উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

বিষয়সূচি

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য : শতবার্ষিকী সংকলন : ব্যক্তিজীবন

॥ ১ ॥

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী লেখার ইতিহাস দীর্ঘকালের। হিমালয়-ভ্রমণকাহিনী ভ্রমণসাহিত্যের মুখ্যস্থান অধিকার করলেও অজানা জনপদ, আরণ্য অঞ্চল, তীর্থস্থান ভ্রমণের কাহিনীতেও নানাভাবে বাংলাসাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন অনেক লেখক। ১৭৭০ সালে কবি বিজয়রাম সেন লেখেন তাঁর তীর্থভ্রমণের পুঁথি কাব্যাকারে, তীর্থমঙ্গল। তারপর প্রমথনাথ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিহর শেঠ, জলধর সেন, স্বামী রামানন্দ ভারতী, স্বামী অভেদানন্দ এঁদের বিভিন্ন রচনায় পাওয়া গেছে হিমালয় ও অন্যান্য স্থানের বিবরণ। শিল্পাচার্য প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে ভ্রমণের নানা বিবরণের সঙ্গে তাঁর অনুপম তুলিকায় এঁকে দিয়েছেন তাঁর দেখা বিভিন্ন উল্লেখ্য স্থান ও বিচিত্র মানুষজনের চিত্র। স্বামী দিব্যাত্মানন্দ তাঁর 'পুণ্যতীর্থ ভারত' গ্রন্থে প্রায় ভারত-পরিক্রমার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব ভাষাভঙ্গিতে। স্বামী প্রণবানন্দও লিখেছেন তাঁর হিমালয়-ভ্রমণকাহিনীতে কৈলাস ও মানস সরোবর ভ্রমণের কথা।

পরবর্তী কালে যে সব ভ্রমণকাহিনীকার বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রবোধকুমার সান্যালের নাম অগ্রগণ্য। 'মহাপ্রস্থানের পথে' সেকালে যেভাবে পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনটি আগে দেখা যায় নি। তাঁর 'দেবাতাত্মা হিমালয়' প্রমুখ অন্যান্য ভ্রমণকাহিনীও উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে। এর পর ব্যাপক জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত অবধূত-এর 'মরুতীর্থ হিংলাজ'। এই সঙ্গে উল্লেখ্য, রাণী চন্দের 'পূর্ণকুম্ভ', শঙ্কু মহারাজের 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা', কালকূটের 'কোথায় পাব তারে', সুবোধকুমার চক্রবর্তীর 'রম্যাণি বীক্ষ্য', নবনীতা দেব সেনের 'হে পূর্ণ তব চরণের কাছে' গ্রন্থগুলি।

ভ্রমণকাহিনীকারদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অনেক কথাসাহিত্যিক—নারায়ণ সান্যাল, বুদ্ধদেব গুহ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শংকর ও আরও অনেকে।

কথাসাহিত্যের লেখক তাঁর মানসসৃষ্টিকে লেখনীর সাহায্যে, কল্পনার রঙে রসে বিচিত্রিত করে পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। কোন কোন রোমান্স-সম্পৃক্ত ভ্রমণকাহিনীর কথা বাদ দিলে, সাধারণ ভাবে ভ্রমণকাহিনীকার তাঁর দেখা বিবরণই পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চান। রোমান্স বা অলৌকিক ঘটনা সম্পৃক্ত হলে ভ্রমণকাহিনী একটি অন্য মাত্রা পায়। এই ধরণের ভ্রমণ ও তার বিবরণ পাঠকদের কাছে চিত্তাকর্ষক ও মনোহর হয়ে ওঠে। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে যখন এইরকম একটি আবহাওয়া চলছিল, সেই সময়ে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ভ্রমণকাহিনী 'গঙ্গাবতরণে'র প্রকাশ ঘটে। এই প্রথম গ্রন্থেই উমাপ্রসাদ বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজে নিজের আসন স্থায়ী করে নেন। 'গঙ্গাবতরণ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। কোন কারণে দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হিমালয়ের পথে পথে' প্রকাশে দেরি হয়, এটি বেরোয় ১৯৬৩ সালে। তারপর উৎস মুখের প্রস্তর বাধা সরে যাবার পর যেমন অদৃশ্য ঝর্ণার ফল্গুধারা বেরিয়ে আসে, তেমনিই একটির পর একটি গ্রন্থ বেরিয়ে আসে উমাপ্রসাদের লেখনী থেকে। উমাপ্রসাদ তাঁর রোমান্সবিহীন কল্পনার আতিশয্যমুক্ত সরল সাদামাটা অথচ সুললিত ভাষায় ভ্রমণকাহিনী লেখার যে নিদর্শন রাখলেন, তার তুলনা বিরল। উমাপ্রসাদের ভ্রমণের ব্যাপকত্ব অসাধারণ—হিমালয়ের পশ্চিম থেকে পূর্ব অঞ্চল, এমন কি সীমান্ত পেরিয়েও নেপালে, তিব্বতে, দেশ ভাগের পূর্বকালীন অখণ্ড ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে দাক্ষিণাত্য, শ্রীলংকা, ব্রহ্মদেশ (অধুনা মায়ানমার), ইন্দোনেশিয়া—যেখানেই সুবিধা পেয়েছেন নতুন দেশ দেখার, চলে গিয়েছেন—সাথী পেলে ভাল নয়তো একাকীই। তবু প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁর আগে বা তাঁর সমকালে রচিত ভ্রমণসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর রচনার অসাধারণত্ব কোথায়? উমাপ্রসাদ তাঁর দেখা অঞ্চলগুলি ভ্রমণ করে কেবল নিজে আনন্দ পেয়ে থেমে থাকেন নি, সেই আনন্দের উপকরণগুলি তিনি ধরে দিয়েছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে। তাঁর ভ্রমণপথের

দুর্গমতার কথা বলেছেন, কিন্তু ভয়াবহতার আতিশয্য সৃষ্টি করেন নি। ধৈর্য ও মনোবলে কীভাবে দুর্গম পথ সুগম হয় তার নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সঙ্গে ভ্রমণপথের চারপাশের সৌন্দর্যের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি দেশ দেখার সঙ্গে সেই সব দেশের মানুষদেরও দেখেছেন। তাদের সুখ-দুঃখ, জীবনযাপন পদ্ধতি, দুর্গম জনপদে দরিদ্র সমাজের স্বল্পপ্রয়োজনে যে সন্তোষ ও আনন্দ তিনি দেখেছেন, আমাদের কাছে তাঁদের আত্মীয়বৎ হয়ে সেই চিত্র এমন ভাবে তাঁর ভ্রমণকথায় ধরে দিয়েছেন যা আগে আমরা কখনও পাই নি। সাজানো-গোছানো নগরসভ্যতা অপেক্ষা অখ্যাত দুর্গম অঞ্চলগুলি তাঁর ভাল লাগত। সেই জন্যই বার বার গেছেন হিমালয়ে, কচ্ছের রান্ অঞ্চলে, দাক্ষিণাত্যে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও। এক-এক জায়গায় একাধিকবার যাওয়ার ফলে সেইসব জনপদবাসীর সঙ্গে তাঁর এক নিকট-আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেইজন্যই তিনি মোটবাহক বা মেষপালকের হাতে তাঁর বিছানাপত্র সমস্ত সমর্পণ করে একলা পথ চলেছেন। কোন ব্যক্তি দৃষ্টিআকর্ষণ করেছেন তাঁর মোটবাহক দাগী আসামী, জেল খেটেছে। কিন্তু তাতে তাঁর বিশ্বাস ও নির্ভরতা বিন্দুমাত্র টলে নি। এই ভাবেই তিনি চলেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিজন বিপদসঙ্কুল পথে। আর অতি সহজভাবেই বলেছেন তাদের কথা। আমরা তাঁর ভ্রমণসাহিত্য পড়ে আনন্দ তো পাই-ই, সেই সঙ্গে আমাদের অজান্তেই আবিষ্কার করে ফেলি ভারতাত্মাকে। এই খানেই উমাপ্রসাদ রচিত ভ্রমণসাহিত্যের অসাধারণত্ব।

॥ ২ ॥

কিন্তু শুধু ভ্রমণকাহিনীকার রূপেই কি উমাপ্রসাদের সামগ্রিক পরিচয়? ঠিক তা নয়। তাঁর প্রথম খ্যাতি বা পরিচয় ভ্রমণকাহিনীর রচয়িতা হিসেবে ঠিকই, কিন্তু তাঁর দীর্ঘজীবন জুড়ে রয়েছে নানা কর্মকাণ্ড। তাঁর শতবার্ষিকী রচনাসংকলনে আছে তার পরিচয়। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত তাঁর প্রথম রচনা 'পশ্চাতের আমি' একটি অত্যুৎকৃষ্ট স্মৃতিচারণ। এতে আছে তাঁর বাল্যকাল থেকে ভ্রমণের নেশা কিভাবে শুরু হয় আর আছে নানা ব্যক্তির প্রসঙ্গ, সাধারণ থেকে অসাধারণ। এই রচনাটি তাঁর ভ্রামণিক জীবনের সারাৎসার বলা যেতে পারে। আনন্দসন্ধানী পরিব্রাজক সন্ন্যাসীতুল্য 'পথিক দেবতা'র কথা স্মরণ করায় যার উল্লেখ করেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দেবযান' গ্রন্থে।

সংকলনের দ্বিতীয় অংশে হিমালয় ভ্রমণের বিবরণ—গঙ্গাবতরণ, স্বর্গারোহণী, কেদারনাথ—সেকাল ও একাল, মণিমহেশ, ত্রিলোকনাথ, বৈষ্ণোদেবী, রেণুকা হ্রদ, পরশুরাম কুণ্ড ও মুক্তিনাথ।

'গঙ্গাবতরণ' উমাপ্রসাদের প্রথম প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী। ১৯৫৩ সালে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ ভ্রমণের বিবরণ উমাপ্রসাদ একটি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। প্রসিদ্ধ আইনজীবী অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও আরও অনেকে আগ্রহ সহকারে সেটি চেয়ে নিয়ে পড়েন ও মুগ্ধ হন। পরে প্রধানত অতুলবাবুর তাগিদেই উমাপ্রসাদ নিজেই 'গঙ্গাবতরণ' প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। প্রকাশক রূপে সজনীকান্ত দাস-এর রঞ্জন পাবলিশিং হাউস-এর নাম ছিল। আনন্দবাজার পত্রিকার কানাইলাল সরকার-এর আগ্রহে গ্রন্থাকারে প্রস্তুত হলেও বইটি আগে দেশ-পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। 'গঙ্গাবতরণ' ধারাবাহিক প্রকাশকালেই উমাপ্রসাদ ভ্রমণকাহিনীকার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান।

গঙ্গাবতরণের পর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হিমালয়ের পথে পথে' কথাসাহিত্যে মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। স্বর্গারোহণী এই গ্রন্থের শেষ পর্ব, শতোপন্থ বা সত্যপদ ভ্রমণের কথা, যে-পথে পাণ্ডবরা গিয়েছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে, যে-পথ বদরীনাথের চিরতুষারময় বিরাট শৃঙ্গগুলির জটাজালে গিয়ে লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তার আগে বদরীনাথ অঞ্চলের সমাজজীবনের এক অন্তরঙ্গ চিত্র উপহার দিয়েছেন লেখক।

কেদারনাথে উমাপ্রসাদ প্রথম যান ১৯২৮ সালে। হৃষীকেশ থেকে ছিল হাঁটাপথ। পথে পথে ছিল ছোট বড় সব চটি, যেখানে যাত্রীরা আশ্রয় নিত। তারপর কালে মোটরপথ হল। সহজ হল কেদারনাথের দিকে এগুনো। হাঁটা পথ ও নিত্য ব্যবহৃত চটিগুলি ক্রমে বিস্মৃত হল। এই পর্বে আগেকার ও নতুন পথের বর্ণনা, কালের সঙ্গে পথের ও স্থানের পরিবর্তনের কথা নিপুণভাবে বলেছেন লেখক। যাঁরা আগে গেছেন এই সব পথে, সেই সব পাঠকের মন এই অংশটি এক অদ্ভুত স্মৃতিমেদুরতায় বিধুর করে তোলে।

মণিমহেশ উমাপ্রসাদের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এটিই প্রথম ভ্রমণকাহিনী যা সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে

সম্মানিত হয়। মণিমহেশ হিমাচল-হিমালয়ের এক প্রসিদ্ধ তীর্থ, কৈলাস শিখরের মতোই। চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে মণিমহেশ হ্রদ, চারপাশে বরফের পাহাড়, আর তারই মাঝে নীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে মণিমহেশ শিখর। উমাপ্রসাদের আগে এমন ভাবে কেউ মণিমহেশের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ঘটাতে পারেন নি।

পশ্চাতের আমি
(স্মৃতিচারণ)

"তৃণে-পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে॥"

সেই ডাকেই আমারও সাড়া দেওয়া। আবার সে-বছর সিকিম হিমালয় ভ্রমণের উদ্দেশে যাত্রা।

তখন ফরাক্কার পুল তৈরি হয়নি। সকরিগলি ঘাটে পৌঁছে, ট্রেন ছেড়ে, স্টীমারে গঙ্গা পার হতে হয়। তারপর, অপর পারে আবার ট্রেন ধরা। কলকাতা থেকে ট্রেনে আসতে সহযাত্রীদের মধ্যে একজনের প্রতি অনেকবার কৌতূহলী দৃষ্টি পড়েছে। কামরার জানলার ধারে তিনি বসে। পরনে সাহেবী পোশাক,— কোট প্যান্ট, মাথায় ফেলট হ্যাট। সেটা কোন বৈচিত্র্য নয়। অদ্ভুত লাগছিল, সারাদিন তিনি একবারও মাথা থেকে টুপি খোলেন না। কারও দিকে তাকানও না, কথা বলা ত দূরের কথা। আপন মনে একটা বই পড়ে সময় কাটালেন, মাঝে শুধু একবার একটা টিফিন কৌটা খুলে কিছু খাওয়া দাওয়া করলেন, —তাও সেই টুপি মাথায়!

তারপর, ট্রেন ছেড়ে যখন স্টীমারে গিয়ে উঠি, ওপরের ডেকে পৌঁছে দেখি, সেই ভদ্রলোক আমার আগে এসে একটা বেঞ্চে একাকী বসে রয়েছেন। আমিও এগিয়ে গিয়ে সেই বেঞ্চেরই খালি অংশে বসি। এইবার ভদ্রলোক সারাদিনের পর এই প্রথম মাথা থেকে টুপি খুললেন, পকেট থেকে রুমাল বার করে মাথা ও মুখ মুছলেন। আমি আড়চোখে লক্ষ করছি। তাঁর মুখ এতক্ষণে ভাল করে দেখতে পাই। দেখেই চমকে উঠি।—আরে! আমাদের অরুণ না?—সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করি, মিস্টার গুপ্ত? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট?

তিনি আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকান। বলেন, হাঁ, তাই। আপনি? চিনতে পারছি না তো।

তখনই হেসে বলি, চিনতে পারছ না? উমাপ্রসাদ।

"আরে! তুমি! কতকাল পরে দেখা! সেই কলেজ ছাড়ার পর এই আমাদের প্রথম দেখা।—তা বছর পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল! কী আশ্চর্য!—কিন্তু, তুমি আমায় দেখে চিনতে পারলে, আর আমি পারলাম না,—এটা কী করে হল?"—বলে ভাল করে আমার মুখের পানে তাকায়, তারপর হেসে বলে, দাঁড়াও, ধরেছি ভাই,—তোমার গোঁফ জোড়াটি গেল কোথায়?

আমিও তখনই স্বীকার করি, ঠিকই ধরেছ, কলেজ ছাড়বার বছর দশেক পরে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা থেকে ফিরে এসে ওটা কামিয়ে ফেলি,—চেনা মুখ মনে রাখবার প্রধান একটা পুরানো চিহ্ন লোপ পেয়েছে, ঠিকই।

তারপর, দুই বন্ধুর মধ্যে গল্প জমে।

অরুণ কলেজ ছাড়ার পর ফরেস্ট দপ্তরে অফিসারপদে যোগ দেয়, জানতাম। চীফ্ কনজারভেটর অফ্ ফরেস্ট পদমর্যাদা ভোগ করে সম্প্রতি অবসরগ্রহণ করেছে। বলে, ভাই সারাজীবন বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে কাটিয়ে এখন আর কলকাতায় থাকতে মন চায় না। দার্জিলিঙে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে রয়েছি, কলকাতায় কখনও সখনও যাই—মেয়েদের কাছে, তারাও সুবিধে পেলে আমার কাছে চলে আসে।—তা তুমি এখন চলেছ কোথায়? দার্জিলিঙ-এই নাকি?

তাকে জানাই, আপাতত চলেছি সিকিমে বেড়াতে, ফেরবার পথে দার্জিলিঙও আবার ঘুরে আসব।

অরুণ বলে, সিকিম যাচ্ছ? চমৎকার! আগে যাওনি ওদিকে? কোথায় কোথায় ঘুরবে? প্রোগ্রাম কিছু করেছ? গ্যাংটকে তোমার কেউ জানাশোনা আছেন?

আমি জানাই, সিকিম আগে দেখেছি বলা ঠিক হবে না। বছর দুই আগে মঙ্‌পুতে থাকতে সেখানকার এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন গ্যাংটক বেড়াতে গিয়েছিলাম—সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসা, গ্যাংটক শহরটুকুই সেবার দেখেছি। সেই সময়ে সেখানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়,—মিস্টার ভট্টাচার্য। সিকিম সরকারের বড় অফিসার। ক'বছরই সেখানে কাটিয়েছেন। কিন্তু তার কয়েক মাস পরেই রিটায়ার করবেন বলেছিলেন,—এখন নিশ্চয় গ্যাংটকে তিনি আর নেই। আর কারও সঙ্গে আমার আলাপের সুযোগ হয়নি। দেখি, গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে সিকিমের কোন্ কোন্ অঞ্চলে ঘুরতে পারি।

অরুণ আশ্বাস দেয়, যোগাযোগ আমি একটা করে দিচ্ছি,—একটু পরিচয় কোথাও না থাকলে কয়েক জায়গায় ঘোরবার সরকারী অনুমতি জোগাড় করা মুশকিল হতে পারে। সিকিমে আমিও সরকারী কাজে কিছুকাল কাটিয়েছি। তখন আমার সহকারী ছিলেন মিস্টার প্রধান, এখন তিনিও রিটায়ার করেছেন। আমার একটা কার্ডে তাঁর নাম-ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। তাঁর সঙ্গে দেখা কোরো।—চমৎকার লোক,—সুপরামর্শ দিতে পারবেন। তাঁর ছেলে—কেশব প্রধানও এখন ডি.এফ.ও হয়েছে, সেও বেশ ভাল ছেলে, তার কাছেও সাহায্য পাবে।

অরুণ তার কার্ডে সেই মত ঠিকানাপত্র লিখে দেয়। ফেরবার পথে দার্জিলিঙে যেন নিশ্চয় তার সঙ্গে যোগাযোগ করি, বারবার জানায়।

গ্যাংটকে পৌঁছে খবর নিয়ে জানতে পারি, মিস্টার ভট্টাচার্য তখনও গ্যাংটকেই রয়েছেন স্পেশাল অফিসাররূপে। ভাবলাম, ভালই হোল, তাঁর কাছে গেলেই সিকিম-ভ্রমণের প্রোগ্রাম করার সুপরামর্শ পেয়ে যাব, প্রয়োজন মত সরকারী অনুমতিপত্র সংগ্রহ করাও সহজ হবে। বন্ধুর কার্ড নিয়ে অপরিচিত মিস্টার প্রধানের দ্বারস্থ হবার দরকার কী?

ভট্টাচার্যের বাড়ি গিয়ে হাজির হই। ভদ্রলোক ছিমছাম সাজানো ড্রয়িংরুমে আরামে সোফায় বসে গড়গড়া টানছিলেন। ঘরের একধারে চৌকির ওপর ফরাশ পাতা। সেখানে সেতার, তানপুরা, তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সাজিয়ে রাখা। আমাকে হঠাৎ দেখে যেমন আশ্চর্য হন, তেমনি উল্লসিত হয়ে ওঠেন, আরে! মুখুজ্জে মশাই! আপনি হঠাৎ কোথা থেকে? আসুন, আসুন।

আমি বলি, ঘুরতে ঘুরতে আবার এখানে আসব, আশ্চর্য হবার কথা নয়। কিন্তু, আপনাকে আবার এখানে পাব তা তো আশা করিনি। সেবার আপনি তো বললেন, ক'মাস পরেই চলে যাবেন।

তিনি জানান, চাকরিতে অবসর পাবার পর আবার একটা স্পেশাল কাজে এখানে আটকে দিলে। আরও কিছুকাল থাকতে হবে। তারপর—কবে এলেন? খবর কী বলুন।

আমি খুশিভাব দেখিয়ে বলি, আপনি এখানে থাকায় আমারই খুব সুবিধা হোল দেখছি। সে বছর গ্যাংটকটুকু ছাড়া সিকিমের অন্য কোথাও যাওয়া হয়নি। তাই এবার চলে এলাম সিকিমে ঘুরতে। নাথুলা যাব এবং আর কোথায় কোথায় যাওয়া যায়,—প্রোগ্রাম ঠিক করে দিন। আপনি তো এত বছর এখানে কাটালেন।—সব জানেন নিশ্চয়।

ভট্টাচার্যের মুখে হঠাৎ যেন কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। গম্ভীর হয়ে যেন ভর্ৎসনার সুরেই বলেন, গ্যাংটকের বাইরে আবার কোথায় যাবেন? সে সব বনজঙ্গল পাহাড় অঞ্চলে দেখবার আছেই বা কী, শুনি? কলকাতা থেকে গ্যাংটকে এলেন,—এই তো যথেষ্ট বেড়ানো হোল। এখন যে-ক'দিন কাটাতে চান—এখানে এসে উঠেছেন কোথায়?—চলে আসুন আমার এখানে, আমার এই ডেরায়—ঐ ঘরে

থাকবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। খাসা গল্পগুজব করে কাটানো যাবে। গানবাজনার নিত্য মজলিস বসছে, কেমন আনন্দে দিন কাটছে, দেখবেন।—বলে গড়গড়ার নল ধরে তামাক টানতে থাকেন।

আমি বলি, সেই মত পরে থাকা যাবে, এখন আপাতত ক'দিন এদিক ওদিক কিছু ঘুরে আসি,—কোথায় কোথায় যাব বলুন দিকিনি,—আপনি সব ঘুরেছেন নিশ্চয়?

তিনি মুখ থেকে নল সরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে জানালেন, আমার ঘোরার কথা বলছেন? এই তো ক'বছর এখানে কাটালাম, এই শহর ছেড়ে আর কোথাও একপাও বাড়াই নি, যাবার কোন ইচ্ছাই হয়নি। নিজের কাজকর্ম করি, অবসর সময়ে বাড়িতে গানবাজনার মজলিস—কখনও কখনও তাদের আড্ডা বসে,—পরম আনন্দে দিন কেটে যাচ্ছে, পাহাড়ে পাহাড়ে অযথা কষ্ট করে ঘোরাঘুরি করার সার্থকতা কী, মশাই? তারপর আবার নল মুখে দিয়ে গুড়ুক গুড়ুক করে দুটান টেনে তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত দেন, দেখুন, আপনাকে সোজাসুজি বলে দিই,—এসব ব্যাপারে আমার কাছে কোনও রকম সাহায্য পাবেন না। ঐ টো টো করে ঘুরে বেড়ান আমি মোটেই পছন্দ করি না। আমার নিমন্ত্রণ রইল, চলে আসুন এখানে,—চুপচাপ বাড়িতে বসে যতদিন ইচ্ছা হয় কাটিয়ে দিন—থাকবার কোন অসুবিধা হবে না আপনার। ও-সব ঘুরে-বেড়ানোর নেশার পোকা মাথা থেকে বার করে দিন।

প্রকৃতই দেখি, এ-প্রসঙ্গে তিনি আর কোন আলোচনাই করতে চান না।

অগত্যা মুখে প্রফুল্লতার ভান রেখে কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প চালাই।

তারপর, তাঁর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি বন্ধুর পরিচিত মিস্টার প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে। তাঁর বাড়ির সন্ধানও সহজেই পেয়ে যাই।

পাহাড়ের কোলে ধাপে ধাপে সাজানো বাগান। একপাশে ছবির মতন কাঠের বাড়ি। যেন ফুলের রঙের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে দাঁড়িয়ে।

বাগানে গাছপালার মধ্যে কী যেন মন দিয়ে দেখাশুনা করছিলেন এক বৃদ্ধ।

গেট দিয়ে আমি ঢুকতেই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তখন দেখি, মাথাভরা পাকাচুল হলেও এখনও কর্মঠ দেহ। পরিচয় পেলাম, তিনিই মিস্টার প্রধান।

তখনই অরুণের কার্ডখানি তাঁকে দিই, আমার আসার উদ্দেশ্যও জানাই।

আমার কথা শুনে তাঁর প্রশান্ত বদন প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। উৎফুল্ল হয়ে জানান, আপনি গুপ্তসাহেবের দোস্ত! সিকিম এসেছেন এ-অঞ্চলে পাহাড়ে ঘোরবার জন্যে? অতি চমৎকার উদ্দেশ্য। গ্যাংটক শহরটুকু দেখলে কি আর সিকিম দেখা হয়? চলুন, ঘরের মধ্যে গিয়ে বসা যাক। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কোন ভাবনা নেই। তাঁর আশ্বাসবাণী আমার ভাবনাতপ্ত মনের উপর যেন শান্তিবারি সিঞ্চন করে।

কথা বলতে বলতে এগিয়ে বাড়িতে তাঁর বসবার ঘরে তিনি নিয়ে আসেন। চেয়ারে বসতে বলে তখনই বাড়ির ভিতরে চলে যান, অবিলম্বে ফিরেও আসেন,—হাতে এক প্রকাণ্ড মানচিত্র!

টেবিলের উপর সেটি ছড়িয়ে পেতে বৃদ্ধ তার উপর ঝুঁকে পড়েন, আমাকে বলেন, দেখুন ভাল করে,—এই এখানে গ্যাংটক—আমরা যেখানে রয়েছি। আপনার সিকিম দেখতে হলে যেতে হবে—বলে সোৎসাহে দেখাতে থাকেন,—এই এখানে নাথুলা, এই সিংঘীক, এধারে এই ইউম্‌থাঙ্‌—এ সবই ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে।

আমি সাগ্রহে তাঁর আঙ্গুলি সঙ্কেতগুলি অনুসরণ করছি, আর মাঝে মাঝে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাচ্ছি, আর ভাবছি, বৃদ্ধের এখনও কী প্রচণ্ড উৎসাহ!—যেন খাঁচায় ধরা বনের পাখির আকাশে ওড়ার আকুল আকুতি!

এক নাগাড়ে তিনি সিকিমের কত দর্শনীয় স্থান দেখিয়ে যান, তারপর এক সময়ে ম্যাপ থেকে মুখ তুলে বিষণ্ণ বদনে বলেন, আমার নিজের এখন বেরুনোর উপায় নেই, নইলে আমিই সঙ্গে করে আপনাকে ঘুরিয়ে আনতাম। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরা—সে কী আনন্দ! তবে আমার ছেলে কেশব এখন ডি.এফ.ও—

আমি তাঁর কথার মাঝেই বলি, গুপ্ত তাঁর কথাও আমাকে জানিয়েছিলেন, তাঁর সুখ্যাতিও করছিলেন।

পুত্রগর্বে হৃষ্টমুখ প্রধান তখন বলেন, গুপ্তসাহাব তাঁকে খুবই স্নেহ করেন। তাকে এখনই আমি টেলিফোন করছি, সে অফিসের কাজ হলেই যেন চলে আসে। সে-ই আপনার সব প্রোগ্রাম করে দেবে,

কোথাও কোথাও নিজেও সঙ্গে যেতে পারবে।

টেলিফোনে খবর পেয়ে কেশব তখনই চলেও আসেন, আমার সিকিমভ্রমণের সুব্যবস্থাও হয়ে যায়।

এ জগতে দেখেছি, প্রধানরাও থাকেন, আবার ভট্টাচার্যিরাও আছেন।

মানব মনোজগতের এ এক বিচিত্র লীলাখেলা।

জানি না, হয়ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগে শরীরবৃত্তি ও মনোবিদ্যা বিশারদগণ এই বৈচিত্র্যের গূঢ় কারণ বিশ্লেষণ করতে পারেন।

* * * *

আমার নিজের কথা বলতে পারি। ছেলেবেলা থেকেই ঘুরে বেড়াতে আমার ভাল লাগে। পথের ডাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া আমার স্বভাব।

জন্মাবধি আমাদের মধুপুরে যাতায়াত। স্কুল-কলেজের ছুটি হলেই সেইখানে গিয়ে কাটানো। টো টো করে সারাদিন ঘোরা। দিগন্তজোড়া মাঠে মাঠে। ধানক্ষেতের আলে আলে। শাল-পলাশের বনের ছায়ায়। উপলবহুল ঝরনাধারার পাশে শিলাস্তূপে সুখাসনে বসা। শীর্ণকায়া নদীর শুষ্ক বালুচরের উপর দিয়ে জুতা হাতে খালি পায়ে জলধারার উৎস সন্ধানে যাত্রার, ও ছোট ছোট পাহাড় ও টিলা দেখলেই তার উপর ওঠার সে কী স্ফূর্তি! সেই জনহীন শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে একাকী স্তব্ধ হয়ে বসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার সে এক অপরিসীম আনন্দ। দিগন্তে নৈর্ঋত কোণে বহুদূরে গাঢ় নীল ধনুকাকার দেখা যেত পরেশনাথ পাহাড়। শুনতাম, এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ গিরিশিখর, প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচু। আকাশে মাথা তুলে নীলচোখে ইশারা করে যেন কাছে যেতে ডাকত!

ক্রমে সুযোগ পেলাম আরও বিভিন্ন গিরিশ্রেণী দেখবার।

১৯১৬ সালে এলাহাবাদ, আগ্রা যাবার পথে বিন্ধ্যগিরি। ১৯১৭ সালে বাবার সঙ্গে বম্বে, পুণা যেতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা সহ্যাদ্রি। পুণার রেলপথে পাহাড়ের সেই কত টানেল! পাহাড় ফুঁড়ে সুসজ্জিতা সেকালের "ডেকান্ কুইন্" (Deccan Queen) ট্রেন চলেছে, পুলক ও বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখেছি।

সে-যাত্রার আর এক দৃশ্য মনে ধরা আছে। পাহাড়-পর্বত নয়। কিন্তু, উত্তুঙ্গগিরিশিখরের মত উন্নতশির দুই পুরুষসিংহের মিলন। পুণার এক বাড়ির বারান্দায় দুই চেয়ারে পাশাপাশি বসে গভীর আলাপরত আমার পিতৃদেব—বাংলার বাঘ আশুতোষ ও মহারাষ্ট্রকেশরী বালগঙ্গাধর টিলক। উভয়েরই তেজোদীপ্ত বলিষ্ঠ দেহ, ঝাঁকড়া গোঁফ,—যেন দুই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা।

* * * *

১৯১৮ সালে বাবা গেলেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-ভাষণ দিতে। আমাকেও সঙ্গে নেন। দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ নীলগিরি পর্বতশ্রেণীরও দেখা পাই। উটকামণ্ডও যাই। সেখানকার সর্বোচ্চ শিখর ৮,৬৪২ ফুট। অবাক হয়ে দেখি, পাহাড় কত উঁচু হয়!

সেই বছরই দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে ম্যাট্রিক দেবার পূর্ববর্তী স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা দিলাম।

মনে পড়ে, বাঙলার প্রশ্নপত্রে প্রবন্ধ রচনার একটা বিষয় ছিল—ভ্রমণ। আমি লিখেছিলাম, আমার সেই দাক্ষিণাত্যভ্রমণ বর্ণনা।

এখন ভাবি, মানুষের জীবনে যোগাযোগ কি এমনি করেই ঘটে!

আমার এই ভ্রমণপিপাসা দেখেই কি ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হয়ে পরের বছরই সুযোগ দেন প্রথম হিমালয় দর্শনের!

১৯১৯ সাল। বাবা চলেন দার্জিলিঙ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাড্‌লার কমিশন উপলক্ষ্যে। আমরাও সকলে সঙ্গে যাই।

হিমালয়, কিন্তু, তখন আমার সম্পূর্ণ অচেনা নন। এ-যেন কারও সঙ্গে পত্রালাপ আছে, এখন প্রত্যক্ষদর্শনের সুযোগ এল। অদেখা হিমালয়ের সঙ্গে সেই পূর্ব-পরিচয়—বই-এর মাধ্যমে।

বাড়িতে বাবার ছিল বিরাট গ্রন্থাগার। রান্নাঘর, স্নানের ঘর এই ধরনের ঘর কয়খানি ছাড়া সেই তিনতলা বাড়ির এমন কোন ঘর, দালান বা হল্ ছিল না, যেখানে বই-ভরা শেল্‌ফ বা আলমারি নেই। সেই বই-এর রাজ্যে আমাদের ভাই-বোনদের জন্ম। সেই গ্রন্থরাজির অরণ্যের অন্তরালেই আনাচে কানাচে আমার ছেলেবেলার লুকোচুরি খেলা। ক্রমে লেখাপড়া শুরু হলে সেই বই-এর মধ্যে থেকে সংগ্রহ

করে কিছু কিছু পড়ার কৌতূহল ও আগ্রহ। সেইখানেই আবিষ্কার সোয়েন হেডিনের Trans Himalaya গ্রন্থ। কৈলাস-মানসসরোবরের বর্ণনা পড়ি, ছবি দেখি। জলধর সেনের "হিমালয়" বদরীনাথ পথের সন্ধান দেয়। পিতৃদেবকে উপহার দেওয়া রত্নমালা দেবীর "হিমালয় পরিভ্রমণ" ও "কাশ্মীর ভ্রমণ" বই দুখানিও হাতে আসে। সেই সময়কার আরও যে বইগুলির কথা এখনও মনে আছে, তার কয়েকটির নাম উল্লেখ করি; শরৎচন্দ্র দাসের Journey to Lhasa & Central Tibet (এটিও গ্রন্থকার কর্তৃক পিতৃদেবকে উপহৃত)। Kawaguch-র Three years in Tibet. Savage Landor-এর In the Forbidden Land, Francis Younghusband-এর India & Tibet. Waddell-এর Amongst the Himalayas ও Lhasa & its mysteries. এবং আরও একটি অতি চমৎকার সচিত্র বই—A. L. Mumm-এর Five months in the Himalayas বইগুলি পড়ে আমার ক্ষুদ্র কিশোর মন হিমালয় সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিল. শিলিগুড়ি পৌঁছে আকাশের পটে প্রকৃত হিমালয়ের বিরাট রূপের মাঝে সে-ধারণা চকিতে কোথায় হারিয়ে যায়,—যেমন অকূল সাগরজলে এক ঘটি জল নিমেষে বিন্দুসম অদৃশ্য হয়।

তখনই বুঝি, হিমালয় যে স্বচক্ষে দেখে নি, তার পক্ষে লোকের মুখে গল্প শুনে বা বই-এ লেখা বর্ণনা পড়ে হিমালয়ের বিস্ময়কর বিশালতা ও অনন্য-রূপসম্ভার কল্পনা করা অসাধ্য।

এখনও মনে পড়ে, সেই খেলাঘরের মত ছোট ট্রেনে চড়ে প্রথম দার্জিলিঙ যাওয়া। শুক্‌নার সেই গভীর অরণ্য, বিশাল বনস্পতির জটলা.—অজগর সাপের মত সর্পিল গতিতে ভোঁস্ ভোঁস্ শব্দ করে ট্রেন চলেছে এঁকে বেঁকে—পাহাড়ের গা বেয়ে.—একপাশে পাহাড়ের খদ. অপরপাশে পাহাড়ের গা. কখন Zig Zag, কখন লুপ্, মাঝে মাঝে ঝরনা, ছোট ছোট স্টেশন। কামরার জানলা দিয়ে কখনও এদিকে দেখি, আবার ওদিকের জানলা দিয়ে তাকাই—কোন্ দিকে দেখি ভেবে না পাই,—প্রকৃতি যেন ছবির বই-এর পাতার পর পাতা উলটে কেবলই নতুন দৃশ্য দেখান। দেখতে দেখতে এক সময়ে ট্রেন পাহাড়ের কত ওপরে উঠে আসে.—গাছের ফাঁকে নীচে বহু দূরে দেখা যায় গিরি-মধ্যপথে সঙ্কীর্ণ নদীর আঁকাবাঁকা ক্ষীণ রেখা,—আরও দূরে ফেলে-আসা বাঙলার শ্যামলভূমি!

এখনও মনে পড়ে, দার্জিলিঙ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য। সেই প্রথম তুষারশিখর দর্শন। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখা, সূর্যোদয়কালে সেই বরফের উপর অপূর্ব বর্ণবিন্যাস, সেই প্রথম দেখার রোমাঞ্চিত অনুভূতি।

অথচ, পরবর্তীকালে আমার হিমালয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতার প্রসারণের ফলে ক্রমশ বুঝতে পারি, ১৯১৯ সালের সেই প্রথম হিমালয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় নামমাত্র চাক্ষুষ দর্শন.—যেন শিশুর হাতে ছবির বই,—তখনও অ আ ক খ বর্ণপরিচয় হয়নি.—মুগ্ধনেত্রে শুধু বই-এর ছবি দেখা।

পরের বছর—১৯২০ সালে—সেই বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগটি হাতে নিয়ে মধুপুর থেকে গিরিডি গিয়ে হঠাৎ পরেশনাথ পাহাড়ে ওঠার সুযোগ এসে যায়। হিমালয়ের তুলনায় এ-পাহাড় কিছুই নয়। সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। তবুও তো প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচু,—কার্সিয়াঙ-এর সমান। কিন্তু. উঠতে গিয়ে প্রকৃত পাহাড়ে চড়ার প্রথম পাঠ নিই—"অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে" "আমটি আমি খাব পেড়ে"! তখনই জানতে পারি, দার্জিলিঙ-এর শৌখিন শৈলশহরে পিচ-ঢালা বা পাথর-বাঁধানো পথে চড়াই-উৎরাই এক ব্যাপার,—আর পরেশনাথ পাহাড় তুলনায় নগণ্য হলেও সেকালের শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যময় পাকদণ্ডী পথে পাহাড়ে ওঠার পদ্ধতি পৃথক। শুনেছিলাম, মাত্র পাঁচ মাইল চড়াই পথ. শেষের খানিকটা পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে সমতল। হিমালয় ঘুরে আমার গর্ব নিয়ে ভ্রমণ-অভ্যস্ত চরণে ত্বরিৎগতিতে উঠতে থাকি,—পাঁচ মাইল—এ তো দেখতে দেখতে পৌঁছে যাব। বেশ কিছুটা উঠে দেখা যায়,—একী! পথ যে আবার পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যায় খানিকটা! অর্থাৎ মূল পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট আরও দুটি পাহাড় অতিক্রম করে তবে মূল চড়াই। ক্লান্ত চরণে মাথা তুলে দেখি, পাহাড়ের চূড়ায় মন্দিরটি যেমন আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে ছিল দেখেছিলাম, এখনও দেখায় তেমনি ছোট, তেমনি দূরে, কয়েকটা চিল সেখানে ওড়ে, কালো বিন্দুর মত! সেই পাঁচ মাইল পথ যেতে সেবার সময় লাগে পৌনে

তিনঘণ্টা। গর্বচূর্ণ হয়ে শিক্ষা পাই, সমতল পথের ও পাহাড়ী পথের দূরত্বের পরিমাপ সমান হলেও তাদের মান-মর্যাদা কত ভিন্ন, চলার গতিবেগে ও ছন্দে কত তারতম্য থাকে। পাহাড়ে উঠতে হয় ধীরে ধীরে, আপন সামর্থ্য ও দম বুঝে, এবং নিজেকে কখনও অতিমাত্রায় ক্লান্ত হতে না দিয়ে।

* * * *

১৯২১ সাল। আবার হিমালয়। গ্রীষ্মের দু'মাস কাটে কার্সিয়াঙ-এ। তারপর ডিসেম্বরে বাবার সঙ্গে চলি লাহোর ও অমৃতসরে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি ভাষণ দিতে চলেছেন। সেবারকার একটা ঘটনা বিশেষ করে মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। এর উল্লেখ অন্যত্রও করেছি। লাহোরে আমরা অতিথি হই পাঞ্জাবের সেকালের এক বিখ্যাত ডাক্তারের গৃহে। ডাক্তার বালকিষণ কাউল। কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ। বাড়ির বাইরে চিকিৎসকরূপে বার হতেন সাহেবী পোশাকে, দেখতেও ছিলেন সুপুরুষ, সাহেবের মতন রঙও। কিন্তু, বাড়ির মধ্যে আচার বিচারে, বেশভূষায় নিষ্ঠাবান খাঁটি ব্রাহ্মণ। সারা বছর পানীয় জল ব্যবহার করতেন সেই গোমুখ থেকে আনানো গঙ্গাজল! তাঁরই বাড়িতে সেই প্রথম গোমুখের জল স্পর্শ করি, মাথায় ছিটাই, পান করি। এখন ভাবি, সেই ফাঁকেই কি হিমালয়ের পথের নেশা আমার শিরায় শিরায় রক্তে মেশে:

ডাক্তার কাউলের সাহায্যে পরের বছর বাবাও কয় ঘড়া গোমুখের জল আনান।

আজ যাট বছর পরে মধুপুরে বসে এই রচনা লেখা। এখানে পাশের ঘরে আজও সেই গোমুখের জলভরা একটা তামার কলসী—মুখবন্ধ, সীলকরা—এখনও তেমনি অটুট রয়েছে!

* * * *

এই সময়ে কোন এক বছরের আর এক ভ্রমণের ছবি এখনও মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পুরীতে তখন সবাই রয়েছি। একদিন বাবা জানালেন, চল, সবাই কোনারক বেড়িয়ে আসি। মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী যাবেন বলছেন। একসঙ্গে দল বেঁধে যাওয়া যাবে।

কোনারক একালে প্রসিদ্ধ ট্যুরিস্ট সেন্টার। পুরী বেড়াতে গেলে মোটরে বা বাস-এ ক'ঘণ্টায় ঘুরে আসা সহজ ব্যাপার। অনেকেই সেইমত যানও।

কিন্তু সেকালে কোনারক যাতায়াতের মোটরপথ ছিল না। যেতে হোত গরুর গাড়িতে। কোনারক তখন লোকের কাছে নামে পরিচিত। তাই কোনারক যাত্রা ছিল আকর্ষণীয় অভিযান।

সেই অভিনব গোযান অভিযানের অভিজ্ঞতা আমারও লাভ হয়।

সন্ধ্যার আগেই পুরী থেকে যাত্রা। সারা রাত চলা। ভোরে কোনারক পৌঁছানো।

সারি সারি গরুর গাড়ি। ছই দেওয়া। ভিতরে বিচালির উপর সতরঞ্চি বিছিয়ে শয্যাপাতা। বয়স্করা এক-একজন এক-একটা গাড়িতে। ছোটরা এক-গাড়িতে দুজন। সঙ্গে মহারাজার লোকলস্কর চলে। এমন কি, বন্দুকধারী সিপাহীও।

গরুর গাড়ি। অথচ, কোন ঝাঁকুনি নেই। ঘড়াং ঘড়াং করে লাফানোও নেই। উঁচু-নিচু বন্ধুর শক্ত মাটির উপর দিয়ে ত চলা নয়,—সমুদ্রের উপকূলে বালুচরে সোজা এগিয়ে যাওয়া। নরম বালির উপর মন্থরগতি গাড়ির ঘর্ষণ শব্দ,—একটানা মৃদুমন্দ খস্‌খস্ আওয়াজ। আর, সারারাত্রি কানে বাজে অদূরবর্তী সমুদ্রের তটে ঢেউ-ভাঙার গম্ভীর গর্জন।

চাঁদিনী রাত। মেঘশূন্য আকাশ। ধু-ধু করে জনহীন বালুচর। যেন, মাথার উপর অযুত তারার শোভামণ্ডিত সুনীল চন্দ্রাতপ, তারই তলে অনুজ্জ্বল দীপালোকে সুপ্তিমগ্না ধরিত্রী—সোনালি চাদর গায়ে।

অতন্দ্রনেত্রে সারারাত্রি চেয়ে থাকি,—আমি যেন প্রহরী।

ভোরের আলো ফোটে। 'নাওয়া-খাওয়া' নদী আসে। দূরে দেখা যায় গাছপালার মধ্যে প্রভাতের রক্তিম আলোকে আকাশপানে মাথা তুলে কোনারক মন্দির।

হঠাৎ নজর পড়ে আমাদের গাড়ির অল্পদূরেই ঐগুলি কী? একপাল হরিণ! দলপতি এক কৃষ্ণসার মৃগ। মুখ তুলে তারা তাকিয়ে দেখে গাড়ির সারি। আমরাও অবাক হয়ে তাদের দেখি। কিন্তু অল্পক্ষণই। চকিতে কীসের ভয়ে ভীত হয়ে যূথপতি মুখ ঘুরায়, লাফ দিয়ে দূরে ছুটতে থাকে, অন্য হরিণরাও তার অনুসরণ করে।

কোনারকে সারাদিন কাটিয়ে আবার সন্ধ্যার আগে যাত্রা। পরদিন ভোরে পুরী পৌঁছানো।

পরবর্তীকালে মোটরপথ হলে কয়েকবারই আবার কোনারক যাই। তখন শুধু মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য দেখারই আনন্দলাভ হয়,—গোযানে সেই প্রথম যাওয়ার পুলক স্মৃতিতেই গাঁথা থাকে।

* * * *

এদিকে হিমালয়ও ধীরে ধীরে আকর্ষণ করে নিকটে নিয়ে চলেন।

১৯২২ সাল। পূজার ছুটিতে যাই হিমালয়ের পাদমূলে দেরাডুনে। সেখান থেকেই আমার প্রথম হরিদ্বার যাওয়া, হৃষীকেশ লছমনঝোলা দেখা. গঙ্গার অপরপারে গিয়ে কেদার-বদরীর পায়ে-হাঁটা যাত্রাপথের ধারে দাঁড়িয়ে যেন হিমালয়ের গোপন সুদূরের শুধু ডাক শুনে চলে আসা।

কিন্তু, সেই হরিদ্বারেই আবার ফিরে আসি ক'বছর পরেই পূর্ণ কুম্ভমেলায়। তারপর ১৯২৮ সালে মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রকৃতই হিমালয়ের পথে নামি। হৃষীকেশ থেকে পায়ে হেঁটে কেদার-বদরী তীর্থযাত্রা শুরু হয়। যাতায়াতে প্রায় চার'শ মাইল পথ। একমাসব্যাপী যাত্রা।

এতদিন পরে নগাধিরাজ হিমালয়ের রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশ থেকে নিভৃত অন্দরমহলে প্রবেশের স্বাধীনতালাভ!

হিমালয়ের পথে পথে পদযাত্রা সে-এক অপার্থিব অপূর্ব অভিজ্ঞতা। তার সামান্য কিছু বিবরণ অন্যত্র লেখার চেষ্টা করেছি। এখানে শুধু বলি, এই কেদার-বদরী যাত্রা আমার হিমালয়-পরিভ্রমণকালে যেন পাঠ্যাবস্থায় স্কুল ছেড়ে কলেজে প্রবেশ!

ভ্রমণের নেশাও তখন কেমন ধরেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়.—সেই বছরেই কেদার-বদরী যাত্রা শেষে মাসকয়েক পরেই ঘুরতে বার হই—আবার অমৃতসর. লাহোর। সেখান থেকে তক্ষশিলা. পেশোয়ার, খাইবার পাশ্—আফগান সীমান্ত পর্যন্ত। সে-কাহিনী "আফ্রিদি মুল্লুকে" লিপিবদ্ধ হয়েছে।

* * * *

কিন্তু. পরের বছর—১৯২৯ সালে—জাহাজে বর্মাযাত্রা ও বর্মাভ্রমণের বিবরণ সে-সময়ে লেখা হলেও প্রকাশ করার কখনও উৎসাহ বা আগ্রহ হয়নি। তারই দুটি ঘটনা এখানে বলি।

রেঙ্গুন শহরে ও তার আশেপাশে ঘোরা, বিখ্যাত সোয়েডাগন প্যাগোডা দেখা. পেগুতে গিয়ে বুদ্ধদেবের সেই বিরাট শায়িত মহাপ্রয়াণ মূর্তি দর্শন.—এসব হলেও বর্মার পাহাড়ে পর্বতে ভ্রমণের লোভ থাকে। সেই উদ্দেশ্যে উত্তর-বর্মায় মাণ্ডালে হয়ে মেমিও শৈলশহরে যাওয়ার প্রোগ্রাম হয়। কিন্তু তাতেও মন ভরে না। চলি. চীন-প্রান্তে উত্তর ও দক্ষিণ পার্বত্য Shan State-এও শান্-রাজ্যে বেড়াতে।

মাণ্ডালের পথে থাজি—Thazi—স্টেশনে নেমেছি। সেখানে ট্রেন বদল করে প্রায় ষাট মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর কালও—Kalaw যাব। কুলি ছুটে এল মাল নিতে। হাসিখুশি সুবেশিনী শান্ Shan রমণীর দল। কথাবার্তা নেই, মাল তুলে এ-ট্রেন থেকে ওদিকের ট্রেনে নিয়ে গিয়ে রাখে। পয়সা দেব.—কত দিতে হবে প্রশ্ন করতে ভাষাবিভ্রাটে পড়ি, যত দেওয়া হয়, আরও চায়. হাত পাতে. খিলখিল করে হাসে, চারিদিক থেকে ঘিরে হইচই শুরু করে। ভাবি. আচ্ছা বিপদ বটে! এমন সময় টিকিট কালেকটারের সাজপোশাক পরা দুজন রেলকর্মী এগিয়ে এসে বিপাক থেকে উদ্ধার করেন। পরিচয় পাই. তাঁরা বাঙালী। বসু ও ঘোষ উপাধি।

আনন্দময় বিস্ময় বোধ করি। এখানেও বাঙালী! ভারতের সেই সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে—পেশোয়ার, খাইবার-পাশ্-এ ল্যাণ্ডিকোটালে আফগান সীমান্তেও কর্মরত বাঙালীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। আবার, পরে তেমনি উত্তর-পূর্ব সীমান্তেও তেজুতে তাঁদের আন্তরিক আতিথেয়তা লাভ করেছি। ভারতের সর্বত্র ত বটেই, এমন কি এখানেও এই বর্মামুলুকের চীন-সীমান্ত-দেশেও দেখি—বাঙালী দেশে বিদেশে যেখানেই ঘোরা যায় সর্বত্রই যেমন কাক ও চড়াইপাখির অবাধ আনাগোনা আমরা বাঙালীজাতিও তেমনি। সর্বত্র বিরাজমান। ভ্রমণ-পিয়াসীও। কোন্ কবি যেন লিখেছিলেন.—"কোথা নেই. কোথা নেই ঘরমুখো বাঙালী/অন্যের মুখ চাওয়া অন্নের কাঙালী।"

মহারাষ্ট্রপ্রদেশের বিভিন্ন বনজঙ্গলে ঘুরছি। আদিবাসী মাড়িয়া গোন্‌ড্‌জাতির এ-অঞ্চলে এককালে স্বাধীন রাজ্য ছিল। এখন তারই এক জায়গায় বল্লারপুর শহর। সেখানে কাগজ তৈরির বিশাল এক কারখানা—Paper Factory। তারই কর্তৃপক্ষের সহায়তা ও সুব্যবস্থায় আমাদের এই অরণ্য ভ্রমণ। কাগজ তৈরির উপাদান বাঁশ। ফ্যাকটরি তাই আদিম অরণ্যভূমির বহু অংশ বন্দোবস্ত নেয়। সেই সুগভীর বনাঞ্চলের মধ্যে আমরা জীপ-এ, এবং কোথাও কোথাও হেঁটে. ঘুরছি.—বন্য জীবজন্তুরও দেখা পাচ্ছি। সেই সাতপুরা গিরিশ্রেণীর গহন বনের এক জায়গায় খানিকটা পরিষ্কার করে বাঁশের তৈরি খানকয়েক ঘর। জায়গার নাম ঘাট্টা। মিল-এর এক মহারাষ্ট্রীয় তরুণ অফিসার সেখানে থাকেন। ঐ অঞ্চলের কাজকর্মের দেখাশুনা করেন। বনে ঘোরার পথে সেদিন দুপুরে আমরা তাঁরই অতিথি হয়েছি। ঐ গভীর জঙ্গলে নির্বান্ধব দেশে তিনি একা রয়েছেন.—অথচ, মনের আনন্দে। কাজকর্মের ফাঁকে তাঁর শখ.—বনের নানারকম পাখিদের বিভিন্ন স্বর ও শিস টেপ-রেকর্ডে ধরে রাখা। বাজিয়ে আমাদের শোনালেনও। চমৎকার লাগল। একজোড়া Flying Squirrel-ও তাঁর পোষ মেনেছে। নিকটের গাছে গাছে ঘুরছে। আর হিংস্র বন্য-জন্তু? বনে ত আছেই। প্রায়ই ডাক শোনা যায়। সহজ হাসিমুখে জানান, এই তো ক'দিন আগে এখান থেকে কিছুদূরে একটা নরঘাতক বাঘ এক আদিবাসী বুড়িকে মেরেছে,—দুদিন পরে তার মাথার খুলিটুকু পাওয়া গেল!

এই পরিবেশে আমার সঙ্গী বন্ধু হঠাৎ আবিষ্কার করেন অফিসারের ভৃত্যদুটি বাঙালী মনে হচ্ছে। আমরা দুজনের মধ্যে যখনই বাঙলায় কথা বলছি, ওরা মন ভরে কেমন শুনছে. নজর করেছেন? অফিসারকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানান, হাঁ, ঠিকই ধরেছেন, ছেলে দুটি রেফিউজি!

বন্ধুর আদি বসতি পূর্ববঙ্গে। হাত নেড়ে ছেলে দুটিকে কাছে ডাকেন। তারা সলজ্জ মৃদু হাসিমুখে নিকটে এসে দাঁড়ায়।

বন্ধুও মিষ্টকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "দ্যাশ কম্‌নে? কুন্‌ জিলা?"

"আইজ্ঞা, ফরিদপুর, তবে কিনা ঢাকার জিলার দিগে।"

"এইখানে আইলা কেমনে?"

"মোরা রিফুজী। বাবায় আমাগো সগলগো লইয়া আইছিলো।"

নাম তাদের সুনীল ও চিন্তামণি। রাজবংশী। সমীপবর্তী মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলায় দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু শিবিরে এদের বাপ-মা রয়েছে। ছেলে দুটি চাকরির সন্ধানে এখানে চলে আসে। মিল-এর সাহেবের দয়ায় পরে ড্রাইভারি শিখবে—এই তাদের উচ্চাশা। এভাবে বনে-জঙ্গলে থাকতে তাদের খারাপ লাগে না।—জন্তুজানোয়ারের ভয়ডরও নেই।

ভাবি. এই ভবসাগরে কোথাকার লোক কোথায় ভেসে এসে ডাঙায় ওঠার চেষ্টা করে!

বর্মার Thazi স্টেশনের সেই টিকিট কালেকটর দুজন—ঘোষ ও বসু—তেমনি আমার মনেও চমক লাগায়। বিদেশে এই সব প্রবাসী বাঙালী সর্বত্রই দেখেছি বাঙালী পথচারী যাত্রীকে আদর করে সাগ্রহে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান, খাইয়ে তৃপ্তি পান, অন্তরালে থেকে সেকালের লজ্জাশীলা বাঙালী গৃহিণীরা আহারের তত্ত্বাবধান করেন। নেপথ্যে তাঁদের চুড়ির মৃদু শব্দ, শাড়ির পাড়ের ঈষৎ আভাস অপরিচিত অতিথির চিত্তে আন্তরিকতার সৌরভ ছড়ায়। পথে বেরিয়েও ঘরের আদরের মধুর স্বাদ মনে অনাবিল আনন্দ দেয়। এখানেও সেই ঘোষ ও বসু আমাদের Kalaw থেকে ফেরবার সময় তাঁদের মেসে নিয়ে গিয়ে আপনজনের মতন যত্ন করে খাওয়ান। অথচ, এই ক্ষণিক যোগাযোগের মধ্যে ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় কোথাও প্রকাশ করিনি, করার আবশ্যকতাও হয়নি।

শুধু এখানেই নয়। Kalaw ৪২৯২ ফুট উঁচু, চারিদিকে পাহাড় মধ্যিখানে ভ্যালি, সেইখানে ছোট শহর। সেখানেও দেখি বাঙালী কয়েক ঘর। সেই দক্ষিণ Shan স্টেটের পাহাড়ের মধ্যে আরও মাইল চল্লিশ এগিয়ে গিয়ে—Taunggyi, সেখানেও পথে দেখি দুটি বাঙালী ভদ্রলোক। আমার পরনে ধুতি দেখে নিজেরাই এগিয়ে এসে আলাপ করেন। পরিচয় দেন, পি.ডবলিউ.ডি.-তে সেখানে চাকরি করেন। সাদরে ডেকে নিয়ে চলেন তাঁদের বাড়িতে। বলেন, কোথায় এখানে হোটেলে খাবেন? চলুন। আমাদের কোয়ার্টার্স-এ।—যাইও তাই।

এর পর উত্তর বর্মায় মান্দালে, মেমিও দেখে ট্রেনে চেপে আরও উত্তরে এগিয়ে যাই,—বর্মার গিরিশ্রেণীর শোভা দেখতে দেখতে—উত্তর Shan রাজ্যে। মনের প্রবল বাসনা,—এদিকের সীমান্ত ডিঙিয়ে যদি কোন রকমে চীনদেশের মাটিতে একটু পা ঠেকাতে পারা যায়! খবর পেয়েছি, Lashio-র এক বাঙালী কনট্রাকটর Hsipaw স্টেশনে থাকেন। মিস্টার দত্ত। তিনি পথের খোঁজখবর দিতে পারেন. তাঁর সহায়তায় যাতায়াতের ব্যবস্থাও হতে পারে।

Hsipaw স্টেশনে ট্রেন থেকে নামি। পার্বত্য প্রদেশ। ১৩৫৪ ফুট উঁচুতে। চীন দেশ যে নিকটে তার প্রমাণ দেখি, স্টেশনে সব চীনা কুলির দল। খবর নিয়ে দত্তর বাড়িতে যাই। কাঠের দোতলা বাড়ি। রাস্তা থেকে কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার বারান্দায়। পাশে একখানি বড় ঘর। কিমোনো গায়ে (ড্রেসিং গাউনের মত) দত্ত চেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। এক বর্মী মহিলা মেঝেতে বসে কলে সেলাই করছেন। আশেপাশে কয়টি ছোট ছেলে মেয়ে। দত্ত উঠে বাইরে আসেন। নাম শুনেছিলাম. তাই বাঙালী বলে চিনলাম। না হলে, চেহারা দেখে ধরবার উপায় নেই। লম্বা চওড়া দশাসই দেহ। কালো রঙ। গোলাকার মুখ। মগের মত থ্যাবড়া মোটা নাক। বাঙলা উচ্চারণও জড়িত। কিন্তু. অতি ভদ্র। আমাদের যথেষ্ট আপ্যায়ন করলেন। আমাদের মনস্কামনা কিন্তু পূর্ণ হোল না। দুঃখের সঙ্গে তিনি জানালেন. বর্ষার পর এ-সময়ে চীনের সীমান্তে পৌঁছুতে পথের কয়েক মাইল মোটর চলাচল সম্ভব নয়. শীতকাল হলে যাওয়া যেত। এখন পথের সেই অংশ হেঁটে যেতে হবে. তাতে সময় লাগবে বেশ কয়েকদিন। আমরা হাতে যে সময় নিয়ে এসেছি. তার মধ্যে যাওয়া-আসা অসম্ভব।

অতএব. নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়। কিন্তু, ভদ্রলোকের মনপ্রাণখোলা অমায়িক ব্যবহারে আনন্দ পাই। মন্তব্য করি, আপনার তো দেখি, যস্মিন দেশে যদাচারঃ,—বর্মামুলুকে বর্মী সংসার। তবুও, বাঙলা কথাবার্তা সম্পূর্ণ ভোলেননি দেখছি।

তিনি তখনই অকপটভাবে সহাস্যমুখে স্বীকার করেন, দু নৌকায় পা রেখে আমার চলা যে, মশাই। এই এখানে দেখছেন আমার বর্মী সংসার। আবার. বর্মার অন্যত্র আমার রয়েছে খাঁটি বাঙালী সংসারও, —সেখানেও আমার একগাদা ছেলেমেয়েরা আছে। বছরের কয়েক মাস তাদের সঙ্গেও নিয়মিত কাটাই। উত্তর মেরু. দক্ষিণ মেরু দুই অভিযানই সমানে চালিয়ে যাচ্ছি!—বলে হাসতে থাকেন।

ভ্রমণের মাঝে দেখি, বিচিত্র জগৎ. কত বিচিত্র মানুষ!

* * * *

১৯৩২ সাল। সে-বছর আমার প্রথম নেপাল যাওয়া। মাকে নিয়ে কাঠমাণ্ডুতে পশুপতিনাথ তীর্থযাত্রায়। কিন্তু. এ-সবই যেন প্রস্তুতি ১৯৩৪ সালের জন্য। সেই বছরেই আমার বহুদিনের আশা পূর্ণ হয়.—কৈলাস-মানসসরোবর যাত্রা করি। সে-কাহিনীও প্রকাশিত হয়েছে। হিমালয়কে তখন নিবিড়ভাবে পেয়েছি। নিজেকেও উজাড় করে আত্মসমর্পণ করেছি। তার পর, যতবার হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া,—সে সবই যেন আমার আপন ঘরে ফেরা। সেই সব দিনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা কয়েকটি কাহিনীতে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি। এ-প্রবন্ধে তাই হিমালয়ের সেই সকল ভ্রমণের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ঐ ১৯৩৪ সালেই ডিসেম্বর মাসে মাকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রগুলি দেখাতে। একমাসের ওপর ঘোরা হয় তীর্থে তীর্থে। তার বিবরণ কোথাও লিখিনি। এখানে কেবলমাত্র দুটি ঘটনার উল্লেখ করি।

তিরুভন্নমালাই-এ—রমণ মহর্ষির দর্শনলাভ। আমার এই সামান্য জীবনে যে কয়জন উচ্চকোটির সাধু-মহাত্মার দর্শন বা সান্নিধ্যলাভের পরম সৌভাগ্য হয়েছে. তাঁদের মধ্যে রমণ মহর্ষির নাম সর্বজনবিদিত। তাঁর সঙ্গে কোন বাক্যালাপ হয়নি। শুধু নির্বাক দর্শন। কতক্ষণের জন্যে? তাও মনে নেই। অথচ, সেই সীমিত কালের দর্শনপ্রাপ্তি মনের মধ্যে চিরজাগরূক হয়ে আছে। অরুণাচল পাহাড়ের কোলে আশ্রম। নাতিপ্রশস্ত একটি হলঘর। মেঝেতে ফরাশ পাতা। একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা চৌকি বা বেদির মত উচ্চাসনে মহর্ষি সমাসীন। খালি গা। পরনে কৌপীন। মেঝেতে কয়েকজন দর্শনপ্রার্থী। আমরাও বেদিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বসি। মহর্ষি আমাদের দিকে একবার তাকান। সে-নয়নে কী

ছিল। কী তার ভাষা, জানি না। শুধু বুঝি, সারা দেহ মন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। বেদির পাশেই জানলা। মহর্ষি তারপর সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন। কী দেখেন? তাও জানি না। স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি। অথচ, কোন কিছু লক্ষ্য বলেও মনে হয় না। লক্ষ্যবিহীন সেই দৃষ্টি যেন কোন অসীমে মিশে যায়। নীরব নিস্তব্ধ গৃহ। মহর্ষিরও নিস্পন্দ নিঃসাড় দেহ। অপলক নেত্র। যেন প্রস্তরমূর্তি। অথচ, প্রাণবন্ত জ্যোতির্ময়। নির্নিমেষ নয়নে আমিও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি। মনে অনির্বচনীয় এক অনুভূতি জাগে। কীসের এক পরম শান্তিতে অন্তর ছেয়ে ফেলে। মনে হয়, যেন মহর্ষির ধ্যানমগ্ন সৌম্য মূর্তি সেই নিস্তব্ধ গৃহে আপন স্বর্গীয় আভা প্রতিফলিত করে।

কেন জানি না, হঠাৎ স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে কয়েকমাস আগে তিব্বতযাত্রায় দেখা আর এক অপরূপ দৃশ্য,—মানসসরোবরের সেই নিস্তরঙ্গ শান্ত সুনীল জলে রজতদীপ্ত কৈলাস শিখরের প্রতিচ্ছায়া!

আমাকে প্রায়ই একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়,—আপনি যত জায়গায় ঘুরেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল লেগেছে কোথায়?

নির্দ্বিধায় উত্তর দিই, তেমন জায়গা তো একটা নয়,—হিমালয়ের কয়েকটি স্থানই আছে। তবে, হিমালয়ের কথা বাদ দিলে ভারতবর্ষের মধ্যে আমার সবচেয়ে সুন্দর লেগেছে—কুমারিকা অন্তরীপ—কেপ্ কমোরিন। অনুপম সেখানকার সৌন্দর্য।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে সেই কন্যাকুমারিকাতেও যাই ১৯৫৩ সালে জানুয়ারি মাসে।

তিন সাগরের সঙ্গমে স্থানটির অপূর্ব পরিবেশ। পুবে বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে আরব সমুদ্র। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। ভারতের এই একমাত্র স্থান যেখানে একই দিনে দেখা যায় প্রভাতে সমুদ্র থেকে সূর্যোদয়, আবার, অপরাহ্নে আর এক সমুদ্রে সূর্যাস্ত! অতুলনীয় এই রমণীয় দৃশ্য।

দক্ষিণ ভারত মন্দিরময়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এক-একটা মন্দির-শহর। চারিপাশে সুবিশাল গোপুরম। কারুকার্য শোভামণ্ডিত। দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। কিন্তু, কুমারিকার মন্দির সে তুলনায় ক্ষুদ্রাকার। আমার ধারণা, প্রকৃতির এই প্রকৃত লীলাভূমিতে ইচ্ছা করেই মন্দির এখানে ছোট করে গড়া হয়,—মানুষের হাতের সৃষ্টি যাতে বিধাতার সৃষ্ট প্রাকৃতিক রূপকে কোনমতে ক্ষুণ্ণ না করে।

ভারতভূমির সেই দক্ষিণতম শেষ ভূখণ্ড সেই প্রথমবার দেখেছি।—জনবিরল, অতিশান্ত তীর্থক্ষেত্র। কয়েকটিমাত্র ছড়ানো ঘরবাড়ি। দেখে পর্যটক-মন তৃপ্তি পেয়েছিল। নির্জন সমুদ্রসৈকতে শান্তমনে পুলকিতনয়নে তাকিয়ে থেকেছি। তট থেকে কিছুদূরে সাগরজলের মধ্যে মাথা তুলে সেই প্রসিদ্ধ Vivekananda Rock—স্বামিজী বিবেকানন্দের ধ্যানাসন শিলা।

দিগন্তপ্রসারী অপার বারিরাশি,—আর সেই সুপবিত্র শিলাখণ্ডের পাদদেশ ঘিরে উদ্বেলিত তরঙ্গমালার আছড়ে পড়া,—যেন বেদিমূলে সহস্র শ্বেতকমলের পুষ্পাঞ্জলি। কল্পনার চোখে দেখি যেন সেই তেজোদীপ্ত বিরাট পুরুষ চিরধ্যানমগ্ন হয়ে তখনও তেমনই সমাসীন।

কুমারিকার প্রশান্ত পরিবেশ, যাত্রীবিরল ক্ষুদ্র মন্দির, সাগরসঙ্গমের অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্বামিজীর পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত সেই নিবারণ শূন্য শিলাখণ্ড এমনই গভীরভাবে মনে আনন্দ ও তৃপ্তি আনে যে কয়েকদিনই ঐখানে কাটাই!

কিন্তু, পরিবর্তনশীল জগৎ।

তেতাল্লিশ বছর পরে ১৯৭৯ সালে আমার দ্বিতীয়বার কুমারিকায় যাওয়া। ইতোমধ্যে ভারত স্বাধীন হয়েছে। দেশের চেহারাও অবস্থান্তর ঘটেছে। কুমারিকারও কল্পনাতীতভাবে রূপ বদলেছে। সেই তিন সমুদ্র তেমনি রয়েছে। মন্দিরও সেইমতই আছে। কিন্তু, যুগধর্ম অনুযায়ী এবং ভ্রমণের নানাবিধ সুবিধার বিস্তারের ফলে যাত্রী সংখ্যা বেড়েছে প্রচুর। যাত্রীনিবাস, হোটেল, আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরি হয়েছে, দোকানপাট বাজার বসেছে—সমুদ্রের সেই শান্ততটে। এখন যাত্রীবহুল, কোলাহলমুখর বড় ট্যুরিস্ট সেন্টার। এতেই শেষ নয়। সমুদ্রের ধারে আমাদের দেশনেতাদের স্মৃতিমন্দির উঠেছে। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে সৌধটি গড়া হয়েছে, সেটি দেখে যেমন স্তম্ভিত হই, তেমনি মর্মপীড়াও পাই। সামঞ্জস্যবিহীন এমন 'আরকিটেকচার' আর কোথাও আছে কি না জানি না। সর্বধর্মসমন্বয়ের স্মারকস্বরূপ মসজিদ-মন্দির-গির্জা প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির আরোপ হয়েছে এই মন্দিরের গড়নের। যেমন বিসদৃশ,

তেমনি দৃষ্টিকটু। দেখেই মনে আসে সুকুমার রায়ের সেই প্রসিদ্ধ "খিচুড়ি"—

"হাঁস ছিল, সজারুও, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে "বাহ্‌বা কি ফুর্তি
অতিখাসা আমাদের 'বকচ্ছপ মূর্তি'॥"

মৃত নেতাদের আরও স্মৃতিমন্দির সমুদ্রের ধারে গড়বার উদ্যোগ চলেছে। সেই সৌন্দর্যময় শান্ত সমুদ্রতট এখন আর সাধু মহাত্মার নির্জন সমাধিক্ষেত্র নয়, মৃত দেশনেতাদের যেন সমাধিভূমিতেই পরিণত হতে চলেছে!

পক্ষান্তরে, বিবেকানন্দ শিলার উপর স্বামিজীর বিরাট স্মৃতি মন্দিরটির গঠন মনোহর। শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তীর থেকে সেই শিলাখণ্ডে মন্দির দর্শনের জন্য স্টীমারে যাতায়াতের সুব্যবস্থাও হয়েছে। দলে দলে দর্শনার্থীরাও চলেছে। মন্দিরের অভ্যন্তরেও দ্রষ্টব্য অনেক কিছুই আছে,—যেন, উচ্চাঙ্গের শিল্প-প্রদর্শনী। আমার পরিচিত যাঁরা সেই মন্দির দেখে এসেছেন, প্রায় সকলের কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি। প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই।

কিন্তু, আমার চোখে ঐ শিলাখণ্ডের উপর মন্দিরস্থাপনা ভাল লাগেনি। তট থেকে বিচ্ছিন্ন, অসীম সমুদ্রকোলে জেগে-ওঠা সেই নিরাবরণ শূন্য শিলাখণ্ডটির নিজস্ব অনির্বচনীয় গরিমা ও সৌন্দর্য অপহৃত হয়েছে। এ-যেন উদাস-করা-ভাব-জাগানো মধুরকণ্ঠ মুক্ত বিহঙ্গকে সোনার খাঁচায় বন্দী করা।

আমার দ্বিতীয়বার কুমারিকা ভ্রমণকালেও ইচ্ছা ছিল প্রথমবারের মতন সেখানে কয়েকদিন নিরিবিলিতে মনে আনন্দে কাটাই, কিন্তু, একরাত্রি বাস করেই ছেড়ে আসি,—চলি কোচীন অঞ্চলে, সেখান থেকে পেরিয়ার অভয়ারণ্যে!

১৯৩৬ সালের প্রথমদিকে কয়েকজন বন্ধু মিলে সাধারণ তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে স্টীমারে গঙ্গাসাগর মেলায় যাই। দ্বিতীয়বার গঙ্গাসাগর যাওয়া ১৯৫৩ সালে। তার সামান্য দু-একটা ঘটনা অন্যত্র বর্ণনা করার সুযোগ হয়েছে।

ঐ ১৯৩৬ সালেই মাকে নিয়ে আমার কাশ্মীর যাত্রাও,—অমরনাথ তীর্থদর্শনে। ফেরবার পথে জ্বালামুখী ও কাঙরা যাওয়া। সেবারকার হিমালয় যাত্রা কাহিনী কোথাও লিখিনি। এখানে শুধু একটি রসাল ঘটনার উল্লেখ করি।

দিকে দিকে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে মাকে নিয়ে যাব আমি তীর্থদরশনে,—আত্মীয়-বন্ধুরা এসে যোগ দেন দলে। এমনি সময়ে একদিন বাবারও এক বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি,—আমরা 'কাকাবাবু' বলে ডাকি, —সকালবেলা আমার বসবার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। লম্বা-চওড়া রাশভারী চেহারা। কানে কিছু কম শোনেন। তাই, গলায় ঝুলিয়ে রাখা রবারের একটা নল, মুখে তার চোঙা বসানো। যার সঙ্গে কথা বলেন, চোঙা মুখে সে উত্তর দেয়, তিনি নলের অপর মুখ কানে লাগিয়ে শোনেন।

সে-সময় বিভিন্ন আইনের এক সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশনার কাজের কিছু ভার আমার উপর ছিল। সেই বই-এরই প্রুফ দেখছিলাম। কাকাবাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। তিনি এগিয়ে টেবিলের কাছে আসেন। টেবিলের কাগজের উপর এক ঝলক দৃষ্টি ফেলেই পিছন ফিরে দরজা দিয়ে প্রস্থানোদ্যত হন। আমি আশ্চর্যান্বিত। উচ্চৈঃস্বরে বলি, কী হোল? আপনি এলেন, আর কোন কথা না বলেই চলে যাচ্ছেন? তিনি তখনই টেবিলের নিকট আবার ফিরে আসেন, সুমুখের প্রুফশীটগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে গম্ভীর মুখে বলেন, বাবা, আমি বুড়ো হলেও বোকা নই, আমাকে দেখেই Cattle Trespass Actটি খুলেছ?

প্রকৃতই, আমি তখন গৃহপালিত পশুর অপরের জমিতে বেআইনী প্রবেশ বিষয়ক আইনের প্রুফটি দেখছিলাম।—তাঁর রসবোধ দেখে হেসে উঠি।

তারপর স্থির হয়ে বসে তিনি জানান, তোমার মাকে নিয়ে অমরনাথ চলেছ, আমাদের বুড়োবুড়িকেও সঙ্গে নিয়ে চল।

আলোচনা করে তাঁরাও সঙ্গে যাবেন ঠিক হয়। কিন্তু, আমার এক শর্ত আরোপ করি। বলি, আপনি

আমার গুরুজন, আপনার সব আদেশ আমার মেনে চলা উচিত। এই অমরনাথ তীর্থভ্রমণের সময় কিন্তু আমি যখন যা স্থির করব তা আপনাকে মেনে নিতে হবে।

তিনি খুশি হয়ে তখনই স্বীকার করেন, এ তো খুব ভাল কথা, হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে ওঠা থেকে আবার হাওড়ায় ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি যেখানে যখন যা ঠিক করবে আমি মেনে নেব, কোন আপত্তি আমার চলবে না।

যাত্রা শুরু হয়। সদলবলে শ্রীনগর পৌঁছুই। স্থির হয়, অমরনাথ যাত্রার "ছড়ি"—অর্থাৎ সরকারী ব্যবস্থায় মূল যাত্রা অমরনাথ থেকে ফিরে এলে আমাদের যাত্রা শুরু করব। পথে তাহলে যাত্রীর ভিড় মোটেই পাব না। সেই কয়দিন শ্রীনগর ও নিকটবর্তী স্থানগুলি দেখার সুযোগও হবে।

ক'দিন পরে আমাদের যাত্রার সময় আসে। সহযাত্রীদের জানাই, সপ্তাহখানেকের মধ্যে অমরনাথ দর্শন করে আমরা আবার শ্রীনগরে ফিরে আসব। তাই অতিরিক্ত যার যা মাল আছে এখানেই রেখে যাওয়া হবে। সঙ্গে যাবে শুধু অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র, জামাকাপড়, বিছানা। সেই মত যেন যে যার মাল ভাগ করে সাজিয়ে ফেলেন।—সেই অনুসারে সাজানোও হতে থাকে।

আমি তদারক করছি। কাকাবাবুরও মাল গোছানো হচ্ছে। হঠাৎ নজরে পড়ে তাঁর 'হোলডঅল'টির দিকে। ওকী! অমন বিরাট আকার! ছোট হাতির মতন। অত প্রকাণ্ড হোল কেন? খুলে ফেলি, দেখি, ভিতরে বিছানার মধ্যে মস্ত এক পাশবালিশ!—যেমন কাকাবাবুর দেহ—সেই অনুপাতেই। বার করে পাশে রেখে দিই।

কাকাবাবু চমকে উঠে করুণস্বরে বলেন, ও বাবা। আমি যে পাশবালিশ ছাড়া শুতেই পারি না।

আমি কর্তৃত্ব ফলিয়ে জানাই, যাত্রার এই সাতদিন বিনা পাশবালিশেই শুতে হবে। অমরনাথের পথে বিছানার ঐ প্রকাণ্ড বোঝা বহে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে হতে পারে.—মাল যত কম ও যত ছোট হয়, ততই ভাল। শ্রীনগরে ফিরে এসে আবার এই পাশবালিশ পাবেন।

তিনি মুখভার করে অসহায়ভাবে আমার পানে তাকান, বলেন, বাবা, কথা যখন দিয়েছি, এ-পথে তোমার হুকুমেই সব চলবে, তখন উপায় নেই, আমাকে মানতেই হবে।

অতএব, পাশবালিশ-বর্জিত বিছানা বাঁধা হয়।

মোটরে পহলগাঁও পৌঁছাই। সেখান থেকে প্রকৃত যাত্রা। মেয়েরা ডাণ্ডিতে যাবেন। কাকাবাবুর জন্যও সেই ব্যবস্থা। আমরা—ছেলেরা—কেউ যাব হেঁটে, কেউ বা ঘোড়ায় চড়ে। প্রথমদিন বেশি দূর যাওয়া নয়। চন্দনবাড়ি পর্যন্ত। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাই। যাত্রীনিবাস সম্পূর্ণ খালি। কিন্তু জঞ্জালে ভরা। মূল যাত্রী দুদিন আগে ফিরে গেছে, তাদের পরিত্যক্ত যত আবর্জনা। সঙ্গের লোকজন দিয়ে তখনই সাফ করানো হয়। লম্বা ঘরের একপাশে কাকাবাবুর মালপত্র রাখিয়ে তাঁর পরিচারককে বলি, এইখানে ওঁর বিছানা এখনই পেতে দাও।

কাকাবাবুকে জানাই, ডাণ্ডীতে এলেও একভাবে বসে থেকে ও ঝাঁকুনিতে ক্লান্ত হয়েছেন নিশ্চয়। বিছানা পাতছে। শুয়ে বিশ্রাম নিন এখন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁর আবার খবর নিতে গিয়ে দেখি, বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছেন,—কিন্তু এ কী! পরম আরামে পাশবালিশটি বুকে জড়িয়ে ধরে।

পাশবালিশ! শ্রীনগরে নিজে বিছানা থেকে বার করে দিয়েছিলাম,—তবুও এল কী করে? যেমন আশ্চর্য হই, তেমনি কৌতূহলও জাগে। ছোট জিনিস নয়,—যে লুকিয়ে আর কোন কিছুর সঙ্গে আসবে। আমার অমন সতর্ক দৃষ্টি হার মেনেছে।

হেঁট হয়ে পাশবালিশের দিকে আঙুল দেখিয়ে পরাজয়ের—হাসিমুখে চেঁচিয়ে বলি, এটা এল কীভাবে?

তিনি কথা বলেন না। মুখে ছোট ছেলের মত দুষ্টু মুচকি হাসি। সেই পাশবালিশ আঁকড়ে-থাকা পাশ-ফেরা অবস্থায় বাঁকা চাহনিতে মিটমিট করে আমার দিকে তাকান। পাশবালিশ আরও আঁকড়ে ধরেন।

আমার কৌতূহল মেটে না। আবার জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বুকের কাছে ধরে রাখা পাশবালিশটির মাথার কাছে কাপড়ের আবরণটি কিছু ফাঁক করেন।

অবাক হয়ে দেখি, পাশবালিশ কই! আগেকার যাত্রীদের ফেলে-যাওয়া একটা জ্বালানী কাঠ—

পাশবালিশের আকারের মত সুগোল লম্বা! সেইটে কাপড় জড়িয়ে আরামে ব্যবহার করছেন।

এতক্ষণে তিনি কথা বলেন. বাবা. এতে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

হেসে তখনই সবাইকে ডেকে এই কৌতুকাবহ দৃশ্য দেখিয়ে আমোদ করি বটে, কিন্তু মনে অনুশোচনার কাঁটাও যেন বিঁধতে থাকে। কাকাবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলি, এমন করবেন জানলে, আমি নিজে কাঁধে গদার মত আপনার পাশবালিশটা বয়ে নিয়ে আসতাম।

সেই যাত্রার সেদিনের সে-ছবি এখনও চোখের ওপর ভাসে।

দূর দেশভ্রমণের কথাই শুধু বলছি, কিন্তু এরই ফাঁকে বঙ্গদেশের ত বটেই, বিহার, ওড়িষ্যা, আসাম, ইউ পি-র নানান গ্রামগঞ্জে শহরেও যাওয়ার সুযোগ হচ্ছে। অথচ, পূর্ববঙ্গে অল্পই কয়েকটি জায়গায় গিয়েছি। তার মধ্যে একটির কথাই এখানে উল্লেখ করি। ঐ ১৯৩৬ সালেই। মেজদা চলেছেন মাত্র দুদিনের জন্য ঢাকায় সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভাসূত্রে। আমিও সঙ্গ নিলাম। উদ্দেশ্য,—তখন ভাদ্র মাস,—সেই 'ভরা ভাদরে' পদ্মার রূপ দেখব। দেখেও ছিলাম পুলকিত বিস্মিত দৃষ্টিতে। কী বিশাল জলরাশি! এপার ওপার দেখা যায় না। যেদিকে তাকাই শুধু জল আর জল! আমার চিরপরিচিত জননী জাহ্নবী নয়, এ যে গৈরিকবসনা ত্রিশূলধারিণী রুদ্রমূর্তি ভৈরবী! আর মনে আনন্দ পাই দেখে, পদ্মার বুকে অগণিত নৌকাগুলির চিত্রবিচিত্র পালের নানারঙের খেলা! যেন, হালকা-মেঘে-ছাওয়া ধূসর আকাশে নানান রঙের পাখির ডানা মেলে ওড়া।

স্মৃতির দেওয়ালে সে-ছবিও টাঙানো থাকে।

* * * *

এই ভাবে পথের নেশায় চলেছে ঘোরাফেরা। এরই মধ্যে রাজস্থানের কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান দেখে দ্বারকাও ঘুরে আসি।

কিন্তু, এই সব বেড়ানোর মধ্যে যে ভ্রমণটির স্বকীয় ভিন্ন সুর ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করি তার কিছু আভাস এখানে দিই।

১৯৪৫ সাল। মাকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজপরিক্রমায় চলি। চুরাশি ক্রোশ পথ পরিক্রমণ। বৃন্দাবন থেকে রওনা হয়ে যাত্রাশেষে আবার বৃন্দাবনে ফেরা। প্রায় একমাসব্যাপী যাত্রা। তিন-চার হাজার যাত্রী একসঙ্গে চলে। অধিকাংশই চলেন পায়ে হেঁটে। কয়েকজনের টাঙ্গার ব্যবস্থা। গরুর গাড়িতেও যাত্রী যায়, মালপত্র তাঁবুও চলে। সারাদিনে বেশিদূর যাওয়া নয়। আগে থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে তাঁবুতে থাকা। গ্রাম বা লোকালয়ে, কখনও কখনও ধর্মশালায় ও গৃহস্থের বাড়িতেও আশ্রয় মেলে। ব্রজমণ্ডলে রাধা ও কৃষ্ণের বিবিধ লীলা যে-যে স্থানে ঘটেছিল বলে প্রচার. সেই সকল অঞ্চল দেখা. সংশ্লিষ্ট লীলাকাহিনী শোনা ও সেই সব পুণ্যস্থানে রাত্রিবাস। ঘুরে ঘুরে রাধাকৃষ্ণের অমর প্রেমকাহিনীর যেন সজীব দৃশ্যনাট্য দর্শন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ধ্বংসস্তূপ বা প্রত্নরত্নরাজি দেখার কৌতূহলী আসক্তি নয়, কেলিকুঞ্জে কুঞ্জে ভক্তিবিহ্বল পুণ্যার্থী যাত্রীদলের অপার্থিব তৃপ্তিলাভের আকুলতা। যাত্রীরা চলে কেউ আপন মনে ভজন গেয়ে খঞ্জনী বাজিয়ে। কোথাও বা দলবেঁধে কীর্তন গেয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে, কেউ বা হাঁটে দূরে সরে একা একা আপনমনে বিভোর হয়ে। যেখানে রাত্রিবাস, সেখানেও এদিকে-সেদিকে কোথাও ভজনের ও কীর্তনের আসর জমে, কোথাও বা চলে স্থানীয় কৃষ্ণলীলার মহাত্ম্য কথন। আরও চমৎকার প্রথার প্রচলন,—ব্রজবাসীদের বিশ্বাস,—রাধারাণীময় এ-জগৎ। সবাই যেন রাধা, পুরুষ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ! তাই, রাধাভাবেই সবার ভাবনা। মানুষে মানুষে সাক্ষাৎ হলে অভিবাদনে 'নমস্কার', 'প্রণাম' বা 'সুপ্রভাত' বলা রীতি নয়, পরস্পরে বলে ওঠে,—'রাধে', 'রাধে'! এমন কি যাত্রীদলের সঙ্গে যে প্রহরী বা চৌকিদার-বাহিনী চলে, তারাও রাত্রে পাহারা দিতে ঘুমন্ত যাত্রীদের সতর্ক করে হাঁক ছাড়ে—"রাধে"! "রাধে"! নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি সেই রাধা ডাকে স্পন্দিত হতে থাকে. দিগদিগন্ত যেন 'রাধে' 'রাধে' প্রতিধ্বনি তোলে, —নিদ্রাতুর যাত্রীর মনে অদ্ভুত অনুভূতি জাগে। এই দীর্ঘ ব্রজপরিক্রমার পথে কোথাও কোথাও বৈষ্ণব সাধু মহাত্মার নিভৃত কুঞ্জ বা আশ্রম আছে। খোঁজ-খবর রাখলে তাঁদেরও কারও দর্শনলাভ হয়। তারই দু-একটা ঘটনা অন্যত্র লিখেছি। এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের এক আকস্মিক ঘটনার উল্লেখ করি।

সেদিন যাত্রীদল চলেছে যথারীতি যে-যার-মত বিক্ষিপ্তভাবে,—কেউ এগিয়ে. কেউ পিছিয়ে. কেউ

এধারে, কেউ ওধারে। হঠাৎ এক জায়গায় দেখি, কয়েকজন যাত্রীর জটলা। কী যেন ঘিরে চাঞ্চল্যকর আবহাওয়া। কৌতূহলী হয়ে সেই দিকে এগিয়ে যাই। দেখি, ভিড়ের মাঝখানে ধরাশায়ী এক মৃতদেহ। বৃদ্ধা এক যাত্রী। সাথী কোথায়? কেউই তো তার সঙ্গে ছিল না। নিঃসঙ্গ একাই ক'দিন এসেছে। দেশ কোথায়? তাও জানা নেই। অসুস্থ হয়েছিল নাকি? না, তাও তো কাউকে কিছু জানায় না। যেমন প্রতিদিন চলে তেমনি আজও চলেছিল,—আপন মনে মন্দিরা বাজিয়ে গান গেয়ে,—ভাবে বিভোর হয়ে। অল্প আগে হঠাৎ পথের ধারে বসে পড়ে। তারপরেই—ব্রজধূলিশয্যায় এই অন্তিম শয়ন। ঐ তো পাশে ধূলারই 'পরে তার স্তব্ধ মন্দিরা! আর পথের ধারে হেলায় ফেলা পুঁটলি। দুজন যাত্রী খুলে দেখে যদি কোন পরিচয় মেলে। ছড়িয়ে পড়ে, একখানা কাপড়, গামছা, সামান্য দু-একটা টুকিটাকি জিনিস—হয়ত বিশ্বসংসারে এই তার সর্বস্ব সম্পদ। যাত্রীরা বলে, পুণ্যবতী নারী! এমন তীর্থপথে এইভাবে মৃত্যু! মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখা যায়, তাঁর পরনের কাপড়ের আঁচলের খুঁটে খুচরা কয়টি টাকা। কিন্তু, কী আশ্চর্য! অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচের যে সামান্য টাকার প্রয়োজন ঠিক সেই কয়টি টাকাই!

*   *   *   *

ঐ ব্রজপরিক্রমায় দ্বিতীয় ক্ষুদ্র ঘটনাটিও হয়ত লোকে বলবে কাকতালীয়,—তবুও লিখি।

বন পরিক্রমার যাত্রাকাল ঘোর বর্ষাকালে—ভাদ্র মাসে। তাই যাত্রার পরিকল্পনাকালে মাকে বলি, ঐভাবে টাঙ্গায় একমাস মাঠঘাট, বনজঙ্গল, পাহাড় অঞ্চল দিয়ে ঘোরা, বর্ষার মধ্যে হয়রানি হবেই, ভিজে অসুখবিসুখও না করে! যাবে কিনা ভেবে দেখ।

মা আশ্বাস দেন, নিয়ে চল তো, দেখবে এ-যাত্রার কী আনন্দ! রাধারাণীর কৃপায় কোন অসুবিধা হবে না।

মনে ভেবেছিলাম, স্তোকবাক্য।

কিন্তু, যাত্রাপথে চলাকালে, অবাক হয়ে দেখি, ঘনঘোর ঘটা করে মেঘ করে আসে,—দিগন্ত ছেয়ে বৃষ্টির প্রবল ধারা দূরে সুমুখে হু হু করে এগিয়ে আসে, মাকে বলি, মা, এইবার আজ নিশ্চয় ভিজিয়ে নাইয়ে দেবেন তোমার রাধারাণী। ঐ দেখ। জল এল বলে!

মার মুখে মধুর হাসি। অবিচলিত স্বরে বলেন, দেখা যাক।

সবেগে এগিয়ে-আসা সেই বর্ষণধারা দেখি, আসতে আসতে ক্রমে হালকা হয়ে আসে, আকাশের জলভরা মেঘ ঝরে নিঃশেষ হয়ে যায়। আমাদের কাছে শুধু বাদল হাওয়াই পৌঁছায়, জল নামে না। কিছুদূর এগিয়ে দেখা যায়, পথঘাটে বৃষ্টির জল থই থই করে, কিন্তু বৃষ্টি তখন থেমেছে।

হঠাৎ একদিনই এমন নয়। কয়েকদিনই এমনি ঘটেছে। সামনের পথে এগিয়ে দেখা গেছে, একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। কোথাও বা আমরা চলে আসার পর পিছনে বৃষ্টি নেমেছে। পিছিয়ে-পড়া যাত্রীরা ভিজেছে। আর, কোন কোনদিন প্রবল বর্ষণ হয়েছে রাত্রিকালে, যখন আমরা পাকাবাড়ির নির্ভয় আশ্রয়ে।

বৃন্দাবনে ফিরে এসে শুনি, সে বছর নাকি বর্ষার অস্বাভাবিক প্রকোপ দেখা দেয়। লালাবাবুর মন্দিরে আমরা অতিথি ছিলাম, সেখানকার অভিভাবকরা আমাদের দুর্ভোগের আশঙ্কা করে গভীর দুশ্চিন্তায় ছিলেন, অথচ, এই দীর্ঘযাত্রায় একদিনও আমরা বৃষ্টিতে ভিজিনি।

একেবারে কাকভেজা ভিজলাম ক'দিন পরে। সে-কাহিনীও শোনাই।

বনপরিক্রমা ও মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রা সাঙ্গ করে মার ইচ্ছা ছিল, ঐখান থেকে কলকাতায় ফেরা। কিন্তু, যাতায়াতের সুবিধার কথা ভেবে ঠিক করা হয়, দিল্লীতে এসে একদিন কাটিয়ে ট্রেন ধরা। সেই মত দিল্লীতে সন্ধ্যায় পৌঁছানো হয়। টাঙ্গা করে দিল্লী স্টেশন থেকে সেখানকার বাসস্থানে যাবার সময় সে কী মুষলধারে বৃষ্টি! বিছানাপত্র সব ভিজলই, নিজেরাও যেন সব সদ্য নেয়ে উঠলাম—জামাকাপড় সপ্‌সপে ভিজে!

হেসে মাকে বলি। মা, তোমার রাধারাণী আজ কোথায়?

তিনিও তখনই হেসে উত্তর দেন, কেন? বৃন্দাবনে! তিনি কি কখনও এই ম্লেচ্ছশহরে আসেন? বৃন্দাবনে কি একদিনও ভিজতে হয়েছিল?

*   *   *   *

এমনি ভাবেই পথ চলার খেলায় আমি মাতি। এই পথের নেশার আনুষঙ্গিক আর এক নেশাও আমাকে

ধরে। হয়ত, পৈত্রিকসূত্রে,—তবে ক্ষুদ্রাকারে পাওয়া,—বই কেনার নেশা! বিশেষত, পাহাড়-পর্বত বনজঙ্গল পশুপক্ষী সম্বন্ধে ও দুর্গম অভিযানের নতুন কোন বই বার হলেই কেনা, সাগ্রহে পড়া। শুধু নতুন বই নয়, পুরানো দুষ্প্রাপ্য বই-এরও সন্ধান পেলে সংগ্রহ করা। নিভৃত গৃহকোণে প্রাণের সঙ্গী পেলাম বইগুলিকে—যেন নেশারই সাঙাৎ—Sir Charles Bell, C. G. Bruce, Montgomery McGovern, Earl Ronaldshay, Frank Smythe, Shipton, Tilman, Chapman প্রভৃতি। পরে আরও অনেককে। কৈলাস মানসসরোবর প্রসিদ্ধ স্বামী প্রণবানন্দজীর সঙ্গেও অন্তরঙ্গতার সুযোগ এল। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনাগুলিও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

এই ভাবেই দিন কাটে।—বাড়িতে থাকলে বই পড়া, আর সুযোগ পেলেই পথে বেরিয়ে পড়া।

এক সময়ে আবার ঘুরে আসি বম্বে, পুণা, নাসিক, অজন্তা এলোরা। ১৯৪৯ সালে মাকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ করিয়ে আনি গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী। ১৯৫০ সালে কলকাতা থেকে জাহাজে চলি কলম্বোয়। সঙ্গী হন বন্ধুবর মনোজ বসু। সিংহলে ক'দিন ভ্রমণ করে তিনি ফিরে আসেন। আমি একাকী সিংহলের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতেও ঘুরে বেড়াই। মনোজবাবু তাঁর একখানা বই-এ সিংহল ভ্রমণের বিবরণ লিখেছেন। কিন্তু, সেখানকার দু-একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া আর কিছু আমার লেখা হয়নি। এখানে কেবলমাত্র একটি বিষয় উল্লেখ করি।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবাসীর কাছে লঙ্কাদ্বীপ রামায়ণ-কাহিনীর মাধ্যমে সুপরিচিত,—সীতাদেবীর অপহারক রাক্ষসরাজ রাবণের রাজধানী। কিন্তু, সিংহলে রামায়ণ-কাহিনীর প্রচার দেখিনি, এমন কি, রাম-রাবণ-হনুমানের স্মৃতিবিজড়িত কোন স্থানেরও সন্ধান পাইনি,—শুধু একটি ছাড়া। অশোকবন। সীতাদেবীকে চেড়ি-বেষ্টিত করে রাবণ যেখানে তাঁকে বন্দিনী রেখেছিলেন। তাই গেলাম সেই স্থানটি দেখতে।

সিংহলের পার্বত্যপ্রদেশে অতি সুন্দর শৈলশহর Nuwara Eliya—(৬,১৯৯ ফুট উঁচু) নুয়ারা এলিয়া—অর্থাৎ New lights—নবীন আলো। সেই পার্বত্য অঞ্চলেরই অপর এক অংশে—অশোকবন। সীতা এলিয়া। ভীতিবহ গভীর বনজঙ্গল নয়। সুবিন্যস্ত সুরম্য উদ্যান। Hakgala-তে সিংহলের প্রসিদ্ধ বোটানিক্যাল গার্ডেনস্। শুনলাম, বহুবিধ মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য তরুলতা, বৃক্ষরাজি এই উদ্যানের সম্পদ। বিশ্বজোড়া এর খ্যাতি। শান্ত নির্জন পার্বত্য পরিবেশে চারিদিকের ফলফুলের ও বৃহৎ বনস্পতির শোভা মনোমুগ্ধকর। তারই একান্তে সাম্প্রতিককালের ছোট এক মন্দির। ভিতরে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ ও হনুমানের মূর্তি। শুনি, এইখানেই ছিল সেকালে অশোকবন। স্থানটির মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে মনে হল, সীতাকে এমন স্থানে রাখা—বন্দিনীর প্রতি রাবণের গভীর অনুরাগেরই সূচনা করে!

লঙ্কাদ্বীপে রামায়ণ-কাহিনীর কোন প্রচার না থাকার কারণ,—লঙ্কাবাসীগণ কট্টর বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

১৯৫২ সাল। আগের বছর কৌসানীতে স্বামী আনন্দের সঙ্গে আলাপ ভারতের বাইরে আর এক বৌদ্ধ দেশে। সে ভ্রমণ কাহিনীও নানা রঙে রঙীন হলেও আমার লেখা হয়নি। সেখানকার দুটি মাত্র দৃশ্যের বর্ণনা দিই।

১৯৫২ সাল। আগের বছর কৌসানীতে স্বামী আনন্দের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সে-পরিচয় গভীর ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হতে সময় নেয়নি। এ-বছর মে-জুন মাসে একবার কেদার-বদরী ঘুরে এসেছি। তবুও, স্বামী আনন্দের সঙ্গে পরামর্শ চলেছে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে কুয়ারি পাশ্ অতিক্রম করে নতুন পথে আবার বদরীনাথ যেতে হবে। আয়োজনও সেই মত সব প্রস্তুত।

এমনি সময়ে একদিন মেজদা ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, ইন্দো-চায়নায় কাম্বোডিয়ায় যাবে আমাদের সঙ্গে? তাঁর কাম্বোজ যাত্রার কারণ এই; তিনি তখন ভারতে মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি। বুদ্ধদেবের দুই প্রধান শিষ্য মোগলন ও সারিপুত্রের Relic—পুণ্য অস্থি বিলাতে সংরক্ষিত ছিল। কিছুদিন আগে বৃটিশ সরকার সেই অস্থি ভারতে মহাবোধি সোসাইটিকে ফেরত পাঠায়। কাম্বোজবাসীরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। সেখানকার সরকারের তরফ থেকে তাই প্রিন্স্ নরোদ্দম সিহানৌক সাগ্রহ আবেদন জানান, কাম্বোজবাসীরা সেই Relic—পূত অস্থি দর্শন আকাঙ্ক্ষায় উদ্গ্রীব, ক'দিনের জন্য যদি মহাবোধি সোসাইটির এক 'ডেলিগেসন'—প্রতিনিধিদল সেইটি নিয়ে এখানে আসেন, এখানকার অধিবাসীরা ধন্য

হবে। ভারত থেকে যাতায়াতের জন্য তিনি প্লেন পাঠাবেন।

মেজদা বলেন, দেখ, রাজি থাক ত সঙ্গে চল, কিন্তু তার আগে সোসাইটির আজীবন সভ্য হতে হবে, —তার চাঁদা মাত্র আড়াইশ' টাকা।

আড়াইশ' টাকায় কম্বোজ ভ্রমণ! রাজ-অতিথি হয়ে! শুনে মন উৎসাহিত হয়। কিন্তু তখনই নিরাশ হয়ে বলি, এমন সুযোগ ছাড়া চলে না, মানি। কিন্তু. স্বামী আনন্দকে কথা দিয়েছি, ঠিক সেই সময়েই আমাদের হিমালয় যাত্রার প্রোগ্রাম হয়েছে।

মেজদা বলেন, তাঁর সঙ্গে আরও কেউ যাচ্ছেন নিশ্চয়? তুমি না হয় যোগ দিতে পারবে না জানিয়ে দাও। ভেবে দেখ।

আমি জানাই, কথা দিয়ে এখন আর পিছিয়ে আসা চলে না। দেখছি, এমন সুযোগ পেয়েও কাম্বোজ যাওয়া আমার ভাগ্যে নেই। কিন্তু, ভাগ্যদেবতার অসীম করুণা। দুদিন পরেই স্বামী আনন্দের চিঠি আসে, তাঁর বিশেষ বন্ধু মাসরুওয়ালার মরণাপন্ন অবস্থা. কৌসানী থেকে নেমে তাঁর কাছে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। অতএব, আমাদের হিমালয়-প্রোগ্রাম আপাতত অনিশ্চিত রইল।

আমিও তখনই জানিয়ে দিই, এ-পরিস্থিতিতে তাহলে আমিও কাম্বোজ যাত্রায় চললাম।

কাম্বোজের পথে প্লেন ব্যাংককেও নামে। সেখানকার বিখ্যাত স্বর্ণমণ্ডিত প্যাগোডা দেখা হয়। শহরে কিছুক্ষণ ঘুরে, আবার প্লেনে ওঠা, কাম্বোজের রাজধানী নম্‌পেন Pnom Penh অভিমুখে যাত্রা। ছোট প্লেন। আকাশের বেশি উঁচু দিয়ে না ওড়ায় নীচের পৃথিবীর রূপমাধুর্য দেখা যায়। মনে হয়, যেন আমাদের বঙ্গভূমি,—তেমনি শস্যশ্যামল, নদনদীমাতৃক, উদার বিস্তৃতি। তারই মাঝে ছোট ছোট গ্রাম ও শহর।

পাইলট জানান, নম্‌পেনের নিকট পৌঁছে গেছি, এইবার প্লেন নামবে,—কোমরের বেল্‌ট লাগান।

নির্দেশমত তখনই বেল্‌ট এঁটে কৌতূহলী হয়ে কাঁচের জানলা দিয়ে নীচের দিকে দৃষ্টি ফেলি। এ কী! কোথায় গেল ধরিত্রীর সেই দিগন্তব্যাপী শ্যামল বিস্তার? নীচে প্রকৃতই যেন জনসমুদ্র। শব্দহীন, শান্ত, নিস্তরঙ্গ। যতদূর দৃষ্টি চলে. শুধু মানুষ আর মানুষ,—হাঁটু গেড়ে বসে, জোড়হাতে. আকাশ পানে মুখ তুলে প্লেনটিকে নামতে দেখে.—যেন যান্ত্রিক আকাশযানের নামা নয়. স্বর্গ থেকে বাহন চড়ে ধরাধামে অবতরণ করেন কোন্ দেবতা! সেই বিশাল জনসমাবেশের মাথার উপর প্লেন বার দুই চক্কর দেয়, তারপরই মাটিতে নামে। সঙ্গে সঙ্গে চকিতে স্তব্ধ শান্ত জনসমুদ্রে যেন তরঙ্গোচ্ছ্বাস ওঠে, হাজার হাজার ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠের সমবেত ধ্বনি জাগে.—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।—দিগ্‌দিগন্ত সেই স্বরে অনুরণিত হতে থাকে।

সেইদিন সেই মহান্ দৃশ্য স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে আছে।

তারপরের বিবরণও শোনাই।

প্লেন থেকে নেমে শুনি, পবিত্র অস্থি-র এই বিপুল সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে বহুদূর অঞ্চল থেকেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লোকজন এসে এভাবে মিলিত হয়েছে এবং দুদিন ধরে এখানে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে,—আকাশতলে, বৃষ্টির মধ্যেও!

এ তো হোল সম্বর্ধনা। এর পর Relic-দর্শনের পালা। তার আয়োজন হয় পরদিন থেকে স্থানীয় সব চেয়ে বড় প্যাগোডা-মন্দিরের সুপ্রশস্ত মুক্ত অঙ্গনে। তিন-চার দিন ধরে চলে।

সেও এক অভিনব দৃশ্য।

সুশৃঙ্খলাযুক্ত হয়ে কাতারে কাতারে দর্শনার্থীরা আসে—বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা.—এমনকি, শিশুরাও জননীর কোলে। হয়ত মায়েদের বিশ্বাস. অবোধ শিশুদের ভক্তিভাব না জাগলেও শুধু সেদিকে চোখ মেলে তাকালেও পুণ্যলাভ!

মনে পড়ে, বদরীনাথের মন্দিরে একবার দর্শনের সময় দেখেছিলাম এক অন্ধ যাত্রীকে। তাঁর সঙ্গী তাঁকে বিগ্রহের বর্ণনা শোনাচ্ছেন। যাত্রীটিকে পরে প্রশ্ন করি. এই দুর্গম পাহাড় পথ অতিক্রম করে এলেন, অথচ আপনার পক্ষে দর্শনলাভ সম্ভব নয়. তা তো জানতেন।—তিনি উত্তর দেন. দৃষ্টিশক্তি

আমার নেই ঠিকই,—তারপর মৃদু হেসে বলেন, আমি না দেখলেও দেবতা তো আমাকে দেখতে পেলেন।

নম্‌পেনে সেই Relic দর্শনের সময় আরও যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি তাই বলি।

সেই দর্শনপ্রার্থী যাত্রীদলে দেখেছি, বহু সুসজ্জিত শহরবাসী নব্য যুবক-যুবতী। সাধারণ গ্রামবাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মতনই ভক্তিনম্রভাবে তাঁরাও আসেন, তেমনি জোড়হাতে হাঁটু গেড়ে Relic-এর সুমুখে বসেন, অস্ফুটে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে দেশব্যাপী এমন প্রগাঢ় ধর্মভাবের প্রকাশ আর কোথাও দেখিনি।

স্তম্ভিত হই আরও এক বিচিত্র প্রথা দেখে। টাকা, পয়সা, মোহর এ-সব তো প্রণামী পড়েই, নববস্ত্র ও রূপা বা সোনার অলঙ্কারও নিবেদিত হয়। আমাদের দেশেও এ-পূজাপদ্ধতি আছে। কিন্তু, অভিনব লাগে যখন দেখি, যাত্রীরা নিজের গা থেকে অলঙ্কার খুলে প্রণামী দিচ্ছেন—কানের দুল, মাকড়ি, গলার হার, হাতের চুড়ি-বালা প্রভৃতি। পুরুষরাও হাতের আংটি, এমন কি দু'একজন রিস্টওয়াচও, দু'একজন টাকা সমেত মনিব্যাগও!

এ-যেন, অতি প্রিয়জনের চরণে উজাড় করে উৎসর্গ করা নৈবেদ্য!

সে-দৃশ্যও এখনও ভুলিনি।

আর,—

স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে ঐ নম্‌পেন থেকে ছোট প্লেনে চড়ে কাম্বোডিয়ার গভীর অরণ্যপ্রদেশে গিয়ে "আঙ্‌কোর"-এর প্রাচীন মন্দিরগুলি দেখা।

নম্‌পেনে দেখে এলাম, এ-যুগের জীবন্ত মানুষের প্রাণময় ভক্তি নিবেদনের উৎসব,—আর আঙ্‌কোরে এসে দেখি, বিগতযুগের মানুষের দেবভক্তির প্রতীক বিশাল দেবালয়গুলির ধ্বংসস্তূপ,—যেন শোকাবহ শ্মশানভূমি,—জনহীন, শব্দশূন্য, নীরব উৎসব। এখানে নির্বাক মরণসঙ্গীত, নম্‌পেনে নবজীবনের জয়গান।

আঙ্‌কোরের মন্দিরময় এককালের রাজধানী এখন অরণ্যে পরিণত। ভাঙা মন্দিরগুলির অঙ্গভরা এখনও দেখা যায় সেকালের শিল্পীদের হাতের অপূর্ব সূক্ষ্ম কারুকার্য। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পকলার বিস্ময়কর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এখন সেই সব বিশাল মন্দির ও মূর্তিগুলি মহাকালের কবলীকৃত। বন্দী তারা—"বনস্পতির নিবিড় পাহারায় কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।" চারিদিক ঘিরে ঘন জঙ্গলের আবেষ্টন। মন্দিরগুলির অপরূপ অঙ্গ বড় বড় বট অশ্বত্থ গাছের শিকড়ের নাগপাশের মরণ আলিঙ্গনে রুদ্ধশ্বাস,—আপীড়িত। তবুও সেই গহন বনের বিশাল বনস্পতিদের মাথা ছাড়িয়ে আকাশপানে ঊর্ধ্বমুখী দাঁড়িয়ে কয়েকটি মন্দির শিখর। নিঃশব্দ অরণ্যের বাইরে দূর থেকে তাকালে মনে হয় "যেন বিশ্বজগৎ নিশ্বাস বায়ু সম্বরি/স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে".—এখনও দেবতাশূন্য ভাঙা দেউল যেন 'ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া!"

*　　　　*　　　　*　　　　*

ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই মহামৌন প্রাচীন কীর্তিসমূহের সুমুখে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ মনে গুঞ্জরণ ওঠে :

"কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্তরাতে কেন বসে চেয়ে রও?
কথা কও, কথা কও।

*　　　　*　　　　*　　　　*

বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।"

সেই মুমূর্ষু নির্বাক কণ্ঠে ভাষা ফোটে দীর্ঘকাল পরে। জগতের কানে কানে বলে সে, ভারতেরই অভাগিনী প্রবাসিনী কন্যা আমি। শুনবে আমার করুণ কাহিনী?

সেই বিশাল বিস্তৃত বনঘেরা মন্দির নগরীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে দেখান—ফরাসী এক প্রত্নতত্ত্ববিদ্। দেখি, ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলির সংস্কার ও পুনরুদ্ধারের কাজ চলেছে। সেই ভাষ্যকারের মুখে

শুনি এখানকার প্রাচীন ইতিহাস।

প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। ভারতীয় সভ্যতার গৌরবসূর্য তখন বহির্ভারতেও আপন দীপ্তি বিকীর্ণ করেছে। সেই সময়েই কাম্বোজের Khmer নৃপতিদের রাজ্যকালে নির্মিত এই মন্দিরগুলি। বিভিন্ন রাজার স্থাপিত রাজধানীর প্রাসাদ ও জনগণের বাসগৃহগুলি এখন নিশ্চিহ্ন। সম্ভবত সে সব ছিল কাঠের ঘরবাড়ি। পাথরে-তৈরি মন্দিরগুলিই এখনও বিরাজমান।

এই সুদূর প্রাচ্যে হিন্দুধর্মের প্রসারণ রণাঙ্গনে অস্ত্রবলে যুদ্ধজয়ে নয়। প্রাচীনকালে প্রবাসী ভারতীয় বণিকদলের ও পরিব্রাজক ধর্মোপাসকদের সংস্পর্শের প্রভাবেই কাম্বোজবাসীরা হিন্দু সভ্যতার অনেক কিছুই সাগ্রহে গ্রহণ করে, তাদের নিজেদের ধ্যানধারণার সঙ্গে আত্মীকরণ করে নেয়। ফলে, দূরপ্রাচ্যের স্বকীয় সুকুমার শিল্পকলার অঙ্গসাজে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা হয়। তাই শোভা পায় মন্দিরগুলির অঙ্গভরা অলংকরণ,—হিন্দুদেবদেবীর বিভিন্ন মূর্তি, তাঁদের লীলাকাহিনী বর্ণন, সৃষ্টিতত্ত্বের ও স্বর্গনরকের দৃশ্যাবলী। শুধু দেবদেবীর মূর্তি নয়, অগণিত হাস্যময়ী নৃত্যপরা অপ্সরামূর্তিও। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত Khmer নৃপতিকুলের এই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পসৃষ্টির কাজ চলে। ইতোমধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীতে Khmer-রাজ দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ বৌদ্ধধর্ম পরিগ্রহ করেন, কাম্বোজবাসীরাও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। এই পরিত্যক্ত আঙ্‌কোর রাজধানী প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র রূপে বিরাজ করতে থাকে।

অবাক হয়ে ঘুরে ঘুরে দেখি সেই সব বিশালকায় অপরূপ সৌন্দর্যময় মন্দিরগুলি। এ যেন এক স্বপ্নলোকে বিচরণ। কয়েকটি মন্দিরেই দেখা যায়, সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য। গগন অভিমুখী মন্দিরচূড়াগুলি যেন মন্দির পর্বতের শিখরাবলী। সেই মন্দিরাকার পর্বতকে দণ্ড ও শেষনাগকে রজ্জুরূপে ব্যবহার করে দেবাসুরগণ যেন সাগর মন্থনে নিয়োজিত। মন্দির যাওয়ার পথের দুই ধারে মানুষের চেয়ে বৃহত্তর আকারধারী সারি সারি পাথরের মূর্তি,—একদিকে দেবতারা, অপর দিকে অসুরের দল,—বিরাট শেষনাগের দেহের দুই প্রান্ত ধরে যেন আপ্রাণ আকর্ষণ করছেন।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখি আর ভাবি, যুগ-যুগান্তর ধরে চলেছে এই সাগর মন্থন। দেবতা ও অসুরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সত্য ও অসত্যের জয়-পরাজয়। সভ্যতার সমুদ্র মন্থনে লক্ষ্মীদেবী ওঠেন তাঁর স্বর্ণভাণ্ড নিয়ে, কিন্তু ওঠে হলাহলও। কোথায় আজ সেই নীলকণ্ঠ? উঠবে কবে অমৃতভাণ্ড?

আঙ্‌কোরের সেই প্রাচীন মন্দিরগুলি জগতে শিল্পকলার ইতিহাসে যেমন চিরভাস্বর স্বাক্ষর, তেমনি আমার মনের নিকষে স্মৃতির স্বর্ণরেখায় এখনও সমুজ্জ্বল।

সেই যাত্রায় সাইগন শহরও ঘুরে আসা হয়।

এমতভাবেই ঘুরে ঘুরে কেটে যায় দিন।

প্রতি বছর হিমালয়ে যাওয়া ত আছেই, তারই ফাঁকে সুযোগ পেলেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরারও বিরাম নেই। এ-যেন ভ্রমণের সূত্রে নানা রঙের ফুল তুলে মালা গাঁথা,—মধ্যমণি হিমালয়। ভ্রমণের নেশায় মন তখন এমনই বিভোর, চরণ এমনই চঞ্চল,—যে তার প্রমাণ সহজেই মেলে সেই সময়কার এক বছরের মাসানুক্রমিক ভ্রমণসূচী দেখলে,—

জানুয়ারি মাসের পয়লা তারিখ। চলেছি বম্বে। সেখান থেকে আবার পুণায়, মহাবালেশ্বরে। বম্বে ফিরে এসে উঠি জাহাজে। আরব সাগর দিয়ে পৌঁছুই পোরবন্দরে। জাহাজ ছেড়ে ভেরাবল, সোমনাথ, প্রভাস দেখে আবার চলি দ্বারকায়। ফিরে আসি পোরবন্দরে। স্থানীয় এক তরুণ বন্ধু তাঁর মোটরে করে ঘোরান সৌরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে। অবশেষে নিয়ে আসেন জুনাগড়ে। গিরনার পাহাড়ের উপর তিনরাত কাটাই। তারপর একাকী চলি,—পলিতানা, আমেদাবাদ, ডাকোর, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, ওঙ্কারনাথ। চলে আসি এলাহাবাদে, সেখান থেকে সাতনা হয়ে খাজুরাহে।

মার্চ মাস শেষ হতে চলে। কলকাতায় আসি।

মে মাসের প্রথমেই আবার যাত্রা। এবার হিমালয়ে। আলমোড়া থেকে কুয়ারি পাশ্ হয়ে যোশীমঠে নামা। আবার Valley of flowers, হেমকুণ্ড, কেদার-বদরী ঘুরে মুসৌরীর উপকণ্ঠে বার্লোগঞ্জে কয়েকদিন থাকা।

এসে যায় জুলাই মাস। আবার কলকাতায় ফিরি। বর্ষাকাল কাটাতে চলে যাই বিহারে পাতরাতুতে।

সেখানকার বন্ধুদের সঙ্গে আশেপাশে বনেজঙ্গলে ঘোরা হয়,—দেখে আসি দামোদরের উৎস—সেই শিশুকালের নাম তার শুনি দেবনদ।

আগস্ট মাসে মধুপুরে এসে বর্ষার শেষভাগ কাটিয়ে কলকাতায় ফিরি। সেপ্টেম্বরে আবার রওনা।

এবার পাঠানকোটে গিয়ে ট্রেন ছাড়ি। চলি চম্বায় মণিমহেশ। তারপর আবার কুলুভ্যালি। মণ্ডী থেকে বাস-এ সিমলা। সিমলা থেকে হাঁটাপথে চক্‌রাতা। নেমে আসি দেরাডুনে। হৃষিকেশ হয়ে আবার চলি কেদারনাথ। ফিরে আসি মুসৌরীতে। তারপর এলাহাবাদ। অক্টোবর মাসের শেষাশেষি মধুপুর। মাসখানেক বিশ্রাম নিয়ে ডিসেম্বরের প্রথমে কলকাতায় যাই, দিন দশেক পরেই আবার রওনা,—এবার রাজগীর। সেখানে ক'দিন কাটিয়ে গয়া। তারপর, আবার পাতরাতুতে পৌঁছান ডিসেম্বরের ৩০শে।

এই ভাবেই "চিরদিন আমি পথের নেশায় পাথেয় করেছি হেলা।"

কিন্তু, তাই কী?

ক্রমশ, এই ভ্রমণের নেশাই অজানিতে এক ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

এ যেন, উনানের দুধ জ্বাল দিতে টগবগ করে ফুটে অবশেষে ঘন ক্ষীরে পরিণতি! এখন মনে আর ভ্রমণের সেই উদ্দাম উদ্বেল উৎসাহ নেই, প্রয়োজন বোধও নেই। আজ আর পথের বাঁধন আমায় পথে টানে না। সব পথ এসে বাসা বাঁধে আমার গোপন নিভৃত অন্তরে।

পথ আজ আমার বন্ধন নয়,—ইন্দ্রজালবলে হয়েছে অলংকার।

"সে বন্ধন বীণাতন্ত্র সুরে সুরে সঙ্গীত নির্ঝরে/বর্ষিছে ঝংকার।"

তাই নির্জন গৃহকোণে একান্তে বসেও উপভোগ করি আজ সেই গোপন পথের গভীর আনন্দ।

তরঙ্গবিক্ষুব্ধ তীর ছেড়ে তরী আজ ভেসে চলে শান্ত অকূল সাগর জলে,—মেঘশূন্য সুনীল উদার গগন তলে।

"আমার চলা যায় না বলা—আলোর পানে প্রাণের চলা—
আকাশ বোঝে আনন্দ তার, বোঝে নিশার নীরব তারা॥"

গঙ্গাবতরণ ❑ স্বর্গারোহণী ❑ কেদারনাথ—সেকাল ও একাল ❑ মণিমহেশ
ত্রিলোকনাথ ❑ বৈষ্ণোদেবী ❑ রেণুকাহ্রদ ❑ পরশুরাম কুণ্ড ❑ মুক্তিনাথ

গঙ্গাবতরণ

১৯৫২ সাল। মে মাস।

আবার কেদার-বদরী যাত্রার উদ্যোগ করছি।

কিছুদিন আগে ভাইপো বিলেত থেকে ফিরেছে। বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-বিষয়ে গবেষণা করছে। সব কিছু নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখে, যার প্রমাণ পায় না তা মানতে চায় না।

আমার যাওয়ার খবর শুনে বলে, আবার কেদার-বদরী চললে কেন? একবার ত ঘুরে এসেছ। যাও না, ইউরোপ দেখে এস। ও-দিকে ত কখনও যাও-ই নি। অনেক কিছু নতুন দেখবে। আর যদি পাহাড়েই বেড়াতে চাও—চলে যাও সুইজারল্যান্ডে। কী অপূর্ব দেশ! পাহাড় পাবে, স্নো পাবে, লেক পাবে। যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তেমনি টুরিস্টদের থাকবার সুবন্দোবস্ত। পায়ে-হাঁটার কষ্ট নেই, চটিতে থাকার অসুবিধে নেই। সব কিছুই হাতের কাছে পাবে, এমন কি পাহাড়ের বরফ-ঢাকা চূড়ায় পর্যন্ত ট্রেনে করে পৌঁছে দেবে!

চুপ করে শুনি আর হাসি।

তারপরে বলি, হাঁ—তাই ত গল্প শুনি, বই-এ পড়ি, ছবিও দেখি। পাস্‌পোর্টও ত করা আছে। কিন্তু তবুও যাওয়া হচ্ছে কই? যখনই সুযোগ আসে তখনই হিমালয়ের দিকেই মন ছোটে, বার হয়ে পড়ি। যেতেই হয়।

ভাইপোও হাসে। বলে, আশ্চর্য! তোমাদের এ-সব বুঝি না কিছু। বুঝেও কাজ নেই আমার!

তারপর, একাই যাত্রা করি। যাত্রা সাঙ্গ করে ফিরেও আসি—পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি নিয়ে।

॥ ২ ॥

বছর ঘুরে যায়। আবার মে মাস আসে।

হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ ঘর-ছাড়া মনকে আবার পথে টানে। যাত্রার আয়োজন করি।

ভাইপো খবর শুনে কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, পাগল হলে নাকি? আবার চলেছ কেদার-বদরী? এই ত সেদিন ঘুরে এলে?

তারপর আবার পশ্চিম-যাত্রার পরামর্শ দেয়, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রোজ্জ্বল প্রগতির পরিচয় দেয়। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা—সত্যি বলো ত ওখানে বার বার গিয়ে কি কোন আনন্দ পাও?

উত্তর দিই, পাই বই কি। নিশ্চয় পাই এবং আশাতীত পাই। নইলে যাবই বা কেন? কেউ ত এখান থেকে জোর করে পাঠায় না। তবে কেন যে যাই, কি যে পাই—বোঝাতে পারি না।

ভাইপো গম্ভীর হয়েই বলে, চলো এবার আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। একবার দেখে আসি, কি আছে ওখানে। পারবো না যেতে?—শুনেছি নাকি খুব কষ্টকর পথ?

যে-কেউ আসে কেদার-বদরী যাত্রার পরামর্শ নিতে, নিঃসঙ্কোচে যেতে উৎসাহ দিই। বলি, দ্বিধা না করে বেরিয়ে পড়ুন। কোনও ভয় নেই। সুবিধে-অসুবিধের, বাধা-বিপত্তির হিসেব-নিকেশ করতে যাবেন না, করলেই হিসেবে মিলবে না, যোগ ভুল হবে—যাওয়ায় বাধা ঘটাবে। বার হয়ে পড়লেই দেখবেন, ঠিক ঘুরে এসেছেন।

ভাইপোর বেলায় কিন্তু বলতে দ্বিধা জাগে। ভাবি, সত্যিই ত পথের অত অসুবিধা, গৃহ-সুখের সন্ধান নেই—যদি কোন ক্লেশ বোধ করে!

তবুও বলি। বেশ ত চলো না, হাজার হাজার লোক চলেছে, আর তুমি পারবে না? নিশ্চয় পারবে। তবে, পথের কষ্টটুকু স্বীকার করে নিয়ো। চোখ ও মন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রেখো—অপার আনন্দ পাবে।

দুজনে বেরিয়ে পড়ি।

হিমালয়ে পথ-চলার অভিনব জীবন তার শুরু হয়। চারিদিকের বিচিত্র আবেষ্টনীর সঙ্গে সে নিজেকে সুন্দরভাবে মানিয়ে নেয়। দুর্গম পথের দুরূহতাও হাসিমুখে বরণ করে।

পথ চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করি, সামনের চড়াইটা ওঠবার জন্যে একটা ডাণ্ডী বা ঘোড়া করব নাকি?

সে তখনই প্রতিবাদ জানায়। বলে, না, নাঃ—চমৎকার চলেছি। ধীরে ধীরে ঠিক উঠে যাব। বেশ লাগছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষক, মন তার সজাগ আছে। অনুসন্ধিৎসার অণুবীক্ষণে সব কিছু দেখবার জানবার চেষ্টা করে।

কেদারনাথে এসে পৌঁছুলাম। সাগরবক্ষ থেকে ১১,৭৫০ ফুট। তুষারমৌলী কেদারশৃঙ্গের পাদদেশে অপরূপ মন্দির। মন্দিরের পিছনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কিছুকাল আগেও বরফে ঢাকা ছিল। এখন চারিদিকে তুষার-গলা জলের ধারা নেমেছে—অদূরবর্তিণী মন্দাকিনীর সঙ্গে কলোচ্ছ্বাসে মিলতে ছুটেছে। বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম বরফের রাজত্বে। সামনেই নগাধিরাজের তুষার-শুভ্র বিরাট রূপ। দুজনে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি।

অস্ফুটস্বরে ভাইপো বলে, নাঃ—আবার এখানে আসতেই হবে।

আমি হাসি। ভাবি, তার বৈজ্ঞানিক মন কি দেখল, কি পেল—কে জানে?

তবে এটুকু জানি—আবার আসতেই হবে!

॥ ৩ ॥

আবার বছর ঘুরে যায়। আবার মে মাসও আসে।

আবার হিমালয়-যাত্রার প্রস্তুতি করি।

এবার আর ভাইপো প্রশ্ন করে না। দুঃখ জানায়, নতুন কাজে যোগ দিয়েছি: কোনমতে বার হবার উপায় নেই। কিন্তু দেখে নিয়ো আসছে বছর যাবই—গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ঘুরে আসতে হবে।

জানি, সে যাবেও।

এমনি করে আমারও বার বার হিমালয়-যাত্রা। কি যে পাই, কত যে পাই—ভাষায় প্রকাশ হয় না, শুধু বুঝি, মন ভরে উঠে—প্রশান্তির প্রদীপ্তিতে পরিতৃপ্তি আনে।

॥ ৪ ॥

এবার কিন্তু কেদার-বদরীর পথেই শুধু যাব না। গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখও দেখে আসার আকাঙ্ক্ষা। কেদার-বদরীর বিবরণীর অভাব নেই। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী যাত্রা-পথের কাহিনীও পড়ি। এর পূর্বেও ও-পথে গিয়েছি। সানন্দে ঘুরে এসেছি। সবারই অভিজ্ঞতা যে একই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। না হওয়াই স্বাভাবিক। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, শরতের আকাশে ভেসে-যাওয়া সাদা মেঘখানি বিভিন্ন জলাধারের জলের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছায়া ফেলেছে। অথচ কোন কোন লেখায় পথের দুর্গমতার যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে তা দেখে মনে সন্দেহ জাগে—আমি কি তবে অন্য কোথাও গেছি—ও পথেই যাই নি!

পথের কষ্ট আছে, ঠিকই। হিমালয়ের পাহাড়-পথে দুর্গমতাও বিচিত্র নয়। কিন্তু সেটা বড় কথাও নয়, ভয়েরও নয়। কেদার-বদরীর যাত্রা-পথ এখন ত বাস চলাচলের ফলে সহজ ও সুগম হয়েছে। গেলেই হল। যাত্রীর স্রোতও অবিরত বয়ে চলেছে—পাহাড়ে ঝরনার মত।

তাই সে-পথের পরিচয় দেবার জন্যে এ-লেখার অবতারণা নয়। গঙ্গোত্রী-যাত্রা পথেরও নয়। গোমুখে যাত্রী যায় অল্প। সেই পথেরই কাহিনী বলা এর উদ্দেশ্য।

॥ ৫ ॥

কলিকাতা থেকে হরিদ্বার রেল-পথ। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ ষোলো মাইল,—রেলের শাখালাইনও আছে, বাসও চলে। হৃষীকেশের পরই পাহাড় শুরু। স্তরে স্তরে গিরিশ্রেণী আকাশ স্পর্শ করতে চলেছে।

হৃষীকেশ থেকে গঙ্গোত্রী-পথেও ১৯৪৯ সাল হতে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। কেদার-বদরীর বাস একদিকে চলে গেল, গঙ্গোত্রী-পথের বাস ভিন্ন পথে নরেন্দ্রনগরের দিকে পাহাড়ে উঠতে লাগল। নরেন্দ্রনগর পার হয়ে, টেহেরী ছেড়ে এসে হরিদ্বার থেকে ৮২ মাইল দূরে ধরাসু। বাস-এর পথ আপাতত এইখানেই শেষ। আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার আয়োজন চলেছে।

ধরাসু গঙ্গার উপর। এখান থেকে গঙ্গার উপত্যকা দিয়ে একটি পথ চলে গিয়েছে গঙ্গোত্রী। ৭৫ মাইল দূর। আর একটি পথ বামদিকের গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে নেমেছে যমুনার উপত্যকায় এবং যমুনার কূল ধরে চলে গেছে যমুনোত্রী। ধরাসু থেকে যমুনোত্রী ৪৮ মাইল। পাঁচ বছর আগে যমুনোত্রী দেখে এসেছি। এবার ওপথে যাবার কথা নয়। গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখ যাওয়াই উদ্দেশ্য।

ধরাসু থেকে পায়ে চলার পথ শুরু। হাঁটা পথ হলেও প্রশস্ত পথ—ভয়ের কোন কারণ নেই। নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে পথ চলা যায়। কচিৎ কোথাও পাথর বেশি হলে পথ অপ্রশস্ত হয়, কিন্তু সেখানেও চলাচলে কোন আশঙ্কা নেই। একমাত্র, পাহাড় ধ্বসে গিয়ে পথ যদি নিশ্চিহ্ন হয়—তখনই সাময়িক চলাচলের অস্থায়ী পথটুকু সঙ্কীর্ণ হয়, মনে হয়ত ভয়ও জাগায়। কিন্তু বর্ষার আগে খুবই কম পাহাড় ধ্বসে, তাছাড়া অসমর্থ বৃদ্ধ যাত্রীদের স্বচ্ছন্দে সে-সব পথ অতিক্রম করতে দেখে মনে সাহস জাগে। আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদও ত কখনও শোনা যায় না। বড় শহরের প্রশস্ত রাজ-পথেও চলাচলের বিপদ কি কম!

ধরাসু থেকে গঙ্গোত্রী পাঁচ-ছয় দিনের পথ। নয় মাইল অন্তর ধর্মশালা। কেদার-বদরীর পথের মত অত ঘন ঘন চটি বা গ্রাম পাওয়া যায় না। তাই এ-পথে নয় মাইলের কম পড়াও নেই, অর্থাৎ সারাদিনে নয় মাইল অথবা আঠারো মাইল যেতেই হয়।

উত্তরকাশী, ভাটোয়ারী, গাঙ্‌নানী, হর্‌শীল, ধরালী—ছাড়িয়ে এসে গঙ্গোত্রী। সাগরবক্ষ থেকে ৯৯৫০ ফুট উঁচু।

সবগুলিই গঙ্গার উপর মনোরম স্থান।

মাঝে দুইটি বড় চড়াই আছে। প্রথমটি 'সুখী'র চড়াই,—চড়াই উঠার সুখ নেই, তবে চড়াই-শেষে বিশ্রামে সুখ আছে। দ্বিতীয়টি, গঙ্গোত্রীর আগেই 'ভৈরবঘাটি'র চড়াই। চড়াই হিসাবে এর খ্যাতি আছে, তবে খ্যাতির তুলনায় ভীতিকর নয়।

॥ ৬ ॥

গঙ্গোত্রী ছোট জায়গা।

বিরাট গিরিশ্রেণীর মাঝে একটি মন্দির ও কয়েকখানি ঘর,—যেন প্রকাণ্ড এক বটগাছের শাখায় ছোট্ট একটি পাখির বাস।

মন্দিরের পাশেই গঙ্গা।

সেই জাহাজ-ভেসে-যাওয়া সুবিস্তীর্ণ সুগভীর ভাগীরথী নয়,—উপলবহুল ক্ষীণকায়া পার্বত্য নির্ঝরিণী। হিমশীতল জল। গৈরিকবসনা। কলস্বরে বয়ে চলেছেন। উচ্ছল উদ্বেল।

গঙ্গার উপর কাঠের ছোট পুল। অপর পারে সাধু-সন্তদের আশ্রম। ছোট ছোট এক-একটা ঘর। চারিদিকে দেবদারুর গহন বন। সেই বনের ধারে গঙ্গার তীরে একান্তে সাধন-ভজনের নিভৃত স্থান।

এ-পার থেকে হঠাৎ দেখে চমকে উঠি। কই, পাঁচ বছর আগে অমন ঘর-বাড়ি ত ওপারে দেখি নি! এক জায়গায় কয়েকটি অতি-মনোরম বাংলো-প্যাটার্নের ঘর। যেন একটা নতুন শৌখীন কলোনী। শুনি, এক স্বামীজী তাঁর আশ্রমের সংস্কার করেছেন। ঝক্‌ঝকে বাড়িগুলি সূর্যকিরণে ঝল্‌মল্ করতে থাকে। কিন্তু সেই প্রশান্ত আবেষ্টনীর মাঝে যে উজ্জ্বলতা উদ্ধত মনে হয়,—যেন পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মাঝে প্রখর বৈদ্যুতিক আলো। চোখে ও মনে আঘাত হানে।

॥ ৭ ॥

তীর্থ-ভ্রমণের এক প্রধান অঙ্গ সাধু-সঙ্গ। তাই পুণ্যকামী তীর্থসেবীদের তীর্থক্ষেত্রে এলেই সাধু-সন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠে।

জানতাম, সকাল দশটায় ধর্মশালায় সাধুদের ভাণ্ডারা দেওয়া হয়। দিনের মধ্যে একবারই। অনেক

সাধু আসেন,—একসঙ্গে দর্শনও মেলে।

সঙ্গীদের উৎসাহে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম।

দুটি পাশাপাশি ঘর—বারান্দার উপর দুটি জানালা। জানালার ফোকরকাটা,—যেন স্টেশনের টিকিট-ঘর।

ঘরের ভিতর কালী-কমলী-ক্ষেত্রের লোক, খাবার নিয়ে বসে আছেন। বাইরে বারান্দায় ও চত্বরে সাধুরা এসে জমায়েত হচ্ছেন। কাঠের বেঞ্চও দুই-তিনটি পাতা আছে। কেউ কেউ তাতে বসেছেন। অনেকেরই রুক্ষ রূপ—কোমল কান্তি নয়,—কঠিন, কঠোর। কারও কারও চোখেমুখে মধুর হাসি,—শিশুর সরলতায় সুস্নিগ্ধ। সবারই নগ্ন পদ। অল্প কয়েকজনের অঙ্গে আচ্ছাদন আছে—মোটা কম্বল বা চাদর। অনেকেই নগ্নদেহ—কৌপীনমাত্র সার। কারও কারও তাও নেই—সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। সবাই জটাজূটধারী। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি মহাত্মা এসেছেন। দুই-একজন পরস্পর কথা বলছেন। নইলে প্রায় সকলেই নির্বাক। অনেক মৌনীও আছেন। সকলেরই হাতে একটি বা দুইটি পাত্র—কোনটি তামার, কোনটি পিতলের, কোনটি বা লাউ-এর তৈরি।

এখানেও 'কিউ'।

একে একে সার বেঁধে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ভিতর থেকে খানছয়েক রুটি, ভাত ও ডাল বা তরকারি দেওয়া হচ্ছে।

কেউ বারান্দায় বসে খাচ্ছেন, কেউ বা গঙ্গার ধারে পাথরের উপর গিয়ে বসেছেন, কেউ কেউ বা নিজ আশ্রমে অপর পারে চলেছেন।

একজন নাগা সাধু দাঁড়িয়েই খাচ্ছেন; শুনলাম, তিনি কখনও বসেন না, শোনও না।

সবাই অপর-পারের আশ্রমবাসী। কিন্তু মহাত্মারা সকলেই ভাণ্ডারা নিতে আসেন না। আশ্রমে পৌঁছে দিলে তাঁদের কেউ কেউ গ্রহণ করেন। আবার এমনও কয়েকজন আছেন যাঁরা এ-সব অগ্নি-পক্ক কোন কিছু ভোজন করেন না। দর্শনার্থীরা কিস্‌মিস্, বাদাম ইত্যাদি দিয়ে প্রণাম করে আসে, শুধু তাই খান।

ছোট একটি ঘটনা ঘটে গেল।

সঙ্গীদের সঙ্গে একপাশে দাঁড়িয়ে এ-সব দেখছিলাম। ক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষের একজন কাজকর্মের তদারক করছিলেন। এগিয়ে এসে আমাদের একটা বেঞ্চে বসতে অনুরোধ করলেন। বেঞ্চটির একধারে বসে দুটি সাধু খাবার নেবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। খালি অংশটুকুতে তাঁদের সঙ্গে একাসনে বসতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করলাম। ক্ষেত্রের লোকটি জানালেন, তাতে কিছু দোষ নেই। কিন্তু আমরা বসা-মাত্রেই সাধু দুটির মধ্যে একজন বিশেষ বিরক্ত হলেন। তাঁর চোখে-মুখে উগ্রভাবে রুষ্ট-ভাব আত্মপ্রকাশ করল। অপর সাধুটি সেখানে নিঃসঙ্কোচে বসে রইলেন এবং তাঁর মৃদু নিষেধ সত্ত্বেও এ-সাধুটি অবোধ্য ভাষায় কি বলতে বলতে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে গেলেন।

লজ্জায় আমাদের মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

আমরাও তখনই বেঞ্চ ছেড়ে একপাশে এসে দাঁড়ালাম।

সাধুটি আমাদের দিকে তখনও রোষ-নেত্রে তাকিয়ে আছেন। দুর্বাসামুনির কথা মনে হল। শকুন্তলার প্রতি সেই অকরুণ অভিশাপ—'যার কথা এমনি একান্ত মনে চিন্তা করছিস্—সে-ই তোকে দেখে চিনতে পারবে না!'

ভাবি, কলির এই নব-দুর্বাসাও হয়ত অভিশাপ দিচ্ছেন,—'তোরা যেমন আমার পাশে এসে বসলি, তেমনি তোদের পাশেও একাসনে এসে বসবে—অচ্ছুত-অস্পৃশ্যেরা।'

মনে মনে বলি, ঠাকুর, অনেকদিন বনে চলে এসেছ। খবর রাখো না। তারা শুধু একাসনে বসবারই অধিকার পায় নি, এখন দেবতাদের হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করার লোভে মন্দিরে এগিয়ে চলেছে! তা চলুক, —ভেদাভেদ যত ঘোচে ঘুচুক। কিন্তু হিমালয়ে এসে তুমি পেলে কি? অঙ্গের বসন-ভূষণ বহিরাবরণ সব কিছুই ছেড়েছ, অথচ মনের কোণে মান-অভিমানের মানুষ-স্বভাবটি এখনও তেমনি আঁকড়ে আছ, ক্রোধের ফণা এখনও তেমনি দুলছে! হিমালয়ের শান্তির মাঝে এখনও সেই অ-শান্তি!

॥ ৮ ॥

বিকালে ওপারে চললাম সাধু-সন্দর্শনে।

এ-পারে মানুষের বাসা, ও-পারে সাধুর বাস। এ-পারে পাথরের বাড়ি কয়েকটি দোকান-ঘর, জানকীবাঈ-এর তৈরি গঙ্গামায়ীর মন্দির। ও-পারে শান্ত তপোবন, সাধুদের ছোট ছোট কুটি, তাঁদের মনোমন্দিরে আরাধ্য দেবতা। এ-পারে যাত্রী-জীবনের উচ্ছল চঞ্চলতার স্রোত, ও-পারে ধ্যান-গম্ভীর নিস্তরঙ্গ জীবন-জলধি।

মাঝখানে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী। তারই উপর পারাপারের সেতু। এ-পারের মানুষের সঙ্গে ও-পারের সাধুর যোগাযোগ সৃষ্টি করেছে।

এ-পারের মানুষ যায় সাধু-সন্দর্শনে, ও-পারের সাধুরা আসেন ভাণ্ডারার সন্ধানে। এ-পারের সংসার-সন্তপ্ত মন সাধু-সন্তদের কাছে ছোটে শান্তির আশায়, ও-পারের আকাশমার্গীরা গৃহীর দুয়ারে এসে দাঁড়ান ভিক্ষার ঝুলি হাতে। যেন জননী জাহ্নবী তাঁর দুই কোলে ভিন্নপ্রকৃতি দুই সন্তান নিয়ে মাতৃগৌরবে চলেছেন।

পুলের উপরে এসে দাঁড়ালাম।

পাঁচ বছর আগেকার কথা মনে হয়। মার সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। সেবারও এমনি সাধু-দর্শনে বার হয়েছিলাম। ধর্মশালা থেকে বার হবার আগেই হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নেমেছিল। শীতও তেমনি দশগুণ হয়ে দেখা দিল।

মাকে বললাম, এত ঠাণ্ডায় বার হবে? মন্দিরে ত দেবতাই দর্শন হয়েছে—আবার সন্ধ্যায় আরতি দেখবে,—সাধু-দর্শন না হয় থাক্-ই।

মা বলেন, সে কি বাবা! তা কি হয়! তীর্থে এসে সাধু-দর্শন করব না? মহাত্মাদের দর্শনে কত পুণ্যি, কত তৃপ্তি! বৃষ্টি ত কমে এল, চলো যাওয়া যাক্।

অতএব, যাওয়াই হয়। একে গঙ্গোত্রীর ঠাণ্ডা, তায় বৃষ্টিবাদল। গায়ে বেশ কিছু গরম জামা-কাপড় চাপালাম।

মার ডাণ্ডীওয়ালাগুলি পাহাড়ী হলেও মুড়িসুড়ি দিয়ে ডাণ্ডী নিয়ে চলেছে।

পাণ্ডাজী শ্রীভূমানন্দ বললেন, প্রথমে চলুন এখানকার এক মস্ত সাধুকে দেখাব।

পুল পার হয়ে বাঁদিকে একটু উঠেই তাঁর কুটি।

পাথরের ছোট পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা জমি। তার মাঝখানে একটি ছোট্ট ঘর। পাঁচিলের এক কোণে আরও একটি ছোট ঘর আছে। মাঝখানের ঘরখানির কাছে এসে দাঁড়ালাম। চারিদিকে খোলা রোয়াক। একটিমাত্র ছোট দরজা—গঙ্গার দিকে মুখ করা। জানালা নেই।

দরজার সামনে এসে ভিতরে তাকালাম।

যোগাসনে বসে এক অপূর্ব মূর্তি। জটাধারী। স্থূলকায়। তাম্রকান্তি। সারা অঙ্গে কোথাও কোন আবরণ নেই। জ্যোতির্ময় মূর্তি—নিশ্চল নিস্পন্দ। নিষ্পলক নেত্রে যেন গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ দেখে মনে হয়, এ যেন জীবন্ত মানুষ নয়,—পাষাণ-মূর্তি। কাশীতে দেখা তৈলঙ্গস্বামীর প্রতিমূর্তিটি চোখের উপর ভেসে উঠল।

অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। পাণ্ডাজীর ডাকে চমক ভাঙল। বললেন, মাকে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলুন।

মাথা অনেকখানি হেঁট করে দরজায় ঢুকতে হয়; কিন্তু এখানে আপনা হতেই ত মাথা নত হয়ে আসে।

মার সঙ্গে প্রণাম করে মূর্তির পাশে দাঁড়ালাম। এতক্ষণে পাথরমূর্তি স্পন্দন পেল। আঁখির তারা ঘুরিয়ে একবার আমাদের তাকিয়ে দেখলেন। প্রশান্ত বদনে মধুর হাসির অস্ফুট-রেখা ফুটে উঠল। ঈষৎ ইঙ্গিত করে আমাদের বসতে বললেন,—হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।

মা যুক্তকরে তাঁর স্নেহচ্ছায়াতলে নিবিষ্টচিত্তে বসে আছেন। দু-নয়নে আনন্দাশ্রুর ধারা। প্রসন্ন পরিতৃপ্তির প্রতিমূর্তি!

এদিকে সাধুর চোখের দৃষ্টি আবার গঙ্গার ধারার দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। ক্ষণিকের সজাগতা কোথায় মিলিয়ে গেছে। আবার নিষ্পলক আঁখি, নিস্পন্দ দেহ। মনে হয় প্রাণহীন। অথচ তারই সান্নিধ্য মনে এক অপূর্ব অনুভূতি আনে। বুদ্ধির সীমা-বন্ধ, পরিচিত দেশ-কাল অতিক্রম করে মন কোন্ অসীমতার মাঝে ভেসে যায়। অনাদিকাল যেন একটি ক্ষুদ্র মুহূর্তের মাঝে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতিস্থ হতে চেষ্টা করি।

মনে পড়ে, পল্ ব্রানটনের কথা। অরুণাচলের ঋষি মহর্ষি রমণ-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ। দেশ-কাল-পাত্র-পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী—সব কিছুরই প্রয়োজনীয়তা কি করে নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। অথচ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিধর্মী বিদেশী!

ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর আর একটি ব্রহ্মচারীও এসে দাঁড়িয়েছেন। গেরুয়া আলখাল্লা পরা। জটাভার চূড়া করে মাথার উপর বাঁধা। মুখে কঠোর সন্ন্যাসজীবনের সুস্পষ্ট পরিচয়, অথচ কোমলতাও আছে। প্রৌঢ় হলেও শ্মশ্রুগুম্ফের রেখা নেই।

সাধুটি সম্পূর্ণ মৌনী। ব্রহ্মচারীজী তাই তাঁর কথা ধীরে ধীরে বলেছিলেন, একশো বছরের উপর বয়স; সাধারণত এমনি ধ্যানরতই থাকেন। আমি সেবা করি।

প্রণামী দেওয়ার প্রশ্নে ব্রহ্মচারীজী জবাব দিলেন, কিছুকাল আগে এক যাত্রী কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন, তা এখনও রয়েছে; তাই নেওয়ার প্রয়োজনও নেই, রীতিও নেই।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে, আবার প্রণাম করে আমরা চলে এলাম। তখনও তিনি তেমনি নিশ্চল, নিস্পন্দ। এমনি করেই তাঁর দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, বছরের পর বছরও ঘোরে। কি করে থাকেন, কেন থাকেন,—কি ভাবেন, কেনই বা ভাবেন এবং কি-ই বা পেয়েছেন—এসব সমস্যার মীমাংসা হয় না।

মাকে নিয়ে আরও সাধু-দর্শন করে ধর্মশালায় ফিরলাম। স্থানীয় লোকজন এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি, সেই সাধুজীটির কথা উঠল।

একজন বললেন, একসময়ে ওঁর মত বড় সাধু দেখা যেত না। সাধুসমাজে ওঁর শীর্ষস্থান ছিল।

"ছিল", শুনেই মনে চমক লাগল।

বললাম, কেন, উনি কি এখনও বড় একজন মহাত্মা নন? না আরও বড় একজন এসেছেন?

উত্তর শুনি, সে-সব অনেক কথা। ঐ বিরাট পুরুষের কাছে ওটা হয়ত একটা ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু সেইটিই এখন মস্ত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

উত্তরদাতাও একজন গেরুয়াধারী হিমালয়বাসী ব্রহ্মচারী। তিনি বলতে থাকেন, উনি একজন মহাপুরুষ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিতিক্ষার দিক থেকে দেখতে গেলে সাধুরা সকলেই এঁকে খুব উঁচু বলেই মানেন। শাস্ত্র-জ্ঞানও গভীর। নিজের চোখেই ত এঁর কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখে এলেন। এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও কিরকম বসে রয়েছেন। এ শীত তো ওঁর কাছে কিছুই নয়। আগে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন গোমুখে—বরফের মধ্যে। সেখানেও ঠিক ঐভাবে সারা বছর থাকতেন, গায়ে কোনও আবরণ নেই, ধুনির আগুনও নেই। অথচ বয়সও হয়ে গেছে একশোর উপর। ইদানীং কয়েক বছর আর গোমুখে যান না—এখানেই থাকেন। সত্যিই আশ্চর্য ক্ষমতা! একবার পণ্ডিত মালব্যজী ওঁকে কাশীতে নিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের কি একটা উদ্বোধন ব্যাপারে। কাগজেও সেকথা তখন বার হয়েছিল।

বললাম, হাঁ—এখন মনে পড়ছে বটে,—পড়েছিলাম, হিমালয় থেকে কোন্ এক বড় সাধুকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন।

ব্রহ্মচারী বললেন, ইনিই তিনি। তারপর শুনুন ব্যাপার। ওঁর জীবনের রাহু হয়েছে ওঁর ঐ সেবক-সাধুটি।

আশ্চর্য হলাম। বললাম, কুটির ভিতর আলখাল্লা-পরা যে সন্ন্যাসীটি দাঁড়িয়েছিলেন? কেন, বেশ সুন্দর ত কথা বলছিলেন—শাস্ত্রজ্ঞানও বেশ আছে দেখলাম। ভালই ত লাগল।

মুচকে হেসে ব্রহ্মচারী বললেন, ঐ ত ব্যাপার। ওটি সন্ন্যাসী নয়,—সন্ন্যাসিনী। এখন ঘটনাটা শুনুন। সাধুজী কয়েক বছর হিমালয় থেকে নেমে নীচে হরিদ্বারের দিকে যেতেন। সেদিকে কিছুকাল কাটিয়ে আবার উপরে চলে আসতেন। এ-পথে মাঝে পাণ্ডাদের একটা গ্রাম আছে, দেখেছেন নিশ্চয়—ধরালীর

অপর পারে,—মুখওয়া। প্রতি বছর আসা-যাওয়ার সময় সেই গ্রামের কাছে তিনি রাত কাটাতেন। তখন এই মেয়েটি ছিল খুব ছোট। সাধুকে দেখতে পেলেই তাঁর কাছে ছুটে আসত, সারাক্ষণ তাঁর কাছে কাছে থাকত, ইনি খুব স্নেহ করতেন তাকে। এমনি করে বছরের পর বছর যায়, মেয়েটিও বড় হয়ে ওঠে। তারপর তার বিয়েও হল; কিন্তু স্বামীর ঘর করা তার ভাগ্যে ছিল না। শেষে গেরুয়া পরল, এই সাধুজীর কাছে সন্ন্যাস নিল, এঁরই কাছে এসে রইল। এঁর কাছে শাস্ত্র-শিক্ষাও করেছে—তখন ইনি মৌনী ছিলেন না, কথা বলতেন। কঠিন সন্ন্যাসব্রতও পালন করেছে। কিন্তু এ-সব হলে হবে কি, এঁর কাছে এসে থাকার পর থেকেই সাধুজীর সম্পর্কে লোকমহলে কথা উঠল—তাদের মুখ ত কেউ চাপা দিতে পারে না। ফলে আগে ওখানে যাত্রীর যত ভিড় হোত এখন আর তত হয় না।

গল্প শেষ করে ব্রহ্মচারীজী চুপ করলেন, তারপর একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমিও বলি, মশাই, কাজটা ঠিক হয় নি। অত বড় সাধু—অত বিরাট শক্তিশালী পুরুষ; চিরকাল একা ছিলেন, একাই থাকলে হোত! কি প্রয়োজন ছিল একজন সন্ন্যাসিনীকে কাছে থাকতে দেবার? আর নিজে থাকেন ত ঐরকম ভাবে। নিজে মহাপুরুষ হতে পারেন, একশো বছরের উপর বয়সও হতে পারে—কিন্তু মেয়েটা ত আর সে ঐশীশক্তি পায় নি!

নির্বাক হয়ে শুনি। মন্তব্য শুনে স্তব্ধ হই। ভাবি, এই দুর্গম হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে সাধু-জীবনের ভালমন্দের বিচার-কাঠিও কি একই? এখানেও মানুষের মনে সেই চির-জাগরূক সন্দেহের কীট, কুৎসা-রটনার অদম্য স্পৃহা!

অতি-বিচিত্র এ বিশাল জগতে এ-ও এক চিরন্তন করুণ সত্য।

হাসি পেল। বললাম, ব্রহ্মচারীজী, সাধুজীকে অতই শক্তিশালী বিরাট পুরুষ বলে মানলেনই, তখন সামান্য একটি মেয়েকে উন্নত করার ক্ষমতাটুকুও তিনি রাখেন, এটুকু স্বীকার করতে ক্ষতি কি?

ক্ষতি কিছুই নয়। কিন্তু, মানুষ-স্বভাব যাবে কোথায়?

॥ ৯ ॥

সেদিন সন্ধ্যায় শোনা সে-কাহিনী আজও বেশ মনে আছে। পুলের উপর দাঁড়িয়ে পাঁচ বছর আগেকার সে-সব কথা ভাবছিলাম।

সামনেই সাধুজীর সেই আশ্রম। প্রায় তেমনি আছে। প্রথমে সেই দিকেই গেলাম। চীর্‌গাছের ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের রোদ এসে পড়েছে কুটির উপর। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ।

কুটি-র সামনে এসে দাঁড়ালাম।

সেই ঘর, সেই দুয়ার সেই রোয়াক সবই তেমনি আছে। এবার সাধুজী ঘরের মধ্যে নয়, রোয়াকে বসে আছেন। চেহারা প্রায় তেমনি আছে—একটু শীর্ণ। লোলচর্ম বার্ধক্য ঘোষণা করছে। বয়স যে বহু বছর—সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ, তবে কত তা দেখে বলা সম্ভব নয়। তেমনি গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে আছেন। গঙ্গাই দেখেন, না আর কিছু?

ভাবি, পাঁচ বছর আগেকার সেই দেখা কি এখনও চলছে?

এবার কিন্তু সম্পূর্ণ সজাগ। আমরা প্রণাম করতেই আশীর্বাদ করলেন; হাত নেড়ে বসতে ঈশারা করলেন।

সেই ব্রহ্মচারিণীও এলেন। হাঁ, মেয়েই বটে। তবে ধরা কঠিন। চেহারার মাঝে, গলার স্বরে অতি সামান্যই ইঙ্গিত আছে।

স্বামীজীর সঙ্গে এবার কথা হতে লাগল। তিনি এখনও মৌনী। তবুও হাত নেড়ে মুখর ভঙ্গিতে ভাবপ্রকাশ করছিলেন। কখনও কখনও ব্রহ্মচারিণীকে ইঙ্গিত করছিলেন, তিনি ওঁর হয়ে বলছিলেন।

আমার সঙ্গীর ও আমার এই দ্বিতীয়বার গঙ্গোত্রী আসা শুনে খুশি হলেন। ঈষৎ হেসে ঈশারা করে বললেন, আবার আসতে হবে!

গোমুখ যাবার ইচ্ছা আছে শুনে আরও আনন্দ প্রকাশ করলেন। হাত দিয়ে বোঝালেন, রাস্তা নেই, কঠিন পথ। তবে কোন ভয় নেই; সব সময়েই যেন মনে বিশ্বাস রাখি, ঠিক দর্শন মিলবে। অতি অপরূপ স্থান।

আকাশের দিকে হাত তুলে বোঝালেন, সবই তাঁর রূপ, তাঁরই অপরূপ লীলা।

স্বামীজীর ইঙ্গিতে ব্রহ্মচারিণী গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন—পুরাণকথিত ভাগীরথীর কত পুণ্য-কাহিনী।

স্বামীজীর আশীর্বাদ নিয়ে প্রফুল্লচিত্তে চলে এলাম। গোমুখ-যাত্রার সঙ্কল্পও সুদৃঢ় হল।

এরপর সেই স্বামীজীকে আর একবার দেখেছিলাম। সেদিন গোমুখ-অভিমুখে যাত্রা করছি সকালে। ওপার থেকে রওনা হয়েছি। হঠাৎ দেখলাম, এ-পারে গঙ্গায় স্নান সেরে উলঙ্গ মূর্তি, আশ্রম-পানে উঠে চলেছেন। তাঁর দুই হাতে দুইটি বালতি। নিশ্চয় গঙ্গার জল ভরা। বালতি দুটি অক্লেশে দুই হাতে নিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দগতিতে চড়াইপথে চলেছেন। সুদীর্ঘ, সরল, সবল দেহ। কে বলবে, একশো বছরের উপর বয়স?

চোখের উপর একটা ছবি ভেসে উঠল।

পুরীর সুনীল সফেন সমুদ্র। তারই বালুকাতীরে একটি নগ্ন শিশু দুই হাতে দুটি খেলার ছোট বালতি নিয়ে ছুটে চলেছে!

শিশুরই মত সরল, নিষ্পাপ।

সত্য-শিব-সুন্দরের সহজ সোপানই বুঝি বা শিশু মন!

॥ ১০ ॥

সাধুজীর আশ্রম থেকে গেলাম আর এক সাধুর কুটিতে।

তিনি বাইরে পাথরের উপর বসে বই পড়ছিলেন। ইনিও বিবস্ত্র। তবে মৌনী নন। দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ জটাজুট।

সাদরে আমাদের বসতে বললেন।

একটা চীরগাছের গুঁড়ি পড়ে ছিল—সাধুকে প্রণাম করে তারই উপর সকলে বসলাম।

সাধুটি বড় স্নিগ্ধ হাসেন, সুমিষ্ট কথা বলেন।

কুটির দিকে তাকিয়ে দেখেই চিনতে পারলাম! গতবার এখানেও এসেছিলাম। তখন অপর আর একজন সাধু ছিলেন। তিনিও নাগা, তবে মৌনী ছিলেন।

বেশ মনে পড়ে, ঘরের ভিতর মাটির মেঝেতে ধুনি ছিল, তার থেকে একটুকরো পোড়া কাঠ নিয়ে মাটির উপর লিখে লিখে আলাপ করেছিলেন।

কলিকাতায় ভবানীপুরে থাকি শুনে লিখেছিলেন, সে ত কালীঘাটের খুব কাছে! কালীমা বড় জাগ্রতা দেবী—বলে উদ্দেশ্যে প্রণাম করেছিলেন।

অনেকক্ষণ আলাপ হয়েছিল। মা সঙ্গে ছিলেন,—তাঁকে দেখিয়ে ইশারায় বলেছিলেন—ইনি আমারও মা।

শুনে মার চোখে জল এসেছিল।

কোন সেবায় আসতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে ঘাড় নেড়ে 'না' বলেছিলেন। তারপরে অতি সঙ্কোচে একটি ধূপকাঠি বার করে দেখিয়েছিলেন,—ইচ্ছা হয় ত এই দিতে পার।

ধর্মশালায় ফিরে এসে পাঠিয়েও দিয়েছিলাম।

তাঁর কাছ থেকে চলে আসার আগে মা বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন,—আর কোন কিছু চাই কিনা বলুন, হেসে আরও বলেছিলেন—আমি ত মা আছি।

সাধুটিও হেসেছিলেন—বড় ম্লান হাসি। তারপর হাত তুলে সম্মতি জানিয়ে ধীরে ধীরে লিখলেন, যদি ইচ্ছা হয় এবং কোনও রকম অসুবিধা না থাকে তো আসামী এণ্ডির চাদর একটা পাঠাতে পার।

চাওয়া শুনে মার সে কী অপরিসীম আনন্দ!

কলিকাতায় ফিরেই পাঠানো হয়েছিল।

ধর্মশালায় এসে তাঁর চাদর চাওয়ার কারণও বুঝেছিলাম। কয়েক বছর তিনি গোমুখে ছিলেন। শীতকালেও থাকতেন সেই বরফের মাঝে। কিছুকাল আগে সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে তাঁকে আনা হয়। শরীর এখনও সুস্থ হয়ে উঠে নি।

কাঠের উপর বসে ঘরের দিকে তাকিয়ে কয় বছর আগেকার সে-সব কথা আজ মনে হচ্ছে।

তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় জানলাম, আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরের বছরই দেহরক্ষা করেছেন।

হঠাৎ ঘরটা যেন খুব ফাঁকা ফাঁকা মনে হল।

ক্ষণিকের পরিচিতি, সংসার-ত্যাগী, হিমালয়-বাসী এক নাগা সন্ন্যাসীর মৃত্যুসংবাদ। তবুও কিসের বেদনায় মন যেন ভারী হয়ে উঠল।

জরা-মৃত্যু তার বিশাল জাল এখানে বিস্তার করেছে—কোথাও নিস্তার নেই। যেখানেই জীবন—সেখানেই মরণ।

পাথরের উপর বসে স্বামীজী বলছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর এই কয় বছর আমি এসেছি। বড় শান্তিময় স্থান। তবে আমার আসন গঙ্গামায়ীর কিনারায় ঐ পাথরটি।

তাকিয়ে দেখলাম, একটি মসৃণ সমতল পাথর,—ঠিক ধারার ধারেই।

বললেন, ঐখানে বসি। আপনা হতেই ধ্যান আসে। ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাস—সেই তো ভগবদ্ সঙ্গীত। গঙ্গাতীরে বাস—এই তো স্বর্গবাস। গঙ্গার জলে স্নান, গঙ্গাকে অবলোকন, গঙ্গার নাম স্মরণ, গঙ্গার মাহাত্ম্য সংলাপন—অমৃতময় এ জীবন।

হঠাৎ, কথা বলতে বলতে উঠে গেলেন। ঘর থেকে মুঠাভরে কি নিয়ে এলেন। গেলেন, এলেন—এও যেন উলঙ্গ শিশুর ঘোরাফেরা।

কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, নাও, প্রসাদ নাও।

চেয়ে দেখি, মুঠাভরা কিশমিশ বাদাম। একটিমাত্র কিশমিশ তুলে নিলাম, মাথায় ঠেকালাম, মুখে দিলাম।

বললাম, এই যথেষ্ট।

আরও নিতে বলেন। তবুও নিই না। জানি, এই তাঁর একমাত্র আহার্য।

সেবার কথা উল্লেখ করি। গ্রহণ করেন না। হাসেন। বড় স্নেহভরা ব্যবহার।

গোমুখ যাওয়ার কথা তুলি। শুনে খুশি হন, উৎসাহ দেন। বলেন, লোকে ভয় দেখাবে,—কিন্তু মনে বিশ্বাস রেখো—কোন ভয় নেই।

সেই একই অভয় বাণী।

পরম-আত্মীয়ের মত বিদায় দেন। আশিস্ জানান।

কঠোর সন্ন্যাসী, অথচ অন্তরে স্নেহের ধারা। যেন পাষাণ-কারা হিমালয়ে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

॥ ১১ ॥

সেখান থেকে আরও এগিয়ে গেলাম।

একটি নতুন কুটি। ছোট। সাধুও নতুন এসেছেন। ঘরের সামনে বারান্দায় বসে আছেন। ইনি ঠিক নাগা নন—সামান্য একটা কৌপীন আছে। তবে মৌনী। যুবা পুরুষ,—মাংসপেশীগুলি সবল সুন্দর স্বাস্থ্য ঘোষণা করছে। মুখ-চোখের হাবভাব, বসার ভঙ্গি—অনেক কিছুই শ্রীরামচন্দ্রের কিঙ্করের কথা স্মরণ করায়।

আশ্চর্য হলাম যখন তিনি আঙুল দিয়ে ঘরের ভিতর তাঁর আরাধ্য দেবতার মূর্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন,—সত্যই ত রঘুনাথজীর মূর্তি! সুন্দর সাদা ধবধবে পাথরের। দেখেই বললাম, এ তো জয়পুরের!

তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, হাঁ।

এঁর কাছে শ্লেট, পেনসিল আছে। তাতে লিখে তাঁর বক্তব্য জানাচ্ছিলেন।

সারাক্ষণই রঘুনাথজীর সেবায় আছেন। প্রবল বাসনা, তাঁর একটা আলাদা ছোট মন্দির করেন। কাজও শুরু করেছেন—প্রাঙ্গণের একপাশে দেখালেন।

গোমুখ যাওয়ার কথা আবার উঠল। এঁর কাছেও সেই একই উৎসাহের বাণী,—কঠিন পথ, তবুও ভয় নেই, অন্তরে স্থির বিশ্বাস নিয়ে চলে যাও।

সবই অটল বিশ্বাসের বাঁধ বেঁধে জীবনধারা বহিয়ে চলেছেন।

এঁকে আবার দেখেছিলাম পরদিন—গোমুখ যাওয়ার পথে।

একমনে মন্দিরের প্রাচীর তৈরি করছেন। সন্তান-সন্ততির আবাসগৃহ নয়, আরাধ্যদেবতার মন্দির।

একাই দুই হাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর তুলে আনছেন। সর্বাঙ্গের পেশীগুলি পাথরের ভারে ফুলে উঠেছে। শরীরে যৌবনের দীপ্তি। মুখে কিন্তু শিশুর সরল হাসি। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে একটা দড়ির সাহায্যে দেখছেন, ঠিক সোজা রাখা হল কিনা। নিপুণ হাতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন।

ভাবি রাজমিস্ত্রী বা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন নাকি!

ঢেঁকি স্বর্গে এসেও সত্যিই ধান ভানে!

॥ ১২ ॥

অস্তমুখী সূর্য পশ্চিমদিকের পাহাড়ের অন্তরালে আত্মগোপন করেন। তাঁর বিদায়-বেলার শেষ আশীর্বাদ পাহাড়ের মাথায় সাদা বরফের উপর রক্তচন্দনের তিলক আঁকে।

সঙ্গীরা বলেন, চলুন, এতক্ষণ তো গঙ্গার উপর-দিকে আসা গেল। এবার ফেরা যাক,—গঙ্গার নীচের দিকে সেই এক সাধুর নতুন আশ্রমের সব বাড়ি দেখা গিয়েছিল ও-পার থেকে—সেখানেও ত যাব!

অতএব সেখানেই যাই।

পথে এক পাহাড়ি নদীর উপরে ছোট পুল। কেদারশৃঙ্গ হতে কেদার-গঙ্গা নেমে এসেছেন,—বরফ-গলা ঘোলা জল। সগর্জনে পুলের কিছু নীচেই ভাগীরথী গঙ্গায় আত্মসমর্পণ করছেন।

পথের বাঁদিকের পাহাড়গুলির পিছনেই কেদার-শিখর। এই কেদার-গঙ্গা ধরে যেতে পারলে দুই-তিন দিনেই এখান থেকে কেদারনাথে পৌঁছানো যায়। যায় বটে, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দুর্গম গিরিপথ,—চিরতুষারে আচ্ছন্ন। বিপদসঙ্কুল হওয়া ত স্বাভাবিকই। কখনও কখনও সাধু-সন্তরা এ-পথে যাতায়াত করেন,—সেই নগ্ন-পায়ে, নগ্ন-গায়ে।

অত্যাশ্চর্য বোধ হয়।

১৯৪৭ সালে একটি সুইস দলের কয়েকজন গিয়েছিলেন,—অবশ্য অনেক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। একেবারে কেদার-শিখরে উঠেছিলেন—এইদিক দিয়েই। কেদারনাথ থেকে কেদার-শিখরে এখনও কেউ উঠতে পারেন নি।

মাথা উঁচু করে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি। মাত্র দুদিনের পথ। অথচ আমাদের সেই কেদারনাথেই যেতে হবে একশো মাইলেরও উপর ঘুরে,—যাত্রী-পথ ধরে। প্রায় দিন দশেক লাগবে।

ভাবি, একবার এসে এ-পথে যাওয়ার চেষ্টা করলে হয়! কেদার-গঙ্গা যেন আকর্ষণ করতে থাকেন।

পুল পার হয়ে একটু এসেই সেই স্বামীজীর নবীন আশ্রম।

একটা বেড়া-ঘেরা এলাকায় কতকগুলি সুন্দর বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকতে হয়। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চাকচিক্যের ঔজ্জ্বল্য। একটি ঘরের সামনের বারান্দায় অনেকগুলি তামার বাসন সাজানো। কি উজ্জ্বল সেগুলির দীপ্তি! চারিদিকেই গৃহ-শ্রী, লক্ষ্মীর চরণচিহ্ন। আশ্রমের শান্ত আবহাওয়া নয়, কর্মব্যস্ততার সজীবতা। কয়েকজন লোকজনও ঘুরছে।

স্বামীজী কি কাজের তদারক করছিলেন, আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন, অভ্যর্থনা করলেন। আমরাও হাত তুলে নমস্কার করলাম।

প্রৌঢ় বয়স। সুন্দর স্বাস্থ্য। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। দাড়ি-গোঁফ-মাথা সবই কামানো। পরনে গেরুয়া লম্বা-আলখাল্লা। দামী ভাল কাপড়ে তৈরি। শুধু বেশভূষাতেই ভদ্র নন, কথাবার্তা, ব্যবহারেও সামাজিক ভদ্রতার পরিচয় দেন। বসবার জন্যে কম্বল পাততে হুকুম করলেন, বলেন, এখানে ত চেয়ার দিতে পারব না, শুধু কম্বলই আছে। তবে এ আনিয়েছিলাম অনেক দূর দেশ থেকে—কেমন জিনিস দেখুন না!

সত্যই, বেশ ভাল কম্বল—দামী, রঙ-বেরঙের।

কিন্তু বসতে ইচ্ছা করে না।

বাইরে আঙিনার দিকে তাকাতেই মনে পড়ল, গতবার মাকে নিয়ে এখানেও এসেছিলাম। ঐ পাথর-

বাঁধানো জায়গাটায় ইনি বসেছিলেন। সামনে কতকগুলি যাত্রী। তাদের ভাষণ দিচ্ছিলেন। নানান কথা,—ধর্মের তো বটেই, সামাজিক, রাজনৈতিক কোন প্রসঙ্গেরই বাদ ছিল না। মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দেরও প্রয়োগ ছিল। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম। সেবারও বসতে বলেছিলেন—-বসা হয় নি।

এবার বাড়িঘর অনেক বেড়েছে। স্বামীজী চা খেতেও অনুরোধ করলেন। বললেন, চা খাবার কিছু খান। সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। চা ত হরদমই চলছে—তৈরি রয়েছে। যাত্রীরা আসে অনেকে। আমার নিজের লোকজনও রয়েছে।

কিন্তু চা খেতেও মন সরে না। বলি, না, থাক। একটু আগেই খেয়ে বেরিয়েছি। এখন বেলা বেশি নেই—আমরা আরও একটু ঘুরতে চাই। তা ছাড়া কাল গোমুখ যাব, ধর্মশালায় ফিরে তারও ব্যবস্থা সব দেখে নিতে হবে।

গোমুখের কথা শুনেই স্বামীজী গম্ভীর হন, বলেন. ও বড় কঠিন পথ। আপনারা যেতে পারবেন না—বৃথা চেষ্টাও করবেন না। তার চেয়ে বরং কাল চলে আসুন এখানে—চা-টা খাবেন। দেশের সব খবর-টবর শোনা যাবে—অনেক গল্প হবে।

ভাবি, তোমারই মুখে এ-কথা সাজে বটে!

মুখে বলি, আচ্ছা—চললাম।

হাত তুলে বিদায়-সম্ভাষণ জানাই। তিনিও গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেন। বলেন, আবার আসবেন।

ভদ্রতার প্রতিমূর্তি।

হঠাৎ মনে পড়ে শহরের পাকা ব্যবসায়ীদের কথা,—কি অমায়িক কথার আড়ম্বর!

এতক্ষণ আশ্রমে আশ্রমে ঘোরার পর এখানে এসে মনের প্রশান্ত-প্রবাহে বাধা পেল।

গঙ্গোত্রী-বাসী একটি সঙ্গীকে প্রশ্ন করলাম, স্বামীজীর বহু ধনী শিষ্য আছেন বুঝি?

তিনি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, নাঃ, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। শিষ্য কিছু আছে বটে, কিন্তু অর্থ উনি নিজেই উপার্জন করেন। আজ ক-বছর কাঠের বেশ বড় ব্যবসা করছেন।

ব্যবসা!—শুনে চমকে উঠি। উঠবারই কথা। গঙ্গোত্রীতে ব্যবসায়ী সাধু! ভাবলাম, কোন্‌দিন হয়ত দেখব, বড়বাজারে গেরুয়াধারী জটাজূট সন্ন্যাসী দোকান খুলে বসেছে!

উত্তরদাতা পাশের জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, ঐসব জঙ্গল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ওঁর জমা নেওয়া। ঐ দেখছেন না, মাঝে মাঝে ফাঁক রয়েছে—ও-সব জায়গায় গাছ কাটা হয়েছে। দেওদার, চীর্, পাইন গাছ,—সব দামী কাঠ। তাছাড়া একচেটিয়া ব্যবসা। এ-সব অঞ্চলে বা গঙ্গোত্রীর পথে যত ঘর-বাড়ি তৈরি হয়—সব কাঠ সাপ্লাই করেন ইনি। এখানে আসার পথে ভৈরবঘাটিতে কালীকম্‌লীর ধর্মশালাটি গত বছর আগুনে পুড়ে গিয়েছিল—এ বছর নতুন ঘর তৈরি হচ্ছে, দেখেছেন নিশ্চয়,—কাঠ যোগান দিচ্ছেন ইনি। বহু টাকা করেছেন।

মনে পড়ে বটে, আসার পথে ভৈরবঘাটিতে বহু কাঠ সংগ্রহ করা আছে দেখেছিলাম। তারই উপর বসে দুরন্ত চড়াই উঠার শান্তি দূর করেছিলাম, দ্বিপ্রহরের আহারও করেছিলাম। তখন ভেবেছিলাম, জঙ্গল থেকে বিনামূল্যে সব কেটে-আনা কাঠ,—সার্থক জন্ম এ গাছগুলির।

এখন জানি, সে-সবই এঁর ব্যবসার সম্পত্তি!

সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, কিন্তু মন ঘোলাটে হয়ে উঠল।

ঘন-সবুজ জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখি। চারিদিকে বিশাল বনস্পতি। তারই মাঝে মাঝে কাটা-গাছে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে!

শ্যাম-বনানীর শ্যামল অঙ্গে নখরাঘাতের ক্ষতচিহ্ন!

॥ ১৩ ॥

গঙ্গাস্নান সেরে তৃপ্ত মনে ফিরছি, হঠাৎ এমন সময় কোথায় যেন পা দিয়ে ফেলেছি,—ব্যবসায়ী সাধুর আশ্রম থেকে বেরিয়ে মনের এমনি সঙ্কুচিত ভাব। এ মনোভাব কাটাবার উদ্দেশ্যে নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম।

একটি যুবকও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন। সারাক্ষণ খুব অল্পই কথা কয়েছেন। এঁকে সকালেও একবার দেখেছিলাম ভাণ্ডারার সময়। সব সাধুদের নেওয়া শেষ হলে সসঙ্কোচে সেই ফোকরের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের আহার্য নিয়েছিলেন। তারপর নদীর ধারে একান্তে গিয়ে বসেছিলেন।

বছর কুড়ির উপর বয়স। সুশ্রী দেখতে। লম্বা দোহারা চেহারা। দাড়ি-গোঁফ আছে, কিন্তু এখনও বেশি বড় হবার সময় হয় নি। লুঙ্গির মত একটা ছোট সাদা মোটা কাপড় পরেন—হাঁটু পর্যন্ত ঝুল। শুধু পা, খালি গা—তারই উপর একটা সুতির মোটা চাদর জড়ানো। কাঁধের উপর একটা তোয়ালে—মাদ্রাজীদের যেমন প্রায়ই থাকে—সেইটিই শুধু গেরুয়া।

জিজ্ঞাসা করলাম, এইখানেই থাকেন, না যাত্রায় এসেছেন?

যুবকটি মিষ্টি হেসে ধীরভাবে বললেন, দুটোর কোনটাই নয়—আবার দুটোই খানিকটা ঠিক। এসেছি মাত্র দুদিন। এখানে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে। কালীকম্‌লীক্ষেত্রের একটা কুটি এ-পারে খালি পড়ে আছে সাধুদের থাকবার জন্যে। সেইটে এখন দেখতে এসেছিলাম, দেখেও গেলাম—এখন অনুমতি পেলে সেখানেই থেকে যাব।

কেদার-গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলের খুব সন্নিকটেই কুটিটি। আমরাও দূর থেকে দেখেছিলাম। সাধনার অনুকূল স্থান।

তারপর অতি সঙ্কোচে বললেন, আপনারা কাল সকালেই গোমুখ রওনা হচ্ছেন?

বললাম, হাঁ, কেন—আপনিও যাবেন নাকি? বেশ তো চলুন না, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

বললেন, গোমুখ-দর্শনের ইচ্ছা তো আছে,—যেতেও নিশ্চয় হবে। তবে কালই আপনাদের সঙ্গে যাব কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না।

শুনেছিলাম, গোমুখের যাত্রী-সংখ্যা খুবই কম। সাধারণত দল বেঁধে যাত্রীরা এখান থেকে যান। বহু স্থানে পথ নেই, পথ-চিহ্নও নেই। তাই পথ-প্রদর্শকের একান্ত প্রয়োজন। গঙ্গোত্রীর মত ছোট জায়গায় তারও সংখ্যা খুব কম। সাধু-সন্ন্যাসীরা সেই কারণে যাত্রীদলে যোগ দেন। দেবার আরও একটা কারণ আছে। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ দেখে ফিরে আসতে অন্তত তিন দিন লাগে। পথে কোথাও গ্রাম নেই—লোকের বসতিও নেই। তাই আহারাদিও মেলে না। যাত্রীদের প্রয়োজনমত নিজ নিজ আহার্য সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। দলে থাকলে সাধু-সন্ন্যাসীদেরও একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে আমাদের কাছেও দুই-একজন যাত্রী সাধু খবর নিয়ে গেছেন, আমরা যাচ্ছি কিনা।

এ-সব জানি বলেই এঁকেও উৎসাহ দিলাম, আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে। ছেলেটিরও যাবার প্রবল আগ্রহ আছে, অথচ সঙ্কোচও আছে।

কথা বলার মধ্যে সঙ্গীটি মাঝে মাঝে ইংরাজী কথাও বলছিল। বিশুদ্ধ উচ্চারণ—ভাষাও শুদ্ধ। কৌতূহল হল।

বললাম, কয়েকটা প্রশ্ন করব—কিছু মনে কোরো না। যদি বাধা থাকে উত্তর দিয়ো না—আমিও কিছু মনে করব না।

হাসিমুখে বললে, বলুন না, সব কিছুরই জবাব দেব। আপনি বুঝি এই দু'বার এলেন এখানে? আমার কিন্তু এই প্রথম,—হিমালয় দেখাও প্রথম। বলুন, কি বলছেন?

আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলি, সে-ও নিঃসঙ্কোচে উত্তর দেয়।

রাজপুত। রাজপুত্রের মত চেহারাও। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়ছিল—পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ। আইন-কলেজে আইনও পড়ছিল। সে-কলেজে আমিও কিছুকাল পড়িয়েছি। তবে এ আমার ছাত্র নয়,—হতে পারত। স্নেহ-সূত্র যেন দৃঢ় হয়ে উঠে।

কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কয়েকজনের নাম করল,—সবাইকে চিনি।

কথা বলতে বলতে ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ফেলে-আসা-জীবনের কয়েকটি স্মৃতি-রেখা,—যেন পুরানো চিঠি পড়ার আস্বাদ।

বাড়ির কথাও বললে। স্বচ্ছল সংসার। কিন্তু সংসার তাকে কোনদিন বাঁধতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ ছিল,—কিন্তু সে আকর্ষণও তাকে টেনে রাখতে পারে নি।

বলতে বলতে তার কণ্ঠ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল,—বললে, আজ এক বছর আগে সব ছেড়ে বেরিয়ে

পড়েছি। ঘুরেছি অনেক, শাস্ত্রগুলি পড়ছি, এখন হিমালয়ে এসেছি—নিভৃতে একান্তে বসব।

মুখের পানে তাকিয়ে দেখলাম, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, ওষ্ঠাধরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অন্তরে অটল বিশ্বাস।

সন্ন্যাসী রাজপুত্র! মনে মনে প্রণাম করলাম।

ধর্মশালার কাছে চলে এসেছি। তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, কালকের যাত্রার কথা। ভাবলাম অপরিচয়ে বাঁধন টুটল। কাল পথে যেতে যেতে দেখব তার মনের গোপন গতি। কেন সে এত পেয়েও সব ছেড়ে এল? কি সে চায়?

কিন্তু তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। গোমুখ-যাত্রার সময় তার খোঁজ করেছিলাম, শুনলাম, আমাদের কিছু আগেই দুজন সাধু গেছেন—হয়ত তাঁদের সঙ্গে গেছে, পথেই দেখা হবে। কিন্তু পরে জানলাম, তাঁদের সঙ্গেও সে যায় নি।

না যাওয়ার কারণও অনুমান করলাম। এ যাত্রা-পথে অপরের কাছে কোন কিছু সাহায্য নেওয়ার সঙ্কোচ বোধ করি সে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

আরও এক কারণ হয়ত আছে। সেদিনের সেই স্বল্প-আলাপনের অন্তরে প্রীতির সৌরভ ছিল।

তাই সম্ভবত তার সন্ন্যাসী-মন স্নেহের সামান্য স্পর্শে মায়া-ভ্রমে ভীরু বিহঙ্গমের মত পালিয়েছে।

অথচ প্রেম মাত্রেই তো মায়া নয়!

তার ক্ষণিকের পরিচয় আমার মনে আনন্দের দীপ জ্বেলে দিল। সেই ব্যাপারী সাধুর অসাধু-সঙ্গের আঁধার ঘোচাল।

॥ ১৪ ॥

আমাদের গোমুখ-যাত্রার সব আয়োজন প্রস্তুত।

বিরাট কিছুই নয়;—যা কিছুর একান্ত প্রয়োজন, তারই আয়োজন। শুধু খাওয়া-পরা-শোওয়ার ব্যবস্থা—কিন্তু তাই কি কম?

সঙ্গের কুলি দুটি নেপালী। হৃষীকেশ থেকেই সঙ্গে আছে। তাদের সঙ্গে এবার আমার অদ্ভুত ব্যবস্থা। চল্লিশ দিন হিমালয়ে কাটাব। যেখানে খুশি যাব, যতদিন খুশি থাকব। হৃষীকেশ থেকে দু'মাইল গিয়েও থেকে যেতে পারি, আবার হিমালয়ের কোন অজানা হিমশিখরেও এক মাস কাটাতে পারি। জিজ্ঞাসা করি, সব ভেবেচিন্তে বলো—এই চল্লিশ দিনের জন্যে কত নেবে,—খাওয়া-দাওয়া সব তোমাদের, সে-সব ঝঞ্ঝাট আমি বইতে পারব না।

তারা অনেক ভেবে বলে, বাবুজি, তাহলে এক-একজনকে একশ' কুড়ি টাকা করে দিতে হবে। দেখুন, জিনিসপত্রের দাম—

আমি কথার মাঝে ছেদ টানি। বলি, কারণ দেখানোর দরকার নেই। বেশ, ঐ টাকাই পাবে। ভালভাবে কাজ করো ত বখশিসও পাবে।

তারা খুশি হয়ে কাজে লাগে।

কাজ শুধু মোট বওয়া। কিন্তু সব সময়ে সব কিছু কাজে এগিয়ে আসে সাহায্য করতে—স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে।

আশ্চর্য তাদের শারীরিক শক্তি! এক মণ ভারী বোঝা পিঠের উপর নিয়ে স্বচ্ছন্দে চড়াই উঠে এসেছে।

তাদের পথ-চলার একটা ছন্দ আছে, আনন্দও আছে। দেখতেও আনন্দ।

সেবা তাদের শুধু কর্তব্যই নয়—ধর্ম। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে পরকে পরম সেবা করার এরা জীবন্ত উদাহরণ।

এদের বিশ্বাস করে কখনও ঠকতে হয় নি। কেউ ঠকেছে বলে শুনিও নি। মানুষ যে অবিশ্বাসী হতে পারে—এইটেই এদের কাছে অবিশ্বাস্য।

এরা অতি দীন-দরিদ্র। তবুও আত্মমর্যাদার মান জানে। তাই দারিদ্র্যও এদের গৌরব—দীন হলেও হীন নয়। নদীর জলে স্নানের কালে, ঝরনার ধারে বা গাছের ছায়ায় রাঁধার সময় এদের সাজ দেখেছি। উলঙ্গই বললে চলে, একটি কৌপীনমাত্র সার। এরাও হিমালয়ের এক শ্রেণীর যথার্থ সাধু।

হাত জোড় করে পায়ের কাছে দুজনে এসে বসল। কি যেন বলতে চায়, অথচ এদের সঙ্কোচ জাগে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে রে?

আস্তে আস্তে বলে, বাবুজি, এ তিন দিন আমাদের খাওয়া-দাওয়ার কি হবে? গোমুখ ত আমরা কখনও যাই নি। শুনছি—ওদিকে গ্রাম বা দোকান নেই—কোন খাবার মেলে না।

বললাম, এই ব্যাপার! এর জন্যে ভাবনা? এ কদিন গঙ্গোত্রী এসেও তো তোদের খাওয়ার কথা ভাবতে হয় নি—যদিও খাবার ব্যবস্থা তোদের নিজেদেরই করার কথা,—মনে আছে তো?

দুজনেই হাসে, কপালে হাত ঠেকায়। বলে, জি বাবুজি।

বললাম, তবে ও-কথা ভাবছিস কেন? যদি আমাদের খাবার মেলে, তোদেরও নিশ্চয় মিলবে। আর যদি আমরা খেতে না পাই, তোরাও পাবি না!

ওরা আবার হাত তুলে নমস্কার করতে থাকে। বলে, এ ঠিক আছে, বাবুজি।

কিন্তু, এদিকে মালের বোঝা ভারী হয়ে গেছে—যে কজন দলে আছে, সবারই খাবার নিতে। উপায়ই বা কি?

ভরসা এইটুকু, ফেরবার পথে এ-সব আহার্যের বোঝার ভার লাঘব হয়ে অন্যত্র ভার বাড়াবে।

কুলিদের গোমুখের শীতে যাতে অসুবিধা না হয়, তাই ধর্মশালা থেকে কয়খানা কম্বলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিড়িও নেওয়া হয়েছে তাদের জন্যে। শীতের মধ্যে একটু মৌতাত পায়, পথ-চলার ক্লান্তিও হরণ করে, শুনি। হবেও বা।

শুধু বলি, বাপু, রাত্রে যদি একঘরে শুয়ে থাকিস—ওটা খাস নে। ওর গন্ধ সইতে পারি না—ভাল সিগারেটের গন্ধে কষ্ট কম, কিন্তু তা পাচ্ছিস কোথায়?

সব কথা বোঝে কিনা বুঝি না।

শুধু দেখি, গভীর কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়, জোড়হাতে নমস্কার করতে থাকে।

সকালে সকলে একসঙ্গে রওনা হলাম।

বহুদিন ধরে শুনে এসেছি,—গোমুখের পথ—দারুণ দুর্গম। সাধু-সন্ন্যাসীরা যায়,—নইলে যাত্রীদের মধ্যে খুব কমই যেতে সাহস পায়। আমরা সাধুও নই, সন্ন্যাসীও নই, অসীম সাহসের অধিকারীও নই। তবুও যাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। দুর্গমতার কাহিনী, কেন জানি না, মনে ভয় জাগায় না, আকর্ষণই করে।

মনে পড়ে, যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ—

কিন্তু তখনই মনে হয়, ঠিক তাই বা কই? এ ত বিনাশের কথা নয়। এ যেন ঈপ্সিত-প্রাপ্তির আশার আলো,—প্রিয়-মিলনের মধুর অভিসার।

তাই মনে ভয়ের ছায়া নেই, আশা-আনন্দের দীপ্তি রয়েছে।

কিন্তু ফুলের কাঁটার মত এই আনন্দেও ব্যথা অনুভব করি।

মা-র বড় ইচ্ছা ছিল আসবার। আনি নি,—কেননা তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙেছে। এ-পথে ডাণ্ডী চলে না, তাই তাঁর পক্ষে সব পথ হেঁটে যাওয়া অসম্ভব।

তিনি এলে খুশি হতেন, তৃপ্তি ও শান্তি পেতেন,—জানি বলেই মনে ব্যথা জাগে।

তাই যাত্রা-মুখে তাঁকে স্মরণ করি, প্রণাম করি আর বলি, আমার এ-চোখ দুটি তোমারই দেওয়া, এ-চোখে তুমি দেখো। আমার দেখার সব আনন্দ, সব তৃপ্তি, সব পুণ্য তোমারই হোক। তোমারই তৃপ্তিতে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি।

মনে মনে মাকে প্রণাম করি, মন্দিরে গঙ্গাদেবীর মূর্তি মায়েরই মূর্তিকে স্মরণ করায়।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি। ওপারে সেই মহাত্মা সাধু গঙ্গাস্নান সেরে চলেছেন।

আশার আলো আরও প্রোজ্জ্বল হয়। মনে হয়, প্রভাতে উঠিয়া ও-মুখ হেরিনু দিন যাবে মোর ভালো।

পুল পার হয়ে গঙ্গার অপর পারে এলাম।

গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাবার কোন বাঁধাধরা নির্দিষ্ট পথ নেই। যতদূর সম্ভব, গঙ্গার ধারা ধরে যেতে হবে। সাধারণত গঙ্গোত্রীর অপর পার দিয়েই যেতে হয়। যদি কোন বছর সে-পার দিয়ে চলাচল অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন এ-পার দিয়ে যাতায়াতের চেষ্টা হয়। কিন্তু এ-পারের পাহাড়গুলি অনেক জায়গায় একেবারে জলের ভেতর থেকে উঠেছে—তাই চলাচল আরও কঠিন।

এ বছর আমাদের আগে আরও একটা দল অপর পার ধরেই গিয়েছিলেন, তাই আমরাও সেই পথই ধরেছি।

সাধুদের আশ্রমগুলি ছাড়িয়ে এলাম। এ-টুকু জানা পথ, পথও আছে।

গঙ্গার অপর পারে কিছু দূরে গঙ্গোত্রীর মন্দির, ঘরবাড়ি—এমন কি লোক-চলাচলও দেখা যাচ্ছে।

এইবার দাঁড়িয়ে দলের হিসাব নেওয়া গেল।

॥ ১৫ ॥

কলিকাতা থেকে এসেছি আমরা তিনজন।

হৃষীকেশ থেকে পেলাম দুই কুলি।

রান্নার ও কাজকর্ম দেখার জন্যে সঙ্গে এসেছে উত্তরকাশীর একটি ছেলে। ভরত সিং—ওরফে ভর্তু। করিৎ-কর্মা, চালাক-চতুর; সম্পূর্ণ বিশ্বাসী—সেটা এই হিমালয়েরই অবদান। আমাদের খুচরা জিনিসপত্রের থলিটি সে পিঠে বয়—ফ্ল্যাস্ক, ক্যামেরা, বাইনোকুলারও। ধর্মশালায় পৌঁছুবার দুই-এক মাইল আগে ত্বরিত-গতিতে চলে যায়, জায়গা দেখে ঘর বেছে পরিষ্কার করে রাখে; কখনও কখনও রান্নাও চড়িয়ে দেয়। মনে স্ফূর্তি রাখে, কাজে আনন্দ পায়। চমৎকার ছেলে।

পাণ্ডার ছেলেও চলেছে। সে-ও ছোকরা, তবে যাত্রীর কাছে পাণ্ডার যে একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে—সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। কেবল এসে খোঁজ নেয়, আর কি সেবায় লাগতে পারি, বাবুজি? বেশ ভাল করে আর একবার চা তৈরি করিয়ে আনি?

চা ত নয়, তার এক অপরূপ স্বাদ। অনেকখানি দুধ, অনেকখানি চিনি—তবেই হল ভাল চা। আর 'বেশ ভাল' অর্থে হল—তাতে লবঙ্গ-দারচিনি সিদ্ধ, এলাচের গুঁড়ো দেওয়া। হাসিমুখে বলে, বাবুজি, এ 'এস্‌পেসাল্' চা আছে—'বহুৎ বড়িয়া'!

অদ্ভুত লাগলেও, খারাপ নয়। খেয়ে শরীর গরম বোধ হয়।

সে-ও চলেছে সঙ্গে। গোমুখ-পথে তারও এই প্রথম যাত্রা।

গঙ্গোত্রী-বাসী এক সাধুও চলেছেন। নাগাও নন, মৌনীও নন। গেরুয়া বাস; একটা মোটা কম্বলও নিয়েছেন। কথাবার্তায় ভালই বোধ হয়।

শুনলাম, আরও দুজন সাধু এগিয়ে গেছেন। পথে দেখা হবে।

সকলেই এ-পথের নবীন যাত্রী। শুধু পথ-প্রদর্শকটিরই পরিচিত পথ। গঙ্গোত্রীর লোক। চেহারা দেখেই চমকে উঠলাম। বেঁটে-খাটো ছোট্ট মানুষ। রোগা লিকলিক করছে। পরনে জুতো, পায়জামা, গায়ে ওভার-কোটের তলায় ওয়েস্ট-কোট। প্রৌঢ় বয়স। মুখে হাসি নেই—স্ফূর্তিরও কোন লক্ষণ নেই। অথচ নাম শুনলাম শ্যামসুন্দর। তার চেহারা দেখেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাপু, পারবে তো যেতে?

শুনে বোধ করি অপমান বোধ করলে। বললে, বহুবার গেছি ওখানে। এ-বছরেও তো এই কদিন আগে যে-দল গেল—তার সঙ্গে ছিলাম। শরীরে আমি কম তাগদ রাখি! আপনাদের ঐ লম্বাচওড়া কুলিদের চেয়ে ঢের বেশি।

তাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হানে। নিজের পিঠের উপর তার নিজেরই কম্বলের ছোট্ট বোঝাটি সোজা করে নেয়।

তারপর গম্ভীর মুখে বলে, চলুন বাবু, দেরি করবেন না। সামনে অনেক পথ, ভারি চড়াই—সন্ধ্যার আগে ডেরায় পৌঁছুতে হবে।

উত্তরে বলি, বাপু, তোমার সঙ্গে তো আমরা তাল রেখে চলতে পারব না। তুমি জোয়ান আদমী। আমরা ধীরে ধীরে চলব—যেমন যাচ্ছি। পৌঁছুতে না পারি—পথের ধারেই পড়ে থাকব। যদি বাঘ-ভালুক আসে, খেয়েই ফেলবে। যাত্রীকে সেবা করা যদি পুণ্য হয়, যাত্রীকে উদরে পুরে সেবা করলে নিশ্চয় আরও পুণ্য হবে!

নিজের প্রশংসাটুকু বুঝে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে। এরই আর এক রূপ দেখেছি তার কিছু পরেই।

একটা বড় চড়াই ওঠা হয়েছে। সবাই ক্লান্ত, সে-ও শ্রান্ত। হবারই কথা।

দেখি, কুলিদের বোঝার উপর তার নিজের কম্বলের ছোট্ট বোঝাটিও চাপিয়ে দিচ্ছে। কুলিরা আপত্তি

করছে, করার যথেষ্ট কারণও আছে। তাদের নিজেদের বোঝা বেশ ভারী, তবুও তাই নিয়ে তারা ধীরে ধীরে চলেছে। তার উপর আরও ভার চাপলে—তা সে যত সামান্যই হোক—তাদের বিরক্ত হবারই কথা।

তারা রুষ্ট হয়ে আপত্তি জানায়, বলে, বাবুজিদের কাজ করতে এসেছি—তোমার মোট বইব কেন?

লোকটি বাস্তবিকই ক্লান্ত হয়েছে। অনুনয়ের সুরে কুলিদের বলে, ছোট্ট বোঝা, এইটুকু নিয়ে নাও ভাই।

কুলিরা ছাড়ে না, ছোট্ট বোঝা তা তুমি নিজেই বও না!

আমি তার অসহায় অবস্থা দেখে কুলিদের নিতে বলি। তারা নেয়ও। নেবার সময় হাসতে হাসতে তাকে বলে, এবার চলে এসো, তুমি নিজেও এসে পিঠে বসে পড়ো। শরীরে খুব তাগদ রাখো, নয়!

তার শক্তিময় দম্ভকে ব্যঙ্গ করে।

॥ ১৬ ॥

পথেরও স্রষ্টা আছে। তা সে মানুষই হোক, কি পশুই হোক। বার বার একই স্থান দিয়ে চলাচলের ফলে পায়ের তলায় পথ জেগে ওঠে। আর মানুষ যদি হাতে তৈরি করে তো কথাই নেই।

এখানে দুটোর কোনটাই খাটে না। রাস্তা-তৈরির প্রশ্ন ওঠে না, কেননা সারা বছরে এত কম লোকই যায় যে, সেই কয়জনের সুবিধার জন্যে এত অর্থব্যয় করবে কে ও কেন?

তাছাড়া অর্থ-ব্যয়ও যদি হয়, প্রকৃতির প্রকোপে পথ থাকতে পারে না। পাহাড় ধ্বসে পড়ে, জলের ধারা নামে, বরফে ঢাকা পড়ে, বরফ গললে পাহাড়ের আকৃতিরও পরিবর্তন হয়। মানব-সৃষ্ট ভঙ্গুর পথের এত আঘাত সইবার শক্তি নেই।

লোক-চলাচলেও পথ-সৃষ্টির আশা নেই। সামান্য কয়েকজনের চকিত চরণপাতে পথের চিহ্ন জাগে না। আর, সে চিহ্ন পড়বেই বা কোথায়? নদীর ধারে বালির উপর, অথবা মনের ভিতর মাটির ওপরে চরণ-রেখা আঁকা সম্ভব বটে, কিন্তু এখানে যে প্রায়ই পাথর। মানুষ তো দেবতা নয়, যে পাষাণের বুকেও চরণ-চিহ্ন ফুটে উঠবে।

অনেকদিন আগেকার কথা মনে জাগে।

চিত্রকূট বেড়াতে গেছি। রামায়ণের সেই স্মৃতি-ভরা চিত্রকূট। বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যে সব ঘুরে ফিরে এসেছি। রামায়ণের কত কাহিনী আবার নতুন করে শুনছি। এখানে এই হয়েছিল, ওখানে ঐ ঘটেছিল। এক জায়গায় প্রকাণ্ড একটি সমতল পাথর;—কে যেন ধরণীর দেহ পাথরে বেঁধে দিয়েছে। তারই উপর দাঁড়িয়ে আছি। এখানকার স্থান-মাহাত্ম্যের কাহিনী শুনছি।

এইখানেই 'ভরত-মিলাপ' হয়েছিল—রামচন্দ্রের সঙ্গে ভরতের মিলন। সীতাদেবী ছিলেন, লক্ষ্মণ ছিলেন, আরও সব কে কে। বনের পশু-পক্ষীরাও এই মধুর মিলন দেখতে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিরহবিধুর দুই ভাই-এর মিলন—উভয়ে আলিঙ্গন করে স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়েছিলেন;—'ভেটত ভুজ ভরি ভাই ভরত সো।' এই করুণ দৃশ্য দেখে সবারই চোখে ধারা বয়েছিল। পাষাণও দ্রবীভূত হয়েছিল। তাই পাষাণের বুকেও সবারই পদচিহ্ন পড়েছিল।

চিত্রকূটবাসী একজন দেখাচ্ছিলেন,—এই দেখুন, এইটে রামচন্দ্রজির, এইটে ভরতের,—এই এদিকে সীতাদেবীর; এই দেখুন সব পাখির পায়ের ছাপ, এই এখানে সব বনের পশুর।

শুনছি আর দেখছি। আশ্চর্য লাগে, পাথরের উপর এই অদ্ভুত চিহ্নগুলি। মানুষের তৈরি নয়, দেখলেই বোঝা যায়। কোন স্বাভাবিক প্রকৃতিগত কারণে পাথরের উপর বিচিত্র এই সব রেখা। কোন-কোনটি মানুষের পায়ের ছাপের মতই লাগে, কোনটি বা পশু-পক্ষীর মনে হয়।

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞের মত নিশ্চয় বিজ্ঞানসম্মত এর কোন কারণ নির্দেশ করবেন। তা করুন, বাধা নেই।

তবে সেই অপূর্ব আবেষ্টনীর মাঝে এই বিচিত্র রেখাগুলির সাহায্যে কারও কল্পনা-বিলাসী বিশ্বাসী মন যদি রামায়ণের সেই করুণ কাহিনীর আলেখ্য এঁকে ক্ষণিক তৃপ্তি পায়, তাতেই বা ক্ষতি কি!

সেই এক দেখেছিলাম, পাথরের বুকে সব পদ-চিহ্ন!

এখানে গোমুখের পথে সেই দেবতাদের চরণ-চিহ্নও নেই, মানুষের পায়ের ছাপও নেই।

তবে পায়ের চিহ্ন না থাকলেও হাতের চিহ্ন রেখে যাবার প্রয়াস আছে। মাঝে মাঝে পূর্বগামী যাত্রীরা পাথরের উপরে ছোট ছোট কয়েকটি পাথর বসিয়ে, বা সাজিয়ে রেখে যান—দেখলেই বোঝা যায় মানুষের হাতের স্পর্শ। পরের যাত্রীরা তাই দেখে অনেক সময় চলেন।

এ যাত্রা-পথে এই একমাত্র সামান্য পথ-নির্দেশ।

॥ ১৭ ॥

সেই পথেই চলেছি আমরা।

কখনও গঙ্গার ধারার খুব কাছ দিয়ে, কখনও বা পাড়ের কিছু উপর দিয়ে। দুই কূলেই গগনস্পর্শী গিরিশ্রেণী। ও-পারের পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। যেন তেজোদীপ্ত ব্রাহ্মণ। তাম্রকান্তি দেহের উর্ধ্বাঙ্গে তুষার-শুভ্র উত্তরীয়। তুষার-নিঃসৃত নির্ঝরিণীগুলি যেন বুকের উপর যজ্ঞোপবীত।

এ-পারের পাহাড়ের চূড়া মাথা তুলেও দেখা যায় না।

হঠাৎ সামনে দেখি বিশাল পাথরের স্তূপ গতি-পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। জলের ভিতর থেকে সোজা উঠেছে পাহাড়ের মাথার দিকে। সে-সব পাথর বেয়ে ওঠার ক্ষমতা আমাদের নেই। গাইড-এর শরণাপন্ন হই। দিক্-ভ্রম হয়নি তো?

জিজ্ঞাসা করি, যাব কোন্ দিক দিয়ে?

ইতিমধ্যে সে একটা পাথরের একটু উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা পা বেঁকিয়ে পাথরের উপর রেখেছে, কোমরে একটা হাত, অপর হাত দিয়ে দেখাচ্ছে—ঐ! ঐ ধার দিয়ে যেতে হবে, উঠে আসুন এই পাথরটার পাশ দিয়ে সাবধানে।

কলোম্বাসের আবিষ্কারের উচ্ছ্বাস!

পাথরের পাশ দিয়ে গিয়ে একটু উঠেই দেখলাম—প্রকৃতির অভিনব পথ-সৃষ্টি। দুইটি বিশাল পাথর, মাঝখানে সামান্য ফাঁক আছে, একটু উপরে মাথায় মাথায় স্পর্শ করেছে। এইভাবে একটি সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। সুড়ঙ্গটি ধীরে ধীরে উপরদিকে উঠে গেছে। এদিক থেকে তাকালে উপরে অপরদিকে সুড়ঙ্গের আর একটি মুখ দেখা যায়! ভিতরে নানান আকারের ছোট-বড় পাথর—তারই উপর চীরগাছের কয়েকটি শুকনো গুঁড়ি পড়ে আছে। সেই পাথর ও গাছের উপর দিয়ে যেতে হবে। এ-মুখে যেখানে দাঁড়িয়ে দেখছি তার চার-পাঁচ হাত দূরেই গঙ্গার প্রবল প্রবাহ। পাথরে গতিরোধ হওয়ায় উচ্ছলিত তরঙ্গে জলকণার ফোয়ারা সৃষ্টি করছে। আমাদের মুখে চোখে তার সজল স্পর্শ সানন্দে অনুভব করছি। মকরবাহিনী যেন তাঁর বাহনের পুচ্ছ-তাড়নায় হিমালয়কে সরিয়েই দিতে চান।

তবুও এই উগ্রমূর্তির পাশে সুড়ঙ্গের পথটুকু বিচিত্র হলেও ভয়ানক নয়। পদস্খলনের আশঙ্কা থাকতে পারে, কিন্তু তাতে গঙ্গাপ্রাপ্তির পুণ্যলাভের আশা নেই। পড়লে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যেই তিন-চার হাত নীচে পড়তে হবে,—তাতে হাত-পা ভাঙার হয়ত সম্ভাবনা—তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু তাও হয় না।

এক সঙ্গীর ডাকে তাকিয়ে দেখি, সুড়ঙ্গের ঠিক পাশেই একটি প্রকাণ্ড গুহা। গুহার ভিতর শেষদিকে পাহাড়ের গায়ে বেদীর মত একটি উঁচু পাথর। তারই উপর পা ঝুলিয়ে সঙ্গীটি বসেছেন—যেন অজন্তার গুহার মাঝে বুদ্ধ-মূর্তি। সেখান থেকে গঙ্গার ধারা অতি সুন্দর দেখায়। গুহার ভিতরটিও পরিষ্কার। মনে হয়, কোন সাধুর সাধনার স্থান ছিল।

সুড়ঙ্গ-পথ পার হয়ে আবার পাহাড়ের গা দিয়ে পথ। গঙ্গার ধারেই একটি ছোট জঙ্গল। সবই দেওদার গাছ—মাঝে মাঝে ভূর্জপত্র। নানান রঙের পাখি ঘুরছে।

জঙ্গল পার হয়েই এক বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে এসে পৌঁছুলাম। চারিদিকে কেবলই নানান আকারের গোলাকৃতি পাথর। যেন পাহাড়ের মাথার উপর থেকে শুধু গোল পাথরের এক বিপুল স্রোত নেমে এসে গঙ্গায় গিয়ে পড়ছিল, এমনি সময়ে কার যেন শাসনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পাথরগুলির অপূর্ব বর্ণবিন্যাস। সাদা গোলাপী অথবা হলুদ রঙের বড় বড় গোল পাথর—সারা অঙ্গে কালো কালো বিন্দু। কে যেন কলমের কালি ছিটিয়ে দিয়েছে।

একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হচ্ছে। এমনি করেই এই

প্রস্তর-প্রান্তর উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রথমে আশঙ্কা হয়েছিল, হয়ত মসৃণ পাথরের উপর পা পড়লেই পিছলিয়ে যাবে,—কিন্তু তা কোথাও যায় নি। দ্বিতীয় আশঙ্কা, দেহের ভার পেলেই নিশ্চল পাথর হয়ত সজাগ হয়ে হেলে উঠবে—গতির বেগে হয়ত পদচ্যুতি ঘটবে। সে-রকম দুরন্ত পাথরের সঙ্গে মাঝে মাঝে পরিচয় ঘটছে, তাই স্বচ্ছন্দে চলার ছন্দপতনও হচ্ছে। সতর্ক গতিতে পাথরের ভারসাম্য বিচার করে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু অল্প সময়েই দেখি, পাথরগুলির সঙ্গেও যেন নিবিড় পরিচয় হয়ে যায়, দেখলেই চেনা যায়—কার উপর নির্ভয়ে দেহ-ভার দিয়ে বিশ্বাস করতে পারব।

গাইড বলে, বাবুজি, গোমুখের পথের প্রধান বৈচিত্র্য হল এই সব পাথর, কেদার-বদরীর পথে এমন নেই—কেবলই লাফিয়ে লাফিয়ে এখানে যেতে হবে। এরকম অনেক জায়গাতেই পাবেন।

সঙ্গী একজন বলেন, তাতে ক্ষতিও নেই, ভয়ও নেই। বরং বেশ ভালই তাড়াতাড়ি চলা যাচ্ছে—লাফিয়ে চলায় স্পীড বাড়ছে।

হেসে বলি, লাফিয়ে চলার অভ্যাসটি যাবে কোথায়?

সবাই সানন্দে এগিয়ে চলি। কিন্তু কোন্‌দিকে যাচ্ছি না যেতে হবে বুঝি না। কিছু নীচেই গঙ্গার স্রোত বয়ে চলেছে। শুধু বুঝি, ঐ গঙ্গারই উৎস-মুখে চলেছি। কিন্তু নদীর গতি-পথ সরল রেখায় তো চলে না। উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীর প্রাচীর ভেদ করে পথ খুঁজে খুঁজে পার্বত্য নদী উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে। চলেছি হয়ত উত্তরমুখে, গাইড দেখায় পূর্বদিকে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়া, বলে, বাবুজি, ঐ—ঐ পাহাড়ের পিছন দিয়ে আমরা যাব।

মনে পড়ে, গঙ্গাসাগর যাবার কথা। স্টীমারে গঙ্গার উপর দিয়ে চলেছি হয়ত দক্ষিণমুখে। সারেঙ দেখায় পশ্চিম দিকের আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, বলে, ও-ধার দিয়ে স্টীমার আসছে—নদী গেছে ঐ দিক দিয়ে ঘুরে।

আবার মনে পড়ে, উড়ে চলেছি প্লেনে আকাশ-পথে। নীচে তাকিয়ে দেখতে থাকি, বড় বড় নদীর গতি-পথ—সবুজ পৃথিবীর বুকে বালুকাময় স্বর্ণ-রেখা—সর্পিল ভঙ্গিতে এঁকেবেঁকে চলেছে।

নদীর বিচিত্র গতি।

চারিদিকে অচল হিমাচলের ধ্যান-স্তিমিত মূর্তি, তারই মাঝে সচল নদীর উচ্ছল জলোচ্ছ্বাস।

দেবাদিদেব মহাদেবের শিরশীর্ষের জটাজালে এই-ই বুঝিবা গঙ্গাবতরণ!

গঙ্গার অপর পারে দৃষ্টি পড়ে। ধারার কিছু উপরেই সামান্য সমতলক্ষেত্র। তারই একধারে ছোট একটি গুহা। গুহার বাইরে ছোট ছোট কয়েকটি সাজানো পাথর মানুষের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়।

গাইড বলে, এক বড় সাধুর আশ্রম ছিল। একাই সাধনা করতেন ওখানে। যাত্রীদের মধ্যে ক্বচিৎ কখনও কেউ কেউ এসে দর্শন করতেন। মহাপুরুষ ছিলেন। আজ কিছুকাল হল দেহরক্ষা করেছেন।

এখন শূন্য আশ্রম ভাঙা মন্দিরের মত পড়ে আছে।

এই নিভৃত-বাসের মধ্যে তিনি কি পেয়েছিলেন, কি দিয়ে গেছেন, তার সন্ধান কে দেবে, তাই ভাবি।

॥ ১৮ ॥

ধীরে ধীরে সাবধানে এগিয়ে চলেছি। পূর্বগামী যাত্রীদের রেখে-যাওয়া সাজানো ছোট ছোট পাথরগুলির উপর দৃষ্টি আছে। গাইডের ডাকে চমক লাগে। তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের উপর দিকে সে উঠে গেছে অনেকখানি।

আমরা গঙ্গার তীরের দিকে নেমে চলেছি। দুদিকেই সাজানো পাথরের পথ-নির্দেশ।

গাইড বলে, উপর দিক দিয়েই যেতে হবে—নিচের পথে পুরানো চিহ্ন—ওদিকে এখন পথ নেই।

অতএব উপর দিকেই উঠতে হয়।

পাহাড়ে ওঠার স্বাভাবিক কষ্ট তো আছেই, ক্লান্তি বোধ হয় আরও এই ভেবে যে শেষ পর্যন্ত গঙ্গার ধারে তো নামতেই হবে, তবে কেন এই অকারণ আরোহণ! কিন্তু পাহাড়-পথে চলার এই-ই তো রীতি। তাই সন্তর্পণে অতি ধীরে ধীরে উঠতে থাকি। উপর থেকে নদীর ধারা-পথ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর দেখাতে থাকে।

সঙ্গের কুলি দুটি দলের সঙ্গে নেই দেখে চিন্তিত হই। কোন সময়ে যূথভ্রষ্ট হয়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা

করা হয়। শিস্ দিয়ে গাইড ইশারা করে—পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি ওঠে—তবুও তাদের কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

সব মালপত্র তাদের কাছে। সে-সব হারাবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই। কিন্তু তারা পথ হারালে তাদের বিপদ আছে, ভাবি। বিরাট পাহাড়গুলির মাঝে নগণ্য দুটি মানব-শিশু। খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, তাই চেষ্টাও বৃথা। অগত্যা তাদের পথ-চেনার সহজ বিচার-বুদ্ধির উপর ভরসা রেখে আমরা এগিয়ে চলি।

পাথর ডিঙিয়ে চলা আপাতত শেষ হয়েছে। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে চলেছি। সামনেই বিরাট ধ্বস নেমে গেছে বহু নীচে নদী পর্যন্ত। পাহাড়ের গায়ে পা রাখার মত স্থানও নেই, তাই এগোবারও উপায় নেই। গাইড থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই বুঝতে পারি, ভুল পথে চলে এসেছি। নদীর দিকেই নেমে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখন এখান থেকে বহু নীচে নদীর দিকে তাকাতে মাথা ঘোরে, সোজা নামতে পারব কিনা সন্দেহ জাগে।

অযথা এতখানি পাহাড়ে ওঠার সময়ও লেগেছে, শ্রান্তিও হয়েছে। গাইড্-এর উপর রাগ ও বিরক্তি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য, সে মনোভাব আসে না। সকলেই সানন্দে সব কিছু মেনে নিই। কারও উপর দোষারোপ করি না। ভাবি, এ-যেন স্ব-কৃতকর্মের ফল। এই পথিক-জীবনে এমনি বিপর্যয় যেন স্বাভাবিক পর্যায়। এতে চঞ্চল বা বিক্ষুব্ধ হলে এখানকার শান্তিময় জীবনধারায় অশান্তির সৃষ্টি করবে। অন্তরে বিশ্বাস রাখি, যে মহান্ আকর্ষণ এখানে এনেছে, সে-ই ঠিক গন্তব্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সকলেই হাসিমুখে প্রকৃতির বিরাট শক্তিকে উপলব্ধি করি, তারই মাঝে পথের কাণ্ডারীর সন্ধান করি।

বহু নীচে গঙ্গার কিনারায় বিক্ষিপ্ত নিশ্চল পাথরগুলির মধ্যে ছোট্ট দুটি সচল জীবের ইঙ্গিত পাই। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখি। আমাদের কুলি দুটি! এ-পথে নতুন হলেও তারা ঠিকই গেছে। এখন আমরা ভুল-পথে আটকে গেছি দেখে তারা বোঝা ফেলে ছুটে এগিয়ে আসছে আমাদের সাহায্য করতে।

কি করে যে তারা পাহাড়ে উঠে আমাদের কাছে চলে এল বিস্ময় লাগে! উঠবার পথ নেই, পা রাখবার স্থান নেই। হাতে ভর দিয়ে কোথাও পা রেখে দেখতে দেখতে উঠে এল। মুখে অভয় বাণী। বলে, বাবুজি, হাত ধরুন, নেমে আসুন, কোন ভয় নেই।

সত্যিই মনে কোনও ভয় রাখি না। নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে তাদের হাত ধরি। দেখতে দেখতে নীচে নেমেও আসি।

গঙ্গার ধারে পাথরের উপর ক্ষণিক বিশ্রাম করে আবার পথচলা শুরু হয়।

নদীর তীরে বড় বড় পাথর। তারই উপর লাফিয়ে লাফিয়ে এসে ক্লান্ত হলেও আবার পাশের পাহাড়ে ওঠা আরম্ভ হল।

একটু উঠেই জঙ্গল। চারিদিকে শুধু ভূর্জপত্রের গাছ। বার্চ ট্রি (Birch Tree) মাটি থেকে একটু উঠেই ডালপালা বিস্তার করেছে। আঁকাবাঁকা শাখা। সবুজপাতার মাঝে সাদা সাদা ডালগুলি, গাছের গুঁড়িগুলিও সাদা। চারিদিকে সাদা রঙের দীপ্তি ছড়িয়েছে। গাছের ছাল টেনে তুললেই পাক খেয়ে খুলে আসে। মসৃণ কাগজের মত। যত টেনে তোলা যায়, পাকের পর পাক খোলে। ডালের ক্ষত অঙ্গ রক্তাভ হয়ে ওঠে। টেনে তোলা ছালের রঙও রাঙা হয়ে আসে। গাছের একটা নীচু ডালের উপর পা ঝুলিয়ে বসে একজন সাথী সেই ভূর্জপত্রের উপর ফাউন্টেন-পেন দিয়ে চিঠি লেখেন।

গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর দিকে ভূর্জপত্রে লেখার প্রচলন এখনও কিছু কিছু আছে। জিনিসপত্র জড়িয়ে নেবার কাজেও এর ব্যবহার প্রচুর। আমাদের দেশে যেমন কলা বা শাল পাতায় খাওয়ার প্রথা আছে, এখানে ভূর্জপত্রেরও তেমনি ব্যবহার হয়।

ভূর্জপত্র! নাম শুনেই যেন কোন্ প্রাচীন যুগে মন চলে যায়।

তারই বিচিত্র বনানীর প্রান্তে বসে আমাদের দ্বিপ্রহরের আহার।

গঙ্গার তীর থেকে অনেকখানি উঠে এসেছি, তাই জলের অভাব। গাইড বলে, কোন ভাবনা নেই, কাছেই ঝরনা আছে, পাত্র দিন—জল আনছি।

পাত্র নিয়ে একটা কুলির সঙ্গে গেল, কিন্তু ফিরতে আধ ঘণ্টার উপর দেরি হল। বলে, ঝরনায় জল নেই, সব বরফ হয়ে আছে, বরফ ভেঙে গলিয়ে আনতে দেরি হল।

আহার্য,—সঙ্গে-আনা রুটি, আলুসিদ্ধ ও চুরমা। চুরমা—ঝরঝরে মোহনভোগের মত, সুজির বদলে আটার তৈরি। একবার তৈরি করলে তিন চার দিন রেখে খাওয়া যায়—নষ্ট হয় না।

যা কিছু খাবার ছিল সকলে একসঙ্গে ভাগ করে খাওয়া হল। কুলিদের বেশি করে দিই, বলি, তোমরা ভার বইছ তাই ভাগ বেশি পাবে।

খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম। বিশ্রামে সুখ থাকলেও, সামনে পথ পড়ে থাকলে সে বিশ্রামে স্বস্তি নেই। তাই আবার যাত্রা শুরু করি। খাওয়ার পর পথ-চলায় শরীর ভারী বোধ হয়। কিন্তু একটু চলার পর গতির ছন্দ আবার ফিরে আসে। দুপুরের রৌদ্রের উত্তাপ তেমন বোধ হয় না। হিম-শীতল বাতাসে বরং শীতই লাগে। বিকালে রাত্রিবাসের আবাসে এলাম।

ধর্মশালা। পাথরের একতলা বাড়ি। খানচারেক ছোট ছোট ঘর। মেঝেতেও পাথর বসানো—অসমতল। শুধু কম্বল বিছিয়ে শোওয়া বিশেষ কষ্টকর। নীচে থেকে ঠাণ্ডা তো ওঠেই, পাথরও বিঁধতে থাকে—শরশয্যার কথা স্মরণ করায়।

কুলিরা পাশের একটা ঘর থেকে লম্বা কয়টা তক্তা নিয়ে আসে, সারি সারি পেতে দেয়। বলে, এর উপর কম্বল বিছিয়ে শুলে কষ্ট নেই।

সেইমত ব্যবস্থাও হয়। কাল গোমুখ দর্শন করে এখানে ফিরে আবার রাত্রিবাস হবে। তাই মালপত্র এখানেই সব পড়ে থাকবে।

লোকজন এখানে কেউ থাকে না, চৌকিদারও নয়।

জায়গার নাম চীরবাসা (১১,৮৩০ ফুট)। মানে হয়ত চীরবনের মধ্যে বাস। কিন্তু বনও প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন চারিদিকেই কঠিন কঠোর পাহাড়, মাথায় সব বরফের চূড়া, তার থেকে এক-একটা বরফের ধারা নেমে গঙ্গার কাছে চলে এসেছে। খানিকটা বরফের উপর হেঁটে ধর্মশালায় পৌঁছুতে হয়।

ধর্মশালার সামনেই গঙ্গা। ক্ষীণকায়া, কলোচ্ছলা। তুষার-শীতল জলধারা।

গঙ্গার পরপারে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। তারই তুষারশীর্ষ থেকে বিপুল এক জলধারা সহস্র ধারায় বিচ্ছুরিত হয়ে গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

চারিদিকে যত নির্ঝরিণী সবই জাহ্নবী-জলে নিজেকে বিলিয়ে দিতে ছুটেছে।

রাত্রে গায়ের জামা কাপড় মোজা পরেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড শীত।

সঙ্গী সাধুটি মৃদুকণ্ঠে গঙ্গা-স্তব গান করছেন।

'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারি চরণ-চ্যুতম্।
ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥'

সেই মধুর সুরের মূর্ছনায় চোখে ঘুমের আবেশ আসে। সারারাত আধ-ঘুমঘোরে কেটে যায়।

॥ ১৯ ॥

অতি ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠেছি। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে সবাই তৈরি হয়েছি। রাত্রের রাখা রুটি একটা করে চায়ের সঙ্গে খাওয়া হল।

গতকাল গঙ্গোত্রী থেকে মাইল বারো এসেছি, শুনলাম। মাপা মাইল নয়, অনুমান মাত্র। সরল পথের মাপে হয়ত বারো মাইল হতে পারে, কিন্তু এখানে যেন মনে হয় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেও পথ শেষ হতে চায় না। আজও তেমনি মাপে ছয় মাইল মাত্র পথ। যেতে আসতে বারো মাইল। কিন্তু সারাদিন লাগবে এ পথ অতিক্রম করে ঘুরে আসতে।

এই চীরবাসায় ফিরে এসে আবার রাত্রিবাস। কাল এখান থেকে ভোরে রওনা হয়ে দুপুরের মধ্যেই গঙ্গোত্রী পৌঁছানো যাবে। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ আসা-যাওয়ার পথে এই একটিমাত্র আশ্রয়স্থল। সঙ্গে তাঁবু আনলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

'গঙ্গামায়ি কি জয়'—ধ্বনি তুলে যাত্রা শুরু হল।

কখনও গঙ্গার ধারার পাশ দিয়ে, কখনও বা পাহাড়ের কিছু উপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছি। পথ নেই। পা রাখার স্থানও কোথাও বা অতি সঙ্কীর্ণ। কুলিদের বা পাণ্ডার ছেলের হাত ধরে সে-সব স্থান অতিক্রম করি। বিপদ ঘটলে তারা যে হাতটুকু ধরে আটকে রাখতে পারবে এমন নয়। তবুও হাতের

এই সামান্য ভরটুকু দিয়ে সাহসের সেতু বাঁধা হয়। শরীরও ভারসাম্য ফিরে পায়। কিন্তু ভয় যে সম্পূর্ণ মনের বিকার তা বুঝতে পারি চলার সঙ্গে। চলতে চলতে মনে সাহস জাগে, আত্মনির্ভরতা আসে, হাসিমুখে নির্ভয়ে সঙ্কটময় পথও একাই ক্রমে পার হয়ে এগিয়ে যাই।

গঙ্গার ধারে বালির উপর সব পায়ের চিহ্ন। গাইড ও কুলিরা দেখেই বলে—ভালুকের পায়ের ছাপ। শুনি, এ অঞ্চলে বড় বড় ভালুক আছে, সামনাসামনি দেখাও যায়। ভাবি, দেখা হলে মন্দ নয়। কিন্তু দেখা পাই না।

ফেরার পথে, গঙ্গার অপর পারে বড় একদল হরিণ দেখা গিয়েছিল। ঘোড়ার মত প্রকাণ্ড। একটার মাথায় বিরাট শিঙ। দল বেঁধে চলছিল। আমরা এপারে দাঁড়িয়ে দেখছি, ওরাও অপর পারে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। আমরাও চলি, তারাও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে যেন বিদায় জানিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গেল।

ধীরে ধীরে গঙ্গার উৎসমুখে সবাই এগিয়ে চলেছি।

মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি। বিগত-বিষয়-তৃষ্ণ।

জগৎ সংসার সব ছেড়ে কোথায় যেন আর এক রাজ্যে চলে এসেছি। স্নেহমায়া, ভয়ভাবনা—কোথায় যেন বিলীন হয়েছে। চারিদিকে প্রকৃতির অপার শান্তির মাঝে নিজেকে যেন নিঃশেষ করে দিয়েছি।

পাহাড়ের মাথায় সব বরফ। বরফ গলে কেবলই ঝরনা নেমে এসেছে। কিছু নীচেই গঙ্গার ধারার সঙ্গে মিশেছে। ঝরনার বুকে বড় বড় পাথর। সেই সব পাথরের উপর পা রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে জলের ধারা পার হচ্ছি। ক্ষীণকায়া ধারাগুলি পার হতে অসুবিধা নেই।

গাইড জানায়, বাবুজি, ফেরবার পথে এইসব জায়গাতেই বিপদ। এখন সকালে বরফ গলতে শুরু করে নি, রৌদ্রের তেজ বাড়লেই দ্রুত গলতে থাকবে, ঝরনার জল বাড়বে, ধারা দশগুণ হয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে নামবে। তখন পার হওয়াই দুষ্কর। জলের ভিতর বড় বড় গোল পাথর গড়িয়ে ফেলে, তারই উপর পা রেখে কোনও রকমে পার হওয়া যায় তো ফেরা—নয়ত এই সব ঝরনারই ধারে রাত কাটিয়ে আবার ভোরে ফিরতে হয়। দিনের শেষভাগে এসব নদী পার হওয়া অসম্ভব।

ভাবি, মিথ্যা এখন ওসব চিন্তা। অসম্ভব হয়-ই যদি, রাত্রিবাস করা যাবে। এখন শুধু অভিমন্যুর ব্যূহভেদ হলেও ক্ষতি কি?

হঠাৎ সামনে পড়ে অপরূপ রূপ!

ঝরনার আশপাশে জল জমে আছে। তারই উপর কাঁচের মত পাতলা বরফ জমেছে। সামান্য স্পর্শেই ভেঙে যায়, জল টলমল করে ওঠে। তার কাছেই পাথরগুলির উপর বরফের আচ্ছাদন। পাথরের নীচে বরফ গলে ধারা বয়ে চলেছে; উপরের পাথর থেকে বরফের সরু সরু ফালি বটগাছের ঝুরির মত নেমেছে। টপ্‌টপ্ করে ফোঁটা ফোঁটা জল মুক্তার মত তা থেকে পড়ছে। আর সেই বরফের ঝুরিগুলির উপর সকালের রৌদ্র পড়ে রামধনুর সাতরঙা ছটা ছড়িয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। কি বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস!

চীরবাসা থেকে মাইল তিনেক এসে ভূর্জবৃক্ষও শেষ হয়ে আসে। জায়গার নাম ভূজবাসা (১২,৪৪০ ফুট)। শুনি, নিকটে এক গুহা আছে। প্রয়োজনে আশ্রয় মেলে।

সকাল থেকে প্রায় ছয় ঘণ্টা চলেছি। এখনও ছয় মাইল পথের শেষ হয় নি। অথচ পথে বিশ্রামও বিশেষ করি নি, ধীরে ধীরে এগিয়েই চলেছি।

গাইড বলে, এইবার পৌঁছে গেছি, পাহাড়ের ঐ বাঁকটা ঘুরলেই দর্শন মিলবে।

গঙ্গার দুই কূলের গিরিশ্রেণী কিছু দূরে সরে গেছে। নদীর উপত্যকা প্রসারিত হয়েছে। এ-পারের পাহাড় থেকে ও-পারের পাহাড় প্রায় মাইলখানেক দূর হবে। তারই মধ্যে সাগর-সৈকতের মত বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর দিয়ে গঙ্গার ধারা নেমে আসছে। সুমুখে উপত্যকার গতিপথ রোধ করে এক বিরাট গিরিশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে। তারই দুইটি বরফ-ঢাকা চূড়া সূর্যকিরণে ঝলমল করছে। 'ভাগীরথী' শিখর। উপত্যকাও তুষারাবৃত। পাহাড়ের উপর থেকে বিরাট 'গ্লেসিয়ার' নেমে এসেছে। সেই হিম-প্রবাহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গাইড জানাল, ওরই কাছে গঙ্গার উৎস-মুখ—গোমুখ। বরফের মধ্যে প্রকাণ্ড বরফেরই কয়েকটি গুহা। তারই ভিতর থেকে বরফ গলে গঙ্গা নদীর রূপ ধরে বার হয়ে আসছেন—

'হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল তরঙ্গে'।

জলের কিনারা দিয়ে পাথর ধরে ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। প্রায় আধ ঘণ্টা চলার পর সেই বরফের গুহার মুখে পৌঁছুলাম। সাগরবক্ষ হতে ১৩,৭৭০ ফুট। এর পর সবই তুষার-আচ্ছন্ন। এইখানেই প্রথম নদীআকারে ভাগীরথীর আবির্ভাব।

ম্যাপ খুলে চারিদিকের তুষার-শিখরগুলির নামের সঙ্গে পরিচয় করি।

ভৃগুপন্থ, মেরুপর্বত, শিব্‌লিঙ, কীর্তিস্তম্ভ, ভাগীরথী পর্বত, শতপন্থ, কালিন্দী, চতুরঙ্গী, বাসুকিপর্ব, নীলাম্বর, রক্তবরণ, শ্বেতবরণ, সুদর্শন,—অপূর্ব সব নামকরণ। কে কবে এসব নাম দিল, তাই ভাবি।

শুভ্র জটাজুট যোগমগ্ন সব যোগীশ্বর। দেবতাত্মা হিমালয়ে যুগ-যুগান্তরের শাশ্বতবাণীর নির্বাক প্রতিমূর্তি।

॥ ২০ ॥

গোমুখ।

নামকরণের কারণ খুঁজি। গাভীর মুখ,—হয়ত কবি-চিত্তের কল্পনার কথা। তবু মনে হয়, সামনের দুইটি বরফের চূড়ার সঙ্গে গরুর শিঙ-এর সাদৃশ্য এবং বরফের বিরাট গুহাটি মুখবিবর মাত্র। আবার মনে হয়, গো অর্থে পৃথিবীও তো হয়। পৃথিবীর এই তুষার-বিবরই তো এ নদীর উৎস-মুখ—তা-ই বুঝিবা গো-মুখ।

বরফের প্রকাণ্ড গুহা। তিন-চারশ ফুট উঁচু, শতখানেক ফুট চওড়া। ভিতরে অন্ধকার। সেই গোপন অন্ধকারের ভিতর থেকে তরল-তরঙ্গে জল বয়ে আসছে। গুহার মুখে বরফের চাঙর ভেঙে ভেঙে পড়ছে, জলের স্রোতে বরফ ভেসে ভেসে চলেছে। বরফ-গলা জল,—নিদারুণ শীতল। জলের রঙ ঘোলাটে। গঙ্গার গৈরিকবাসের পূর্বাভাস।

গঙ্গার জলে স্নান করলাম।

সঙ্গে আনা মেজদাদার অস্থি বিসর্জন দিলাম।

জাহ্নবীধারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে থাকি। স্রোতের আবর্তে চিতাভস্ম ও অস্থিখণ্ড নিমেষে কোথায় অন্তর্ধান করে।

ঠিক এক বছর আগেকার কথা। সেদিন এমনি হিমালয়-পথে ঘুরতে ঘুরতে বদরীনারায়ণে এসে পৌঁচেছি। পৌঁছানোমাত্র পাণ্ডাজি এসে ডাকের চিঠি হাতে দিলেন।

মেজদাদার লেখা। কাশ্মীরে তখন তিনি বন্দী।

লিখেছেন, এ চিঠি যখন তোমার কাছে পৌঁছুবে, ততদিনে তুমি হয়ত বদরিকাশ্রমে পৌঁচেছ। হিমালয়ের বিরাট ও অপরূপ সৌন্দর্য তুমি নিশ্চয় উপভোগ করছ। এখানে আমিও ঐ মহান হিমালয়েরই আর এক অংশে আছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও আছে। শুধু প্রভেদ এই, তুমি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আর আমার ঘোরাফেরার হুকুম নেই, স্থানও নেই,—চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে। আমার খুবই ইচ্ছা ছিল, এবার তোমাদের সঙ্গে কেদারবদরী ঘুরে আসি। কিন্তু তা ভাগ্যে ছিল না। আগামী বছর ভাগ্য আরও প্রসন্ন হবেন, আশা করি।

এ চিঠি পাবার দশ দিন পরে কলিকাতায় ফিরে আসি। তার দুই সপ্তাহ পরেই তিনিও ফিরলেন—চির-মুক্তি পেয়ে। কাশ্মীর সরকার কাশ্মীরী শালে আচ্ছাদন করে তাঁর মরদেহ ফেরত পাঠালেন!

সেদিনই শ্মশানে তাঁর চিতার পাশে বসে সঙ্কল্প করলাম, তাঁর চিতা-ভস্ম ও অস্থি-চূর্ণ নিয়ে আগামী বছর গোমুখে ও বদরিকাশ্রমে ব্রহ্মকপালে বিসর্জন দিয়ে আসব।

আজ বৎসরান্তে সেই উদ্দেশ্য সার্থক হল।

তাকিয়ে দেখি, গঙ্গার প্রবল প্রবাহে যেন সেই প্রদীপ্ত চিতাবহ্নিরই লেলিহান শিখা। আজ বুঝিবা জননী জাহ্নবীর শান্ত-স্নিগ্ধ স্পর্শে নির্বাপিত হল।

'সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।'

* * *

জলধারার ধারেই এক শীতল শিলাখণ্ডের উপর আসন নিয়েছি। সামনে গোমুখ-গুহা।

চারিদিক নিস্তব্ধ নিশ্চল। যোগমগ্ন হিমাচল। তুষারকান্তি জ্যোতির্ময়।

তারই মাঝে জাহ্নবীর জন্ম-কাকলী। সুরধুনীর সুরধ্বনি।

ভাগীরথীর মর্ত্যে অবতরণ।

স্থির হয়ে বসি। 'দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে' অমর মাহাত্ম্য হৃদয়ে উপলব্ধি করি।

চোখের উপর ভেসে ওঠে সেই শীর্ণকায়া পর্বত-নির্ঝরিণীর মহীয়সী মহিমা—বিশাল বিস্তৃতি। অঙ্কুরের মাঝে মহীরুহের ইঙ্গিত।

গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে মন ভেসে চলে। ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌। পাহাড়-পর্বত ভেদ করে ছুটে চলে। যত বাধা, তত বেগ উচ্ছল উদ্দাম। চারিদিকের গিরিদেবতা ঝরনার জলের অঞ্জলি দেয়।

জল বাড়ে, স্রোত বয়। পারাবার-বিহারিণী জাহ্নবী ছুটে চলে।

দেবাদিদেব মহাদেবের জটা বেয়ে স্বর্গের নির্ঝরিণী সব কলোচ্ছ্বাসে নেমে আসে। মন্দাকিনী, সরস্বতী, গৌরী, নন্দা, অলকানন্দার সহিত মিলিত হয়ে ছুটে আসে, ভাগীরথীতে নিঃশেষে বিলীন হয়।

মিলনের পুণ্যতীর্থে সঙ্গমে সঙ্গমে প্রয়াগের প্রতিষ্ঠা। পাহাড়ের মাঝেও গঙ্গার উভয়তীরে মানুষের বসতি জাগে। মন্দিরে শঙ্খঘণ্টার রোল ওঠে। গঙ্গার আবাহন জানায়,—পতিতপাবনি সুরধুনী গঙ্গে!

জাহ্নবী ছুটে চলে। পর্বত-কারায় অবরুদ্ধা প্রমত্তা নদী মুক্তির সন্ধানে বেগে ধেয়ে চলে। গিরিদ্বার ভেদ করে হরিদ্বারে কল্যাণী জননী নেমে আসেন। শ্রান্তি-হরা, শান্তি-ভরা, ভীষ্ম-জননী!

ভরা নদী বয়ে চলে। তীরে তীরে কত নগরী, কত তীর্থ গড়ে ওঠে। দুকূলের ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলে।

অন্ন-দায়িনী শান্তি-প্রদায়িনী ভাগীরথী!

কলকল্লোলিনী জাহ্নবী তবু ছুটে চলে। বিশাল বিস্তৃতি—সুগভীর জলরাশি। নৌকা চলে, জাহাজ ভাসে। সভ্যতার পণ্য আসে। যন্ত্র-দানবের বিরাট সৌধ জাগে।

সুধাপ্লাবিতা মকরবাহিনী তবুও ছুটে চলে।

জলস্রোতে বিগত বছরের কয়দিনের কাহিনী স্মৃতি-পথে ভেসে আসে।

গঙ্গাসাগর অভিমুখে চলেছি। এই ভাগীরথীরই আর এক রূপ। উচ্ছলা চঞ্চলা পার্বত্য নির্ঝরিণী নয়—সুবিস্তীর্ণ বারিরাশি। প্রশান্ত বিস্তার। দুই তীরে অভ্রভেদী গিরি-প্রহরী নয়,—সুদূর দিক্‌চক্রবালে তরুরাজির ঘনসবুজ রেখা। দিগন্ত-প্রসারিণী প্রবাহিনী। সাগর-সঙ্গমে ছুটে চলেছে।

সঙ্গমে মন্দির। তীর্থযাত্রার সমারোহ। লোকমুখে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্তন। ভগীরথের কীর্তি, জহ্নুমুনির উপাখ্যান, সগর-রাজের কাহিনী—কত পুণ্যস্মৃতিভরা জাহ্নবী!

মহাসমুদ্র ঊর্মিমালার মুকুট মাথায় হিমালয়ের দুহিতাকে সাদর আহ্বান জানায়। সহস্র তরঙ্গে আলিঙ্গন করে। ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ সাগর-জলে বিলীন হয়। মিলনের কল্লোল-কলরব শব্দব্রহ্মের ধ্বনি তোলে।

মহাদ্রি-শিখর হতে মহাসাগর,—বিরাট হতে বিশাল। ধ্যানমগ্ন স্তব্ধ হিমাচলে উৎপত্তি, চিরজাগ্রত উদ্বেল মহাসমুদ্রে বিলুপ্তি।

বিপুল বিস্ময়ে দেখি, সাগরের বারিকণা মেঘাকারে আকাশপথে আবার ছুটে আসে। হিমগিরির হিমশিখরে তুষার জমে। গিরি-কন্দরে প্রাণের স্পন্দন জাগে, শিবসুন্দর জটা-শীর্ষে গঙ্গার প্রচণ্ড ধারা বহন করেন, ভগীরথ শঙ্খনাদে আবাহন জানান। গঙ্গার চিরন্তন মঙ্গলময় যাত্রা আবার চক্রবৎ শুরু হয়।

গোমুখ-বিবর-নিঃসৃতা জাহ্নবীর ছলছল উচ্ছল বাণী ওঠে; নির্ঝরিণীর সেই কলধ্বনির মাঝে মহাসাগরের মহাকল্লোল প্রতিধ্বনিত হয়।

গোমুখ-কল্লোল-মাঝে শুনি আমি সাগর-সঙ্গীত।

স্বর্গারোহণী

॥ ১ ॥

কাঠের লম্বা টানা বারান্দা। সামনে কাঠের রেলিঙ্। উপরে করোগেটের ঢালু ছাদ। দোতলার বারান্দায় চেয়ার বার করে বসি।

সুমুখে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়। মাথায় তার বরফের আবরণ।

নীচেই অলকানন্দা নদী। তুষার-রাজ্যের রাজকন্যা। গিরি-প্রাসাদের সোপান বেয়ে ছুটে নেমে আসে। উচ্ছলিত কলোচ্ছ্বাস। যাত্রাপথে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড পথরোধ করে। রোষদীপ্তা স্রোতস্বিনী ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত সহস্র ফণা তুলে আঘাত করে। চকিতে কলহাস্যের বিপুল রোল তুলে পাথরের পাশ কেটে ছুটে নেমে যায়। পিছনে ধেয়ে নামে অচ্ছেদ্য অনুচরী অগণিত জলের ধারা। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে ছুটে চলে। নিমেষে অদৃশ্য হয়। আবার নতুন ধারা নামে। ছল্‌ছল্ কল্‌কল্ ছুটে যায়। এ নামার শান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। যুগ-যুগান্তরের যাত্রাকাহিনী।

নদীর সেই চিরন্তন যাত্রা-পথের পাশেই তীর্থ-যাত্রীর যাত্রা এসে সাঙ্গ হয়। সে-যাত্রারও স্রোত চলেছে যুগ হতে যুগান্তরে।

বদরিকাশ্রম।

'বদর্য্যাখ্যং ক্ষেত্রং সর্বার্থসাধনম্।'

সর্বার্থসাধন অতি-পবিত্র বদরীক্ষেত্র।

সুন্দর, সুসজ্জিত, পাথরের বাড়ির বারান্দায় বসে ভাবি, এই সেই তীর্থক্ষেত্র!

'ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।'

শুধু তাই?

ক্ষেত্রস্য স্মরণাদেব মহাপাতকিনো নরাঃ।
বিমুক্ত কিল্মিষাঃ সদ্যো মরণান্মুক্তিভাগিনঃ॥

এই তীর্থের শুধু স্মরণমাত্রেই মহাপাতক মানুষও অচিরে পাপমুক্ত হয়। মৃত্যুভয় দূর করে মুক্তিভাগী হয়।

আরও আছে।

অন্যতীর্থে কৃতং যেন তপঃ পরমদারুণম্।
তৎসমা বদরীযাত্রা মনসাপি প্রজায়তে॥

অন্য-তীর্থে কঠোর তপশ্চর্যার যে ফল, শুধু মনে মনে বদরী-যাত্রা চিন্তা করলেও তার সমতুল ফল লাভ হয়।

অতএব,—

বহুনি সন্তি তীর্থানি দিবি ভূমৌ রসাতলে
বদরীসদৃশং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে বহু তীর্থ আছে, কিন্তু বদরী-তুল্য তীর্থ হয় নি, হবেও না।

স্কন্দ-পুরাণের তীর্থ-মাহাত্ম্য-কাহিনী। শাস্ত্র-বাচন।

এখন সেখানে ইলেক্‌ট্রিক আলোর তলায় বসে পুরাণ-কাহিনী পড়ি। ভাবি, কোথায় সে বদরী-বৃক্ষ, কোথায়ই বা সে-আশ্রমের শান্তি!

যত দুরূহ তীর্থ, তীর্থ-মাহাত্ম্যেরও ততই গরিমা। তাই হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায়, ছোট বড় শত সহস্র মন্দির। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর নিভৃতে স্বতন্ত্র বাস। দুর্গম,—অতএব দুর্লভ। দুর্লভ, তাই লাভে মহান্ পুণ্য।

কিন্তু এখন সভ্যতার যান-চলাচলে দুর্গম হয়েছে, তাই দুর্লভও সহজলভ্য হয়েছে। যাত্রী চলেছে দলে দলে—সহস্র সহস্র। বদরীনারায়ণের ছোট শহর জন-কলরোলে মুখরিত। শহরের সভ্যতা সম্পদে সমৃদ্ধ। এখন এ-যাত্রাপথে হারিয়ে গেছে কষ্ট স্বীকার করে দুর্লভকে পাওয়ার অসীম আনন্দ।

ওপারে সরকারী হাসপাতাল, জেলখানা, ডাকবাংলো ছাড়িয়ে এসে অলকানন্দার উপর লোহার পুল। পুল পার হয়ে এ পারে শহর শুরু। পাথরে বাঁধানো সোজা সরু পথ। দুইদিকে সারি সারি বাড়ি। পোস্টঅফিস, দোকান, ধর্মশালা। পথের দক্ষিণে বাড়িগুলির পিছনে অল্প নীচে নদী। বামে ধীরে ধীরে পাহাড়ের উঁচু স্তর উঠে গেছে। পাহড়ের কোলে ধাপে ধাপে বাড়িও উঠেছে। কিছুদূরে এসে পথের উপর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। একপাশে নদীর দিকে পাথরে-বাঁধানো বসবার জন্যে লম্বা জায়গা। পাহাড়ের দিকে মন্দিরের সোপান-শেষে প্রকাণ্ড তোরণ। কারুকার্যখচিত। দক্ষিণে নদীর দিকেও সোপানের আর এক ধারা নেমে গেছে। অলকানন্দার ঘাটে ও তপ্তকুণ্ডে। মন্দির ছাড়িয়েই পথের ডানদিকে সুন্দর একটি বাড়ি। মন্দির-কমিটির অতিথিশালা।

তারই একটি ঘরেতে থাকি।

সেক্রেটারি সাদর অভ্যর্থনা করে বলেন, পথের দিকের ঘবগুলিতে যাত্রীর কোলাহল। নদীর দিকের ঘরটি শান্ত—যেখানে প্রতি বছরই থাকেন, এবারও সেই ঘরে ব্যবস্থা হয়েছে।

তাই থাকিও। নদীর ধারে এই ঘরটিতে শান্তি আছে, শোভাও আছে।

ভোরে উঠে বারান্দায় বসে সে-শোভা উপভোগ করি।

বদরীনাথ উঁচু জায়গা। ১০,১৩৯ ফুট। শীত থাকাই স্বাভাবিক। তবুও ভোরে ওঠার অসুবিধা নেই। যা কিছুর প্রয়োজন, ঘরের সঙ্গেই তার সুব্যবস্থা আছে। গরম জলেরও কোন অভাব নেই। যে কোন সময় তপ্তকুণ্ড থেকে বালতি ভরে আনলেই হয়।

বারান্দার নীচে নদীর নতুন ঘাট বাঁধানো হচ্ছে, দেখি। তপ্তকুণ্ডের কাছ থেকে লম্বা টানা সেই ব্রহ্মকপালীর শিলা পর্যন্ত। যাত্রীদের বেড়াবার, বসবার রম্যস্থান হবে। ভাবি, নদীর দুর্দান্ত স্রোতে রাখবে তো? না রাখলেই বা ক্ষতি কি? নদীর কূলে প্রকৃতির ছড়ানো পাথরগুলির উপর বসার আনন্দ কি কম?

ওপারে ছোট ছোট কয়েকটি কুটির। বদরিকাশ্রমে যে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসী, এখনও একান্তে থাকেন, ঐ-পারে তাঁদের বাস। প্রতি বছর এ পারে বারান্দায় বসে তাঁদের দেখতে পাই। কেউ নামছেন নদীর তটে, কেউ বা চলেছেন উপরে এক ঝরনার ধারে। কারও গেরুয়া বাস, কারও বা কৌপীনসার। এ-পারে বসেও ও-পারের শান্ত আবহাওয়ার শান্তি অনুভব করি। পাহাড়ের সবুজ-অঙ্গে গেরুয়া রঙের কয়টি ফুল যেন বাতাসে দুলে যায়।

সেক্রেটারি বলছিলেন, এবার অলকানন্দার ওপর নতুন ব্রীজটা তৈরি হয়ে গেল, দেখছেন?

দেখি বটে। সুন্দর লোহার পুল। তপ্তকুণ্ডের নীচেই।

এই নতুন পুল-তৈরির ইতিহাস আছে।

অলকানন্দার দুই তীরে দুই গিরিশ্রেণী। বামে নর-পর্বত। দক্ষিণে নারায়ণ পর্বত। যেন নর-নারায়ণের সম্প্রসারিত দুই বাহুর আবেষ্টনে উৎফুল্লা পার্বত্য নদী তরঙ্গ-ভঙ্গে বয়ে চলেছেন।

নারায়ণ পর্বতের কোলে বদরীনারায়ণের মন্দিরকে ঘিরে শহর উঠেছে। শহরের পিছনে নারায়ণ পর্বতের উচ্চ শিখর। গ্রীষ্মকালেও স্বল্প তুষারাবৃত। তার পিছনে আকাশচুম্বী নীলকণ্ঠ শিখর। চিরতুষার আচ্ছন্ন। ২১,৬৪০ ফুট উঁচু। বদরীনাথ শহর থেকে এই শিখরের দর্শন মেলে না। শহরের সমীপবর্তী গিরিশ্রেণী দৃষ্টিপথ রোধ করে। নদীর অপর পার থেকে নীলকণ্ঠের অনুপম শোভা চোখ ও মন আকর্ষণ করে। হিমালয়ে এর চেয়ে আরও উঁচু শিখর বিরল নয়। কিন্তু এমন কমনীয় কান্তি ক্বচিৎ দেখা যায়। বিদেশী পর্যটকও এর শোভায় বিমুগ্ধ হয়ে নামকরণ করেন : The queen of Garhwal।

ভারতবাসীর কানে নীলকণ্ঠ নাম আরও মধুর শোনায়। শুভ্র জটাজুট যোগীশ্বর নীলকণ্ঠ। ধ্যানমগ্ন দেবাদিদেব মহাদেব।

ওপার থেকে অবাক হয়ে দেখি। পাণ্ডাজি বলেন, চূড়ার নীচে দেখেছেন? সাদা বরফের মধ্যিখানে হঠাৎ খানিকটা কালো দাগ। নীলকণ্ঠ যে!

কালো চিহ্নটি সুস্পষ্ট। এর মধ্যে অলৌকিক কোনও কারণ নেই। কেননা, বুঝি, পাহাড়ের ঐ অংশের মসৃণ অঙ্গ এমনি সোজাভাবে নেমেছে যে বরফ পড়লেও স্থায়ী হয়ে ওখানে থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়। তবুও শিখরের ঠিক কণ্ঠদেশে এমন চিহ্নটির সঙ্গে নামকরণের আকস্মিক যোগাযোগ যুক্তিবাদী মনেও ক্ষণিক আনন্দ আনে।

কিন্তু সৌন্দর্যেরও বিপদ আছে।

শহরের ঠিক মাথার উপরে ও অতি সন্নিকটে তুষার-শীর্ষ শিখর। শীতকালের পর যখন বরফ গলে, তখন অতিকায় তুষারের ধস্ (avalanche) পাহাড়ের উপর থেকে হঠাৎ নেমে আসে। শহরের অংশ ধ্বংস করে।

১৯৫২ সালের কথা। সে বছর যখন আসি, তার কিছুদিন আগেই এই রকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল। পৌঁছে দেখি, শহরের চারিদিকে ধ্বংসের লীলা। তুষার-বন্যা-বিধ্বস্ত। যেন, ভূকম্পনের পর করুণ দৃশ্য। ওই অতিথিশালাটিরও এক অংশ ভেঙে গিয়েছিল। সেই সব ভাঙা অংশের গহ্বরে তখনও বরফের স্তূপ জমে রয়েছে। তবে বহু ক্ষতি হলেও প্রাণহানি হয় নি। কেননা সাধারণত যে-সময়ে এই সব বরফ গলে নেমে আসে, তখনও মন্দির খোলে না। শহরবাসীরাও এখানে তখন থাকে না।

মাঝে মাঝে এমন দুর্ঘটনা হলেও মন্দিরটির কোনকালে ক্ষতি হয় না।

স্থানীয় লোকেরা দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করে বলেন, নারায়ণের অসীম কৃপা!

নদীর অপর পারে নর-পর্বতের কোলে যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে সেখানে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা নেই। নদী থেকে গিরিশ্রেণী বেশ কিছু দূরে। তাই শঙ্কিত ও সাবধানী কর্তৃপক্ষের মন ঐদিকে এই বিপদ এড়ানোর উপায় খোঁজে। গভর্নমেন্টও অনুমোদন করে,—নতুন শহর ও-পারে গড়ে তোলা হোক। শুধু মন্দিরই থাকবে এ-পারে। দেবতাকে স্থানচ্যুত করার বাধা ও আপত্তি আছে।

সেই পরিকল্পিত ব্যবস্থার প্রথম সূচনা,—পারাপারের এই নতুন সেতু।

পূর্বে অপর পারের সাধুদের কুটিয়াতে যাতায়াতের পথ ছিল—প্রায় আধ মাইল আগে শহরের প্রবেশ-পথের কাছে পুরানো সেতুটি। সেখান দিয়ে—অর্থাৎ প্রায় মাইলখানেক ঘুরে গেলে, তবে শহর থেকে ঐ সব কুটিয়াতে পৌঁছানো যেত। যাত্রীদের নিত্য যাতায়াতের পথ নয়। দর্শন-প্রার্থী যাত্রীরাই শুধু যেতেন।

সেক্রেটারি নতুন পুলটি দেখিয়ে বলছিলেন, এখন কত সুবিধা হয়ে গেল। যাত্রীরা এখন এপারে সোজা মন্দিরে এসে উঠবে। এরই মধ্যে অনেকে এ-পুল দিয়ে যেতে আসতে শুরু করেছে। ও-পারে বড় সড়কও হচ্ছে, নতুন খুব ভালো একটা ধর্মশালা তৈরিরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তাতে আপনাদের সব রকম আয়োজন থাকবে।

এমন জায়গায় এমন সুন্দর লোহার পুল করায় মানুষের বাহাদুরি আছে, স্বীকার করি। আবার প্রশ্নও করি, কিন্তু সাধুদের হবে কি?

সেক্রেটারি বলেন, কেন? তাঁদেরও তো মন্দিরে ও তপ্তকুণ্ডে আসা কত সহজ হয়ে গেল! এক মাইল ঘুরে আসতে হবে না। যাঁরা মন্দিরে প্রসাদ বা ক্ষেত্রগুলিতে ভাণ্ডারা নিতে আসেন—তাঁদেরও যাতায়াতের কত সুবিধা হয়ে গেল।

হেসে বলি, সুবিধে বটে! সদর রাস্তার ওপর এখন তাঁদের কুটিয়াগুলি পড়ল। শুধু যে স্বতন্ত্রতা হারালো তাই নয়, সকাল থেকে এখানে বসে দেখছি, সারি সারি যাত্রী চলেছে পুল দিয়ে অপর পারে। সাধু-সন্দর্শনে নয়, লোটাহাতে!

সেক্রেটারিকে প্রশ্ন করি, শহরের উন্নতি হচ্ছে; রাস্তা খুলছে; তার ওপর সাধুদের কুটিয়া পড়ল। এর জন্যে betterment levy বা কোন ট্যাক্স বসবে না?

সেক্রেটারি হাসেন। বলেন, ঠাট্টা করছেন আপনি? যেমন দেবতার মন্দির, তেমনি সাধু-সন্ন্যাসীদের

বাসও তো এইসব তীর্থক্ষেত্রের গৌরব। তাঁদের ওপর কর-ধার্যের কথা ভাবতেই পারা যায় না।

আমি বলি, তা হলে এখন ভাবতে শিখুন। স্বাধীন ভারতেও কোথাও কোথাও শুরু হয়েছে যে! শুনুন তবে উত্তরকাশীর এক সাধুর চিঠিতে-লেখা খবর।

উত্তরকাশী হিমালয়ের এক বহু প্রাচীন, অতি-শান্ত তীর্থক্ষেত্র। অনেক সাধুসন্তের সেখানে নিভৃতে বাস। একান্তে সাধন-ভজন করেন। কঠোর সন্ন্যাসজীবন পালন করেন। প্রবাদ, বারাণসী কাশীতীর্থ মর্ত্যের মানুষের জন্যে, হিমালয়ের উত্তরকাশী দেবতাদের জন্যে। সেখানেও উত্তরবাহিনী ভাগীরথী-গঙ্গা, দুইদিকে বরুণা ও অসি—দুই নদী, গঙ্গার উপর দশাশ্বমেধ ঘাট, বিশ্বেশ্বরের মন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির—সব কিছুই আছে। এমন কি মণিকর্ণিকার ঘাট পর্যন্ত। অবশ্য কাশীর তুলনায় আয়তনে সবই ছোট। শহরও ছোট। তবে ক্রমে ক্রমে সভ্যতার শ্রী ও সম্পদে সমৃদ্ধ হচ্ছে। বড় বড় বাড়িও উঠছে। সেনানিবেশও বসেছে। শহরের বাইরে সাধুদের কুটিয়া ও আশ্রমগুলি। সেবার গঙ্গোত্রী যাবার পথে উত্তরকাশীতে কয়দিন ছিলাম। এক পূর্ব-পরিচিত স্বামীজির আশ্রমেও গিয়েছিলাম। ভাগীরথীর ঠিক উপরেই অতি মনোরম শান্ত স্থান। শহরের বাইরে—একান্তে, নিভৃতে। একাই থাকেন। জলের কয়েক হাত উপরেই তাঁর ভজন-কুটি। জিজ্ঞাসা করি, বর্ষায় ঘরে জল আসে না?

বলেন, এখনও তো কোন বছর আসে নি। বেশি জল নামলে—অপর পারে জল ছড়িয়ে যায়; এপারে এখানে এতদূর ওঠে না। অথচ কি সুবিধে দেখুন, কয় হাত নামলেই গঙ্গার জল। জলের কোন অভাব নেই। সারাক্ষণই ভাগীরথীতীরে আসন করে আছি। মনে কত শান্তি ও আনন্দ আনে।

সেই স্বামীজিরই ক'বছর পরে এক চিঠিতে খবর পেলাম। শহরের অনেকরকম উন্নতিসাধন হচ্ছে। জলের পাইপও বসেছে। শহর থেকে কিছু দূরে এক পাহাড়ের উপরের ঝরনার জল সেই পাইপ-এ আনা হয়েছে। তাই জলের ট্যাক্সও বসেছে। নোটিশ হয়েছে সকলের ওপর—যাঁদের এলাকার সামনে দিয়ে পাইপ গেছে তাঁদেরও ধার্য ট্যাক্স দিতে হবে—তাঁরা পাইপ-এর জল ব্যবহার করুন বা নাই করুন। স্বামীজির উপরও নোটিশ হয়েছে, কেননা তাঁর আশ্রমের কাছ দিয়ে পাইপ-লাইন গেছে। খবরটি দিয়ে স্বামীজি লিখছেন, পাইপ-এর জলের আমার কোনও প্রয়োজন নেই এবং থাকতেও পারে না,—নিজের চোখেই সব দেখে গেছেন। গঙ্গামায়ের কোলের উপরই তো আশ্রয় পেয়েছি। তবুও ট্যাক্স দেবার দায়িত্ব হয়েছে বলে দাবি করে নোটিশ দিয়েছে। অথচ বহু বছর হয়ে গেল সব কিছু ছেড়ে হিমালয়ে চলে এসেছি। টাকাকড়ি তো দূরের কথা, পূর্বাশ্রমের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কারও সঙ্গে সংস্রব পর্যন্ত রাখি নি, রাখার কথাও নয়। এখানে সব মহাত্মাদেরই সেই একই কথা। সবাই একান্তে আপন সাধনভজন নিয়ে আছেন। কোথায় পাবেন ট্যাক্স দেবার টাকা? অর্থজালে যদি আবার জড়াতেই হয় তো হিমালয়ে এই সন্ন্যাস-জীবনই নিরর্থক। এখন শুধু ভাবছি কোথায় আবার তিনি টেনে নিয়ে যাবেন!

ভাবি, শহর-লোকালয় ছেড়ে সর্ব-ত্যাগী হয়ে সাধুরা এলেন হিমালয়ে বনবাসে ভগবৎ-সাধনায়, কিন্তু নগর-ব্যবস্থা অবাঞ্ছিত ভাবে তাড়না করে আসে এঁদেরও পিছনে—এখানেও—করের কৃপাণ-হাতে!

॥ ২ ॥

বদরীনাথে একদিন ওপারে গেলাম স্থানীয় ডাক্তারবাবুর কাছে। ডাক্তার বলে নয়। বাঙালী। তাই, খবর পেতে তিনি নিজেই এসে আলাপ করেন। একদিন রাত্রে তাঁর বাড়িতে খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। তাতে রাজী হই না। বলি, আপনার বাড়িতে তো নিশ্চয় যাব, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা নয়।

তিনি ছাড়েন না। অগত্যা চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি।

ওপারে হাসপাতালের পাশে তাঁর থাকবার বাড়ি। সরকারী কোয়ার্টার্স। বিকালে বেড়াতে বেড়াতে যাই। সঙ্গে চলেছেন স্থানীয় আর একজন বাঙালী। সেদিনই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। এখানে কাজ নিয়ে এসেছেন। কয়েক মাস থাকতে হবে। মন্দিরের কাছে একটি ঘরে থাকেন। একা। একটি পাহাড়ি ছোকরা তাঁর বাড়ির কাজকর্ম করে দেয়।

ভদ্রলোক বলেন, এমনি করেই চলে যাচ্ছে দিন। ক'টা মাস কাটলে বাঁচি। দেরাদুনে জমি কিনেছি কিছু। একটা ছোট বাড়িও করেছি সেখানে। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার সময় অল্প যা কিছু আনতে পেরেছিলাম—তাই দিয়ে আবার এক নতুন জীবন শুরু করেছি। স্ত্রী আছেন দেরাদুনে, চাষ করাচ্ছেন

সেখানে। ছেলে ও মেয়ে তাঁর কাছে আছে। স্কুল কলেজে পড়ে—তাই তাদের আসার উপায় নেই। আমি একলাই পড়ে আছি এখানে—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

হেসে বলি, কেন? তীর্থ-বাস হচ্ছে। পুণ্যলাভ করছেন তো।

উত্তর দেন, প্রথম যখন আসি তাই মনে হয়েছিল বটে! কিন্তু বাধ্য হয়ে বেশিদিন থাকতে হলে ও-সব ভাব আর থাকে না। সংসারী মানুষ, মশাই!

যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করি, ডাক্তারবাবুর ওখানে প্রায়ই যান নিশ্চয়?

বলেন, হ্যাঁ। বিদেশে বাঙালী পরম আত্মীয় মনে হয়। দুটো সুখ-দুঃখের কথা মাতৃভাষায় মন খুলে বলা যায়। তা ছাড়া—আরও একটা কারণ আছে—বলে মুচকে হাসতে থাকেন। বলেন, সব্জির মধ্যে আলু ছাড়া এখানে খাদ্য তো নেই। মাঝে মাঝে মুখটা ওখানে বদলানো যায়।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, অন্য সব্জি ওঁরা পান কোথায়? নীচে থেকে আনান বুঝি?

এঞ্জিনিয়ার হেসে বলেন, সে তো দু-একরকম আনান-ই। হাসপাতালের জিনিসপত্র যখন আসে সেই সঙ্গে আনানোর কোন অসুবিধে নেই। ভদ্রলোকের স্ত্রীও সঙ্গে আছেন। তিনি রাঁধেনও ভালো। হাজার হোক বাঙালী মেয়ে তো। কিন্তু সে-সব এমন কিছু নয়।—বলে, আবার মুচকে হেসে চাপা-গলায় বলেন, একটু মাছ-মাংসও চলে যে!

মাছ-মাংস! আশ্চর্য হই! জিজ্ঞাসা করি, এখানে মাছ-মাংস? এ-সব চলে নাকি?

উত্তর শুনি, চালালেই চলে। তীর্থক্ষেত্র হল গঙ্গার দক্ষিণ কূলে—এপারে। ও-দিকটা তো বদরী-পুরীতে নয়। অপর পারে যে! ডাক্তারবাবু করিতকর্মা আছেন। বিশেষ ব্যবস্থা করে কিভাবে যোগাড় করান। অবশ্য মাঝে মাঝে। শুনেছি, পাহাড়িরাই এনে দেয়, পয়সা পায়। তারাও কেউ কেউ খায় যে!

কোন মন্তব্য করি না। তবুও তিনি নিজেই বলে চলেন, দেখুন, ও-সব নিয়মকানুন হল তীর্থ-যাত্রীদের জন্যে, যাঁরা আসেন পুণ্যি করতে। আর তাঁরা আসেনও তো দু'দিনের জন্যে। খুব জোর তে-রাত্তির বাস। কিন্তু যাঁদের চাকরির তাড়নায় মাসের পর মাস এখানে কাটাতে বাধ্য হতে হয়—তাঁদের পক্ষে ও-নিয়ম চলবে কেন? এই দেখুন না, যেমন রীতি-নীতি তার সমাধানও তেমনি। এখনকার এক অফিসারের স্ত্রীর সন্তান হল—এ-পারে পুরীতে হবার নিয়ম নেই। তাই ও-পারে একটা বাড়ি নিয়ে সেইখানে তাঁকে সপরিবার থাকতে হচ্ছে। বললাম যে, ও-পারে দোষ নেই!

চুপ করে শুনি! ভাবি, এত কৈফিয়ত-এরই বা প্রয়োজন কি!

ডাক্তারবাবু আমাদের পেয়ে খুব খুশি। বলেন, আজ চায়ের সঙ্গে শুধু পাঁপরভাজা, পকৌড়ি খেয়ে গেলেন—এ ঠিক হল না। শতোপন্থ থেকে ঘুরে আসুন—তারপর রাত্রে একদিন এখানে আহার করতেই হবে।

বলে তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি চুপ করে রইলে কেন? ভালো করে তুমিও বলো!

ভদ্রলোক সাদাসিধে, মনখোলা। অনেক কিছুই গল্প করেন। জিজ্ঞাসা করেন, আর একজন বাঙালী ডাক্তারবাবুও যে এখানে এসেছেন—দেখা হয়েছে নাকি। দেবপ্রয়াগে এক বছর ছিলেন। এখন বদলী হয়ে গেলেন কাশীতে। যাবার আগে স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থ করে যাচ্ছেন। ভালোই করেছেন, আবার কবে এদিকে আসা হয় কি না হয়। তারপর একটু রাগ করেই বলেন, কিন্তু দেখুন, ওঁর একটা আচরণ দেখে আমার আজ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, দু-এক কথা শুনিয়েও দিয়েছি। তিনি নিজে খুব ভক্ত—সারা পথ স্ত্রীকে নিয়ে হেঁটে এসেছেন। তা আসুন। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়ে দুটো—সাত-আট বছর মাত্র বয়েস হবে—তাদেরও সমস্ত পথ হাঁটিয়ে এনেছেন!

আমি তখনই বলি, সে ভদ্রলোক যে রয়েছেন আমাদেরই বাংলোতে, সামনের দিকের ঘরে। আসার সময়ও তাঁর ছেলেমেয়ে দুটিকে বারান্দায় দেখলাম। রোগা লিকলিকে চেহারা—একটার পায়ে যেন কি বাঁধাও দেখেছিলাম।

ডাক্তারবাবু বলেন, তাই থেকেই তো জানতে পারলাম। ছেলেটার পায়ে ফোস্কা পড়ে ঘা হয়ে গেছে—তবুও হাঁটিয়ে এনেছেন; এখন এসেছেন ঘা সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। আমি শুনেই বললাম—ঐ বাচ্চা দুটোকে এই পাহাড়ের পথ হাঁটিয়ে আনলেন কি বলে? দুজনের জন্য একটা ডাণ্ডিও তো ভাড়া

করতে পারতেন? তিনি কি উত্তর দিলেন জানেন? নির্বিকার ভাব দেখিয়ে বললেন, পায়ে হেঁটে না এলে তীর্থে আসার পুণ্য ওদের হবে কি করে? জবাব শুনে আমি দিলাম দু-কথা শুনিয়ে,—বাপ, না—

আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাই—বলি, চলুন, আর ঘরে বসে গল্প নয়। সন্ধ্যা হবার আগে এ-পারে একটু ঘুরে বেড়ানো যাক।

ডাক্তারবাবু উল্লসিত হন। বলেন, খুব ভালো কথা। চলুন। এ-পারটা বেশ নিরিবিলি। সাধুদের কুটিয়াও আছে। দর্শন করে আসবেন। আমি প্রায়ই এদের কাছে যাই। কে জানে, কারও কৃপায় যদি কিছু পেয়েই যাই। বলা তো যায় না।

বলি, চলুন এমনি বেড়ানো যাক। সাধুদের নাই বা বিরক্ত করলাম।

গল্প করতে করতে এগিয়ে চলি। কিছুদূরে একটি কুটিয়ার কাছে এক সাধুকে দেখে ডাক্তারবাবু সেদিকে যান। আমাদের ডাকেন, চলে আসুন। ওঁর একবার খবর নিয়ে যাই। কিছুদিন আগে নিউমোনিয়া হয়েছিল। চিকিৎসা করেছিলাম। এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

জিজ্ঞাসা করি, কি চিকিৎসা করলেন?

বলেন, পেনিসিলিনেই কাজ হয়েছিল। বুকে যা সর্দি জমেছিল, আমি তো ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সেরে গেছেন। তবে দুর্বলতা এখনও আছে। পথ্য তো কিছু নেই—ক'দিন আমি একটু দুধের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। এমন অসুখেও সামান্য একটা কম্বলেই এই শীতে কাটিয়ে দিলেন। আশ্চর্য!

সাধুজীর কুটিয়ার বাইরে ছোট বাগান। সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। নানান রঙের মরসুমী ফুল। বাগানের এক অংশে বয়ে যাওয়া ছোট্ট একটি ঝরনার জলধারার মুখ বন্ধ করে জলাধার তৈরি হয়েছে। লম্বা-চওড়ায় তিন-চার হাত মাত্র হবে। অতিরিক্ত জল অপর দিক দিয়ে বার হয়ে বয়ে যাচ্ছে,—নীচে অলকানন্দার দিকে। জলের ধারে কয়েকটি সমতল পাথর। বসবার সুন্দর আসন। তারই একটিব উপর স্থির হয়ে বসে আছেন।

দেখলেই বোঝা যায় বয়স হয়েছে। সাদা লম্বা দাড়ি-গোঁফ। অঙ্গে সামান্য একটা আবরণ। সৌম্যমূর্তি। শান্ত দৃষ্টি।

সকলে প্রণাম করলাম। বসতে বললেন। সম্প্রতি রোগভোগের চিহ্ন তাঁর চোখে মুখে প্রকাশ পায়। বাঙালী। বাঙলাতেই কথা বলেন। স্বল্পভাষী।

'কেমন বোধ করছেন?'—ডাক্তারবাবুর প্রশ্নে মৃদু হেসে আকাশপানে হাত তুলে নমস্কার করে শুধু বলেন, তাঁরই দয়া।

প্রায় পঁচিশ বছর এখানে আছেন, শুনি। হিসেব করে বলি, মাকে নিয়ে আমিও প্রথম এখানে এসেছিলাম—১৯২৮ সালে। তখন হৃষিকেশ থেকেই হাঁটতে হয়েছিল। মার জন্য অবশ্য ডাণ্ডী ছিল—কিন্তু তিনিও হাঁটতেন প্রায়ই। এখন বাস হয়ে যাতায়াতের অনেক সুবিধে হয়েছে বটে, কিন্তু তখনকার যাত্রার আনন্দ অন্য রকমের ছিল বলে মনে হয়। এই বদরীপুরীও তো কত শান্ত ছিল।

হঠাৎ নতুন পুলটার কথা মনে হয়। জিজ্ঞাসা করি, এখানকার শান্ত আবহাওয়ার এতে বিঘ্ন ঘটাবে না তো?

তাতেও তিনি মৃদু হাসেন, বলেন, শান্তি তো মনে! মন যদি সুসংযত আত্মস্থ থাকে, বাইরের শতকোলাহলও সেখানে পৌঁছতে পারে না। তবে তীর্থক্ষেত্রের শান্তির কথা স্বতন্ত্র। এখানকার আবহাওয়ার পরিবর্তন তো ঘটছেই। এ-পুল তৈরি তার একটা সামান্য প্রকাশ মাত্র। নানান্ শ্রেণীর লোক এখানে আসতে শুরু করেছে, বহুরকম উদ্দেশ্য নিয়ে। স্থানীয় লোকদেরও জীবনযাত্রার রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, তাদের মনোবৃত্তির বিবর্তন ঘটছে।

তারপর আরও মৃদুভাবে বলেন, যারা দুদিনের জন্যে আসে তাদের চোখে পড়বার কথা নয়। কিন্তু কয়েক দিন থাকলেই কত কি না দেখা যায়। এমন কি বন্দুক হাতে পাখি শিকার করতে আসতে দেখা গেছে। বড় শহর গড়ে উঠেছে, শহরের লোকের মনোভাবও দেখা দেবে, আশ্চর্য কি? সেই সঙ্গে শহরের যা কিছু দুর্নীতি এখানেও ধীরে ধীরে মানুষের মনে বাসা বাঁধছে। কলির যুগধর্ম। এর প্রতিকারও নেই, প্রতিরোধও নেই।

চুপ করে শুনি। তাঁর কথার ভাবে, বলার ভঙ্গিমায় বেশ বুঝি, এটি অভিযোগ নয়। ভবিতব্যের স্বীকৃতি মাত্র।

আবার শান্তভাবেই তিনি বলেন, মানুষের মানসিক প্রবৃত্তি রক্তবীজের মত রক্তে থাকে। সুযোগ-সুবিধা পেলেই সজাগ হয়ে ওঠে। লোভনীয় কিছু না থাকলে মানুষও নির্লোভ থাকে। এখন এখানে অনেক কিছুই আসছে ঘটছে। এখানকার লোকেও দেখে শিখছে। তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতাবোধ রক্ষাকবচের কাজ করত—এখন তার প্রভাব যাচ্ছে। মানুষের নীচ বৃত্তিগুলি খাদ্য পেয়ে এখানকার মানুষের মনেও মাথা তুলছে—তারাও মানুষ হয়ে উঠছে। মানুষ-খেগো বাঘ, শুনেছি, মানুষের রক্তের স্বাদ পাবার পরই মানুষ-খেগো হয়ে ওঠে—তার আগে নয়। এও তেমনি আর কি!

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেন, দুঃখ করার কিছু নেই, করেও লাভ নেই। তবে এই শরীরটাকে অন্য কোথাও নিভৃতে সরানো প্রয়োজন। তীর্থক্ষেত্রের—বিশেষত হিমালয়ের এই সব অঞ্চলের—একটা বিশেষ প্রভাব আছে। কত প্রাচীন মুনি-ঋষির তপোভূমি। তাই তো বদরিকাশ্রমে এসে মন্দিরের অত কাছে থেকেও এ-পারে দূরে থাকা!

অভিযোগ শুনেছিলাম আর এক সাধুর কাছে।

ইনিও বাঙালী। বছর ত্রিশের উপর এখানে আছেন। হঠাৎ আমার ঘরে এসে হাজির হলেন। গেরুয়া বেশভূষা। বৃদ্ধ হলেও সক্ষম সবল দেহ। গোল মুখখানি সাদা-কালো দাড়ি-গোঁফে আচ্ছন্ন। অভ্যর্থনা করে বসতে বললাম। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনি এখানে ক'বার এসেছেন শুনেছি, কিন্তু কোনবারই আলাপ হয়নি। আমার কথা আপনাকে পুরী নিশ্চয় বলেছেন?

মনে পড়ল কলকাতা ছাড়ার আগেই এক স্বামীজি এঁর কথা বলেছিলেন বটে।

বললাম, হ্যাঁ। তা আপনি নিজেই কষ্ট স্বীকার করে এসে গেছেন।

তিনি বলেন, মন্দিরে রোজই আসি। এ-বাড়ি তো পথের ওপরেই।

তারপর শুরু করেন তাঁর বক্তব্য। স্থানীয় এক সেবাশ্রমের কর্মীদের বিরুদ্ধে অশেষ অভিযোগ।

বলেন, অনেকগুলি সাধুসন্ত সেখানে নিয়মিত ভাণ্ডারা পাচ্ছিলেন, হঠাৎ ক্ষেত্রের সেবাকার্য এখানে বন্ধ হল। কোন পূর্ব বিজ্ঞপ্তি নেই। সাধুদের দুর্দশার কথা কেউ একবার ভাবলেও না। শুধু তাই নয়। সাধুদের দান করার উদ্দেশ্যে যে-সব কম্বল এসেছিল, সেগুলি বাজারে বিক্রি হয়েছে। ক্ষেত্রের পুস্তকাগারে যে-সব ধর্মগ্রন্থ ছিল তা ওজন-দরে বিক্রি করেছে। এখনও বাজারে গেলে দেখা যাবে তাতে ঠোঙা তৈরি করে জিনিস বিক্রি হচ্ছে।

স্তম্ভিত হয়ে শুনি। তিনি উত্তেজিত হয়ে আরও অনেক কিছুই জানান।

ক্ষমাহীন চক্ষু ক্রোধে জ্বলতে থাকে। মন্তব্যের মধ্যেও আগুন ছোটে। বলেন, গেল, সব গেল—ধর্মের আর কিছুই রইল না;—পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সব। যাবে, নিশ্চয় যাবে। মহামায়ার খেল্ দেখবেন তখন!

ভাবি, গেরুয়াবাস তো নয়, যেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা। মূর্তিমান্ অভিশাপ।

সব শুনে আশ্বাস দিই, ফিরে গিয়েই কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে দেখা করে জানাব।

তাতে তিনি নিরস্ত হন না। তাঁদের উপরও তাঁর বিশ্বাস নেই। উত্তেজনাবশে আবার অভিযোগগুলির পুনরুক্তি করতে বসেন।

চুপ করে বসে থাকি। বাইরে তাকাই। চোখে পড়ে, অলকানন্দার উদ্দাম স্রোত। চিরন্তন। মঙ্গলময়। কর্ণকুহরে বেঁধে স্বামীজির ক্রোধোন্মত্ত বাক্যবাণ। সুতীক্ষ্ণ। বিষময়।

স্বামীজি বলেন, আমার কাছে তো শুনছেন, আমি এখানকার আরও কয়েকজনকে নিয়ে আসব, তাঁদের মুখেও শুনবেন। বাজারেও আপনাকে নিয়ে যাব—নিজের চোখে দেখবেন—যা কিছু বলছি সত্যি কিনা!

আমি প্রমাদ গনি। তৎক্ষণাৎ বলি, আর সকলে এসে নতুন কিছু বলবেন না তো? যা জানবার আপনার কাছেই তো জানলাম।

তাতে সন্তুষ্ট হন না। বলেন, অন্য লোকের কাছেও শুনুন। সত্যাসত্য নিজেই যাচাই করে দেখুন, যখন এসেছেনই এখানে।

বিনীতভাবে জানাই, ও-জন্যে তো এখানে আসা নয়। তবে খবরগুলি আপনি জানাতে চেয়েছিলেন, জানিয়েছেনও। আমার দ্বারা যেটুকু করবার নিশ্চয় করব। অন্য লোকের মুখে আবার শোনার প্রয়োজন নেই।

তবুও ছাড়েন না। সবাইকে দল বেঁধে আনতে চান।

ভাবি, অভাব-অভিযোগ-অপকীর্তি সে-সব তো আছেই; এখানে এসেও সেই অশান্তির দুর্ভোগ! স্বামীজিকে বলি, দেখুন, আপনি প্রাণখুলে সব জানিয়েছেন, এবার আমিও মনখুলে একটা কথা বলি। কিছু মনে করবেন না। এখানে এইসব আলোচনা আমার কাছে রুচিকর নয়। তবুও সব শুনেছি, যা করবার নিশ্চয় করব। আর, সত্য-যাচাই-এর কথা বলছেন? আপনার কথায় যদি বিশ্বাস করে থাকি, অপর লোকের কাছে যাচাই করার কথা ওঠে না। আর আপনার কথায় যদি সন্দেহ থাকে, অপরের কথাতেও যে সে-সন্দেহ্ থাকবে না, কে বলতে পারে? অতএব ও-প্রসঙ্গ আর না।

তিনি হেসে ওঠেন। বলেন, আচ্ছা থাক, ও নিয়ে আর নয়। অবশ্য বলে রাখি, আমার নিজের লাভ-ক্ষতি ওতে কিছু হয় নি। কয়েকটি অসহায় সাধুর দুরবস্থা দেখেই মনটা আকুল হয়ে উঠেছিল। আর লোকগুলির তীর্থক্ষেত্রেও আচরণ দেখে। কিন্তু যাক ও সব। এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনি হরেনকে চেনেন তো? হরেন—আমাদের হরেন গো!

ভাবি কয়েকটি হরেন নাম-ধারীকে তো চিনি। এঁর হরেনটি কে?

প্রশ্ন করে বুঝতে পারি। বলি, ওঃ! তার কথা বলছেন? আসার আগের দিনও দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। তার সঙ্গে যে প্রায় রোজই দেখা হয়।

স্বামীজি বলেন, তা আমি জানি। তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, তার মেয়ের বিয়েটা এখনও দিলে না কেন? বুড়ো বাপ এখনও রয়েছেন, এই বেলা দিয়ে দেওয়াই ভালো। সব দিক দিয়েই সুবিধে—তা সে বুঝবে না।

মেয়ের বিবাহের জন্যে হরেনের চিন্তা ও চেষ্টার কথা জানা ছিল। তাই বললাম, সে চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনও কোথাও যোগাযোগ হয় নি। পাত্র পছন্দ হয় তো কুষ্ঠি মেলে না, কুষ্ঠি মেলে তো পাত্র পছন্দ হয় না।

তিনি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বলেন, না—নাঃ। ওর কাণ্ডজ্ঞান নেই। বাপ থাকতে থাকতে কোথায় নিজের মেয়ের বিয়ের দায়িত্বটা কাটিয়ে নেবে, তার মর্মও বোঝে না। আমার নাম করে তাকে আপনি বলবেন।

এরপর তাঁর সঙ্গে যে কদিনই দেখা হয়েছে, হরেনের মেয়ের বিবাহের জন্যে তাঁর দুশ্চিন্তা প্রতিদিনই প্রকাশ পেয়েছে। এমন কি যেদিন ফিরে আসি সেদিনও তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তপ্তকুণ্ডে স্নান সেরে মন্দিরে চলেছেন। সিঁড়ির উপরে মন্দিরতোরণের কাছ থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছেন, আমরা নীচে রাস্তা দিয়ে চলেছি। দূর থেকে হাত তুলে নমস্কার করলাম। হাসিমুখে হাত তুলেও তিনিও চেঁচিয়ে বললেন, যাত্রা করলেন তাহলে! ধীরে ধীরে পথ চলবেন। বাড়ি পৌঁছে চিঠিতে পৌঁছানো সংবাদ দেবেন যেন। আর ভালো কথা, হরেনকে বললেন, বাপ থাকতে তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে দেয় যেন।

'আচ্ছা'—বলে চলতে থাকি। তাঁর কথাগুলি কানে কিছুক্ষণ বাজতে থাকে।

হিমালয়-বাসী সর্ব-ত্যাগী এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কার এক অনূঢ়া কন্যার বিবাহের জন্যে এ কি দুশ্চিন্তার নিগ্রহ!

আর একবারের একটি ছোট্ট ঘটনা। ছোট হলেও মনে উজ্জ্বল রেখা রেখে গেছে।

বিকেল বেলা। বদরীনাথে বাড়ির সুমুখে পায়চারি করছি।

এক স্বামীজি এলেন। গেরুয়া-বাস। লম্বা চেহারা। দাড়ি গোঁফ মাথা কামানো। হাতে দীর্ঘ দণ্ড।

কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো উমাপ্রসাদবাবু?

হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আপনি বাঙালী দেখছি। যাত্রায় এসেছেন নাকি?

বলেন, না। এইখানেই এক কুটিয়াতে থাকি। এখনই সেক্রেটারি মশায়ের কাছে শুনলাম, আপনি কাল এসেছেন। তাই আলাপ করতে এলাম।

বললাম, চলুন তবে, বসা যাক কোথাও। কোথায় বসবেন? আমি আছি সামনের এই বাড়িরই একটি ঘরে, সেখানেও যাওয়া যেতে পারে, নদীর ধারে নিরিবিলি কোথাও বসা যেতে পারে, কি বলেন?

তিনি প্রশ্ন করেন, হাঁটবেন একটু? তবে চলুন না—আমার কুটিয়াতে। নাঃ—ওপারে নয়। শহর ছাড়িয়ে মানা গ্রামের পথে যেতে অলকানন্দার ধারে। বেশিদূর নয়—আধ মাইলটাক হবে।

তাই চলি।

পথ থেকে ডাইনে নামতে হয় অলকানন্দার কূলে। নদীর ধারে সমতল ভূমি। সেইখানেই পাথরের দেওয়াল-দেওয়া ছোট্ট একটি বাড়ি। দুইখানি পাশাপাশি ঘর। সামনে ছোট বারান্দা। সম্মুখেই নদী। ঘরে বা বারান্দায় যেখানে বসা যাক—গঙ্গার দর্শন পাওয়া যায়।

স্বামীজি বলেন, এইখানে সনক-আদি ঋষিদের আশ্রম ছিল। অতি পবিত্র স্থান।

ঘরের ভেতর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন—আসবাবপত্র কিছুই নেই। ভূমিতে কম্বল-শয্যা। একটা কাঠের তক্তার উপর কয়েকখানি বই—সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা, ইংরাজীও। সবই ধর্ম-গ্রন্থ।

স্বামীজি বলেন, নিজেও পড়ি, মাঝে মাঝে অন্য সাধুসজ্জন ব্রহ্মচারীরা আসেন, তাঁদের কাছেও পাঠ করে শোনাতে হয়, আলোচনাও হয়। কেউ বা কখনও দু-একটা বই নিয়েও যান পড়তে। এই করে ও নিজের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে মনের আনন্দেই।

মনে মনে প্রশ্ন জাগে, কিন্তু আহারের ব্যবস্থাটা চলে কি করে? মন্দিরের প্রসাদ, না ক্ষেত্রের ভাণ্ডারা? প্রশ্ন করতে হয় না। কথায় কথায় প্রকাশ পায়।

স্বামীজি বলেন, এই ঘরটায় আমি আছি। পাশের ঘরটা খালি ছিল। কয়েকদিন হল এক ব্রহ্মচারী এসেছেন। এখন কিছুকাল থাকবেন, বলছেন। আমার সুবিধাই হয়েছে। লোকটি ভালো। শান্ত প্রকৃতি। উন্নতি করবেন মনে হয়। আমার ভোজনের ব্যবস্থা উনি নিজেই করে দেন। আমার এখন ও-সময়টা ছুটি—অর্থাৎ নিজের কাজে একটু বেশি সময় দিই।

'ভোজন' বললেন বটে, কিন্তু তার উপকরণটা কি তখনই জানতে পারি।

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে নদীর ধারের জমিটা দেখিয়ে বলেন, ঐ দেখুন আমার ক্ষেত। দেখবেন চলুন, কেমন আলু লাগিয়েছি। হচ্ছেও বেশ। এখানকার জমি যে বড় ভালো। পাহাড়ীরা এসব বোঝে না। এইখানটায় এক রকম শাক এনে লাগিয়ে দিয়েছি—হবে বলে মনে হয়। আমার খাদ্য শুধু এই আলু। লবণ ছেড়েছি আজ কবছর হল। অন্ন-ময়দা-আটা এ-সবও ছেড়েছি। শুধু ফলমূলই এখন আহার্য। কিন্তু ফল এখানে হয় না, বড় একটা আসেও না, তাই মূল ধরেই আছি। অবশ্য দুধটা কখন-সখন কেউ দিয়ে গেলে পাই। শহর থেকে এখানে অনেকে আসেনও। তাঁর অসীম দয়া।

নদীর তটে স্থানটি মনোরম লাগে। স্বামীজির সঙ্গও ভালো লাগে। বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হয়। গল্প করতে করতে কয়েকবারই দেখি তিনি বলেন, আপনি কাল এসেছেন, আমি একদিন পরে খবর পেলাম। পেয়েই চলে এসেছি। কাল পেলে কালই আসতাম। মাত্র আর দুদিন থাকবেন বলছেন,—একটা দিন এর মধ্যে চলে গেল বিনা পরিচয়ে!

আমি আশ্চর্য হই। সম্পূর্ণ অপরিচিত। পথিক-জীবনে হঠাৎ পরিচয়। নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া ঝরা-পাতার ক্ষণিকের তরে কূল ছুঁয়ে যাওয়া। আজকের দেখা, কালকের ভুলে যাওয়া, আবার হঠাৎ মনে-হওয়া। এতে একদিন বৃথা চলে-যাওয়ার দুঃখ ওঠে কোথায়? তার উপর সাধু-সন্ন্যাসী!

তাই জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা আপনি কবারই দুঃখ করলেন—একদিন আগে আলাপ হল না। নাই বা হল, তাতে ক্ষতি কি?

হেসে উত্তর দেন, লাভ-ক্ষতির কিছুই নেই জানি। তবুও, মনে ওঠে ও-কথা। আজ প্রায় ত্রিশ বছর কলকাতা ছেড়েছি। আর যাই-ও নি ও-অঞ্চলে। যাবার ইচ্ছাও হয় না। এখানেই নিজের সাধন-ভজন নিয়ে আছি। পূর্বাশ্রমে যখন শহরে ছিলাম এবং কলেজে পড়তাম তখন আপনার পিতাঠাকুর জীবিত। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য দান ভোলবার নয়। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু আমরা বাংলাদেশের তখনকার ছাত্ররা তাঁকে পিতার মতোই দেখতাম, ভক্তি করতাম। আজ এতদিন পরে হঠাৎ যখন শুনলাম তাঁরই এক ছেলে এসেছেন এখানে, তখনই, কেন জানি না, মনে হল, আমার এক ভাই এসেছে। তাই খবর পেয়েই চলে এলাম।

স্তব্ধ হয়ে শুনি। চোখে জল ঠেলে আনে। কঠিন-কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের অন্তরালে অলক্ষ্যে বয়ে-যাওয়া ভক্তি-প্রীতির ফল্গুধারা। মৃদু মধুর তার কলধ্বনি। অফুরন্ত তার উৎস। অমৃত সে-ধারা।

॥ ৩ ॥

যাত্রীদেরও মধ্যেও বিচিত্র প্রকৃতির লোক দেখি।

একটি যুবকের সঙ্গে একবার পরিচয় হল। বদরীনারায়ণের মন্দিরের চারিদিকে পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণের উপর পরিক্রমা করছে। প্রায় সব যাত্রী—এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীরাও করে থাকেন। এ পরিক্রমায় নাকি অশেষ পুণ্য আনে। একাগ্রতা যে আসে তাতে সন্দেহ নেই। তিব্বতী লামাদের হাতে যেমন 'ওঁ মণি পদ্মে হুং'—মন্ত্র-লিপি-ভরা ঘূর্ণিচক্র ঘুরতে থাকে, এখানেও তেমনি যেন কোন এক শক্তি অলক্ষ্যে বসে মন্দিরকে কেন্দ্র করে যাত্রীদের ঘোরাতে থাকেন। বন্‌বন্ করে ঘুরে চলেছেই।

ছেলেটিও তেমনি ঘুরছিল। এখানকার পুলিস-অফিসারটি তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

কালো রঙ। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। দাড়ি-গোঁফ কামানো। মাথায় একটা বড় রঙিন রুমাল ঘুরিয়ে বাঁধা—বেদুইনদের মতো। তারই তলা দিয়ে কপালে ও পিছনদিকে কয়েকগাছি ঘন-কালো কোঁকড়া চুল বেরিয়ে গেছে। টানা চোখদুটি জ্বলজ্বল করছে। টিকালো নাকটি চিরন্তন-জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে আছে। গায়ে লম্বা গরম কোট। পরনে কাপড়—লুঙ্গির মতন করে। খালি পা,—মন্দিরের মধ্যে হবারই কথা। হন্‌হন্ করে ঘুরছিল চরকির মত।

পরিচয়ে জানলাম মূর্তিমান চক্রই বটে।

পায়ে হেঁটে এসেছে বদরি-নারায়ণে—ত্রিবাঙ্কুর থেকে।

বললাম, ঘোরা শেষ হলে চলে এসো আমার আস্তানায়,—এই মন্দিরের বাইরেই।

হেসে বলে, ঘোরা আমার অত সহজে শেষ হবে না। চলুন, এখনই আপনার ওখানে ঘুরে আসি।

সবই তার 'ঘোরা'। অদ্ভুত তার জীবন। গল্প করে।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন-প্রদেশে দেশ। ত্রিচুর জেলায়। গ্রামের নাম পল্লীস্যেরী। নাম শুনে বলি, বুঝেছি, ওটা আমাদের ভাষায় হবে, বোধ করি, পল্লীশ্রী। সুন্দর নাম। তোমার নিজের নামটি কি?

হেসে বলে, বলছি,—সেটি অত সহজ বা সুন্দর নয়। মনে রাখতে পারবেন না, কাগজ দিন, লিখে দিই।

বড় বড় হরফে ইংরাজিতে লিখে দেয়—শ্রীঅবনপরন্তুমাধোয়ম্ অনন্তকৃষ্ণম্।

একত্রিশ বছর বয়স। ১৯৫৪ সালের ৩রা জুলাই দক্ষিণ-ভারত থেকে পায়ে হাঁটতে শুরু করে। ভারতবর্ষের নানান্ স্থানে ঘুরেছে। ৬৯৬২ মাইল অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছে ১০ই মে ১৯৫৬ সালে।

বলে, এ আমার জীবনের স্বপ্ন সফল হচ্ছে। স্কুল-কলেজে ইতিহাসের পাতায় পড়তাম—নিজের চোখেও দেখেছি—মানুষের একটা ধর্ম,—ঘর-বাঁধা। যেখানে বসবে—আশ্রয় খুঁজবে, মনোরম একটি গৃহ রচনা করতে পারলেই যেন পরম শান্তি। আমার রক্তে কিন্তু বাইরের ডাক। ঘর-ছাড়া মনকে কেবলই পথে ডাকতে থাকে।

কথা বলতে বলতে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর হেসে বলে, তা বলে ভাববেন না যেন ছন্নছাড়া আমার জীবন। বাপ-মার আমি আদরের সন্তান ছিলাম।

জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা এখন কেউ নেই নিশ্চয়?

আশ্চর্য হয়ে বলে, থাকবেন না কেন? বাবা-মা-দাদা সবাই আছেন। দেশে থাকেন। ধনী না হলেও সচ্ছল অবস্থা। আমিও কলেজ ছাড়ার পরই চাকরি পেয়ে গেলাম। কিন্তু আমার তখন হেঁটে বেরুবার নেশা লেগেছে। এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই, অথচ বাবা-মাকে ছেড়ে বহু দূরে বেরিয়ে পড়ার কথায় যেন জোর পাই না, চাকরির শিকল আরও জোর করে আমায় বাঁধল। মাসে দেড়শ টাকা মাইনে। কোন অভাব নেই,—তবুও মনে তৃপ্তি নেই। বিয়ের জন্য বাবা-মা ধরেন। কোন রকমেই রাজী হই না। বেশ বুঝি, ও-জীবন আমার নয়। রাত্রেও স্বপ্ন দেখি, আমি যেন চলেছি—পায়ে হেঁটে—দেশ থেকে দেশান্তরে, দূর-দূরান্তরে—পথের শেষ নেই—চলার শ্রান্তি নেই—আনন্দেরও সীমা নেই।

এমনি করে সে বলে যায়। কথার মধ্যেও তার চলচঞ্চল পদধ্বনি শুনি।

সে বলতে থাকে, অতৃপ্ত-বাসনায় শুধু স্বপ্ন দেখেই এইভাবে ক বছর কেটে গেল। তারপর একদিন এক জার্মান যুবক হঠাৎ এসে দাঁড়াল আমাদের অফিসের গেট-এ। মোটর-সাইকেল হাতে। গগল্‌স চোখে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে সেই সাইকেল চড়ে। মুখের লাল রঙ রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে। চোখমুখে কি উজ্জ্বল প্রফুল্ল ভাব। কথা বলে যেন আনন্দ উছলে পড়ে। ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে কত দেশের কত গল্প বলে।

তার ভ্রাম্যমাণ জীবনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সব। সেইদিনই সে আবার তার যাত্রা-পথে চলে গেল। কিন্তু অজানিতভাবে আমার শিকল ভেঙে দিয়ে গেল। তার পরদিনই আমি চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। কাঁধে এক ছোট্ট ঝোলা—সামান্য দুটো জামা-কাপড়। পকেটে আমার চাকরি থেকে সঞ্চিত সামান্য পুঁজি। কিন্তু মন-ভরা অসামান্য আনন্দ।

জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়িতে জানাও নি? পালিয়ে এসেছ?

আশ্চর্য হয়ে বলে, পালাব কেন? বাবা-মাকে বলেই এলাম। তাঁরা আমাকে সত্যি করেই চেনেন। তাই বাধা দেন নি, আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন। মা শুধু বলেছিলেন, দেখি কদ্দিন থাকতে পারিস্!

বললাম, প্রায় দু বছর হল বাড়ি ছেড়েছ, তাঁদের আর খবর পাও?

হেসে বলে, পাই বই কি। এই তো আজই চিঠি পেয়েছি। দেখুন না।

বার করে দেখায়। চার পাতা তাদের ভাষায় দীর্ঘ পত্র। বলি, পড়ে শোনাও, বাবা কি লিখেছেন।

সে শোনায়। দেশের সব খবর, খুঁটিনাটি অনেক কিছু।

বলে, ওসবে আমার আগ্রহ নেই, তবুও ওঁরা প্রতি চিঠিতেই জানান। টাকা পাঠাবেন কিনা জানতে চান। জানাই, এখনও তার প্রয়োজন নেই।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, চলে কি করে তোমার?

সে হেসে উত্তর দেয়, চলি তো পায়ে, তার খরচা নেই। আর খাওয়ার খরচ? সে আর কতটুকু? যা প্রয়োজন শুধু তাই খাই,—যেখানে যেমন পাই। তার মধ্যে শৌখিনতা নেই। যে টাকা সঙ্গে এনেছিলাম তা এখনও শেষ হয় নি। না হওয়ার আরও কারণ আছে। যেখান দিয়ে আসি, সুযোগ পেলে সেখানে কারও কোন কাজ করে দিই—ক্ষেতের কাজ, ঘরের কাজ, কখনও বা আমার অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিই—এইভাবে কিছু আয়ও হয়। তা ছাড়া কোথাও দেখেছি—বিশেষত গ্রামে—লোকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আহার্য দিয়েছে—আনন্দের সঙ্গে। পথের ছেলেকে ঘরে ডেকে খাওয়ানো—এতেই যেন তাদের তৃপ্তি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, দেখুন, ঐ যে বলছিলাম ঘর-বাঁধা মানুষের ধর্ম, ঠিক তেমনি আবার যাযাবর জীবনেরও একটা প্রবল আকর্ষণ আছে—মানুষের সেটাও একটা আদিম ধর্ম। আমি সেই জাতের।

হেসে বলি, তাই বুঝি মাথার ওপর বেদুইনদের মতো কাপড় বেঁধেছ?

সেও হেসে ওঠে। কাপড়টা টেনে মাথা থেকে খুলে ফেলে। মাথা-ভরা একরাশ লম্বা চুল চারিদিকে নেচে নেমে আসে। হাত দিয়ে মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বলে, এই জন্যেই বেঁধে রেখেছি। এ দুবছর চুল কাটিনি। এইবার এইখানে মুণ্ডন করব।

তার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ পরিবর্তন আসে। চোখের দৃষ্টিও শান্ত হয়। যেন আশ্বিনের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার পর শরতের গাঢ় নীল আকাশ, রূপালী রৌদ্র।

ধীরে ধীরে বলে, এখন হিমালয়ের এই অঞ্চলে দু-বছর কাটাব। এখানে মন্দিরের কিছু ওপরে একান্তে একটি গুহার মধ্যে এখন আছি। নিভৃতে শান্তভাবে দিন কাটে। মন্দির থেকে ধর্ম-পুস্তক নিয়ে যাই—পড়ি। সকালে সন্ধ্যায় একশো আট বার মন্দির পরিক্রমা করি। এতেও এক অনির্বচনীয় অনুভূতি!

দুজনের কেউই কোন কথা বলি না কিছুক্ষণ।

তারপর সে বলে, দু-বছর পরে হিমালয় থেকে নামব। এখানে আসার পথে পশ্চিম ও মধ্য ভারত, রাজপুতানা, কাশ্মীর ঘুরে এসেছি। নামার পর যাব পূর্ব ভারতে, তারপর দক্ষিণে। আপনাদের বাংলাদেশেও যাব—তখন আপনার সঙ্গে হয়তো আবার দেখা হবে।

হঠাৎ সজাগ হয়ে বলে, ভালো কথা, আপনার নাম-ঠিকানাটা লিখে দিন।

তার ডায়েরি বার করে হাতে দেয়। বেশির ভাগই তাদের মাতৃভাষায় লেখা, কচিৎ কোথাও ইংরাজিতে। খাতাটির প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা :

"Live for Truth and die for Truth."

॥ ৪ ॥

সেই চারণিকের সঙ্গে যে পুলিস অফিসারটি আমার আলাপ করিয়ে দেন তাঁর সঙ্গেও সেইদিনই আমার প্রথম পরিচয়।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে সাধারণ বেশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখ দেখে তাঁকে চিনলাম। মুখে পুলিসের ছাপ ছিল না, কিন্তু চেনার চিহ্ন ছিল।

কয় বছর আগে এই যাত্রা-পথে এক পাহাড়ী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। পোস্টমাস্টার। অতি অমায়িক ও সজ্জন। সকলেরই—বিশেষত যাত্রীদের সাহায্য করতে সব সময়েই প্রস্তুত। নিজের দপ্তরের কাজেও, অফিসের বাইরেও।

সে বছরেও দেখা হল পথে—শ্রীনগরে। অফিসঘরে টেবিলের উপর টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতির মধ্যে শব্দ তুলে বার্তা দিচ্ছেন, নিচ্ছেন। হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে উল্লসিত হন, আরে আপনি এ বছরেও এসে গেছেন! বসুন, বসুন—চা আনাই।

একজোড়া প্রকাণ্ড গোঁফের মধ্যে শুভ্র দাঁতগুলি বার করে হেসে ওঠেন। সাদরে অভ্যর্থনা করেন। কুশল সমাচার নেন। যেন পরম আত্মীয়ের সঙ্গে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ।

তিনি জানান, এবার বদরীনাথে আমার ভাই-এর সঙ্গে আলাপ করবেন। সেখানে থানার চার্জে এখন আছেন।

বদরীনাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভাইটিকে দেখেই চিনি। সেই বিরাট গোঁফের আর এক জোড়া। মুখের আকৃতিরও সাদৃশ্য আছে।

এগিয়ে গিয়ে নিজেই পরিচয় করি।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে? না হয়ে থাকে চলুন, আমার ওখানে উঠবেন।

বলি, থানায় তো? কিন্তু এমন কিছু তো করি নি যে ওখানে পুরবেন!

ভদ্রলোক হেসে ওঠেন। থাকার ব্যবস্থা হয়েছে জেনে নিশ্চিন্ত হন। বলেন, এবার যাত্রীর যা ভিড়, জায়গা পাওয়া খুব কঠিন। আমার ওখানে আশ্রয় দিতে হয় প্রায়ই। একা থাকি,—যথেষ্ট জায়গা আছে। এই শীতের দেশে বাইরে যাত্রীরা পড়ে থাকতে পারে না। যতটুকু পারা যায় তাদের সেবা করার চেষ্টা করি।

তাঁর ভাই-এর মতনই কথাবার্তা, ব্যবহারও। যদিও পুলিস!

একপাশে দাঁড়িয়ে গল্প করি। জিজ্ঞাসা করি, একা থাকেন বললেন, বাড়ির সব আনেন নি কেন? এখন তো ক'মাসই এখানে থাকতে হবে?

বলেন, ঠাণ্ডা জায়গা। অসুবিধে হয়। কিন্তু আসল কারণটি হচ্ছে খরচা। এখানে সামান্য জিনিসপত্রেরও কি ভীষণ দাম—নিশ্চয় জানেন। একদিন দু-দিনের জন্যে ততটা গায়ে লাগে না। তা ছাড়া যাত্রী যাঁরা আসেন তাঁরা খরচ হবেই জেনে আসেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে মাসের পর মাস এখানে সংসার চালানো অসম্ভব ব্যাপার।

মন্তব্য করি, কেন? এখানে থাকার জন্যে নিশ্চয় বাড়তি ভাতা পান আপনারা?

অফিসারটি দুঃখপ্রকাশ করেন, সেইটিই তো কথা। এই দূর-দুর্গম পাহাড়ের দেশে থাকলেও তা পাবার নিয়ম নেই। সে আইন হল হিল্-স্টেশনের জন্যে, আর এটা হিল্-স্টেশন নয়! সরকারের সোজা জবাব। এই নিয়ে লেখালেখি চলছে অনেকদিন থেকে। আশা করা গিয়েছিল, স্বাধীন ভারতে একটা সুরাহা হবে। কিন্তু তাও এখনও হল কই? অথচ দেখুন, প্রতি বছর মিনিস্টার, ডেপুটি-মিনিস্টার, হোমড়া-চোমড়া অফিসাররা সব বেড়াতে আসছেন—আর দেশের কি টাকাটাই না খরচ হচ্ছে শুধু তাঁদের জন্যে!—যাক, ও-সব দুঃখের কথা না আলোচনা করাই ভালো।

আমিও ভাবি, দেশের কি চরম দুর্ভাগ্য, হিমালয়ের এই দূর অঞ্চলেও এই সাধারণ মনোভাব জাগবার সুযোগ পাচ্ছে!

কথার মোড় ঘোরাই। জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি তো আপনার খালি বললেন, হাজতঘরগুলির অবস্থা কি?

তিনি বলেন, সে-ও শূন্য। আগে কখনও ব্যবহার করার প্রয়োজন হত না, শুধু শাসনের কটাক্ষ নিয়ে থাকত। বছর দুয়েক থেকে মাঝে মাঝে এখন খুলতে হয়। যাত্রীদের সঙ্গেই দু-একজন চোর-জোচ্চোর আসতে শুরু করেছে। বাস্ হয়ে এখন আসার সুবিধা হয়েছে কিনা! যাত্রীর সংখ্যাও যেমন বাড়ছে, চোরেরাও তেমনি তাদের কর্মস্থল বিস্তার করছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এবার এখানে এই এক মাসে মাত্র একটি কেস হয়েছে। কিন্তু তবু হয়েছে তো, স্বীকার করতেই হবে। হয়ত আরও হত—খুব কড়া নজর না রাখলে।

জিজ্ঞাসা করি, কি চুরি হয়েছিল?

বলেন, জিনিস সামান্যই। তাহলেও চুরি। তপ্তকুণ্ডের ধারে কাপড় রেখে যাত্রী স্নান করতে নেমেছিল —যেমন সবাই নামে। এবার কি রকম ভিড় দেখেছেন? সেই সুযোগে তার সেই কাপড়খানা ও খুচরা কিছু পয়সা একজন চুরি করে। তারপর থেকে ওখানে পুলিস-পাহারা দিতে হয়েছে, সাধারণ বেশেও ঘুরছে। এ-সব তীর্থস্থানে এমন ব্যবস্থা করার যে দরকারও হয় সেইটিই আমার কাছে লজ্জার বিষয়।

আমি তখনই সায় দিই যে এই তীর্থ পথে নিশ্চিন্ত মনে আসাটাই কত বড় শান্তি। চুরির ভয় নেই, ঠকবার আশঙ্কা নেই—পথ-জোড়া যেন আপন ঘর, চারিদিকে আপন জন। নিজের চোখেই দেখেছি, যাত্রী নেমেছে নদীতে স্নান করতে, তার টাকার থলিটি পাড়ে রেখে। স্নান সেরে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে, থলিটির কথা ভুলেই গেছে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মনে পড়ায় ফিরে গেছে, দেখে ঠিক তেমনি পড়ে আছে। অনেকের হয়তো নজরে পড়েছে, কিন্তু তবুও কেউ চোখ দেয় নি।

কয় বছর আগেকার এক ঘটনা পুলিস অফিসারের কাছে গল্প করি।

শীতকাল। কলকাতা শহর। বিকেলবেলা কাজ সেরে বাড়ি ফিরেছি। দেখি দুজন পাহাড়ী অপেক্ষা করছে। অপরিচিত মুখ। প্রশ্ন করে জানতে পারি, যমুনোত্রীর পাণ্ডার ছেলে, অপরটি তার গ্রামবাসী। ওপরে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম। অবাক হয় ইলেকট্রিক আলো-পাখা দেখে; ভয়-বিহ্বল হয়ে সসঙ্কোচে চেয়ারে বসে।

জিজ্ঞাসা করে জানি, দেশ ছেড়ে এই তাদের প্রথম বার হওয়া, শহরও দেখা।

অনেকে যেমন মনে করেন, শহর-সভ্যতা ছেড়ে হিমালয়ের পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়া একটা প্রচণ্ড দুঃসাহসিক ব্যাপার, এদের পক্ষেও এখানে আসা তেমনি এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। প্রথমে পাহাড়ে হাঁটা-পথ,—পঞ্চাশ-ষাট মাইল হলেও সেটা কিছুই নয়; কিন্তু তারপর প্রথম বাস চড়া, প্রথমে ট্রেনে ওঠা এবং অবশেষে কলকাতা শহর। সে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা! বিস্ফারিত নয়নে তাদের সেই কাহিনী শোনায়। কথার স্রোতে অপরিচয়ের সঙ্কোচভার ভেসে যায়।

বলে, দু-দিন আগে কলকাতায় পৌঁছেছি। স্টেশনে নামলাম। চারিদিকে তাকিয়ে তাজ্জব লাগছিল। চড়াই-উৎরাই নেই। দূর দেখা যায় না। এ কি! বাইরে এসে একটা মানুষ-টানা গাড়িতে উঠলাম। তাকে কলকাতা নিয়ে যেতে বললাম। সে তবুও জিজ্ঞাসা করে, কোথায় নিয়ে যাব? তাকে যত বলি কলকাতা, —তবুও সে বোঝে না, বলে, কলকাতায় কোথায়? এমন সময় একজন লোক এসে আমাদের জিজ্ঞেস করলে, কলকাতায় কোথায় যাবে?—তাকেও বললাম, কলকাতায় যাব, আবার কোথায়? তখন সে গাড়ির লোকটাকে কি বলে দিল, সে একটা ধর্মশালায় নিয়ে গেল।

বুঝলাম, ভাগ্যক্রমে একজন সৎ লোকের নজরে পড়েছিল, তাই তাদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাও হয়েছে। এখন হ্যারিসন রোডে এক ধর্মশালায় আছে এবং পাণ্ডার যে খাতাটি সঙ্গে এনেছে, তাতে লেখা যাত্রীদের নাম-ঠিকানা বার করে তাদের বাড়ি যাচ্ছে। আমার কাছে আসাও তেমনি খাতার পাতায় নাম বার করে।

কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য শুনি। তার ভগিনীর বিবাহ দিতে হবে, অর্থের প্রয়োজন। পাণ্ডাজী কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, অর্থ-সংগ্রহের জন্যে। তাঁর ধারণা, এখানে পথের দুধারে টাকা ছড়ানো

আছে, তুলে নিতেই যা কষ্ট! দুজনের যাতায়াতের খরচ পড়বে দেখলাম প্রায় দেড়শো টাকা।

আমাদের বাড়িতে এসে তাদের থাকতে বললাম। জিনিসপত্র নিয়ে আসার কথা বলায় বললে, জামা-কাপড় তো এই গায়েই রয়েছে, আর এই খাতাটা—অন্য আর কিছু নেই।

জিজ্ঞাসা করি, বিছানা কম্বল, কিছু আনো নি?

দুজন মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর বলে, হ্যাঁ ছিল—দুখানা কম্বল ও একটা লোটা। তা এখন আর নেই।

গল্প শুনি, দুজনে ট্রেনের কামরায় ওপরের বাঙ্কে রাত্রে শুয়েছিল। ভোর হলে নীচে নেমে বসে—ওপরে তাদের কম্বল ও লোটা গুছিয়ে রাখে। হু-হু করে ট্রেন চলেছে, জানালা দিয়ে ভোরের বাতাস আসছে—আরামে বসে ঝিমোচ্ছিল। এমন সময় একটা বড়ো স্টেশন এল। বহু যাত্রী। কত লোক উঠল, নামল। তারা যেমন বসে ঘুমুচ্ছিল তেমনি ছিল। ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে। ওদের ঘুম ভেঙেছে। পরের স্টেশনে জল নেবে বলে লোটার সন্ধান করতে দেখে—লোটাও নেই, কম্বলও নেই। সহযাত্রীরা অম্লান বদনে বলে, আগের স্টেশনে নিশ্চয় কেউ নিয়ে চলে গেছে! নজর রাখো নি কেন? অমন নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজে ঘুমুলে যাবেই তো! কোথাকার লোক সব! উজবুক!

গল্প করতে করতে আশ্চর্য হয়ে বলে, তাজ্জব ব্যাপার! একজনের জিনিস আর একজন নিয়ে গেল, এ হয় কখনও?

ওরা কয়দিন আমাদের বাড়িতে ছিল। কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি তাদের ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলাম—যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, মন্দিরেও পাঠালাম। ট্রামে বাস্‌-এ চড়ল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তাদের সারাদিনের নব নব অভিজ্ঞতার উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী শুনতাম। ঘরের টেবিলের উপর নির্বিচারে ধূলি-মলিন পা দুখানি তুলে দিয়ে বসত—আরাম করে। মনে কিন্তু ধূলার স্পর্শ নেই। প্রাণখুলে কথা বলত। একজন হয়ত কথা বলছে, অপরজন তখন রাস্তার দিকে তাকিয়ে গান ধরেছে গলা ছেড়ে। হঠাৎ কোন শহুরে সভাভব্য বন্ধু এসে পড়লে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, কি ব্যাপার হে? বলতাম, এসো, বসো, এ-সব আমার পাহাড়ী বন্ধুরা।

একদিন পাঠালাম সিনেমায়। কৃষ্ণ-চরিত্রের কি একটা ফিল্ম ছিল। দেখে এসে সে কী উত্তেজনা। বলে, আজ তো দর্শনই মিলে গেল, কৃষ্ণজির বাঁশীও শুনে এলাম।—বলে আমাকেই নমস্কার করে বসে। তাদের সঙ্গে যে লোকটিকে পাঠিয়েছিলাম তার কাছে শুনি, সিনেমা-হলে তাদের চুপ করে বসিয়ে রাখাই মুশকিল—জয়ধ্বনি করে চেঁচিয়ে ওঠে, সিট ছেড়ে ছুটে যেতে চায় শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করতে।

বোঝে না, কলিকালে সিনেমার পর্দায় অদৃশ্য দেবতাও কত সহজে ধরা পড়েছেন! আসল পরমহংসদেব ও নকল শ্রীরামকৃষ্ণে প্রভেদ বোঝাই ভার। আর কিছুদিন পরে পানের দোকানে তো নিশ্চয়ই, সম্ভবত ঘরে ঘরেও সিনেমার রামকৃষ্ণের ফটো চালু হয়ে যাবে।

এমনিভাবে আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে তাদের কয়দিন কাটল। কিছু অর্থ-সাহায্যেরও ব্যবস্থা হল। তারপর টিকিট কাটিয়ে ট্রেনে বসিয়ে দেবার জন্য একজন লোক দিয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলাম। বিদায়-কালে তাদের জিজ্ঞাসা করি, এবার দেশে ফিরছ,—এত ঘুরে গেলে, দেখে গেলে—সবচেয়ে তাজ্জব কি দেখলে বল?

তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, সত্যিই অনেক কিছু দেখেছি যা কখনও ভুলব না, এ যেন এক স্বপ্নের দেশ।—বলতে বলতে গম্ভীর হয়। তারপর বলে, অনেক কিছুই তাজ্জব দেখলাম বটে, কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব লেগেছে, এ-দেশে একজনের জিনিস অপর একজন নিয়ে নেয়! কি আশ্চর্য!

শহর-সভ্যতার বিস্ময়-সমুদ্র মন্থন করে এই তাদের বিষময় চরম অভিজ্ঞতা।

পুলিস অফিসার গল্প শুনছিলেন। বললেন, আমার নিজের জেলার লোকের মিথ্যা গর্ব করছি না। সত্যি, ঐ হল তাদের প্রকৃত রূপ। গাড়োয়ালে এখনও এমন গ্রাম আছে যেখানে তালা-চাবি যে কি পদার্থ ও কি তার প্রয়োজন, লোকে তা মোটেই জানে না। আমাদের এখানে একটা প্রবাদ আছে জানেন? ঘরে তালা পড়েছে—মানে গৃহস্থের সর্বনাশ হয়েছে!

শুনে আমি বলি, ও-ধরনের প্রবাদ আমাদের অঞ্চলেও আছে যে! বোধ হয় তালার প্রচলনের সঙ্গে

প্রবাদটাও চলন হয়েছে। তবে যে-সব গ্রামের কথা আপনি বলছেন সে-রকম গ্রাম আমি নিজেও চোখে দেখেছি। অবশ্য বাস-এর, এমন কি, যাত্রার পথেও এখন আর সে-সব দেখা যায় না। যাত্রাপথ ছেড়ে কিছু ভেতরে গেলেই পাওয়া যায়। তবুও কি রকম বিশ্বাসী মানুষ এখনও এ-পথে আছে—এই সে-বছরও তার পরিচয় পেলাম। ফাটার ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠেছি। পুরানো বুড়ো চৌকিদার যাবা মাত্রই আমায় দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলে, আপনি এসে গেছেন! সে-বছর আপনার চাকুটা এখানে ফেলে গিয়েছিলেন যে। আমি তুলে রেখে দিয়েছি। খুব সুন্দর জিনিসটা। কত লোক ওটা টাকা দিয়ে নেবার জন্যে ধরাধরি করেছিল—একজন দশ টাকাও দিতে চেয়েছিল—আমি কিছুতেই দিই নি,—বললাম, তাঁর জিনিস, আমি দেব কি করে? তিনি নিশ্চয়ই আবার আসবেন, এলেই দিয়ে দেব। গত বছর এখানে আপনি আসেন নি, দু বছর ধরে আমি অপেক্ষা করছি।—তখনই গিয়ে নিয়ে আসে, অতি যত্নভরে বার করে দেয়। যেন কত মহামূল্য এক সামগ্রী!

বার করতেই চিনতে পারি। ঠিক বটে—আমারই। মোগলসরাই স্টেশনে কেনা অনেকগুলি ফলা-সমেত সেই ছুরিটি। সেটা যে সে-বছর এইখানে ফেলে গিয়েছিলাম তা জানতামই না, সন্দেহ করি নি। বাড়ি ফিরেও ছুরির কথা মনে হয় নি, পরের বার আসার সময় খুঁজে পাই নি, এই পর্যন্ত।

ছুরিটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে চৌকিদার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। যেন একটা দায়মুক্ত হল।

আমিও তখনই খুশী-মনে ছুরিটি তাকে আবার দিয়ে দিই, বলি, এটি তোমার কাছেই থাক। এটি তোমায় দিলাম।

এ-সবের মর্ম সে বোঝে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। হয়তো ভাবে, যার জিনিস তাকে দিলাম, ফেরত দেয় কি!

তার এই আচরণে প্রকৃত আনন্দ পাই। অশিক্ষিত, অতি-দরিদ্র। তবুও—অথবা, তাই-ই হয়তো—অপহরণ করতে শেখে নি, লোভের বশীভূত হয় নি। এরাই তো এ-অঞ্চলের মাথার মণি।

অফিসারটি বলেন, আমাদের শিক্ষাহীন দেশে এখনও সেই আদর্শ ও ধারা বজায় আছে। মনে হয়, দেশের লোকের মজ্জাগত সংস্কার ও দৃঢ় ধর্ম-বিশ্বাস এর কারণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সভ্যজগতের নতুন হাওয়া লেগে এবার ঘুণ ধরতে শুরু করেছে। তবে যাত্রীদের মধ্যে যে-সব চুরি হয়, সাধারণত এখনও বাইরে থেকেই লোক আসে এ-সব করতে।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, কি ধরনের চুরি এখানে হয়?

তিনি বলেন, স্থানবিশেষে প্রকারভেদও হয়। এখানেও তাই। এখানকার আবহাওয়া অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। যাত্রীরা এখানে আসেন প্রাণ-ভরা ভক্তি নিয়ে। যা কিছু করেন, যা কিছু দেখেন সব কিছুই ভক্তিরসে সিক্ত করে নেন। গেরুয়া দেখলেই মনে করেন সাধু, ভস্মমাখা হলে তো কথাই নেই। তখনই ভাবেন, হিমালয়ের সাধু-সন্ন্যাসী! দর্শনেই মুক্তি। সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণিপাত করেন। ধূর্ত লোকে এসব জানে। গেরুয়া গায়ে অথবা ভস্ম মেখে যাত্রীদলে যোগ দেয়। বলে, হিমালয়ের গুহায় বাস করি, কেদার-বদরী তীর্থ করতে বেরিয়েছি।—পুণ্যলোভী যাত্রীরা ভোজন দেয়, পরে কখনও সঙ্গীও করে নেয়। সাধু-সঙ্গের পরম ভাগ্য, পরমানন্দ। সাধুর ওপর অন্ধ বিশ্বাস এমনই আছে, ক'দিনের আচার-ব্যবহারে সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। এদিকে সাধু-বেশী সঙ্গীটি দৃষ্টি রাখে কোথায় যাত্রীর টাকার থলি। তারপর একদিন হঠাৎ অদৃশ্য—লোকটিও, পথের পুঁজিও।—এই ধরনের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, ধরাও পড়েছে দু-একজন। আবার আর এক ধরনের চুরিও দুবার হয়েছে। পথের সঙ্গীভাবে যাত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। একই পথের যাত্রী। দুর্গম পথ। একসঙ্গে যায়। একই চটিতে ওঠে। সুখ-দুঃখের গল্প করে। এই সুযোগে যাত্রীর বাড়ির খবরাখবর নেয়, ঠিকানাও জানে। তারপর একদিন পথে কোন বড় চটীতে থেকে যায়, সঙ্গী-যাত্রীকে জানায় 'আপনি এগিয়ে যান, আমি দুদিন এখানে কাটিয়ে যাব—জায়গাটায় মন বসে গিয়েছে—আবার দেখা হবে পথে।'—বন্ধু-বিচ্ছেদের বেদনার ভানও করে। যাত্রী যাত্রা-পথে এগিয়ে যায়, দুঃখপ্রকাশ করে বলে, দুদিন একসঙ্গে বেশ থাকা গিয়েছিল। তারপর, ধূর্ত লোকটি যাত্রীর নাম নিয়ে তার বাড়ির ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে, 'পথে হঠাৎ সর্বস্বান্ত হয়েছি, টেলিগ্রাফে টাকা পাঠাও, পোস্টমাস্টারের কেয়ারে।' পোস্টমাস্টারের সঙ্গে ইতিমধ্যে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আলাপ করে—তার সামনেই তার পাঠায়। একদিন অপেক্ষা করার পরই টাকা আসে। না এসে উপায় নেই। তারপর উধাও! প্রায়

মাসখানেক পরে, বাড়ি ফিরে যাত্রী সব কিছু জানতে পারে। তখন কোথায় কে! শুধু পথের সঙ্গীটির বন্ধুত্বের উজ্জ্বল স্মৃতিখানি কালিমায় লিপ্ত হয়ে যায়।

পুলিস অফিসারটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হাজার হাজার যাত্রীর মধ্যে দু-একটা চুরি হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়, জানি। তবে এই তীর্থ-পথের ওটা একটা কলঙ্ক হয়ে ওঠে। এই দেখুন না কত বড় লজ্জার বিষয়—এখন কোন কোন চটীতে পুলিসকে যাত্রীদের সাবধান করিয়ে দিতে হয়—যেন নিজের নিজের জিনিসের উপর ঠিকমত নজর রাখে—যথাসাধ্য চেষ্টা করছি এর প্রতিরোধ করতে। কিন্তু ভাবনা হয়, আমাদের দেশের লোকের কথা ভেবে, এ প্রবৃত্তি যেন ওদের মধ্যে না প্রবেশ করে।

দুশ্চিন্তারই কথা বটে।

এই সেদিন সংবাদপত্রে পড়লাম, যুক্তরাষ্ট্রের এটর্নি জেনারেল তাঁর বার্ষিক বিবৃতিতে বলছেন, ১৯৫৮ সালে এক বছরের মধ্যে আমেরিকায় প্রতি ৬৪.২ মিনিটে একটি করে নরহত্যা (murder), ৪৬.৪ সেকেন্ডে একটি করে সিঁদেলচুরি (burglary) এবং প্রতি ৬.১ মিনিটে একটি করে নারীধর্ষণ (rape) হয়েছে। সেই বৎসরে শুধু গুরুতর আইনগত অপরাধের সংখ্যা উঠেছে—১৫,৫৩,৯২২।

সভ্যদেশের সভ্যতার কলঙ্কিত পরিচয়!

॥ ৫ ॥

কিন্তু কালের প্রবল প্রবাহ রোধ করবে কে?

মনে পড়ে, সাধুজির সেই নির্বিকার অভিমত;—যুগ-ধর্মের প্রভাবে তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদাহানির কাহিনী, —সভ্য-সমাজের সমস্যাগুলির হিমালয়ের এই নিভৃত অঞ্চলেও অবাঞ্ছিত প্রবেশ।

প্রতি বছর আসা-যাওয়ার পথে তার নিদর্শন পাই।

সে-বছর পথ ধরে চলেছি। কে একজন পথের একটু উপর থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে—ইংরাজিতে—Have tea here, Sir, good tea। তাকিয়ে দেখি, একটা ছোট দোকান। বাইরে একটা গাছ, তার তলায় বেঞ্চ। সেইখানে দাঁড়িয়ে এক পাহাড়ী ছেলে। একটু পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।—আমার তখন চা খাওয়ার দরকার নেই। তাই বললামও। তবুও সে ছাড়ে না। বলে, সকাল থেকে বসে আছি—একটিও যাত্রী এখানে বসে নি। কড়ার দুধ তেমনি রয়েছে, দেখুন না। হিন্দী ইংরাজি মিশিয়ে কথা বলে।

ছেলেটিকে দেখে কৌতূহল জাগে, মায়াও হয়। উঠে গিয়ে বলি, তাহলে দু-গ্লাস তৈরি করো।

আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনি তো একা! সঙ্গী কেউ পেছনে আসছেন বুঝি?

বলি, করো তো তুমি ভালো করে তৈরি!

দুজনে একসঙ্গে চা খেতে খেতে ছোট্ট তার জীবনের কাহিনী শুনি।

সেই বছর স্কুল-ফাইনাল পাস করেছে। একটু গর্বের সঙ্গেই বলে, সেকেন্ড ডিভিসনে।—কিন্তু উৎসাহ থাকলেও আর কলেজে পড়ার মত অর্থ-সংস্থান নেই। মাইল তিনেক দূরে গ্রাম। বাবা আছেন, অন্য ভাই-ও আছে। সামান্য জমি-জমা,—তাঁরাই চাষবাস করেন, সংসার চলে যায়। এর এখন আর ক্ষেতে গিয়ে কাজ করার মত মন নেই। বলে, বাবার সঙ্গে তাই নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেছে। তাহলে লেখাপড়া শিখতে গেলাম কেন?

অগত্যা এই ছোট দোকানটুকু খুলেছে, কিন্তু চলছে না, আর এতে হবেই বা কি? আমাকে ধরে, কলকাতায় নিয়ে চলুন আমাকে—আরও পড়তে পারলে তো ভালোই, নয়ত সেখানে চাকরি দেবেন একটা।—ছলছল্ চোখে বলে, জীবন কি আমার এইভাবে নষ্ট হয়ে যাবে?

দেখি, শহরের সেই একই সমস্যা এখানেও দেখা দিয়েছে। গতানুগতিক শিক্ষার স্বাদটুকুই পেয়েছে। সে-শিক্ষা কার্যকরী নয়। জ্ঞানের পিপাসা জেগেছে—মেটাবার ক্ষমতা নেই। বেকারের গ্লানি এসেছে। মনের ও গৃহের শান্তি ভেঙেছে।

ভাবি, গাড়োয়ালে অন্তত একটা মিলিটারি কলেজও তো খুললে পারে। এখানকার ছেলেদের সেনা-বিভাগে যোগ দেবার আকর্ষণ বহুকাল ধরেই আছে।

আমাদের বদরীনাথের পাণ্ডাজির নাতিটিও পাস করেছিল। পাণ্ডাজি আমায় ধরলেন, কলকাতায় থেকে আরও লেখাপড়া করবে। তাঁদের গ্রামে ডাক্তার নেই—ডাক্তার হবে।

শেষের প্রস্তাবটা শুনে ভালো লেগেছিল। মন হল, সত্যিই,—গভর্নমেন্টও যদি এখান থেকে ভালো ছেলে বেছে খরচ দিয়ে ডাক্তারি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন—অনেক ছেলের ভবিষ্যৎ খোলে, দেশেরও উপকার হয়। কয়েক জায়গায়—যাত্রা-পথে সরকারী হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্সারি আছে, নইলে কোনও গ্রামেই একজনও ডাক্তার নেই, লোকে চিকিৎসাও প্রায় না। যে-সব রোগ ওষুধে সারবার কথা, ওষুধ না পেয়ে লোকে তাতে মারা যায়। শিশু-মৃত্যুর তো কথাই নেই। স্বাস্থ্য-রক্ষার অতি-সাধারণ নিয়মগুলিও জানে না, এ-সবের প্রয়োজনীয়তারও বোধ নেই। মানস-সরোবর যাবার পথে একদিন আমাদের একটা কুলির প্রবল জ্বর আসে। এক সঙ্গীর কাছে ওষুধ ছিল, তিনি তাকে খাইয়ে দিয়ে বললেন, চুপচাপ কম্বল গায়ে শুয়ে থাক। কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখি, সে লোকটাকে ঘিরে অন্য কুলিরা বসেছে এবং সর্দার কুলি তাকে কি একটা গাছের পাতাসমেত ডাল দিয়ে খুব মারছে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি?—শুনলাম, ওর জ্বরের প্রকৃত কারণ ওরা ধরতে পেরেছে। ওকে দানায় পেয়েছে। তাই তার চিকিৎসাও চলেছে!—জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা কিসের ডাল?—শুনি, বিছুটি!—ভাবি, চমৎকার চিকিৎসা! লোকটার কিন্তু সেই দিনই জ্বর ছেড়েছিল। আমার সঙ্গী বলেন,—আমরাও জানি,—তাঁর ওষুধে। কুলিরা বলে, তাদের চিকিৎসায়। এই সব বিষয়ে এই ধরনেরই ওদের মূঢ় বিশ্বাস। সেখানে উন্নতির ক্ষেত্র আছে।

গাড়োয়ালে একবার এক গ্রামে গেলাম। যাত্রাপথ থেকে অনেকখানি ভেতরে। সেখানে এক পরিচিত অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে। খবর না দিয়ে হঠাৎ পৌঁছুই। আমাদের পেয়ে তাঁর সে কি আনন্দ। ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী সেখানে থাকেন। ছেলেরা ভালো করে লেখাপড়া শিখে বড় বড় চাকরি করে—ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আছে। ক্বচিৎ কখনও গ্রামে আসে। বেশ বড় গ্রাম। কিন্তু একটিও দোকান নেই। সংসারে যার প্রয়োজন সব ঘরে আছে। তার বাইরে কোন কিছুর দরকার হলে দশ মাইল দূরে যাত্রাপথে যে শহর আছে, সেখান থেকে আনতে হবে। ভদ্রলোকের কিছুদিন থেকে পায়ে একটা ব্যথা হয়েছে—মাঝে মাঝে অসহ্য যাতনা হয়, ফোলেও। চিকিৎসার দরকার। কিন্তু ডাক্তার নেই। পাহাড়ের পাঁচ হাজার ফুট নীচে সেই দশ মাইল দূরে সরকারী হাসপাতালের একজন মাত্র ডাক্তার। তাঁকে এখানে আনানোর অনেক অসুবিধা, এঁরও যাওয়া অসম্ভব। অতএব চিঠি লিখে চিকিৎসা চলছে, রোগ-ভোগও চলেছে।

এইসব মনে পড়ে। তাই পাণ্ডাজির নাতিকে ডাক্তার করানোর অভিপ্রায় শুনে রাজী হই, কিন্তু তখনই মনে আশঙ্কা জাগে, পাহাড়-প্রদেশের শান্ত, নিরীহ ছেলে—হঠাৎ কলকাতার ছাত্রসমাজের ও শহর-সভ্যতার মধ্যে গিয়ে কি পরিণতি হবে কে জানে! পাণ্ডাজিকেও সে-কথা জানাই। তিনি বলেন, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

ছেলেটি কলকাতায় আসে। মন দিয়ে পড়াশুনাও করে। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি কলেজে তার ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় না। তারপর ভালো ভাবেই এম্.এস্-সি. পাস করেছে। এখন কলকাতাতেই একটা ভাল চাকরি করছে। আচার-ব্যবহারে, নম্রতায় কোন পরিবর্তন হয় নি। তার ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য এসেছে। কিন্তু গাড়োয়াল তাকে হারিয়েছে। প্রতি বছরে একবারের জন্যে দেশে যাওয়াও তার সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এ রকম আরও অনেককে জানি। গাড়োয়ালে বাড়ি। উচ্চ শিক্ষা পেয়েছেন। এখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভালো ভালো চাকরি করেন। গাড়োয়ালে সে-সব চাকরির বা কাজের কোন সুযোগই নেই। দু-তিন বছর অন্তর কয়েকদিনের জন্যে যদি একবার দেশে যানও—সে যেন 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হয়ে থাকা। তাঁদেরও মন বসে না—নিজেদের লোকেদের সঙ্গে প্রাণখুলে আর মিশতেও পারেন না।

এ শিক্ষালাভে গাড়োয়ালের উন্নতি হয় নি, কয়েকটি লোকের উপকার হয়েছে। গাড়োয়ালের বহু ছেলেরা যারা এখন সাধারণ শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন পথ খোলে নি, বরং ব্যর্থতার গ্লানিতে মন তিক্ত হয়ে উঠছে।

আর একবারের এক ঘটনা। বাইরের লোকের প্রভাবও কি ভাবে আবহাওয়া বিষাক্ত করে তোলে।

এই ১৯৫৯ সালে। কেদারনাথ থেকে ফিরছি। বাস্ যে পর্যন্ত গেছে—কাঁক্‌রাঘাটেতে সকাল আটটায় নেমেছি। এইবার বাস্-এ বসে রুদ্রপ্রয়াগ চলে আসব। কুড়ি মাইল পথ। দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব। টিকিটের জন্যে নাম রেজেস্ট্রি করতে গিয়ে খবর পেলাম,—দুটি মাত্র বাস্ এখন চালু আছে। আমাদের নামের নম্বর পড়ল—২৪৬। দিন দুই তিন পরে যেন খোঁজ নিই। কিছুদিন থেকে মাত্র বাস্ ঐ পর্যন্ত আসছে—তাই সাময়িকভাবে কয়েকটি দোকান খুলেছে। ছোট জায়গা। তাকিয়ে দেখে বুঝলাম, শ'খানেক যাত্রীও হবে না, নম্বরটা বাড়িয়েই লেখা হচ্ছে। তার কাবণও সুস্পষ্ট। কিছু পরে নিজের চোখেও দেখলাম—পুলিসের বা কন্ডাকটারের সঙ্গে একটু ব্যবস্থা করা!

এ-সব আমার ভালো লাগে না—বিশেষত এই হিমালয়-পথে। পাহাড়ী সঙ্গীকে বলি, কুড়ি মাইল মাত্র, হেঁটেই যাব। গতবারও তো এ পথ হেঁটেই গিয়েছিলাম।—সে বলে, দাঁড়ান। আর একবার চেষ্টা করব। প্রিন্সিপাল সাহেবের একজন পুরানো ছাত্র ওখানে রয়েছে মনে হল।

অবশেষে আশ্বাস পাওয়া যায়, দুপুরে বারোটায় টিকিট মিলবে। পেয়েও ছিলাম, এবং বাস্ যখন ছাড়ল—কোথায় সেই ২৪৬ যাত্রী! একটিও পড়ে নেই—বরং বাসে জায়গা খালি পড়ে!

পথ থেকে একটু উপরে একপাশে ছোট্ট একটা দোকান। সেইখানে সেই চার ঘণ্টা আশ্রয় নিয়েছিলাম। ছোকরা দোকানদার—বছর ষোলো বয়স। ইংরাজিতে বলে, আমি সাধারণ দোকানী নই। আমি ছাত্র। আমার কাছে 'ফার্স্টক্লাস পিওর' ঘি আছে। নিন—এখানে আর কারও কাছে পাবেন না—সর্বত্র বনস্পতি।

শুনি, বাস্-এর পথে অগস্ত্যমুনিতে স্কুলে পড়ে। এখন ছুটি। তাই এখানে দোকান চালাচ্ছে।

ভাবলাম, বলছে ভালো ঘি, একটু নেওয়াই যাক। একটা ছাত্রকে সাহায্য করা হবে। নিই। কিন্তু রাঁধতে গিয়ে দুর্গন্ধ বেরোয়। ভাজা জিনিস ফেলে দিতে হয়।

ছোকরা হাসে। বলি, এই তোমার খাঁটি ঘি? ছাত্র হয়ে এইসব করছ?

সে নির্লজ্জের মত বলে, বাঃ, ব্যবসা করছি—ওসব একটু-আধটু করতে হয়। ওতে আবার দোষ কি? ছ টাকা করে সের বলেছিলাম, না হয় একটু কমিয়েই দেবেন।

তারপর জেরা করে বার করি, বাইরের একটা লোক ওখানে কটা দোকান খুলেছে—এইসব ছেলেদের বসিয়ে চালাচ্ছে।

বাস্ হয়ে অনেক সুবিধা হয়েছে সন্দেহ নেই। বিশেষত যাত্রীদের। দশদিনের হাঁটা-পথ এখন দু-দিনেই চলে যাওয়া যায়। কিন্তু তাতে এইসব অঞ্চলের লোকেদের অনেক ক্ষতিও হয়েছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে দু-তিন মাইল অন্তর সারি সারি চটি ছিল। পথের নিকটস্থ গ্রামাবাসীরা এইসব দোকান চালাত— ব্যবসা করত। এখন দেড়শো মাইলের উপর বাস্ হয়ে গেছে—এসব দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে। ছোট জায়গায় বাস্ দাঁড়াবারও বিশেষ দরকার হয় না, ছুটে বেরিয়ে যায়—যাত্রীদেরও কেনাকাটার তাগাদা থাকে না। স্থানীয় বহু লোক এইভাবে ব্যবসা হারিয়েছে, তাদের মনে একটা বিক্ষোভও জেগেছে। বাস্ চলল তাদেরই দেশে, অথচ লোকের দৈনন্দিন জীবনে কোন উপকার হল না। গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার ক'জনেরই বা প্রয়োজন হয়? যাদের হয়ও সকলের ভাড়া দেবার ক্ষমতাও থাকে না। জিনিসপত্রের দামও কিছু কমে নি, বরং বেড়েই চলেছে। হবার মধ্যে শৌখিন জিনিসপত্র ওখানে পৌঁছে গেছে। বাস্ চালু করার সঙ্গে সঙ্গে এইসব লোকেদের যদি অন্য কোন উপজীবিকার বা কোন কিছু কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হত, লোকেদের উপকার হত, এই ক্ষোভেরও কারণ হত না। বাস্ আসায় আর এক বিপরীত বিপত্তিও ঘটেছে। বাইরে থেকে অনেক উৎসাহী ব্যবসাদার এসে গেছে। শহরগুলিতে নতুন দোকান খুলে বসছে। স্থানীয় ব্যাপারীরা সেখানেও ব্যবসাচ্যুত হচ্ছে।

দেশের লোকেরা তাই প্রথম বাস্ চলার আনন্দ-উদ্দীপনা কেটে গেলেই দেখে, সভ্যতার যান তাদের মুখের অন্ন নিয়ে এল না, মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেল। অথচ বাস্-কোম্পানি লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে তাদেরই দেশের বুকের উপর দিয়ে চলে যায়। তারা নিঃসহায়, নিরুপায়।

চাষের কথা বলি। পাহাড়ে চাষ হয় পাহাড়েরই গায়। স্তরে স্তরে ক্ষেতের ধাপ উঠেছে—সাহেবরা বলেন, terraced cultivation। দূর থেকে দেখতে সুন্দর লাগে। মোষের লাঙলে চাষ হয়। কঠিন পরিশ্রম করে এই পাহাড়ের পাথুরে জমি তৈরি করতে হয়। পাহাড়ের বুকে লাঙল দেওয়া—সে কি সহজ কথা! তবুও মানুষের অদম্য উদ্যম, বুক-ভরা আশা। কিন্তু অলক্ষ্যে বসে ভাগ্যবিধাতা হাসেন। চাষীও জানে। তাঁর সঙ্গে যে তার ভয়-ভক্তি-প্রেমের সম্পর্ক—বিশ্বাসের দৃঢ়-বাঁধনে বাঁধা।

সে বছর আসছি গঙ্গোত্রী থেকে কেদারনাথের পথে। মধ্যে পাওয়ালির চড়াই। পাহাড়ীরা বলে, জার্মান কো লড়াই। একদিনও পথে বৃষ্টি পাইনি। তবুও রোজই ছাতা-লাঠি দুই সঙ্গে রাখি—যদি আসে। একদিন আঠারো মাইল হাঁটতে হবে, চড়াইও অনেকখানি উঠতে হবে। ভাবি, বৃষ্টি তো কোনদিনই হয় না—আকাশ পরিষ্কার—ছাতার ভার অযথা বওয়া কেন? সঙ্গে নিই না। মাঝপথে হঠাৎ দূর পাহাড়ের মাথায় মেঘ দেখা দেয়। ছোট একখণ্ড মেঘ—কিন্তু ঘন কালো। চোখের সামনে সেই ছোট মেঘ বড় হয়ে ফুলতে থাকে, পাহাড়ের মাথা থেকে অন্য পাহাড়ে আকাশ বেয়ে লাফিয়ে ছুটে আসে। নিমেষে আকাশ, পাহাড় চারিধার ছেয়ে ফেলে। দিনের আলো নিবে যায়।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে তখনও আট মাইল বাকি। এই দুর্যোগে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু আশ্রয় বা মেলে কোথায়? এ-পথে চটি নেই। ছুটে চলি। ঢোল বাজানোর একটা শব্দ আসে না? হয়তো কাছাকাছি লোকালয় আছে। ঠিকই তাই। পাহাড়ের বাঁক ঘুরলেই নজরে পড়ে কিছু নীচে এক ছোট গ্রাম। পথ ছেড়ে সেইদিকে নামি। একটি লোকের সঙ্গে দেখা। আশ্রয়ের কথা বলি। সানন্দে সে আমাদের নিয়ে চলে, বলে, জল তো নেমে এল, গ্রামে যেতে ভিজে যাবেন। ঐখানে আমার নতুন একটা ঘর করছি—সেইখানে আপাতত উঠবেন চলুন। এখনও কিন্তু দরজা-জানলা বসে নি।

মুষলধারে বৃষ্টি নামে। ছুটে সেখানে উঠি। সুন্দর দোতলা বাড়ি। মাথার জল মুছতে মুছতে বলি, না থাক দরজা-জানলা—এখানেই আজ রাত কাটাব—আপনার আপত্তি যদি না থাকে!

তিনি বলেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। আমার বাড়ি ধন্য হবে। কিন্তু খাবার ব্যবস্থা আমি ঘর থেকে করে নিয়ে আসব। এ বৃষ্টি থামতে এখনও ঘণ্টা-দুই লাগবে—তারপরও চলবে থেকে থেকে এখন সাতদিন।

আবহাওয়া সম্বন্ধে কথা বলেন যেন আবহবিদ্যা-বিশারদ্। অবশ্য, তাহলেই না-মেলার আশঙ্কা হয় বেশি।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, এ-সব বোঝেন কি করে?

তিনি দ্বিধা না করে বলেন, কেন? বাজনা শুনছেন না? দেবতার পূজা হচ্ছে যে। বৃষ্টির অভাবে ফসলের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা হয়েছিল, তাই দেবতাকে বার করতে হয়েছে। এই সাতদিন আশপাশের সব গ্রামগুলি ঘুরে এলেন—প্রতি গ্রামে ঘরে ঘরে পুজো পেয়ে এলেন। সাতদিনের পরিক্রমা। শেষ হলেই বৃষ্টি নামবেই—দিনসাতেক চলবেও। আজ শেষ হল—বৃষ্টি আসবেই আমরা জানতাম। চিরকাল এ দেখেও আসছি।—চলুন না, দর্শন করবেন—খুব জাগ্রত দেবতা আমাদের।

জল কমলে দেখতে যাই। দুটো বাঁশ সমান্তরালে রাখা। তার উপরে মাঝখানে চেঁচাড়ি-দিয়ে-তৈরি হাতদেড়েক উঁচু একটা ছোট মন্দিরমত। ভিতরে রঙিন-কাপড়ে-ঢাকা একটি ছোট মূর্তি। বাঁশ দুটোর দুইদিকে দুজনে লোক—কাঁধের উপর তাই নিয়ে উন্মাদের মত নাচছে, একবার হেঁট হচ্ছে আবার লাফিয়ে উঠছে, কখনও বা ঘুরে ঘুরে চক্র দিচ্ছে। দুজন ঢুলিও ঢোল বাজাচ্ছে নেচে নেচে। সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক। সকলেই বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে গেছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। সকলেই আনন্দে বিভোর। দেবতা তাদের পূজা নিয়েছেন, প্রার্থনা শুনেছেন।

আমাদের গৃহস্বামী বলেন, আপনারা পাহাড়ে আসতে ভালো করে নজর করেন নি। ইন্দ্রদেবের আদেশে ঐরাবত এলেন যে প্রথমে ঐ পাহাড়ের মাথায়—তারপর তাঁর বিশাল শরীর ফুলিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে পা রেখে দাঁড়ালেন—প্রকাণ্ড শুঁড় তুলে জলের ধারা ছড়াতে লাগলেন।

ফসলের জলের অভাব হলে এই হয় এদের জল পাওয়ার ভরসা।

কিন্তু দেবতাও সব সময় প্রসন্ন থাকেন না। চাষী তাও জানে। পাহাড়ের ঢালু গায়ে ক্ষেত তৈরির এত কষ্ট, ফসলের এত আশা—সব কিছুই হয়তো একদিনের পাহাড়-ধসায় ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে

যাবে। যায়ও তাই। তবুও মানুষ হাল ছাড়ে না, নইলে পেট চলে না। আবার বহু কষ্ট স্বীকার করে অন্যত্র নতুন ক্ষেত তৈরি করে। আবার একদিন সেখানেও ভাঙে। এই তাদের চাষের জীবন। তবুও হাসিমুখে সব মেনে নেয়। ভালো ফসল হলে নিজেদের পরিশ্রমের গর্ব করে না, মাথায় তুলে নেয় দেবতার অশেষ করুণার দান বলে। আবার প্রকৃতির বিপর্যয়ে ফসলের ক্ষতি হলে দেবতাকে দোষ দেয় না, বলে, নিজেদের কোন পাপেরই এই শাস্তি।

চাষীদের এই শঙ্কাকুল অনিশ্চিত জীবনে আশা দিতে হবে, আত্ম-ভরসা জাগাতে হবে, তাদের সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশের চাষীদের সমস্যা আর হিমালয়ে চাষের সমস্যার মধ্যে রূপভেদ আছে, তার প্রতিকারেরও তাই ভিন্ন রূপ দিতে হবে। হাল-আমলের গতানুগতিক চাষের উন্নতির পন্থাগুলি সব সেখানে চলে না।

আর একটি ঘটনা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। নতুন আইন-কানুন প্রবর্তনের কথা।

গাড়োয়ালের এক গ্রামে এক পাহাড়ী-বন্ধুর বাড়িতে ক'দিন আছি। একদিন গল্প হচ্ছে, হঠাৎ তিনি আমায় বললেন, একটা আইনের প্রশ্ন করি। উত্তরাধিকারী হবার আমাদের কি নতুন আইন রয়েছে বলুন তো?

আমি বলি, এখানেও আইনের প্রশ্ন? কি ব্যাপার বলুন, উত্তর দিচ্ছি।

তাঁর এক বিশেষ বন্ধুর কথা। কিছুকাল আগে মারা গেছেন। গ্রামের মধ্যে ছোট একটি বাড়ি, অল্প জমি-জমা। সেইখানে থাকতেন। সাধারণ অবস্থা। অভাব ছিল না, শান্তি ছিল। প্রথম পক্ষের একটি মাত্র মেয়ে। এ পক্ষের দুটি ছেলে। কোন স্ত্রী জীবিত নেই। ছেলে দুটি বড় হয়েছে। বাড়িতে থাকে, ক্ষেত-খামারের কাজ করে। কয়েক বছর আগে মেয়েটির বিবাহ দিয়েছেন। একমাত্র মেয়ে, মা-হারা। বিয়ে দিতে অনেক খরচ করেছিলেন। জামাইটি এ-দেশের হলেও বহুদিন দেশ-ছাড়া। বাইরে থেকে লেখাপড়া করেছে, এখন পাঞ্জাবে ভালো চাকরি করে। অবস্থা বেশ ভালো। কিন্তু সমাজে এঁদের চেয়ে কিছু নীচু। তাই বিয়ের প্রস্তাবে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আপত্তি উঠেছিল। তবুও পাত্রটি ভালো বলে ভদ্রলোক হাতছাড়া করেন নি; সম্পত্তির খানিকটা বিক্রি করে বিয়ে দেন। বিয়ের পর জামাই আর আসে নি। জাত সম্বন্ধে দু-একটা মন্তব্য নাকি তার কানে গিয়েছিল। মেয়েও আর আসে নি। বাপের শেষ অসুখের খবর পেয়েও নয়। কিন্তু মারা যাবার কিছুদিন পরেই এক উকিলের চিঠি—বাড়ি ও জমির অংশ মেয়ে দাবী করে। ছেলেরা চিঠি পেয়ে সন্ত্রস্ত, কি করবে বোঝে না। পরামর্শই বা করবে কার সঙ্গে? চুপচাপ বসে ছিল। সম্প্রতি সমন এসেছে কোর্ট থেকে—ভগ্নী, ভাইদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে—তার অংশের দাবী করে।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন, মেয়েদেরও কি ছেলেদের সঙ্গে স্বত্ব হয়েছে? এই কি নতুন আইন? মেয়েটার বিয়ে দিতে সম্পত্তির খানিকটা তো বিক্রী করে দিতে হল—আর ওই ছোট একটা পাথরের বাড়ি, তার অংশ নিয়ে মেয়ে-জামাই করবেই বা কি, আর তার ভাগই বা হবে কি করে? নগদ টাকাই বা ছেলেরা পাবে কোথায়?

আমি বলি, ও-সব তর্ক এখন আর চলবে না। দেশের ভাগ্য-বিধাতারা এসব নতুন আইন করেছেন —কেননা, সমাজে ও দেশে মেয়েদের সমান অধিকার দেওয়াই উদ্দেশ্য, নইলে দেশে মঙ্গল আসবে না, জাতি-হিসেবে জগতে পেছিয়ে থাকবে।

ভদ্রলোক বলেন, গ্রামের লোকেরা এ-সব কিছুই জানে না। কোথা থেকে আইন করে তাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। এতে তো এখানকার সব সংসার ভেঙে যাবে। গাড়োয়ালে প্রথম এই ধরনের মামলা হল, শুনলাম। আরও হবে নিশ্চয়। অথচ এখানকার লোকে কোর্ট-আদালত জানেই না—কখনও দরকারও হয় না।

আমি বলি, কোর্ট পর্যন্ত যাবে কেন? মেয়েদের অংশ ছেড়ে দিলেই হয়!

বন্ধু বলেন, ছোট বসতবাড়ি—তার মধ্যে অংশ ছাড়া, সে কি সম্ভব?—তারপর হঠাৎ চিন্তিত হয়ে বলেন, আমার নিজের কথাও তো তাহলে ভাবতে হয় দেখছি। মেয়েদের সব ভালোভাবে বিয়ে দিয়েছি, —জামাইদের কাছে বাইরে থাকে। এখানে মাঝে মাঝে আসেও।—নাঃ, তারা কেউ ওরকম হবে না।

তবু আইনে যদি অধিকার দিয়ে থাকে—তারাই বা দাবী ছাড়বে কেন?—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সম্পত্তি থাকাও এক বিপত্তি!—গালে হাত রেখে চুপ করে ভাবতে থাকেন।

চারিদিকে আকাশ-চুম্বী গিরিশ্রেণী। বিরাট নিস্তব্ধতা। সেই অচল হিমাচলের নিভৃত অন্দরে প্রাচীন সংস্কারের অচলায়তন। সেই দুর্গম গিরিপ্রাচীর ভেদ করে প্রগতির আকস্মিক তুফান পাহাড়ী মানুষের শান্ত জীবনে দুশ্চিন্তার ও অশান্তির প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে।

॥ ৬ ॥

বদরীনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণ যাত্রীদের মিলন-ক্ষেত্র। নতুন যাত্রী কারা এলেন, কত লোকই বা এলেন, সেখানে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করলেই অনেকটা ধারণা করা যায়। যাত্রী-সংখ্যা তো কম নয়। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অবিরত আসছে। উঠছে, ভাঙছে, ফিরছে। শহরে প্রবেশ করার মুখে কর্তৃপক্ষের একটা দপ্তরও আছে—যাত্রী-সংখ্যা গণনার জন্যে। প্রতি দলের দলপতির নামধাম, কয়জন সঙ্গী—সব লেখা হয়। মে-জুন মাসে যাত্রায় সব চেয়ে ভিড়। প্রতিদিন হাজারখানেক যাত্রী—কখনও বা তারও বেশি—আসতে থাকেন। পথখোলার দিন—অর্থাৎ বছরের প্রথম যেদিন মন্দির খোলে—পাঁচ-ছয় হাজার যাত্রী হয়। প্রায় ছয় মাস মন্দির খোলা থাকে, আজকাল বাস্ চলাচল হয়ে সর্বসমেত লাখখানেকেরও উপর যাত্রী বছরে যায়। আগেও বহু যেতেন, সে-সময়েও বছরে পঞ্চাশ-ষাট হাজার হত। তবে তখন যাত্রীদের মনে নানারকম ভয় ছিল, ভাবনা ছিল,—এখন অনেক কমে গেছে, কেদারনাথের যাত্রা, বাস্ হয়ে সেই অনুপাতে বাড়ে নি। ও-দিকেও বাস্‌পথ এগিয়েছে, কিন্তু অনেকে আজকাল দুবার বাস্-বদলের ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে শুধু বদরীনাথেই যান। সারা তীর্থপথ ঘোরাতে তাঁদের উৎসাহের অভাব, সম্ভবত সময়েরও টানাটানি। তাই শুধু বদরীনাথ দশ-বারো দিনেই ঘুরে আসেন। এ যাওয়ার সার্থকতা কম। যাঁরা অবশ্য দুবছরে ধীরেসুস্থে দু জায়গায় যেতে চান—তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। সে-রকম এক দম্পতির সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল।

বদরীনাথ থেকে ফিরে আসছি। পথের পাশে চটিতে কাঠের বেঞ্চের উপর দুজনে বসে চা খাচ্ছেন। সাধারণ যাত্রীর মত বেশভূষা নয়—তাই বিশেষ করে চোখে পড়ল। ভদ্রলোকের পরনে হাত-কাটা শার্ট, ফুলপ্যান্ট—বুটের সঙ্গে ব্রিচেস্-এর মত পট্টি দিয়ে বাঁধা. মাথায় ক্যাপ, চোখে রঙিন চশমা, হাতে লাঠি। ভদ্রমহিলার সুশ্রী চেহারা, পরনে ফুল-কাটা নানান্ রঙে চিত্রিত সিল্কের শাড়ি, মাথায় রোদ আটকাবার জন্যে প্রকাণ্ড এক স্ট্রহ্যাট, চোখে নীল চশমা, ঠোঁটে গালে লাল রঙের প্রসাধন। তাঁরও কাছে এক লম্বা লাঠি।

চটিতে সাধারণত চা দেয় মোরাদাবাদী গেলাসে। আজকাল কোথাও কোথাও কাপ-ডিসের প্রচলন হচ্ছে। গেলাসগুলি গরম হয়ে যায় অতি সহজেই। রুমাল বা সেই জাতীয় কাপড় দিয়ে না জড়ালে হাতে ধরা যায় না। এঁরা দুটি রঙিন রুমালে সেই ভাবেই ধরেছিলেন। পান করছেন দেখলাম খুব উপভোগ করে। আমাকে দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, ঠিক কটা বেজেছে বলতে পারেন?

হেসে উত্তর দিই, ঠিক সময় কি, তা জানা নেই। অনেকদিন শহর ছাড়া। ঘড়ি মেলাবার সুযোগ পাইনি। তবে আমার ঘড়িতে কটা বেজেছে বলতে পারি।

সময় বলি। তাঁর ঘড়িটা থেমে গিয়েছিল, তিনি চালিয়ে নেন। আমি বলি, এ-সব পথে এক-আধ ঘণ্টার তফাত হলেও ক্ষতি নেই—এখানে কেউ সময়ের সে-ভাবে মূল্য দেয় না, দরকারও হয় না।

তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। শিক্ষিতা মহিলা। সাহেবী কায়দায় ইংরাজি বলেন।

ভদ্রলোক বলেন, দেখুন, আমাদের একটা অনুরোধ রাখতে পারেন? আমাদের দুজনের কাছে দুটো ক্যামেরা রয়েছে। ছবিও তুলছি অনেক। উনি আমার ছবি তোলেন, আমি ওঁর তুলি—কিন্তু দুজনের ছবি একসঙ্গে তোলা হচ্ছে না। আমার ক্যামেরাটা ঠিক করে আপনার হাতে দিচ্ছি—আমরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াব—একটা ছবি যদি কষ্ট করে তুলে দেন—

মুখে সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক স্ত্রীকে নিয়ে দাঁড়ান।

আমি সানন্দে ছবি তুলে দিই। দিয়ে বলি, একটু দাঁড়ান। আমারও একটা অনুরোধ আছে। এটা আমার অজানা ক্যামেরা—ঠিক উঠল কিনা জানি না। আপত্তি যদি না করেন, আমার নিজের ক্যামেরায়

একটা ছবি নিই—ওতে ঠিকই উঠবে, ভরসা রাখি।

ওঁরা আরও খুশী হন। ছবি তোলা হয়। কলকাতায় এসে ওঁদের পাঠিয়েও দিই।

ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছিল। সিন্ধু-প্রদেশে বাড়ি ছিল। পাকিস্তানের পর সব ছেড়ে আসতে হয়েছে। মিলিটারি এয়ার অফিসার। ফ্লাইট্ লেফ্‌টেনেন্ট। দিল্লীতে এখন আছেন। এক মাসের ছুটি নিয়েছেন। সস্ত্রীক বদরীনাথ বেড়াতে চলেছেন। এযাত্রায় কেদারনাথ যাবেন না। বলেন, এবার এটাই শুধু করা যাক। ভালো লাগে তো আসছে বছর আবার এক মাস ছুটি নেব—তখন কেদারনাথ ঘুরে আসা যাবে। ভালো যে নিশ্চয় লাগবে মাত্র দুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারছি। ধীরেসুস্থে পায়ে হেঁটে চলেছি। ইচ্ছে হলেই চটিতে বসি—চা খাই। সারাদিনে দু মাইল—চার মাইল গেলেও ক্ষতি নেই। এক মাস সময় হাতে রয়েছে—কম নয় তো! দুজনে বেশ দেখতে দেখতে গল্প করতে করতে যাওয়া যাচ্ছে। রাস্তা দেখছি ভালোই—শুধু পাতালগঙ্গার কাছে দেখলাম এক-জায়গায় ভেঙে গেছে—সারানো চলছে—সেইখানটায় একটু সাবধানে পার হতে হল। যারা কাজ করছে তারাই হাত ধরে পার করিয়ে দিলে। আমি এঁর একটি ছবি সেখানে তুলে নিয়েছি—এই ড্রেস—সাজগোজ—আর হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া-জামা লেঙটি-পরা ধুলোমাটি মাখা এক গাড়োয়ালি। দুজনকে চমৎকার মানিয়েছিল। বলে কৌতুক-দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকান।

মহিলাও হেসে উঠে বলেন, বটে! আমার কথাটা বলা হল—আর নিজের কি? মিলিটারি অফিসার। মস্ত বীরপুরুষ! সে-জায়গাটা পার হতে গিয়ে হঠাৎ পায়ের তলায় একটা ছোট পাথর একটু সরে গেছে—আর অমনি—ওঁর তখনকার মুখের চেহারাটা যদি দেখতেন।—যে-লোকটা হাত ধরে ওঁকে পার করছিল, দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমিও নিয়েছি সেই অবস্থায় একটা ছবি তুলে। দেব তোমার কমান্ডারের কাছে পাঠিয়ে।

দুজনে এইভাবে হাস্য-পরিহাস করতে থাকেন। 'বাই' 'বাই' বলে এগিয়ে চলেন।

দেখি, মন-ভরা আনন্দ নিয়ে চলেছে। যেন দুটি রঙিন পাখি—বনের মধ্যে গাছের এ-ডালে ও-ডালে বসতে বসতে উড়ে চলে। জানি, আর দুদিন চলার পর রঙের চটক যাবে, কিন্তু মনের আনন্দ কমবে না।

সেই ভদ্রমহিলার অত রঙিন বেশভূষা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও পাহাড়ের পথে দৃষ্টিকটু লাগে নি। কিন্তু চোখে লেগেছিল বদরীনাথের মন্দিরের মধ্যে আর এক মহিলার সাজসজ্জা দেখে।

দর্শনের জন্য যাত্রীর তখন বেশ ভিড। মন্দিরের মধ্যে গর্ভগৃহের দরজার সামনে একটু জায়গা নিয়ে বসতে যাচ্ছি, হঠাৎ নজরে পড়ল সকলের দৃষ্টি বিগ্রহের প্রতি নয়—দরজার একধারে পাথরের যে উঁচু লম্বা বেদীমত বসবার জায়গা আছে সেই দিকে। তাকিয়ে দেখি একটি রূপসী মহিলা সেখানে বসে। রঙ-বেরঙের খুব দামী ও উজ্জ্বল শাড়ি পরা। অঙ্গ-ভরা হীরা-মুক্তার অলঙ্কার। তাঁর পাশেই বসে আছেন এক নধরকান্তি পুরুষ—গেরুয়াধারী। এমন ভাবে আছেন যে ইনি মহিলাটির সঙ্গী বলে বুঝতে ভুল হয় না। এই বিচিত্র সংসর্গ ও মন্দিরের মধ্যে রূপসজ্জার এমন উৎকট প্রদর্শন অদ্ভুত লাগে, যাত্রীরাও দেবতা ভুলে মানুষের লীলা দেখে।

লীলাই বটে!

মন্দির থেকে বেরিয়ে পরিচয় পাই। এক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রের কোন এক মঠের মঠাধীশ। অতএব বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। পরিধানে ওটা ঠিক গেরুয়া নয়, গেরুয়া অনুরূপ আর এক কি রঙ, শুনি। সঙ্গে সহধর্মিণী। তাঁদের মঠের নিয়মে বিবাহে বাধা নেই। সস্ত্রীক তীর্থ-দর্শনের পুণ্য অর্জন করতে বেরিয়েছেন।

তা করুন। কিন্তু দেবস্থানের উপযোগী বেশভূষা করাও যে ধর্মেরই এক অঙ্গ, সে বোধের অভাব হয় কেন, বুঝি না। দক্ষিণ-ভারতে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করতে হলে পুরুষদের খালি গায়ে যাবার প্রথা আছে। দেহের সাজসজ্জা বাইরে ফেলে দেবতার কাছে যেতে হবে—এ-কথা ভাবতেও ভালো লাগে; উত্তরভারতে সেরূপ কোন রীতি নেই; হিমালয়ের এই সব শীতাঞ্চলের মন্দিরে হবারও উপায় নেই। কিন্তু তবু সর্বত্রই মন্দিরে বেশভূষার শালীনতা যাত্রী মাত্রেই মেনে চলেন। এতে মনে তৃপ্তিও আনে। মনে পড়ে, আমাদের দেশের পূজার্থিনী মহিলাদের কথা। কি শুচিশুভ্র রূপ-সজ্জা, স্নান সেরে গরদ বা তসরের

শাড়ি-পরা, ভিজা চুল—এলো করে কাঁধ বেয়ে পিঠের উপর ছড়িয়ে রাখা, এক হাতে নৈবেদ্যের থালা, চন্দন, ধূপকাঠি, অপর হাতে সদ্য-তোলা ফুলের সাজি,—মুখভরা স্নিগ্ধ পবিত্র ভাব। ধন-দৌলতের জৌলুস নয়, উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাসের বিকিরণ নয়—সহজসুন্দর ভক্তি-প্লুত অপূর্ব মূর্তি!

মন্দিরে দেব-দর্শনে একটা আনন্দ আছে। কেন আছে, তার মধ্যে যুক্তিতর্ক চলে না। মানুষের বিচিত্র মন। কোন্ পথ দিয়ে তার আনন্দ আসে, দুঃখ জাগে—সব সময়ে তার কারণ পাওয়া যায় না। মন্দিরের বাইরের আবহাওয়ার মধ্যে মনের যে ভাব, মন্দিরে প্রবেশ করে বিগ্রহের সামনে দাঁড়াতেই সেই মনেরই একটা অকস্মাৎ পরিবর্তন আসে। বেশ লাগে বসে বসে মূর্তির সেবা-পূজা-আরতি দেখতে।

প্রাতে ও রাত্রে নির্বাণ-দর্শন। ভোরে রাত্রির অঙ্গাবরণ একে একে সব খুলে ফেলা হয়। তখন দর্শন পাওয়া যায় বেশভূষাহীন শুধু পাথরের মূর্তির। সৌম্যদর্শন নারায়ণ। যোগাসনে আসীন। পূজার অধিকারী একমাত্র রাওয়াল। দেবতাকে স্পর্শ করার আর কারও অধিকার নেই। দক্ষিণ-ভারতের নাম্বুদ্রী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। গর্ভগৃহে আর একজন সাহায্যকারী আছেন—নায়েব রাওয়াল। সব গুছিয়ে রাওয়ালজির হাতে তিনি এগিয়ে দেন। আর কারও ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। দ্বারের বাইরে দর্শনগৃহে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-আচার্য-উপাসকগণ সুর করে সমস্বরে বেদপাঠ করেন, স্তোত্র পড়েন।

এরই মধ্যে এক সময়ে বিগ্রহের লক্ষণাদি ব্যাখ্যাও করে দেন একজন,—রাওয়ালজি সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল দীপ নিয়ে সেই সব লক্ষণ দেখিয়ে দেন।

কালো পাথরের মূর্তি। প্রায় ফুট দুই উঁচু। কেউ বলেন যোগাসন, কারও মতে সিদ্ধাসন। চরণ দুখানি দেখা যায়; চরণে পদ্ম চিহ্ন—বর্ণনায় শুনি। দুইটি হাত কোলের উপর রাখা—স্পষ্ট দেখা যায়। কারও মতে চতুর্ভুজ মূর্তি—অপর দুইটি হাত একসময়ে থাকার কয়েকটি নিদর্শন মূর্তির সঙ্গে দেখানো হয়। কম্বু-গ্রীব—প্রদীপের আলোকেও শাঁখের ন্যায় রেখা গ্রীবায় স্পষ্ট ফোটে। যোগী নারায়ণ—শিরোভাগ থেকে জটাভার নেমে এসেছে দুদিকে কাঁধের উপর। বুকের উপর উপবীত, মধ্যখানে ভৃগু-পদ-চিহ্ন। বিশাল-বক্ষ। ক্ষীণকটি। সুন্দর লীলায়ত মূর্তি। কিন্তু মুখমণ্ডলের অস্তিত্ব নেই—যেন কিসের আঘাতে অবলুপ্ত হয়েছে—এমনি মসৃণ, সমতল।

এ-মূর্তি কোন্ দেবতার তা নিয়ে মতভেদ আছে। সে কথাও প্রচার করা হয়। বৈষ্ণবেরা এই বিগ্রহে দেখেন—চতুর্ভুজ নারায়ণ। শৈবরা বলেন, দ্বিভুজ জটাধারী শিবমূর্তি। শক্তি-উপাসকদের মতে—দেবী ভদ্রকালীর মূর্তি। জৈনরা বলেন, ইনি তীর্থঙ্কর। আবার কারও মতে এটি ধ্যানী বুদ্ধ-মূর্তি; নায়ায়ণের প্রাচীন মূর্তি অপসারিত হবার পর এই মূর্তি তিব্বত থেকে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রবাদ আছে, রাজা বৈখানস বদরীনারায়ণের মূর্তিতে রামচন্দ্রজির পূজা করতেন। ব্যাখ্যাকারী উপসংহারে বলেন, দেবতার মূর্তি—যে ভক্ত যেমন বিশ্বাস নিয়ে দেখবেন তিনি এখানে সেই রূপেরই সেই ভাবে দর্শন পাবেন। ভগবানই আশ্বাস দিয়েছেন :

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

মন্দিরের অন্যান্য বিগ্রহাদিরও সেইভাবে পরিচয় ও বর্ণনা দেওয়া হয়—দুই ঋষিভ্রাতা নর, নারায়ণ; নারদ, গরুড়, কুবের আদি।

শোনা যায়, বদরীনাথের নারদকুণ্ড থেকে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য এখানকার এই মূর্তি উদ্ধার করেন এবং গরুড়শিলার কাছে এটির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৫শ শতাব্দীতে গাড়োয়ালের এক মহারাজা বদরীনাথে একটি মন্দির নির্মাণের জন্যে স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং এখন যেখানে মন্দির সেইখানে মূর্তিটি নিয়ে আসেন। এর পর রাণী অহল্যাবাঈ সেই মন্দিরটি সংস্কার করেন ও মন্দিরের শীর্ষদেশ স্বর্ণ দিয়ে আচ্ছাদন করে দেন।

শুনি এ-মূর্তি সাধারণ পাথরের মূর্তি নয়, শালগ্রাম-শিলা।

মূর্তির অভিষেক হয়;—ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজলে, দুধের ধারায়ও। তারপরে আতর আদি সুগন্ধি উপচারে মার্জন হয়। রাওয়ালজি আতরের পাত্রটি বাইরে পাঠিয়ে দেন—দর্শনার্থীরা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে সেই সুগন্ধ কপালে লাগান, ঘ্রাণ করেন,—মনে স্নিগ্ধ প্রফুল্ল ভাব জাগে। তারপর গাঢ় শ্বেত-চন্দন দিয়ে নারায়ণের সারা অঙ্গ প্রলেপন করা হয়—যেন সুদক্ষ ভাস্কর চন্দনেরই এক অনুরূপ মূর্তি গড়লেন।

অবশেষে বেশভূষা দিয়ে, অতি মূল্যবান অলঙ্কারাদি পরিয়ে, বহু ফুলের ও পাহাড়ী তুলসীর মালায় বিগ্রহের শৃঙ্গারবেশ হয়,—তারই মধ্যে ফুটে ওঠে চোখ-মুখ-নাসার আকৃতিও। প্রকৃত পাথরের শান্ত সমাহিত যোগী-মূর্তি এইভাবে অদৃশ্য হন; উজ্জ্বল বসন-ভূষণ-ফুল-সাজে সিংহাসনে জেগে বসেন মোহন মধুর মূর্তি।—তখন শুরু হয় নানান দীপমালায় তাঁর আরতি; ঘণ্টাধ্বনি ওঠে, স্তবগান চলে।

একবার এই মূর্তি সাজানোর মধ্যে বিশেষ এক আনন্দ অনুভব করেছিলাম।

সে বছর কলকাতা থেকে যখন যাত্রার আয়োজন করছি, মা বললেন, নারায়ণের বস্ত্র নিয়েছ?

আমি হেসে বলি, নিজেকেই নিয়ে চলেছি—সামান্য একটা কাপড় নিয়ে কি হবে? কত ধনীলোক যান —খুব দামী ভালো রঙ-বেরঙের ভেলভেট, সিল্কের কাপড় দেন। তোমার নারায়ণের কি আর কাপড়ের অভাব? না সেই সব ফেলে আমার-নিয়ে-যাওয়া সামান্য একটা কাপড় তিনি পরবেন?

মা ধমক দেন, ছিঃ, ওকথা বলে! একটা জোড় কিনে নিয়ে যাও—ছোট হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু রঙটা দেখে নিয়ো—নারায়ণের সব রঙ চলে না—হলুদ রঙ হলেই ভালো।

বলেই চুপ করে অন্যমনে একদিকে তাকিয়ে থাকেন। মুখে তৃপ্তির হাসি ফোটে। ভাবি, বোধ হয় নিজের কল্পনায় কল্পিত কাপড়খানি পরিয়ে মূর্তিটি দেখেন।

তারপর বলেন, হ্যাঁ, তাই নিয়ে যা।

নিয়ে যাই-ও।

রাওয়ালজি মূর্তি সাজাচ্ছেন। একমনে বসে দেখছি। বেশ সাজান। এদিকে একটা কাপড় ছড়িয়ে দিয়ে, ওদিকে খানিকটা কুঁচিয়ে—একটু পেছিয়ে এসে দেখেন, ঠিক হল কিনা। নাঃ, ওদিকটা যেন একটু বেঁকে আছে, এগিয়ে গিয়ে সোজা করে দেন। ওখানটায় মানায় নি—আর একটা কাপড় তুলে নিয়ে সেইদিকে ঝুলিয়ে দেন। রত্নবেদীর উপরও এমনভাবে কাপড় ছড়িয়ে দেন, মনে হয় যেন বিগ্রহের দেহেরই এক অংশ। সরে এসে একমনে একদৃষ্টিতে দেখা, আবার এগিয়ে যাওয়া—অতি-সযতনে একটু অদল-বদল করা,—দেখে মনে হয়, যেন নিপুণ শিল্পী ইজেলের উপর ছবি রেখে আঁকছেন—দূর থেকে দেখছেন, আবার এগিয়ে এসে আঁকছেন।

পাশে জড়ো করা যাত্রীদের দেওয়া কাপড়। ভালো ভালো দামী অনেকগুলি রয়েছে—তার থেকেও দু-একটা তুলে নেন। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, তারই মধ্যে থেকে বেরুল মা'র-পাঠানো সেই পীত-বসনটি। উঁচু করে ধরে রঙটি দেখেন। তারপর খুলে কুঁচিয়ে মূর্তির সুমুখদিকে মধ্যিখানে কোঁচার মত ঝুলিয়ে দেন —কাপড়ের নীচের দুই দিকের দুই খুঁট ধরে বেদীর উপর বিস্তার করে দেন—দেখে যেন মনে হয় একটি ফোটা কমলের আধখানা। আশ্চর্য হয়ে দেখি, ঐটুকু বস্ত্রখণ্ড—তারই মধ্যে এতখানি বিস্তৃতি ছিল! ছোট কাপড়ও বড় হয়ে চোখে পড়ে। আনন্দে মন ভরে ওঠে। মনে মনে মাকে স্মরণ করি, দেখে যাও তোমার নারায়ণের কাপড় পরা। সেই জন্যেই বুঝি হেসেছিল!

সেইদিনই মাকে চিঠি লিখে সব জানাই। দিনের মধ্যে কয়েকবার মন্দিরে ঘুরে ঘুরে দেখেও যাই।

রাওয়ালজির মূর্তি-সাজানো, পূজা, আরতি—দেবতার সব কাজেই যেমন সৌন্দর্য বোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর প্রেম-বিহ্বল তন্ময়তাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমারও ভালো লাগে। সেই বারই তাঁর সঙ্গে, তারপর, আলাপ করি তাঁর বাড়ি গিয়ে। তপ্তকুণ্ডে যাওয়ার পথে সিঁড়ির ধারেই বাড়ি। বয়স বোধ করি বছর পঁচিশ মাত্র হবে। পাতলা লম্বা গড়ন। কৃষ্ণ বরণ। মাথায় লম্বা কালো কোঁকড়ানো চুল—কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ইংরাজি বোঝেন না, হিন্দী অল্প শিখেছেন, সংস্কৃত ভালো জানেন। মাত্র দুবছর এখানে এসেছেন। সরল মধুর ব্যবহার। অল্প কথা বলেন,—মনে হয় যেন তাঁর কোন্ গভীরে ডুবে আছে। তাঁর বিগ্রহ সাজানোর প্রশংসা করি। লজ্জা পান। শূন্য দৃষ্টিতে অন্য দিকে তাকান। অস্ফুটস্বরে বলেন, ওতে অদ্ভুত এক আনন্দ পাই, আমার তখন নিজের আর জ্ঞান থাকে না—মনে হয়! কে যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন।

আমি বলি, দেখে মনে হয় বিগ্রহও আনন্দ পান আপনার হাতে সেজে ও পূজা নিয়ে।

এই ভাবেই স্বল্প পরিচয় হয়। কিন্তু তারই মধ্যে অসীম আনন্দ পাই।

পরের বছর গিয়ে দেখি, তিনি নেই। আর এক নূতন রাওয়াল। তাঁর খবর নিই। শুনি, শীতের সময় মন্দির বন্ধ হলে দক্ষিণে তাঁর দেশে যাচ্ছিলেন, পথে কাশীতে নামেন—সেখানে বসন্তে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

মন্দিরে বসে বার বার তাঁর কথাই স্মরণ হয়। ভাবি স্বর্গের মন্দিরে বুঝি তাঁর সাজানোর ডাক পড়েছে!

কয়েক বছর থেকে মন্দিরের ভিতর বেশি যাই না বা থাকি না। মন্দিরের প্রাঙ্গণেই ঘুরি। দেবতার দর্শন মনে মনেই করি। এর এক বিশেষ কারণ আছে।

মন্দিরের গর্ভগৃহে—যেখানে বিগ্রহ আছেন—তার সামনে একটি ঘর। সব যাত্রী সেই ঘর থেকে দর্শন করেন। ঘরের মধ্যখানে একটা বড় সিন্দুক, তার উপর রূপার প্রকাণ্ড এক থালা ও ডাবর রাখা। ডাবরের তলায় ফুটা, সিন্দুকের মাথায় গর্ত। ডাবরের মধ্যে যা পড়ে, সিন্দুকের ভিতর তা চলে যায়, সিন্দুকে তালা বন্ধ। এই পাত্রগুলিতে যা কিছু প্রণামী, দান ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। সিন্দুকটি ঘরের মাঝে থাকায় একটা বেড়ারও কাজ করে—যাত্রীদের ঐখান থেকেই দর্শন করতে হয়—আরও কাছে যাবার তাদের উপায় নেই। সিন্দুক থেকে গর্ভগৃহের দ্বার পর্যন্ত সম্মুখের যে স্থানটুকু—দর্শন পাবার সব চেয়ে ভালো ও লোভনীয় জায়গা যেটা—সেখানে শুধু ভাগ্যবান ব্যক্তিদের প্রবেশ করার অধিকার আছে। এই সৌভাগ্যের অধিকারী হন যে-সব যাত্রী মোটা টাকা দিয়ে পূজা দেন, আর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা,—সরকারী ক্ষমতাশীল অফিসাররা তো বটেই। কয়েকবার যাতায়াতের ফলে মন্দিরের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ হয়ে গেছে, আমি গেলেই সাদরে কাছে সবাই ডেকে নেন, তাই আমারও সেখানে যাবার কোন বাধা নেই।

কিন্তু সেখানে বসে স্বস্তি বোধ করি না। পিছনে পঁচিশ-ত্রিশের বেশি যাত্রী একসঙ্গে ধরে না, অথচ হয়ত হাজারখানেক যাত্রী দর্শন পেতে এসেছেন;—মন্দিরের ভিতর, বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। যাতে হঠাৎ ভিড়ের চাপ ঘরের মধ্যে এসে অশান্তির সৃষ্টি না করে তাই দরজার বাইরে প্রাঙ্গণে কাঠের বেড়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া আছে,—তারই মধ্যে দিয়ে সার বেঁধে যাত্রীরা ঘরে ঢোকে। দরজার মুখে মন্দিরের দ্বাররক্ষীরা থাকে,—ঘরের ভিতরের জনতা বুঝে দরজা খোলে, যাত্রী ছাড়ে, আবার বন্ধ করে। দর্শনের পর বার হয়ে যাবার আর একটি দরজা—ঘরের আর এক দিকে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ভালোই। কিন্তু মন্দির ছোট, যাত্রী অনেক বেশি। কর্মচারীরা সাধারণত বিনীত ভাবেই এক মিনিট পরেই সামনের যাত্রীদের বাইরে যাবার জন্যে অনুরোধ করেন, আপনাদের দেখা হয়ে গেছে—এবার এগিয়ে ঐ দরজা দিয়ে যান—পেছনের যাত্রীদের আসতে দিন—তাঁরাও দেখবেন—চলুন, এগিয়ে চলুন।

কিন্তু আগাবেন কে? সব যাত্রীই বহু দূর দেশ থেকে কত কষ্ট স্বীকার করে—কত অর্থ ব্যয়ে—কত বুক-ভরা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—হিমালয়ের এই দুর্গম তীর্থে এসেছেন—ভগবান শ্রীবদরী-বিশালের দর্শন পেতে। এই কি তাঁর দর্শন? দু'দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই—বাইরের প্রখর আলো থেকে এসে মন্দিরের অভ্যন্তরের স্তিমিত আলোকে তখনও চোখের দৃষ্টি অভ্যস্ত হয় নি—বিগ্রহের দর্শন তখনও সুস্পষ্ট নয়;—বাইরের কোলাহল থেকে মন তখনও মুক্ত হয়ে সমাহিত হয় নি—মন্দির ছেড়ে চলে যাব?

কর্মচারী তাগাদা দেয়, বেরিয়ে চলুন, এখন বেরিয়ে যান—ইচ্ছে হয় তো আবার ঘুরে পেছন থেকে আসবেন।

যাত্রী বলে, আবার সেও তো এসে তখনই বেরিয়ে যেতে হবে?

তা তো হবেই। উপায় কি?

এ যেন সেই ঝাঁকি-দর্শন। বৃন্দাবনের এক মন্দিরে দেখেছিলাম। রাজপুতানার প্রসিদ্ধ নাথদ্বার মন্দিরেও সেই নিয়ম। মন্দিরের ভিতরের দরজার উপর পর্দা ফেলা। পর্দা একবার সরছে, আবার তখনই বন্ধ হচ্ছে। এরই মধ্যে বিগ্রহের দর্শন। যেন ঝিলিক মেরে দেখা!

বদরীনাথের পর্দা সরে না। সারি সারি যাত্রী সরে। একটানা স্রোতের মত অনবরত চলেছে;—ধীর স্থির মনে তাদের দর্শনের কোন উপায় নেই। অথচ আমি বসে আছি মূল দরজার কাছে—বিগ্রহের সামনে। যতক্ষণ মন্দির খোলা থাকবে—এখানে বসে দেখতে পারি। পাশে আমার বিপুলকায় কয়েকটি মারোয়াড়ী পুরুষ-মহিলা।—তাদের কোলের উপর দুটি ছোট ছেলেমেয়ে শিশুসুলভ উৎপাত করে।

হঠাৎ কানে শুনি পিছনে জনতার মধ্যে এক নারী-কণ্ঠ।—'যাচ্ছি বাবা, এখনই যাচ্ছি।—একটু দাঁড়িয়ে একবার দেখতে দাও। কই, নারায়ণের চরণ কই? দেখা যায় না? আহা, তাই তো! বসনে মালায়

ঢাকা পড়েছে যে! মুখটি কোথায় দেখাও না বাবা? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি—ঐখানে হয়—কপালের ওপর ঐ না হীরে ঝকঝক করছে—মাথার ওপর মস্ত বড় মুক্তো-পান্নার মুকুট ঐ তো! আহা কি সাজ! চোখ সার্থক হল। ধরো বাবা, ধরো, এই নাও!'

পিছন ফিরে তাকাই। দেখি ছিন্ন তসর-পরা কে বৃদ্ধা। চোখের দৃষ্টি কমেছে, শরীরের শক্তি গেছে, তবু ভিড় ঠেলে সিন্দুকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে একটি ছোট্ট পাতলা রুপোর বাঁশী। তুলে ধরে কর্মচারীকে দেন, বলেন যাচ্ছি, এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি—একবার ঠাকুরের হাতে এটি ধরিয়ে দাও বাবা—দু'চোখ ভরে দেখে যাই।

কর্মচারী মৃদু হেসে বলেন, মা, ঠিক আছে, এটা দেবেন তো? এই সিন্দুকের মধ্যেই থাকবে এ-সবই—ঠাকুরের জিনিস আছে এতে।

বৃদ্ধা ছাড়েন না, অনুনয় করতে থাকেন, একবারটি ঠাকুরের হাতে দাও বাবা!—কর্মচারী হেসে বাঁশীটি সিন্দুকেই ফেলে দেন। বৃদ্ধার চোখে জল নামে। এক পা এগিয়ে যান, আবার ফিরে দাঁড়ান, বলেন, যাচ্ছি দাঁড়াও, এটাও আছে যে!—একটি পুরনো রূপার টাকা অতি যত্নভরে আঁচল থেকে খুলে দেন। এ যে তাঁর লক্ষ টাকার সমান!—সিন্দুকের রাশীকৃত প্রণামী অর্থের মধ্যে সেটিও লুপ্ত হয়।

কিসের এক লজ্জায় ও বেদনায় আমার মন ভরে যায়। আমিও উঠে চলে আসি। তার পর থেকে, দর্শনে গেলেও তার বেশিক্ষণ ওখানে বসি না।

আর এক বারের কথা।

বাইরে মণ্ডপে যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দর্শন করছি, নিকটে একজন তাঁর সঙ্গীকে বিগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন শুনি। বিবরণের ধারা শুনে কৌতূহল হয়। তাকিয়ে দেখি, সঙ্গীটি তাঁর সম্পূর্ণ অন্ধ। অপরের মুখের বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি দর্শনের আনন্দ নিচ্ছেন। মনে মনে ভাবি, এই দুর্গম পথ,—কত রকম অসুবিধা—এই অন্ধব্যক্তি অতিক্রম করে এসেছেন নিশ্চয় সঙ্গীর হাত ধরে! কিন্তু এ-পথের একটা বিশেষ আকর্ষণ—চারিদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য। চোখে মনে আনন্দ আনে। পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করে! নতুন দেশ ও দৃশ্য দেখার মনে একটা আগ্রহও থাকে। তাছাড়া মন্দিরে দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা তো আছেই। কিন্তু দৃষ্টিহীনের কাছে এ-সবই নিরর্থক, মূল্যহীন। যেখানেই তিনি থাকুন—একই কথা। তবে কেন এই কষ্ট স্বীকার করে ব্যর্থ যাত্রা!

দর্শন-শেষে তাঁদের কাছে এগিয়ে যাই। তাঁর দর্শন-না-পাওয়াব দুঃখে সহানুভূতি দেখাই।

বিচিত্র মানুষ!—মুখে দেখি তাঁর পরিপূর্ণ তৃপ্তির প্রসন্নতা। হেসে আমায় বলেন, দর্শন আমি পাই নি, ঠিকই—আমি যে অন্ধ, কিন্তু নারায়ণের তো চোখ আছে—তিনি আমায় দেখলেন, সেই তো আমার আনন্দ!

॥ ৭ ॥

জগতে কখনও কখনও এমন ঘটনা ঘটে, সহজ দৃষ্টিতে যার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ যুক্তিবাদ মানুষের ধর্ম। প্রাণীজগতে এই তার এক বৈশিষ্ট্য। কারণ না বার করে সে তুষ্ট হতে পারে না। কিন্তু কারণ যদি নাই পাওয়া যায়, করাই বা যাবে কি? অগত্যা তখন কেউ বলেন, ওটা ভূতের খেলা; কেউবা চোখ বুজে বলেন, দেবতার লীলা; আবার কেউ বা সন্দেহ পোষণ করে মন্তব্য করেন, আছে বই কি ভেতরে কিছু—লোকে ধরতে পারে নি। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করি না।

ব্যাপারটা ঘটে বদরীনাথেই। আমারও নিজের চোখে দেখা নয়, শোনা কথা। তবে অনেকেই যাঁরা দেখেছিলেন, গল্প করলেন। সে বছর বদরীনাথ পৌছুতেই স্থানীয় কয়েকজন এসে দুঃখপ্রকাশ করলেন, আহা, আপনি এই কটা দিনের জন্যে দেখতে পেলেন না—মাত্র তিন দিন আগে হয়ে গেল। স্বামীজি যে আবার নারায়ণকে ভোগ খাওয়ালেন। এর আগের বার অনেকে দেখতে পায় নি, তা বিশ্বাস করে নি—এবার কারও যাতে কোন সন্দেহ না থাকে—তাই ভালোভাবে ব্যবস্থা করে ভোগ দিলেন, নারায়ণ হাতে করে খেয়ে গেলেন। কি অদ্ভুত ক্ষমতা স্বামীজির! আপনার ভাগ্যে দেখা হল না।

মনে মনে ভাবি, আমার ভাগ্যটাই ঐ রকম। একবার কলকাতা শহরে এক নিকট-আত্মীয়ের বাড়িতে ভূত দেখা গেল। কদিন আগেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে। তার পর থেকে ঘরের দেওয়ালে নানা রকম

ছায়া দেখা যেতে লাগল। ছায়ার মাধ্যমে ছেলে-নাতিদের সঙ্গে মৃতের সাঙ্কেতিক কথাবার্তাও চলতে থাকে। রোজই হয়। খবর পেয়ে আমরা গেলাম। অনেক রাত পর্যন্ত রইলামও। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু দেখতে পেলাম না। শুনলাম কদিন ধরে কমে গেছে,—সবদিন হয় না।

কিন্তু থাক সে-সব কথা।

প্রথমে স্বামীজির পরিচয় দিই, তারপর এই ভোগ-লীলা। কিন্তু তারও আগে হিমালয়ের সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে সাধারণভাবে দু-একটা কথা বলি।

হিমালয়ের বহু সাধু-সন্তের বাস। হিন্দুমতে হওয়াই স্বাভাবিক। কেউ বৈষ্ণব, কেউ শাক্ত, কেউ বা শৈব, কেউ অবধূত সন্ন্যাসী—নানান সম্প্রদায়। কারও গেরুয়াবাস, কারও বা কৌপীন সার, আবার কেউ বা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। বহু শ্রেণীর সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী। বিভিন্ন-পন্থী হলেও সকলেরই উদ্দেশ্য—ধর্ম-জীবন-যাপন, ভগবদ্-চিন্তা, সাধন-ভজন। কিন্তু সকলের সমান শক্তি থাকে না, সমান সিদ্ধিও হয় না। তাঁদের মধ্যে কে কত উচ্চ মার্গে উঠেছেন, বাইরে থেকে দেখে বোঝা সম্ভব নয়। সে-বিচারে ভুলেরই সম্ভাবনা। তা ছাড়া এসব শক্তির বিচার করারও ক্ষমতা থাকা চাই।

মানুষই সংসার-ধর্ম ত্যাগ করে সাধু হয়। সাধু-জীবন আদর্শ-জীবন। তাই সন্ন্যাস-জীবনে মানুষের সৎ ও মহৎ গুণগুলির বিকাশ ও প্রকাশ সকলে প্রত্যাশা করে। প্রকৃত সাধুসমাজে সাধারণত সেই বিকাশের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের মজ্জাগত দুর্বল বৃত্তিগুলিও তো আছে। চিরতরে সম্পূর্ণরূপে সেগুলি কাটানো সহজ কথা নয়, সব ক্ষেত্রে কাটানো যায়ও না। তাই কোন সময়ে হয়ত সেই সব মানুষ-স্বভাব সাধু-জীবনেও প্রকাশ পায়। তাতে ক্ষুন্ন বা আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তখন তাঁদের মানুষ ভাবেই মেনে নেওয়া ভালো। সে সময়ে সেই ক্ষেত্রে সাধু অক্ষম, মানুষ প্রবল।

কঠোরব্রতী সাধুর জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটতেও দেখেছি।

একবার কেদারনাথে এক নাগা মৌনী সাধুকে দেখেছিলাম। সেই প্রচণ্ড শীতেও নগ্নদেহে নিস্পন্দভাবে বসে আছেন। শুনলাম, মস্ত বড় সাধু। তাঁর দর্শনের জন্যে যাত্রীদের কি বিপুল জনতা! সকলেই ভক্তি-গদগদ ভাবে প্রণাম করছেন। তিনি নিশ্চল, নির্বিকল্প। আমারও দেখে ধারণা হল, বিরাট পুরুষই হবেন।

দুবছর পরে। ঐ কেদারনাথের পথে এক চটিতে দেখি, লোকের বেশ ভিড়! কৌতূহল জাগল। কাছে গিয়ে উঁকি মারি। দেখি, জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি লোক—কোট্-প্যান্ট-পরা, মুখে সিগারেট, হাতে ক্যাপ্‌সটানের টিন, অনর্গল বকে চলেছে—হিন্দি, ইংরাজি-মেশানো বুলি—অসম্বন্ধ সব প্রলাপ। লোকের কাছে শুনি, আগে নাগা সাধু ছিলেন, প্রয়াগে কুম্ভে গিয়েছিলেন—হঠাৎ এই পরিবর্তন ঘটেছে। চিনতে পারি, কেদারনাথে দেখা সেই সাধুটি!

বুঝলাম, কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের দুর্বহ ভার সামলাতে পারেন নি। মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়েছেন—তাই এই বিকৃত পরিণতি।

ভালো সাধু বলে যাঁদের মনে হয়েছে তাঁদের কথাই এখন বলি। অল্প সময়ে বাইরের আলাপে যেটুকু পরিচয় মেলে, তাই।

হিমালয়ে সাধুদের মধ্যে এক শ্রেণী আছেন যাঁরা বিদ্বান, তীক্ষ্ণধী, গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী। প্রাঞ্জল ভাষায় নানান ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন, সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। নিজের মতামতও সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। শাস্ত্রচর্চার উপর তাঁদের ধর্ম-জীবনের ভিত্তি। অথচ পাণ্ডিত্যের কোন দম্ভ নেই। ছোট একটি কুটিয়াতে—অথবা কোন আশ্রমে শান্ত পরিবেশে থাকেন। শান্তিময় জীবনযাপন করেন। বেশ-ভূষা, আহার-বিহার—কোথাও কোন বিলাস নেই। হয়ত সামান্য গেরুয়া কাপড়, ফতুয়া—শীতের সময় গেরুয়া গরম গেঞ্জি, কেউ বা হয়তো এসবও ত্যাগ করেছেন। কেউ অত গৈরিকও ধারণ করেন নি। কিন্তু যা কিছু ব্যবহার করেন, সামান্য হলেও পরিচ্ছন্ন। ঘরের ভিতর বা বাইরে চারিপাশ যথাসম্ভব পরিষ্কার করে রাখা। মনে হয়, এঁরা বিশ্বাস করেন মনে পবিত্রতা রাখতে হলে বাইরেও পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। এঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য, গভীর জ্ঞান ও নিরহঙ্কার আচরণ দেখে মনে শ্রদ্ধা জাগে। এঁদের সান্নিধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব আছে। সহজ সুন্দর ব্যাখ্যার মধ্যে বুদ্ধিবাদের (Intellectualism) সুস্বাদ উপভোগ করা যায়। শ্রদ্ধেয় তপোবনস্বামী এই শ্রেণীর ছিলেন। শেষজীবনে উত্তর কাশীতে থাকতেন। আজ বছর

তিনেক হল, দেহরক্ষা করেছেন। কিন্তু তাঁর কথা এখন নয়।

আর এক শ্রেণীর সাধু আছেন, তাঁরা জপ-তপ, আরাধনা, পূজা-অর্চনা নিয়ে দিবারাত্র কাটিয়ে দেন। যে সব আচার-নিয়ম-ক্রিয়াদিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন, সেগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন—কোথাও যেন নিয়মভঙ্গের সামান্য ত্রুটির ছিদ্রও না থাকে। নিয়মকানুনের লোহার বাঁধনে বাঁধা তাঁদের জীবন, যন্ত্রের মত ঘোরে। এর মধ্যে কি আনন্দ পান ও আশা রাখেন, জানি না। পান সম্ভবত, নইলে করেনই বা কেন?

যোগমার্গী সাধুও আছেন।

বিভিন্ন প্রণালীর যোগাসন—নাম বর্ণনা করে, কোন্ আসনের কি বৈশিষ্ট্য, কি গুণ ও সার্থকতা, ভুল আসনেরই বা বিপদ কোথায়—দেখিয়ে দেখিয়ে বলে গেছেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখেছি, মেদশূন্য দেহে সুন্দর পেশীগুলির ছন্দোময় খেলা; আবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অদ্ভুত অস্বাভাবিক পাক খাওয়ানো। কখনও বা স্থির হয়ে বসে একদৃষ্টে চোখের দিকে তাকান—উজ্জ্বল দৃষ্টি, মনে হয় গভীর সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ নীল জলের ভিতর তাকিয়ে আছি।

আর এক শ্রেণীর সাধু, তাঁদের বহির্জীবনে কর্মানুষ্ঠানের কোন প্রকাশ নেই। স্থির হয়ে একাগ্রমনে বসে থাকেন, বোধ করি যোগ-সাধনাই করেন। মনে হয় কঠোর তিতিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন। তাঁদের মধ্যে অনেকে মৌনব্রতী। যাঁরা কথা বলেন, তাঁরাও স্বল্পভাষী। কঠোর সন্ন্যাস-জীবন। তবুও সহজ সরল মধুর ব্যবহার। বিশেষ কিছু আলোচনা করেন না, পাণ্ডিত্যের কোন প্রচার করেন না। তাঁদের কাছে বসলে মনে একটা শান্ত স্নিগ্ধ ভাব জাগে, জগৎ-সংসারের অশেষ সমস্যা—ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা—সব যেন ম্লান হয়ে যায়, শান্তিময় প্রসন্নতায় মন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জানি, এ-সবই বাইরের দৃষ্টি দিয়ে বা আপন মনের অনুভূতি দিয়ে অপরের স্বল্প পরিচয় নেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। সাধারণ মানুষের মন এতে তুষ্ট হয় না। প্রশ্ন করে, হিমালয়ের বড় সাধু—তার প্রমাণ কি? অলৌকিক ক্ষমতা কি দেখলেন?

এ-প্রশ্নের কারণ আছে। সাধারণত প্রসিদ্ধ সাধকদের জীবনীতে ও সাধুসন্ন্যাসীদের কাহিনীর মধ্যে তাঁদের বিরাটত্বের পরিচয় দিতে হলেই প্রথম ও প্রধান প্রমাণ দেখানোর রীতি, তাঁদের আশ্চর্য বিভূতি—অর্থাৎ কোন দৈব বা অলৌকিক শক্তি। যেন এই শক্তির আরোপ না করলে তাঁদের মহত্ত্বের কোন প্রমাণই হয় না।

এই ধরনের শক্তি লাভ হয় কিনা, এবং হলেই বা কতখানি হয় ও কে-ই বা কি পরিমাণ পেয়েছেন—তার প্রমাণ আমি নিজে কিছু দেখি নি, নেবার চেষ্টাও করি নি। যোগাভ্যাসে বা কঠোর সাধনায় মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির কল্পনাতীত বিকাশ হতে পারে—এর অতি সামান্য নিদর্শন আমাদের সাধারণ জীবনেও মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে। এই সেদিন কাগজে খবর পড়লাম, একটি তেরো বছরের মেয়ে যোগ-সাধন করে স্মৃতিশক্তির এমনই উন্মেষ করেছে যে যে-কোন বক্তৃতা একবার মাত্র শুনলেও নির্ভুল পুনরাবৃত্তি করে দিতে পারে। অসাধারণ ক্ষমতা, সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধুদের সম্পর্কে আরও নিগূঢ় কোন আধ্যাত্মিক বা ঐশী শক্তির সন্ধান করা হয়, এই সংশয়ের নিরাকরণ সাধু ছাড়া আর কে-ই বা করতে পারেন? অথচ যদি কোন বড় সত্যিকার সাধু এমন কোন অজ্ঞেয় শক্তির অধিকারী হনই, তবে এই সাধনা-লব্ধ আত্মশক্তির পরীক্ষা তিনি অযথা প্রকাশ্যে দেবেনই বা কেন, এবং তাই যদি দেন তবে তখনই কি সন্দেহ জাগে না যে ইনি উচ্চস্তরের সাধু কিনা? আধ্যাত্মিক বা দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী মনের কাছে প্রমাণের প্রয়োজন নেই, তাই এই তর্কও ওঠে না। যদিও এই বিভূতির প্রকাশ দেখার জন্য তাঁদের অসীম আগ্রহ। ঐশী শক্তিতে অবিশ্বাসী মন নিজের বিজ্ঞান-লব্ধ বিদ্যার কষ্টিপাথরে ঘষে বিচার করে এবং আপাত-দৃষ্টিতে কোন যুক্তিসম্মত কারণ না পেলে সন্দেহ আরও ঘনীভূতই হতে থাকে, সমস্যার সমাধানও হয় না।

সাধারণ মানুষের কানে সাধুদের প্রসিদ্ধির আর এক উপকরণ—তাঁদের পূর্বাশ্রম-পরিচয়। অমুক সাধু বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, অমুক ডাক্তার ছিলেন বা অধ্যাপক ছিলেন কিংবা মস্ত বড় চাকরি করতেন—তা হলে তখনই তাঁর সাধারণ্যে সহজে একটা প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। অবশ্য প্রচারের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই ধরনের মনোভাব আমাদের সাধারণ সমাজেও আছে। এর পিছনে যুক্তিরও কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ ইনি পূর্বাশ্রমে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত—অতএব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাই তাঁর

কাছে প্রকৃত সাধুজীবনের প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ আশা করা যায়।

আমাদের বদরীনাথের এই স্বামীজির এই পূর্বাশ্রমের প্রসিদ্ধি আছে, সন্ন্যাস-জীবনেও বিপুল খ্যাতি আছে। উত্তরাখণ্ডে এঁকে সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন।

শোনা যায়, তিনি এককালে জেলা-জজ ছিলেন। দায়রার বিচারে এক আসামীর মৃত্যুদণ্ড দেন। কয়েক বছর পরে প্রকাশ পায় যে প্রকৃত দোষীর বদলে এক নির্দোষ ব্যক্তির চরম সাজা হয়ে গেছে। তার পরই তিনি চাকরি ছেড়ে দেন, সংসারও ত্যাগ করেন, সন্ন্যাস-জীবন নেন। বহু বছর হিমালয়ের নানাস্থানে কঠোর সাধনা করেছেন। কারও কারও মতে সিদ্ধিও লাভ হয়েছে। এখন বৃদ্ধ বয়সে উত্তরাখণ্ডে আছেন। প্রতি বছর কয়েকমাস বদরীনাথে কাটান। আগে বিবস্ত্র ছিলেন, লোকসমাজে এলে শুধু একটা চট জড়িয়ে রাখতেন। সে অবস্থায় হৃষীকেশের কাছে এক আশ্রমে একবার তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম।

এই স্বামীজিই বদরীনাথে নারায়ণকে ভোগ খাওয়ান।

বদরীনারায়ণের প্রতিদিন ভোগ হয়। দেবতা মাত্রেরই যেমন হয়ে থাকে; ভোগের সময় চারিদিক বন্ধ রাখা হয়; দেবতার আহার মানুষের দেখা চলে না। শুনি, কয় বছর আগে একবার স্বামীজি নিজের হাতে এক ভোগের থালা রেখে দেন, ভোগ-শেষে দেখা যায় সেই থালার অন্ন কে যেন তুলে খেয়েছেন এমন চিহ্ন রয়েছে। সেবার সে ঘটনা অনেকের দেখার সুযোগ বা সৌভাগ্য হয় নি। তাই এ-বছর সকলকে জানিয়ে আবার এই ভোগ খাওয়ানোর অনুষ্ঠান। অনেকে এবার উপস্থিত ছিলেন। চারিধারে ভালোভাবে পরীক্ষা করে সবাই দেখেছিলেন, যাতে কেউ বা কোন কিছু ভোগের জায়গায় বা কাছাকাছিও না যেতে পারে। সুরক্ষিত ভাবে ভোগ সাজানো হল, সেক্রেটারি নিজেও একটা থালা আলাদা করে সাজিয়ে রাখলেন। তারপর সব বন্ধ করে, বাইরে থেকে স্বামীজির নারায়ণকে আরাধনা ও ভোগ-নিবেদন। অবশেষে যখন পর্দা তোলা হল, দেখা গেল, সব পাত্র থেকেই কে যেন গ্রাস তুলে খেয়ে গেছেন।

অলৌকিক কাণ্ড—মন্তব্য করেন আমার বক্তা প্রত্যক্ষদর্শী!

কাছেই পরিচিত হিমালয়-বাসী অপর এক সাধু বসে ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করি, স্বামীজি, ব্যাপারটা কি, বলুন না একটু খুলে!

তিনি চুপ করে থাকেন, কথা বলতে চান না। বলি, আপনি বিশ্বাস করেন না নাকি—নারায়ণকে নিজে উৎসর্গ করে ভোগ খাওয়ানো?

কঠোর মন্তব্য করেন, নারায়ণের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, গেলেন অত লোকের কাছে ওঁর ভক্তের পরিচয় দিতে আর মান রাখতে।

বলি, ও-কথা বললে চলে কি করে? ভোগের থালায় চিহ্ন এল কোথা থেকে?

বলেন, যদি বলি মুষিক-জাতীয় কোন প্রাণীর দৌরাত্ম্য? এ-পাহাড়ে তাদের অভাব নেই!

আমি বলি, ওটা অচল। ইঁদুর অন্য দিন যায় কোথায়?

স্বামীজি বলেন, দেখুন যোগের দ্বারা অনেক রকম ক্ষমতা হয়। পিশাচসিদ্ধ তো হয়ই—আমার নিজের দেখাও আছে। তাদের দিয়ে সুকাজ-কুকাজ করিয়ে নিতেও দেখেছি। এ-ও সেই ভাবে কোন কিছু করানো বলা যেতে পারে। তবে নারায়ণকে এতখানি বশে আনা,—ডাকা মাত্রেই নিজের হাতে তুলে খেয়ে গেলেন—তা হলে আর ভাবনা কি? এত ঘোরাঘুরি—এমন ভাবে থাকাই বা কেন—সবই তো হয়ে গেল। ও-সব ভেল্কির কথা রেখে দিন।

মনে মনে ভাবি, ব্যাখ্যা তো হল না। ইনি পিশাচ পর্যন্ত এগোতে প্রস্তুত আছেন।

সেই বৃদ্ধ শান্ত স্বামীজিকে তারপর, প্রতি বছরই বদরীনাথে দেখতে পাই। একটা সাদা মোটা ছোট কাপড় পরে থাকেন—গান্ধীজির মতো। গায়ে একটা সামান্য চাদর। প্রতিদিন বাড়ির সামনের পথ দিয়ে ধীরপদে মন্দিরে যান, সঙ্গে জনকয়েক ভক্ত করতালি দিয়ে 'না-রা-য়-ণ' 'না-রা-য়-ণ' গাইতে গাইতে চলেন। শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে সাধুদের একান্তে থাকবার জন্যে মন্দির কমিটির একটি ভালো কুটিয়া আছে, সেইখানে প্রতি বছর এসে থাকেন। বহু যাত্রী দর্শনে যান। ঘরে বসে দেখি। কিন্তু আমার একদিনও যাওয়া হয় না, ভোগ খাওয়ানোর কাহিনী শোনার পরও। কেন জানি না, যাওয়ার প্রেরণা পাই না।

মন্দিরের মধ্যেও সাধু-দর্শন হয়। তাঁরা নিজেরা দর্শনে আসেন, যাত্রীরাও তাঁদের দর্শন পায়। মন্দিরে ভোগের পর প্রসাদ পেতেও তাঁরা অনেকে আসেন। সেইখানে একবার এক বৈরাগী সাধুর সঙ্গে আলাপ হয়। ঠিক পরিচয় নয়, চাক্ষুষ দুজনে দেখা। দেখামাত্রই দুজনের মুখে অকারণ মৃদু হাসির বিনিময় ঘটে। কিন্তু তাতেই দীর্ঘ পরিচয়ের সেতু রচিত হয়।

মন্দিরে ভোগ-বিতরণ হচ্ছে। প্রাঙ্গণের এক অংশে সারি-সারি ভোগের পাত্র। তার থেকে প্রথমে সাধু-সন্ন্যাসীদের দেওয়ার প্রথা। তারপরে পাবার কথা সর্ব-তীর্থের চিরন্তন অঙ্গ—ভিক্ষুকদের। একপাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। যাত্রীদেরও জনতা জমেছে। তাদের মধ্যেও প্রসাদ পাওয়ার আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু প্রথম থেকেই ভিখারীদের সবলে প্রবেশে ও প্রবল উত্তেজনার ফলে প্রসাদ-বিতরণে বিশৃঙ্খলা এনেছে। সাধুরা পাত্র হাতে এসেছেন। দু-একজন ভিড়ের মধ্যে কোনক্রমে প্রবেশ করে প্রসাদ নিয়ে আসছেন, অনেকেই শান্তি-স্থাপনের আশায় অপেক্ষা করছেন।

কাছেই কে একজন বাংলা-মেশানো হিন্দিতে কথা বললেন। বাংলার আভাস পেয়ে আপনি দৃষ্টি গেল সেইদিকে। দেখি একটি সাধু অপর একজন বলিষ্ঠ সাধুকে একটি পাত্র দিয়ে অনুরোধ করছেন জনতা-জাল ভেদ করে তাঁরও প্রসাদ আনার জন্যে। সাধুটি যুবক। গৌরবর্ণ সুশ্রী। কপালে মোটা করে শ্বেতচন্দনের দীর্ঘ তিলক। মাথায় একরাশ জটা—কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে রয়েছে। অল্প দাড়ি-গোঁফ। গায়ে সাদা মোটা সুতির চাদর। পরনে কি আছে বোঝা যায় না। সন্ন্যাসীর রুক্ষ বেশ, কিন্তু মুখে-চোখে যৌবনের স্নিগ্ধ দীপ্তি। তরুণ তাপস।

আমি তাকাতেই আমার দিকে তাকান। মৃদু হাসেন। আমিও হাসি। পাত্রটিতে প্রসাদ আসে। এগিয়ে এসে বলেন, জয় সীতারাম! এমন করে ভিড় ঠেলে যেতে সঙ্কোচ লাগে, নিন—প্রসাদ নিন।

দেখি, পাত্রের ভেতর দু-হাতা অন্নপ্রসাদ ও ডাল। জানতাম—এই এঁদের সারাদিনের খাদ্য।

তাই বলি, এ আপনার জন্যে থাক। আজ আমিও প্রসাদ পাব মন্দির থেকে, বলে এসেছি।

তিনি তবুও অনুরোধ করেন। আঙুল ঠেকিয়ে একটু মুখে ফেলি, বলি. এই হয়েছে—প্রসাদ কণিকামাত্র।

মনে কৌতূহল জাগে। জিজ্ঞাসা করি, দেখছি তো এখানেই থাকেন। এত গোলমালের মধ্যে ভালো লাগে? প্রকাণ্ড শহর হয়ে গেছে না?

তিনি কোন জবাব দেন না। হাসি-ভরা মুখে চলে যান। বালকের মত।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার দেখা। অতিথিশালার সামনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তিনি হন্‌হন্ করে হেঁটে চলেছিলেন—আমাকে দেখে দাঁড়ালেন। আবার পরস্পরের মৃদু হাস্য বিনিময়। 'জয়রাম শ্রীরাম—জয় সীতারাম!' বলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন, এইখানে আছেন বুঝি? একটু আগে মন্দিরে একটা প্রশ্ন করেছিলেন, উত্তর দিই নি। শহরে আমি থাকি না। থাকা চলে না। বড় হট্টগোল। আমি থাকি শহরের বাইরে। মাইলখানেক হবে। এক গুহায়। যাবেন সেখানে?

বলি, বেশ তো। কিন্তু আপনার কোনও রকম অসুবিধা হলে—নয়। কাল আমার ঐদিকেই যাবার কথা আছে,—মানাগ্রাম হয়ে বসুধারা যাবার ইচ্ছা।

শুনে বলেন, বাঃ! তাহলে ভালোই হয়েছে, ঐ পথেই পড়বে। অবশ্য রাস্তার ওপর নয়, আধ মাইলটাক গিয়ে পথ ছেড়ে বাঁধিকে পাহাড়ের ওপর খানিকটা উঠতে হয়।

আমি রাজী হই। বলি, তাহলে এক কাজ করুন। কাল সকালে এখানে চলে আসুন। একসঙ্গে যাব। আপনার গুহা দেখে আমি বসুধারায় যাব। আর, আপত্তি না থাকে—চলুন. কাল একসঙ্গে বসুধারাতেও।

তিনি উল্লসিত হয়ে বলেন. বেশ তো!—তারপর হঠাৎ কি তাঁর মনে হয়, বলেন, দাঁড়ান—কাল—কাল—কাল, নাঃ, আমার গুহা ছেড়ে বার হবার উপায় নেই। কাল সারাদিন আমার একটা ক্রিয়া আছে। তবে আপনার গুহায় যাবার কোন বাধা নেই। আপনি সোজা চলে আসবেন—বসুধারা যাবার পথে।

আমি হেসে বলি, যাব যে, পাহাড়ের মধ্যে গুহাটি খুঁজে বার করব কি করে? রাস্তার নাম, বাড়ির নম্বরটা বলে যান তাহলে?

ছেলেমানুষের মত হেসে ওঠেন। বলেন, ঠিক বটে, জানা না থাকলে বার করা কঠিন। গুহাও তো একটি নয়। আশেপাশে আরও কয়টা আছে। এ-অঞ্চলে গাছপালাও নেই যে চিহ্ন বলে দেব।

অতএব স্থির হয়, সেইদিনই তিনি বিকেলে আসবেন—একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

বিকেলবেলা। জুতা-জামা পরে প্রস্তুত হয়ে আছি, তিনি এলেন। বললাম, আমি তৈরি। এক মিনিট সময় নেব—ঘরের চাবিটা দিয়ে আসি।

তিনি বলেন, এক মিনিট কেন? পাঁচ মিনিটই নিন না। অত ঘড়ি ধরে এখানে কাজ হয় না। তালা দিয়ে এসে আপনি রাস্তার সামনে দাঁড়ান, আমিও এখুনি একবার ঘুরে আসছি—ওদিক থেকে।—বলে বাজারের দিকে আঙুল দেখান।

শহর ছাড়িয়ে মানাগ্রামে যাবার সোজা সমতল পথ। ডানদিকে অল্প নীচে অলকানন্দা নদী। বাঁদিকে ধীরে ধীরে পাহাড় উঠে গেছে বহু উপরে। গাছপালার চিহ্ন নেই। শুধু পাথর। মাঝে মাঝে ঘাসের আচ্ছাদন। এক জায়গায় পথ ছেড়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ে ওঠা শুরু হল। এঁকে-বেঁকে উঠছি। দু-একটা জলের ধারা উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে। ছোট ছোট ঝরনা। এক পাথরের উপর থেকে অন্য পাথরে পা রেখে ধারাগুলি পার হই। এক জায়গায় জলের ধারে কতকগুলি বড় কালো পাথর। কোনটি গোলাকার, কোনটি বা মসৃণ। তারই একটির উপর জটাজূট এক সাধু বসে আছেন। নগ্নদেহ। কৌপীনবাস। সঙ্গী বৈরাগীজি তাঁকে 'নমো নারায়ণ' বলে সম্ভাষণ করলেন। তিনি শুধু মৃদু হাসেন। বৈরাগী জানান, স্বামীজি মৌনী। এই ক'মাস হল এসেছেন। বড় শান্ত মিষ্ট স্বভাব। সারাক্ষণই ধ্যানে আছেন। ঐ গুহাটিতে থাকেন।

আরও একটু উঠে আর একটি গুহা। এখানকার ভাষায় গুম্ফা। পাহাড়ের গায়ে স্বাভাবিক ছোট গুহা, তার মুখে প্রকাণ্ড বড় কতকগুলি কালো পাথর। নানান আকারের পাথরগুলি এমনভাবে সাজানো আছে যে গুহাটি ওরই মধ্যে আরও প্রশস্ত হয়েছে। প্রবেশ-পথটি সঙ্কীর্ণ। হাত দুই তিন মাত্র উঁচু। হাতেপায়ে ভর দিয়ে ঢুকতে হয়। গুহার বাইরে স্বল্প-পরিসর সমতল স্থান। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় বহু উঁচু বাড়ির খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। তারই একধারে একটি লম্বা পাথর— যেন বসবার বেঞ্চ। সেইখানে বসে জুতা বাইরে খুলে রেখে সাবধানে গুহায় প্রবেশ করি। বৈরাগীজির জুতা খোলার হাঙ্গামা নেই। খালি পা—পায়ের তলা দেখিয়ে বলেন, আমাদের জুতা পায়ের সঙ্গে সেলাই হয়ে আছে!—তাকিয়ে দেখি, শক্ত মোটা চামড়া, মাঝে মাঝে লম্বা ফাটা—দারুণ গ্রীষ্মে যেমন মাঠের মাটি ফাটে।

আমার আগে তিনি গুহায় প্রবেশ করেন—শরীরটা একটু বেঁকিয়ে—অনায়াসে। তাঁর কাছে অতি সাধারণ সহজ পথ। ভেতরে গিয়ে অতিথির প্রতি তাঁর সতর্ক-দৃষ্টি দেন। প্রবেশ করে উঠে দাঁড়াতে যাই, হাত ধরে সাহায্য করেন, বলেন, দেখবেন—সাবধানে মাথা তুলবেন, সোজা হয়ে দাঁড়াবেন না যেন—ওপরে পাথরে মাথা ঠুকে যাবে।

সত্যিই তাই। সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। সামান্য উপরেই ছাদের মত পাথর ঢালুভাবে রয়েছে। মাটিতে বসতে যাই, বলে ওঠেন, বসবেন না এখন, একটু বেঁকে কষ্ট করে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন— বসবার আসন দিই।—বলে একটা কম্বল টানতে যান, আমি হাত ধরে ফেলি। তাকিয়ে দেখি, একপাশে মাটিতে শুকনো ঘাস ছড়ানো। বলি, ওর ওপর বসি।

তিনি হেসে বলেন, তাই চান, বসুন, ওই তো আমার আসন—শয্যাও বটে, বসিও তাই। তাঁকেও হাত ধরে পাশে বসাই। বৈরাগী বলেন, শুকনো ঘাস, বেশ গরম হয়, জানেন নিশ্চয়।

গায়ের চাদরটা খুলে একপাশে রেখে দেন। কোমরে একটা দড়ি বাঁধা—তারই সাহায্যে শুধু একটি লেঙটি পরা। লম্বা রোগা শরীর।

গুহাটির ভেতরদিকে হাতপাঁচেকও লম্বা হবে না। মাথার উপরের ঢালু পাথর যেদিকে নেমে গেছে—সেদিকে সোজা হয়ে বসাও যায় না। পাশে যে পাথরগুলি দেওয়ালের মত আছে, তার মাঝে মাঝে ফাঁক ছিল—ছোট ছোট পাথর গুঁজে সেগুলি যথাসম্ভব বন্ধ করা হয়েছে। শুধু সামনে দরজার ফাঁকটুকু আছে। ঐ পথে আলো-বাতাসেরও গতিবিধি। মেঝেতে কোথাও পাথর, কোথাও মাটি— তবে বেশি অসমান নয়; পরিষ্কার করে রাখাও। গুহার ভেতর গরম। বৈরাগী বলেন, লোকের ধারণা—এই শীতের দেশে পাথরের গুহার মধ্যে ঠাণ্ডায় কত কষ্টে আমরা থাকি—কিন্তু দেখেছেন তো গুহার মধ্যে

কেমন আরাম। আর এটা যেদিকে মুখ করা, সেদিক থেকে কখনও ঠাণ্ডা বাতাস আসে না। ও-পারের ঐ পাহাড়ে হলে নীলকণ্ঠের বরফের হাওয়া একবারে শরীর নীল করে দিত। এখানে রোদ্দুর চান—বাইরে বেরিয়ে রোয়াকে বসুন—ওখানটায় সূর্য ওঠার পর থেকে রোদ আসে, সারাদিন থাকে। মানুষ দেখার কখনও ইচ্ছে হলে তাও দেখতে পাবেন ওখানে বসে—নীচে রাস্তা দিয়ে লোক চলেছে। কিন্তু বহু দূরে; —তাদের কোন কলরব এখানে এসে পৌছয় না। মন্দিরে জিজ্ঞাসা করছিলেন, হট্টগোলের মধ্যে থাকার কথা: এবার দেখুন, সে-সব আছে এখানে কিছু? একমনে সাধন-ভজন করি। কি সুন্দর স্থান, এইখানে বসেই বাইরের দৃশ্যটি দেখুন না একবার।

এসে পর্যন্ত তাই দেখেছিলামও। নীচে অলকানন্দার সর্পিল গতি-পথ, ওপরে গগন-স্পর্শী নর-পর্বত, তারই শিখরে স্থানে স্থানে এখনও সামান্য তুষার-রেখা।

চারিদিক শান্ত, শব্দহীন। গুহার মধ্যে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়—যেন দরজার-ফ্রেমে-বাঁধানো আঁকা-ছবি দেখছি।

গুহার মধ্যে কি আছে তাও দেখি। একধারে একটি পাথরের উপর নারায়ণের ছবি। খান চার-পাঁচ বই—গীতা, তুলসীদাসের রামায়ণ, পূজাপার্বণ ও স্তোত্রের হিন্দী বই। একটা ছোট্ট টর্চ। আলোর ডিবে। একটা ভুটিয়া কম্বলও আছে। বলেন, যখন এসেছিলাম কাছে একটা থালা-গেলাসও ছিল—বছরখানেক আগে সে দুটো গেছে। একদিন মন্দির থেকে ফিরে এসে দেখি—নেই!—বলে হাসতে থাকেন।

আশ্চর্য হয়ে বলি, এখান থেকে গেল কোথায়?

তিনি হাসতেই থাকেন, বলেন, নিশ্চয় কোন দুষ্ট লোক এসেছিল হঠাৎ কোথা থেকে। এসব এখানে হয় না—হয়ে গেছে কি ভাবে। ভালোই হয়েছে। সাধুদের ও-সব কিছু না রাখাই ভালো, কি বলেন?

বলব আর কি! অবাক হয়ে শুনি।

বৈরাগী বলেন, এবার তাহলে একটু গরম জলের ব্যবস্থা কবি?

জিজ্ঞাসা করি, এখন গরম জল কি করবেন?

হেসে বলেন, গরম জল মানে চা। আপনার কাছে সেটা ঠিক চা-খাওয়া হবে না—শুধু গরম জলই হবে।

বারণ করি। বলি, কোন দরকার নেই, তাছাড়া এখুনি খেয়েও এলাম।

শোনেন না, বলেন, দেখুন না, কি রকম টি-সেট। চায়ের সব সাজ-সরঞ্জাম বার হয়!

গুহার এক কোণ থেকে বার হয় দুটি টিনের কৌটা। একটাতে খানিকটা চিনি, অপরটাতে একটু চায়ের গুঁড়া। কনডেন্সড মিল্কের ডিবাও একটা বেরোয়। পেতলের একটা ছোট পাতলা ঘাটি,—উপর ও ভিতর দিক মাজা ঝকঝক করছে কিন্তু তলাটা কালিতে ঝুল-কালো হয়ে আছে,—তাতে জল ভরা ছিল। হাতে নিয়ে বলেন, দেখুন তো এতখানি দরকার হবে? একটু ফেলে দিই?

আমি বলি, কেন এইভাবে জল নষ্ট করছেন!

তিনি বলেন, ঘরের কাছেই দেখলেন তো কেমন ধারা বয়ে চলেছে! জলের অভাব কোথায়? কোনও কিছুরই অভাব নেই এখানে—তো জল!

গুহার মধ্যিখানে তিনটে পাথর উনানের মত করে রাখা। ঘটিটায় চায়ের গুঁড়ো ফেলে তার উপর চাপান। কয়টা শুকনো সরু কাঠি ও ডাল দিয়ে আগুন জ্বালান। আগুন ধরতে চায় না। সরু বাঁশের একটা চোঙ্ মত বার করে জোরে ফুঁ দেন। দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার নিবে যায়। ধোঁয়া ওঠে। তখন ধীরে ধীরে ফুঁ দিতে আরম্ভ করেন। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকান। ব্যস্ত ও লজ্জিত হয়ে বলেন, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আপনাকে বাইরে গিয়ে বসতে বলা উচিত ছিল—এ ধোঁয়ায় আপনি থাকবেন কি করে? আপনি তাই করুন, আবার বেরুতে একটু কষ্ট হবে আর কি!

আমি বলি, আপনাকে তো থাকতেই হবে ভেতরে, তবে আমিও থাকি।—আপনি উনুন ধরান।

জোর করে বসে থাকি বটে, কিন্তু চোখ জ্বলতে থাকে, জল বেরিয়ে আসে। তবুও থাকি। এদিকে ছোট গুহাটি ধোঁয়া জমে ভরতে থাকে, দরজা দিয়ে বেরোয় না—অন্য নিকাশেরও পথ নেই। মাথাও ঘুরতে থাকে, মনে হয়, বুঝি দম বন্ধ হয়ে এল।

বৈরাগী বুঝতে পারেন, বলেন, এসব অভ্যেস নেই আপনাদের, কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছেন?

অগত্যা বাইরেই এসে বসি। কিছু পরে ভিতর থেকে ডাক পড়ে,—এবার চলে আসুন, জল ফুটছে।

আর হামা দিতে হয় না। কোমর বেঁকিয়ে, মাথা খুব হেঁট করে ঢুকি। বৈরাগীজি হেসে বলেন, বাঃ, দুবার ভেতর বাইরেই করেই অভ্যেস হয়ে গেল দেখছি!—এবার কাপের ব্যবস্থা করতে হবে—কি বলেন?

বার হয় দুটি টিনের লম্বা কৌটা।—দেখিয়ে বলেন, এতে খেতে পারবেন তো, ভীষণ গরম হবে কিন্তু। রুমাল আছে নিশ্চয় পকেটে?—বসুন একটু, বাইরে থেকে এ দুটো ভালো করে ধুয়ে আনি।

ফিরে এসে ঘটির মুখে কাপড়ের একটা ছোট টুকরো জড়ান—চা ছাঁকবার জন্যে। ন্যাকড়ার গাঢ় লাল ও কালচে রঙ দেখে বুঝতে পারি—এই জন্যেই একে রাখা।

টিনের কৌটা দুটির মধ্যে একটু করে জমা দুধ ঢালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, চিনি কতখানি খান, বলুন?

আমি বলি, চিনি খাওয়া খুব কমিয়ে দিয়েছি—এক চামচেরও কম লাগবে।

মনে মনে ভাবি, মিথ্যা বললাম। না—তাই বা কেন? আজ এখন থেকেই না হয় কমিয়েই দিলাম—মনে থাকবে আজকের এই ছোট্ট ঘটনা।

তিনি বুঝতে পারেন। হেসে বলেন, চিনি আমার রয়েছে এখন। একজন মাঝে মাঝে দেন—তাই পাবার অসুবিধে নেই। না থাকলে পেতেন না। বেশি চিনি না হলে এখানে চা জমে কখনও? এই দেখুন, এতখানি দিলাম।—বলে তিনি চার চামচের মত ঢালেন।

রুমাল জড়িয়ে চা-ভরা কৌটা ধরে চা-পান শুরু করি। তিনি ধরেন শুধু-হাতেই। বলেন, ও আমার সহ্য হয়ে গেছে—গরম লাগে না, যেমন ধোঁয়াও চোখে লাগে না।

গায়ের চাদরটা কাছে টেনে নেন। একটা খুঁটে কি বাঁধা ছিল—গেরো খুলে বার করেন। দেখি আটটি লাড্ডু। আড়চোখে আমার দিকে তাকান। মুখ খুশীতে ভরা। তখনই আবার গম্ভীর হয়ে চোখ বুজে শান্ত হয়ে মিনিটখানেক বসেন। ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করেন। তারপর অতি যত্নভরে আমার সামনে রেখে বলেন, নিন, প্রসাদ নিন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বলি, এ-সব হচ্ছে কি? এ-খাবার আনা হয়েছে কেন? তাই বুঝি আমি ঘরে চাবি দিতে গেলাম—বললেন, আসছি ঘুরে একবার? এই জন্যেই বাজারে তখন যাওয়া হয়েছিল? পয়সা পেলেন কোথা থেকে? কাছে কত টাকা আছে শুনি একবার?

ছেলেমানুষ। অপ্রস্তুত হয়ে যান। বলেন, টাকা পাব কোথা থেকে? এক পয়সা নেই—দরকারও নেই। আজ আপনি আসবেন এখানে, ভাবছিলাম চায়ের সঙ্গে কি দেব? শুধু চা খাবেন—সেটা মনে কি রকম লাগছিল! হঠাৎ মনে পড়ল, কিছুকাল আগে এক যাত্রী প্রণাম করে একটা টাকা দিয়েছিল। আমি কিছুতেই নেব না—যত তাকে বলি টাকার কোন দরকার নেই আমার, আমি পয়সা-কড়ি নিই না, রাখিও না,—সে কোনমতেই শুনবে না, পায়ের কাছে ফেলে রেখে, হাতজোড় করে তাকিয়ে থাকে, ছল্‌ছল্‌ চোখে চায়। মনে কি রকম লাগল—টাকাটা তুলে রেখে দিলাম। এতকাল সেটা পাথরের পাশে গোঁজাই পড়ে ছিল—আজ হঠাৎ সেটার কথা মনে পড়ল—তাই দিয়ে কিনে এনেছি।

আমি রাগের ভান করে বলি, খুব অন্যায় করেছেন। আমার জন্যে এইভাবে খরচ করার কোন মানে হয় না। আর ঘরে অতিথি এলে তাকে চা-খাবার খাইয়ে অভ্যর্থনা করতে হবে এই হিমালয়ের গুহাতেও? এ সবই যদি করা দরকার মনে হয়—তবে আর এখানে আছেন কেন? আসামে থাকলেই হত।

তিনি চমকে ওঠেন, বলেন, আসামের কথা আপনি জানলেন কি করে?

আমি হেসে বলি, শারলক্ হোম্‌স পড়েছিলেন তো?

তিনি বলেন, বাঃ, পড়েছি বই কি। কোনান্ ডয়েলের একটা গল্প আমাদের ইন্টার-এর পাঠ্যেও ছিল।

আমি বলি, সেই শারলক্ হোম্‌স-এরই কথা—খুবই সহজেই, ওয়াটসন্, খুব সহজে। আসামে আপনার বাড়ি বুঝতে কোন কষ্টই হয় নি—আপনার মুখের চেহারা ও বাংলা কথার টানের ও উচ্চারণের মধ্যে।

তিনি হেসে ওঠেন, ঠিকই ধরেছেন।

ভাবি কথাটা যখন উঠলই, জিজ্ঞাসা করি না ঘর-বাড়ির কথা। ছেলেমানুষ—এইভাবে চলে এলই বা কেন?

প্রথমটা একটু সঙ্কোচ করেন, তারপর সব বলেন।

বাবা-মা নেই। দাদা আছেন, সংশোধন করে বলেন, আছেন মানে ছ'বছর আগে ছিলেন। এখনকার খবর জানি না। কেননা গত ছ'বছর আর খবর রাখি নি। এখানে যে এসেছি ও আছি তাঁদের আর জানাই নি। তাঁরা নিশ্চয় খোঁজখবর অনেক করেছিলেন, বার করতে পারেন নি। গুরুদেব বলেন, এ সব খবরাখবর রাখলে প্রথম দিকে কাজের বিঘ্ন ঘটায়; তাই সে-সব সংযোগ আর রাখি নি। কিছুদিন একটু মন চঞ্চল হত—এখন সেটা কেটে গেছে।

তাঁর জীবনের ছোট্ট ইতিহাস শুনি। ইন্টারমিডিয়েট যখন পড়েন, তখন যুদ্ধ বাধে। সেনাবিভাগে যোগ দেন। বর্মায় অনেকদিন ছিলেন। সেখানে সৈনিক জীবনের নানারকম নতুন অভিজ্ঞতা হয়। সেই সময়েই তাঁর মনের পরিবর্তন আসতে শুরু করে। তারপর দেশে ফিরে ভারতের কয়েক জায়গায় ঘোরেন। তীর্থগুলিও দেখেন। শেষে সব ছেড়ে এইখানে বসে গেছেন।

বলেন, ভগবানের অশেষ কৃপা। গুরু পেয়ে গেলাম যোশীমঠে। দেখেন নি তাঁকে, এবার দর্শন করে যাবেন ফেরার পথে। আনন্দ পাবেন।—বলে হাত তুলে কপালে ঠেকান।

গুরুদেবের নাম শুনে তখনই বলি, দর্শন আমি তাঁকে করেছি।

উত্তরাখণ্ডে সেই মহাত্মার কথা সকলেই জানেন। একশো বছরের উপর বয়স, শোনা যায়। সাধুরাও সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। দেখলেই ভক্তি জাগে।—এর কয়েক বছর পরে ১৯৫৯ সালে যোশীমঠে তিনি দেহরক্ষা করেন।

এইভাবে বৈরাগীর সঙ্গে পরিচয় হয়। যে দু'দিন বদরীনাথে থাকি রোজই দেখা হয়। আমার ঘরেও আসেন। ফেরার সময় আমার সঙ্গে-আনা উদ্বৃত্ত চা, দুধের গুঁড়া, চিনি—সব তাঁকে দিয়ে আসি। বলি, এখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরব—এসব সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কি হবে?

তিনি নিতে রাজী হন না। জোর করি। হেসে বলেন, আচ্ছা তবে রেখে দিই। যখনই খাব, আপনার কথা মনে হবে।

বাড়ি পৌঁছানোর সংবাদ চিঠি লিখে জানাবার জন্যে বার বার বলেন। আশ্চর্য, যে কয়টি সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হয় সকলেরই এই অনুরোধ!

কলকাতায় ফিরে তাঁদের একজন স্বামীজিকে পত্র লিখে খবর দিই, তাতে অন্য সকলের—বিশেষত বৈরাগীর উল্লেখ করে লিখি, যেন তাঁদেরও খবরটুকুও বলে দেন।

ক'দিন পরেই বৈরাগীর এক চিঠি। অভিমানে ভরা। লিখেছেন, সেদিন তপ্তকুণ্ডে স্নান করতে গিয়ে স্বামীজির সঙ্গে দেখা। তাঁর কাছে আপনার নিরাপদে পৌঁছানোর খবর শুনলাম। আমাকেও নাকি জানাতে লিখেছেন। খবর শুনে খুশী হলাম, কিন্তু তিনটি মাত্র পয়সা খরচ করে আমাকে লেখা বুঝি সম্ভব হল না?

চিঠি পড়ে ভাবি, একটা পোস্ট-কার্ড লিখলেই হত। তখনই উত্তর লিখি—তিন পয়সা বাঁচানোর কোন প্রশ্নই নেই, তাই আগেকার বাঁচানো পয়সা খরচ করে এবার খামেই লম্বা চিঠি লিখছি। আলাদা চিঠি লিখি নি, কেননা ভেবেছিলাম খবরটুকুই তো দেবার কথা—দিয়েছিলামও। শহর থেকে চিঠি লিখে আপনার সেই সুন্দর শান্ত গুহার আবহাওয়া কেন দূষিত করব!

তারপর প্রায় প্রতি বছরই বদরীনাথ অঞ্চলে কোথাও না কোথাও দুজনের দেখা হয়। পরিচয়ের গভীরতাও বাড়ে। শতপন্থেও তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাই। সেই কাহিনী যথাস্থানে হবে।

এক বছর ক'দিন একসঙ্গে কাটিয়ে ফিরে আসছি। বৈরাগী অতি সঙ্কুচিত ভাবে এসে বলেন, দেখুন, একটা কথা বলি। নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না, জানি। যদি আপনার কোনরকম অসুবিধে না হয় আমাকে একটা ঘড়ি দিতে পারেন? একটুও অসুবিধে হলে কিন্তু কোনমতেই নেব না। হয়েছে কি জানেন, গুহায় একা থাকি—রোজই রাতে একবার ঘুম ভেঙে গেলেই তখনই জপে বসে যাই। ভোর হতেই চলে যাই তপ্তকুণ্ডে স্নান করতে। এখানে আকাশের আলো দেখে সব সময় রাত্রের গভীরতা ঠিক করা যায় না। মাঝে মাঝে এমন হয়েছে, ভোর হয়ে গেছে ভেবে স্নান করতে চলে গেছি, স্নান সেরে ফিরছি

মন্দিরের ঘড়িতে বাজছে শুনি রাত দুটো! বলে হাসতে থাকেন।

প্রশ্ন করি, কিন্তু শুধু লেঙটি পরে হাতে রিস্ট-ওয়াচ বেঁধে ঘুরতে পারবেন তো?

তিনি বলেন, না না, রিস্ট-ওয়াচ নয়,—ও পরা চলবে না। পকেট-ঘড়ি এখন মেলে না?

বলি, তাই বা রাখবেন কোথায়? পকেট তো নেই। ট্যাকও নেই। কোমরে তো একটা দড়ি!

বলেন, তা বলেছেন ঠিক। কিন্তু ঐ দড়ির সঙ্গেই একটা ব্যবস্থা করে নেব।

আমি বলি, তাহলে একটা গল্প শুনুন। বিলিতি গল্প। শেষ পর্যন্ত সে অবস্থা যেন না হয়, দেখবেন। গল্পটার নাম ছিল—All for a hat : শুধু একটা টুপির জন্যেই সব! এক সাহেবের অবস্থা বেশ ভালো। কিন্তু তাঁর মতে ধনদৌলতের জাঁকজমক দেখিয়ে মানুষের বাস করা কখনই উচিত না। তিনি তাই তাঁর নিজের বাড়ি করলেন—ছোট করে, ঠিক যতটুকু একান্ত প্রয়োজন। কাজ চলার মত ছোট একটা মোটরগাড়িও কিনলেন। কিছুদিন পরে এক দোকানে বেশ ভালো মাথা-উঁচু একটা হ্যাট—টুপি দেখে তাঁর পরবার ভারি লোভ হল। প্রথমে মনকে সংযত করবার চেষ্টা করলেন, শেষে বোঝালেন, শুধু তো একটা টুপি! ওতে আর কি হয়েছে? কিনলেন। তারপর রোজ বাড়ি ঢুকতে দরজাতে টুপি ঠেকে যায়—দরজা অগত্যা ভেঙে বড় করতে হল। নতুন দরজার আকারের সঙ্গে ঘরের আকার মেলে না, তাই ঘরও ভেঙে বড় হল। এদিকে টুপি-মাথায় ছোট মোটরে উঠতে পারেন না—বড় মোটর কিনতে হল। তার জন্য গ্যারেজ-ঘরও ভেঙে বাড়াতে হল। শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই ছোট্ট বাড়ি দেখতে দেখতে বিরাট অট্টালিকা হয়ে গেল—শুধু সেই টুপিটুকুরই জন্যে!

বৈরাগী হেসে গড়িয়ে পড়েন, বলেন, না, না—সে-সব ভয় নেই। বেশ গল্পটা কিন্তু।

কলকাতায় ফিরে ঘড়ি কিনে পাঠিয়ে দিই। খুব খুশী হয়ে চিঠি দেন।

বছরখানেক পরের কথা। হঠাৎ এক লম্বা চিঠি,—আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। হয়তো আগে না লিখে আমি অন্যায় করেছি। আপনাকে জিজ্ঞাসা না করেই সে-ঘড়িটা আজই একজন পাহাড়ীকে দিয়ে দিলাম। সে লোকটি অনেকদিন ধরেই চাইছিল। কিন্তু তার চাওয়ার জন্যেই যে দেওয়া তা ঠিক নয়। প্রকৃত কারণ সাধুদের কোন কিছু রাখা কখনই উচিত নয়—ঘড়িও নয়। তা ছাড়া, এটি সঙ্গে রেখে মনে একট অস্বস্তি জেগেছিল,—ঠিক সময় দম্ দেওয়া চাই, কোথায় রাখি, কখন হারায়,—সব সময়েই মনের এই বিকার!—তাই আজ ঘড়িটি দিয়ে মুক্ত হলাম। স্বকৃত ভুল-সংশোধন করলাম। ক্ষমা করবেন।

চিঠির নীচে দেখি, বৈরাগী নাম ত্যাগ করে তিনি "ত্যাগী" হয়েছেন।

আমিও খুশি হয়ে জানাই, খড়ি তো আপনার। দিয়ে দিয়েছেন—খুব ভালো করেছেন।

তারপরও বৎসরান্তে যখনই দেখা হয়, চোখে পড়ে—যৌবনের সেই স্নিগ্ধ কমনীয় কান্তি, লজ্জিত-বিনম্র-স্বভাব কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের নির্মম নিষ্পেষণে রুক্ষ শুষ্ক হয়ে এসেছে—যেমন ভোরের ফোটা রঙিন ফুল দুপুর-রোদের প্রখরতায় শুষ্ক ম্লান হয়ে আসে।

দেখে মনে মনে বলি, 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি, সন্ন্যাসী!'

কিন্তু তখনই আবার দৃষ্টি পড়ে, সেই দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসীর উগ্র-কঠোর রূপের মধ্যেও এক সৌম্য অচঞ্চল জ্যোতির উন্মেষ। রমণীয় নয়, কমনীয় নয়—দিব্য মঙ্গলময়।

॥ ৯ ॥

আর এক বছরের কথা। সে বছর একা গিয়েছি। সাধারণত এই সব পথে একজন সঙ্গী থাকা ভালো। বিদেশ-বিভুঁই। তায় বিরাট হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চল। পাহাড়ের বুকে কোন এক সুসভ্য শহরে সুস্থির হয়ে দিন কাটানো নয়। পথে পথে দিন কাটে। নিত্য নতুন স্থানে রাত্রিবাস। তাই মনে ভয়-ভাবনার ছায়া পড়া অস্বাভাবিক নয়—যদি অনিয়ম অত্যাচারে অজানা দেশে হঠাৎ কখনও শরীর অসুস্থ হয়! সেক্ষেত্রে পরিচিতের বা বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্যে মনে সাহস আনে। তা ছাড়া, প্রাণ খুলে দুটো মনের কথাও বলা চলে। এসব দিক থেকে দৈনন্দিন পথিক-জীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দের একজন সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা কম নয়। কিন্তু এই সঙ্গী-নির্বাচনে সতর্কতা চাই। বন্ধু হলেও সব সময়ে বা সর্বক্ষেত্রে এই সব পথে যে মনের বা মতের ঠিক মিল থাকে এমন নয়। নিজের নিজের ঘরের মধ্যে বাস করে প্রতি মানুষেরই কতকগুলি স্বভাব গড়ে ওঠে। ঘরের বাইরে এই পাহাড়-পথে যেভাবে দিনযাপন করতে হয় তাতে এই সব মজ্জাগত

অনেক অভ্যাসেরই ব্যতিক্রম ঘটে। ভেতরে ভেতরে অজানিত ভাবে মানুষের ত্যক্ত মন তিক্ত হয়ে ওঠে, অলক্ষ্যে স্বার্থপরতা উঁকি মারে—তারপর একদিন হঠাৎ সামান্য ঘটনার সূত্র ধরে বন্ধুত্বের বন্ধন খুলে লজ্জাশরমের মুখোশ ছিঁড়ে মনের দুর্বল ভাবগুলি কুৎসিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করে ফেলে। তখন যাত্রার সব আনন্দ তো যায়ই, এইভাবে যাত্রা পণ্ড হয়ে মাঝপথ থেকে দল ভেঙে যাত্রীকে ফিরে যেতেও দেখেছি।

এই বছরেই একটি ছোট্ট ঘটনা।

রামপুর চটি। ধর্মশালায় উঠেছি। দোতলার এক ঘরে আছি। সন্ধ্যার আগে নীচে নামতে গিয়ে সিঁড়ির উপর দেখা একজন যাত্রীর সঙ্গে। বাঙালী দেখে দুজনেই আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করলাম। কলকাতা থেকে তাঁরাও আসছেন। বড় দল। কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও আছেন। একটু পেছিয়ে পড়েছেন। এখনও সবাই এসে পৌঁছন নি, বললেন। আমাদের পাশের ঘরে উঠেছেন।

সন্ধ্যার পর খাওয়াদাওয়া শেষ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছি। সারাদিন হাঁটা, আবার শেষরাত্রে উঠে পথ চলা শুরু হয়, এ অবস্থায় এক ঘুমেই রাত কাটে। কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দুই বৃদ্ধের গলা। পাশের ঘর থেকেই আসছে। তুমুল বচসা চলেছে। কখন কি নিয়ে শুরু হয়েছে জানি না। আমার কানে যখন গেল, তখন বিবাদের বিষয় হচ্ছে—একজনের জিনিস আর একজন ব্যবহার করেছেন কেন? কৈফিয়ত গ্রাহ্য হচ্ছে না। অপরজনও ছাড়বার পাত্র নন—চিৎকার করে বলেন, সেদিন আপনিও তো আমার শিশি থেকে সরষের তেল নিয়ে মেখেছিলেন!

অনেক রাত পর্যন্ত ঝগড়া চলতে থাকে। যাত্রী-ভরা ধর্মশালার ঘুমন্ত পুরীর নিস্তব্ধ আবহাওয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভেঙে পড়ে—লজ্জায় আমার মন ভরে ওঠে। বেশ বুঝি, এঁদের যাত্রার আনন্দ গেছে, হয়তো অকালে মাঝপথে যাত্রা সাঙ্গ হবে।

এই সব কারণে সঙ্গে কেউ যেতে চাইলেও আমি সহজে রাজী হই না। নির্ভরযোগ্য কাউকে না পেলে একাই বার হয়ে পড়ি।

একা ঘুরে বেড়ানোর একটা বিশিষ্ট অনুভূতি আছে। সহস্র যাত্রী, তবুও একা। যেন স্রোতে ভেসে যাওয়া ঝরা একটি পাতা। স্রোতের টানে চলে, অথচ জলের অংশ নয়। বিচ্ছিন্ন। নিজের মনে চলি। মন অজানা এক আনন্দে ভরপুর। যেখানে ভালো লাগে, থাকি। আবার চলি। আপনা হতেই সংযতবাক্। কথা বলি মনে মনে নিজেরই সঙ্গে। গহন বিজন বনের মধ্যে, অথবা আকাশ-ছোঁয়া মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের জনহীন পথ দিয়ে একা যেতেও কখনও একলা ভাব মনে জাগে নি। চারিদিকের পরিবেশে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়ে আত্মসত্তা লুপ্ত হয়ে যায়। কখনও বা মনে হয়, কে যেন এক অন্তরঙ্গ সঙ্গী সঙ্গে চলেছে। মনে মনে তার সঙ্গে কথা বলি। সুস্পষ্ট অনুভব করি, হাতে তার হাত ধরে এগিয়ে চলেছি। কে সে,—জানি না, জানার প্রয়াসও করি না, ইচ্ছাও হয় না। শুধু বুঝি, কে যেন চলেছে সব সময়ে আমারই সঙ্গে—পা ফেলি তারই পায়ের তালে তালে। এ এক অতি বিচিত্র অথচ অতি সত্য অনুভূতি।

এ শুধু আমার একারই নয়। বিদেশী তুষার-শিখর অভিযাত্রীদের কাহিনীতেও এই ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা পড়েছি। তাঁদের কেউ কেউ এই অদৃশ্য অজ্ঞাত সঙ্গীকে নিজের আহার্যের অংশও হাত বাড়িয়ে সাদরে দিতে গেছেন,—কথা বলেছেন,—তারপর নিজের কণ্ঠস্বরে চমক ভেঙেছে, মনে পড়েছে —কোথাও কেউ নেই—তিনি একা। অথচ তাঁর সমস্ত সত্তা ও চৈতন্য দিয়ে সেই অপরকার উপস্থিতি কি স্পষ্টভাবেই না অনুভব করেছেন!

বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক নিশ্চয় এর যুক্তিযুক্ত মনোবিজ্ঞান-সম্মত কৈফিয়ৎ দেবেন, জানি। কিন্তু তবুও, কেন জানি না, এই অদ্ভুত অনুভূতি মনে এক অভিনব আনন্দ ও অসীম সাহস আনে। একা ঘোরার এও এক অমূল্য অভিজ্ঞতা।

সেবারও এইরকম একাই গিয়েছি। বদরীনারায়ণে পৌঁছেছি। সেখানে হঠাৎ দেখা এক বন্ধুর সঙ্গে। তাঁরও হিমালয়ে ঘোরার স্বভাব। বিশাল দেহ, বিপুল দাড়ি। মুখভরা হাসি। আমাকে দেখেই দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করেন। উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে বলেন, আরে, তুমিও আবার চলে এসেছ! চমৎকার হয়েছে—চলো, আজ এক সাধুকে দর্শন করাতে নিয়ে যাব তোমাকে।

বন্ধুটি অদ্ভুত মানুষ। তখন প্রায় ষাট বছর বয়স। তাঁর যৌবনকালের দুটি কাহিনী শোনাই।

বিয়ে দেবার জন্যে তাঁর মার বিশেষ আগ্রহ। কিন্তু বিবাহ-জীবনে যেতে বন্ধু কোনমতেই রাজী নন। মাও ছাড়েন না, পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। একদিন তিনি ছেলেকে বলেন, 'দেখ, এবার আর অমত করা চলবে না। গঙ্গার ঘাটে যেতে এক ব্রাহ্মণের একটি মেয়ে দেখে এসেছি। অতি শান্ত, সুশ্রী। কিন্তু বাপ গরিব—তাই এমন মেয়েরও বিয়ের ব্যবস্থা করতে পাচ্ছেন না। তুমি নিশ্চয় একবার দেখে আসবে, দেখলে তোমার পছন্দ হবেই। যাবে কিন্তু নিশ্চয়,—যাবে বলে আমি তাঁদের কথা দিয়ে এসেছি।' বন্ধুটি হেসে মাকে বলেন, 'একেবারে কথা দিয়ে এলে, মা, যাব বলে! ভালো, তোমার কথা রাখব।'

তারপর একদিন গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার পথে তাঁদের বাড়ি গিয়ে বন্ধু উপস্থিত। পরনে ভিজে কাপড়, খালিগায়ে গামছা জড়ানো। মেয়ের বাবাকে ডেকে পরিচয় দিয়ে বলেন, 'মা বলেছেন, তাই এসেছি। মেয়েকে এখুনি নিয়ে আসুন, সাজাতে হবে না—যেমন আছে তেমনি আনুন।'

ভদ্রলোক আশ্চর্য হন। তবুও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা—মেয়েকে তখনই ডেকে আনেন।

বন্ধু দেখামাত্রই পাত্রীকে প্রশ্ন করেন, মা, তোমার নামটি কি? ভারি সুশ্রী মেয়েটি তো—বলে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এমন সুন্দরী মেয়ে আপনার—এর বিয়ের জন্য ভাবনা? আমি নিজে দাঁড়িয়ে এঁর বিয়ের ব্যবস্থা করব।'

যেমন কথা, তেমনি কাজও। মাকে এসে সব ঘটনা বলেন। দিনকয়েকের মধ্যে একটি ভাল পাত্র সন্ধান করে নিজের খরচায় মেয়েটির বিবাহও দেন।

মা এর পর বিবাহের কথা আর কখনও তোলেন নি।

বন্ধুর গুরুদেবের সন্ধান পাওয়ার অদ্ভুত ঘটনা।

১৯১৫-১৬ সাল। তখন তিনি কলকাতা কলেজে পড়েন। খিদিরপুরে থাকেন। একদিন বিকালবেলা কলেজ থেকে ফেরার পথে গড়ের মাঠে গেছেন ফুটবল খেলতে। খেলার শেষে ভাবলেন, পকেটে শুধু একটা আধুলি আছে, ওটা আজ আর ভাঙাব না—হেঁটেই বাড়ি যাই।

রেস-কোর্স-এর বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। কোথাও জনমানব নেই। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। হঠাৎ দেখেন, অপর দিক থেকে হন্ হন্ করে হেঁটে আসছেন আলখাল্লার মত লম্বা ঝোলা জামা গায়ে একজন সাধু। চোখে তাঁর রঙিন চশমা। কাছে আসতেই তিনি দাঁড়ালেন এবং হিন্দিতে বললেন, বদরীনাথ যাবার জন্যে খরচার কিছু পয়সা দিতে পারো?

বন্ধুর পকেটে শুধু সেই একটি মাত্র আধুলি। কিছু না ভেবে আধুলিটি বার করে তাঁর হাতে দিলেন। তিনিও নিয়ে চলতে শুরু করলেন। বন্ধুও এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ তাঁর মনে সন্দেহ জাগল, লোকটির হাতে কালো রঙের বড় কমণ্ডলু দেখলাম না? সে তো মুসলমান ফকিররা ব্যবহার করে! ইনি তো বললেন, বদরীনাথে যাবেন। তবে কি লোকটি—ভাবতে ভাবতে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, সাধুটি কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ও তাঁরই দিকে তাকিয়ে দেখছেন। বন্ধুকে ফিরতে দেখে বলেন, কি, সন্দেহ হল ঝুটা বলে? বলে হেসে চলে গেলেন।

বন্ধু বাড়ি ফিরে গা থেকে পাঞ্জাবি খুলে রাখছেন, ঝনাৎ করে আধুলিটি পকেট থেকে মেঝেতে পড়ল। আশ্চর্য, কোথা থেকে ফিরে এল!

এই ঘটনার বছর বারো পরের কথা। গুরু লাভের আকাঙ্ক্ষায় বন্ধুর মন তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোথাও মনোমত সন্ধান পান না। হরিদ্বারে সেবার পূর্ণকুম্ভ। সাধু-সন্ন্যাসীদের আখড়ার চারিধারে ঘুরে ঘুরে দেখছেন। এক জায়গায় একজন সাধুকে কেন্দ্র করে ভিড় জমেছে। বন্ধু গিয়ে সেখানে দাঁড়ালেন। দেখেন সৌম্যমূর্তি এক বৃদ্ধ সাধু। চোখে তাঁর রঙিন চশমা। রঙিন চশমা! বন্ধু ভাবেন, কোথায় যেন দেখেছি! সাধুজি তাঁকে সস্নেহে কাছে ডাকেন। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন, এতদিন পরে আবার দেখা হল—তুমি আসবে জানতাম, কেননা এবার সময় হয়েছে—তোমায় দীক্ষা দেব।—তারপর একটু হেসে বলেন, কেমন যাদু দেখলে?

এই সেই বন্ধু। পরের উপকার ও সেবা করে দিন কাটান। পূজা-অর্চনায় স্তোত্রপাঠে প্রচুর উৎসাহ। সুযোগ পেলেই সাধু-সঙ্গ করেন। আমাকে বলেন, চলো সাধুটির দর্শন করে আসবে। শুনেছি উঁচুদরের।

কয়েক বছর আছেন এখানে। অনেকে বলেন, বাঙালী। চলো দেখে আসি।

আমি যেতে রাজী হই না। বলি, তুমি ঘুরে এসো। তোমার কাছে গল্প শোনা যাবে।

বন্ধু ছাড়েন না। পীড়াপীড়ি করেন। অগত্যা সঙ্গ রাখি।

তপ্তকুণ্ডের একপাশে যে বাড়িগুলি, তারই নীচের একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াই। ঘর তো নয়, খুপ্‌রি। দরজাও তেমনি। মাথা অনেকখানি হেঁট করে, দেহ সঙ্কুচিত করে কোন রকমে ঢুকতে হয়। ঘরের বাইরে পাথর-বাঁধানো চাতাল। সেইখানে দাঁড়িয়ে ভেতরদিকে তাকাই। দেখি জনচারেক মেয়েপুরুষ ভেতরে বসে আছেন। একপাশে এক উলঙ্গ সাধু। বন্ধুকে বলি, ভেতরে স্থানাভাব, তুমি গিয়ে দর্শন করে এসো, আমি বাইরে এখানে অপেক্ষা করছি—কোন ক্ষতি নেই।

বন্ধু একটু ইতস্তত করে ভেতরে প্রবেশ করেন। প্রণাম করে বসেন। সাধুটি আমায় দেখতে পান। মৃদু হেসে আমাকেও ডাকেন। হিন্দীতে বলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে চলে এসো, আর একজনের জায়গাও করে নেওয়া যাবে এখানে।

ভাবি, অযথা বাক্যব্যয় না করে বসাই ভালো। ঢুকে বসিও, কোন রকমে একটু স্থান করে।

সাধুটির চেহারা এবার ভালো করে দেখি।

বয়স বোধ করি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। তাম্রবর্ণ। তপঃক্লিষ্ট দেহ। তবে শীর্ণ নয়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। মনে হয়, যোগাভ্যাসে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। অঙ্গে ভস্মাবরণও নেই। নগ্নকান্তি। যৌবনশ্রী। টানা চোখ। টিকালো নাক। মুখে অল্প দাড়ি। চোখে-মুখে প্রশান্ত ভাব। অথচ বুদ্ধি-দীপ্ত। মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল যেন যুবক পরমহংসদেবের মত চেহারা। ঘরের ভেতর দেখি একধারে একটি ছোট্ট বেদী। তার উপর কয়েকটি দেব-দেবীর ছবি—শিব, দুর্গা, কালী, শ্রীকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও।

দর্শন-প্রার্থীদের সঙ্গে সাধু অবধূত স্মিতমুখে আলাপ করেন। সকলে নানান বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি শান্ত কণ্ঠে অল্প কথায় উত্তর দেন। আমার সঙ্গীটির সঙ্গেও কথা বলেন। বেশির ভাগ হিন্দীতে। কখনও বা ইংরাজিতে। বিশুদ্ধ ইংরাজি। সুস্পষ্ট শুদ্ধ উচ্চারণ।

আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, তুমি চুপ করে কেন? কোন জিজ্ঞাস্য থাকে প্রশ্ন করতে পার!

বলি, আপনাদের কথা শুনছি। আমার নিজের কোন প্রশ্ন নেই।

বন্ধুটি পরিচয় করিয়ে দেন। এখানে পরিচয়ের প্রয়োজন কিছুই নেই, তবুও।

হাইকোর্টের নাম শুনে অবধূত বলেন, এবার দুজন নতুন জজ হল না? তাঁদের নাম কি?

শুনে আশ্চর্য হই। সেদিনই সকালে এখানে পৌঁছে কলকাতা থেকে চিঠি পেয়েছি। বাড়ির খবর আছে, দেশের বিস্তারিত সংবাদও আছে। তাতেই জেনেছি যে নতুন দুজন জজ হয়েছেন—তাঁদের নামও উল্লেখ করা ছিল।

বলি, আজই খবরটা পেয়েছি। নামও উল্লেখ করি। শুনে তাঁদের একজনের পূর্ব পরিচয় দেন, বলেন, তিনি তো সার্ভিসে ছিলেন, অপরটি কে?

জিজ্ঞাসা করি, আপনি এ সব জানলেন কি করে?

উত্তর দেন না। হাসতে থাকেন।

আমি আমার বন্ধুটির পরিচয় করিয়ে দিই। বলি, আসানসোলে থাকেন। কয়লাখনির কালো রাজ্যে বাস হলেও চেহারাটি যেমন সুশ্রী, মনটিও তেমনি নির্মল। ভক্ত সজ্জন।

বন্ধু সলজ্জ ভাবে বলেন, ওর কথা শুনবেন না।

স্বামীজি মৃদু হাসেন। বলেন, কয়লার মধ্যেও রত্ন আছে। শুধু বিজ্ঞানের কথা নয়, এই চোখ দেখেছে। তখন এই শরীর ছিল বিলেতে। লন্ডনে এক সাহেবের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয়। ন্যায়নিষ্ঠ। ধার্মিক। সৎপথে থেকে দিনযাপন করেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। তাঁর হাতের রেখায় ছিল হঠাৎ ধনলাভ। তাঁকে সেকথা বললে বিশ্বাস করতেন না, হেসে উড়িয়ে দিতেন। বন্ধুরা তাঁকে উৎসাহ দিত, ডার্বিতে টিকিট কেনো—হাতের রেখায় রয়েছে যখন, পেয়ে যাবে নিশ্চয়।

তিনি বলেন, ওতে আমি বিশ্বাস করি না। ভাগ্যে যদি থাকেই, দেখা যাক—কিভাবে আসে! আমি আমার নিজের কাজ করে যাব।

ছোট্ট একটি কয়লার দোকান। বাইরের দিকে থাকেন। পিছনদিকে অন্ধকার ঘরে কয়লার বস্তা জমানো। নিজে ঘুরে ঘুরে পরিচিত মহলে বিক্রি করেন। একদিন হঠাৎ অসময়ে এসে হাজির, হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলেন, ভীষণ আশ্চর্য ব্যাপার! হাতের রেখা সত্যিই ফলেছে, কয়লার মধ্যে একটা সোনার চাঁই—স্বর্ণপিণ্ডক—নাগেট্!

সত্যিই তাই। আইনমত সেটা অবশ্য গভর্নমেন্টে জমা দেওয়া হল, কিন্তু তাঁরও অর্থাগম হয়েছিল। কয়লার মধ্যে সত্যি রত্নও পাওয়া যায়!

তাঁদের আলাপ-আলোচনা আবার ভগবদ্‌মুখী হয়। চুপ করে শুনি। তিনি আমাকে আলোচনার মধ্যে টানতে চান। আমি অনিচ্ছুক। আবার বলি, আমার প্রশ্ন কিছু নেই। তাই চুপ করে শুনছি।

হঠাৎ মনে জাগে, বিলেত-ফেরত শিক্ষিত পুরুষ, তবুও সর্বস্ব ত্যাগ করে, উলঙ্গ হয়ে এই কঠোর জীবন বরণ করলেন কেন? পেয়েছেনই বা কি? একবার আলাপ করে দেখলে হয়!

তাই বিনীতভাবে তাঁকে জানাই, যদি সত্যিই আলাপ করবার সুযোগ দিতে চান, তবে একলা আপনার সঙ্গে মিলতে চাই। কোন্ সময় আপনার অসুবিধে হবে না বলুন, তখন আসব। অবশ্য আপনার কোনরকম আপত্তি বা অসুবিধে থাকলে—এ প্রশ্ন ওঠে না, এবং আমিও আসতে চাই না।

তিনি হাসেন, বলেন, বেশ তো, একাই কথা হবে। কোন অসুবিধে নেই। আসতে পারবে—রাত ন'টার পর? তখন চারিদিক সব শান্ত থাকবে। কিন্তু শীত আছে মনে রেখো।

আমিও একা থাকি। নিকটেই আছি। অতএব আমারও কোন অসুবিধা নেই, জানাই।

সকলকে নামকীর্তন করতে বলেন। বন্ধু মুক্তকণ্ঠে মধুর সুর ধরেন—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...'

সকলে সমবেত কণ্ঠে যোগ দেন! একজন অস্ফুট স্বরে বলতে থাকেন দেখে অবধূত বলেন, দেবস্থানে দেবতার নামগান মুক্তকণ্ঠে নিতে লজ্জা কিসের? গলা ছাড়ো!

ছোট ঘর নামগানে ভরে ওঠে। তাকিয়ে দেখি, সবাই চোখ বুজে। অবধূতের ধীর স্থির নিস্পন্দ মূর্তি। বন্ধুর নিমীলিত নয়ন থেকে ধারা নেমেছে।

রাত ন'টার অনেক আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে তৈরি হয়ে আছি। ঠিক সময়মত অবধূতের কাছে যেতে হবে।

হঠাৎ মনে পড়ে আর এক সাধুর সঙ্গে আলাপের কথা। হিমালয়ে নয়। মাকে নিয়ে ব্রজপরিক্রমায় চলেছি। বৃন্দাবন থেকে যাত্রা শুরু হয়। চুরাশি ক্রোশের পরিক্রমা। প্রায় মাসখানেক লাগে। তিন-চার হাজার যাত্রী একসঙ্গে চলে। কেউ গরুরগাড়িতে, কেউ বা টাঙায়, অধিকাংশই পায়ে হেঁটে। দিনের পর দিন এইভাবে চলা। এক অভিনব আনন্দময় জীবন। চারিদিকে সবারই মুখে শ্রীরাধিকার নাম। রাত্রে চৌকিদারও পাহারা দিতে ঘোরে 'রাধে' 'রাধে' ডাক দিয়ে। নিত্য নতুন জায়গায় রাত কাটানো। সঙ্গে কারও তাঁবু থাকে, নইলে অনেকে গাছতলাতেই শয্যা পাতেন, পথে বড় গ্রাম পেলে ধর্মশালা বা পাকাঘরেও আশ্রয় মেলে। রাধা-কৃষ্ণের লীলা-কাহিনী ঘিরে এই তীর্থযাত্রা গড়ে উঠেছে। এই পথেরই এক অঞ্চলে এক বৈষ্ণব বাবাজীর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয়। তিনিই নিয়ে গেলেন এক বৈষ্ণব মহাত্মার দর্শন করাতে। শ্যামকুণ্ডের এক নিভৃত অন্তরালে পাঁচিল-ঘেরা ছোট্ট কুটিয়া। সঙ্গী বাবাজীর অনেক ডাকাডাকির পর দরজা খুলে গেল। এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব সুমুখে দাঁড়িয়ে। পরনে সামান্য এক টুকরা কাপড়। মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। রুক্ষ শুষ্ক মূর্তি। কিন্তু সুমিষ্ট হাসি। টানা চোখ দুটি ভরে প্রেমের অশ্রু টল্‌মল্ করছে। তাঁর চোখের দিকে চাইতেই হঠাৎ মনে এল—কুমারিকায় যে ঘরটিতে থাকতাম তারই একটি ছোট্ট জানালা দিয়ে ভারত-মহাসাগরের সুনীল বারিবাশির দৃশ্য দেখা যেত। এঁর চোখের পাতা দুটির মধ্যে দিয়েও মনে হয় এক শান্ত গভীর প্রেম সাগরের যেন সন্ধান দেয়। নত হয়ে পায়ের ধূলা নিই। তিনি দু'হাত বাড়িয়ে বুকে নিয়ে আলিঙ্গন করেন। মৌনী। একটা স্লেট্-পেনসিল নিয়ে প্রয়োজনমত লিখে প্রশ্ন করেন, উত্তর দেন। এইভাবেই আলাপ হয়। বিদায় নেবার আগে স্লেটে লিখে এগিয়ে দেন—নামঠিকানা দিয়ে যাও।

প্রশ্ন করি, তাতে প্রয়োজন কি?—তিনি মধুর হাসতে থাকেন। আমি লিখে দিই।

এর কয়েক বছর পরের কথা। হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে এক চিঠি পেলাম। 'প্রীত্যাস্পদ' বলে সম্বোধন করেছেন। লিখে জানিয়েছেন—বন-যাত্রার সময় শ্রীশ্রীনিবাসের সঙ্গে শ্যামকুণ্ডতীরে নিকুঞ্জ কুটিরে দীনজনকে দর্শন করে গিয়েছ। তোমার ঠিকানাটি লিখে রেখেছিলাম এই কারণে, ভবিষ্যতে যদ্যপি বিশেষ কোন সেবার দ্রব্যের এস্থানে অভাব প্রয়োজন ঘটে তা হলে পত্র দ্বারা জানাব। উপস্থিত ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সুখার্থে একটি সেবার দ্রব্যের প্রয়োজন বিধায় তোমাকে পত্র দিতে বাধ্য হলাম। যদ্যপি সেবা করতে পার তো পরমানন্দ লাভ করব। সেবাটি এই, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের করকমলের একটি উৎকৃষ্ট ১নং বংশী। বংশেরই হোক কিংবা কাষ্ঠনির্মিতই হোক—মোটা সাইজের গম্ভীর সুমিষ্ট স্বরযুক্ত ও ধ্বনি সুদূরবর্তী চলে।—চিঠিতে তারপর বাঁশীটির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া, কি ভাবে পাঠাতে হবে তারও নির্দেশ লেখা। শেষে লিখেছেন, 'সময় সময় রসময়ের বংশীগান করতে প্রাণে বড়ই সাধ হয়, কিন্তু উত্তম স্বরযুক্ত বংশী এস্থানে মেলা দুর্ঘট, তন্নিমিত্তই তোমাকে শ্রীশ্রীনিবাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকায় প্রীতি সম্বন্ধে জানালাম।'

চিঠিখানি পেয়ে আনন্দ পেয়েছিলাম। সেইদিনই কলকাতার এক প্রসিদ্ধ বাজনার দোকানে গিয়ে চিঠির বর্ণনামত বাঁশীর সন্ধান করলাম, পাঠাবারও আয়োজন করে এলাম। কিন্তু তারপরই তাঁর এক চিঠি এল—তাতে জানিয়েছেন, বাঁশীটি ক্ল্যারিওনেট্ হলেই ভালো।

দোকানদারের কাছে আবার তখনই যাই। তাঁরা হেসে বলেন, ক্ল্যারিওনেট্ কি যে সে লোক বাজাতে পারে,—ওর রীতিমত শিক্ষা থাকা দরকার, স্বর বার করাও শক্ত।

বলি, এক কাজ করুন। একটা ক্ল্যারিওনেট্ই পাঠান, সেই সঙ্গে একটা ভালো বাঁশের বাঁশীও দিন।

সেই মত পাঠানোও হয়। চিঠিতে দোকানদারের কথাগুলি উল্লেখ করে লিখি, ক্ল্যারিওনেট্টি যদি বাজাতে না পারেন আপনার বংশীধারীর কাছেই শিখে নিয়ে তাঁকে শোনাবেন।

বাঁশীগুলি পেয়ে উল্লাসভরে তিনি আনন্দ জানান। চিঠির মধ্যেও যেন তাঁর বাঁশীর সুর ভেসে আসে। চিঠিতে তাঁর আশ্রমের নামটিও বড় মধুর ছিল—'ঘন মাধবের ঘেরা।'

সেই একদিনের অল্প পরিচয়। তবুও গভীর প্রেমে ভরা, মনের নিকষে স্বর্ণরেখা রেখে গেছে, স্মৃতির আলোকে কারণে-অকারণে ঝিকমিক করে।

॥ ১০ ॥

রাত ন'টা বাজে। টর্চ হাতে বার হই। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে কোটের উপরই গরম চাদর জড়াই, মাথা কান চাপা দিই। নিঝুম বদরীপুরী। জনহীন পথ। গতিহীন, শব্দহীন। শুধু অলকানন্দার নৃত্যকলরোল। অনন্ত কল্লোল।

অবধূতের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াই। দরজার মধ্য দিয়ে একফালি আলো বাইরে এসে পড়েছে। বাইরে থেকে দেখি, অবধূত একপাশে বসে আছেন। সামনে দাঁড়িয়ে দুটি যুবক। বেশভূষায় বাঙালী বুঝতে পারি। একজনের হাতে রুটি, অবধূতকে খাইয়ে দিচ্ছে। তিনি চুপ করে বসে আহার করছেন। খাওয়া শেষ হল। অপর ছেলেটির হাতে ঘটি। দেখি, জল খাইয়ে দিল। একটা তোয়ালে দিয়ে মুখও মুছিয়ে দিল। অতি যত্নভরে খাওয়ানো, মোছানো। যেন মায়ের হাতে ছোট ছেলে খাচ্ছে। তারপর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে ছেলে দুটি বার হয়ে গেল। এখন তিনি একা। হেঁট হয়ে দরজা দিয়ে আমি প্রবেশ করি। ঘরের চারিধারে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিই। একপাশে ছোট লম্বা একটা বেদীর মত। পাথরের উপরে কিছু শুকনো ঘাস বিছানো। একজন মানুষ কোনরকমে শুতে পারে। তারই উপর তিনি পা মুড়ে বসে আছেন। একপাশে কাগজপত্রের বাণ্ডিল। লেখাপড়ার সরঞ্জাম। দু'তিনখানা বইও আছে মনে হল। ঘরের মাঝখানে ছোট অগ্নিকুণ্ড। একটা বড় কাঠ—আধপোড়া পড়ে আছে, আগুন নেই। আর এক দিকে সেই দেব-দেবীর ছবিগুলি।

আমাকে দেখে অবধূত মৃদু হাসেন। কাছে ডাকেন। বেদীর উপর তাঁর পাশে বসতে বলেন। বসিও তাই।

হিমালয়ের নিঃশব্দ নিভৃত রাত্রি। ক্ষুদ্র প্রদীপের স্তিমিত আলোক। পাশেই এক নগ্ন সন্ন্যাসী। মনে

অস্বাভাবিক ভাব আসাই স্বাভাবিক। তবুও সাধারণ ভাবেই সব কিছু নেবার চেষ্টা করি। সহজভাবে তাঁকে বাংলায় সম্বোধন করি। বলি, দেখুন, প্রথমেই দুটো কথা আপনাকে বলে রাখি। আমি বাংলাতে কথা বলব। হিন্দী আমার আসে না, যেটুকু বলার চেষ্টা করি—বাধ্য হয়েই বলতে হয়, ভুলও হয় প্রচুর। ইংরাজীতে তার চেয়ে কথা বলা সহজ, কিন্তু ইংরাজী বলার দরকার দেখি না। অবশ্য আমাদের বাংলায় কথা বলা মানে—ইংরাজী বাংলা মেশানো। নিজের ভাষায় কথা বলাটা সহজ হবে। আপনি অবশ্য যাতে ভালো মনে করেন তাতেই বলবেন।—বলে তাঁর দিকে তাকাই। তিনি হিন্দীতে বলেন, বেশ তো, বাংলাতেই বলো। তাতে বোঝার কোন অসুবিধে হবে না।

বিজ্ঞের মত বলি, তা আমি জানি।

তখনও সেই বন্ধুর দেওয়া খবর অনুযায়ী আমার ধারণা, তিনি বাঙালী। কিন্তু তিনি সেদিন অথবা তার পরে কখনও বাংলায় কথা বলেন নি। হিন্দী বা ইংরাজীতে বলতেন। আমি বাংলাতেই অনেক সময় বলতাম—তিনি পরিষ্কার বুঝতেন দেখতাম। পরে শুনেছিলাম, তিনি সম্ভবত বাঙালী নন, দক্ষিণ দেশীয়।

অবধূত বলেন, দ্বিতীয় কথাটি কি?

উত্তর দিই, আপনার সঙ্গে যথোচিত আচার-ব্যবহারের কথা। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে, সুযোগ পেলেও, বেশি মিশি না। ভাবি, তাঁরা তাঁদের কাজ নিয়ে আছেন, বিরক্ত করার দরকার কি? তাঁদের সঙ্গে ঠিক কিভাবে আচরণ করা উচিত, কেমন ভাবে কথা বলার রীতি—আমার জানা নেই। আপনার সঙ্গে তাই অতি সহজ সাধারণভাবে কথা বলব, কোন কিছু বাধা বা সঙ্কোচ না রেখে। নিশ্চয় জানবেন তার মধ্যে এতটুকু অশ্রদ্ধা বা অসম্মানের উদ্দেশ্য নেই। এ-ভাবে আলাপ করায় যদি আপনার আপত্তি থাকে বা অসঙ্গত মনে হয়, তবে মৌখিক পরিচয় করেই চলে যাব—তাতেও নিশ্চয় জানবেন আমার কোন দুঃখ থাকবে না।

দেখি, তিনি হাসছেন। নির্মল হাসি। আমার ডান হাতটা ধরে কর-রেখাগুলি দেখেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন। আমার মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার কথা। প্রশ্নোত্তর করে শিক্ষকের হাতে দিলে তিনি খাতার উপর চোখ বুলিয়ে এমনি ভাবেই তাকাতেন; মনে হত—বিদ্যের দৌড় ধরে ফেলেছেন।

অবধূত বলেন, ঠিক আছে। নিশ্চিন্ত মনে আলাপ করবে, নিঃসঙ্কোচে কথা বলবে—কোন বাধা নেই। অনেক ঘুরেছ, নয়? এখনও ঘোরা আছে।

বলি, হাতের রেখায় লেখা আছে দেখলেন?

তিনি বলেন, প্রশ্ন থাকে করতে পার।

আমি বলি, ওতে আমার কৌতূহল নেই। নিজের জীবনের অতীত ঘটনা জানা আছে, ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহ নেই। যা ঘটবার ঘটবে, নিজে সব কিছুর সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারলেই হল। গণনার ভুল হলে মিথ্যা আশা বা আশঙ্কায় মনকে অযথা উদ্বিগ্ন করার সার্থকতা দেখি না। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করি, আপনার হাত দুটি তো দেখছি, বেশ কর্মদক্ষ আছে,—তবে ঐ ছেলে দুটি এসে খাইয়ে দিয়ে গেল কেন? আপনি নির্জীব হয়ে ছিলেন দেখলাম।

তিনি বলেন, ওঃ, এই কথা! ওটা একটা সামান্য ব্যাপার। ভগবানই এ-শরীরের জন্যে আহার জুটিয়ে দেন। তিনি দিলে ও খায়, না দিলে ও পায় না। বলতে পার—অজগর-বৃত্তি।

অতি-সহজ কণ্ঠে কথাগুলি বলেন।

মনে পড়ে, মহাভারতে শান্তিপর্বের কথা। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে ইচ্ছামৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির আদি উপস্থিত হয়েছেন। যুধিষ্ঠির ধর্ম সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন করছেন। পিতামহ উপদেশ দিচ্ছেন, বহু উপাখ্যান শোনাচ্ছেন। তার মধ্যে মোক্ষধর্ম পর্ব অধ্যায়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন অজগর ব্রতের কাহিনী। ব্রতচারী এক ব্রাহ্মণ। নির্লোভ, শুদ্ধস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, দয়ালু, মেধাবী, প্রাজ্ঞ। তবুও শিশুর মত দিনযাপন করেন। লাভালাভে তুষ্ট বা দুঃখিত হন না। ধর্ম, অর্থ, কামে সম্পূর্ণ উদাসীন। বলেন যদি লোকে দেয়, তবে খাই, না পেলে অভুক্ত থাকি। অজগর সর্প যেমন দৈবক্রমে লব্ধ খাদ্যে তুষ্ট থাকে, আমিও সেই মত যদৃচ্ছাগত বিষয়েই সন্তুষ্ট থাকি। শয়ন ভোজনের নিয়ম নেই। দৈহিক সুখ অনিত্য। এই উপলব্ধি করে পবিত্র ভাবে আত্মনিষ্ঠ হয়ে অজগর ব্রত পালন করছি।

ভাবি, শুনতে তো ভালই লাগে, কিন্তু এভাবে থাকা কি সম্ভব? প্রশ্ন করি। অবধূতের উত্তরে যা জানি তা এই :

নিজের আহার্যের জন্যে তিনি নিজে কোন প্রয়াস করেন না। কয়েক বছর এমনই চলছে। কেউ খাবার নিয়ে এসে বা তৈরি করে খাইয়ে দিয়ে গেলে খান, নয়ত অভুক্ত থাকেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে একটি দল এখানে গড়ে উঠেছে। স্থানীয় কয়েকজন তাতে আছেন, কয়েকটি সাধুও আছেন। এ ব্যাপারটি আমি নিজে পরে লক্ষ্য করি। কেননা এই বিপক্ষ দলের দু-একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তাঁদের কারও কারও মতে অবধূতের এই নগ্ন বেশে শহরের মধ্যে, মন্দিরের এত কাছে বাস করা শোভন নয়। তাঁরা বলেন, 'বাইরে গুম্ফায় থাকলেই তো পারেন,---যদি তিনি উলঙ্গই থাকতে চান!' অবধূত কিন্তু মন্দিরের সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে অসম্মত,—যদিও তিনি কিছুকাল থেকে মন্দিরের ভেতর যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। অঙ্গে কোন আবরণ দেওয়ার প্রশ্ন তাঁর কাছে ওঠে না,—কেননা তাঁর সন্ন্যাস-জীবনের সংস্কারে বাধে। অবধূত বা পরমহংস যিনি, তিনি সমদর্শী। সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন। তাই বিধি-সংযমের অতীত অবস্থায় চলে যান।—তবুও ইনি সাধারণত পা দুটি মুড়ে যে আসন করে বসে থাকতেন তাতে দর্শকের লজ্জা পাবার বা আপত্তি করার কোন কারণ থাকত না। অথচ এই নিয়ে বিপক্ষ দল তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে, সাধু-সন্দর্শনপ্রার্থী যাত্রীদের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকে। ফলে যদিও এক সময়ে অবধূতের দর্শন পেতে বহু যাত্রী যেতেন—এখন তাঁরা কমই যান। কখনও কোন যাত্রী না এলে তিনি অভুক্ত থাকেন।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, এমন ভাবে পাঁচ-সাত দিনও যায় তো?

তিনি হেসে বলেন, পাঁচ-সাত দিন কেন, দু'তিন সপ্তাহও কখনও চলে গেছে; এই তো এইবার প্রায় সপ্তাহ দুই পরে এই ছেলে দুটি হঠাৎ একদিন এল। তার পরদিনই এদের দেশে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু যায় নি। সপ্তাহখানেকের ওপর হল থেকে গেছে। এই বাড়িরই ওপরে একটা ঘরে থাকে। রোজ আসে। এই শরীরকে ভোজন দিয়ে চলে যায়। এরা যখন থাকবে না, আর অন্য কেউ যদি না আসে, এ-শরীরও আহার পাবে না। তাতে ক্ষতি নেই। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে।—বলে ঊর্ধ্বপানে তাকান। নির্বিকার ভাবে কথাগুলি বলা। কারও উপর কোন আক্রোশ নেই, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগও নেই। শরীরের এত বড় প্রয়োজনটাও যেন তাঁর কাছে নিঃশেষ হয়ে গেছে। অথচ দুই মুঠা উদরান্নের জন্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পৃথিবীময় কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা! সভ্যতার প্রগতির যুগেও—বিজ্ঞানের এত প্রসারেও—এ সমস্যার এখনও সমাধান হয় নি। ভাবি, ক্ষুধা কি এমন ভাবে জয় করা যায়?—প্রশ্নও করি।

উত্তরে অবধূত শারীরতত্ত্বের নানারূপ কথা বলেন। শরীর ধারণের পক্ষে খাদ্যের একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকদের কি মত, তাও জানান। বলেন, বিজ্ঞানে বলে, মানুষ কোন খাদ্য না খেয়েও দু'মাসেরও বেশি বেঁচে থাকতে পারে। শরীর-রক্ষার দিক থেকে খাদ্যের চেয়েও দেহের প্রয়োজন হল জল। জল না পেলে মানুষের এক সপ্তাহ বা দশদিনের বেশি প্রাণ থাকে না। অথচ জলের অভাবে তখনও সে তৃষ্ণায় মরে না। যদিও কথায় বলে, 'তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মারা যাচ্ছি'—তখন মৃত্যু ঘটে নিরুদনে—dehydration-এ, এ তো বিজ্ঞানের কথা। তার উপরও যোগাভ্যাসের ব্যাপার আছে। যোগসাধনায় মানুষের অনেক সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে, নতুন শক্তিও সে লাভ করে। শরীর বা জীবন-ধারণের জন্যে সাধারণ মানুষের পক্ষে যে-সব বস্তু একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়—কিংবা মানুষের মধ্যে যে-সকল আদিম বৃত্তিও থাকে—যোগবলে সেগুলি শুধু দমন করাই সম্ভব তা নয়, সেই সব শক্তি ভগবদ্‌মুখী করে আত্মসিদ্ধির পথে প্রয়োগ করতে হয়—তার প্রভূত ফলও পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে সুপ্ত ঐশী শক্তি জাগ্রত করে নিতে পারলেই সব কিছু সম্ভবপর হয়। সাধারণ মানুষ তখন তার সামান্য বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়, ভাবে—এ-সব অস্বাভাবিক কিছু। সে বোঝে না যে ভগবদ্-দত্ত প্রকৃত স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে সে-ই বরং অস্বাভাবিক হয়ে গেছে—তাই যা তার অন্তর্নিহিত অতি স্বাভাবিক শক্তি তাকে অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ভেবে বিস্মিত হচ্ছে।

এইভাবে অবধূত বলে যান। চুপ করে শুনি। কিছু বুঝি, অনেক কিছুই বুঝি না। কিন্তু বেশ বুঝি, তাঁর জীবনে এ শুধু তত্ত্ব-কথাই নয়।

এই দীর্ঘ-অভুক্ত থাকার সম্বন্ধে এর অনেকদিন পরে সংবাদপত্রে একটি খবর পড়ি।

সে এক মর্মান্তিক আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ। দারুণ বর্ষার সময়। আসানসোল অঞ্চলে এক কয়লার খনিতে হঠাৎ প্রবল বন্যার এক বিপুল ধারা প্রবেশ করে। প্রায় জন-চল্লিশ কর্মীর খনির গহ্বরে সলিল-সমাধি ঘটে। মাটি থেকে প্রায় ৪৫০ ফুট নীচে। এতগুলি প্রাণহানির আশঙ্কা চারিদিকে গভীর শোকের ছায়া ফেলে। জলনিকাশের ব্যবস্থা চলে। দিনের পর দিন জল তোলা হয়। কুড়িদিন পরে এগারোটি জীবন্ত মানুষ সেই খনির গহ্বর থেকে উদ্ধার পেল। মৃত্যুর দুয়ারে আঘাত করে প্রাণবন্ত মানুষ অপ্রত্যাশিতভাবে আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে। দীর্ঘদিন উপবাসী। বুভুক্ষু। তবুও সজীব! প্রশ্ন ওঠে, কুড়িদিন শুধু জল খেয়ে ছিল কি করে? সন্ন্যাসী নয়—যোগী নয়—তবুও অনায়াসে মানুষ এতদিন বাঁচে কি করে? শুধু তাই নয়, প্রায় দীর্ঘ তিন সপ্তাহ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কাটিয়ে এসে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, কুড়িদিন কোথায়? মাত্র চার-পাঁচ দিন তো আমরা আটকে ছিলাম!

মানুষের অন্তর্নিহিত অপরিমিত শক্তির পরিচয় দেয়। অজানা তার সীমা।

অবধূতের সঙ্গে আলাপ করি। নানান বিষয়ে কথা ওঠে। আলাপনের মধ্যে তাঁর পূর্বাশ্রমের কিছু আভাস পাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন। ডিগ্রী ছিল। বিলাতেও শিক্ষাপ্রাপ্ত। আইন সম্পর্কে জ্ঞান আছে। সমাজে বিধিনিয়মের প্রয়োজনীয়তা, আইনের কল্যাণকর রূপের বর্ণনা দেন। সে বিষয়ে আলোচনা বেশি অগ্রসর হতে দিই না। বলি, ও-সম্বন্ধে শুধু বইয়ের পড়া বিদ্যা নয়, ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তারই ভিত্তিতে নিজের মতামতও গড়ে উঠেছে। আইন-আদালত নিয়ে দিন কাটে। ওর মধ্যে আধ্যাত্মিক বা গভীর কোন কিছু তত্ত্ব নেই। স্থূল জগতে বা সমাজে শুধু ওর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাই আছে। তাই হিমালয়ে এসে ও বিষয়ে আলোচনা অচল।—মন্তব্য শুনে তিনি হাসেন।

বিজ্ঞান বিষয়েও তিনি জানেন দেখি। সে-জগতেও কোথায় কি নতুন আবিষ্কার হয়েছে, কোন্ দেশে কোন্ বৈজ্ঞানিক এখন কি নিয়ে গভীর গবেষণা করছেন—এ সবের শুধু খবরই রাখেন না, বিশদভাবে বোঝেন ও আলোচনা করতেও প্রস্তুত। কিন্তু আবার এ কথাও বলেন, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের জ্ঞানের সীমা বহুদূর বিস্তারলাভ করেছে ঠিকই, তবুও স্থূল জগতের জ্ঞানের বাইরে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মলোকের বহু তত্ত্ব ও তথ্য শেখবার আছে। আধুনিক বিজ্ঞান শক্তিশালী হলেও তার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে যেখানে যেতে পারে না, সত্যকার সাধকদের যোগশক্তি অবলীলায় সেখানে পৌঁছুতে পারে।

সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধেও কথা বলেন। নতুন ভালো বই কোথায় কি প্রকাশিত হল তারও খবর কিছু জানেন, দেখি। বলেন, সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা—এ সবই তো সত্য-সুন্দরের সাধনা। ভগবদ্-আরাধনার আর এক রূপ।

পাশ্চাত্ত্য ভাষা, শুধু ইংরাজী নয়, অন্য কয়েকটিও জানা আছে, তার প্রমাণ পাই।

কলকাতায় অনেকদিন ছিলেন। আমার পিতৃদেবের নামের সঙ্গে পরিচিত। বলেন, বিরাট পুরুষ ছিলেন। দেশের কত বড় কাজ করে গিয়েছিলেন তিনি, আজকালকার লোক তার বিশেষ খবর রাখে না। এ-শরীর তাঁকে দেখে নি, তখন ছোট ছিল। তোমার দাদার খবর এ রাখে।

আরও অনেকের নাম করেন। তাঁদের কয়েকজনকে চিনি। দু-একজনের নাম করে বলেন, এঁরা এ-শরীরের পূর্ব পরিচয় জানেন, এখনও মাঝে মাঝে খবর করেন।

ভাবি, বাড়ি ফিরে তাঁদের কাছ থেকে এঁর সঠিক পরিচয় নেব। নেবার সুযোগও পাই। তবুও নেওয়া হয় না। মনে হয়, নিরর্থক এই কৌতূহল। যে মানুষ সব কিছু মুছে ফেলে একান্তে নির্জন-বাস করছেন, যাঁর পূর্বাশ্রমের জীবন এখন বিস্মৃত অতীত মাত্র, কি প্রয়োজন আছে সেই বিগতকালের কুক্ষিগত শবদেহখানি তুলে ব্যবচ্ছেদ করার?

এখন নৈর্ব্যক্তিক তাঁর দেহ। তাই দেখি, প্রকৃত সাধুরা নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করতে কখনও 'আমি' বলেন না। 'এই শরীর' বলেই উল্লেখ করেন। দেহস্থ 'আমি' পরমাত্মায় লীন হয়েছে, পূর্বের 'আমি' এখন পঞ্চভূতময় শরীর মাত্র।

তাই যখন রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধেও মতামত প্রকাশ করেন ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেন এবং

স্বাধীনতার পর দেশের কর্তৃপক্ষের কার্যবিধি সম্বন্ধেও সংবাদ রাখেন দেখি, তখন আশ্চর্য বোধ করি। ভাবি, ঈশ্বরেই যদি এখন স্থিতি এবং নশ্বর যদি জগৎ, তবে সে-জগতের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন কি?

তাই জিজ্ঞাসা করি, এত খবর রাখেন কি করে এবং কেনই বা?

হেসে বলেন, সব কিছু এখানে বসেই পাওয়া যায়। যা অতীত সে তো জানা থাকে, যা ঘটছে তাও চোখের ওপর ভাসে, ভবিষ্যতের ছবিও ফুটে ওঠে। তা ছাড়া চিঠিপত্র আসে খবরাখবর নিয়ে। দেশবিদেশ থেকে উপদেশ চায়। এই তো এই সপ্তাহেই চিঠি এসেছে জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে। দিল্লী থেকেও দেশ-নেতাদের মাঝে মাঝে চিঠি আসে।

চিঠিগুলি দেখাতে যান, আমার ভালো লাগে না, বলি, চিঠি দেখার কৌতূহল আমার নেই। কিন্তু আশ্চর্য লাগে আপনার কথাগুলি শুনে। অত জায়গা থেকে এত চিঠি! এতে আপনার শান্ত নিভৃত-বাসে বিঘ্ন ঘটানোর কথা, সন্ন্যাস-জীবনের এগুলি অন্তরায় বলেই তো আমাদের মনে হয়।

তারপরে হেসে বলি, এক কাজ করুন—এখানে না থেকে কলকাতা বা দিল্লীতে সেন্টার খুলুন। লোকজনের অনেক সুবিধা হবে। আর সেখানে যদি মন্তর দিতে শুরু করেন তো দেখবেন শিষ্য-ভক্তের অভাব হবে না—বড় বড় মোটর হাঁকিয়ে সব আসতে আরম্ভ করবেন।

তিনি হেসে ফেলেন। প্রাণখোলা হাসি।

বলেন, সন্ন্যাস-জীবনের এটা একটা বিঘ্ন বই কি, তবে সেটা খুব বড় কিছু নয়। আর লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ? যদি সন্ন্যাস-জীবনে কোন শক্তি বা জ্ঞানের সঞ্চয় হয়েই থাকে, জগতের হিত-কাজে সেটা লাগানো—সে তো কর্তব্য, তারই কাজ। এতে ধর্ম-জীবনের ব্যাঘাত হবার কোনও আশঙ্কা নেই। তবে এ-কথাও ঠিক—লোকপ্রতিষ্ঠার মোহ সাধুদের জীবনেও একটা বড় অন্তরায়। অনেকেরই এতে পতন হয়। একে বলে রুদ্রগ্রন্থি,—লোকৈষণা—এ ছেদ করা খুবই কঠিন।

নির্বাক হয়ে শুনি। জ্ঞানের দম্ভ নয়, শক্তির প্রচার নয়—নিজের সুস্পষ্ট অভিমত স্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্ত করা। বলেন, কত লোক কত কি চাইতে আসে। ভাবে, বুঝি এখানে বসেই সব কিছু পাওয়া যায়, দেওয়া যায়। নিজের ভেতরের শক্তির সন্ধান রাখে না। ধর্ম-কথা,—তার শেষ নেই! পুরানো চিরকালের কথা—শাশ্বত সত্য—সব ধর্মেরই যে-সব মূল তত্ত্ব—আবার নতুন করে বার বার বলা—তাই শোনে। বিদেশী অভিযাত্রীদলেরও অনেকে আসেন এই শরীরের সঙ্গে আলাপ করতে। তাঁদের মধ্যেও দু-একজন আধ্যাত্মিক জগতের অনুসন্ধিৎসু থাকেন। হিমালয়ের হিমশিখরে উঠে তাঁরাও বিচিত্র অনুভূতির কিছু অভিজ্ঞতা পেয়ে যান। কিন্তু তাঁরা সন্ধান জানেন না, এইসব অভিযান যোগবলের সাহায্যে কত সহজ হতে পারে। সাজ-সজ্জার বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন হয় না, বহু অর্থব্যয়েরও প্রশ্ন ওঠে না।

এই সম্পর্কে যোগবলের অনন্ত মহিমার অনেক কথাই শুনি। বলেন, সাধারণ মানুষের ধারণা, যৌগিক ক্রিয়ায় শরীরকে কষ্ট দেওয়া হয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল। ঠিকভাবে যোগ অভ্যাস করলে দেহের ও মনের সমূহ শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়। যোগী মানুষ অতি সহজে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সঙ্গে নিজেকে প্রয়োজনমত মানিয়ে নিতে পারে। এমন সব আসন আছে যার সাহায্য নিলে বরফের ওপর অত শীতেও হাত পা শরীর কখনও আড়ষ্ট হয় না। প্রাণায়ামে শরীরের উত্তাপও ঠিক থাকে না। এসব যে-সাধুরা জানেন তাঁদের কাছে শীতের রাজ্যেও আগুনের অভাব বোধ হয় না, শরীর গরম করবার জন্যে উত্তেজক পানীয় বা অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না।

এইভাবে অবধূত কত রকম আসনের নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ করেন।

হঠাৎ বাইরে মানুষের পায়ের শব্দ শুনি। দরজার কাছে একজন পাহাড়ী এসে দাঁড়ায়। অবধূত তাকে ভেতরে ডাকেন। প্রণাম করে সে বসে। বিষণ্ণ চিন্তিত মুখ। কথার মধ্যে বুঝতে পারি, কার অসুখের ওষুধ নিতে এসেছে। অবধূত পাশ থেকে একটি কৌটা বার করেন, দুটা সাদা পিল বার করে দেন। সে ভক্তি-ভরে অঞ্জলি পেতে নেয়। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। দেখি, এরই মধ্যে তার মুখ থেকে উৎকণ্ঠার ছায়া সরে গেছে, বুক-ভরা আশা ও বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে ফিরে চলে।

অবধূত আমার দিকে তাকান, বলেন, আধুনিক সাল্‌ফা-ড্রাগ-এর এই ওষুধগুলি খুব উপকার

দেয়—তবে কড়া ওষুধ। এ-সব কাছে রাখতে হয়; মানুষের কাজে লাগে। এর অসুখও এতেই সারবে। পাহাড়ের গাছ-গাছড়া-শিকড়ও কিছু জানা আছে—তাতেও খুব ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এদের যাই দেওয়া যাক না কেন তাতেই ভাবে, নিশ্চয় রোগ সারবে।

আমি জানাই, আমার কাছেও কিছু ওষুধপত্র আছে। ফেরার সময় দিয়ে যাব। কাজে লাগবে।

বলেন, ভালোই তো।

দেখি, সেই যোগ-ক্লিষ্ট বিবস্ত্র সন্ন্যাসী-দেহের অন্তরালে এক কল্যাণকামী দরদী হৃদয়। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রয়োজনমত সাহায্য নিতে মনের কোন সংকীর্ণতা নেই।

যে কয়দিন বদরীনাথে থাকি, তাঁর কাছে আসতে বলেন। যাই। গল্প করি। চলে আসি।

একদিন সন্ধ্যার পর গিয়েছি, দেখি ঘরে নেই। বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ নজরে পড়ে, একটু নীচে অলকানন্দার বরফ-গলা-জলে স্নান সেরে উঠছেন। সুমুখে এসে দাঁড়ান। সম্পূর্ণ নগ্নদেহ। দেখে মনে জাগে যেন একটি ছোট্ট ছেলে স্নান সেরে উলঙ্গ এসে দাঁড়িয়েছে। সারা অঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে। অথচ শীতের অনুভূতির কোন লক্ষণ নেই। মুখে তৃপ্তির সরল হাসি। একজন ভক্ত এসে কাপড় দিয়ে জল মুছিয়ে দেয়। শিশুর মতই আরও হাসতে থাকেন। না মোছালে দেহের জল নিশ্চয় দেহেই শুকাতো।

অথচ ঘরের পাশেই প্রসিদ্ধ তপ্তকুণ্ড।

কলকাতায় ফিরে আসি। বিজয়ার পর ডাক-যোগে খামে-ভরা প্রসাদী ফুল ও সিন্দূর পাই। তার কয়েকদিন পরে তাঁর একখানা চিঠি পেলাম। শীতের সময়ও তিনি বদরীনাথে কাটাবেন। এটা তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়। ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি এইভাবে সেখানে থেকে আসছেন। বদরীনাথের বহু উপরে শতোপন্থ ও স্বর্গারোহণীতে তিনি চৌদ্দবার গেছেন এবং একবার চার মাস বরফের মধ্যে সেখানে ছিলেন। তাই শীতের সময় বদরীনাথে তাঁর এবারও থাকার উদ্দেশ্য শুনে আশ্চর্য হই না। কিন্তু তিনি জানান, ইতিমধ্যে কতকগুলি বাধার সৃষ্টি হয়েছিল।

শীতকালে বদরীনাথে থাকার সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ মত আছে। সাধারণ বিশ্বাস, বছরের শুধু ছয় মাসকাল নারায়ণ বদরীপুরীতে মানুষের পূজা নেন, বাকি ছয় মাস—অর্থাৎ শীতকালে যখন চারিদিক বরফে ছেয়ে ফেলে—তখন সেখানে শুধু দেবতাদেরই নারায়ণের পূজার অধিকার। মন্দিরের ভোগমূর্তিটি নিয়ে পূজারী কার্তিক মাসে দীপাবলির পর যোশীমঠে নেমে আসেন—সেইখানেই তাঁর পূজার্চনা হয় বৈশাখ মাস পর্যন্ত।

অবধূতের শীত-বাসের সঙ্কল্পে সে বছর আপত্তিটা একটু ঘোরতর ভাবেই ওঠে। সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়েও মতভেদ আছে।

অবধূত তাঁর সঙ্কল্পের কথা চিঠিতে জানান। একদল লোকের বিরুদ্ধাচরণের বিষয়ও উল্লেখ করেন। লেখেন, তারা আদালতের সাহায্য নিয়ে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভগবানে উৎসর্গীকৃত এই শরীর এখানেই থাকবে, সব বাধা তিনিই সরিয়ে দিয়েছেন। কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিসের কথাও লেখেন। প্রয়োজন তাঁর নিজের জন্যে নয়, এক ব্রহ্মচারী তাঁর সঙ্গে থাকবেন, তাঁর জন্যে। তাও এমন বিশেষ কিছু নয়, বৃষ্টি ও বরফের মধ্যে বাইরে যাবার সময় ব্যবহার-উপযোগী জুতা ও টুপি সমেত একটি বর্ষাতি। নিজের কথাও চিঠির শেষে একটু উল্লেখ করেন—সঙ্কুচিত ভাষায়,—যদি সহজে কখনও কোথাও পাওয়া যায়—একটি শিরসুদ্ধ পূর্ণ বাঘ-ছাল—চিতা নয়, রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

রেজেস্ট্রি ডাকে জিনিসগুলি গিয়েছিল, শুধু ব্যাঘ্র-চর্মের ব্যবস্থা সম্ভব হয় নি। তাঁর প্রাপ্তিস্বীকারও পেলাম। তখন ডিসেম্বরের শেষ। ইংরাজি নতুন বছরের শুভ কামনা জানিয়েছেন ইংরাজি কবিতা লিখে :

Forget not the march to Time,
    Forlorn in the lure of clime :
Friend or foe to thee thou art;
    Dive within and search thy heart :
Who else is there but for you
    Head and tail are both untrue,

Fear not the flames of filthy senses
Fret not at the fancy glimpses.
Kill the ego, the mundane merit
Fill thyself with Divine Spirit.

তারপর লিখেছেন :

Years that have rolled on have given you an opportunity to study good and evil, to witness the pros and cons of events, major and minor, to experience pleasure and pain arising out of activities chosen purely by you through your ego, either selfishly as a man of all potence or selflessly embracing Universal Brotherhood. These locate you today, this very moment, decisively over a fulcrum leaving it all for you to sensitively balance the heavily weighing past by carefully adjusting your furture. A new day is dawning fast as 1953. Let you smoothly sail towards the goal of life overcoming the surges of emotions. May you thereby enjoy peace, plenty and prosperity herein and Happiness and Bliss anon. May the Lord bless you! OM.

১৩৫৩ সাল। সে বছরেও বদরীনাথে পৌঁছে তাঁর খোঁজ নিই। দেখি অন্য আর একটি ঘরে আছেন। হঠাৎ দেখা হওয়ায় খুশী হন। আবার ক'দিন আলাপ-আলোচনায় কাটে। সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী আছেন। খাওয়ানোর আয়োজন তিনিই করেন দেখি। অবধূতের চেহারায় কিছু পরিবর্তন লক্ষ করি। মস্তক মুণ্ডন করেছেন,—কেশদামের সঙ্গে যৌবনকান্তি গেছে। কিন্তু মুখের সেই মিষ্ট হাসি আরও মধুর হয়েছে। কথাবার্তার ফাঁকে আভাস পাই—কয়েকটি লোকের বিরুদ্ধ আচরণ দিন দিন রূঢ় হয়ে উঠছে। মৃদু হেসে বলেন, ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী সব হবে, এই শরীর শুধু তাঁরই কাজ করে যাবে।

সেই বছরে কলকাতায় ফেরার কয়েকদিনের মধ্যেই মেজদাদার আকস্মিক দেহাবসান হয়। সুদূর কাশ্মীরে। স্বাধীন ভারতের ভূস্বর্গ—মৃত্যুর করালছায়া নৃশংস নারকীয় রূপে দেখা দেয়। অকস্মাৎ এই অশনিপাতে ভারতবাসী বিমূঢ় বিক্ষুব্ধ হয়। দেশের বহু স্থান থেকে বহু লোকের শোকতপ্ত সান্ত্বনাবাণী আসে। হিমালয়ের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও চিঠি লেখেন : ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদ মর্মন্তুদ। অতি পুণ্য দিবসে তিরোধান করায় নিজের দিক থেকে তিনি সর্বোচ্চ লোক প্রাপ্ত হয়েছেন। তবুও সমগ্র জাতির—বিশেষত সনাতনী হিন্দুদের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাব অপূরণীয় ক্ষতি এনেছে। হয়তো সময়ে সময়ে ভগবানের অভিলাষ হয় যে তাঁর নির্বাচিত বীরসন্তান ও পূজারকদের সহায়তায় বর্তমান সমাজ উন্নয়নের উপযোগী নয়। ভগবদ্-ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। অন্তরঙ্গ কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ উপাসনা এখানে অনুষ্ঠিত হল। ওঁ।

সে বছরও শীতকালে অবধূত বদরীনাথে কাটান।

তার কয়েক মাস পরে আবার যখন সেখানে যাই, বদরীপুরীতে প্রবেশ করেই মনে হল তাঁর কথা। আজই আবার দেখা হবে। এক বৎসর পরে।

যে ঘরটিতে থাকতেন, গেলাম। তালাবন্ধ। বাইরে গেছেন নাকি? কিন্তু তাঁর ঘরে তো তালা লাগানো থাকত না! অন্যত্র কোথাও আছেন, ভাবি।

পরিচিত কয়েকজনের কাছে সংবাদ নিই। সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছেও অনুসন্ধান করি। সকলের কাছে একই খবর পাই। অতি সঙ্গোপনে ফিস্ ফিস্ করে সকলে জানান,—তাঁর আর খবর পাবেন কি করে? তাঁর সেই সঙ্গী ব্রহ্মচারীকে ও তাঁকে—দুজনকেই যে হত্যা করেছে!

হত্যা! শুনে চমকে উঠি। সাধু-সন্ন্যাসীকে হত্যা! হিমালয়-তীর্থে! কে করলে কে? কেনই বা করলে?

কিন্তু প্রশ্নের সঠিক উত্তর আসে না। সন্দেহের আকারে শুধু সঙ্কেত পাই। তাঁর বিরুদ্ধে দলের কাউকে ইঙ্গিত করে বলে, ওদেরই কারও প্ররোচনায় সম্ভবত শেষ হয়ে গেছে।

আবার দু-একজন বলে, অপর আর এক সাধুরই এই অপকীর্তি। সেই যে নদীর ওপারে এক গুম্ফায় থাকতেন, দেখেছেন সম্ভবত তাঁকে। তাঁর খুব আক্রোশ ছিল এঁর ওপর। শেষ করে দিয়ে চলে গেছেন কৈলাসে।

স্তম্ভিত হয়ে শুনি।

যদিও সাধুর বিরুদ্ধে সাধুর হিংসার কাহিনী এই নতুন শুনি না।

কিছুকাল আগে রমণ মহর্ষির এক জীবনীতেও পড়েছিলাম। তিনি যখন গৃহত্যাগ করে প্রথম অরুণাচলে আসেন তখন তাঁর অল্প বয়স—বালক মাত্র। পাহাড়ের কিছু উপরে এক গুহায় আশ্রয় নেন। এক বৃদ্ধ সাধু বহুদিন থেকে সেই গুহার কাছে থাকতেন। তাঁর দর্শন পেতে নিকটস্থ গ্রামবাসীরা প্রায়ই আসত, বড় সাধু বলে শ্রদ্ধাও করত। বালক-সাধু রমণের আসার পর গ্রামবাসীরা তাঁর দিব্য রূপে ও মধুর আচরণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরই কাছে বেশি যেতে শুরু করে। অবহেলিত বৃদ্ধ সাধুটি ক্ষুব্ধ হয়ে পাহাড়ের আরও উপরে আর এক গুহায় উঠে যান। এর পর এক-একদিন উপর থেকে বড় পাথর এসে পাহাড়ের নীচের দিকে রমণ ঋষির কাছে হঠাৎ পড়তে থাকে। ভাগ্যক্রমে কোন পাথরই তাঁকে আঘাত করে না। তাঁর প্রথমে আশঙ্কা হয়—প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগবশতই হয়তো এমন ঘটছে। কিন্তু প্রকৃত কারণ কিছুদিন পরে ধরা পড়ে। একদিন তিনি নিজেই দেখতে পান—এ সবই সেই বৃদ্ধ সাধুটিরই কীর্তি, উপর থেকে ঠেলে ঠেলে পাথর গড়িয়ে ফেলছেন, তাঁকে উদ্দেশ করে।

সাধুর বিরুদ্ধে সাধুর হিংসা!

আমার সংবাদদাতাদের জিজ্ঞাসা করি, কোন প্রমাণ কিছু পাওয়া গেছে?

উত্তর পাই, শীতকালের পরও লোকে তাঁদের দেখেছে। তার পরের ঘটনা কারও দেখা থাকলেও সহজে স্বীকার করবে কেন? প্রমাণ আর কি থাকবে? থাকার মধ্যে তো শরীর দুখানি? ভারী পাথর বেঁধে ঐ অলকানন্দায় ছেড়ে দিলেই—সলিল সমাধি! সাধু-দেহের যা সাধারণ অন্ত্যেষ্টি, তারপর সব নিশ্চিহ্ন! আর অনুসন্ধান করছেই বা কে? হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চল। সর্বত্যাগী নাগা সন্ন্যাসী। নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবন। এখানে ছিলেন, লোকে দেখতে পেত। এখন নেই, কেউ তাঁর খবরও নেয় না। শুধু ডাকঘরের একটা খোপের মধ্যে জমে আছে তাঁর নামে আসা অনেকগুলি চিঠি, কাগজপত্র। তার উপর ধূলা জমেছে, মাকড়সায় জাল বুনছে।

ভাবি, সর্বত্যাগী শিক্ষিত সন্ন্যাসীরও অবশেষে এই পরিণতি!

অলকানন্দার কূলে গিয়ে বসি।

মনের কোথায় যেন সূচ বেঁধে।

তাকিয়ে দেখি, নদীর কিন্তু সেই একই রূপ। সহস্র তরঙ্গের উচ্ছ্বাস তুলে তেমনি ছুটে চলেছে। দলে দলে পুণ্যলোভী যাত্রী আসে জলস্পর্শ করতে। সাধুসন্ত আসেন অবগাহন স্নানে। স্নান-শেষে কমণ্ডলু ভরে জল নেন। কে ভাবতে পারে, ঐ জলধারার অন্তরালে এক নিহত সন্ন্যাসীর রক্তাক্ত দেহের অংশাবশিষ্ট হয়তো এখনও পড়ে আছে। জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকমিক করে, অবধূতের মুখের সেই সরল হাসি মনে পড়ে।

মানুষের কৃত পাপকর্ম। আবার মানুষের গড়া দেবতা। পাপ-স্খালনের ভার দেয় মানুষ সেই দেবতারই উপর। তাই তো দেখি—গরল পানে নীলকণ্ঠ ঐ তুষারধবল গিরিশিখর! আবার তারই পাদমূলে কলুষহারিণী গঙ্গা—অলকানন্দা!

কিন্তু তখনই কবির সেই প্রশ্ন জাগে :

> যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
> তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

মনে শান্ত হবার চেষ্টা করি।

ভাবি, অবধূত ভূত-ভবিষ্যতের কথা বলতেন, তিনি তাঁর দেহের এই পরিসমাপ্তি জানতেন? জানা থাকলে—এখান থেকে চলে গেলেন না কেন? হয়ত তাহলে এই বিকৃত পরিণতি ঘটত না। অথবা—এ শুধু তাঁর আত্মবলি?

এই সূত্রে মনে পড়ে আর একটি ঘটনা। ভাগ্যবিড়ম্বনার এক করুণ কাহিনী।

এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিবাহ দেবেন। বহু অনুসন্ধান করে সুপাত্র পেলেন। কিন্তু তাঁর এক বন্ধু কোষ্ঠী বিচার করে বললেন, এ-বিবাহের এক বছরের মধ্যেই বৈধব্যযোগ আছে, তাই চলবে না।

কন্যার পিতা পাত্রটিকে হাতছাড়া করতে চান না, অথচ কোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহসও হয় না।

তাই বন্ধুকে নিয়ে কাশীধামে গেলেন। সেখানে তাঁর বন্ধুর গুরুদেব থাকেন, বিচক্ষণ কোষ্ঠী-বিচারক, তিনি যদি এ-বিবাহে সম্মতি দেন! গুরুদেব বিচার করে দেখে বিবাহ হবে বলে দিলেন। কন্যার পিতা আনন্দে উৎফুল্ল।

বন্ধু তখন সঙ্গোপনে গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার গণনায় কোথায় ভুল হয়েছিল বলুন, আপনারই শিক্ষা অনুযায়ী বিচার করেছিলাম বলেই তো আমার বিশ্বাস।

গুরুদেব বললেন, তোমার বিচারে ভুল হয় নি। ঠিকই বলেছিলে—এ বিবাহের এক বছরের মধ্যে বৈধব্যযোগ আছে। কিন্তু এও কি দেখ নি, এদের এই বিবাহ কোনমতে খণ্ডন করার উপায় নেই? এ বিবাহ হবেই, বৈধব্যও ঘটবেই।

শেষ পর্যন্ত সেই মত ঘটেও ছিল!

ভাবি, অবধূত কি তাই জানতেন? কে জানে?

॥ ১১ ॥

শুধু বদরীনাথে আসায় আর মন ভরে না।

তাই সেবার এলাম শতোপন্থ যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। বদরীনাথ ছাড়িয়ে হিমালয়ের আরও উপরে ও নিভৃত অন্দরে যেতে হবে। শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিনে যাবার একমাত্র সময়। তখন সেখানকার বরফ অনেকখানি গলে যায়, যাতায়াতও সম্ভব হয়।

১৯৫৫ সাল। সেপ্টেম্বর মাস। ৮ই রাত্রে কলকাতা ছেড়েছি। ১৪ই সকালে বদরীনাথে পৌঁছেছি। ছয়দিনও পুরো লাগে নি। পিপুলকুঠি পর্যন্ত বাস্ পেয়েছি। যোশীমঠ পর্যন্ত বাস্ এলে আরও একদিন কমে যাবে। এ-যুগে বদরীনাথ কত নিকটে হয়ে গেছে, ভৌগোলিক দূরত্বের বিচ্ছিন্নতা পৃথিবীর সর্বত্রই মুছে যাচ্ছে।

এ সময়ে যাত্রীর মোটেই ভিড় নেই। হনুমান চটী থেকে এখানে আসার পথে দু-জন মাত্র যাত্রীকে দেখেছি। মে-জুন মাস হলে দিনে হাজারখানেক যাত্রী যায়-ই।

যাত্রার চিরাচরিত নিয়ম, প্রথমে কেদারনাথ দর্শন, তারপর বদরীনাথ। এবার কিন্তু সোজা চলে এসেছি বদরীনাথে। কেননা প্রথমেই যেতে হবে শতোপন্থ। শতোপন্থ অর্থাৎ সত্যপদ।

শুনি, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পথ। কেউ দেখান বদরীনাথের উপর দিয়ে, কেউ বা দেখান কেদারনাথের মন্দিরের পিছনের বরফের পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। বরফের উপর দিয়ে এই দুই মন্দিরের ব্যবধান খুব বেশি নয়—শোনা যায়, ক্রোশ তিনেক মাত্র ছিল। প্রবাদ, পুরাকালে একই পূজারী দুই মন্দিরে নিত্য সেবাপূজা করতেন। একদিন তিনি এক মন্দিরের পূজা শেষ করে আর এক মন্দিরে যাওয়ার পথে পূজার নৈবেদ্যের অংশ আহার করেন। এই দুষ্কৃতির ফলে এই মন্দিরের মধ্যে বিরাট তুষারপ্রাচীর মাথা তোলে—সেই সহজ যাতায়াতের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়।

অপর আর এক প্রবাদও আছে : সেই পূজারী প্রতিদিন দুই মন্দিরের পূজা শেষ করে গৃহে ফিরে নিত্য স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করতেন, তাঁকে প্রহারও করতেন। পূজারীর অভিযোগ ছিল, 'আমি দু'পাহাড়ে পূজা শেষ করে এলাম, তবু তোমার গৃহকর্ম শেষ হয় না!'—ব্রাহ্মণী বুদ্ধিমতী। দুই দেবতার কাছে প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা শুরু করেন, 'তোমাদেরই পূজার পূজারী আমার প্রাণনাশ করছে, আমার মরণে স্ত্রীহত্যার ভাগী তোমাদেরই হতে হবে!'—অবশেষে হর-হরি বিচলিত হলেন, বর দিলেন—একদিনে দুই মন্দিরে যাতায়াতের পথ রুদ্ধ করে এক অত্যুচ্চ তুষারপর্বত উঠল।

মহাপ্রস্থানের পথও তাই দুই দিকের যেদিক দিয়েই যাক না কেন, পর্বতের একই অঞ্চলে গিয়ে মিশেছে। শুধু শুরু নিয়েই মতভেদ,—পথের শেষ নিয়ে নয়। বদরীনাথের চিরতুষারময় বিরাট গিরিশৃঙ্গগুলির জটাজালে সেই মহাপ্রস্থানের পথ লুপ্ত হয়েছে; মানচিত্রে এই শিখরগুলিকে চৌখাম্বা বলে অভিহিত করা হয়। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা ২৩,৪২০ ফুট। পর্বতের সেই শিখরদেশে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সেখানে ওঠার আমার সামর্থ্য নেই, শিক্ষাও নেই—তাই সাহসও নেই। বই-এ পড়েছি, অভিযাত্রীদের কেউ কেউ ঐ শিখরগুলি আরোহণ করেছেন। মহাপ্রস্থানের পথের শেষ সীমা ঐ তুষারশৃঙ্গগুলিরই মধ্যে একটি বিশেষ অংশকে লক্ষ্য করে দেখানো হয়—ঐ স্বর্গারোহণী!

বরফের পাহাড়ের সেই অংশটির অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট আছে। তারই দর্শনলাভের আমাদের আকাঙ্ক্ষা। স্বর্গারোহণীর কিছু আগে একটি হ্রদ আছে—শতোপন্থ তাল। তুষারধবল গিরিশিখরগুলির পাদদেশে বিচিত্র সৌন্দর্যময় বারিরাশি। সেই হ্রদের তীরে কয় রাত্রি কাটানোরও ইচ্ছা আছে।

বদরীনাথে পৌঁছতেই মন্দির-কমিটির সেক্রেটারি এসে জানালেন, যাবার সব আয়োজন তিনি করে রেখেছেন।

একটা দিন এখানে বিশ্রাম করে ১৬ই রওনা হব ঠিক হল। জিনিসপত্র এর মধ্যে গুছিয়ে নিতে হবে। যেসব বস্তুর এ পথে একান্ত দরকার—শুধু তাই সঙ্গে যাবে। বাকি বদরীনাথেই পড়ে থাকবে।

এসব পাহাড়-পথে লোমশ ঋষির উপদেশ এখনও মেনে চলতে হয়। পাণ্ডবরা তীর্থযাত্রায় যাচ্ছেন। মহাভারতের বনপর্বে তার বর্ণনা আছে। লোমশ ঋষি এলেন—পথ-প্রদর্শক হয়ে সঙ্গে যাবেন। জিনিসপত্র, সাজ-সরঞ্জামের বহর দেখে ঋষিবর বিস্মিত হন, উপদেশ দেন,—'লঘুর্ভব মহারাজ লঘুঃ স্বৈরং গমিষ্যসি।'

যাত্রা-পথে সেই 'লঘুর্ভব' উপদেশ আজও মেনে চলতে হয়।

ট্রেন ও প্লেন যাত্রায়ও আধুনিক যুগে সেই 'Travel light'-এরই বিজ্ঞপ্তি।

কলকাতা থেকে এসেছি আমরা দুজন। শিশিরবাবু এবারও এসেছেন। বয়স তখন তাঁর ষাট হয়েছে। তবুও মনের উৎসাহে ও দেহের সামর্থ্যে কোথাও ভাটা লাগে নি। তিনি সঙ্গে থাকলে অনেক দুশ্চিন্তার ভার সহজেই নেমে যায়। দুর্গম পথের বহুবিধ কষ্ট ও অসুবিধা হাসিমুখে মেনে নেন। এ-পথে তাঁকে দেখলে সেই বনপর্বের কথাই আমার মনে পড়ে। হিমালয়ে দুর্গম তীর্থযাত্রার জন্যে পাণ্ডবরা প্রস্তুত হচ্ছেন। অনেকে সঙ্গী হয়ে যাবার জন্যে এসেছেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁদের ফিরে যাবার জন্যে অনুরোধ করে বলছেন, যাঁরা ক্ষুধা, পিপাসা, পথের পরিশ্রম, গ্রীষ্মের প্রখরতা, শীতের কষ্ট সহ্য করতে না পারেন, তাঁরা সকলেই নিবৃত্ত হোন।

ভোজনপ্রিয় ব্যক্তিদেরও তিনি নিবারণ করে বলেন, যেসব ব্রাহ্মণ কেবল সুস্বাদু খাদ্য ভোজন করেন, যাঁরা পক্বান্ন লেহ্য পেয় ও মাংস ইত্যাদি বিবিধ বস্তু ভক্ষণ করে থাকেন, তাঁরাও সকলে ফিরে যান।

তে সর্বে বিনিবর্তন্তাং যে চ মিষ্টভুজো দ্বিজাঃ
পক্বান্নলেহ্যপানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পকাঃ॥

মহাভারতীয় যুগের কথা। তবুও এখনও তেমনি প্রযোজ্য।

সেই চিরকালীন বিচার-মতে শিশিরবাবু এ-পথে আদর্শ সঙ্গী। ভোজনের বা শয্যার কোন বিলাস নেই। কম্বল পেতে আর একটা কম্বল গায়ে নিশ্চিন্ত আরামে শুতে পারেন। বালিশেরও প্রয়োজন হয় না। শুলেই চোখ বোজেন। চোখ বুজলেই ঘুম আসে। তাঁর শুধু শীতের আতঙ্ক। একটু শীত বেশি হলেই গরম পুরো-হাতা সোয়েটার গায়ে, গরম মোজা পায়ে, 'মঙ্কি ক্যাপ' মাথায়—কম্বল টেনে মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শোবেন। একটু পরেই ফুস্‌ফুস্‌,—ঘুমন্ত নিঃশ্বাসের শব্দ! খাওয়া-দাওয়া-রুচি সম্পর্কেও নির্বিকার। কিছু খেতে পেলেই হল,—রান্না যেমনই হোক। বলেন, এ-পথে এসে অনেকে অভিযোগ করেন, আলু ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না—ক'দিনেই খাওয়ায় অরুচি আসে; আমার তো কিন্তু দিন দিন খিদে বেড়েই চলেছে। বাড়িতে খাই দু'খানা রুটি, এখানে পাঁচ-ছ'খানাও চলছে। শরীর মুটিয়েছে, নয়? দেখুন তো? মুখটাও তো আরশিতে দেখছি, বেশ ভারি ঠেকছে।

আমি হেসে বলি, তা দেখাবে না? বোধ হয় এক সপ্তাহ পরে দাড়ি কামাতে বসেছেন, কলকাতা ছাড়ার পর নিশ্চয় কামান নি?

তিনি বলেন, ঐখানেই আপনার সঙ্গে তাল রাখতে পারি না। রোজই বসে যান দাড়ি কামাতে।

আমি বলি, ওটা স্বভাব হয়ে গেছে। কামাতে কষ্ট হয় না—কতটুকুই বা সময় লাগে! অথচ নিয়মমত কামালে মন কেমন প্রফুল্ল থাকে দেখি। ঠিক যেমন একটা করণীয় কর্তব্য পালন করে মনের তৃপ্তি আসে। আবার হয়তো না-কামানো অভ্যেস করলে কামাতে ভালো লাগবে না। ভালো কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন, কামানোর সরঞ্জাম এখানেই রেখে দিয়ে যাই। শতোপন্থে ক'দিন দাড়ির ছুটি দেওয়া যাক। ভারও তো কিছু কমবে।

শিশিরবাবু তখনই বলেন, খুব ভালো প্রস্তাব। ও-পথে যা দারুণ শীতের কথা শোনা যাচ্ছে! না

কামানো দাড়িতে খানিকটা কম্ফর্টারের কমফর্ট দেবে। কিন্তু এখান থেকে ক'মাইল যেতে হবে খোঁজ নিলেন?

জিনিসপত্রের গোছগাছ করা, কেনাকাটা, বাঁধাবাঁধি—এ-সব শিশিরবাবু থাকলে তাঁরই কাজ। পথঘাট সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া, কতদূর যাওয়া যাবে, কোথায় থাকা হবে—সে-সব ভার আমার উপর।

তাই বলি, আপনি তো জানেন, পাহাড়ের অনেক জায়গা আছে যেখানে মাইল দিয়ে দূরত্ব মাপা বা বোঝা যায় না। সময় দিয়ে মাপতে হয়—অর্থাৎ যেতে কতক্ষণ লাগে। এখানেও তাই। শুনেছি, পথ নেই। যেখান দিয়ে যাওয়া যাবে, সেইটেই পথ। কেউ বলে, এখান থেকে সাড়ে পনেরো মাইল, কেউ বলে তার কম, আবার কেউ বলে তারও বেশি। যার যেমন মনে লেগেছে। সময়ও লাগে যাত্রীর সামর্থ্যের উপর। একটু বেশি কষ্ট করলে দ্বিতীয় দিনেই ওখানে পৌঁছানো সম্ভব। আমরা কিন্তু যাব ধীরেসুস্থে—তিন দিনে। আমাদের হাতে সময়ের যখন টানাটানি নেই, তাড়াতাড়ি করারও কোন সার্থকতা নেই।

সেক্রেটারি আসেন। বলেন, আপনাদের সঙ্গে মাল নিয়ে যেসব লোক যাবে, এসে গেছে। এরা সবাই মানা গ্রামে থাকে। শতোপন্থ অঞ্চল এদের জানাশুনা। অত উঁচুতে গাড়োয়ালী বা নেপালী সাধারণ কুলিরা ভার বইতে পারে না। কাল কখন যাত্রা করবেন, বলে দিন।

সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে যাত্রা শুরু হবে, ঠিক হয়। তার আগে ওরা এসে মালপত্র ওদের সুবিধামত বেঁধে নেবে। কি কি জিনিস সঙ্গে যাবে এবং তার ওজনই বা কত হবে, তখনই দেখে একটা ধারণা করে নেয়।

মালপত্র বইবার জন্য চারজন লাগবে। একজন তো শুধু খাদ্যের বোঝাই বইবে। সেই সঙ্গে আধ মণ কাঠকয়লা নেবে,—কেননা সব জায়গায় জ্বালানী কাঠ পাওয়া সম্ভব হবে না। স্টোভ নিলে রান্নার কাজ চলবে বটে, তবে পথে তেল পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া, স্টোভে তো আর আগুন পোয়ানো যাবে না। মাল বইবার জন্যে প্রতিজনে নেবে দৈনিক চার টাকা করে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তাদের নিজেদের।

লোকগুলির নাম জিজ্ঞেস করি।

ওদের দলপতি যে তার চেহারা দেখে মনে হয়, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হয়েছে। নাম—উদয় সিং। বাকি তিনজনের যুবা-বয়স। একজনের নাম রতন সিং, আর একজনের পান সিং। অপরটির নাম জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না। শিশিরবাবু বলেন, বোধ হয় কথা বুঝতে পারছে না।

তার সঙ্গীরা তাকে বুঝিয়ে বলে।

সে বলে, আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার নামটা মনে করতে পারছি না কোনমতে। ভুলে গেছি। ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে ভাবতে থাকে। সবাই হেসে ওঠে। আমরা আশ্চর্য হই, মানুষ নিজের নাম ভুলে যায়! তার সঙ্গীরা বলে, ও ঐরকমই, কেমন ভোলা-মন।

সেক্রেটারি জানান, মন্দিরের একজন চাপরাশীকেও সঙ্গে দিচ্ছি। করিৎকর্মা লোক। রাঁধতেও জানে। খুব হুঁশিয়ারও আছে। গত বছর ওখানে গিয়েছিল। আপনাদের খাবার তৈরি করবে। সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। দুর্গম পথ। কোথায় কখন কি বিপদ আসে বলা যায় না। দু-একজন লোক বেশি থাকা ভালো। বিদ্যাদত্! —বলে ডাক দেন।

দরজার বাইরে জুতা খুলে রেখে, লম্বা ফর্সা এক গাড়োয়ালী সুমুখে এসে দাঁড়ায়। পরনে লম্বা কালো কোট। মাথায় কালো গোল টুপি। বুকের উপর মন্দির-কমিটির চাপরাশ। সবল দেহ। দেখলেই মনে হয় নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

সেক্রেটারিকে বলি, ভালোই হয়েছে। খুচরা জিনিসের ছোট থলিটা ওর কাছে দেব, ক্যামেরা ও জলের ফ্লাস্কও ওই নেবে। সব সময়ে পথে আমাদের কাছে কাছে থাকবে।

দুপুরে বিদ্যা এসে দেখেশুনে মালপত্র গুছিয়ে নেয়। সেক্রেটারিও আসেন।

কলকাতা থেকে একটা ছোট তাঁবু এনেছি। Himalayan Ciub-এর সম্পত্তি। সভ্য হিসাবে ভাড়া পেয়েছি। চমৎকার জিনিসটি। প্লাসটিক-এর তৈরি। উপরটা গেরুয়া রঙ। বরফের রাজ্যে শীত ও বাতাস দুই আটকায়। সবসমেত ওজন মাত্র সের চার-পাঁচ। বাঁধা থাকলে তাঁবু বলে বোঝাই যায় না। মনে হয়, যেন একটা হ্যান্ডব্যাগ। দুজন থাকার পক্ষে যথেষ্ট। এ-পথে তাঁবু না আনলে গুহায় রাত্রিবাস করতে হয়।

সঙ্গের অন্য সকলে তাই করবে।

বিছানার মধ্যে আছে খানদুই করে কম্বল। সেক্রেটারি তাঁদের মোটা ভুটিয়া কম্বল আরও দুখানা দিয়েছেন। বলেন, আপনাদের ওসব ভালো কম্বলের চেয়েও এ জিনিস কাজ দেবে অনেক বেশি। যেখানকার যা। দেখবেন সেখানকার শীতের কাঁপুনি। তার ওপরে যদি মেঘ করে, বরফ পড়ে যায় তো কথাই নেই!

আহার্যের মধ্যে সঙ্গে চলেছে,—সকলের জন্যে আধ মণ আটা, দশ সের আলু, ঘি, লবণ, গুঁড়ামশলা।

চাল, ডাল নিয়ে লাভ নেই,—সেখানকার জলে সিদ্ধ হতে চায় না।

বিদ্যা সাবধানী লোক। বলে, আমাদের এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম হলেও আরও দু-তিন দিনের রসদ বেশি নিয়ে যেতে হবে। ওসব জায়গায় কখন কোথায় কি ঘটে বলা যায় না। যদি কোথাও আটকে যাই—দু-একদিন বেশি থাকতে হয়, তখন তো আর কোন জিনিস পাবার উপায় থাকবে না।

সেই মত ব্যবস্থাও হয়!

চা, চিনি ও গুঁড়া দুধও নেওয়া হয়েছে। বিদ্যা বলে, এইটেই একটু বেশি করেই লাগবে। সকলেই হরদম খাবে। সঙ্গের সকলকেই তো দিতে হবে। ও-পথে এইটেই সবচেয়ে দরকার। শরীর গরম রাখবে, মেজাজও ঠাণ্ডা রাখবে।

পাণ্ডাজী এসে বলেন, দোকানে অর্ডার দিয়েছি—মুগের লাড়ু ও 'নিমকিন্' করে দেবে। চা-এর সঙ্গে মুখরোচক হবে। নইলে শুধু আলু ও রুটি খেয়ে অরুচি লাগবে। বেশ ভালো করে বন্ধ করে রাখবেন। ক'দিন থাকবেও ভালো—আর তাছাড়া, মানে কিনা—বলে চোখ ঘুরিয়ে অনুপস্থিত মানা-বাসীদের উদ্দেশ করেই বলেন—মানে, আরও সব থাকবে তো—একটু সাবধানে রাখাই ভালো।

তাঁর এই অহেতুক কটাক্ষ আমার ভালো লাগে না।

শিশিরবাবুর হঠাৎ কি মনে হয়, তাঁর ঝোলা থেকে দুটো কৌটো বার করেন। জিজ্ঞাসা করি, ওতে কি?

বলেন, আসার সময় বাড়ি থেকে যে নিমকি ও মিষ্টি গজা তৈরি করে দিয়েছিল, মনেই ছিল না। এগুলোও নেওয়া যাক। এখানকার পাহাড়ি নিমকিন্ কেমন হবে কে জানে—আমার তো আবার পরের দাঁত, সে-সব চিবোতে পারলে হয়!

আমি বলি, সঙ্গে রাখুন। লোক তো কম যাচ্ছি না—সকলে মিলেই সব কিছু খেতে হবে। কাজে দেবে নিশ্চয়।

এ-ছাড়া বিস্কুটও কিছু সঙ্গে আছে।

ওষুধপত্র সামান্য নেওয়া হয়েছে—পেটের অসুখের ও ঠাণ্ডা-লাগার ভয়ে। আস্প্রোর ট্যাবলেটও আছে। একটু টিনচার আইওডিন, তুলা ইত্যাদিও আছে। আসার সময় কলকাতা থেকে এক ডাক্তার বন্ধু Cardiazol একশিশি দিয়েছিলেন, পাহাড়ের অত উঁচুতে—বরফের মধ্যে যদি প্রয়োজন হয়। সেটাও সঙ্গে রাখি।

সেক্রেটারি বিদ্যাকে বলেন, দমন-পত্র কিছু নিয়ে রেখো।

শিশিরবাবু বলেন, দমন-পত্র! সে-বস্তুটা আবার কি? কাকে দমন করার চিঠি?

সেক্রেটারি জানান, নারায়ণের গলায় তুলসী-পাতার মত সবুজ পাতার মালা দেখে থাকবেন,—সেই মালা। এইসব অঞ্চলেই ঐ গাছ হয়। দুর্গম বা পাহাড়ের অনেক উপরে সূক্ষ্ম আবহাওয়ার (rarefied air) জন্যে নিশ্বাসের কষ্ট বোধ হলে—এতে খুব কাজ দেয়। জামার পকেটে রাখবেন, দরকার হলে মাঝে মাঝে হাতের আঙুলে টিপে ঘষে শুঁকলেই কষ্ট কমে যাবে। গন্ধটিও ভালো। সাধু-সন্ন্যাসীরা খুব ব্যবহার করেন।

গরম জামা-কাপড় যা কিছু সঙ্গে এসেছে, সবই চলেছে। এই পথের জন্যেই তো আনা। নইলে শুধু কেদার-বদরীর পথে ক'দিন ও কতটুকু বা গরমজামার দরকার হয়!

শিশিরবাবুকে বলি, আপনার কান-ঢাকা টুপিটা নিয়েছেন তো?

তিনি হেসে উত্তর দেন, এইখান থেকেই সেটা মাথায় লাগাব, সাতদিন পরে আবার এইখানে এসে খুলব।

বলি, মাথায় যে ক'গাছা চুল আছে, তার সঙ্গে বুনে নিন। পথে যদি খুলে পড়ে যায়—টের না পান—তখন রিসার্চ চলবে—এটা স্নো-ম্যান-এর মাথার খুলি কিনা!

হাস্য-পরিহাস ও আনন্দের মধ্যে আমাদের যাত্রার আয়োজন চলতে থাকে।

ঘরে প্রবেশ করেন হিমালয়বাসী পূর্ব-পরিচিত এক বৃদ্ধ সাধু। আমাদের যাবার উৎসাহ দেখে বলেন, তাই তো, আপনারা এ-পথে যাবার চেষ্টা করছেন! এ-সব গৃহীদের পথ নয়। সাধু-সন্ন্যাসীরাই যেতে সাহস পান না অনেক সময়। আপনাদের একটু দুঃসাহসিকতা হচ্ছে। ভেবে দেখুন ভালো করে, যাবেন কিনা।

আমি নজির দেখিয়ে বলি, কেন? এর আগেও তো কত লোক ঘুরে এসেছেন। আর যেতে যদি আমরা নাই পারি, ফিরে আসব।

তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, ফিরে আসা কি সহজ?

আমি হেসে বলি, যাক, তাহলে যাওয়াটা শক্ত নয়, ফেরাটাই শক্ত!

তিনি বলেন, না না, এ-সব পথ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা নয়। বড় কঠিন যাত্রা। মহাপ্রস্থানের পথ—শুধু ধর্মরাজই একমাত্র শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছিলেন।

তারপর তাঁর কাছে গল্প শুনি, এই দুরূহ পথের নানাবিধ ভয়াবহ কাহিনী। মৃত্যুর ছায়ামলিন। তাঁর নিজেরও সেই শতোপন্থ-তালের তীরে কাটানো দিনগুলির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। একদল সাধুর বরফের মধ্যে জীবন্ত সমাধিপ্রাপ্তি। পরের বছর নাকি তাঁদের মৃতদেহগুলির উদ্ধার হয়। সারা বছর বরফে চাপা থাকায় তাঁদের ভোজনসামগ্রী বা কোন কিছুই নষ্ট হয় নি, দেহগুলির কোন বিকৃতি ঘটে নি—শুধু প্রাণটুকু গেছে।

কোন্ এক ইউ-পি প্রদেশবাসীর সস্ত্রীক ঐ পথে যাওয়ার গল্প শুনি। স্বামীজী বলেন, তাঁকে অনেক করে নিষেধ করেছিলাম—বিশেষত স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কিন্তু কোনমতেই শুনলেন না, বলেন, সস্ত্রীক না গেলে পুণ্যলাভের অঙ্গহানি হবে।—মরণ টানছিল মশাই, মরণ! গেলেন জোর করে, তারপর মাঝপথে অতি দুর্গম এক জায়গায়—সেখানটায় শিরদাঁড়া পথ—যেতে পারেন তো দেখবেন কি ভীষণ!—সে মহিলাটি ওপর থেকে পড়ে গেলেন—মৃত্যুও নিশ্চয় তখনই ঘটেছে। কিন্তু স্বামী নাকি অপেক্ষাও করেন নি, ফিরে তাকিয়েও দেখেন নি। তীর্থ সাঙ্গ করে একাই ঘুরে এলেন।

শিশিরবাবু গম্ভীর মুখে বলেন, যুধিষ্ঠিরও তো ঐ ধরনের আচরণ করে চলে গিয়েছিলেন? কিন্তু এ ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ছিল নাকি?

স্বামীজী বলেন, ওসব কথা রাখুন। এ-যাত্রা বড় ভীষণ পথে মশাই, আপনারা যাবেন কিনা ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখুন।

আমি বলি, যাত্রাটা তো কাল করি। তারপর পথের কথা পথেই দেখা যাবে। তবে আশীর্বাদটা করবেন যেন যাত্রা সার্থক হয়।

আরও কত গল্পই না শুনি এই পথের!

সকলেই বলেন, অতি দুর্গম পথ। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যময় পরিবেষ্টন—এও সকলে স্বীকার করেন।

হিমশিখরগুলির জটাজাল বিস্তার করে ঐখানেই তো সত্যকার হিমালয়। দেবাদিদেব মহাদেবের আবাসভূমি। তাই তো শুনি, ঐ পথে জড়দেহের অবসান সাধুসন্তরা একান্তভাবে কামনা করতেন। কেদারনাথের পিছনে বরফের পাহাড়ে অংশবিশেষে উঠে তাঁরা উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিতেন। এই মরণে নাকি অশেষ পুণ্য। এখন এইভাবে মৃত্যুবরণ করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

এই পথে যাওয়ার অধিকার-ভেদেরও কথা শুনি। পূর্বে সকলের যাওয়ার নিষেধ ছিল?

স্বর্গীয় যদুনাথ সর্বাধিকারী ১২৫৯ সালের মাঘ মাস থেকে ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ভারতের বহু তীর্থ পদব্রজে ভ্রমণ করেন। তাঁর সেই ভ্রমণের রোজনামচা 'তীর্থভ্রমণ' নামে বইআকারে পরে প্রকাশিত হয়। তিনি উত্তরাখণ্ডেও গিয়েছিলেন। একশো বছরেরও উপরের কথা। এই মহাপ্রস্থানের পথে তিনি নিজে না গেলেও এই পথের যাত্রী হবার অধিকার কাদের আছে সে সম্বন্ধে লিখেছিলেন। টেহেরীর রাজার কাছ থেকে তখন অনুমতি নিতে হত। অনুমতি দেওয়ার আগে যাত্রীর শক্তি-পরীক্ষা নেওয়ার

নিয়ম ছিল। সেই পরীক্ষার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন এই বলে :

"যাহার মহাপন্থা হইয়া হিমলিঙ্গেশ্বর স্পর্শ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকে অগ্রে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ, কি অন্য অন্য আশ্রম লইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইয়া গোগ্রাসে ভোজন, তদনন্তরে আপন পদে ঝিক করিয়া চরু রন্ধন করিয়া ভোজন, তদনন্তরে রাজার নিকট মহাপন্থাগমনের আবেদন করিতে হয়। রাজা শ্রুত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে রাজভবনে রাখিয়া, উত্তম উত্তম মেওয়াদি তেজস্কর দ্রব্য, দুগ্ধ (ও) ঘৃত প্রচুররূপে আহার করাইয়া, উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া, উত্তম রূপসী যুবতীগণকে সেবায় নিযুক্ত করিয়া, দুই-তিন মাস একত্রে বাস করাতে যদি কিছু বিকার জন্মে তবে তাহাকে পুনর্বার পায়ের ঝিকে পাকস্থলি বসাইয়া চরু পাক করিয়া আহার করিতে পারিলে, সেই ব্যক্তিকে মহাপন্থা গমনের অনুমতি দেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তি এই স্থলে আসিয়া উলঙ্গ হইয়া সকল ত্যাগ করিয়া মহাপন্থাতে গমন করে, এক ক্রোশ পর্যন্ত তাহাকে দেখিতে পায়, তৎপরে কোথা যায়, কি হয়, কেহ দেখিতে পায় না।"

ভাবি, এখন সেই টেহেরী-রাজ্যও নেই, রাজাও নেই, সে-সব পরীক্ষাও নেই। কালের গতিতে এ-সব কিছুরই প্রয়োজনীয়তা মুছে গেছে। সেকালে লোকে বদরিকাশ্রমে আসত প্রাণ হাতে নিয়ে,— বিলেতের জাহাজেও যেমন চড়ত উইল করে! অজানা দীর্ঘ দুর্গম পথের বিপদের আশঙ্কায় প্রিয়জনের চোখে অশ্রু ঝরত। যাত্রীও কাঁদত। আর এখন যাত্রী আসে হাসিমুখে—মন্দিরের মাত্র কয় মাইল দূরে মোটর চড়ে।

কিন্তু সেই সনাতন সত্যপদের পথ এখনও কি তাই আছে?

'জয় রাম শ্রীরাম! জয় জয় রাম—জয় সীতারাম!'

আরে, এই যে বৈরাগীজি এসে গেছেন! প্রতি বছরই বদরিনাথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। সেই মুখভরা হাসি। মাথাভরা জটা। আলিঙ্গন করে বসাই।

বলেন,—এইমাত্র খবর পেলাম—আপনারা কাল এসে গেছেন। যাত্রা করছেন কবে?

বলি, কাল রওনা হব। সব গোছগাছ আজ হয়ে গেল।

বলেন, ভালোই। দর্শন করে আসুন। খুব আনন্দ পাবেন। দেখবেন কি অপূর্ব স্থান! যেমন প্রাকৃতিক শোভা, তেমনি বিচিত্র অনুভূতি। ওঃ!—বলে চোখ বোজেন। মুখ গম্ভীর হয়। ভ্রূযুগল কাঁপতে থাকে। যেন কল্পনার রথে চড়ে আবার সেখানে বিচরণ করেন।

জিজ্ঞাসা করি, আপনি গিয়েছিলেন কোন্ বছর?

বলেন, এই তো দু'বছর হল। ভাবি আবার কবে যাব?

বলি, চলুন না—যাবেন আমাদের সঙ্গে?

শুনে উৎসাহিত হন। কিন্তু তখনই সংযত হয়ে বলেন, যাওয়ার অন্য কোন বাধা নেই। আপনাদের যদি অসুবিধা হয়?

শিশিরবাবু উৎফুল্ল হয়ে বলেন, আমাদের আবার অসুবিধে কি? চলুন সঙ্গে। খুব ভালোই লাগবে।

সেইমতই স্থির হয়।

ঘণ্টাখানেক পরে বৈরাগী গম্ভীর মুখে ফিরে আসেন। বলেন, কাল তো আপনাদের যাওয়া চলবে না। দুদিন পরে বেরুতে হবে।

আশ্চর্য হই। জিজ্ঞাসা করি, কেন, কি হয়েছে?

তিনি বলেন, এইমাত্র ওপরে গিয়েছিলাম। স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, কাল-পরশু দু-দিনই অযাত্রা। তাই তার পর যাওয়াই প্রশস্ত।

আমরা রাজী হই না। বলি, যাওয়ার আয়োজন সব হয়ে গেছে। মানাগ্রাম থেকে সে-লোকগুলিও কাল তৈরি হয়ে আসবে—এখন এ অবস্থায় আর দিন পেছুনো চলে না।

তিনি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, আপনারা বুঝি পাঁজিটাজি এসব মানেন না? তীর্থযাত্রায় এসব মেনে চলতে হয়।

আমি হেসে বলি, ওসব প্রশ্ন এখন থাক। আপাতত আমার একটা সহজ জবাব আছে। আমাদের

যাত্রা শুরু হয়েছে কলকাতা থেকে। সেদিন কি যোগ ছিল তা দেখি নি, জানিও না। ভালো-মন্দ যাই থাক —সেটা হয়ে গেছে—আর ফেরা চলবে না। বদরীনাথে থাকা, আমাদের কাছে পথে থাকা মাত্র। তাই এখান থেকে যাত্রার দিনক্ষণ দেখার আমাদের প্রয়োজন নেই। ঠিক নয় কি?

তিনি হেসে বলেন, তা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমার পক্ষে তো ওটা খাটবে না। আমার যাত্রা যে এখান থেকে শুরু।

অতএব স্থির হয়, আমরা কাল আয়োজন-মতই রওনা হব। তিনি দুদিন পরে যাত্রা করবেন এবং দুই দিনে এই পথ অতিক্রম করে আমাদের একদিন পরে শতোপন্থতালে পৌঁছুবেন। তারপরে একসঙ্গে সেখানে থাকা যাবে, ফেরা যাবে। শিশিরবাবু তাঁকে বলেন, আপনার মালপত্র আজই দিয়ে যান। আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।

তিনি গুহায় ফিরে গিয়ে নিয়ে আসেন।

মালপত্রের বহর দেখে আমরা হেসে উঠি। কি-ই বা আছে! থাকবেই বা কি?—একটি মৃগচর্ম, একটা লোটা ও দুখানা চটি বই।

বলেন, মৃগচর্মটা শোওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বেশ গরম থাকে। আর এই গায়ের চাদরটা—সেটা তো আমি সঙ্গেই নিয়ে যাব—মাঝপথে একটা রাত্রি তো আমাকে কাটাতে হবে। আর পুথি দুটি নিয়ে চলেছি —তুলসীদাসের 'রামায়ণ' আর 'সত্যনারায়ণের কথা'—সরোবরের কূলে সত্যনারায়ণের পূজাপাঠ করতে হয়। কেমন ঠিক না?

শিশিরবাবু বলেন, মন ঠিক থাকলে সবই ঠিক আছে। জয় রাম শ্রীরাম—জয় সীতারাম।

॥ ১২ ॥

সকাল দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই প্রস্তুত।

মন্দির পরিক্রমার পর বদরীবিশালকে প্রণাম করে যাত্রা শুরু হল।

পাণ্ডাজি, সেক্রেটারি, স্থানীয় বন্ধুবান্ধব শহরের শেষ সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বৈরাগীজিও এসেছেন। মাইল দেড় দূরে মাতা-মন্দির—সেই পর্যন্ত তিনি যাবেন, বললেন।

সার বেঁধে আমরা চলেছি। দলের পুরোভাগে মাল নিয়ে রতন সিংরা চারজন। তাদের পিছনে আমরা দুজন ও আজকের কিছুক্ষণের সঙ্গী বৈরাগী। সকলের শেষে বিদ্যা। তার এক কাঁধের উপর থেকে ঝুলছে জলের ফ্লাস্ক, অপর কাঁধ থেকে একটি ছোট্ট ঝোলা—তাতে ক্যামেরা ও খুচরো কয়েকটা জিনিসপত্র আছে।

আপাতত সোজা পথ। পাহাড়ি ভাষায়—ময়দান। চড়াই নেই, উৎরাইও নেই। মাইল দুই এই রকমই যাবে, শুনি। বাঁদিকে ঊর্ধ্বমুখী স্তব্ধ নারায়ণ পর্বতশ্রেণী, ডানদিকে কিছু নীচে নিম্নমুখী গতিশীলা অলকানন্দা। নদীর পরপারে নরপর্বত গিরিশ্রেণী।

সোজা সহজ পথ হলেও ধীরে ধীরে চলি। শরীরের যা কিছু শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয় করে রাখতে হবে। সম্মুখের দুর্গম পথের কত রোমাঞ্চকর কাহিনীই শুনেছি। ভাবি, সে-সব পথের কষ্ট সইবার শক্তি যেন থাকে, বিপদ বইবার মনের জোর যেন পাই। কেন জানি না, মনে ভয়ের কোন ছায়া পড়ে না। কি এক অজানা শক্তির উপর নিশ্চিন্ত মনে সম্পূর্ণ নির্ভর করি—বিমল আনন্দে সারা মন ভরে ওঠে। চরণ চলতে থাকে। যেন পথ-হারা পথিক বহুকাল পরে আপন ঘরের পথ খুঁজে পায়।

একটা সামান্য ব্যাপার অসামান্য রূপে হঠাৎ মনে জাগে।

পকেটে হাত দিয়ে দেখি—শূন্য। আজ সঙ্গে কপর্দকও নেই। পয়সাকড়ি যা কিছু ছিল—বদরীনাথে রেখে এসেছি। এ-পথে এক পয়সারও প্রয়োজন নেই। কোন কিছু কেনবার জিনিসও নেই, বেচবার দোকানও নেই। পথের উপর কোন লোকালয় বা গ্রামও নেই, টাকাকড়ি দেবার-নেবার লোকও নেই।

এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পথের পথিক। সাতদিন কাটবে। অথচ অর্থের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। শহরে বাড়ির বাইরে যেতে হলে পকেটে কিছু পয়সা—দরকার না হলেও রাখতেই হয়; কে জানে, যদি হঠাৎ প্রয়োজন হয়! না রাখলে মনে একটা অসহায় ভাব আসে।

আর, এই সাত দিনের জীবনে টাকার কোন মূল্য নেই। অর্থ নিরর্থক। তাই এই শূন্য-পকেট অভাবের

অস্বস্তি জাগায় না, মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি আনে।

জীবন-পথিক—অর্থ নেই, তবুও নিঃস্ব নই!

বদরীনাথ থেকে প্রায় মাইল দেড় দুই দূরে মানাগ্রাম। শতোপন্থের পথে পড়ে না, অলকানন্দার অপর পারে। এ-পার থেকে দেখতে পাই।

ক'বছর আগে ওখানে গিয়েছিলাম। বসুধারায় যাবার সময়। নদীর উপর লোহার ঝোলা পুল। সে-বছর প্রচণ্ড তুষারপাতে পুল ভেঙে গিয়েছিল। নদীর জলস্রোতের উপর সে সময়েও বরফের প্রচণ্ড স্তূপ জমে ছিল। তারই উপর দিয়ে যাতায়াত করেছিলাম। অতি সাবধানে। বরফের সেই স্তূপের মুখে প্রকাণ্ড গহ্বর হয়েছিল, তার ভিতর থেকে নদীর জলধারা প্রখর বেগে ছুটে আসছিল, ধার থেকে বরফের চাঙড় ভেঙে ভেঙে জলে পড়ে ভেসে চলেছিল। বরফের সেতুর কোথা দিয়ে পার হওয়া নিরাপদ, পাহাড়ী সঙ্গীরা দেখিয়ে দিয়েছিল।

মানাগ্রাম এ-অঞ্চলে বড় গ্রাম। প্রায় তিন-চারশো লোকের বসতি আছে। এরাই, শুনি, গন্ধর্বজাতি। এখন লোকে বলে, মার্চা। চাষবাস করে, ভেড়াছাগল পোষে; তিব্বতীদের সঙ্গে ব্যবসা করে। শীতের সময় নীচে নেমে যায়। সম্প্রতি এখানে ভারত-সীমান্তের পুলিসের ছাউনি হয়েছে। এই দিক দিয়ে মানা পাস্ হয়ে তিব্বত যাবার পথ। সেই দিক থেকে নেমে আসছে সরস্বতী নদী। পুরাণে কথিত আছে, সরস্বতী বেদের দ্রবময়ী দ্বিতীয় মূর্তি। জল-রূপিণী সরস্বতী এখানে অলক্ষ্যবাহিনী নন, লক্ষ তরঙ্গের উচ্ছ্বাস তুলে ছুটে আসছেন। খর-ধারায় দুই দিকের পাথর কেটে। বসুধারায় যাবার পথে তারই উপর এক জায়গায় বিশালকায় পাথর পড়ে একটি প্রাকৃতিক সেতু রচিত হয়ে আছে। ভীমসেন পুল নামে এর প্রসিদ্ধি। প্রবাদ, মহাপ্রস্থানের পথে মধ্যম পাণ্ডব এই নদী পারাপারের জন্যে ভীমকায় পাথরগুলি এমনিভাবে ফেলেন। সৃষ্টির কারণ যাই হোক—স্থানটি মনোরম। বদরী-যাত্রী মাত্রেই এই পথটুকু স্বচ্ছন্দে গিয়ে উপভোগ করে আসতে পারেন। সোজা রাস্তা। চলার কষ্ট নেই। অথচ দেখার আনন্দ আছে। মানাগ্রামও সেই সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। পুরাণ কথিত এই মানসোদ্ভেদ তীর্থ। মণিভদ্রাশ্রম। এরই পশ্চিমদিকে চড়াই-পথে বসুধারা। পুরাণে তারও উল্লেখ আছে। মানাগ্রামের কাছে পাণ্ডারা অনেক কিছুই দর্শনীয় দেখান। বহু উঁচু এক পাহাড়ের গায়ে কালো রঙ-এর বিচিত্র রেখা—অনেকটা ঘোড়ার আকারের—দেখিয়ে বলেন, ঐ শ্যামঘোটক। শ্রীকৃষ্ণ কৈলাস-যাত্রা শেষ করে ফিরছেন। তিব্বতে থোলিং মঠে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সেখানে দেখেন তিব্বতীরা জম্বু-মাংস নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করছে। তাই দেখতে পেয়েই তিনি উচ্চৈঃশ্রবায় চড়ে তখুনি এখানে চলে আসেন এবং নারায়ণে লুপ্ত হন। অশ্বটি লিপ্ত হয়ে থাকে ঐ হিমালয়ের গায়ে। গ্রামের একপাশে একটা বিরাট পাথরের স্তূপ, দেখলে মনে হয় স্তরে স্তরে জমে আছে। পাণ্ডারা বলেন, ব্যাস পুস্তক—ব্যাসদেবের সব পুঁথি। এই শুনি, ব্যাসভূমি। কাছেই গণেশগুম্ফা। পাণ্ডাজি হেসে বলেন, তিনি তো ব্যাসদেবের স্টেনো ছিলেন! আরও কত কি! মনে পড়ে, কুলু উপত্যকার পথেও ঐ ধরনের একটি প্রস্তরস্তূপ দেখিয়ে ব্যাসদেবের পুঁথির কাহিনী সেখানকার অধিবাসীরাও শুনিয়েছিল।

ভাবি, ব্যাসদেবের সঠিক ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব থাকলেও তাঁর স্মৃতি ভারতবাসীর অন্তরে সর্বত্র জেগে আছে। যেন তাঁর রক্তমাংসের শরীর এই সেদিন চলে গেছে, ভূর্জপাতার পুঁথিগুলি এখন পাথর হয়ে জমে আছে। ভারতবাসী মাত্রেই ভাবতে আনন্দ পায়, ব্যাসদেব আমার স্বদেশবাসী. আমার ঘরের পাশে তাঁর ঠাঁই। তাই বুঝি দেখি, ভারতের বহুস্থানে ছড়ানো—ব্যাসভূমি।

মানাগ্রামের কিছু নীচেই অলকানন্দার সঙ্গে সরস্বতীর সঙ্গম। কেশব প্রয়াগ। সরস্বতী সোজা নেমে আসছেন, অলকানন্দার ধারা বাঁদিকের উপত্যকা দিয়ে বয়ে এসেছেন। অলকানন্দার সেই ধারা ধরে আমাদের গতিপথ। ওপারে দূরে মানাগ্রামের বাড়িগুলি আঁকা ছবির মত পড়ে থাকে। এপারে পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। চারিপাশে গমের ক্ষেত। ক্ষেত ঘিরে পাথর সাজিয়ে বুক-উঁচু পাঁচিল। দুই দিকে একটানা পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে সরু পথ। ফুট দুই মাত্র চওড়া হবে। যেন গ্রামের গলির মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলেছি। কখনও বা সেই পথ রোধ করে আর একটা পাঁচিল উঠেছে। সাজানো পাথরগুলি ধাপের কাজ করে; পাঁচিল ডিঙিয়ে সেখানে ক্ষেতের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়।

মানাগ্রামের প্রায় সামনাসামনি এপারে মাঠের মধ্যে ছোট একটি সাদা মন্দির। মাতামূর্তির। পৌরাণিক

ঋষি নর-নারায়ণের জননী। ঋষিদ্বয় বিষ্ণুর অবতার। মন্দিরের কাছাকাছি কোন লোকজনের বসতি নেই। অন্য কোন মন্দিরও নেই। একান্তে একাকিনী মাতা দেবী বিরাজ করছেন।

এই সম্পর্কে এক সুন্দর উপাখ্যান আছে।

ঋষি নর-নারায়ণ দুই ভাই গৃহত্যাগ করে যখন চলে আসেন তখন তাঁদের জননীর কাছে প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন মধ্যে মধ্যে সংবাদ দেবেন। কিন্তু একাগ্র তপস্যায় মগ্ন থাকায় মায়ের কাছে কোন খবর আর পাঠানো হয় না। বছরের পর বছর যায়, জনক-জননী উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। অবশেষে পিতা ধর্মরাজ ও মাতাদেবী তাঁদের সন্ধানে বার হন। বদরীনাথের কাছে তাঁদের আসতে দেখে নর-নারায়ণ চিন্তিত হয়ে ওঠেন—মা এসে তাঁদের তপস্যা-ক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করবেন। তাই তাঁরা দুজনে বদরী-ভূমির দুই দিকে—অলকানন্দার দুই কূলে—দুটি পর্বতের আকার পরিগ্রহ করে রইলেন। কিন্তু পরে মায়ের দুঃখে বিচলিত হয়ে ঋষি নারায়ণ তাঁর কাছে আসেন এবং বদরিকাশ্রমের নিকট মায়ের বসবাসের সম্মতি দেন। সেই থেকে মাতা-মূর্তি জনহীন প্রান্তরে একাকিনী এই ছোট মন্দিরে অধিষ্ঠান করছেন। দৈনন্দিন সেবা-পূজার কোন নিয়ম নেই, ব্যবস্থাও নেই। সারা বছর মন্দির বন্ধই থাকে। বছরের একদিন মাত্র—বামন দ্বাদশীর দিন—পুত্র নারায়ণ আসেন মায়ের কাছে। বদরীনাথের মন্দির থেকে নারায়ণের ভোগমূর্তি—উদ্ধবদেব বিরাট শোভাযাত্রা করে আসেন। এখানে প্রকাণ্ড মেলা বসে। নারায়ণের প্রধান পূজারী রাওয়াল নিজে এসে মাতার পূজা করেন। বিশেষ ভোগ হয়। বিশ্বকল্যাণের জন্যে হোম-অগ্নি জ্বলে। দিনশেষে মাতাপুত্রের একদিনের মিলন-উৎসব সাঙ্গ হয়। ভগবান নারায়ণ আবার নিজ বৃহৎ মন্দিরে অগণিত ভক্তবৃন্দ নিয়ে ফিরে যান। মাতার ক্ষুদ্র মন্দিরের ক্ষণিক-খোলা দুয়ার আবার বন্ধ হয়। পুত্রের মঙ্গলকামী জননী বোধ করি আবার বৎসরের নিঃসঙ্গ নিরম্বু উপবাসের দিনগুলি গুনতে বসেন।

সাধারণ বিশ্বাস, এখানে বসে ধ্যান করলে গৃহস্থের বিপথগামী সন্তান সৎপথে ফিরে আসে; সংসার-আসক্ত মন মায়ার বাঁধন কাটিয়ে বৈরাগ্যের সন্ধানও পায়।

মন্দিরের দরজার ফাঁক দিয়ে মাতার দর্শন করি। পাথরের মূর্তি। মনে হয় অধরপ্রান্তে যেন ম্লান অথচ মধুর হাসির অস্ফুট রেখা। ভাবি পাথর বলেই বোধ করি এত সইতে পারেন, জননী বলেই অত স্বল্পেই তৃপ্তির হাসি ফোটে।

মন্দিরে প্রণাম করি। মন ভরে, মাথা পেতে মায়ের আশীর্বাদ নিই। আবার পথ চলি।

মনে আসে অনেক দিন আগেকার এক ঘটনা।

বাংলা দেশের এক শহরে গিয়েছি। সেখানকার এক বড় জমিদারির মালিকদের মধ্যে মামলা শুরু হয়েছে। মাত্র দু'পুরুষ আগে এই জমিদারি গড়ে ওঠে। বিপুল সম্পত্তি। জমিদার জীবিতকালে রাজা উপাধি পান। তাঁর পুত্র-পৌত্রগণও সেই সূত্রে তখনও 'কুমার' বলে পরিচিত। নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের বিষে যখন জর্জরিত হয়ে উঠেছে, তখন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পত্তি বাঁচাবার জন্যে দখল নিতে যাওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। শহরের কাজগুলি শেষ হলে এক বৃদ্ধ কর্মচারীর কাছে শুনলাম, শহর থেকে কিছুদূরে সেই রাজাবাহাদুরের সময়ের আর এক বৃহৎ অট্টালিকা আছে। সেটি দেবোত্তর, তাই এই মামলার বিষয়ীভূত নয়। সেইখানে এখনও বৃদ্ধা রাজরানী একাকিনী বাস করেন। দেবোত্তরের অবস্থা শোচনীয়। সেই রানীমারও এখন কেউ খোঁজখবর নেন না। প্রাসাদ, মন্দির সব ভেঙে পড়ছে। অথচ সেই প্রাসাদের কারুকার্য, রূপার আসবাবপত্র এককালে দর্শনীয় বস্তু ছিল। এখনও অনেক কিছু পড়ে আছে, শুনি।

প্রয়োজন না থাকলেও, দেখার আগ্রহ জাগে। মনে বিশেষ করে কৌতূহল তোলে সেই রাজরানীর নিঃসঙ্গ জীবন কাটানোর কাহিনী। বৃদ্ধ কর্মচারীকে নিয়ে দেখতে যাই।

শহর থেকে বেশ দূরে। দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে। বড় বড় গাছের বন হয়ে আছে। আম কাঁঠাল ইত্যাদি নানান ফলের ও বহুবিধ ফুলের এককালীন সাজানো বাগান এখন ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। তারই মধ্যে মাথা তুলে এক বিপুল অট্টালিকা এবং ঊর্ধ্বমুখী এক মন্দিরচূড়া। গাছগুলির উপরে বহু দূর থেকে দেখা যায়। দেখে মনে পড়ে, ইন্দো-চায়নায় দেখা ঘন বনের মধ্যে আঙ্কোর ভাট্-এর বিস্ময়কর

মন্দির-নগরের দূর থেকে দৃশ্য। কী মহান্, অথচ কী করুণ! যেন অতীত গৌরবের নিভে-যাওয়া চিতার ঘন কালো ধূমরাশির জমাট কুণ্ডলী।

বিকেলবেলা। তবুও, মনে হয় সন্ধ্যার আবছায়া নেমেছে।

প্রাসাদের বাইরে ইঁটের সূক্ষ্ম কারুকার্য ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এখনও আত্মগরিমা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বিস্মিত হয়ে দেখি।

কর্মচারী বলেন, উপরে চলুন। ঘরের আসবাবপত্র দেখবেন। সাবধানে দেখে উঠবেন। চারপাশে ভাঙা ইঁট, ঝোপঝাপ। সাপের বাসা।

উপরের ঘরে ঢুকে চমকে উঠি। রূপার তৈরি সোফা-সেট। ঘরের মাঝখানে রূপার পালঙ্ক। কিন্তু ও কী! দেওয়ালের গায়ে গায়ে, খাটের রূপার ছতরী ঘিরে প্রকাণ্ড সাপ জড়িয়ে আছে!

কর্মচারী বলেন, এগিয়ে চলুন। ওগুলো সাপ নয়। দেওয়াল বেয়ে, ছাদ থেকে ঘরের চারিদিকে ওসব বট-অশ্বত্থের ঝুরি নেমেছে। রুপোর পাকে পাকে ঝুরির পাক খেলেছে।

সত্যই তাই। কালের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! বিগত কালের রাজার ধনদৌলত-সুখসম্পদের জাজ্বল্যমান প্রতীকগুলিকে মহাকাল ধ্বংসের নাগপাশে বেষ্টন করেছে। মানুষের গড়া কত আশা-আকাঙ্ক্ষায় সাজানো সংসার—এই তার চিরন্তন পরিণতি। মানুষ গড়ে, কাল ভাঙে। তবু মানুষ আবার গড়ে। আবার কাল ভাঙে। ভাঙা-গড়ার নাগর-দোলায় মানব-শিশুকে বসিয়ে মহাকাল ঘোরাতে থাকেন।

কিন্তু ভাবি, রাজরানী থাকেন কোথায়? একবার দেখা হয় না? কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করি। দর্শনের ব্যবস্থা হয়। শুনি, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। রানীর সাজসজ্জায় সময় নেবে।

কর্মচারী ম্লান হেসে বলেন, রাজবেশের আয়োজন নয়। একরকম বিবস্ত্রই থাকেন। কয়েক বছর আগে পক্ষাঘাত হয়েছিল। শরীরের একটা অংশ পড়ে গেছে। বয়সও হয়েছে আশীর কাছাকাছি। কাছে সব সময়ে থাকেন ওঁর এক বহুকালের পরিচারিকা। সব কাজ দেখাশুনা তিনি একাই করেন। এই দুঃখদৈন্যের দিনেও ছেড়ে যান নি। রানীমা ওঁকে মেয়ের মত মানুষ করেছিলেন, ভালো বিবাহও দিয়েছিলেন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই বিধবা হয়ে ফিরে আসেন। সেই থেকে ওঁর নিত্য সহচরী হয়ে আছেন। আমরা দু-একজন পুরানো কর্মচারী মাঝে মাঝে আসি। রানীমা এখান থেকে কোথাও যেতে চান না।

শারীরিক অবস্থার কথা শুনে বলি, ওঁকে তবে বিরক্ত করে কাজ নেই। দেখা না করাই ভালো।

কর্মচারী জানান, দেখা করলে তিনি খুশীই হবেন। আর এখন একবার খবর দিয়ে দেখা না করে গেলে মনে আঘাত পাবেন। কেউ তো আসে না দেখা করতে। একমাত্র ছেলে—কুমার বাহাদুর—বছর পনেরো হল হঠাৎ মারা গেলেন, আগে তাঁর কাছেই থাকতেন। এখন নাতি-নাতনীরা আছে, কলকাতাতেই থাকে। কখনও এদিকে মাড়ায় না। কোন খোঁজখবরও নেয় না। জমিদারির টাকা সেখানেই সব যাচ্ছে, খরচও হচ্ছে। শুনি, সে টাকায় রেস্-এর ঘোড়াও নাকি ছুটছে।

ভেঙে-পড়া বিরাট প্রাসাদের একপাশে একতলায় ছোট্ট দুটি ঘর। কোনরকমে বাসের উপযোগী করে রাখা। তারই সামনে বাঁধানো রোয়াক। সেইখানে একটি চেয়ারে রানীমাকে নিয়ে এসে বসিয়েছে। পরনে গরদের থান। পায়ের কাছে সামান্য অংশ দেখতে পাওয়া যায়। মাথার উপর দিয়ে সর্বাঙ্গে জড়ানো অতি সূক্ষ্ম কাজ-করা দামী শাল। কতক অংশ পোকায় কেটেছে, কোথাও বা ছিঁড়েছে। রানীমার একটি হাত অক্ষম, অপর হাতটি থরথর করে কাঁপছে। সারা অঙ্গ শালে ঢাকা। শুধু মুখখানি খোলা। কাঁচা সোনার রঙ শুনেছি আজ চোখে দেখি। ভাবি, রাজরানীর রূপ এমনি তো হওয়া চাই। মুখে জরা ও বার্ধক্যের বলিরেখা। তবুও, সাদা মুখ যেন জ্বলজ্বল করে। টানা চোখ দুটিতে শান্ত-করুণ দৃষ্টি।

শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন করি। আর একটি চেয়ার পাশে রাখা ছিল, মৃদু কণ্ঠে বলেন, বসো। তোমার আসার কারণ সব শুনলাম। দেখো, যদি সম্পত্তি বাঁচে—এ আমার স্বামীর নিজের হাতে সব গড়া। আমিও যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলাম। মনে হয়, সেদিনের কথা। চোখের সুমুখে কি পরিবর্তনই না দেখলাম!

পুরানো দিনের গল্প করেন। কথার তুলিতে, ভাবের আবেগে যেন ছবি ফুটে ওঠে। একদিনের ঘটনা বলেন :

তখন সবে নতুন মোটর আমদানি হয়েছে। রাজাবাহাদুরের কেনার শখ হল। এক মহালের প্রজাদের কাছে টাকা তোলা হল। নতুন মোটর এল। তাতে চড়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। প্রজারা গ্রাম থেকে দলে দলে দেখতে আসে। ঘোড়া নেই, তবু গাড়ি ছোটে। আশ্চর্য ব্যাপার। আমি থাকি অন্দরমহলে। লোকের মুখে গল্প শুনি। সে-বছর পূজার সময় আর এক বড় মহালের বহু প্রজা এসেছে। ভোগ প্রসাদ পাবে। প্রকাণ্ড উঠানে সারি বেঁধে খেতে বসেছে। পরিবেশন করতে কোমরে কাপড় জড়িয়ে হাতা হাতে আমি বেরিয়ে এলাম। নিজের হাতে একধার থেকে দিতে শুরু করেছি। চারিদিকে চাঞ্চল্য জাগল—'এ কী। রানীমা আপনি নিজে? এ কি করছেন?'—আমি তখনই অভিমান দেখিয়ে উত্তর দিই, 'আমি তো তোদের গরিব রানী। তোদের রাজাকে তাঁর প্রজারা মোটর কিনে চড়তে দেয়—আমাকে কে কি দেয়? আমি তোদের গরিব মা!'—কিছুদিনের মধ্যেই সেই মহালের প্রজারা ক'হাজার টাকা তুলে আমার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে গেল। সেই টাকাতেই এই এখানকার সম্পত্তি কেনা, দেবোত্তর করা, আমার শ্যামরায়ের ঝোলা ঝোলানো।

চুপ করে শুনি। কথা বলে ক্লান্ত হন। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। ভাবি, অক্টোপাস-এর মত আঁকড়ে ধরে মন্দিরের গা বেয়ে যে বিরাট অশ্বত্থ গাছটি উঠেছে—তাই কি দেখছেন?

নাতিদের কথা তুলি। শুনেই বলেন, আহা! তারা শহরে থাকে। ছেলেমানুষ। নানা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সময় পায় না; তাই আসতে পারে না। যেখানেই থাক ভালো থাকলেই আমি খুশী। সময় পেলে নিশ্চয় আসবে। আমি এখানে আমার শ্যামরায়কে নিয়ে আছি।

কোন অভিযোগ নেই, কথার ফাঁকে কোন অভিমানও নেই। ঠোঁটের কোণে যেন করুণ হাসির রেখা ফোটে। অথচ কি নিঃসঙ্গ, নিদারুণ, দুঃখের দিনগুলি কাটান।

বেশিক্ষণ বসি না। এমন ভাবে বসে থাকায়, কথা বলায় তিনি কষ্ট বোধ করেন, দেখি। আবার অভিবাদন করে চলে আসি। কিন্তু স্মৃতিপটে সেই মাতৃমূর্তির ম্লান অথচ মধুর ছবিখানি চিরতরে আঁকা হয়ে থাকে।

॥ ১৩ ॥

মাতা-মূর্তির মন্দির ছাড়িয়ে এগিয়ে এসেছি।

ওপারে বসুধারা দেখা যায়। ওরই কাছে মাতা-মূর্তির পতি ধর্মরাজের তপস্যাভূমি। কেউ বলে, অষ্টবসুরও সাধনাস্থল। পাহাড়ের বহু উপর থেকে এক জলধারা লাফিয়ে পড়ছে। প্রায় চারশত ফুট উঁচু থেকে। নামার পথে বাতাসের বেগে জলের রাশি অসংখ্য কণায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, উড়ে যায়। সূর্যের আলো সেই বাষ্পমণ্ডলীতে প্রতিফলিত হলে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র রঙের ছটা ফোটে।

মনে পড়ে, ক'বছর আগে ঐ জলধারার পাদমূলে সেই স্বর্গীয় শোভা প্রাণভরে পান করেছিলেন।

আজ এপার দিয়ে যেতে পাহাড়ের বুকে সেই ধারার উচ্ছ্বাসধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনি।

আনন্দে চমকে উঠি—যেন অতি-প্রিয়জনের হঠাৎ-শোনা কণ্ঠস্বর।

বেশি চড়াই-উৎরাই এখনও আসে নি। তবে অলকানন্দার বিস্তৃতি শীর্ণ হয়ে আসছে। বাঁ দিকের গিরিশ্রেণীও অতি নিকটে এগিয়ে এসেছে। এবার আর মাঠ-ক্ষেতের উপর দিয়ে পথ নয়, পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলেছি। বাঁদিকে পাহাড়ের গা উঁচু দেওয়ালের মত উঠে গেছে, ডানদিকে সোজা নেমে গেছে নদীর জলে। প্রায় চার-পাঁচশো হাত নীচে। তবুও যাবার মত চওড়া পথ আছে। তাই নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলি। একটা মোড় ঘুরে দেখি, উদয়সিংরা চারজন দাঁড়িয়ে আছে। পিঠের উপর বোঝা নেই, কাছেও কোথাও রাখা নেই।

শিশিরবাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপার কি? এরা এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে? মালও দেখছি না?

বিদ্যা জানায়, সামনে একটু পরেই দেখবেন, পাহাড় একেবারে ধসে পড়ে আছে। 'বহুৎ খতরনাক' জায়গা আছে। তাই ওদের বলে দিয়েছিলাম, আগে গিয়ে সেই জায়গাটায় মালপত্র পার করে রেখে দিয়ে যেন ফিরে আসে। আপনাদের ওখানটায় যাবার সময় ওদের সাহায্য দরকার হতে পারে।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, স্থানটা একটু বিপদসঙ্কুলই বটে।

পাহাড়ের মাথা থেকে প্রকাণ্ড একটা ধস নেমে সোজা নদীর মধ্যে পড়েছে। পার হতে হবে

সোজাসুজিই। নীচে নামবার উপায় নেই, উপরে ওঠবারও পথ নেই। বিদ্যা বলে, এ জায়গা প্রতি বছরই ভাঙে, এ বছরও ভেঙেছে। এইটুকুই সাবধানে পার হয়ে যেতে পারলে হল—তারপর আর কোন ভয় নেই।

শিশিরবাবু ভুরু কুঁচকে বলেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু এখানটা যাওয়া যাবে কি করে? পা রাখবার কোন জায়গাই তো দেখছি না! সোজা ভাঙা পাহাড়ের গা, ফসকালে একবারে ঐ তো নীচে নদীর মধ্যে। বোধ হয় সাত-আটশো ফুট হবে, কি বলেন?

বলব আর কি?

বিদ্যা সাবধান করে দেয়, ওদিকে তাকাবেন না। আসুন হাত-ধরাধরি করে পার করিয়ে দিই। শুধু পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। কোন ভয় নেই।

জানি, এটা ওর মুখের আশ্বাস-বাণী নয়, অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। বিপদ কোন কিছু ঘটবে না।

কেন জানি না, আমাদেরও মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে। কোথা থেকে এই অগাধ নির্ভরতা আসে, কেনই বা আসে—তার উত্তর খুঁজে পাই না। মনে মনে শুধু বুঝি যত দুর্গমই হোক—সব পথ নিশ্চয়ই পার হয়ে যাব।

যাই-ও তাই। কেমন করে আসি ঠিক বুঝি না। দেখি, সেই চার-পাঁচশত হাতের ব্যবধান যে দুর্গমতার সৃষ্টি করেছে, এরা কয়জনে যেন তার পারাপারের সেতু হয়ে দাঁড়ায়—সামনে, পেছনে, পাশে হাত ধরে—একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করে পার হয়ে আসি। যেন লোফালুফি করে একটা বল এধার থেকে ওধারে নিয়ে গেল। মাটিতে পা ছিল বটে, কিন্তু পায়ের তলায় জোর ছিল না, বালি-মাটি-পাথর ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে যাচ্ছিল। তবুও তারা তাদের নিজেদের পা এগিয়ে দিয়ে কেমন জোর করে রাখে, বলে, এরই ওপর পা রেখে নির্ভয়ে ভর দিয়ে চলুন—, আমার পায়ে কিছু লাগবে না—চলুন আপনি।—গিয়েছিও কোথাও তাই। তারা যে কেমন ভাবে নিজেরা দাঁড়িয়ে ছিল, বুঝলাম না।

বুঝি নি তখন, কিন্তু বুঝেছিলাম ফেরার সময়। তখন আর অমন দুর্গম মনে হয় নি, অত সাহায্যেরও প্রয়োজন হয়নি। ততদিনে এ-ধরনের ভাঙা পাহাড় দিয়ে চলা অভ্যেস হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতায় ও তাদের দেখে তখন শিখেছি—সেই ঝরা বালি মাটি ও পাথরের উপর প্রথমে পায়ের জুতার চাপ দিয়ে কেমন পাটুকু রাখার মত নির্ভরযোগ্য স্থান করে নেওয়া যায়, এক হাতে পাহাড়ের গা ধরে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা চলে। তাই ফেরবার পথে শুধু একজনই পাশে এসেছিল সতর্কতার জন্যে। পার হতে সময়ও লেগেছিল অল্প।

বেশ বুঝি, ভয় মাত্রেই মানসিক বিকার। অন্ধকারের ভয় আলোয় কেমন কেটে যায়।

লক্ষ্মীবন।

পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। কিছু আগে ছাড়িয়ে এসেছি—চম্‌তোলী। সেখানেও খানিকটা সমতল ক্ষেত্র, একটি গুহা। কিন্তু আজ তাঁবু ফেলা হবে এইখানে—লক্ষ্মীবনে। বেলা থাকতে এসে পৌঁছেছি। সেই ভাঙা পথটুকু ছাড়া আর কোথাও দেরি হয় নি। চড়াইও পাই নি। শুনি, বদরীনাথ থেকে এসেছি আজ সাড়ে সাত মাইল।

লক্ষ্মীদেবী এখানে তপস্যা করেছিলেন, তাই নাম লক্ষ্মীবন। তপস্যা এখানে করুন বা না করুন, এই নামকরণের সার্থকতা আছে। বদরীনাথ ছাড়ার পর কোথাও গাছ নেই। চারিদিকে শুধু পাহাড় ও পাথর। এইখানে এসে দেখি, অল্প নীচে—অলকানন্দার তীরে কতকগুলি গাছের ঝোপ। ভূর্জবৃক্ষের বন। সেখানটায় শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। ভূর্জগাছের সাদা সাদা ডাল। এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে আছে। রক্তাভ বল্কলগুলি রঙিন কাগজের মত ডালে ডালে আঁকড়ে রয়েছে, কোথাও বা খুলে ঝুলছে। একটু টানলেই পরতে পরতে পাক খুলে উঠে আসে। ছালগুলির গায়ে লাল ও সাদা রঙের বিচিত্র চিত্রণ—যেন শ্বেত ও রক্তচন্দনের ফোঁটা ছড়ানো। মনে পড়ে 'কুমারসম্ভবে'র বর্ণনা—'ভূর্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোনাঃ'। বনের ছায়া ছুঁয়ে অলকানন্দার একটি ক্ষীণ ধারা বয়ে চলেছে। জলস্রোতের কলকল ধ্বনি। গাছের শাখায় শাখায় পাখিদের কলকাকলী। পরপারে তুষারমৌলী গিরিশ্রেণী। তারই একটির বুকে দীর্ঘ সরল

শ্বেতরেখা। দূর থেকে দেখা বসুধারা। নীচের দিকে আবছায়া—বাতাসে উড়ে-যাওয়া জলকণার বাষ্পমণ্ডলী। যেন, শ্বেতবরণী দীর্ঘাঙ্গিনী সুর-সুন্দরী—সূক্ষ্ম-রেশমী-ঘাগরা-পরা!

চরিদিকে স্তব্ধ কঠোর গিরিশ্রেণী। তারই মধ্যে, চকিত চরণে নামে লক্ষ্মীশ্রী। শৈলকাননশোভিতা।

একটা পাথরের উপর আমরা দুজনে বসি। হঠাৎ কোথা থেকে মেঘ উড়ে আসে। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি নামে। কন্‌কনে হাওয়া ছোটে।

শিশিরবাবু চিন্তিত হয়ে বলেন, উদয়সিংদের দেখা নেই এখনও। মাল এসে পৌঁছুল না। তাঁবু খাটালে তার মধ্যে বসা যেত।

বিদ্যা ছুটে আসে। বলে, জলের মধ্যে বসে ভিজবেন না, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে। উঠে চলুন। ঐ গুহার ভেতরটা পরিষ্কার করে এলাম—ঐখানে আপাতত বসবেন।

চারিদিকে বড় বড় পাথর ছড়ানো। তাদেরই ভেতর এখানে ওখানে চার-পাঁচটি গুহা। খুব বড় না হলেও দু-তিনজন করে থাকা চলে। মাথা সোজা করে ভেতরে সব জায়গায় দাঁড়ানো সম্ভব না হলেও—স্বচ্ছন্দে বসে থাকা বা শোয়া যায়। গুহার মুখগুলি খোলা। অবস্থা বুঝে গুহার ব্যবস্থা করতে হয়—কোন্ দিক দিয়ে বাতাস বইছে, কোন্ গুহায় ঠাণ্ডা বাতাস বেশি ঢোকার আশঙ্কা, কোন্ গুহার মেঝে উঁচু-নীচু পাথরে অসমতল কম।

দেখেশুনেই একটি গুহার ভিতর বিদ্যা পরিষ্কার করেছে। আমাদের একটা বর্ষাতি পেতেছে। বলে, এখন এখানে বসুন। মালপত্র এলে তাঁবু খাটানো যাবে। উদয়সিংরা মাঝপথে নিশ্চয় কোথাও বসে গেছে, নইলে এখনও দেখা নেই কেন? এসে বলবে, জিনিসপত্র পাছে ভিজে যায় তাই অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু আদত ব্যাপারটা, ভেড়া-ছাগল চরাতে কোন গ্রামবাসীরা হয়ত এ-অঞ্চলে এসেছে—তাদেরই কোন দলের সঙ্গে দেখা হয়েছে, বসে গেছে ছিলিম খেতে।

আমরা বলি, তা থাক্। ঐ ভারী বোঝা নিয়ে চলা—কম কষ্ট নয় তো! আমরা খাসা আসছি খালি হাতে!

বিদ্যা ঝোলা থেকে নিমকি, গজা বার করে দেয়। ফ্ল্যাস্ক থেকে জল ঢালে। আমরা দুজনে খাই। তাকেও দিই।

শিশিরবাবু সহসা চেঁচিয়ে ওঠেন, দেখুন ভাল্লুক নাকি?

ভাল্লুকের মতই বটে, তবে ভাল্লুক নয়। গুহার মুখের কাছে এসে দাঁড়ায় প্রকাণ্ড এক কুকুর। কালো রঙ। গা-ভরা ঝাঁকড়া লোম। তিব্বতী মাস্টিফ। বাইরে দাঁড়িয়ে একবার গা-ঝাড়া দেয়, সর্বাঙ্গ থেকে ফুলঝুরির মত বৃষ্টির ফোঁটাগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর বলা-কওয়া নেই, কোন সঙ্কোচ বা ভয় নেই, ভেতরে ঢুকে এসে বসে—একেবারে আমাদের গায়ে গা ঠেকিয়ে।

বিদ্যা একটা পাথর তুলে তাড়া দিয়ে তাড়িয়ে দিতে যায়। কুকুরটির মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন আমাদের মায়া জাগে। অমন ভীষণ শরীর—দেখলে ভয় লাগার কথা। কিন্তু মুখ তুলে যখন আমাদের দিকে তাকায়—দেখি, কি শান্ত চোখের দৃষ্টি। হিংস্রতার লেশমাত্র নেই। চোখের ভাষায় যেন মনে হয়, বলে, এই যে, তোমরা পৌঁছে গেছ! এসো, একটু ঘেঁষাঘেঁষি বসা যাক—উঃ, যা শীত!

শিশিরবাবু বলেন, এ যে এসে বসল—যেন কতকালের পরিচয়! কার কুকুর এটা—কোত্থেকে এলো? উদয়সিংদের কারও হবে নিশ্চয়!

বিদ্যা বলে, কই, তাদের সঙ্গে তো কোন কুকুর দেখি নি?

শিশিরবাবু বলেন, দাঁড়া, তোকেও কিছু খেতে দিই। বলে পকেট থেকে দু'টুকরা বিস্কুট বার করে দেন। কুকুরটি তখনই খায়। লম্বা লক্‌লকে জিব বার করে নিজের পা চাটতে থাকে। আনন্দে লেজ নাড়ে। আমাদের মুখের পানে মুখ তুলে তাকায়। আরও নিবিড় হয়ে ঘেঁষে বসে। তারপর ছড়ানো সামনের পা দুটোর মধ্যে মাথা গুঁজে আরামে চোখ বোজে।

কৈলাস-মানসসরোবরে পথের একদিনের এক ঘটনা মনে আসে। সঙ্গে এক শ্রদ্ধেয় স্বামীজি ছিলেন। তিনি তার আগেও তিনবার কৈলাস ঘুরে এসেছেন। অনেক বছর ঐ হিমালয় অঞ্চলে কাটিয়েছেন। তাঁর বহুমুখী অভিজ্ঞতা, দুর্জয় সাহস। হিমালয়ের সেই দুর্গম পথে তার প্রমাণও পাই। অবাক হয়ে দেখি, ছোট্ট

এতটুকু মানুষ, কিন্তু মনের কি জোর! হঠাৎ একদিন তাঁরই মধ্যে আর এক চেহারা দেখলাম। সেদিন পথের ধারে তিব্বতীদের একটা তাঁবুর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁদের ভীষণাকার কুকুরটা চিৎকার করে ছুটে এল। সকলেই ভয় পেলাম। পাবারই কথা। তবু তারই মধ্যে যথাসম্ভব দূরত্ব রেখে লাঠি উঠিয়ে আমরা পার হয়ে এলাম। স্বামীজি, কিন্তু কোনমতেই এলেন না। আমাদের তিব্বতী গাইডকে দিয়ে কুকুরটাকে পথের পাশ থেকে দূরে সরিয়ে তবে এলেন। সেদিন হঠাৎ তাঁর মুখে ভয়ের পাণ্ডুর ছায়া দেখেছিলাম—ছোট ছেলের ভয় পাওয়ার মত। আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শুনি, একবার তাঁকে কুকুরে কামড়েছিল: তাই এই অতি-সতর্কতা।

ভয় জাগে এমনি ভাবেই। পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়।

বৃষ্টি থেমেছে। ফোঁটা কয়েক পড়েই বন্ধ হয়েছে। উদয়সিংরা এসে পৌঁছল। বিদ্যা এরই মধ্যে গুহার কাছে একটু জায়গা পরিষ্কার করে রেখেছিল। দেখতে দেখতে সেখানে তাঁবু পড়ে। তাঁবুর তিনদিক মাটির ভেতর গুঁজে দেওয়া হয়। তারপর তাঁবু ঘিরে চারপাশে বিঘতখানেক নীচু ছোট্ট পরিখামতো কাটা হয়। বিদ্যা বলে, এ-সব জায়গায় ঠিক নেই—যে-কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। তাঁবুর গায়ের জল এ নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা হলে, শিশিরবাবুর সঙ্গে চলি রান্নামহলে। একটি স্বতন্ত্র গুহায় উনুন জ্বালার ব্যবস্থা হয়েছে। উদয়সিং কতকগুলো শুকনো কাঠ দিয়ে আগুন জ্বেলেছে। রতনসিং এসে ঢোকে। কাঁধের উপর কেরোসিন তেলের একটা টিন। কিছুদূরের ঝরনা থেকে খাবারজল ভরে এনেছে।

শিশিরবাবু সন্দিগ্ধ হয়ে বলেন, টিন-এ তেলের গন্ধ নেই তো?

বিদ্যা হেসে জানায়, বদরীনাথ থেকে আনার আগে ভালো করে ধুইয়ে এনেছি।

পান সিং আসে। কাঁধের উপর একরাশ শুকনো কাঠ, ডালপালা। সত্যই তো, এখানে যখন কাঠ পাওয়া যায়, অযথা কয়লা খরচ করে লাভ কি?

নাম-ভোলা ছোকরাটি একটা কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে আসে। উদয়সিং-এর হাতে এগিয়ে দেয়। উদয়সিং তামাকু খেতে বসে। সর্দারের হাত থেকে অন্য সকলে প্রসাদ পাবে।

উনানের উপর চায়ের প্রকাণ্ড কেটলি চাপে। চা তৈরি হলে সবাই মিলে চা খাই।—তাঁবুতে ফিরে এসে আবার এক কাপ করে চেয়ে পাঠাই। আনতে আনতে জুড়িয়ে যায়।

কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে শিশিরবাবুর হঠাৎ মনে পড়ে, তাই তো! কুকুরটার কথা জিজ্ঞাসা করা হল না?

বিদ্যা বলে, আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। ওদের কারও নয়। হয়তো কাছাকাছি ভেড়া-ছাগল চরাতে কেউ এসেছে—ফিরে গেছে নিশ্চয় এতক্ষণে।

সন্ধ্যার মধ্যেই খাওয়া সারা। বাইরে কন্‌কনে শীত। তাঁবুর দরজা ভালো ভাবে বন্ধ করে শুয়ে পড়ি, কোনদিকে বাতাস ঢোকার যেন ছিদ্র পর্যন্ত না থাকে। দিব্য আরামে রাত কাটে। তাঁবুর মধ্যে তেমন শীতবোধ হয় না।

ভোর হয়েছে। শিশিরবাবু তাঁবুর বাইরে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, আরে তুই এখানে শুয়ে! সারারাত এই শীতের মধ্যে!

জিজ্ঞাসা করি, কার সঙ্গে কথা হচ্ছে?

শিশিরবাবু বলেন, সেই কুকুরটা। তাঁবুর দরজার বাইরে সারারাত শুয়ে ছিল। গায়ের ওপর গুঁড়ো গুঁড়ো জলের কণা জমে গেছে দেখছি।

কুকুরট গা-ঝাড়া দেয়। শব্দ পাই।

শিশিরবাবুর গলা শুনি, আরে আবার আমার সঙ্গে চললি কোথায় এখন?—আচ্ছা আয়।—চেঁচিয়ে আমাকে বলেন, মহাপ্রস্থানের পথ। একটা কুকুর সঙ্গে না থাকলে যাত্রা পূর্ণাঙ্গ হত না—এ চমৎকার হল।

দশটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁবু তুলে আবার যাত্রা।

এসব অঞ্চলে রোদের তত তেজ নেই। তাই আহারের পাট চুকিয়ে সারাদিন হাঁটার নিয়ম,—তাতে

যতদূর যাওয়া যায়। দিনের মধ্যে আবার জিনিসপত্র খোলা, তাঁবু খাটানো—এ সকলের হাঙ্গামা থাকে না। লম্বা একটানা সময় হাতে থাকে। যেন ছেলেদের হাতে লাটাই-ভরা সুতো। সুতো খোলে, ঘুড়ি আকাশে উঠতে থাকে, বাতাস থাকলেই হল। এখানে চলার দম ও মনের জোর থাকলেই হল।

লক্ষ্মীবন ছাড়ার আগে একটা গুহার মধ্যে কিছু আলু ও কাঠকয়লা রেখে আসা হয়, মাটি ও পাথর চাপা দিয়ে। ফেরবার পথে এখানে কাজে লাগবে। উদয়সিং-এরই এটা পরামর্শ,—মিথ্যে কেন এ কদিন বয়ে নিয়ে যাওয়া, আবার এখানে ফিরিয়ে আনা? ফেরার পথে যেখানে যা লাগবে, যাবার সময় সেখানে তা রেখে যাব।

শিশিরবাবু ভাণ্ডারী। তাই সতর্কতা আছে। জিজ্ঞাসা করেন, লোকসান যাবার ভয় নেই?

সকলে আশ্চর্য হয়। বলে নেবে কে? আর অন্যের জিনিস ছোঁবেই বা কেন? অসম্ভব!

ভাবি, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সম্ভব-অসম্ভবের ধারণা কেমন গড়ে ওঠে। শহর হলে বলতে হত, এ-ভাবে ফেলে রেখে যাওয়া, ফিরে এসে পাওয়া—অসম্ভব।

অলকানন্দার কিছু উপর দিয়ে চলেছি। সামনেই দেখছি, নদী আবার বাঁদিকে পাহাড়ের আড়ালে ঘুরে গেছে। সেইদিকে অলকানন্দার হিমবাহ (glacier) শুরু। বদরীনাথ ছাড়ার পর ঘোড়ার খুরের আকারে নদীর গতিপথ বেঁকে গেছে। বদরীনাথের নারায়ণ পর্বত ও নীলকণ্ঠ শিখর—মন্দিরের পিছনে দেখা যায়। আমাদের এখানেও যেতে হবে সেই সব পাহাড়েরই পাশ দিয়ে, তবে অপর দিকের অংশ বাঁ হাতে রেখে। অর্থাৎ নীলকণ্ঠ শিখরকে অর্ধ-পরিক্রমা করা হবে।

বাঁকের কাছে সামনে থেকে আর একটি প্রশস্ত হিমবাহ এসে অলকানন্দার হিমবাহের সঙ্গে মিশেছে, ভগীরথ খর্‌গ।

বহুদূরে সেই হিমবাহের শেষভাগে বরফের চূড়া দেখা যায়। শুনেছি, ঐ হিমবাহ ধরে গেলে পাঁচ-ছয় দিনে গোমুখে পৌঁছানো যায়। দুর্গম বরফের রাজ্যের মধ্য দিয়ে সে পথ। ঐ তুষার-শিখর ও হিমবাহগুলি থেকে অপর দিকে নেমে যাওয়া ধারাগুলি ভাগীরথী-গঙ্গার উৎস, আর এদিকে নেমে আসা ধারাগুলি অলকানন্দা-গঙ্গার নদীরূপ সৃষ্টি করছে।

সেই দুটি বিরাট হিমবাহের সমঙ্গস্থলে এসে পৌঁছুই। নদীর স্বচ্ছ নীল জলের চিহ্ন মেলে না। দুই দিকেই ছড়ানো ভাঙা পাথর ও ধূলা-মাটি-বালি মাখা বরফের স্তূপ। হিমবাহ দুটিকে দেখে মনে হয় যেন প্রাণহীন, রক্তহীন, বিবর্ণ দুই বাহুর মিলন। হাতে হাত মিলিয়ে দুই বিশাল কঙ্কালের মত পড়ে আছে। তারই মধ্যে কোথাও বা গলে-যাওয়া বরফের ফাঁকে আঁধার-ভরা গহ্বর। যেন কঙ্কালের দৃষ্টিহারা চোখের শূন্য কোটর। দয়ামায়াহীন মরণোত্তর এক জগতের সঙ্কেত দেয়।

বিদ্যার ডাকে চমক ভাঙে।

অলকানন্দার অপর পারে—হিমবাহ সঙ্গমের কিছু আগে—দুটি গিরিশ্রেণীর মধ্যস্থিত একটি পার্বত্যনদীর উপত্যকার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলে, ঐ ওদিকে দেখুন অলকাপুরী।

অলকাপুরী! নাম শুনেই মনে পুলক জাগে। মন-ভরা বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে উৎসুক দৃষ্টি দিই।

এপার থেকে দেখি গিরিশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে একটি ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণী শৈল-সোপান বেয়ে সর্পিল গতিতে নেমে এসেছে—অলকানন্দায় আত্মবিসর্জন দিতে। বহুদূরে উপত্যকার শেষ সীমায় তুষারশীর্ষ গিরিশিখর। সুনীল আকাশের পটে শ্বেত পাথরে গলা মন্দির-চূড়ার যেন আকৃতি আঁকা! তারই উপর একখণ্ড সাদা মেঘ যেন পতাকা উড়ায়। তখনই মনে আসে কবির বর্ণনা—

খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরেষু পদং ন্যস্ত গন্তাসি যত্র।
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাং চোপযুজ্য॥

ভাবি, ঐ কি সেই মেঘদূত? কবির কাব্য-সুধার সিঞ্চনে অমর হয়ে এখনও ওখানে বিরাজ করে! দেখি, শিখর ঘিরে নিম্নদেশ থেকে ধোঁয়ার মত কুয়াশার কুণ্ডলি ওঠে, মনে হয়, 'বাহ্যোদ্যানস্থিত হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌত হর্ম্য'গুলিতে বুঝি ধূপধুনার আরতি শুরু হল।

ঐ কি সম্মুখে—হংসদ্বার?—"ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম।"

ঐ পথেই কি বলাকাসারি উড়ে চলে মানসসরোবরে? প্রকৃতই তো, এরই অল্প দূরে মানা-গিরিসঙ্কট।

এখনও মানসে যাবার সেও এক পথ।

ঐ ক্ষীরধারা নির্ঝরিণীর উর্ধ্বগতি রেখাপথ কোথায় নিয়ে যায়? সত্যই কি সেই অলকাপুরীতে?

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্ট সংযোগ সাধ্যাৎ।

যেখানে শুধু আনন্দেই নয়নে অশ্রু ঝরায়। অন্য কোন কারণে নয়। যেখানে কুসুম শরেই শুধু মনস্তাপ জাগায়। অন্য কোন সন্তাপে নয়।

প্রকৃতই কি ওখানে :

যত্রোন্মত্ত ভ্রমরনিকরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাপ্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ।।

কবি কালিদাসের অমর অলকাপুরী। ধনপতি কুবেরের অক্ষয় সুখ-সম্পদ। অতুল রূপরাশি। বিরহী যক্ষের বিচ্ছেদ-ক্রন্দনের অশ্রুবাষ্পভরা।

সেই অলকাপুরীর সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে আজ মনে মনে আবার 'মেঘদূতে'র স্তুতি করি।

অকস্মাৎ অন্তরের অন্তঃপুরে গোপন দৃষ্টি পড়ে। সাশ্চর্যে দেখি, কোথায় সেই 'মেঘদূতে'র আনন্দ-দ্যুতি! এতদিন সেই কাব্যের মধুর ঝংকার ও অমৃত রস যে-মনে অসীম আনন্দের সঞ্চার করেছে, আজ সে-মনের সন্ধান পাই না।

সেই মহাকাব্যের 'নবঘনস্নিগ্ধছায়া' আজ মনে কোন মায়ার জাল বোনে না। অন্তরে সেখানে মাথা তুলে বসে এক গৃহত্যাগী মন। সম্মুখে শিবসুন্দরের শ্মশানক্ষেত্রের দিকে সে উন্মুখ নয়নে চেয়ে আছে। পাষাণ-হৃদয় হিমালয়ের কঠিন-কঠোর রূপ তাকে আকৃষ্ট করে। কামনার মোক্ষধাম—সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি—সেই অলকাপুরী এখন তার নয়নে কবিকল্পনার অঞ্জন মাথায় না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভোগ, মণি-মাণিক্যের চাকচিক্য—ক্ষুদ্র মানবের বিরহমিলনের মহান গীতিকাব্য,—সে যে 'শুধু স্বপ্ন ক্ষণপ্রভ'।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ আজ মহাপ্রস্থানের পথ। সেই হিমবাহের শ্মশানভূমির দিকে ধীরে ধীরে মন এগিয়ে চলে। 'মেঘদূতে'র মধুর সুর আজ আমার জীবনে প্রথম সুর হারায়।

॥ ১৪ ॥

অলকানন্দার হিমবাহে এসে পৌঁছেছি।

পথের উপরের বরফ এখন এখানে অনেক জায়গায় গলে গেছে। তবে চারিদিকে বরফের পাহাড়। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন এখনই তুষারস্তূপ নামিয়ে দিয়ে আবার সব ভরিয়ে দিতে পারে—এমনি উদ্ধত রুদ্রভাব।

বরফের খোলস ছেড়ে এখানে-ওখানে চারপাশে ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি পাথর। নানান আকারের, বিচিত্র বর্ণের।

এখানকার পাথরগুলির আকার, রঙ ও রেখার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশের পাথরগুলির মত এদের চাকচিক্য বা উজ্জ্বলতা নেই;—নিষ্প্রভ রুক্ষ শুষ্ক। দেখেই বোঝা যায়, তুষার-আবরণ এদের অভ্যস্ত জীবন। হিমরাজ্যের অধিবাসী বলে যেন আভিজাত্য প্রকাশ করে। মুক্ত রৌদ্র-বাতাসের স্পর্শ তাদের চমক লাগায়! আশেপাশে বরফ-গলা জলের ধারা কলকল রবে হেসে ওঠে। তাদের ঘিরে ঘিরে জলের স্রোত ছুটে চলে। এঁকেবেঁকে—ছলছল শব্দ তুলে—পাথরের উপর থেকে পাথরে লাফিয়ে।

আমরাও চলি পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে, ধারাগুলির পাশ দিয়ে। পায়ের জুতা যথাসম্ভব জল থেকে বাঁচিয়ে।

পথ-রেখা নেই। যেখান দিয়ে কোন রকমে যাওয়া যায়—সেইখান দিয়ে যাই, সেই আমাদের পথ। শুধু গন্তব্য-স্থানের দিকে দৃষ্টি আছে। বিদ্যা আঙুল দিয়ে দেখায়, ঐ—ঐদিকে আজ আমাদের তাঁবু পড়বে।

কিন্তু পথ দেখানোর অন্য লোকের আমাদের প্রয়োজন নেই।

সেই কুকুরটিই এগিয়ে চলেছে—পথ দেখিয়ে। খানিকটা ছুটে যায়। দাঁড়ায়। পিছনে ফিরে তাকায়। ঠিক আসছি দেখে আনন্দে লেজ নাড়ে। আবার এগিয়ে চলে। আবার দাঁড়ায়। ফিরে তাকায়। পেছিয়ে পড়েছি দেখে ছুটে ফিরে আসে কাছে। কিছুক্ষণ সঙ্গে চলে—আবার এগিয়ে যায়।

পথ জুড়ে বড় বড় পাথর পড়ে। হাতে ভর দিয়ে একটা পাথরের উপর উঠে আর একটা পাথরে ডিঙিয়ে চলি।

কুকুরটা অক্লেশে পাশের একটা বড় পাথরের উপর উঠে মাথা বেঁকিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমরা নির্বিঘ্নে পার হলে সে ছুটে নেমে আসে। লেজ নাড়তে নাড়তে হেলে-দুলে আবার এগিয়ে চলে।

শিশিরবাবু উৎসাহিত হয়ে বলেন, সাধে কি আর অত ওকে খাওয়াচ্ছি। ধর্ম চলে আয়, দুটো বিস্কুট খেয়ে যা!

হেসে বলি, ঘুষ দিয়ে ধর্ম রাখার চেষ্টা হচ্ছে তো? কিন্তু আশ্চর্য, কুকুরটা এল কোত্থেকে? আমাদের সঙ্গেই তো চলল দেখছি!

ধর্ম কিন্তু বিস্কুটের লোভে আসে না। চুপ করে দাঁড়িয়েছে। কান খাড়া। একদৃষ্টে একটা পাথরের দিকে তাকিয়ে আছে।

শিশিরবাবু বলেন, হল কি ওর? অমন করে দেখছে কি?

হঠাৎ তীরবেগে কুকুরটা ছুটে যায়।

ওর গতিপথ লক্ষ্য করে দেখি, অনতিদূরে ধূসর রঙের খরগোশ। মানসসরোবরের পথেও ঐ ধরনের দেখেছিলাম। পর্বত-মূষিক শ্রেণীর। হৃষ্টপুষ্ট কিন্তু লেজ নেই। কুকুরটার দিকে সেও মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। লম্বা দু-কান সোজা করে। অবাক দৃষ্টিতে। কুকুরটাকে হঠাৎ ছুটতে দেখে তার একাগ্রতা ভাঙে। স্প্রিং-এর মত লাফাতে লাফাতে সেও ছোটে, দুটো পাথরের মাঝখানে একটা গর্তে ঢুকে যায়। কুকুরটা সেখানে গিয়ে এদিক-ওদিক শুঁকতে থাকে, সামনের পা দুটো দিয়ে মাটি-বালি খোঁড়ে।

শিশিরবাবু ডাক দেন, ধর্ম! খুব হয়েছে, চলে আয় এদিকে। নিরীহ নিরামিষাশী একটি প্রাণী—আর তাকেই তুমি গেলে তাড়া করে! তোমার এখানেও সেই স্বভাব!

হেসে বলি, ভুলে গেলেন হিতোপদেশের শ্লোকটা—'শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা সঃ কিং নাশ্নাদুপানহম্।'

কুকুরটা মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে ফিরে আসে। লজ্জায় নয়, বোধ করি বিফলতার বিষণ্ণতায়। আবার পথ দেখিয়ে চলে। আমরাও এগিয়ে চলি। ফিরে দেখি, সেই পাথরটার কাছে খরগোশটা আবার বেরিয়েছে, পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে বসেছে, সামনের পা দুটো তুলে নাড়ছে, কানও নাচছে।

শিশিরবাবু বলেন, কুকুরটাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে!

কিছুক্ষণ থেকে জল পড়ার প্রচণ্ড শব্দ পাচ্ছিলাম, এবার তার কারণ বুঝলাম।

বাঁদিকে নীলকণ্ঠ পর্বত। তারই অঙ্গ বেয়ে বহু ধারা নেমেছে। দীর্ঘদিন যে তুষাররাশি পর্বতের অঙ্গীভূত হয়ে স্থির ও স্তব্ধ ছিল, গ্রীষ্মের খরতাপ সূর্যের সোনার কাঠির স্পর্শ পেয়ে সেই নির্ঝরিণীদের নিদ্রা ভেঙেছে।

আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের মাথা থেকে ধারাগুলি ধেয়ে নামে ধরণীর বুকে। মুক্তির উচ্ছ্বাস নিয়ে। স্তব্ধতার পাষাণ হৃদয় শতভাগে বিদীর্ণ করে তারা ছুটে চলে শ্যামল ধরিত্রীর দিকে, পৃথিবীর মানুষের আশা মেটাতে—ক্ষুধার অন্নের ভাণ্ডার ভরাতে, তৃষ্ণার সুশীতল বারিপাত্র হাতে।

পথে দেখে এসেছি বসুধারা, একটি ধারামাত্র। তারই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি। এখানে দেখি বহুধারা।

নামও শুনি—সহস্রধারা।

সামনেই পাঁচটি বড় বড় প্রপাত চোখে পড়ে। ভাবি, পুরাণ-কথিত এই কি পঞ্চধারা তীর্থ? বদরীনারায়ণ তীর্থক্ষেত্রের বর্ণনায় হিমগিরির নৈর্ঋত দিগ্‌ভাগে অবস্থিত বলে উল্লেখ আছে। তীর্থগুলির নামকরণ আছে—প্রভাস, পুষ্কর, গয়া, নৈমিষ ও কুরুক্ষেত্র। ভগবানের আদেশে এই পঞ্চতীর্থের দেবতারা এইখানে তপস্যা করেন, শুনি।

সেই ধারাগুলি নেমে যেখানে নদীর আকারে বয়ে চলেছে, সেখানে পৌঁছুলাম। ওপারে যেতে হবে। পুল নেই। প্রয়োজনও নেই। কেন না, জলের গভীরতা নেই। সমতলভূমিতে জলস্রোতগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে ছোটায় খুব বেশি টানও নেই। তবে তুষারগলা জল,—মনে হয়, বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা। যেমন রৌদ্রের চেয়ে রৌদ্রতপ্ত বালির তাপ অসহ্য মনে হয়।

জুতা মোজা খুলে পার হই। শিশিরবাবুও প্রস্তুত হন। রতন সিং ছুটে আসে। বলে, আপনার ওসব খুলতে হবে না—পিঠে করে পার করিয়ে দিচ্ছি।

শিশিরবাবু আপত্তি করেন। বলেন, দরকার নেই কোন।

রতন সিং শোনে না। উদয় সিং ও পান সিং আসে। রতন সিং ও পানসিং-এর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়—কে বয়ে নিয়ে যাবে? উদয় সিং হুকুম দেয়, রতন সিং নিয়ে যাবে, এই প্রথম এসেছে। শিশিরবাবুকে বলে, আপনি চুপ করে বসুন, কষ্ট করবেন না। এরা হয়েছে কিসের জন্যে?

রতন সিং টপ্ করে তাঁকে তুলে নেয়। যেন ছোট একটা ছেলেকে নিচ্ছে। পিঠে নিয়ে জলের উপর দিয়ে ছপছপ করে চলে। শিশিরবাবু হেসে চেঁচাতে থাকেন, আর বাবা, ফেলে দিবি ফেলে দিবি! করছিস কি?

সবাই হেসে ওঠে।

নাম-ভোলা সে-ছেলেটি ওপারে একটা পাথরের উপর বসে পা দোলাচ্ছে। ছোট ছোট পাথর ছুঁড়ে জলে ফেলছে। সেও এদিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

ওপারে গিয়ে সামান্য চড়াই। তারপর আবার উচুনীচু পথ-চলা। অল্প বৃষ্টি নামে। তার মধ্যেই বর্ষাতি-কোট-গায়ে চলি। দেখতে দেখতে কোথা থেকে ঘনঘটা করে মেঘ আসে। জোরে জল নামে। পথের পাশে ছোট্ট এক গুহায় আশ্রয় নিই। হু-হু করে বাতাস ঢোকে, কনকনে শীত। পা নাচাই, হাতে হাত ঘষি। পকেট থেকে দস্তানা বার করে হাতে লাগাই। বিদ্যাকে বলেছিলাম, বদরীনাথ থেকে কয়েক প্যাকেট বিড়ি সিগারেট যেন সঙ্গে আনে। জানি, পথের মধ্যে পেলে উদয়সিংরা খুব খুশী হবে।

বিদ্যা বার করে তাদের দেয়। আনন্দে তাদের মুখ ভরে ওঠে। যেন কি অমূল্য সম্পদ পেল। তখনই ধরিয়ে টানতে থাকে। আমাদের সঙ্গে এ পথের সম্বন্ধে নানা গল্প করে। প্রাণ খুলে কথা কয়। নিঃসঙ্কোচে। যেন কত দিনের বন্ধু সব।

বিদ্যাও সিগারেট ধরায়। সঙ্কোচভরে। ওরই মধ্যে যথাসম্ভব আড়াল রেখে টানে।

মানুষে মানুষে সরল মিলনের যে সহজ সুন্দর রূপ, পাহাড়ী হলেও চাপরাশের চাপে সে তা হারিয়ে ফেলেছে।

•

এইবার সেই শিরদাঁড়া পথ শুরু হল। ইংরাজি ভাষায় Razor-edged ridge।

মানুষের শিরদাঁড়ার মত নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অতিকায় যে-সব জীবজন্তু ছিল—যাদের কঙ্কাল এখন যাদুঘরে রক্ষিত হয়ে বিস্ময় জাগায়—তাদেরই মধ্যে ডাইনোস্যর (Dinosaur)-এর শিরদাঁড়ার মত। সেই বিরাটকায় জীবের আকার বহু সহস্র গুণ করলে যত প্রকাণ্ড হয়—সেই রকমই এক প্রাণীর কঙ্কাল যেন দুই দিকের গিরিশ্রেণীর মাঝখানে দীর্ঘাকারে শায়িত আছে। তারই উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। একটা সরু লাইনের উপর দিয়ে চলা। দুই দিকেই পাহাড়ের ঢালু গা। নীচে তিন-চারশ ফুট সোজা নেমে গেছে। কোন রকমে ভার সামলে চলি। কোথাও সামনে পথ জুড়ে পাথরের স্তূপ—এগিয়ে যাবার উপায় দেখি না। বিদ্যার হাত ধরে এক পাশের সেই ঢালু গায়ের উপর কোন রকমে পা রেখে পার হই। যদি হঠাৎ পদস্খলন হয়-* নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, বিদ্যা বলে ওঠে, ওদিকে তাকাবেন না—শুধু পা-টুকুর ওপর নজর রেখে প' ফেলুন।

ভাবি, এ কি অর্জুনের অস্ত্র-শিক্ষার একাগ্রতার কথা! গাছ নয়, ডাল নয়, পাতা নয়—শুধু পাখি! তারও আবার কেবল চোখটুকু দেখা! 'অন্য দিকে দেখো না'—কথাগুলি বলা তো সহজ, কিন্তু না তাকিয়ে উপায় কই? চোখের দৃষ্টি কে যেন সজোরে টেনে নিয়ে যায়। দেখি বহু নীচে মাটি বালি—ছোট বড় পাথরে-ভরা রুক্ষ কর্কশ ধরিত্রীর দেহ। মাঝে মাঝে বিদীর্ণ হয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, উপরের মাটির ও বালির আস্তরণের অভ্যন্তরে সাদা বরফের স্তর,—কোথাও বা সেই সব তুষার গলে

জলের ধারা বার হচ্ছে। সুন্দরী প্রকৃতির স্নিগ্ধ শোভা নয়—মৃত্যু-মলিন হিমশীতল শ্মশানক্ষেত্রে যেন এক বিকৃত শবদেহ পড়ে আছে। ক্ষতবিক্ষত তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। শাণিত অস্ত্রে কে যেন কেটে রেখে গেছে—ক্ষতদেহের অভ্যন্তরে বিবর্ণ সাদা সাদা মেদ-মজ্জার কদর্য রূপ প্রকাশ পেয়েছে!

মৃত্যু যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। কিন্তু তবুও এই ভয়াবহ পথে, কেন জানি না, মনে মরণের ভয় জাগে না। কেমন এক নির্বিকার নিশ্চিন্ত অনুভূতি। দয়া মায়া স্নেহ—মানব-মনের কোমল বৃত্তিগুলি কোথায় যেন হারিয়ে যায়। চারিদিকের আকাশচুম্বী তুষারশিখরগুলির মহান সৌম্য দ্যুতি, জটাধারী নগাধিরাজের ধ্যানগম্ভীর বিরাট স্তব্ধ মূর্তি মনের ভিতর এক অপার্থিব ভাব আনে। জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ মনে হয়। আত্ম-পরের ভেদ ঘোচে। মনে ভয়-ভাবনার লেশ থাকে না। অন্তরে বাইরে যেদিকে তাকাই সবই মনে হয় বিরাট এক শক্তির অংশমাত্র। ক্ষুদ্র মানব সেখানে অতি নগণ্য অণু-পরমাণু মাত্র। তার বাঁচা-মরা—হিমালয়ের অঙ্গে ধূলিকণার থাকা-না-থাকার মতই—অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

মনে পড়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা। কারও কারও মতে এই পথেই নাকি গিয়েছিলেন মহাপ্রস্থানে। মহাভারতকারের বর্ণনা—"দুঃসহোগ্রদুঃখগ্রস্ত" পাণ্ডবগণ। "ভ্রাতরঃ পঞ্চ কৃষ্ণা চ ষষ্ঠী শ্বা চৈব সপ্তমঃ।" মহাগিরি হিমবন্তের এই তুষার-রাজ্যে এসে তাঁরা দেখেন "মহাশৈলং মেরুং শিখরিণাং বরম্।" দুর্গম পথে সবাই চলেছিলেন সারি বেঁধে—'যোগযুক্তা'—'যোগধর্মী'। অকস্মাৎ পশ্চাতে দ্রৌপদীর পতন ঘটল —ধ্যান থেকে স্খলিতমানস হয়ে। "যাজ্ঞসেনী ভ্রষ্টযোগা নিপপাত মহীতলে।"

বিমর্ষ সন্ত্রস্ত মধ্যম পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু ধর্মরাজ দৃক্‌পাত না করে এগিয়ে চলেন। একে একে প্রিয় ভ্রাতাদেরও পতন হয়। তবুও যুধিষ্ঠির নির্বিকার। পিছন ফিরে তাকান না। ফিরে তাকানো? সে তো স্বর্গান্তরায়রূপ স্নেহেরই নিদর্শন। সে-স্নেহের বন্ধন মুক্ত হয়েই তো স্বর্গপথে তিনি চলেছেন।

রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষের মনে যে এই নির্বিকার, স্নেহ-শূন্য ভাবের আবির্ভাব অসম্ভব নয়—মনে মনে আজ স্পষ্ট অনুভব করি।

শুধু সেই মহাভারতীয় যুগের কাহিনীই নয়, মনে পড়ে বদরীনাথের সেই বৃদ্ধ স্বামীজীর মুখে শোনা গল্প—উত্তরপ্রদেশবাসী সেই যাত্রীটির কথা। এইখানেই না তাঁর সহধর্মিণীর পতন সত্ত্বেও ফিরে তাকান নি? এখন ভাবি, হয়তো সেও সত্য হবে।

এই সূত্রে আর একটি আধুনিক ঘটনাও মনে আসে।

হিমালয় নয়—হাওড়া স্টেশনে। একটি পশ্চিমগামী ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে। তারই এক কামরায় বসে এক সাধু-যাত্রী। দুটি যুবক তাঁর দর্শনে এসেছে। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে থেকে সহযাত্রীরা বুঝতে পারেন, ছেলে দুটি দূর থেকে স্টেশনে এসেছে শুধু তাঁরই সঙ্গে, তাঁর যাবার পথে দেখা করতে। শেষ সময় পর্যন্ত তারা বসে থাকে,—যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকা যায়। ঘণ্টা বাজে। ট্রেন ছাড়ে। অন্য যাত্রীরা তাদের নেমে যেতে তাগাদা দেয়। চলন্ত গাড়ি থেকে তারা লাফিয়ে নামে। তাদেরই একজনের অকস্মাৎ বিপদ ঘটে। নামতে গিয়ে পড়ে যায়। চারিদিকে আতঙ্কিত রব ওঠে। যাত্রীরা চেন টেনে ট্রেন থামায়। লোকজন ছোটে। ভিড় জমে। যে যেমন পারে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। স্ট্রেচারে আসে। তাঁর অচৈতন্য দেহখানি নিয়ে চলে যায়। আবার ট্রেন ছাড়ে। সকলের এত উত্তেজনা, এত করুণ কলরব,—কিন্তু সাধুটির অদ্ভুত আচরণ। সম্পূর্ণ নির্বিকার,—নীরব, নিশ্চল। একবারও নিজের স্থান ছেড়ে নড়েন নি—জানালা দিয়ে তাকিয়েও দেখেন নি। সারাক্ষণই স্থির হয়ে বসে ছিলেন। ট্রেন ছাড়লে বিক্ষুব্ধ সহযাত্রীরা তাঁকে তিরস্কার ও বিদ্রূপ করতে থাকে। তাঁকেই দেখতে আসার জন্যে ছেলেটির এই বিপত্তি, অথচ এ কী তাঁর অমানুষিক আচরণ! গেরুয়াধারী ভণ্ড সন্ন্যাসী!

সাধু তাতেও নির্বিকার। প্রতিবাদ করেন না। কোন কথাও বলেন না। মুখমণ্ডলে অন্য কোন ভাবও প্রকাশ পায় না। প্রশান্ত আত্মভোলা মূর্তি।

মহাপ্রস্থানের পথের সেই কাহিনীর ও আধুনিক যুগের এই ঘটনাগুলির উপর নূতন আলোকপাত হয়।

এই আলোকের প্রকৃত স্বরূপ কি, কোথা থেকে আসে, কেনই বা আসে—সে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। শুধু বুঝি, জগতের সব কিছু দেখার গতানুগতিক দৃষ্টিকোণ বদলে গেছে। মনে হয় যেন এতদিন

সিনেমা-হল-এর অন্ধকার ঘরে কৃত্রিম আলোকে রূপালি পর্দার উপর মানুষের চলন্ত ছবি দেখছিলাম। হঠাৎ যেন চারিদিকের বদ্ধ দুয়ার খুলে গিয়ে দিনের শুভ্র আলোক ঘর ভরিয়ে দিল। সিনেমার সেই সব উজ্জ্বল জীবন্তপ্রায় মূর্তিগুলি সে-আলোয় বিবর্ণ ম্লান হয়ে গেল, পটের উপর সুন্দর দৃশ্যাবলী তাদের পরিপ্রেক্ষিত (perspective) হারিয়ে ফেলল। যাদের মনে হচ্ছিল যেন সজীব মানুষ—এখন দিনের তীব্র আলোক নির্মমভাবে প্রকাশ করে তাদের অলীক রূপ, মিথ্যা পরিবেশ। শুধু চিত্র মাত্র, মায়ায় রচিত সংসার-মঞ্চে সুসজ্জিত নট-নটীর অভিনয়। ক্ষণিকের কপট মান-অভিমান, দুদিনের অলীক স্নেহ-ভালবাসা।

এ কার আলো? কিসের আলো?—তাই ভাবি।

॥ ১৫ ॥

বিকেলে এসে পৌঁছুলাম চক্রতীর্থে।

ঘণ্টা পাঁচ-ছয় চলেছি। ভাবলাম, কয়েক মাইল নিশ্চয় এগিয়েছি। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হই,—লক্ষ্মীবন থেকে মাত্র পাঁচ মাইল। এত ধীরে ধীরে সাবধানে চলা—অলক্ষ্যে সময় কেটেছে, পথ এগোয় নি। তাতে ক্ষতি নেই। ধীরে-সুস্থে যাব, ঠিক আছে। হাতে সময়ের টানাটানি নেই।

সার্ভে ম্যাপ্-এ এ স্থানটির নাম লেখা আছে মাজ্না। গ্রাম নেই, কোন বসতিও নেই। মাজ্না নামের অর্থ জানি না। কিন্তু চক্রতীর্থ-নামকরণের ব্যাখ্যা শুনি।

চারিদিক আকাশচুম্বী তুষার-কিরীট গিরিশ্রেণী। তারই মধ্যে প্রায় চক্রাধারে বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। মনে হয়, পাহাড়ে ঘেরা যেন গোলাকার বৃহৎ হ্রদ ছিল—এখন শুকিয়ে গিয়ে পাথর-বিছানো ময়দান-রূপে পড়ে আছে। তারই বুকে দু-একটা ঝরনার ধারা এখনও এঁকে-বেঁকে চলেছে।

চক্রতীর্থ নামের পৌরাণিক কাহিনীরও প্রচলন আছে। নারায়ণ যখন যোগাসনে বসেন, এইখানে তাঁর সুদর্শন চক্রটি রেখেছিলেন। আবার শুনি, অর্জুন এই পুণ্যতীর্থে তপস্যা করে শিবের কাছে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন।

প্রান্তরের একটু উপরে রাশীকৃত পাথরের মধ্যে কয়েকটি গুহা। তারই কাছে তাঁবু ফেলা হয়। একটা পাথরের উপর বসে গরম চা পান করি। তুষারশিখরগুলির উপর অস্তগামী সূর্যের রশ্মি পড়ে। বিচিত্র বর্ণের ছটা ফোটে। দেহেমনে রঙের পরশ লাগে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে। আকাশের লাল আলো ম্লান হয়। বাতাসের হিমস্পর্শ শিহরণ জাগায়। তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করি। ভিতরে ছোট লণ্ঠন জ্বলে। সেই লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলো তাঁবুর ছোট দরজার মুখে দিনের নিবে-আসা শেষ আলোটুকুকে বাইরে ঠেলে দেয়। বাইরে মনে হয় গাঢ় আঁধার, তারই মধ্যে পাহাড়ের আরও কালো বিকট বিশাল দেহ। হঠাৎ সেই পাহাড়ের মাথায় ফুটে ওঠে সাথী-হারা একটি মাত্র তারা। জ্বলজ্বল করে কাঁপতে থাকে। মনে করিয়ে দেয় একচক্ষু দানব সাইক্লোপের ভয়াবহ দৃষ্টি।

তাঁবুর বাইরে ও ভিতরে বসে মনের এ কি পরিবর্তন!

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কম্বল-শয্যা নিই।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙে। বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ শুনি। শিশিরবাবু বলে ওঠেন, তাই তো! বৃষ্টি শুরু হবে নাকি? সন্ধ্যেবেলায় আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল—এত মেঘ এরই মধ্যে জমল কোত্থেকে?

কিন্তু আশ্চর্য, তাঁবুর উপর বৃষ্টি পড়ার কোন রকম শব্দ শুনি না। অথচ আবার বাজ পড়ার শব্দ ওঠে। দুজনে কৌতূহলে মুড়িসুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসি। দেখি মেঘহীন সুনীল আকাশ। তারা আলোয় ফুটফুট করছে। যেন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। তবে শব্দ ওঠে কোথায়? বিনা মেঘে সত্যই কি এদেশে বজ্রপাত হয়?

এই অশনি-নিনাদের কারণ বুঝি পরের দিন।

চক্রতীর্থ ছাড়িয়ে চলেছি। অল্প চড়াই। সামান্য হলেও পাহাড়ের এই চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে সহজেই ক্লান্তি আসে। গলার ভিতরে কেমন শুষ্ক ভাব। জল খেলে ক্ষণিকের জন্যে ভেজে বটে, কিন্তু তৃপ্তি নেই। আবার তখনই শুকিয়ে ওঠে। যেন তপ্ত বালির উপর দু-ফোঁটা জল পড়েই খটখটে হয়ে যাওয়া। মাথাও একটু ভার হয়ে থাকে। ন্যক্কার-বোধও কখনও জাগে। চোখে রঙিন চশমা—কনকনে

বাতাস যাতে না লাগে, বরফের উপর রোদের প্রখর আলোর কঠোর দীপ্তি চোখে আঘাত না করে। সারা শরীরে ও মাথার ভেতর কেমন একটা অস্বস্তি ভাব। চশমা খুললেই বুঝতে পারি—চোখের পাতাও ভারী মনে হয়, দৃষ্টিশক্তি কিসে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মনে হয় যেন গাঢ় নিদ্রা থেকে এইমাত্র উঠেছি—ঘুমঘোর এখনও কাটে নি।

বেশ বুঝি, হিমালয়ের এই উচ্চস্তরের সূক্ষ্ম আবহাওয়া অনভ্যস্ত শরীর ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দু-এক দিনের পরিচয়েই এই অস্বস্তিকর অনুভূতি দূর হবে। হয়ও তাই দেখি।

চড়াই-শেষে পাহাড়ের অপরদিকে নামা। পায়ের তলায় বালি-মাটি-পাথরের কুচি ঝুরঝুর করে ঝরতে থাকে। বিদ্যার হাত ধরি। লাঠিতে ভর দিই। লম্বা লাঠির এখানেই প্রয়োজনীয়তা বুঝি।

তারপর আবার উঁচুনীচু পথ। ছড়ানো পাথরের উপর থেকে আর এক পাথরের উপর পা ফেলে ফেলে চলা। পায়ের তলায় দেহের ভারে পাথর টলমল করে ওঠে। যেমন গোমুখের পথে। কখনও বা আবার সেই শিরদাঁড়া পথ।

চারিদিক রৌদ্রে ঝলমল করছে। হঠাৎ আবার শুনি গতরাত্রির সেই প্রচণ্ড বজ্রপাতের মত শব্দ। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখি।

দূরে নীলকণ্ঠ পর্বতের গা থেকে বরফের স্তূপ ভেঙে পড়ছে। হিমানী সম্প্রপাত—Avalanche!

যেখানে বরফ ভাঙছে তারই আশেপাশে বাষ্প ও তুষারকণা পুঞ্জীভূত হয়ে সাদা মেঘের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে। যেন নিদ্রিত বিশালকায় এক পশুরাজ হঠাৎ জেগে হুঙ্কার রবে কেশর ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

পাহাড়ের নীচের অংশ ধূসর ও পিঙ্গলবর্ণ। তুষারশূন্য। চক্ষের পলকে দেখি উপরের সেই শুভ্র বাষ্পমণ্ডলী ভেদ করে সাদা বরফের লেলিহান জিহ্বা নীচে সেই পাহাড়ের গায়ে এঁকে-বেঁকে বিদ্যুৎবেগে নামতে থাকে। চারিদিকে ছোট বড় শব্দ ওঠে। এপারের পাহাড়গুলি সেই শব্দ লোফালুফি করে প্রতিধ্বনি তোলে।

তারপর হঠাৎ আবার সব শান্ত। শব্দহীন, গতিহীন। যেন স্বপ্ন;—কোথাও কিছু ঘটে নি।

অথচ দূরে দেখি—এই ক্ষণিক প্রলয়ের রেখে-যাওয়া সুস্পষ্ট চিহ্নগুলি। এই কিছু আগে যেখানে বরফ ছিল না, সেখানে বরফ ছেয়ে গেছে। যে তুষারস্তূপ থেকে হিমানী-সম্প্রপাত হয়—সেখানে অবশিষ্ট তুষার-অঙ্গে অপূর্ব বর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। বরফের সাদা ধবধবে রূপ আর সেখানে নেই—ভেঙে যাওয়া অংশে নীল সবুজ স্বচ্ছ শক্ত তুষার দেখা যায়—যেন ভাঙা নীল কাঁচের বোতল, তারই উপর সূর্যের কিরণ বর্ণ-বিন্যাস জাগায়।

স্তম্ভিত হয়ে দেখি। ভাবি, অকস্মাৎ ধ্যান ভেঙে নটরাজ বুঝি তাঁর প্রলয় নাচন শুরু করেছিলেন। নৃত্যের তাণ্ডব তালে ধূর্জটির শুভ্র জটাভারের কয়েকটি বাঁধন খুলে তাঁর ভস্ম-ধূসর অঙ্গে ছড়িয়ে গেল। নৃত্যশেষে এখন আবার যোগীরাজের সেই চিরন্তন ধ্যানস্তব্ধ শান্ত মূর্তি।

আশঙ্কাহীন ব্যবধান রেখে সব কিছু দেখা। তাই নিঃশঙ্ক চিত্তে নিশ্চিন্ত মনে হিমালয়ের এই প্রলয়ঙ্কর রূপের বিরাট সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি। কিন্তু জানি, তুষার-শিখর-অভিযানকারীদের কাছে এর সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয়। সেই ধ্বংসোন্মুখ তুষারস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে তাঁদের কাছে এই হিমানী-প্রপাত মঙ্গলময় সৌন্দর্যের বার্তা আনে না,—ভ্রূকুটি-কুটিল নিশ্চিত মরণের দূত মাত্র। তবু অজানা কিসের এক আকর্ষণে তাঁরা দুর্জয় সাহস সঞ্চয় করে সেই মৃত্যুসঙ্কুল তুষার-রাজ্যে এগিয়ে যান—কোন্ বরফের স্তূপে avalanche-এর কতখানি আশঙ্কা আছে—কোন্ সময়েই বা ঘটতে পারে—কি উপায়েই বা সেই বিপদ কাটানো সম্ভব—এ সবই তাঁদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় জানা থাকে,—তবুও কখনও কখনও রুদ্র হিমালয়ের এই আকস্মিক নিষ্ঠুর আঘাত ধূলিকণার মত তাঁদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। মরণের মধ্যে অমর জীবন লাভ করে তাঁরা হিমালয়ের বুকে বিরাজ করতে থাকেন।

শিশিরবাবু বলেন, এতক্ষণে বেশ বোঝা গেল গতকাল রাত্রের বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের শব্দের কারণ। ভীষণ-সুন্দর একেই বলে। সুরম্য-দারুণ।

একটু পরের ঘটনা।

শিরদাঁড়া পথ দিয়ে চলেছি। অতি সাবধানে। কোন রকমে পায়ের উপর ভর রেখে শরীরের ভার সামলে। ডাইনে বাঁয়ে—দু-পাশেই গভীর খাদ। পথ আগেও ছিল না, এখনও নেই। উদয় সিংরা এগিয়ে চলেছে। তাদের অনুসরণ করে আমরাও চলেছি। কুকুরটা কিন্তু দেখি এক জায়গায় নীচের দিকে নেমে গেল। যাবার আগে ক'বার ডাকাডাকি করল। তারপর নীচে গিয়ে সোজা এগোতে লাগল। মাঝে মাঝে আবার ছুটে উপরের দিকে উঠে আসে—মাথা ঘুরিয়ে পাহাড়ের নীচের অংশ দেখায়, ছুটে নীচে সেদিকে নেমে যায়—আবার উপরে উঠে আসে। ওঠা-নামার ক্লান্তিতে লম্বা লকলকে জিব বার হয়। বেশ বোঝা যায়, সে আমাদের নীচের দিকে যাবার জন্যেই বার বার সঙ্কেত করছে। বিদ্যাকে সে-কথা বলি। জিজ্ঞাসা করি, ঠিকপথে চলেছি তো?

বিদ্যা বলে, ঠিকই যাচ্ছি। ঐ তো উদয়সিংরাও এই দিক দিয়েই চলেছে। যেতে হবে ঐ যে দূরে কালো পাথরগুলি দেখছেন—তারই পাশ দিয়ে।

এ-সব পথে ঐরমকই পথ-চিহ্ন। আবার বছর বছর বদলেও যায়। বেশি বরফ পড়লে, পাহাড় ভাঙলে নতুন দিক দিয়ে তখন যেতে হয়। পূর্বগামী যাত্রীরা—ক্বচিৎ কখনও যাঁরা আসেন—পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে রেখে যান, মানুষের হাতে সাজানো বোঝা যায়। পথ-সঙ্কেতের কাজ করে। পুরনো বছরের সাজানো পাথরগুলি কখনও কখনও দিগ্‌ভ্রমও করায়।

বিদ্যার কথামত ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। অনেকখানি নীচে কুকুরটিও এগিয়ে চলে—মাথা তুলে মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকায়, কখনও বা ডাক ছাড়ে।

অনেকখানি আসার পর দেখি, উদয় সিংরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। কাছে গিয়ে নজর করি সামনেই পাহাড় সোজা হয়ে ধসে গেছে। এগোবার উপায় নেই, নামবারও পথ নেই।

নীচে কুকুরটার দিকে তাকাই। মুখ তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে আমাদের দিকে। ভাবটা, যেন—এতক্ষণ ধরে বলছি না।

অনেকখানি পথ আবার ফিরতে হয়, তবে নীচে নামার মত পথ পাই। কুকুরটা ছুটে আমাদের কাছে ফিরে আসে। আমাদের ফিরতে দেখে স্ফূর্তিতে লেজ নাড়তে থাকে, তার আনন্দ উছলে পড়ে। আবার পথ দেখাতে দেখাতে হেলেদুলে এগিয়ে চলে।

মনে কিসের এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করি।

ধীরে ধীরে পথ চলি।

ছড়ানো বড় বড় পাথরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া কতকগুলি ঝরনাধারা পাই। জমির উপরে পাথরের আশেপাশে এখানে এখনও সাদা বরফ জমে রয়েছে। কোথাও বা বরফ গলে জলের স্রোত নামছে। জলে বরফের টুকরাও ভেসে চলেছে। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে ধারাগুলি পার হই। বরফের উপর অতি সাবধানে পা ফেলি। চামড়ার জুতার সাধারণ তলা পিছলে যায়। লাঠিতে ভর দিই, কখনও বা বিদ্যার হাত ধরি।

অনেকক্ষণ ধরেই বিদ্যা সামনে দেখাচ্ছিল,—ঐ যে উঁচু জায়গাটা দেখছেন—ছোট পাহাড়ের মত—ওর উপর যেতে হবে। ওখানে উঠলেই 'শতোপন্থ তাল'ও দেখতে পাবেন।

শিশিরবাবু একটু দাঁড়াবার সুযোগ পান। দম নিয়ে বলেন, দেখতে তো পাব—কিন্তু তারপর ওখান থেকে আরও কত দূর?

বিদ্যা হাসিমুখে আশ্বাস দেয়, ওখানে উঠলেই তো পৌঁছে গেলেন, উঠেই অপর দিকে অল্প একটু নামতে হবে।

শিশিরবাবু হাঁফ ছেড়ে বলেন, যাক তাহলে আসা গেল। ওখানে তো এখনই পৌঁছে যাব।

কিন্তু দেখতে অতি-নিকটে হলেও পৌঁছতে বেশ সময় লাগে। হিমালয়ের উচ্চস্তরে শুষ্ক, ধূলিশূন্য, নির্মল পরিবেশ—বহুদূরের জিনিসও সন্নিকটে মনে হয়,—দূরত্বে ভ্রম জাগায়। পাহাড়ের উপর দূরে ঐ যে কালো পাথরটি—তার গায়ের প্রতি রেখাটি পর্যন্ত এখান থেকে সুস্পষ্ট নজরে পড়ে—যেন পাশে এসে দেখা। এখানকার সূক্ষ্ম আবহাওয়ায় মনে হয় যেন অলক্ষ্যে বসে কোন এক যাদুকর আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ চিরপরিচিত ধ্যান-ধারণাগুলি ভেঙে দিচ্ছে।

দূরের সেই উঁচু লম্বা জায়গাটি একটা বাঁধের মত। শেষ চড়াই জেনে সেটুকু উঠতে নতুন উৎসাহ আসে।

বিদ্যা ঠিকই বলেছে। ঐ তো শতোপন্থ তাল। নীচে দেখা যায়।

ততঃ সত্যপদন্নাম তীর্থং সর্বমনোহরম্।
ত্রিকোণাকারমেবৈতৎ কুণ্ডং কল্মষনাশনম্॥

স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণুখণ্ডের বর্ণনা।

বিস্মিত হয়ে দেখি, সত্যই তো পুরাণকারের নিখুঁত বিবরণ—ত্রিকোণ আকার। যেন ধরিত্রীর বুকে আঁকা ভারতের মানচিত্র।

শুনি, তিন কোণে তিন দেবতার অধিষ্ঠান—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তাঁরা সেখানে ধ্যানরত। 'ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রিকোণস্থাঃ সমাহিতাঃ।' শ্রেষ্ঠ দেবতার তপস্যাক্ষেত্র। মানুষের গড়া কোথাও কোন মন্দির নেই। প্রকৃতির প্রাকৃতিক দেবায়তন। ঊর্ধ্বে সুনীল আকাশ। চারিপাশে অমলধবল তুষার-প্রাকার। যেন শ্বেত-পাথরের গড়া। নিম্নতলে বিস্তীর্ণ বারিরাশি। নিস্তরঙ্গ স্ফটিকস্বচ্ছ প্রশান্ত সরোবর। সর্ব-মনোহর। যেন নীলকণ্ঠের কণ্ঠে দোলে নীলকান্ত মণি।

ত্রিকোণমণ্ডিতং তীর্থং নাম্না সত্যপদপ্রদম্।
দর্শনীয়ং প্রযত্নেন সর্বৈঃ পাপমুমুক্ষুভি॥

দুর্গম পথের অশেষ ক্লান্তি কোথায় নিমেষে অন্তর্ধান করে। তবুও গতিবেগ সংযত করি। মাথা নত করে ধীরপদে হ্রদের তীরে নেমে চলি। প্রাণভরা অসীম আনন্দ। আঁখি-ভরা জল। ভক্তি-নত শিরে নামে দেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণে মানুষ-ভিখারি।

॥ ১৬ ॥

হ্রদের তীরে তাঁবু পড়ে।

সাগরবক্ষ থেকে এখানকার উচ্চতা—১৪,৪৪০ ফুট। মনে পড়ে, মানস-সরোবরের উচ্চতাও ১৪,৯৫০ ফুট। তবে সেই বিরাট হ্রদের বিস্তৃতি ২০০ বর্গ মাইল। ছোটখাটো সমুদ্রের মত। শতোপন্থ সে তুলনায় ক্ষুদ্র জলাশয়। এই হ্রদের পরিসীমা ছয় ফার্লঙ্ মাত্র। এক কোণ থেকে অপর কোণের দূরত্ব প্রায় দুই ফার্লঙ্। চওড়া—এক ফার্লঙ্ ৬৪০ ফুট। বদরীনাথ থেকে সাড়ে পনেরো মাইল, চক্রতীর্থ থেকে তিন মাইল মাত্র।

শিশিরবাবু চেয়েছিলেন, তাঁবুর মুখ হ্রদের দিকে থাকবে। তাঁবুর ভিতরে বসে বা শুয়ে থাকলেও যাতে সারাক্ষণই হ্রদের দৃশ্য চোখে পড়ে।

বিদ্যা জানায়, তা তো হতে পারে না। বাতাস উঠলে ঐ দিক দিয়েই আসবে,—বরফের পাহাড়ের মাথা থেকে নামবে ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া, তখন ভারি তক্‌লিফ্ হবে। সারাদিন বাইরে রোদে কাটবে, রাত্তিরের জন্য তো তাঁবু—তখন তাঁবুর চারিদিক বন্ধ থাকবে।

তার উপদেশ আদেশ ভাবেই মানতে হয়।

শিশিরবাবু জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে তাঁবুর মধ্যে ঢোকেন। আমি যাই উদয় সিংদের থাকবার কি ব্যবস্থা হল দেখতে।

তারা থাকবে কাছেই দুটো গুহায়। শুনি, নিকটে আরও গুহাও আছে। দু-একটা বেশ বড়ও। দশ-বারো হাত লম্বা হবে। উদয়সিং হুঁকা হাতে এসে দাঁড়ায়। এরই মধ্যে নতুন করে কলকে ধরিয়েছে। পথ হাঁটেও সে অনেক সময় হুঁকা হাতে। হাসিভরা মুখে বলে, তাঁবুর চেয়ে এ-সব গুম্ফা ভালো। এখানে এসে রাত্তিরে থাক। এখানে ঠাণ্ডা কম। শীতে গুম্ফার ভেতর গরম থাকে। আবার ধূপের সময় ঠাণ্ডা রাখে।

এ কি, গুহার মুখে সেই চলমান 'বার্নাম উড'! একরাশ শুকনো ডালপালা নিয়ে কে ঢোকে? ডালগুলির ফাঁকে দেখি সেই আপন-নাম-ভোলা ছেলেটি। শব্দ করে মাথার ও হাতের বোঝা গুহার একপাশে নামায়। ক্লান্তিভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। দিনশেষে নিজের কর্তব্য শেষ হওয়ায় স্বস্তিবোধের আনন্দ ফুটে ওঠে। পকেট থেকে কি একটা বার করে হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই শুনতে পাই দূর থেকে ভেসে আসা তার বাঁশীর সুর।

উদয়সিং-এর কাছে শুনি, হ্রদের তীরের এক অঞ্চলে কয়েকটা ঝোপ্ আছে। সেখান থেকে এই কাঠ-সংগ্রহ। সারারাত আগুন জ্বলবে। গুহা গরম থাকবে। দেখি, জুনিপার-এর ডালপালা। কৈলাসের পথেও পেয়েছিলাম।

গুহার একপাশে ছড়ানো কাপড়ের টুকরো, ছেঁড়া কাগজপত্র—চিত্র-বিচিত্র। দেখে মনে হয় যেন ছিন্ন কোষ্ঠীপত্র। জিজ্ঞাসা করে জানি, ঠিক তাই। মানা প্রভৃতি গ্রামের মার্চা অধিবাসীরা এখানে প্রতি বছর শ্রাদ্ধ করতে আসে, মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে। বদরীনাথে ব্রহ্মকপালে যেমন হিন্দুযাত্রীদের পিণ্ডদানের বিধি আছে, এই অঞ্চলের পাহাড়ীদেরও তেমনি শতোপন্থে পিণ্ডদানের প্রথা। বদরীনাথে তারা দেয় না, বোধ করি তাঁদের ঘরের অতি নিকটে বলে তাদের চোখে সেখানকার ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য এর তুলনায় কম। গ্রামের যে কোন লোকের মৃত্যু হলে সকলেই মাথা মুণ্ডন করে, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব শতোপন্থে আসে শ্রাদ্ধ করতে। ছিন্ন কোষ্ঠীপত্রগুলি তারই নিদর্শন।

তাঁবুতে ফিরে আসি।

শিশিরবাবু জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখেছেন। ছোট্ট তাঁবু। আমাদের দুজনের জন্যে যথেষ্ট। তাঁবুর মুখে রাখা হয়েছে আমাদের বাক্স। টেবিলের কাজ করবে। খুচরা জিনিসপত্র তার উপরে সাজানো। খাওয়ার সময় থালাও বসবে ঐখানে। তাঁবুর সঙ্গে জোড়া দেওয়া মাটির উপর বিছানো waterproof ground-sheet। তার উপর আমাদের দুজনের পাশাপাশি কম্বল-শয্যা পড়েছে। কলকাতা থেকে আনা একজোড়া কম্বলের উপর বদরীনাথের সেক্রেটারির দেওয়া একটি তিব্বতী কম্বলও পাতা হয়েছে। গায়ে দেবার জন্যেও তিনি সেই ধরনের আরও একটা কম্বল দিয়েছেন। যেমন মোটা তেমনি গরম। ভারীও কম নয়। গায়ের উপর চাপা থাকলে দু-হাত তুলে তবে পাশ ফিরতে হয়। মনে হয় যেন একপাল জীবন্ত ভেড়া বুকের উপর চেপে বসেছে। গন্ধেও সে কথা স্মরণ করায়। শরীর গরম রাখার এত আয়োজন, তবুও শিশিরবাবু বলেন, রাতে শুতে হবে কিন্তু এইসব সোয়েটার, পুলওভার, গরম আন্ডারওয়ার, ফুল মোজা পরে—এমন কি মাথায় মাঙ্কি-ক্যাপ দিয়ে।

করাও হয় তাই। তবুও মনে হয় যেন গায়ে সামান্য কি আছে—কোথায় যেন ফাঁক রয়েছে, কনকনে শীত ঢুকছে। পাশ ফিরলেই চমকে উঠি, বিছানার উপর বাইরের জমা বরফ গলে জল গড়িয়ে এসেছে নাকি? এতে হাওয়াই বা ঢোকে কোথা থেকে? মাথার কাছে তাঁবু কি খুলে গেল?

সবই ঠিক আছে। তবুও, প্রচণ্ড শীতে এমনই মনে হয়।

খালি হোল্ড্-অল্‌টা টেনে শিশিরবাবু দুজনের মাথার কাছে দেওয়াল করে রাখেন। তারপর মাথা মুড়ি দেন। মুখ চাপা দিয়ে শোয়া আমার অভ্যাস নয়। দম আটকে আসে। নাকটুকু বার করে রাখি। একটু পরে নাকের ডগায় হাত দিয়ে দেখি যেন বরফের কুচি। অসাড়। তাড়াতাড়ি আবার চাপা দিই। হাঁটু দুটি গুটিয়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে একটু আয়েস পাই।

সকালে তাঁবুর বাইরে এসে দেখি, বালতিতে রাখা জল জমে বরফ হয়ে আছে। হ্রদের জলের উপরও পাতলা বরফের একটা আচ্ছাদন পড়েছে—তা থেকে ধোঁয়ার মতন উঠছে,—ঠিক যেন কড়া-ভরা গরম দুধে সর পড়েছে।

এত শীত, তবুও আশ্চর্য, কুকুরটা সারারাত তাঁবুর বাইরে দরজার কাছে শুয়ে ছিল, সর্বাঙ্গে লোমের উপর তুহিন-আবরণ। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়, গা ঝাড়ে, সামনের পা দুটা বিছিয়ে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙে, তার পর লেজ নেড়ে কাছে আসে, পায়ের জুতার কাছে নাক এনে শোঁকে, লেজ নাড়তে নাড়তে সঙ্গে সঙ্গে চলে।

একটু বেলা হলে বাঁধের উপর থেকে আচম্বিতে ডাক শুনি—'জয় রাম শ্রীরাম জয় সীতারাম!'

সকলে মুখ তুলে তাকাই। আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যুত্তর দিই। বৈরাগীজি ছুটতে ছুটতে নেমে আসেন। সকলকে প্রেম-ভরা আলিঙ্গন করেন। খালি পা, শুধু গা—তার উপর সেই সাদা মোটা চাদর জড়ানো। মাথার দুপাশ থেকে জটা নেমে দুই কাঁধের উপর পড়েছে,—যেন বটগাছের ঝুরি নেমেছে। মুখ-ভরা আনন্দের হাসি নিয়ে বলেন, কাল আপনারা ঠিকমত পৌঁছেছিলেন তো? পথে খুব বেশি কষ্ট হয় নি? আমি কাল যাত্রা করে পথে এক জায়গায় গুম্ফায় রাত কাটিয়েছিলাম—ভোরে উঠে চলে এসেছি।

শিশিরবাবু জিজ্ঞাসা করেন, শীতে কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয় খুব? একটা কম্বলও তো ছিল না?

তিনি হেসে বলেন, কষ্ট মোটেই না। সীতারাম কষ্ট পেতে দেন কই? হঠাৎ কোত্থেকে দুটো ভুটিয়া এসে হাজির—সারারাত একই গুম্ফায় ছিলাম। আগুন জ্বেলেছিল—বড় আরামে কেটেছে। কষ্ট পাবার উপায় কই, ঐ দেখুন না—আসতে-না-আসতেই বিদ্যা গরম চা আনছে।

বলি, চলুন তা হলে ঐখানে ওই পাথরটার উপর উদয়সিংহের কাছে—ওরাই চা করে পাঠিয়েছে, সকলে একসঙ্গে বসে খাওয়া যাক।

মাত্র দুদিন পরে দেখা। তবুও স্থান-কাল-ভেদে এমনি মনে হয় যেন কত কাল পরে হঠাৎ সকলে মিলিত হয়েছি। রোদে বসে গল্প করে আনন্দে সময় কাটে। বৈরাগীজি গায়ের চাদর ফেলে উঠে পড়েন, বলেন, এবার স্নান সেরে পূজাপাঠ করে নিই।

শিশিরবাবু বলেন, চলুন, আমিও হ্রদে একটা ডুব দিয়ে আসি, আর যখন এলামই এখানে তর্পণটাও করে নিই।—তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি আর এখন স্নান করবেন কেন?—আর একটু বেলা হোক—রোদের আরও তেজ বাড়ুক।

নির্মল নীল হ্রদের জল। কোথাও কোন লতাপাতা সামান্য কুটি পর্যন্ত নেই। কিছু উড়ে পড়লে বা ভেসে এলে তখনই কোথা থেকে পাখি উড়ে আসে, ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে চলে যায়। ছোট ও বড় পাখি। বেশির ভাগ ধূসর বরণ, কারও বা কালো রঙ। মন্দিরের গৃহতল যেমন পূজারীরা ধূলিহীন ও মার্জিত করে রাখেন—এই হ্রদের জলরাশিও তেমনি সুপরিষ্কৃত। মলিনতাশূন্য। দর্পণের মত ঝকঝক করে। হ্রদের তীরে বিক্ষিপ্ত পাথরগুলির—এমন কি দূরের তুষার-কিরীট শিখরশ্রেণীর প্রতিবিম্ব জলে জলছবি তোলে। বাতাসে মৃদু কম্পনে ঢেউ-এর বুকে ছায়াগুলি কাঁপতে থাকে।

বৈরাগীজি বলেন, ঐসব পাখিগুলিও শাপভ্রষ্ট দেবতা। ভাগ্যবান, তাই তাঁরা এমন স্থানে আছেন। ভগবানের সরোবর মার্জন করে রাখা ওঁদের পক্ষীজন্মের নিত্য করণীয় কাজ। একাদশীর দিন হরি স্বয়ং আসেন এখানে স্নান করতে। 'একাদশ্যাং হরিস্তত্র স্নয়মায়াতি পাবনে।' পড়েন নি পুরাণে? তাঁর পদানুসরণ করে মুনিগণও আসেন। দেবতাত্মা হিমালয়ের এই তো প্রকৃত দেবভূমি। থাকুন এখানে কিছুদিন—ভাগ্যে থাকে তো অনেক কিছু দেখতে পাবেন, শুনতে পাবেন। হরিবাসরের মধ্যাহ্ন-সময়ে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সুমধুর গীতধ্বনি এখানে শোনা যায়। কত বিচিত্র শঙ্খ-ঘণ্টার রোল—যেন বিশ্বজোড়া বিরাট মন্দিরে পূজারতির ধুম লাগে।

মনে পড়ে হেমকুণ্ডের কথা। সেই শিখ সাধুটিরও কাছে এই ধরনেরই বর্ণনা শুনেছিলাম।

সর্বাধিকারী মহাশয়ের সেই একশো বছর আগেকার ভ্রমণ-কাহিনীতেও এই ধরনের এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ আছে। হিমালয়ের গভীর অঞ্চল নয়, লছমনঝোলার উপর দিয়ে গঙ্গার পরপারে যাওয়ার সময়। সেকালে লছমনঝোলার পুল ছিল না। সত্যকার ঝোলাই ছিল। সেই দড়ির ঝোলার সাহায্যে গঙ্গার বেগবতী স্রোতধারা পার হওয়া স্বভাবতই তখন অতি কঠিন ও বিপদসঙ্কুল ছিল। যাত্রীরা প্রাণ হাতে করে পার হতেন। সর্বাধিকারী মহাশয় তার বর্ণনা লিখেছেন এইভাবে :

"ঝোলা দেখিয়া সকলের জ্ঞান হত হইল, তাহার কারণ ঐ ঝোলার আকৃতি পাহাড়ের উপর হইতে পাঁচশত হাত রশি বিপরীত পারে পাহাড়ের উপর গাছ আছে, তাহার সহিত বন্ধন। এইমত তিন রশি দেওয়া আছে। তিন রশিতে দেড় হাত প্রস্থ; ঐ রশিতে অর্ধ হস্ত অন্তর এক এক খাদি কাষ্ঠের থাক বান্ধা, যেমন সিঁড়ি মই এইমত থাক থাক বান্ধা, দুই পার্শ্বে দড়ির রেল বন্ধ কোমর পর্যন্ত উচ্চ। তাহার উপরে দুই পার্শ্বে মোটা দুই রশি আছে, তাহা ধরিয়া ঐ ঝোলার উপর উঠিয়া ঐ খাদি কাষ্ঠের উপর পদক্ষেপ করিয়া, ভীত ব্যক্তির উপরের রজ্জু ধরিয়া গঙ্গা পার হইতে হয়।...ঝোলার দুই মুখ উচ্চ পর্বতের উপর, মধ্যস্থল নিম্ন হইয়া ঝুলিয়া আছে, ঐ স্থলে আইলে প্রাণ সশঙ্কিত তাহার কারণ যে, ভাগীরথী গঙ্গা আছেন—তাঁহার জল এমত স্রোতবতী যে, দশ বার শত মণ যে প্রস্তর তাহাকে ভাঁটার ন্যায় গড়াইয়া, আর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল দন্ত-কাষ্ঠের ন্যায় ছিন্নভিন্ন করিয়া স্রোতের দ্বারা দেশ-দেশান্তরে ভাসাইয়া লইয়া যায়। জলের শব্দ এমত বিপরীত হইতেছে যে, ঝোলা হইতে হাজার হাত নীচে গঙ্গার জল তথাচ তাহার কলকল শব্দে কর্ণে তালা লাগে এবং নিকটের ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে হয়, তবে বাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। ঝোলা হইতে এক হাজার হাত নীচে এই বিকটরূপ গঙ্গার জল, তাহাতে ঝোলাতে অর্ধ হস্ত অন্তর অন্তর পদক্ষেপ করিতে হয়। কিছুদূর গমন

করিয়া যাইলে ঝোলা হেলিতে দুলিতে থাকে, মধ্যস্থলে আইলে অতিশয় আন্দোলিত হয় এবং এক পার্শ্ব উচ্চ এক পার্শ্ব নিম্ন হয়। তৎকালে 'ত্রাহি মধুসুদন' 'ত্রাহি মধুসূদন' অন্তর্যাগ হয়। আর এক আশ্চর্য এই যে, পূর্ব পূর্ব সাধুদিগের বাচনিক এমত শ্রুত ছিলাম যে, লছমনঝোলা পার হইবার সময় দৈববাণী শুনা যায় যে পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিয়া কহে, 'পন্থি! সাবধান পগধ্যান, মুখে বল রামনাম, হিঁয়া কহি নাহি হায় আপনা!' এই শব্দ শূন্য-পথ হইতে শুনা যায়, তাহা ঝোলাতে উঠিবার সময়ে আপন স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাহার বিশেষ তদারক করিয়া দেখা হইয়াছে, কোনক্রমে মনুষ্য কি পক্ষী কিছুই নহে— দৈববাণী তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে ঝোলাতে উঠিয়া আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে পার হওয়া হইল।''

এখন লছমনঝোলার সেই ঝোলাও নেই, পারাপারের কোন ভয়ও নেই। এ-যুগে লছমনঝোলার লোহার শক্ত সেতু। মোটর চড়ে দলে দলে লোক পুলের কাছে নামে! নির্ভয়ে গঙ্গার সেই চিরন্তন উদ্দামধারা পার হয়। আধুনিক আবেষ্টনীর মধ্যে সেই একশো বছর আগেকার দৈববাণীর কাহিনী কোথায় মিলিয়ে গেছে।

কিন্তু শতোপন্থের দুর্গমতা তার ভয়াবহ রূপ নিয়ে এখনও প্রকট আছে। তাই সেখানে বসে শোনা অলৌকিক কাহিনী এখনও রোমাঞ্চ জাগায়। সেই জনমানবহীন তুষারময় হিমালয়ের নিস্তব্ধ প্রদেশে অনভ্যস্ত কর্ণকুহরে নানারূপ শব্দের রেশ যে না বাজে এমন নয়। মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক শব্দও প্রকৃতই শোনা যায়। সেই সব শব্দের প্রাকৃতিক কারণ নির্ণয় করাও হয়তো অসম্ভব নয়। তবুও বিশ্বাসী মনের কল্পনার তুলিতে সেই শব্দগুলিই দিব্য-রঙে রঙিন হয়ে ওঠে।

বিশ্বাসী মন আপন মনের মাধুরী নিয়ে কেমনভাবে আত্মজগৎ রচনা করতে পারে তা দেখেছিলাম বৃন্দাবনের চুরাশি ক্রোশ বন-পরিক্রমার পথে একটি ছোট্ট ঘটনায়।

সেদিন সকালের হাঁটা শেষ করে বনের প্রান্তে এক গ্রামে এসে পৌঁছলাম। সারাদিন এখানেই থাকা। রাত্রিবাসও। মা এসে বললেন, শুনছি এখান থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে এক বালক-সাধু থাকেন। মস্ত বড় ভক্ত। রোজই নাকি সাক্ষাৎ দর্শন পান। আমরা সবাই দেখতে যাচ্ছি। চল্‌, দেখে আসবি।

কেন জানি না, আমার তেমন কৌতূহল জাগে না। তাই যাইও না।

দর্শন করে মা ফিরে আসেন। মুখ-ভরা তৃপ্তির হাসি। উৎসাহভরে বলেন, গেলি না কেন, যা, এই তো অল্প দূরেই। দেখে আয়। বড় ভালো লাগল। ছেলেটি কি অদ্ভুত গল্প করলেন তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের।

মার কাছে তার গল্প শুনি।

মাত্র বছর চৌদ্দ-পনেরো বালকটির বয়স। পিতা জেলা-জজ। মা-বাপের একমাত্র সন্তান। আদরে যত্নে লালিত পালিত হলেও ছোট বয়স থেকেই গৃহত্যাগী মন। বছর তিন-চার আগে বাড়ি থেকে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পিতা তার সন্ধান পান, বাড়িতে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু আবার সে গৃহত্যাগী হয়। পিতাও আবার জোর করে তাকে নিয়ে যান। সে আবার চলে আসে। এইভাবে কয়েকবার ঘটবার পর এখন সে এইখানেই থেকে গেছে। মাঝে-মাঝে বাপ-মা এসে এখানে দেখা করে যান। বনের মধ্যে একটি গুহায় থাকে। কাছেই আর এক সাধু থাকেন। বালকটি জপতপ আরাধনা করে।

তার একখানি রামায়ণ পাওয়া সম্বন্ধেও অদ্ভুত গল্প শুনি। মা বলেন, গিয়ে তাঁর নিজের মুখেই শুনবি। আশ্চর্য!

দেখতে যাই।

বনের মধ্যে শান্ত স্থান। চারিদিকে বড় বড় গাছ। বিকেলের হেলে পড়া সূর্যে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে। গাছের ডালে পাখির মধুর কাকলী। ইতস্তত কয়েকটি শিলাখণ্ড পড়ে আছে। তারই একটির উপর বালক সাধুটি বসে একমনে সুর করে কি পড়ছে। পিছন দিক থেকে এসেছি, সে জানতে পারে নি।

তার পরনে ছোট কাপড়। খালি গা। বুকের ও পিঠের উপর দিয়ে কাপড়ের একটা অংশ পাকিয়ে পৈতার মত ঘুরিয়ে দিয়ে কোমরে ছড়ানো। শ্যাম বর্ণ। চওড়া বুক। সরু কোমর। মাথার উপর চুলের জটা পাকিয়ে কুণ্ডলী করে রাখা। শরীর অল্প দুলিয়ে একমনে পড়ছে। সামনে খোলা পুঁথি। একটু শুনেই

বুঝলাম—তুলসীদাসের রামায়ণ। আমাকে দেখতে পেয়ে মুখ তুলে তাকায়। টানা চোখ, লম্বা নাক। মুখে স্নিগ্ধ সরলতা। হঠাৎ মনে পড়ে একটি প্রাচীন চিত্র। বাল্মীকির আশ্রম। লবকুশ পাথরের উপর বসে রামায়ণ গান করছেন। অদূরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সীতা দেবী। কিছু দূরে একটি হরিণ। ঘাস ফেলে মুখ তুলে গান শুনছে। আরও দূরে গাছের ফাঁকে দেখা যায় গঙ্গার প্রশান্ত ধারা। সেই চিত্র থেকে এই বালকটি যেন একাকী জীবন্ত বার হয়ে এসেছে আজ এই বাস্তব জগতে।

পাশে বসে স্নেহভরে আলাপ করি। তাই বালকসুলভ সঙ্কোচ কাটে। তারপর মায়ের কাছে শোনা কাহিনীর জের টেনে তাকে প্রশ্ন করি : এ রামায়ণটি পেলে কোথা থেকে?

সে বলে, গ্রামের দোকান থেকে কিনেছি।

বলি, দাম নিয়েছিল কত? টাকা পেলে কোথায়?

সে উত্তর দেয়, একদিন গ্রামের দোকানে দেখে কিনতে ইচ্ছে হল। দাম চাইল দশ টাকা। ফিরে এসে বুড়ো সাধুর কাছে টাকা চাইলাম। তাঁর কাছে মাত্র পাঁচ টাকা ছিল। তিনি দিয়ে বললেন, 'আর টাকা তো আমার কাছে নেই। পারো তো তোমার কৃষ্ণজীর কাছে চেয়ে নিও।' তাই করলামও। রাতে কৃষ্ণজী এলে চাইলাম। সকালে উঠে দেখি, পুরা টাকা এসে গেছে। কিনে নিয়ে এলাম।

জিজ্ঞাসা করি, কৃষ্ণজীকে তুমি দেখেছ? কবে শেষ দেখা হয়েছে?

বড় বড় চোখ দুটি তুলে বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকায়। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, তাঁকে তো রোজই দেখি। এই তো তিনি এখনই আসবেন। বনের মধ্যে বাঁশী বেজে উঠবে। আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন ঐ গাছের তলায়। ডালে বাঁধা ঐ ঝোলায় আমায় বসাবেন, দোল দেবেন। তারপর তিনি নিজে বসবেন। আমি দোল দেব। কত খেলা দুজনে খেলব, বাঁশী বাজাব। সন্ধ্যা কেটে যাবে—রাত্রি এলে পাশে বসে তিনি গল্প করবেন—চোখে আমার ঘুম নামবে।

হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করে, কেন, তুমি দেখ নি তাঁকে? শোনো নি তাঁর বাঁশী? শুনবে আজ? চুপ করে থাক তবে আমার পাশে। একটু পরেই ঐ দিক দিয়ে আসবে সেই বাঁশীর ধ্বনি—তারপর ঐ হেলানো গাছের পাশ থেকে বার হবেন—মাথায় চূড়া বাঁধা—হাতে বাঁশী, মুখে হাসি—আমার কৃষ্ণজী।

আঙুল তুলে দেখায়, বনের মধ্যে গোধূলির আবছায়া আঁধারের দিকে। একটা গাছের ডালে মৃদু হাওয়ায় দুলছে শিকড় দিয়ে বোনা একটি ঝোলা।

তাকিয়ে থাকি। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বিশ্বাসে-ভরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে, তার সঙ্কোচবিহীন কথাগুলি শুনে আমার যুক্তিবাদী মনের সব কিছু অবিশ্বাস কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

ভাবি, সত্য মিথ্যা এও তো মানুষেরই সৃষ্টি। প্রয়োজনমত আমরাই গড়ি, আমরাই ভাঙি। এই ভক্ত বালকের কাছে—এই তো অতি-বড় সত্য। যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণ বিচারের শরাঘাতে নাই বা তার সেই আনন্দ-জগৎ জর্জরিত হল।

কিন্তু যুক্তিবাদী মানুষ তবু ছাড়ে না। বিচার করতে বসে। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে।

মনে পড়ে, Aldous Huxley-র Devils of Loudon গ্রন্থে এই মনস্তত্ত্বেরই সূক্ষ্ম বিচারের কথা। এ-সবই বুঝি মনের ফাঁকি বা মস্তিষ্কের বিকার। Psychic ব্যাপার।

William Blake-এর জড়াতীত জগতের বিচিত্র অনুভূতির কাহিনীও মনে আসে। দিব্যদৃষ্টিতে দিব্যদর্শনের (vision) বর্ণনা। সাধারণের ধারণা, তাঁর কাব্যে ছায়া পড়েছে তাঁর মানসিক বিকৃতির। কিন্তু তাঁর Spiritual Portraits-এ তিনি অতি সহজ ভাবেই প্রচার করেন : "You can see what I do if you choose. Work up imagination to the state of vision, and the thing is done."

ধর্ম সম্পর্কে আত্ম-মত ও আত্ম-অভিজ্ঞতা একান্ত স্বকীয়। Cardinal Newman-এর অভিমতে—"in matters religious, egotism is true modesty. In religious enquiry, each of us can speak only for himself. His own experiences are enough for himself, but he cannot speak for others; he cannot lay down the law, he can only bring his own experiences to the common stock of psychological facts."

কিন্তু ভারতীয় সাধু-মহাত্মাদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনীর যথাযথ বিচার বা বিশ্লেষণ করা অত সহজ নয়। তাঁরা বলেন, এ-সবই দেহনির্মুক্ত আত্মার সূক্ষ্ম জগতের অনুভূতির বিকাশ মাত্র। প্রকৃত সাধু স্থূল দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম দেহে বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করতে পারেন। এই অলৌকিক দর্শন সেই অভিজ্ঞতারই নিদর্শন।

সাধুরা আরও বলেন, এ আর অমন বিচিত্র কি? সাধনার বলে সাধকের উন্নতি হয়। প্রথমে তৃতীয় নেত্র খোলে। তারপর খোলে দিব্যনেত্র। তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হলে ধ্যানাবস্থায় ভাবানুরূপ দেবতার দর্শন হয়। কিন্তু দিব্যচক্ষু যখন খোলে তখন আর ধ্যানের প্রয়োজন হয় না, সাধক তখন যে কোন সময়ে যে কোন দেবতার দর্শন পেতে পারেন।

এ-সবই সাধুদের উক্তি, সাধুদের যুক্তি। সত্যকার সাধুরাই এর বিচার করতে পারেন।

জানি না, সেই বালক-সাধু কোন্ স্তরের?

॥ ১৭ ॥

কিন্তু থাক্ ওসব সাধু-সন্তদের অলৌকিক কাহিনী।

হিমালয়ের এই সকল দুর্গম নিভৃত অঞ্চল সাধারণ মানুষের প্রাণে যে বিচিত্র অনুভূতি জাগায়, সেই কথা বলি।

নিদারুণ গ্রীষ্মে রৌদ্রের রুদ্রতাপে মানুষের দেহে যখন জ্বালা ওঠে, সরোবরের শান্ত শীতল জলে অবগাহন স্নানে দেহ-মন স্নিগ্ধ হয়। তেমনি আবার অতি-অপরিচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় স্থানে ক্ষণিকের অবস্থানও দেহ-মনকে সঙ্কুচিত করে তোলে। মানুষের মনের উপর পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর এই বিভিন্ন প্রভাব সকলেই সাধারণ জীবনে অনুভব করি। এর বৈজ্ঞানিক কারণও নিশ্চয় আছে। সেই কারণ বিশ্লেষণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুধু মর্মে মর্মে বোধ করি, হিমালয়ের এই শান্ত প্রদেশ মনে শান্তিময় অসামান্য এক অনুভূতি আনে।

বৈরাগীজি বলেন, এই তো এখানে স্বাভাবিক। কত প্রাচীন সিদ্ধ যোগী মহর্ষিদের তপস্যার ক্ষেত্র এসব। মহাত্মাদের আত্মার সংযোগে এখানকার আলোবাতাস জলস্থল চারিদিক এক পবিত্র ভাবে সারাক্ষণই সঞ্জীবিত হয়ে থাকে, যেমন তোরঙ্গে ফুল রাখলে ভেতরের সব কিছু সুবাসিত হয়ে ওঠে। ঋষিদের যোগসিদ্ধির প্রভাবে এখানকার বায়ুমণ্ডল বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত একপ্রকার শক্তি বিকীরণ করে। প্রাণে আধ্যাত্মিক শিহরণ জাগায়। তাই তো সাধু-সন্তেরা সাধনার জন্যে এসব স্থানে আসন পাতেন। সিদ্ধির অতি অনুকূল পরিবেশ।

হ্রদের তীরে কালো মসৃণ একটি পাথরের উপর বসে সেই কথাই ভাবি। হবেও বা। নিজে সেই ভাবে বিভোর হয়ে সাধনা করতে না বসলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে কি করে? কিন্তু তবুও মনে মনে বেশ অনুভব করি যে চারিদিকের আবহাওয়া এক অভূতপূর্ব প্রভাব মনের উপর বিস্তার করে। শহর-সভ্যতার মধ্যে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে মনে যেসব সাধারণ ভাবের উদয় হয়, এখানে এখন অন্তরের নিভৃত কোণেও তাদের সন্ধান মেলে না। কোথায় যেন হারিয়ে যায়। প্রকৃতির বিরাট রূপরাজির মধ্যে নিজেকে নগণ্য, অতি সামান্য মনে হয়। দৈত্যাকার গিরিরাজ্যের অঙ্গে যেন 'গ্যালিভারস্ ট্রাভেলস্'-এর সেই লিলিপুটিয়ানরা। মহাকালের অসীম সাগর-তরঙ্গে জলবুদ্বুদ মাত্র। জাগতিক জীবনে বা সভ্যজগতে যেসব গুণের ও জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এতকাল স্বীকার করে এসেছি, এখন মনে হয় সে-সবই নিরর্থক। জ্ঞান-অজ্ঞান প্রভেদ হারায়। জানি শুধু, এইটুকু,—কিছুই জানি না। মনের গভীরতম প্রদেশে তাকিয়ে দেখি, ভয়-ভাবনা-চিন্তা, স্নেহ-ভালবাসা মায়া-মমতা কোন কিছুরই রেশমাত্রও নেই। লোভ-মোহ-দ্বন্দ্ব সংকোচের অতীত। বাসনার শিকল ছিন্ন হয়েছে। নির্বিকার চিত্ত। যেমন উচ্ছ্বাসবিহীন ঐ নিস্তরঙ্গ হ্রদের জল। সুনীল সুনির্মল। শিশুর চোখে টানা কালো কাজল। ছলছল জলভরা সরল শান্ত দৃষ্টি।

মাথার উপর আকাশ। গাঢ় নীল। চারিদিকে গগনস্পর্শী গিরিশ্রেণীর প্রাচীর বেষ্টন। 'নিভৃতির দুর্গ সুদুর্গম'। সেই পর্বতকারার মধ্যে আকাশের নীলে মুক্তির আহ্বান শোনায়। অজানা ভাষাহীন গানে দূরের পানে টানে। বিরাট ব্যোম। শব্দহীন। গতিহীন। অসীম নির্জন। 'অভয় আশ্বাস ভরা নয়ন বিশাল' সেই

সুনীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। মনে প্রাণে নিবিড় শান্তি পাই।

আজ সভ্যজগতের শহরে বসে লিখতে গিয়ে ভাবি, সেই সীমাহীন শূন্যের নীরন্ধ্রতা নিস্তব্ধতা Pascal-এর মনে এককালে ভীতিরই সঞ্চার করেছিল। আজ সেখানে বিজ্ঞানের দম্ভ নিয়ে রকেট ছোটে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। জ্ঞানের সীমা আরও বাড়ে। বিশ্বের মানুষের গড়া যন্ত্রদানবের হুঙ্কারে নভোমণ্ডলের বিরাট স্তব্ধতা ভেঙে পড়ে। তবুও মানুষ শান্তির সন্ধান পায় না।

সন্ধ্যার ছায়া নামে।

বৈরাগীজি এসে জানান, আজ সত্যনারায়ণ পাঠ। তীর্থে এসে বিশেষ করে করা উচিত। কি বলেন?

তাঁবুর ভিতর এক পাশে তিনি মৃগচর্ম বিছিয়ে বসেন। সামনে একটা বাক্সের উপর পুঁথি খোলা। একধারে ছোট রেকাবিতে পূজার নৈবেদ্য—এক মুঠো শুকনো ভাজা আটা চিনি দিয়ে মাখা, উপরে দুটো কিশমিশ। হেসে বলেন, যেমন দেশ, তেমনি দেবতার ভোগ। ঠিক না? ভক্তিভরে দিলে দেবতার কাছে অল্প-বেশি ছোট-বড়র তফাত নেই। শিশিরবাবুকে বলেন, দিন দুটো ধূপকাঠি জ্বালিয়ে।

তাঁবুর আর এক পাশে শিশিরবাবু ও আমি বুক পর্যন্ত কম্বল টেনে মাথায় মঙ্কি-ক্যাপ লাগিয়ে বসে আছি। তাঁবুর মুখে বিদ্যা ও উদয়সিংরা সকলে এসে দাঁড়িয়েছে। শিশিরবাবু একটা কম্বল এগিয়ে দিয়ে বসতে বলেন। সবাই বসে। উবু হয়ে। ঐ তাদের অভ্যাস। হ্রদের তীর থেকে তুলে আনা ফুল অঞ্জলি ভরে ধরে রেখেছে। কুকুরটাও বাইরে স্থির হয়ে বসে আছে।

বৈরাগীজির সামনে ছোট লণ্ঠন। তাঁর ছোট দেহ। কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় তাঁবুর গায়ে তারই প্রকাণ্ড ছায়া পড়েছে,—মসীকালো বিরাট আকার।

সুর করে বৈরাগীজি সংস্কৃত শ্লোক পড়েন। শরীর একটু দুলতে থাকে। মুখ ফিরিয়ে বিদ্যাদের দিকে তাকান। হিন্দীতে ব্যাখ্যা করেন। কেমন করে সত্যনারায়ণের পূজা করে, ভক্তিভরে ভোগ দিয়ে দীনহীন মানুষ অতি সুখে দিন কাটায়। ধনী সওদাগর বাণিজ্যে চলে। ধন-দৌলতের মোহে সত্যনারায়ণের পূজা ভোলে। দেবতার রোষ জাগে। প্রবাসে বিপদ আসে। রাজরোষে লাঞ্ছিত হয়। চুরির দায়ে দণ্ড পায়। ঘোর দুর্বিপাকে আবার দেবতার শরণ নেয়। সত্যনারায়ণের পূজা করে। পুনর্বার দেবতার কৃপাদৃষ্টি নামে। প্রিয়জনের সহিত মিলন ঘটে। বাণিজ্যে লক্ষ্মীশ্রী ফেরে। ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণের পূজার প্রথা চলে। রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন প্রভেদ নেই। পূজার সামান্য উপচার। সওয়া পাঁচ পোয়া দুধ, আটা, শর্করা, কলা মিশ্রিত শিরনি।

নিবিষ্টমনে বিদ্যারা কথা শোনে। দেবতার অসীম ক্ষমতার ও অশেষ করুণার কাহিনী—ভক্তের রক্ষা, দুর্জনের শাসন, অনুতাপীকে ক্ষমা, আবার স্বল্পেই তুষ্টি। কৃপার সিন্ধু ভগবান এমনি ভাবেই প্রেমে ধরা দেন। বিদ্যারা থেকে থেকে মাথা নেড়ে সায় দেয়, চোখ মোছে। কপালে জোড়হাতে প্রণাম করে।

মনে পড়ে, বাড়িতেও ছেলেবেলা থেকে দেখছি সত্যনারায়ণের পূজা। পুরুত-ঠাকুর আসেন। সত্যনারায়ণের কথা শোনান। মেয়েরা জোড়-হাতে বসে শোনেন। প্রণাম করেন। পূজাশেষে শিরনি বিতরণ হয়। বাতাসা মাখিয়ে মুখে ফেলা। এখনও কণিকামাত্র প্রসাদ গ্রহণ করলে সেই অমৃত-স্বাদের স্মৃতি জেগে ওঠে।

দেশ-কাল অতিক্রম করে এই সুদূর হিমালয়ে আজও সেই সনাতন প্রথারই প্রকাশ দেখি।

রাত্রে পাহাড়ের মাথায় কালো মেঘ জমে। গুরু গুরু গর্জন ওঠে। আশ্চর্য হয়ে দেখি বিদ্যুতের অপরূপ খেলা। ছেদহীন। অবিরাম। তড়িতের ত্বরিতগতি নয়। হঠাৎ-আলোর ঝলকানি নয়। একের আলো নিভে যাবার আগেই আবার চমকে ওঠে। একটানা কম্পমান বৈদ্যুতিক দীপ্তি। তাঁবুর বাইরে চারিদিকে,—ভিতরে ছোটখাটো সব জিনিস সুস্পষ্ট দেখা যায়।

শিশিরবাবু উঠে বসেন। বলেন, এত তীক্ষ্ণ আলোয় কখনও ঘুম আসে। আকাশেও যে নিঅন্-লাইট-এর চলন দেখি! বসে বসে বই পড়লে হয়।

ভাবি, রাত্রে তুষারপাত হবে।

কিন্তু কিছুই হয় না। শুধু শীতই বাড়ে। হি-হি করে কাঁপতে থাকি, থুল্‌মার মধ্যে আরও কুঁকড়ে শুই।

পরের দিন চলি শতোপন্থ ছাড়িয়ে আরও দূরে সোমকুণ্ড ও সূর্যকুণ্ডের দিকে। আজও সেই শিরদাঁড়া পথ। তেমনি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে চলা।

হ্রদের জলের কাছে পাথরের আশেপাশে নানা রঙের ছোট ছোট ফুল। পাড়ের এক জায়গায় কয়েকটা পাখি ঘুরছে। সর্বাঙ্গে বড় পালক। তুষাররাজ্যে স্বভাবজাত শীতবস্ত্র। ধূসর রঙ—যেন ধূলি-ধূসরিত গৈরিক বসন। হাঁসের মত আকার। কুকুরটা ছুটে গিয়ে লাফিয়ে ধরে একটাকে। পাখিটা ডানা মেলে ঝটপট করে। সবাই চেঁচিয়ে উঠি। বিদ্যা ছুটে আয়। পাথর ছুঁড়ে কুকুরটাকে মারে।

পাখিটা ছাড়া পায়। খুঁড়িয়ে দু-পা চলে অল্প উড়ে জলের উপর পড়ে। সকলে নিশ্চিন্ত হই।

এই শান্ত প্রদেশে হিংসা ও লোভের অকস্মাৎ প্রকাশ। মনে কোথায় ব্যথা জাগে।

বৈরাগীজি হঠাৎ প্রশ্ন করেন, আপনি কৈলাস গেছেন, তাই না? অতি শান্তিময় স্থান শুনেছি। আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছে। কিন্তু এখনও ভাগ্যে হয় নি।—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

উত্তর দিই, চলে যান না। যাওয়ার আপনার বাধা কোথায়? নিজে গিয়েই দেখে আসবেন।

বৈরাগীর প্রফুল্ল বদন ম্লান হয়। গভীর কণ্ঠে বলেন, যাব। সেখানে গিয়েও দেখব। শুধু চোখে দেখা নয়, দীর্ঘদিন থাকব। নিশ্চয় মনে সেখানে নিরঙ্কুশ গভীর শান্তি মিলবে।

কথা শুনে চমকে উঠি। জিজ্ঞাসা করি, কেন? বদরীনাথ আপনার অমন গুহায় শান্তি পাচ্ছেন না?

বলেন, সেখানে আর মন বসছে না। তাই ভাবছি, কৈলাস যাই। কি বলেন?

বলি না কিছুই। মনে মনে ভাবি, বৈরাগীর মনের এই অশান্তির অস্পষ্ট ইঙ্গিতও তো কোনদিন পাই নি!

বিধাতার বিচিত্র সৃজন মানুষের মন। সব কিছু পেলেও কোথায় যেন কিসের অভাব। বাইরে আনন্দের প্রকাশ, অন্তরে অতৃপ্তির অতল গহ্বর। যেন আপাত শান্ত আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে অনির্বাণ অগ্নিদাহ।

হ্রদের তীরে কয়েকটি গুহা। ভিতরে উঁকি মেরে দেখি। বন্য জীবজন্তুর গুহার ভিতর তাদের গন্ধ থাকে। মানুষ সে ঘ্রাণ পায়। বনের পশুও, শুনি, মানুষের গায়ের গন্ধ পায়। বহুদূর থেকেও। কিন্তু মানুষ মানুষের গন্ধ সেভাবে অনুভব করে না। গুহার ভিতর এককালে মনুষ্য-বাসের সাক্ষ্য দেয় চারিদিকে ফেলে যাওয়া ছোটখাটো জিনিসগুলি। টুকরো কাগজ। কাপড়ের ফালি। ভাঙা টিনের কৌটা। সাজানো পাথর। একপাশে বেদি। মাঝখানে ধুনি—এখনও আগুনের কালি মাখা। আধপোড়া কাঠ। রৌদ্র বৃষ্টি শীতের প্রকোপ থেকে মানুষের আত্মরক্ষার আশ্রয়স্থল। সাধু-সন্তদের প্রস্তর-প্রাসাদ। আজ দেখি,—সবই পরিত্যক্ত।

শূন্য গুহা মনে প্রশ্ন তোলে,—এলেনই বা কেন? পেলেনই বা কি? গেলেনই বা কোথায়?

মনে পড়ে সেই সাধুগুলির কথা। শতোপন্থে এসেছিলেন কয়েক মাস কাটাতে। তারপর তুষারপাতে মৃত্যু ঘটে। পরের বছর তাঁদের শবদেহগুলি লোকে দেখতে পায়। সাধুদের সৎকার করে। এখানে কি ভাবে তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন কেউ তা জানে না। সাধারণ মানুষের মত তাঁরাও কি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়েছিলেন?

মৃত্যু-পথ-যাত্রী অপর এক সাধুর শেষ দিনগুলির কথা মনে আসে।

সে বছর কলকাতা থেকে রওনা হচ্ছি আবার হিমালয়-পথে। তারই ক'দিন আগে এক বন্ধু দেখা করতে এলেন। হিমালয়ের এক প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রে নিরালায় দিনকয়েক কাটানো তাঁর উদ্দেশ্য। তাই খোঁজ নিলেন, কোথায় থাকার ব্যবস্থা হতে পারে। সেখানে এক স্বামীজির সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। নির্জন আশ্রমে তিনি একাকী থাকতেন। গঙ্গার উপকূলে। শান্ত মনোরম স্থান। ফলফুলের ছোট বাগান। আশ্রমের একটি কাঠের সুন্দর বাড়িও ছিল। গঙ্গার দিকে বারান্দা ও ঘরগুলিতে কাচ বসানো। হিল স্টেশনের শৌখিন বাড়ির মত। কিন্তু স্বামীজী নিজে থাকতেন পাশে এক ছোট্ট কুটিরে। বাড়ি খালি পড়ে থাকত। আমায় অনেকবার বলেছিলেন, ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকবার জন্যে। কিন্তু গিয়েছিলাম বটে, থাকা হয় নি। বন্ধুবান্ধব ক্বচিৎ কেউ ঐ অঞ্চলে গেলে স্বামীজীর কাছে পরিচয়-পত্র দিতাম। তিনি

সানন্দে তাঁদের গ্রহণ করতেন। স্বামীজী শিক্ষিত ব্যক্তি। ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে, সদ্-আলাপ-আলোচনায় ও জপ-তপে দিন কাটাতেন। ত্রিশ বছরের উপর হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিলেন। তারই মধ্যে কয়েক জায়গায় তাঁর সাক্ষাৎ পাই। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ষাট-এর কোঠায় বয়স হলেও অটুট স্বাস্থ্য। বিধিনিয়মে বাঁধা জীবনধারা। আহার-বিহারে কঠিন সংযম। পত্রযোগেও আমার সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন। বছরখানেক আগে লিখেছিলেন, হঠাৎ অসুস্থ হয়েছেন। ফলে শহরের হাসপাতালেও যেতে হয়েছে। কাঁপা হাতের হরফে ছোট্ট চিঠির মধ্যে তাঁর রোগের গুরুত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেতাম, কিন্তু রোগের স্বরূপ জানতে পারি নি। হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়ে লিখলেন, স্বাস্থ্য ভেঙেছে। রোগভোগের উপশম হলেও নিরসন হয় নি। যতদিন এ দেহ থাকবে দুর্ভোগও চলবে। দেহের এই-ই তো ধর্ম।

বন্ধু যখন সেখানে যাবার কথা বললেন, স্বামীজীর উল্লেখ করলাম। বললাম, কয়েক মাস তাঁর খবর পাই নি। হিমালয়ের যেসব অঞ্চলে ছিলাম, চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের সুবিধে ছিল না। আবার শীঘ্রই বেরিয়ে যাচ্ছি। আপনি আমার নাম করে লিখে দিন, ওঁর ওখানে আপনার থাকা সম্ভব হবে কিনা। শরীর তাঁর এখন কেমন আছে বিশেষ করে জেনে নেবেন। বেশি অসুস্থ থাকলে তাঁর কাছে থাকবেন না, তাও জানাবেন। ওষুধপত্র বা অন্য কোন পথ্য এখান থেকে নিয়ে যাবার থাকলে আপনাকে নিঃসঙ্কোচে জানাতে লিখবেন।

বন্ধু সাধু-সেবার সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। বলেন, নিশ্চয়। সে সৌভাগ্য কি আমার হবে?

কয়দিন পরের কথা। সেইদিনই হিমালয়-যাত্রা করছি। বন্ধু টেলিফোন করলেন। স্বামীজীর চিঠির উত্তর এসেছে। তাঁর থাকার সম্বন্ধে লিখেছেন, উমাপ্রসাদবাবুর বন্ধুর আপনি, আপনার নিজের যদি এখানে অসুবিধা বোধ না হয়—আশ্রমের দ্বার অবারিত। শরীরের বিষয়ে জানিয়েছেন সেই সংক্ষিপ্ত এক কথা, মানুষদেহ যতদিন আছে, রোগভোগও ততদিন থাকবে।—প্রয়োজনীয় কোন কিছু দ্রব্যের আবশ্যকতা থাকার কথা নয়। নেই-ও। তবে যখন এ-বিষয় লিখেছেনই, একটা কথা লিখি। সম্ভব হলে সঙ্গে আনবেন আপনার বন্ধুকে, বহুদিন দেখি নি। আনতে পারেন তাঁকে?

চিঠির কথাগুলি শুনে মনটা কেমন করে উঠল।

সেইদিনই ট্রেনে উঠেছি। গন্তব্যস্থল হিমালয়ের অন্যত্র। কিন্তু ভাবলাম, দু-দিন পরেই না হয় সেদিকে যাব। স্বামীজীর কথাগুলি যেন টানতে থাকে।

গেলামও তাঁরই আশ্রমে।

বিকেল বেলা। ভাগীরথী তীরে। হিমালয়ের এককালের নিভৃত শান্ত অঞ্চল। সাধু-সন্তদের বহুবাঞ্ছিত তপোভূমি। আধুনিক সভ্য যুগে বাসপথ সেই শান্ত আবহাওয়ার বুক চিরে চলেছে। উদ্ধত ভাবে। নবীন সমৃদ্ধ শহর উঠছে। ধর্মশালায় সরকারের দপ্তর বসেছে। বুভুক্ষিত সভ্যতা সাধুদের আশ্রম গ্রাস করতে চলেছে।

আশ্রমের সদর দরজা বন্ধ। মৃদু আঘাতেই খুলে গেল। বাগানে জঙ্গল ভরা। তবুও ফুল ফুটেছে। মানুষের বিনা যত্নেও। চারিদিকে নীরব। কেমন একটা ছমছমে ভাব। সন্তর্পণে স্বামীজীর কুটিরের দিকে এগিয়ে যাই। দরজার সামনে চিক্ ফেলা। ভিতরে কে যেন কি পড়ছেন। চাপা গলায়। অস্ফুট শব্দ করি। অপরিচিত কণ্ঠে মৃদু আহ্বান পাই, আসুন।

চিক্ তুলে দরজার সামনে দাঁড়াই।

ছোট ঘর। বাঁদিকে একটা চৌকি পাতা। উপরে কম্বল-শয্যা। দেওয়ালের তাকের উপর কতকগুলি বই, কাগজপত্র, লেখবার সাজ-সরঞ্জাম, কয়েকটি ওষুধের শিশি। চৌকির পায়ের কাছে ছোট জানালা। তারই খুপরিতে একটা লণ্ঠন ও পাথরের বাটি। ঘরের অপর কোণে নর্দমার কাছে এক বালতি জল, একটি কমণ্ডলু। আর এক কোনায় দণ্ডীধারীর দণ্ড। গেরুয়া কাপড় জড়ানো। তারই কাছে মাটিতে কুশাসনে বসে আছেন এক ব্রহ্মচারী। চৌকির উপর একজন গেরুয়াবাস সাধু বসে। তাঁর হাতে খোলা একখানি গ্রন্থ। বুঝলাম, ইনিই পাঠ করছিলেন। যাঁকে শোনাবার জন্য পাঠ—তিনি বসে আছেন সামনে এক চেয়ারে। দরজার দিকে মুখ করে।

ইনিই কি স্বামীজী? আশ্চর্য হয়ে তাকাই। বহুবার তাঁকে দেখেছি। একসঙ্গে থেকেছি। দেখেই

না-চেনবার কথা নয়। তবুও প্রথম দর্শনে সন্দেহ জাগে। কিন্তু তখনই মনে হয়, নিশ্চয় ইনিই হবেন, এ যে তাঁরই আশ্রম। আকৃতির প্রভূত পরিবর্তনের মধ্যেও তাঁর প্রচ্ছন্ন পরিচয় তখন প্রকাশ পায়।

স্বামীজীকে এর মাত্র বছর দুই আগেও দেখেছিলাম। দীর্ঘাঙ্গ। সবল সুস্থ। লম্বা মুখ। মাথা, দাড়ি গোঁফ —কামানো।

কিন্তু এখন চেয়ারে বসে আছেন দেখি, স্থূলকায় এক বিপুল দেহ। প্রকাণ্ড চেয়ারখানি জুড়ে আছে গেরুয়া চাদরে জড়ানো এক মাংসপিণ্ড। হাতলের উপর হাত রাখা,—আঙুলগুলি বেরিয়ে আছে, অসম্ভব ফোলা। মাথা থেকে লম্বা সাদা চুলের জট নেমেছে। প্রকাণ্ড গোলাকার মুখ। বুক অবধি দাড়ি ঝুলছে। সেই দাড়ি-গোঁফ-ভরা ফোলা গালের উপরে চোখ দুটি কোন রকমে খোলা। আবিল দৃষ্টি।

আমার দিকে স্তম্ভিতভাবে ক্ষণিক তাকিয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে টেনে টেনে বললেন, উ-মা প্র-সা-দ! আ-স-বে আ-স-বে, দে-খা হ-বে-ই জা-ন-তা-ম।

আর কথা ফুটল না। দু-চোখের বাঁধ ভেঙে ঝরঝর করে ধারা নামল। কখনও তাঁর অঙ্গস্পর্শ করি নি। তবু কিসের এক টানে এগিয়ে গেলাম। মাথাটি কোলের কাছে নিয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়ালাম।

হিমালয়বাসী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তবুও দেখি, রোগীর দেহের মাঝে চিরন্তন শিশু।

আশ্রমে উঠব ভেবেছিলাম। তিনি বলেন। তবুও থাকি না। কেন না, দেখি, তিনি উত্থানশক্তিরহিত। তাঁরই আশ্রমে তাঁরই কাছে থাকব, অথচ তিনি অসহায়ভাবে পড়ে থাকবেন,—আমার উপস্থিতি তাঁর এই অবস্থায় নিশ্চয় দুশ্চিন্তার কারণ ঘটাবে। অতএব নিকটে অন্যত্র থাকি। যখন-তখন তাঁর কাছে আসি।

স্থানীয় ডাক্তারটি বাঙালি। তাঁরই চিকিৎসাধীনে প্রথম ছিলেন। এখন চিকিৎসার বাইরে। তবুও ডাক্তারবাবু রোজই এসে দেখে যান। খোঁজখবর নেন।

ডাক্তারের কাছে তাঁর অসুখের ইতিবৃত্ত শুনি।

বছরখানের আগে রোগ ধরা পড়ে। ক্যান্সার। মূত্রনালীতে। ডাক্তারেরই উপদেশ ও ব্যবস্থামত শহরে হাসপাতালে তাঁকে পাঠানো হয়। অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। নালীটি বাদ দিয়ে এখন পাইপ লাগানো আছে। ফিরে এসে কিছুকাল শরীর অনেকটা সুস্থ ছিল, দেহে বলও পাচ্ছিলেন। মাসাবধি আবার হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সারা অঙ্গ অতিমাত্রায় ফুলে গেছে। কোন ওষুধেই সাড়া দিচ্ছে না। ডাক্তারি চিকিৎসা বন্ধ হয়েছে। স্থানীয় এক স্বামীজী কবিরাজী ওষুধ জানেন। দিচ্ছেন। এক ব্রহ্মচারী এখন কাছে থেকে সেবা করেন। কতদিন করবেন জানা নেই। কেউই দু-চার দিনের বেশি থাকতে পারেন না। এমন রোগীর বেশিদিন একটানা শুশ্রূষা করা কঠিন। টাকা দিয়েও এখানে লোক মেলে না। অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবু মন্তব্য করেন, দেখেছি তো মশাই, কিছুদিন পরে পরম আত্মীয়স্বজনই ছেড়ে চলে যায় এসব রোগীকে। নেহাত না যেতে পারলে মনে মনে ভাবে, রোগীর রোগভোগের মুক্তি হবে কবে,—তারও আপদের শান্তি! এ স্বামীজীর এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি। চিকিৎসায় যে আর কিছু হবার নেই এবং রোগভোগের তাঁর শীঘ্রই শেষ হবে—এ সবই তিনি জানেন। নির্বিকার হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। স্বামীজীর রোগের যা অবস্থা তাতে অন্য যে কোন রোগীই দু-এক দিনে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এঁর হৃদ্‌যন্ত্র এখনও এত সক্ষম ও সতেজ যে মাস-দুইয়ের মধ্যে এঁর শান্তি মিলবে না।

ডাক্তারের কথা শুনি আর ভাবি, ব্যাধির গতিবিধি কি সর্বত্রই। যতদিন মানুষদেহ, ততকালই নিগ্রহ। হিমালয়ের শান্ত আশ্রমে দীর্ঘ তপস্যায় কাটিয়েও রোগভোগের অন্ত কই।

ডাক্তার বলতে থাকেন, কি অসীম সহ্যগুণ স্বামীজীর! হবার কথাই। বছর দুই এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। অনেক অবস্থাতেই দেখছি। যেমন বিদ্বান, তেমনি মধুর ব্যবহার! যদিও কঠোর জীবনযাপন করতেন। এই তো সত্যিকারের সাধু। সাধারণ লোকের কাছে তো বটেই, সাধু-সমাজেও দেখেছি এঁর প্রচুর খ্যাতি ও সম্মান। অথচ কি ভোগাটাই না ভুগছেন। আমার কিছু করবার নেই, তবু যাই রোজ দেখতে। না গিয়ে পারি না।

আমি বলি, সাধুরাও আসেন দেখলাম!

ডাক্তার বলেন, তা তো আসবেই। কিন্তু ওঁদের কথা না বলাই ভালো। আছেন বটে কয়েকজন সত্যিকার ভালো লোক। রোজ এসে ওঁর কাছে বসেনও। কিন্তু—তারপর চাপা গলায় বলেন, অনেক

কিছুই দেখলাম এইসব পুণ্যতীর্থেও। এখানে তো চারিদিকেই সাধু। অথচ এখন বেশ জেনেছি, গেরুয়া পরলেই সাধু হয় না। হিমালয়েও নয়। এঁর অসুখের মধ্যেই তার প্রমাণ পেলাম। ইনি তখন এখানে আমার হাসপাতালে। রোগের কঠিন অবস্থা। অনেকেই আসেন খোঁজখবর নিতে। রোগনির্ণয়ও হয়েছে। সকলে জেনেছেনও। সাধারণ লোক শুনে চিন্তিত হয়ে বলে, 'আহা, এত বড় সাধু, তাঁর এমন অসুখ! ভালোয় ভালোয় সেরে উঠুন। যতদিন থাকেন, আমাদেরই সৌভাগ্য।'—কেউ বা গিয়ে মন্দিরে পুজো দেয়। সাধুরাও আসতেন খবর নিতে। কিন্তু অবাক হয়ে যাই, যখন তাঁদেরই মধ্যে দু-একজন আমাকে গোপনে ডেকে নিয়ে যান, চুপিচুপি বলেন, 'কুৎসিত কোন রোগ নাকি ডাক্তারবাবু? লুকোবার দরকার নেই, আমার কাছে বলবেন তার আর ক্ষতি কি? কারও কাছে তো প্রচার করছি না।' আমি যত তাঁদের জানাই সে ধরনের কোন কিছুই নয়, তবুও তাঁরা পীড়াপীড়ি করেন। স্তম্ভিত হয়ে দেখি মশাই, আমার উত্তর তাঁদের মনোমত হয় না।—অথচ তাঁরাও গেরুয়াধারী। এখানে তাঁদেরও নাম-ডাক আছে।

আমিও স্তব্ধ হয়ে শুনি।

স্বামীজীর কাছে গিয়ে বসি। আমি কখনও-সখনও কথা বলি। তাঁকে বলতে দিই না। কথা বলায় কষ্ট হয় দেখি। কাসির দমক আসে। গাঢ় শ্লেষ্মা ওঠে। পাশেই মরচে-পড়া টিনের একটা কৌটা। তাতে ফেলেন। ফেলে ধুঁকতে থাকেন। চোখ দিয়ে জল ঝরে। এ জগতে মুছে দেবার কেউ নেই। নিজেও মোছেন না। তবুও মুখে কাতরতা-জ্ঞাপন কোন ধ্বনি ওঠে না। শান্তভাবে বসে থাকেন।

সেই প্রথম দিন অকস্মাৎ দেখা হওয়ার সময়ে একবার মাত্রই ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছিল। তার পর কয়েকদিনের মধ্যে কখনও কোন ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখি নি। সম্পূর্ণরূপে নিরাসক্ত, নির্বিকার। অথচ বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্র হ্রাস নেই। স্মৃতিশক্তিও প্রখর আছে। সামান্য কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তরের ফাঁকে তার প্রমাণ পাই। আমার বন্ধুটির চিঠির কথা বলেন। আশ্চর্য হয়ে বলি, আপনার এই অবস্থা, তবুও তাঁকে এখানে উঠতে নিষেধ করেন নি! আমি এসেই তাঁকে খবর দিয়েছি, এখানে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আশ্রমে ওঠা কোন রকমেই চলবে না।

ফোলা মুখে তাঁর হাসির রেখা ফোটে। চোখ দুটি আরও কুঁচকে যায়। অদ্ভুত দেখায়। বলেন, উঠতেন না হয় এখানে। থাকতেন ওদিকের ঘরগুলিতে। এ শরীরের মাস দুয়েকের মধ্যে হবার তো কিছুই নয়, ডাক্তারই বলেছেন। তবে তাঁদের নিশ্চয় অস্বস্তি বোধ হত। তা ভালোই করেছেন।

আমাকে চিরকাল 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। সেদিন প্রথম দেখার সময় তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিলাম। এখন আবার 'আপনি' বলায় হেসে বললাম, কি হল, আজ আবার 'আপনি'তে ফিরে গেছেন?

আবার মৃদু হাসলেন। বললেন, কি জান? ওটা স্বভাব হয়ে গেছে। একবার এক ভক্তের সঙ্গে একটি যুবক এসেছিলেন। স্নেহভরে তাঁকে 'তুমি' সম্বোধন করেছিলাম। শিক্ষিত পুরুষ। তাঁর সম্মানে আঘাত লাগল। কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিলেন। তারপর থেকে সবাইকে আপনি বলাই অভ্যাস হয়ে গেছে। সামান্য সম্বোধনের মধ্যে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টিতে কাজ কি? এই তো ক'দিনের পরিচয়।

চুপ করেন। একদৃষ্টে দরজা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকেন। কোন কিছুর প্রতি নয়। উদার নীল আকাশের পানে নয়, বিরাট হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরের দিকেও নয়। লক্ষ্যবিহীন দৃষ্টি। এই পঞ্চভূতময় জগতের সবকিছুর মূল্য যেন তাঁর কাছে নিঃশেষ হয়েছে। জাগ্রত সজীব জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। পৃথিবীর কেউ তিনি নন। মৃত্যুর রহস্যময় গুহা অতিক্রম করে জীবনোত্তর অজানা এক লোকের সন্ধান যেন তিনি পেয়েছেন। সেখানে শোক নেই, দুঃখ নেই, রোগভোগের গ্লানি নেই,—শুধু এক অপার প্রশান্ত আনন্দ। মনে হয়, জীবনের প্রান্তদেশে নবতর বিজয়যাত্রার যাত্রী পরপারের জ্যোতির্ময় রাজ্যের রূপ দেখছেন।

তাই কাছে বসে দেখি, শান্তভাবে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করার তাঁর অসীম ক্ষমতা, শান্তিপ্রদ আসন্ন মরণের জন্য তাঁর নীরব প্রতীক্ষা।

মনে আসে War and Peace-এর একটি চরিত্র-চিত্র। Prince Andrewর জীবনের শেষ দিনগুলির কথা। গুণী, জ্ঞানী, সম্ভ্রান্ত পুরুষ। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত হয়েছেন। পশ্চাৎপদ সৈন্যদল তাঁকে শহরে এনেছে। চিকিৎসার সব কিছু সত্ত্বেও জীবনের আশা নেই। আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তাঁর দিন কাটে। পরম আত্মীয়স্বজন কাছে আসেন। অতি প্রিয়জন সেবা করেন। কিন্তু তিনি বন্ধনমুক্ত,

নির্লিপ্ত। ঋষি টলস্টয় বর্ণনা দিয়েছেন :

"It seemed that he did not understand what was living, not because he had lost the power of understanding, but because he understood something else that the living did not and could not understand, and that entirely absorbed him...He experienced a sense of aloofness from everything earthly, and a strange and joyous lightness in his being. Neither impatient, nor troubled, he lay awaiting what was before him...The menacing, the eternal, the unknown, and remote, the presence of which he had never ceased to feel during the whole course of his life, was now close to him, and...from that strange lightness of being, that he experienced—almost comprehensible and palpable."

॥ ১৮ ॥

এগিয়ে চলি মহাপ্রস্থানের পথে। সামনে রেখে স্বর্গারোহণী।

সত্যপদ হ্রদ থেকে ঘণ্টাখানেক গিয়ে সোমকুণ্ড। মাইল দেড় হবে, শুনি। সেই শতোপন্থ গ্লেসিয়ারের চাপা-পড়া তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়ে চলা। কোথাও বা সেই শিরদাঁড়া পথ। কুণ্ডটি ছোট। হাত কুড়ি-পঁচিশ মাত্র পরিধি। তুষার-তরলিত স্বল্প জল। যেন বৃহৎ এক শ্বেতপাথরের পাত্রে নির্মল সুনীল বারি সঞ্চয় করে রাখা। গরলপায়ী নীলকণ্ঠ পান করবেন। শোনা যায় চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে কুণ্ডে জলের পরিমাণও কমে, বাড়ে। অমাবস্যায় সম্পূর্ণ জলশূন্য হয়। হয়তো সব জল জমে যায়। এখান থেকে আরও ঘণ্টাখানেকের পথ সূর্যকুণ্ড। এই ধরনের ছোট ছোট কুণ্ড এসব তুষাররাজ্যে আরও আছে। রুদ্রকঠোর হিমাঞ্চলে স্ফটিকস্বচ্ছ সুনীল জলে স্নিগ্ধতার ইঙ্গিত পাই। যেন যোগীবর গিরিরাজ্যের আবেশ-বিভোর নয়নে শান্ত মধুর দৃষ্টি।

সামনে কিছুদূরে গগনস্পর্শী পর্বতশ্রেণী। হিমবান্ মহাশৈল। বিরাট আকার। যাত্রাপথে প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওরই নাম বদরীনাথ পর্বত। সার্ভের ম্যাপ-এ বলে চৌখাম্বা। ঐদিক থেকে নেমে এসেছে এই শতোপন্থের হিমবাহ, অপরদিকে নেমে গেছে গঙ্গোত্রী-গ্লেসিয়ার। ঐ পর্বতের গিরিসঙ্কট দিয়ে যেতে পারলে মদমহেশ্বরেও নামা যায়। কেদারনাথেও পৌঁছানো চলে। তবে সাধারণ যাত্রীর পক্ষে এসব সম্ভব নয়। পর্বত-আরোহণের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা চাই, সাজসরঞ্জাম চাই, দেহের বল এবং অন্তরের সাহস ও সঙ্কল্প চাই। যোগী-ঋষিদের কথা স্বতন্ত্র। অভিযাত্রী দল দু-একটা গিয়েছে শোনা যায়। চৌখাম্বা শিখরেও উঠেছেন। বিদেশীও, ভারতবাসীও। সেসব হল ভৌগোলিক হিমালয়ে দুঃসাহসী মানুষের পর্বত অভিযানের অতি-আধুনিক রোমাঞ্চকর কৃতিত্ব। বিপদবহুল শৈলশিখরের অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। সে আহ্বান যার প্রাণে বাজে, ঘর-ছাড়া করে তাকে পাহাড়ে টানে। সে ডাকে সাড়া দিয়ে তার অপূর্ব আনন্দ।

কিন্তু আজ এখানে মনে আবেশ মাখায় পৌরাণিক কাহিনী। কল্পনার রথে বসে মন ছুটে চলে কোন্ এক অতীত যুগে। 'মহাভারতে'র মহাপ্রস্থানের যাত্রীদের সঙ্গে।

বৈরাগীজি শ্রদ্ধাভরে দেখান, দেখুন সামনে স্বর্গারোহণী।—স্বর্গের সোপান।

তাকিয়ে দেখি, প্রকৃতই দূরে হিমগিরির অঙ্গে তুষার-সোপান উঠেছে। পর্বতের শিখরদেশ থেকে ভেঙে-পড়া বরফের স্তূপ স্তরে স্তরে নেমে এসেছে। বোঝা যায় হিমানী সম্প্রপাতের avalanche-এর ফল। কোথাও বা হিমবাহের—glacier-এর স্বাভাবিক নিম্নমুখ জমাট তুষারের গতিপথ। দূর থেকে দেখায় সোপানশ্রেণীর ধাপ নেমেছে।

বাস্তববুদ্ধি সবই বোঝায়। তবুও নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। কানে আসে বৈরাগীজির কথা—মহাভারতের কাহিনী। প্রাণে পুলক জাগায়। যুধিষ্ঠির নাকি স্বর্গে গেছেন ঐ পথ ধরে। সোপান-শ্রেণীর ধাপে ধাপে উঠে। পিছনে ফেলে গেছেন জীবনসঙ্গিনী দ্রৌপদীকে, চিরসহচর চার সহোদরকে। সঙ্গে আছে তখনও পথের সঙ্গী সামান্য সারমেয়—পথের কুকুর।

বৈরাগী অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখান, ঐ স্বর্গের সিঁড়ির উপর এসে নেমেছিল স্বর্গের রথ। রথ থামিয়ে ইন্দ্র আবাহন করলেন, মহারাজ, স্বর্গের যান এসেছে আপনাকে নিয়ে যেতে। যুধিষ্ঠির যেতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করেন—পিছনে যে পড়ে আছেন দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ। দেবরাজ আশ্বাস দেন, তাঁরা

সকলেই মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে স্বর্গে উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গী কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির রথে যেতে চান। ইন্দ্রদেব জানান, কুকুর অপবিত্র, তার সঙ্গ ত্যাগ করতে। বলেন, এতে নিষ্ঠুরতা নেই।—'ত্যজ শ্বানং নাত্র নৃশংসমস্তি'।—কুকুর ত্যাগ করে স্বর্গলোকপ্রাপ্ত হোন—'শুনস্ত্যাগাৎ প্রাপ্যসে দেবলোকম্'। কিন্তু ধর্মপুত্রের ধর্মবুদ্ধি। স্বর্গের দ্বারে এসেও ধর্মত্যাগে আপত্তি। স্বর্গলাভের আশাও তিনি ত্যাগ করতে প্রস্তুত, ভক্তত্যাগে তিনি অসম্মত। বলেন, ও যে আমার আশ্রয়প্রার্থী, পথের সাথী। ওকে ত্যাগ? সে যে ব্রহ্মবধের সমতুল্য। ইন্দ্রদেব স্বর্গের লোভ দেখান। যুধিষ্ঠির অটল। বলেন, স্বর্গসুখের লোভেও ভক্তকে ত্যাগ করে ধর্মের হানি করব না।

বৈরাগী মন্তব্য করেন, দেখুন, স্বর্গের দ্বারে এসেও ধর্মের পরীক্ষার বহর!

শিশিরবাবু আমাদের সঙ্গী কুকুরটির দিকে তাকাতে থাকেন।

বৈরাগী হাসেন। বলেন, যুধিষ্ঠিরের কুকুর—মূর্তিমান ধর্মরাজ—নিজমূর্তি প্রকাশ করলেন। তারপর—

স তং রথং সমাস্থায় রাজ কুরুকুলোদ্বহঃ।
উর্ধ্বমাচক্রমে শীঘ্রং তেজসাবৃত্য রোদসী।

যুধিষ্ঠির ঐ সোপান-শেষে রথে বসে সশরীরে স্বর্গের পথে ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগলেন। তাঁর তেজঃপুঞ্জে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হল।

সেইদিকে তাকিয়ে থাকি। তুষার-শিখর থেকে সাদা মেঘের পুঞ্জ বাতাসে ভেসে ভেসে নীল আকাশে উঠতে থাকে। ভাবি, ঐরকমই মেঘের অন্তরালে বুঝি অন্তর্হিত হয়েছিল স্বর্গের রথ।

মনে পড়ে যায়, শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ'র শেষ দৃশ্য। মায়ের শ্মশানশয্যার পাশে বসে কাঙালীর স্বপ্ন দেখা।

"সবাই সকল কাজে ব্যস্ত—শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী উর্ধ্বদৃষ্টিতে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।"

কাঙালী অভাগা। দীন-দরিদ্র। বিদ্যাবুদ্ধিহীন। তাই সরল বিশ্বাসী। স্বর্গের রথে মায়ের স্বর্গযাত্রা চোখে দেখে।

মহাভারতের অমর কবিও মহাকাব্যে স্বর্গ রচনা করেন। বিশ্বাসী মানুষের মন বাস্তব জগতে হিমালয়ের হিম-শিখরে সেই স্বর্গের সোপান গড়ে। মানসচক্ষে স্বর্গের রথ নামায়, ওঠায়—

'সহজ বিশ্বাসে,
যে বিশ্বাস আপনার মাঝে তৃপ্ত থাকে
করে না বিরোধ,
আনন্দের স্পর্শ দিয়ে সত্যের প্রত্যয় দেয় এনে।'

সেই স্বর্গের সোপানতল থেকে দেহধারী ধরার মানুষ ফিরে চলে।

পথপাশে পড়ে থাকে হিমালয়ে সাধুদের জনহীন গুহাগুলি। আলো-আঁধারে ভরা। অনন্তকালের প্রহেলিকা-প্রচ্ছন্ন। জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার চিহ্নরূপে।

ভাবি, এই গুহাগুলিই ছিল এককালে আদিম মানুষের আশ্রয়স্থল। বর্বর অসভ্য মানুষ তখন বনচর। গৃহনির্মাণ অজানা কঠিন কর্ম। রৌদ্র-বৃষ্টিতে রাত্রের অন্ধকারে আশ্রয় নেয় প্রকৃতির স্বাভাবিক গুহার ভিতর। সেইখানেই সংসার পাতে। পাষাণ-শয্যায় শুয়ে স্বপ্ন দেখে। পাথরের গায়ে আঁচড় কেটে ছবি আঁকে। জীবজন্তুর আকার। প্রকৃতির নিপুণ নকল। সতেজ, বেগময়, প্রাণবন্ত রেখা। মানুষের শিল্পসৃষ্টির প্রেরণার প্রথম প্রকাশ। অরণ্য-বাসী মানুষ আহারের সন্ধানে বনে বনে ঘোরে। গাছের ফলমূল খায়। নদীর মাছ ধরে। বনের পশুপাখি শিকার করে। চকমকির আঘাতে আগুন জ্বালায়। চাকার আবিষ্কার করে। মানুষের উদ্ভাবনী-শক্তির প্রথম উন্মেষ হয়। জাগ্রত প্রাণে আলোকের দ্যুতি দেখে। বিজ্ঞানের বুদ্ধি জাগে। জ্ঞানের স্পৃহা আনে। সুদূরের ডাক শোনে। গিরিগুহা ছেড়ে বনপ্রান্তরে নেমে আসে। অরণ্য কেটে শহর তোলে। এককালের গুহাবাসী মানুষ পৃথিবী জুড়ে সুসভ্য মানবজাতির প্রতিষ্ঠা করে। পরিশ্রমে,

যত্নে, চেষ্টায়, শিক্ষার গুণে, বুদ্ধির বলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ দেখায়। নিখিল বিশ্বের অসীম রহস্য মনে তার কুহক জাগায়। তারই উন্মাদনায় মানুষ মত্ত হয়। পৃথিবী ছেড়ে গ্রহলোকে ছুটে চলে। আদিম কালের সেই গুহাবাসী মানুষ সভ্যতার আস্তরণে লুপ্ত হয়। আত্মসুখ-সমৃদ্ধির শিখরে ওঠে। কিন্তু কুসুমেও কণ্টক থাকে, কীটে বাসা বাঁধে। বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞানের গরিমা, ধন-সম্পদের দম্ভ মানুষের মনে স্পর্ধা জাগায়। রিপুর দংশন ফোটে। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ঈর্ষা আসে। দ্বন্দ্ব বাধে। ভোগের লিপ্সা, রাজ্য-বিস্তারের লালসা, শক্তির দুর্জয় প্রতাপ ধ্বংসের মুখে টানে। কত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, কত সভ্যতার বিলোপ হয়।

'ভিত্তি যার ধ্রুব বলে হয়েছিল মনে
তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয়নর্তনে।'

নিমেষে সব ভেঙে পড়ে। তবুও আশাবাদী মানুষ আবার ওঠে। নতুন স্বপ্ন দেখে। জীবনের শুষ্ক বালুচরে আবার স্ফটিকের প্রাসাদ তোলে। ভাবে, জীবনের এই সত্য, এতে পাব সুখ।

কিন্তু প্রকৃত শান্তির তথাপি সন্ধান মেলে না। অতৃপ্ত বাসনা, অনন্ত কামনা অন্তর আকুল করে। যেন বিধাতার অভিশাপ। 'নিসর্গের নিষ্ঠুর নিয়ম'।

অপরদিকে জেগে ওঠেন আর একদল মানুষ। ভিন্ন গোত্র। ভিন্ন দৃষ্টি। বৈরাগ্যব্রতী সন্ন্যাসীর দল। জাগতিক সভ্যতার সব কিছু দান হেলায় ফেলে দেন। ধীরপদে দৃঢ়মনে ফিরে চলেন হিমালয়ের গুহামুখে। সংসারের শতকর্ম থেকে ভীরু পলায়ন নয়। জীবন-যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার নয়। কঠিন কর্তব্যের গুরুভার বহন করে, অনিত্য জগতে শাশ্বত সত্যের সন্ধানে। মুক্তির জয়যাত্রায়। নিখিলের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নয়, অন্তর্মুখী অভিযানে। সসীম থেকে অসীম অনন্তে। আত্মা থেকে পরমাত্মায়। অন্তরের ক্ষীণদীপ জ্বেলে চির-জ্যোতির্ময়ের মিলন সন্ধানে।

তাঁরা আশ্রয় করেন ভাগীরথী-তীরে। শিবজলা, পুণ্যা, সৌম্যা, মহানদী, দেবর্ষিগণসেবিতা দেবনদীর উপকূলে। ধ্যানে বসেন তাঁরা একান্তে নিভৃত গিরিগুহায়। দেবতাত্মা হিমালয়ে।

এইরূপেই ঘটে সত্যসন্ধানী মানুষের হিমালয়ে পুনরাবর্তন।

এইভাবেই বইতে থাকে চির-মানবের ইতিহাসের অনন্ত প্রবাহ। আঁধার-ঘেরা গিরি-কন্দর থেকে মানব-সভ্যতার নীল-সাগরে। তারপর আবার ফিরে আসা হিমাচলের গুপ্ত-গুহায় লুপ্তরত্নের আশায়।

সত্যের অমৃতরূপের সন্ধানে ফেরে অতৃপ্ত মানব।
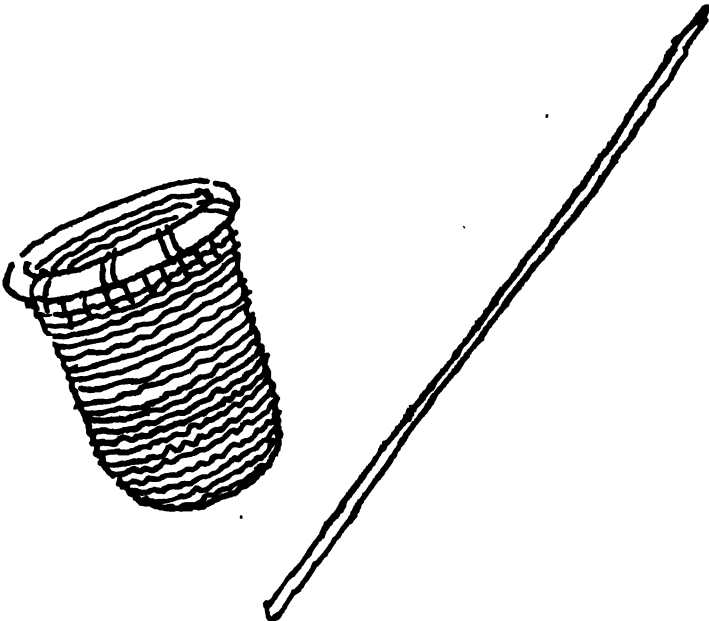
কেদারনাথ—সেকাল ও একাল

॥ ১ ॥

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। ১৯২৮ সাল। সেই আমার প্রথম কেদার-বদরী যাত্রা। সে-যাত্রার কি সমাপ্তি নেই? পৃথিবী ঘোরে, বছরও ঘুরে আসে, আমিও ঘুরি। এই দু'বছর আগেও গিয়েছি। কিন্তু সেই প্রথম যাত্রার বিপুল উৎসাহ, আকুল আগ্রহ আজ আর নেই। তখন ছিল বাঁধভাঙা নদীর প্রবল উচ্ছ্বাস। প্রচণ্ড বেগ। এখন শান্ত ধীর গভীর জলের অচঞ্চল প্রবাহ।

বয়সে দেহের শক্তি কমে। মনের কৌতূহল মেটে। এখন হৃদয়-ভরা হিমালয় পথের আনন্দ। সারাজীবনের সঞ্চিত অমূল্য সম্পদ। দূরে বসেও সে-আনন্দের অপার্থিব স্বাদ পাই। যেমন ভাবে যেখানেই থাকি না কেন,—দেহ-মন তারই সৌরভে সুরভিত, স্মৃতি-বিজড়িত, আনন্দ-দীপ্ত। পায়ে না চলেও মনে পথ-চলার পরম আনন্দ। যেন, ঘটে ভরে-রাখা গঙ্গাজল।

তাই ভাবি, ট্রেন-বাস-এর ভিড় ঠেলে আর যাওয়া নয়। যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। ভাবি তাই। তবু, আবার যদি চলেও যাই, আশ্চর্য নয়। হিমালয়ের এমনই দুর্নিবার আকর্ষণ। বার বার পথে টানে। কেন টানে? কিসে টানে? কে জানে!

কিন্তু প্রথম যে-বছর যাই, হিমালয়কে এমনভাবে চিনতাম না।

দার্জিলিং গিয়েছি তার আগে কয়েকবারই। কালিম্পং-এর পথেও ঘুরে এসেছি। অন্যান্য হিল-স্টেশনেও। হিমালয়ের সে এক ভিন্ন রূপ। সাগরতটে বসে সমুদ্র দেখা। অসীম অতল জলধির তরঙ্গ-দোলায় দোলার সে-আনন্দ কোথা?

১৯২৭ সালে হরিদ্বার-হৃষীকেশেও কদিন কাটাই। সেই সুযোগে প্রথম দেখা লছমনঝোলা।

কি ভাবে দেখেছিলাম, আজ আর ঠিক মনে নেই। তবু, স্পষ্ট মনে আছে, হিমালয়ের বিরাট রূপ ও গঙ্গার উচ্ছল সৌন্দর্য পরম বিস্ময় জাগায়। চারিদিকে ধ্যানমৌনী গিরিশ্রেণী। তারই মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসেন গৈরিকবসনা ভৈরবী জাহ্নবী। আলুলায়িত কুন্তলা।

মর্মে মর্মে অদ্ভুত এক আকর্ষণ বোধ করি কেদার-বদরীর পায়ে হাঁটা পথখানি দেখে। লছমনঝোলার অপর পারে পথের মুখে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। বিশাল হিমালয়। পদপ্রান্তে সরল রেখা টেনে দূরে চলে যায় নির্জন শান্ত পথ। নিবিড় অরণ্যের ঘন ছায়ায় হারিয়ে যায়। জননী জাহ্নবী হাত ধরে টেনে এনে তাঁরই কূল দিয়ে নিয়ে চলেন—পথহারা শিশু-পথরেখাটিকে।

অবাক হয়ে দেখতে থাকি। কোথায় চলে সে-পথ? মন টানে।

ঘরে ফিরি। কিন্তু, মনের গভীরে, দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরা-উপশিরায় সে-পথ একাকার হয়ে মিশে যায়। ঘরের বাহিরে টানে।

॥ ২ ॥

সাত বছর পরে ফিরে আসি।

১৯২৮ সাল। হিমালয়ের পথে পথে হাঁটা শুরু হয়। মায়ের সঙ্গে তীর্থে চলি। সঙ্গে অন্য সঙ্গীরাও আছেন। হৃষীকেশ থেকেই হাঁটা আরম্ভ। বাস-এর রাজপথ তখনও হিমালয়ের অন্দরমহলে পৌঁছয় নি। কেদার-বদরী দর্শন করে কর্ণপ্রয়াগ থেকে ভিন্নপথে ফেরা,—মেহেলচৌরী হয়ে রাণীক্ষেত। সেইখান থেকে বাস। কাঠগোদামে ট্রেন ধরা। হাঁটতে হবে সবসুদ্ধ প্রায় চার শ' মাইল।

চার শত মাইল! শুনে সবাই চমকে ওঠেন। শুধু মাইলের দূরত্বই নয়, হিমালয়ের দুর্গমতাও।

দাদারা নিষেধ করেন, না, না, হেঁটে যাওয়া চলবেই না। মায়ের জন্যে ডাণ্ডি তো থাকবেই, তোমার জন্যেও একটা রাখবে। দরকার না হয় উঠো না, কিন্তু সঙ্গে থাকবেই।

কথাও দিয়ে আসতে হয়। সঙ্গী পূর্ণদা বড় স্পোর্টসম্যান। তাই একসময়ে খেলায় হাঁটু ভাঙে। অতএব,

তাঁর সঙ্গে ভাগাভাগি করে ডাণ্ডি রাখা হয়। কিন্তু, সঙ্গেই থাকে। চড়ে বসার প্রয়োজন হয় না,—একদিনও। চড়তে ইচ্ছাও হয় না। আমারও নয়, পূর্ণদারও নয়। সারাপথ শূন্যযাত্রী সেই ডাণ্ডি চলে। ছোটখাটো দরকারী মালপত্র—চটিতে পৌছেই যেগুলি নিত্যপ্রয়োজন—-সেইগুলি চাপানো থাকে সেই ডাণ্ডিতে। ভারবিহীন ডাণ্ডি,—অপর ডাণ্ডিবাহকদের মনে ঈর্ষা জাগায়। বিদ্রূপ করে বলে—ওটা তো মালগাড়ি—গুড্স্ ট্রেন!

হরিদ্বার থেকে যাত্রার আগে পোস্ট-অফিস-এ যাই। কেদার-বদরীর পথে সাময়িক ডাকঘর কোথায় খুলেছে, তার তালিকা ও দূরত্ব দেখে হিসাব করি, কলকাতা থেকে কবে কোথায় চিঠি দিলে পাওয়ার সম্ভাবনা। নিজেদের দৈনন্দিন পথ চলারও প্রোগ্রাম করা হয়। পরামর্শ হয়, দিনে দশ মাইল হাঁটা—দু'বেলায়। দশ মাইল—হিমালয়-পথে! কম কথা! সেইমত হিসাব করে কলকাতায় জানাই, কবে কোথায় কোন্ পোস্ট-মাস্টারের কেয়ারে চিঠি দিতে হবে।

কিন্তু, পরে দেখা যায়, খাতায় পাতায় হিসাব ঠিক হলেও, পাটে হাঁটার গতিবেগের অঙ্কে ভুল হয়। এ-যেন নৌকা চলার বেগের হিসাব। স্রোতের টান, হাওয়ার হিসাবে ভুল। অভিজ্ঞতার অভাবে তখন ভাবতেই পারি না, হিমালয়ের পথ চলাই সহজ ধর্ম। তাইতেই আনন্দ। চরণযুগল চলার নেশায় সদাই মশগুল। যেন ভক্তের হাতে জপের মালা। ঘুরেই চলে। দেহে ক্লান্তি? সে তো নামবেই। কিন্তু পাহাড়ের আবহাওয়ার এমনি গুণ, ক্ষণিক বিশ্রাম সব শ্রান্তি নিমেষে দূর করে। ভোরের শিশির রোদের তাপে যেমন মিলায়। সামনের পথ হাত-ইশারায় ডাক দেয়,—বসে কেন? এগিয়ে চলো। দেখবে এসো—কি আছে, ঐ পাহাড়-পথের ঐ বাঁকে!

একদিনের ঘটনা। ফেরবার পথে। যাত্রা-শেষে নেমে চলি। পাহাড়ে পথ চলায় তখন অভ্যস্ত। সার্থক যাত্রার অপরিসীম আনন্দ, বিপুল উল্লাস সারাদিন পথ চলায়। দিনশেষের আশ্রয়ে পৌছুই। তখনও সূর্য ডোবে নি। চটির দাওয়ায় বসে পূর্ণদার সঙ্গে হিসাব করি,—সারাদিনে আজ কত মাইল হাঁটা হল? গুণে দেখি, পঁচিশ মাইল। দুজনেই উৎসাহে হাসি। গর্ববোধ করি। হিমালয়ে পঁচিশ মাইল! পায়ে হেঁটে—একদিনে! বন্ধুরা শহরে বসে বিশ্বাসই করবেন না।

তাকিয়ে দেখি, সামনে পথ দিয়ে এগিয়ে চলেন, একদল যাত্রী। কয়টি গুজরাটি মহিলা। বেঁটেখাটো। গোলগাল চেহারা। ফর্সা রঙ। পথ চলায় মুখ আরও রাঙা দেখায়। হেলেদুলে এগিয়ে চলেন। টাট্টু ঘোড়ার মত।

দেখেই চিনতে পারি। গতরাত্রে একই চটিতে এই যাত্রীদলও ছিলেন। আজ ভোরে সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করেন। তাঁরাও চলে এলেন। শুধু তাই নয়। আমাদের বসে থাকতে দেখে একমুখ হাসি নিয়ে বলেন, তোমরা বসে যে? এরই মধ্যে? এখনও তো বেলা রয়েছে,—আরও মাইল দুই চলা যাবে—

বলে উৎসাহে পরের চটির উদ্দেশে মেয়েরা এগিয়ে যান।

দুজনে পরস্পরের মুখের পানে তাকাই। গর্বের হাসি লজ্জায় মিশায়।

॥ ৩ ॥

সেই চারশ' মাইল পথ পায়ে হেঁটে তখন যেতে লাগত এক মাস। সেবার ২৯শে এপ্রিল হরিদ্বার থেকে বাস-এ সকালে রওনা হই। হৃষীকেশে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দুপুর আড়াইটেতে পদযাত্রা শুরু হয়। ২৮শে মে সকালে রাণীক্ষেতে পৌছেই বাস পাই। সন্ধ্যায় কাঠগোদামে ট্রেন ধরি।

আর এখন? হৃষীকেশে বাস-এ বসে সেইদিনই বিকালে গুপ্তকাশী। সেখান থেকে কেদারনাথ দুইদিনের হাঁটা পথ। বদরীনাথ-যাত্রায় হাঁটার আর প্রশ্নই ওঠে না। বাস থেকে নেমে বদরীনাথ দর্শন। আবার বাস-এ বসে হৃষীকেশে ফেরা। এক সপ্তাহেই যাত্রা-শেষ!

১৯২৮ সালে হৃষীকেশ ছেড়ে লছমনঝোলায় গঙ্গা পার হই নৌকা করে। ১৯২৪ সালে বন্যার প্রকোপে পুল ভেঙে যায়। এখনকার পুল তখনও তৈরি হয় নি।

লছমনঝোলা ছাড়িয়ে অপর পারে দু মাইল গিয়ে মনোরম চটি। সুন্দর সাজানো বাগান। সুশ্রী ঝরনা। বাঁধানো কুণ্ড। অল্প নীচেই গঙ্গা। ঝরনার উপর দিকে মাইলখানেক গেলে দেখা যায় ঝরনার জলে গাছ পাতা পাষাণীভূত বা fossilized হয়ে আছে। হয়ত গন্ধকের প্রভাবে। ছোট একটা জলপ্রপাত। পাহাড়ের

গায়ে গুহা। বদরীনাথের যাত্রামুখে মনোমুগ্ধকর পার্বত্যশোভা। চটির নামও তেমনি,—গরুড় চটি। নারায়ণ-মন্দিরের দ্বারী গরুড়। ভক্ত যাত্রীদের বিশ্বাস, এই কঠিন তীর্থপথে তিনিই যাত্রীদের নিত্যসঙ্গী। পাণ্ডাজীও জানান, পথ চলতে ক্লান্তিবোধ হলেই গরুড় ভগবানকে স্মরণ করনেন। নারায়ণের বাহন। নিজে এসে কাঁধে করে ভক্তকে নিয়ে যাবেন।

যাত্রীদের মুখেও তাই অনবরত ধ্বনি ওঠে, বোল, গরুড় ভগবান কী জয়!—সমস্বরে সবাই তখনই সেই একই রব তোলে।

গরুড় আসেন না ঠিকই। তবে সমবেত চিৎকারে যাত্রীর মনে উৎসাহ জাগে, পথ-চলার নব প্রেরণা আনে।

যুদ্ধক্ষেত্রে রণসঙ্গীত যেমন সৈনিকের মনে উন্মাদনা জাগায়।

বদরীনাথের সেই পুরানো যাত্রাপথ পরিত্যক্ত হলেও এখনও অনেকে হৃষীকেশ থেকে ছুটির দিন কাটাতে আসেন,—এই গরুড় চটিতে।

প্রথম রাত কাটে সেবার আরও দু'মাইল গিয়ে ফুলবাড়ি চটিতে। বিকেল বেলা। চটিতে মালপত্র সাজিয়ে গঙ্গার ধারে চলে যাই। চারিপাশে পাথর, নানান রঙের বহু আকারের। পাশেই তীরবেগে গঙ্গার ধারা বহে চলে। পাথরে আঘাত পেলে জল ছিটকে ওঠে। একটা বড় পাথরের উপর বসে দেখতে থাকি। জলের কলকল ধ্বনি শুনি। নদী যেন কথা বলে। যেমন, পাতাভরা প্রকাণ্ড গাছ। পাতার আড়ালে ছোট্ট পাখি। মধুর কণ্ঠে শিস দেয়। দেখা যায় না, শুধু সুরই শুনি। মনে হয় গাছই বুঝি পাতার খঞ্জনী বাজিয়ে গান ধরে।

যেদিকে তাকাই পাহাড়ের সারি। আকাশ পানে মাথা উঁচু করে। ওপারে গহন বন। এপারে যাত্রা-পথ, চটি। একদৃষ্টে ওপারে তাকিয়ে থাকি। কি জানি, বন্য পশু হয়ত নামবে জল খেতে। অরণ্য-রহস্যে-ভরা গঙ্গার অপর পার।

কালের বিচিত্র গতি। মোটরের পথ এখন চলে সেই পার দিয়ে। লছমনঝোলা পড়ে থাকে পথের পাশে—নীচে। এখন কেদার-বদরী-যাত্রায় সেই পার থেকে বাস-এ বসে তাকিয়ে থাকি। মোটর ছোটে। হিমালয়ের নিস্তব্ধতা ভেদ করে—সশব্দ গতিবেগে। এপারে দেখা যায়—যাত্রীশূন্য পরিত্যক্ত প্রাচীন যাত্রাপথ। ভেঙেপড়া চটির ঘরবাড়ি। দৈবাৎ দু' একজন লোকের অলস মন্থর গতি; এখন ওপারে নতুনজাগা লোকালয়, এপারে পুরানো পথের অতীত কাহিনী।

সেইবারে যাত্রাপথের প্রথম সন্ধ্যায় একটি জিনিস হারায়। অন্ধকার নামলে গঙ্গার তীর ছেড়ে চটিতে ফিরি। একটু পরেই জানতে পারি পকেট থেকে ঘড়িটা কোথায় পড়েছে। কখন কোথায় ফেলেছি বুঝতে পারি নি। গঙ্গার ধারে টর্চ জ্বেলে খুঁজি। কোথাও পাই না। মনে কিন্তু হারানোর দুঃখও জাগে না।

হিমালয়-পথের প্রথম পাঠ নিই, ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা সময় তীর্থপথে মুক্তি পায়। যেন, খাঁচার পাখি ছাড়া পেয়ে নীল আকশে উড়ে যায়।

এ-পথে যাত্রী চলে আকাশের আলো দেখে। রাতের আঁধার কাটার আগেই যাত্রী জাগে। চটিতে গুঞ্জরণ ওঠে। মালপত্র নেবার জন্যে কুলিরা এসে তাগাদা দেয়। যাত্রীর পোঁটলা-পুঁটলি রাত্রেই গোছানো, এখন কেবল বিছানা গুটানো। কোন রকমে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে পথ চলা শুরু। হয়ত যাত্রার আগে অল্প কিছু খাওয়া, না হলে খালি পেটে হাঁটলে অসুখের আশঙ্কা। ভোরের তখনও আলো ফোটে না। লণ্ঠন বা টর্চ-এর আলো পথ দেখায়। বিলম্বে যাত্রায় নিজেদেরই দুর্ভোগ আনে। একটু বেড়া বাড়লেই রোদের তেজ বাড়ে। পাথর তাতে। পথ চলায় কষ্ট হয়,—বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে।—দুপুরে আবার নতুন চটি। স্নান, আহার, বিশ্রাম। বিকালে আবার পথ চলা। রাত্রে চটিভরা যাত্রী। কানায় কানায় উপচে থাকে। নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য পথ। সকালে জনমানবহীন চটি। পথে সারি সারি যাত্রী। মেয়ে পুরুষের মিছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। কত বিচিত্র বেশভূষা। কিন্তু যাত্রার লক্ষ্য এক। এই দেখেই ভগিনী নিবেদিতা লেখেন, এই তীর্থপথে এসে বোঝা যায় ভারত এক মহাদেশ ও মহাজাতি। এইখানেই সেই জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি।

প্রথম চড়াই ছিল সে-পথে—বিজনীর চড়াই। গুলর চটিতে হিজলী নদীর পুল। নাইমোহনায় চড়াই শুরু। পরের দিন বিজনী থেকে পাহাড়ের অপর দিকে নামা। আবার গঙ্গার কিনারা: বন্দরমেলা চটি।

রাত্রি কাটাই সেইখানে। সন্ধ্যার আগেই খাওয়াদাওয়া সাঙ্গ। কম্বল-শয্যায় সারি সারি যাত্রী। চটির লম্বা ছাউনি। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় নতুন এক যাত্রীর সাড়াশব্দে। অনেক রাত্রে পৌঁছন। টর্চ জ্বেলে দেখে নিয়ে চটির এক কোণে কোনরকমে জায়গা করে শুয়ে পড়েন।

ভোরে যাত্রার জন্যে সকলে তৈরি হচ্ছি। গলার স্বর শুনে নতুন যাত্রী এগিয়ে আসেন।

আরে! ভোলাদা!

দেখে সকলেই খুশি। মাসীমা আমাদের সঙ্গে চলেছেন। যাত্রার আগে দেশে খবর জানিয়ে দেন। ভোলাদা তাঁর দেওর-পো। নিঃসন্তান জ্যেঠাইমা তাঁকে ছেলের মত মানুষ করেন। যাত্রার খবর পেতেই তখনই রওনা হন সঙ্গ ধরবেন বলে। হাসিমুখে বলেন, ফাঁকি দিয়ে আপনি একা তীর্থ করে যাবেন? সে কি হয়? চিঠি পেতেই বেরিয়ে পড়লাম।

তাড়াতাড়ি যাতে ধরতে পারেন তাই হৃষীকেশ থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে চলে এসেছেন। সারাদিন চালিয়ে। শেষে পথে রাত নামে। তবু চলতে থাকেন। বলেন, ঘোড়ার সহিস অন্ধকারে এগোতে চায় না, বকশিশের লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসি। তখন কি আর জানি; পরে কি ঘটবে? আজ তোমাদের ধরবই বলে আসছি। হঠাৎ পাহাড়ের একটা মোড় নিতেই কিসের খসখস শব্দ! শুনেই সহিস ঘোড়ার লাগাম ধরে পাহাড়ের দিকে মুখে ঘুরিয়ে দেয়। ঘোড়ার ওপর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে। জিজ্ঞাসা করতে যাব, ব্যাপার কি?—তাকিয়ে দেখি, হুড়মুড় করে পাশ দিয়ে যায়—বিরাট আকার এক ভাল্লুক! ওপর থেকে নেমে পথ পার হয়ে পাহাড়ের খাদের দিকে চলে যায়। কি ভাগ্যিস, আমাদের দিকে নজর পড়ে নি! চোখের পলকে ঘটা। চলে যাবার পর তখন ভয়ে কাঁপুনি শুরু—আমার তো বটেই, সহিসেরও,—ঘোড়াটারও। বাধ্য হয়ে তখন কথা দিই, সামনেই যে-চটি পাব সেখানেই রাত কাটাব। তখন কি জানি, ভাল্লুকের দৃষ্টি এড়িয়ে তোমাদেরই পাশে বসে শুলাম।

॥ ৪ ॥

দূর থেকে দেবপ্রয়াগ প্রথম দেখার কথা এখনও ভুলি নি।

গঙ্গার তীর ধরে পথ। সামনে নদী নেমে আসে সোজা, পথও এগিয়ে চলে তেমনি সোজা। সমান্তরাল দুটি সরলরেখা। নদী চওড়া, পথ সরু। দুপাশে পাহাড়ের উঁচু পাঁচিল। সুমুখে বহুদূরেও পাহাড়—নীল রঙ। আকাশের ফিকে নীলের সঙ্গে যেন গাঢ় নীল মিশতে চায়। সোজা পথের অনেক দূর থেকে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে সাদা লাল রঙের বিন্দু। চুমকি বসানো সবুজ চাদর ঢাকা যেন পাহাড়ের পা। গঙ্গার ধারা সেই চাদরের পাড়। পাণ্ডা সূর্যপ্রসাদজী দেখান, ঐ দেবপ্রয়াগের ঘর-বাড়ি। সঙ্গমের ওপর।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি, অলকানন্দা কই?

পাণ্ডাজী বলেন, কাছে না গেলে দেখা যাবে না। ডানদিক থেকে এসে ভাগীরথীতে মিশছেন। এখানে পাহাড়ের আড়াল পড়ে।

দূর থেকে শুধু যে সে-নদীই দেখা যায় না, তা নয়। দুই নদীর সঙ্গমে যে প্রচণ্ড তরঙ্গের সংঘাত, জলের উচ্ছ্বাস, তার আভাসও পাওয়া যায় না।

নিকটে এলে সবই প্রকাশ পায়। দুই নদীব জলের রঙেরও প্রভেদ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। ভাগীরথীর চিরন্তন গেরুয়া বসন। অলকানন্দার স্বচ্ছ নীলধারা। যৌবন-মদ-মত্তা তরুণী এসে আত্মসমর্পণ করে বৈরাগিণীর কাছে।

পুরানো যাত্রাপথ সঙ্গমের নিকটে এসে ডানদিকে ঘুরে যায়। এগিয়ে চলে অলকানন্দার বাম কূল ধরে। সেইখানেই পাণ্ডাদের যাত্রীনিবাস, ধর্মশালা।

অলকানন্দার উপর ঝোলানো লোহার সেতু। কিন্তু যাত্রাপথ ওপারে যায় না। তবে যাত্রীরা যান। ওপারে রঘুনাথজীর মন্দির। সঙ্গমে তীর্থস্নান। দোকানপাটও।

এখন বাস-এর পথ দেবপ্রয়াগ আগে গঙ্গার অপর পার ধরে, নদীর দক্ষিণ তীর দিয়ে। বাস থেকেই দেখা যায় সঙ্গমের সুন্দর দৃশ্য। যেন উঁচু মিনার থেকে ঝুঁকে দেখা।

গঙ্গার সেই অপর পারে এখন দোকান, হোটেল, ফেরিওয়ালা। সেইখানে বাসস্ট্যান্ড। বাস চলাচলের গেট। দুই দিক থেকে বাসগুলি সব পৌঁছুলে তবে বাস আবার চলার অনুমতি পায়। আধ ঘণ্টা হয়ত

অপেক্ষা করতে হয়, কখনও বা ঘণ্টা খানেকও। তারই মধ্যে উৎসাহী যাত্রী তাড়াতাড়ি নেমে যায় গঙ্গার ধারে। সেখানেও আর একটা লোহা'র পুল। পার হয়ে যাত্রীরা সঙ্গমে নামেন। লোহার চেন ধরে অথবা ঘটি, মগ দিয়ে জল তুলে কোনক্রমে স্নান সারেন।

সজাগ দৃষ্টি থাকে অপর পারে উপর দিকে বাস-স্ট্যান্ডে। এই বুঝি বা বাস চলবার পুলিসের হুইসিল বাজে, গাড়ির হর্ন দেয়!

অথচ, এই দেবপ্রয়াগই ছিল সেকালের যাত্রাপথের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। ধীরেসুস্থে যাত্রী বিশ্রাম নিতেন, যেমন দূরগামী ক্লান্ত পথিক আশ্রয় নেয়---বিরাট বটগাছের শান্তস্নিগ্ধ ছায়ায়। এখানে রাত্রিবাসও করতেন। হিমালয়ের নিভৃতে দুই বেগবতী গিরিনদীর সঙ্গমশোভাও উপভোগ করতেন।

কেদার-বদরীর পথে পথে মন্দির। প্রতি ধূলিকণাই তীর্থরেণু। দেবপ্রয়াগ এ পথের পঞ্চপ্রয়াগের এক প্রয়াগ। অপর চারটি—রুদ্রপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগ। প্রতি প্রয়াগেই তীর্থস্নানের বিধি ছিল।

এখন যাত্রাপথে দেবপ্রয়াগ বাসযাত্রীদের আধ ঘণ্টা বিশ্রামের স্থান। যেন, আগ্রাফোর্টের পাশে স্টেশনে ট্রেনের ক্ষণিক থামা। জানলা দিয়ে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকা—ঐ তো ফোর্টের পাঁচিল! ঐ না তাজমহল!—প্ল্যাটফর্মে নেমে বা ট্রেনের কামরায় বসেই চা-খাবার খাওয়া!—দেবপ্রয়াগেও এখন বাস থেকে নেমে পথে কিছুক্ষণ পায়চারি করা,—খাবার কিনে খাওয়া। মে-জুনের গরম হলে কল থেকে জল নিয়ে মুখে মাথায় ঢালা। উপর থেকে সঙ্গমের দু-একটা ফটো তোলা।

প্রকৃতির সঙ্গে শান্তমনে মিলনের সুযোগ নেই। হিমালয়ের বিরাটত্বের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার অবকাশ নেই।

মনে পড়ে প্রথম যাত্রার কথা।

অলকানন্দার পুল পার হয়ে আসি সঙ্গমের কাছে। তখন ভাগীরথীর উপর এখনকার লোহার পুল ছিল না। দড়ির ঝোলা। কেদার-বদরী-যাত্রীদের এ-পুল পার হতে হত না। অলকানন্দার বাম কূল ধরে তাদের যাত্রাপথ। তবুও এগিয়ে গিয়ে বসি সেই ঝোলার মুখে একটা পাথরের উপর। ওপারে এখন যেখানে বাস-স্ট্যান্ড, তখন ছিল বনজঙ্গল। তারই পাশ দিয়ে নদীর দক্ষিণ তীরে উপর দিকে উটে চলে সরু পথ। টেহেরী হয়ে গঙ্গোত্রী যাওয়ার সেই ছিল যাত্রাপথ। কৌতূহল জাগে। ঝোলাপুলে উঠি। দোলনার মত দুলতে থাকে। দু হাতে দুদিকের দড়ি শক্ত মুঠোয় ধরে রাখি। পায়ের নীচে শুকনো ডাল, সারি সারি কাঠি। তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ভাগীরথীর প্রচণ্ড স্রোত। সহস্রফণা ক্রুদ্ধা নাগিনী। অতি সন্তর্পণে ধীরে পার হই। ওপারে পৌঁছে পাথরের উপর বসে হাঁপ ছাড়ি, ভাবি, আবার ফিরতে হবে। এমনি সময়ে একটি পাহাড়ী মেয়ে আসে। মাথায় তার শুকনো কাঠের বোঝা, পিঠেও কাপড়ে-বাঁধা ছোট্ট একটি ছেলে। ঝোলায় ওঠে। এক হাতে দড়ি ধরে। অপর হাত মাথার বোঝায়। নিঃশঙ্ক পার হয়। অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবে।

ফেরবার পথে আমারও দেখি সাহস বাড়ে।

দেবপ্রয়াগে সেইবার অনেক রাত পর্যন্ত একাকী কাটাই অলকানন্দার লোহার পুলের উপর বসে। কম্বল বিছিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়েও থাকি। হিমালয়ের ঘোর গভীর রাতের আলো-আঁধার। জনমানবহীন। নিঃসীম শান্তি। চারিদিকে বিশাল কালো পাহাড়। মাথার উপর আকাশ-ভরা তারা। যেন, স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। নীচে নদীর উত্তাল ধারা। জলের একটানা উচ্ছল সঙ্গীত। সব মিলে এক নিবিড় রহস্যের সৃষ্টি করে। মনে হয়, বিশ্বপ্রকৃতির মহাকাব্য। আকাশে পথে অযুত তারার স্বর্ণাক্ষরে লেখা! দেবনদী অলকানন্দার কণ্ঠে তারই মধুর গুঞ্জরন। হিমগিরির অন্তরে তারই গম্ভীর প্রতিধ্বনি।

॥ ৫ ॥

যাত্রাপথে চটিগুলি আনন্দকুটির। দিনশেষে পাখির নীড়। নিত্য নূতন চটি। তবু যাত্রী এসে আশ্রয় নেয় যেন আপন ঘরে। মাটির দালানে চাটাই পাতা। তারই উপর কম্বল বিছানো। মাথার কাছে সারি সারি উনান। অদূরে নদী, ঝরনা বা জলের পাইপ। পাশাপাশি যাত্রীর শয্যা পড়ে। অপরিচিত যাত্রী, তবু যেন পরম আত্মীয়। সারা যাত্রাপথ জুড়ে একই সংসার। চটিতে থাকার জন্য ভাড়া ছিল না। চটিওয়ালার

শ্রীনগরের মাইলখানেক আগে নতুন ও পুরানো পথের মিলন। বাস-এর রাস্তা অলকানন্দার ওপার দিয়ে এসে কীর্তিনগর ছাড়িয়েই নতুন পুলে এপারে আসে। খানিক এসেই দুই পথ এক হয়। নিকটেই পৌড়ীর বাসপথও পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসে। যেন, ত্রিবেণীসঙ্গম। হৃষীকেশ ও পৌড়ীর রাজপথ,—গঙ্গা ও যমুনা। চলন্ত বাস-এর স্রোত। প্রাণহীন, নির্জন পুরানো যাত্রাপথ যেন লুপ্ত সরস্বতী।

রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত নতুন ও পুরানো পথ নদীর একই দিকে। মাঝে মাঝে পুরানো চটিগুলিও বাস-এর পরে পড়ে। খানকয়েক মাটি ও পাথরের ঘর। বড় বড় আমগাছ বা অশ্বত্থ-পিপুলের ছায়া। হয়ত একঝাড় কলাগাছ। মোটা ঝোলে! কাঁদিভরা কলাও। কিন্তু বিস্বাদ। পাহাড়ীরাও খায় না। ঘরের ছাদে কুমড়ো। পাশেই ঝরনা, নয়ত জলের ধারা। ছোট ছেলে-মেয়ে তেমনি ধুলো মেখে খেলা করে। ঘড়া কলসী মাথায় জল নিতে মেয়েরা গা দুলিয়ে চলে। রাস্তার ধারে বেঞ্চে বা ঘরের দাওয়ায় বসে পুরুষেরা জটলা করে, তামাক টানে। শব্দ করে ধুলো উড়িয়ে বাস ছুটে চলে। যেন, তাচ্ছিল্যভরে। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। হঠাৎ আকাশ চিরে যেন উল্কাপতন।—মুখ তুলে গ্রামবাসীরা তাকায়। মেয়েরা পথ ছেড়ে পাহাড়ের গায়ে সরে দাঁড়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে খেলা ফেলে অবাক হয়ে দেখতে থাকে। তাদের মুখের চিরন্তন তীর্থবুলি হারিয়ে গেছে। আগেকার দিনে যাত্রীরা এলেই গ্রামবাসীদের পরম আত্মীয় হয়ে উঠত, তাদের নিঃস্বার্থ সেবাযত্ন পেত। যাত্রীমাত্রেই সঙ্গে আনতেন বাণ্ডিলভরা সূঁচসূতা, পাই-পয়সা, টিপ। এই দেওয়া-নেওয়াও ছিল এ-তীর্থপথের আনন্দ। যেন পূজার সময় বিদেশ থেকে গৃহস্বামীর গ্রামে ফেরা—সবারই জন্যে উপহার নিয়ে। চটি আসবার আগেই ছুটে আসে ছোট ছেলেমেয়ের দল, যাত্রীদের ঘিরে চলে,—দে সুইতাগা, পাই-পয়সা! তরুণ যুবতীরাও সূঁচসূতা চায়। নাকে কানে বুকে গলায় একরাশ গহনা দুলিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে, মেয়েদের কাছে হাত পাতে—সুই বিভিনি দেও রাণী।

কি-ই বা তখন ছিল সূঁচসূতার দাম? একটা পাই পয়সাতেই তারা খুশি। শহরবাসীর হাতে যেন মোহর। পাহাড়ী পুরুষদেরও টুপিতে বা জামার গায়ে সূঁচ গাঁথা থাকত। কে জানে, কখন দরকার হয়। বেশভূষা, কাপড়-চোপড় বদল করার অবস্থা কম লোকেরই। যা পরে, নিজেরাই বোনে। রিপু ও সেলাই—এঁদের নিত্যকর্ম। A stitch in time saves nine—এদের জীবন মন্ত্র।

রুদ্রপ্রয়াগের নাম শুনলেই এখন জিম করবেট-এর নাম মনে হয়। ১৯২৮ সালে যখন যাই তাঁর নাম জানা ছিল না। যদিও তার বছর তিনেক আগে সেই দুর্ধর্ষ মানুষখেকো বাঘটাকে তিনি মারেন। তখন পথে যেতে শুধু শুনি এ-সব অঞ্চলে বাঘের বাস, তাদের উৎপাতের রোমাঞ্চকর গল্প। সাহেবরা আসে শিকারে, বাঘও মারে। যাত্রীদের ফেরবার একটা পথ ছিল রামনগর হয়ে। টেরাই-এ নেমে সে-পথে গরুর গাড়িতে যেতে হত। তখন শুনতাম, জঙ্গলের মধ্যে অলক্ষ্যে গরুর গাড়ি অনুসরণ করত, সুযোগ পেলেই যাত্রীদের ধরে নিয়ে যেত, গরুগুলিও প্রায় তাদের খোরাক হত।

কয়েক বছর পরে পড়ি করবেট-এর বই। তখন পরিচিত গ্রাম, চটির নাম, নদীর পুলের কথা বই-এ পাই। নিখুঁত বর্ণনার মধ্যে বাঘ শিকারের রোমাঞ্চ ও বিস্ময় অনুভব করি। অথচ, পথ চলতে সে-সময় মনে ভয়ই জাগে নি, লোকমুখে শোনা কাহিনী গল্পকথা মনে হত।

পরে ভালভাবে নজর করি রুদ্রপ্রয়াগের দু মাইল আগে গুলাবরায় চটি। চটির ঘরগুলি ছেড়ে এসে বাঁ হাতে সেই প্রসিদ্ধ আমগাছ। এরই উপর বসে করবেট বাঘটাকে মারেন। এক সময়ে সেই গাছের পাশে লোহার দুটি রড-এ একটা হাতে আঁকা বেশ বড় ছবিও টাঙানো হয়—সাহেব গাছে বসে গুলি করে বাঘ মারছে, ছবির নীচে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বছরের পর পর বছর ঘোরে। আবার দেখি, সেই রড ভেঙেচুরে দুমড়ে পড়ে আছে গাছের তলায়। ছবি অদৃশ্য হয়েছে। আমগাছ তেমনি আছে, তারই গৌরব-ইতিহাস লোপ পেয়েছে।

বাস-ট্রাক-এর অ্যাকসিডেন্টে ভাঙল, অথবা বিদেশী সাহেবের কীর্তিচিহ্ন স্বাধীন দেশের স্বদেশিয়ানায় লোপ পেল,—সে কথা সঠিক জানতে পারি নি।

রুদ্রপ্রয়াগ! হাঁটাপথে রুদ্রকান্তিই ছিল বটে। যে-দিকে তাকাই মাথা-উঁচু বিরাট পাহাড়। ভিড় করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আশেপাশে গাছপালার ঝোপ। কেমন একটা থমথমে অন্ধকার আবহাওয়া। Pilgrim's Progress-এর সেই ভীষণাকৃতি দৈত্য—Apollyon—স্বর্গপথ রোধ করে দাঁড়ায়।

সেই গিরিপ্রাচীর ভেদ করে দু দিক থেকে খরস্রোতা দুই নদী নেমে আসে। অলকানন্দা ও মন্দাকিনী। একদিকে একটা ছোট ঝরনাও। সঙ্গমে নামার জন্যে খাড়া পাহাড়ের গায়ে পাথর কাটা উঁচু ধাপ। স্তরে স্তরে নেমে যায়। নীচে দুই নদীর সংঘাতে প্রচণ্ড তোড়। উন্মত্ত তরঙ্গ সহস্র ফণা তুলে প্রলয়নৃত্য করে। উপর থেকে দেখতেও মাথা ঘোরে। স্রোতের হুঙ্কার দিগন্ত মুখরিত করে। কামানের গর্জন তোলে।

আর এখন? রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছবার আগে ডানদিকে পাহাড়ের উপর কলেজের ঘরবাড়ি। পাহাড় কেটে ঘুরে জিলাপী-পাকে প্রশস্ত পথ নেমে আসে। হাসপাতাল, ডাকবাংলো ছাড়িয়ে বাজারে এসে বাস-স্ট্যান্ড। পাহাড় ও জঙ্গল কেটে প্রকাণ্ড এলাকা। বড় বড় দোকান পাট হোটেল ইত্যাদি। অলকানন্দার উপর নতুন বড় পুল। ওপারে পাহাড় ফুঁড়ে টানেল। পুল পার হয়ে টানেলের মধ্যে দিয়ে বাস পাহাড়ের অপর দিকে মন্দাকিনীর ধারে আসে। সেই নদীর ধারে ছুটে চলে কেদারের পথে গুপ্তকাশীর পানে।

বদরীনাথের পথ অলকানন্দার পুল পার হয় না। নদীর বাম তীর ধরে এগিয়ে যায় বদরীর পথে।

রুদ্রপ্রয়াগ বাস-এ বসে পার হতে এখন যাত্রীরাও জানতেও পারেন না, এই শহরের উন্নতি আনেন এক সর্বত্যাগী সাধু। এখনও সঙ্গমের কাছে তাঁর আশ্রম ও মন্দির আছে। এককালে বহু যাত্রী সেখানে আশ্রয় পেতেন। পরম আনন্দে রাত্রি কাটাতেন। স্বামীজীর সৌম্যমূর্তি। সহাস্য বদন। মধুর ভাষণ। সস্নেহ আচরণ। অথচ, দৃষ্টিহীন। জন্মান্ধ। তবুও শাস্ত্রজ্ঞ। হেসে বলেন, চোখের দৃষ্টি পাছে বাইরে অন্যদিকে যায়, তাই তিনি কেবল অন্তরেই তাকাতে বলেন।

—বলতেন বটে তাই, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর সদাই জাগ্রত জগতের সেবায়। আশ্চর্য কর্মযোগী পুরুষ। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন, যাত্রীদের সেবায় দাতব্য চিকিৎসালয়। স্থানীয় পাহাড়ীদের শিক্ষার উদ্দেশে সংস্কৃত পাঠশালা। ক্রমে তাঁরই চেষ্টায় হাসপাতাল ও কলেজ গড়ে ওঠে। অন্ধ হয়েও কি করে তিনি এই প্রতিষ্ঠানগুলি চালাতেন, ব্যয়ভারও বহন করতেন, কোথা থেকে টাকা আসতো কেউ জানে না। গাছের ছায়ায় শ্রান্ত পথিক যেমন নির্ভাবনায় আশ্রয় পায়, ছায়ার অভাব বোঝে আবার তপ্ত রোদে পথ চলতে, তেমনি রুদ্রপ্রয়াগবাসীরা অভাব বুঝল, হঠাৎ স্বামিজীর দেহাবসানের পর। অর্থের অনটন তখন প্রকট হয়ে ওঠে। এখন গভর্নমেন্ট হাসপাতাল ও কলেজ চালান। দুটি প্রতিষ্ঠান স্বামী সচ্চিদানন্দের নামের পুণ্যস্মৃতি বহন করে।

এই রুদ্রপ্রয়াগে মাঝে কয়েক বছর এক বাঙালী ডাক্তার ছিলেন। যাওয়া-আসার পথে পরিচয় হয়। ঘনিষ্ঠতাও জন্মে। তাঁর বাড়িতে বারকয়েক কাটাইও। পরম আনন্দে ও নিঃস্বার্থ আদর যত্নে। এ-সব দুর্গম দূরদেশে সাধারণত এক বছর পরেই বদলি হওয়ার নিয়ম কিন্তু এই ডাক্তারের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও ঘটে। তাঁর কাজের একাগ্রতা ও সুনামই এর কারণ। নিজের নানান অসুবিধা সত্ত্বেও বদলির অর্ডার আসে না। দু বছর কেটে যায়। ভদ্রলোক চিন্তিত হয়ে একবার সেই কথাই বলছিলেন। দুজনে আমরা চলেছি রুদ্রপ্রয়াগের বাজারের মধ্যে দিয়ে। তখনও বাসস্ট্যান্ড এত বড় হয় নি। বাজারের দোকানগুলির উল্টোদিকে পাহাড়ের গায়ে ছোট গুহা মতন। সেখানে এক সাধু থাকতেন। দেখলে মনে হয়—ভিখারি। রুক্ষ কাঁচা-পাকা চুল, দাড়ি। শুকনো রোগা লিকলিকে শরীর। কালো রঙ। গা-ভরা মরামাস। একরাশ ছেঁড়া কাগজপত্র, ময়লা কাপড়ের টুকরো চারপাশে জড় করা। গায়ে কখনও হয়ত শতচ্ছিন্ন কম্বল। গুহা ছেড়ে নামেন না। কেউ গিয়ে চা, খাবার দিলে খান। বিড়ি দিলেও টানেন। অনর্গল কি যেন বিড়বিড় করে বলেন। কখনও বা চেঁচিয়েই কথা কন—আপন মনে। শুনে মনে হয়, অসংলগ্ন, পাগলের প্রলাপ। অথচ, স্থানীয় লোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করে, প্রণাম করে। বলে, উচ্চকোটির সাধক। অশেষ ক্ষমতা ধরেন। বাইরে দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

কতবার তাঁকে দেখেছি। ভাবি, কি জানি হয়ত হবে বা!

সেবার ডাক্তারের বদলির কথা দুজনে আলোচনা করতে করতে চলেছি। সাধুর গুহার কাছাকাছি আসতেই ডাক্তার বলেন, একটু আস্তে চলুন, ঐ শুনুন সাধুজী কি বলছেন!

দুজনেই বেশ শুনতে পাই, সাধুজী হি-হি করে হাসেন আর হিন্দীতে বলেন, ডাকদার—ডাকদার—চলেছে—খুব ভাবছে—বদলি—বদলি—কেন হয় না! হা—হা—বদলি বদলি—খবর এল—এবার আসছে, আসছে—ডাক্তার চলল—এইবার বদলি হল—হাঃ হাঃ!

প্রকৃতই তার কয়দিন পরেই বদলির অর্ডার এসে যায়!

পরের বছর গিয়ে দেখি সাধু নেই, গুহাও নেই। স্ট্যান্ড বড় হয়েছে, পাহাড়ের সে-অংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

সাধুকে কিন্তু সরাতে হয়নি। তিনি আপনা থেকেই চলে যান। কয়দিনের অসুখেই দেহান্তর হয়। সঙ্গমে তাঁর মরদেহের সলিল-সমাধি হয়। কিন্তু তাঁর গুহা পরিষ্কার করতে লোকজন ঢুকে দেখে, সেই রাশীকৃত আবর্জনার মধ্যে হাজার দুই তিন টাকা—নোট পয়সা ইত্যাদি! জঞ্জালের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে আছে!

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে মাত্র মাইল দুই দূরে কোটীশ্বর শিবের গুহা। যাত্রাপথে নয়। অলকানন্দার পুল পার হয়ে কেদারের পথ যায় বাঁ দিকে ঘুরে। কোটীশ্বরের পথ ডান হাতে। অলকানন্দার দক্ষিণ তীর ধরে সোজা পথ। চড়াই উৎরাই নেই। মামুলি পাহাড়ী পথ। মাইল দুই যাবার পর ডান দিকে নদীর ধারে নেমে যায়। সুন্দর ধর্মশালা, মন্দির। অল্প এগিয়ে জলের ধারে পাহাড়ের গায়ে গুহা। সমতল মেঝে, তারই উপর অগণিত ছোট বড় শিবলিঙ্গ। নিশ্চিন্ত মনে পা ফেলা দায়। এই বুঝি বা শিবের মাথায় পড়ে! কি করে কে গড়েছেন বোঝা শক্ত নয়। নদীর স্রোতের কয়েকটি ধারা গতির উচ্ছ্বাসে গুহার মধ্যে আসে, ঘুরে ঘুরে আবার বেরিয়ে যায়। আবার নতুন ধারা আসে, তেমনি চক্রাকারে ঘুরে ফিরে বার হয়ে যায়। এই স্রোত চলাচলের ফলে পাথর কাটে, বহু শিবলিঙ্গের আকার নেয়। গম্ভীর গুহা, কালো পাথর। তার মধ্যে জলের ধারার গতি-চঞ্চল উচ্ছলতা। সাদা ফেনার হীরক দ্যুতি। ঘুরে ঘুরে শব্দ তোলে। গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনি ওঠে। গঙ্গাদেবী যেন সহস্র হাতে কোটি শিব গড়েন, হাতে তালি দিয়ে ব্যোম ব্যোম রব তোলেন।

হিমালয়ে শিবের জটাজালে গঙ্গা পথ হারান, আবার সেই হিমালয়েই অলকানন্দার স্রোতের ধারাজালে কোটি শিব ধরা দেন।

॥ ৯ ॥

রুদ্রপ্রয়াগ ছাড়িয়ে পাহাড় ঘুরে সেকালের পায়ে হাঁটা কেদারনাথের পথ যেত সাবলীল সরল রেখায়। সোজা পথ। পাশেই মন্দাকিনী। নদীর স্বচ্ছ নীলধারা। কলস্বরে বহে চলে। মাঝে মাঝে দু-একটা দড়ির ঝোলা পুল। ওপারে গ্রামে যাতায়াতের পথ। কেদার-যাত্রীদের সে-পুল পার হতে হয় না। অপর পারে ধানক্ষেত। ক্ষেত উঠে যায় পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে। এ-পারেও পথের পাশে পাহাড়। সরলরেখা পথের উপর স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে দু পাশে গাছের সারি। তীর্থযাত্রীদের সম্বর্ধনায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সবুজ নিশান উড়িয়ে। আনন্দ জাগে মনে এ-পথ চলতে।

ছতোলী, মঠচটি, রামপুর ছেড়ে এসে অগস্ত্যমুনি। ওরই মধ্যে বড় চটি। প্রাচীন মন্দির, ধর্মশালা। মন্দিরের সামনে রুদ্রাক্ষের বড় গাছ। নদীর ধারে প্রশস্ত ময়দান। কিছুদিন প্লেন নামাবার চেষ্টা হয়েছিল।

অগস্ত্যমুনিতে প্রায়ই যাত্রীর ভিড়। তাই এগিয়ে চলি। পথে অন্য চটিতে আশ্রয় নিই।

একবার দেখি, মাইল দেড়েক গিয়ে সুন্দর নতুন একটি বাড়ি ওঠে। পরের বছর দোতলাও হয়। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন বাড়িখানি। রাস্তা থেকে দু-তিনটা ধাপ উঠে সামনে বাঁধানো আঙিনা। একপাশে পাথরের মন্দির। গাছের ছায়া। তারই পিছনে বাড়ির একতলায় সারি সারি ঘর। দোতলার ঘরের দরজা-জানলায় রঙ করা। সামনেই পথের অপর দিকে মন্দাকিনীর ধারা। বাড়ির গায়েও ছোট্ট এক পাহাড়ী নদী। তারই উপর পথের পুল। দূরে নীল আকাশের গায়ে মাথা তুলে বরফের চূড়া,—কেদার-শিখর।

ভাবি, এমন বাড়ি, এমন মনোরম স্থানে করলেন কে!

পরিচয়ও সহজেই হয়। গৃহস্থ নন, অথচ সুন্দর গৃহ রচনা করেন। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে নয়। সাধুসেবায়। বিশিষ্ট যাত্রীদের পথ-কষ্ট লাঘবের আশায়।

কৌপীন-ধারী এক সাধুর প্রচেষ্টা। মন্দিরে শিবের নাম 'হর হর মহাদেও', সাধুর মুখেও সদা ঐ নাম, তাই তাঁরও নামকরণ হয়—'হর হর মহাদেও মহারাজ'। এক সেবককে নিয়ে থাকেন। পেশীবহুল সবল দেহ। পাহাড়ের কোলে শাকসবজি ও লেবুর বাগান। গরুও রাখেন। যাত্রী আশ্রয় নিলে সযত্নে সেবা করেন। বলেন, তীর্থযাত্রী দেবতারই অংশ। দোতলায় হলঘর, দেবদেবীর রঙিন ছবি ও মূর্তি দিয়ে সাজানো। যাত্রীদের নিয়ে ভজন ও সৎসঙ্গ হয়।

কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতের নিয়মই এই—সংসারও যেমন, সাধুর গড়া আশ্রমও তেমনি। দুর্দিনের সাজগোছ, আশা-আকাঙ্ক্ষা। উৎসাহ-উদ্বেল। বর্ষায় নদীর দুকূলব্যাপী বন্যার তোড়।

এখন বাস চলে ধূলা উড়িয়ে সেই আশ্রম ও মন্দিরের সামনে দিয়ে। তাকিয়ে থাকি উৎসুক নয়নে। কখনও হয়ত হঠাৎ তাঁকে অঙ্গনে দেখতে পাই। মনে হয়, অতি শীর্ণ দেহ, বাড়ি-ঘরেরও সে-উজ্জ্বলতা নেই। যাত্রীদেরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

চন্দ্রাপুরী।

কে কবে চটির নাম রাখে জানি না। পাহাড়ী নদী—চন্দ্রা। তাই থেকেই নামকরণ। ছোট নদী,—তবু পাহাড়ে জলের ঢল নামলে পার হয় কার সাধ্য। একবার বর্ষাকালে দেখি সাময়িক পুল,—পারাপারে পয়সা নিতে লোক দাঁড়িয়ে। না হলে, কুলকুল করে জলের ক্ষীণধারা বয়ে চলে। নদীর বুকে পাথর ছড়ানো। অনায়াসে পায়ে হেঁটে যাত্রীরা পার হয়। অল্পদূরে মন্দাকিনীর সঙ্গে সঙ্গম। সঙ্গমের কাছে ছোট বসতি।

প্রথম যে-বছর আসি, সন্ধ্যার মুখে চটিতে পৌছুই। মন্দাকিনী যেদিক থেকে নেমে আসেন সেইদিকে সন্ধ্যার আকাশে মেঘের ফাঁকে দিগন্তজোড়া কেদারনাথের চূড়া। যেন মেঘলোকে 'সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা'। দূরে পাহাড়ের গায়ে পাইনের সারি।

পূর্ণিমা রাত। ছোট চটিতে শুয়ে শুয়ে বরফের দৃশ্য দেখি। চোখে ঘুমের আবেশ জাগে, তন্দ্রার মধ্যেও সে-রূপ দেখি। হঠাৎ জেগে বসি। দেখি, অতন্দ্র প্রহরী তেমনি জ্যোৎস্না-স্নাত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার-তরু সারে সারে;
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

সারারাত মন-ভরা আনন্দে জেগে কাটাই।

এর কয় বছর পরের কথা। চন্দ্রাপুরী বড় হয়ে ওঠে। তিনতলা নতুন বাড়ি মাথা তোলে। রেলিঙ দেওয়া বারান্দা। সবুজ রঙ-এর টিনের ছাদ। উপরের বারান্দায় শুয়ে বরফের পাহাড় দেখে আবার রাত কাটে।

আবার বছর ঘোরে। ফিরে আসি। সেই তিনতলা ধর্মশালাতেই উঠি। এবার কেদারনাথ-যাত্রাপথটুকু কয়টি বন্ধু সঙ্গ নেন। তাঁদের সঙ্গে রাত কাটে। এবারও বিনিদ্র রজনী। কিন্তু ভিন্ন কারণ। শয্যা নেবার একটু পরেই বন্ধুরা উসখুস করেন,—আঃ উঃ বিরক্তির শব্দ তোলেন। উঠে বসেন। টর্চ জ্বালান। হুঙ্কার দেন, এই দেখ! চারপাশে কী ভীষণ ছারপোকা!—আর এক বন্ধু বলে ওঠেন, ওদিকে কি? এইদিকে দেখ না—সার বেঁধে আসছে, চতুর্দিক থেকে!

দেওয়াল বেয়ে নামে, ছাদ থেকে পড়ে—অক্ষৌহিণী সেনাবাহিনী।

দেহের ক্লান্তিতে অগত্যা আবার ঘুমের চেষ্টা করেন। নিস্ফল প্রয়াস। বাধ্য হয়ে উঠে বসেন। রাগে ও বিরক্তিতে কয়েকটি পিষে মারেন। 'এঃ! কী দুর্গন্ধ!' বলে মুখ বাঁকান। কিন্তু রক্তবীজের দল আসতেই থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে।

চুপ করে শুয়ে থাকি আমি। ওপাশ ফিরে নিঃসাড় হয়ে। ওঁদের সব মন্তব্য শুনি। ছারপোকার কামড়ও সহ্য করি। হা-হুতাশে বা বসে থেকে লাভ কি? ভাবি, শুনেছি যোগীদের নাকি গায়ের উপর দিয়ে বিষাক্ত সাপ চলে যায়, তবু নড়েন না। আমার গায়ে এ তো সামান্য ছারপোকা!

চন্দ্রপুরীতে আর এক রাতের কথাও মনে পড়ে।

সে-বছর হঠাৎ প্রচণ্ড ভিড় পাই। নিরিবিলি একান্তে কোথাও জায়গা মেলে না। তিনতলা ধর্মশালাও ভর্তি। কিন্তু উপরতলায় লোকের সাড়াশব্দ পাই না। খবর নিতে শুনি, কে এক পুলিশের কর্তা আসবেন, তাঁর দলবলের জন্যে তালাবন্ধ। অগত্যা দোতলায় সিঁড়ির পাশে অল্প এক জায়গা পেয়ে সেইখানেই কম্বল বিছাই। একটা রাত্রি,—একা মানুষও, বেশ কেটে যাবে। ছারপোকা-বাহিনীরও অত্যাচার সহ্য তো করেছি।

কিন্তু তখন কি আর ভাবি, মানুষ-কীটেরও অনাচার প্রবলতর!

দেশ তখন স্বাধীনতা পেয়েছে। স্বাধীন দেশের বিপুলবিক্রম রাজপুরুষের আবির্ভাব হয় তুচ্ছ তীর্থপথে। সাঙ্গোপাঙ্গ, লটবহর, লোকলস্কর। সিঁড়ি দিয়ে লোক চলাচল শুরু হয়। যেন পাহাড়ী ঝরনা। চলেছে তো চলেছেই। হাসিহল্লা, ব্যস্ততা। কম্বলের উপর মাড়িয়ে তো চলেছেই, মাঝে মাঝে গায়েও প্রকাণ্ড বুটের স্পর্শ পাই। বুটধারী দয়া করে তাকিয়ে দেখে বলে, আরে! আদ্‌মী হ্যায়—ইধার!—আর একজন করুণা দেখিয়ে মন্তব্য করেন, যাত্রী-লোগ্—যাঁহা মিল্‌তা,—শো যাতা!

বলি না কিছুই। রাগ নয়, বিদ্বেষ নয়, রূঢ় কথা নয়। কারও মনে ব্যথা দেওয়াও নয়। মান-অভিমানের পালা সংসার-রঙ্গমঞ্চে ফেলে আসা। পড়ে থাকি তীর্থপথের ধূলিকণার মত। আরও কুঁকড়ে শুই। হিমালয়পথে এই তো শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

হঠাৎ পুলিশপুঙ্গব আমারই সামনে এসে হাজির। গোল মুখ, গোল চোখ, চ্যাপটা নাক। টোল-খাওয়া বেলুন। খাকি সাজ। হাতে ছোট বেটন—রুলার। কার কাছে আমার পরিচয় পান। এসেই ভদ্রতা করে বলেন, তাই তো আপনার থাকার একটু অসুবিধে হচ্ছে দেখছি।—'কুছ্ সেবামে' আসতে পারি তো জানাবেন নিশ্চয়।

তবু বলেন না, ওপরের হল-এ একটু জায়গা দেব,—চলুন।

আমিও বলি না। শুধু জানাই, খাসা আছি। যাত্রা-পথ। একটা রাত। কেটে যাবে আনন্দেই।

তাঁরই মুখে শুনি, শীঘ্র বদলি হবার সময় চলে এসেছে, তাই তীর্থ ও ইনসপেকশন দুটো কাজই তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছেন। এই সুযোগে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। বদলি হয়ে গেলে এমন সুযোগ তো আর মিলবে না,—বলে মুখ টিপে হাসেন।

ভাবি, ঠিক বটে!

আবার সবিনয়ে 'কুছ্ সেবামে' জানিয়ে উপরে ওঠেন।

পশ্চিমে ঘোরাফেরার ফলে 'কুছ্ সেবামে'র অর্থ আমার জানা। রাষ্ট্রভাষার ওটা পোশাকী বিনয়। যখন এর গূঢ় মর্ম জানা ছিল না, শুনে তখনই হয়ত কোন সাহায্য বা কাজের কথা তুলেছি। দেখেছি, তখনই 'সেবা'র ইচ্ছা কোথায় উবে যায়। ওটা ভদ্রতাসূচক বিনয়প্রকাশ। ইংরেজিতে যেমন, থ্যাঙ্ক ইউ, স্যরি!

এই ধরনের আর এক বিনয়-বাক্য ভারতের অন্য প্রান্তেও শুনি। নতুন গিয়েছি সেখানে। স্থানীয় এক বন্ধুর সঙ্গে কয়েকজনের বাড়ি গিয়ে পরিচয় করি। যার কাজেই যাই, তিনি তখনই বলেন, আসুন, ভাত খাবেন, রুটি খাবেন।—প্রথম পরিচয়। তবু একেবারে আহারের নিমন্ত্রণ। শুনতে ভাল লাগে। বন্ধুকে বলি, এখানকার লোকজন তো খুবই অতিথি-সেবায় উৎসুক।

বন্ধু প্রথমে বুঝতে পারে না। তার পরে বুঝে হেসে বলেন, ওঃ। ওটা তো কথার মাত্রা। ঐ রকম বলাই হল সদাচার। কি ভাগ্যিস আপনি বলেন নি যে নিমন্ত্রণ নিতে রাজি। তাহলে ওরা অবাক হয়ে ভাবত, লোকটা সভ্যতা জানে না।

আমাদের বাংলাদেশেও তো প্রবাদ আছে, অতিথি চলে যাবার সময় গঙ্গায় নৌকা ঠেলে দিয়ে বলা, —আর একদিন থেকে গেলে হত না।

পুলিশ-অফিসারটির সেবাধর্মের দৌড় পরে আরও প্রকাশ পায়।

চটির বাইরে সাময়িক সারি সারি পায়খানা। সেখানকার চৌকি ও টিনগুলি সাফ হয়ে তিনতলায় চালান যায়—কর্তাদের দলের সুবিধার জন্যে। জমাদার দুজনাও সেইখানে হাজিরা দেয়। ফলে চটি-ভরতি যাত্রীদের করুণ দুর্দশা, অসীম নিগ্রহ।

ভাবি, যাত্রার সময়ে এই ধরনের অফিসার-পুঙ্গবদের সফর নিয়ম করে বন্ধ করাই উচিত,—অন্তত যতদিন না তাঁদের কর্তব্যবুদ্ধি সচেতন হয়।

॥ ১০ ॥

সেকালের হাঁটাপথ চন্দ্রাপুরী ছেড়ে নদীর ধারে ধারে ক্ষেতের পাশ দিয়ে আরও মাইল চার সোজা যেত। এখনও সেই পথ ধরে বাস চলে। কিন্তু বাস চলে যায় সোজা কুণ্ডচটি পর্যন্ত। নতুন পুলে নদীর অপর পাড়ে গিয়ে চটি। সেইখান থেকে গুপ্তকাশীর চড়াই শুরু। হাঁটা পথ ভীরীচটির কাছে ছোট লোহার পুলে নদী পার হত, ঐ পার দিয়ে এগিয়ে যেত কুণ্ডচটিতে।

পাণ্ডার দেওয়া গাইড-বই-এ লেখা থাকত—"কুণ্ডচটি—শীত লাগে।"

তার আগে দশদিন হিমালয়ের পথে কাটে, তবু গ্রীষ্মকালে শীত থাকে না। বিজনীর চড়াই-এ পাহাড়ের কিছু উপরে ওঠা, না হলে পথ আসে নদী ধরে—উপত্যকা দিয়ে, তাই শীতও নেই।

গুপ্তকাশী এদিকের প্রথম চড়াই। তবে এমন কিছু নয়।

এখন সেটুকুও নেই। বাস-এ বসেই গুপ্তকাশী পৌঁছানো।

গুপ্তকাশী এই যাত্রাপথে রমণীয় স্থান। যদিও যাত্রীর ভিড় প্রায়ই থাকে। স্থানাভাবও হয়। ৪,৮৫০ ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে বড় চটি বা গ্রাম। চন্দ্রশেখর মহাদেব ও অর্ধনারীশ্বরের মন্দির। সুন্দর কারুকার্য। সামনে একদিকে দূরে দেখা যায় চৌখাম্বা বা বদরীনাথের তুষারশিখর। সেইদিকেই মদ্‌মহেশ্বরের পাহাড়। আবার পাহাড়ের বাঁক ঘুরলেই চোখে পড়ে কেদারনাথের বরফচূড়া।

নীচে মন্দাকিনীর উপত্যকা। অপর পাড়ে পাহাড়ের গায়ে উখীমঠ। ঘরবাড়ি, মন্দির। ৪,৩০০ ফুট। উখীমঠ কেদারতীর্থের একটি প্রধান কেন্দ্র। শীতের সময়—অর্থাৎ বছরের ছয় মাস—যখন কেদারনাথ মন্দির বন্ধ থাকে, উখীমঠেই পূজা হয়। শুধু কেদারনাথেরই নয়, মদ্‌মহেশ্বরেরও। অথচ, উখীমঠ কেদারের পথে পড়ে না। গুপ্তকাশীর এক মাইল দূরে নালাচটি। কেদার থেকে ফিরতি পথে যাত্রীরা এই নালাচটি থেকে মন্দাকিনীর তীরে নামতেন, পুল পার হয়ে ওপারে চড়াই উঠে উখীমঠ পৌঁছুতেন। তারপর তুঙ্গনাথ দর্শন করে চামেলীতে বদরীনাথের যাত্রাপথ ধরতেন।

এখন কেদার-ফেরত অধিকাংশ যাত্রী গুপ্তকাশীতে এসে বাস করেন। সোজা বদরীনাথ চলেন বাস-এ এসে।

উখীমঠ অবহেলিত পড়ে থাকে।

কেদারনাথের গদি ঐ উখীমঠে। তাই রাওয়াল বা প্রধান পুরোহিতও থাকেন ঐখানে। আগেকার দিনে এঁরাই ছিলেন কেদারনাথের মোহন্ত-স্বরূপ, সর্বেসর্বা। এখন মন্দিরগুলি কমিটির তত্ত্বাবধানে। রাওয়ালও তার অধীনে।

ঐ উখীমঠেই আলাপ হয় এক রাওয়ালজীর সঙ্গে।

সন্ধ্যাবেলা। আরতি শুরু হয়। ওঁকারনাথ মন্দিরের আরতি শেষে অন্যান্য মন্দিরেও দীপ নিয়ে আরতি করে চলেন পূজারী। পিছনে আসেন রাওয়ালজী। বেনারসী জরির বেশভূষা। মাথার উপরও জরির উত্তরীয়। তরুণ বয়স। শ্যাম বর্ণ। কপালে চন্দনের প্রলেপ,—দীপালোকে উজ্জ্বল দেখায়। আয়ত নয়নে স্নিগ্ধ দৃষ্টি যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন। হাত তুলে আশীর্বাদ করেন। আরতি-শেষে নিজের ঘরে চলে যান। কেন জানি না, কিছু পরে তাঁর সেবক এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। দেখি নিজ গদিতে বসে, সেই জরির বেশভূষা একপাশে জড়ো করা। গেরুয়া চাদর গায়ে। মাথায় জটা। গলায় প্রকাণ্ড রুদ্রাক্ষের মালা। যেন কিশোর-শিবমূর্তি। মৃদু হেসে বলেন, এ-সব সাজ-পোশাক পরা মন্দিরের নিয়ম 'আচ্ছা' লাগে না। এখন খুলে হাঁফ ছাড়ছি। কোথা থেকে আসছেন? কোথায় উঠেছেন?

কাছে বসিয়ে আলাপ করেন। সেই প্রথম পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

প্রতি বছরই আসা-যাওয়ার পথে তাঁর কাছে কয়েক দিন কাটাই। দাক্ষিণাত্যের শরীর। লিঙ্গায়েত শ্রেণী। তাই শিবলিঙ্গ সব সময়েই দেহে ধারণ করেন। কখনও মাথার জটার মধ্যে, কখনও বা বুকে ঝোলানো রূপার গোল কৌটার মাঝে।

পরম আত্মীয়ের আদর-যত্ন পাই তাঁর কাছে। থাকবার ব্যবস্থা তো সব করেনই, নিজের হাতে রান্না করে তাঁর পাকশালায় বসিয়ে একই সঙ্গে আহার করেন। "আউর লেও, আউর লেও,—কুছ্ ভী খাতে নাহি" "অন্নং ব্রহ্ম" বলে জোর করে পাতে দেন, হেসে বলেন, হিমালয়ে ঘুরবে, দেহকে অভুক্ত রাখবে না,—মনও তবে ঠিক থাকবে, সাধনভজনও ঠিক চলবে।

প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা করেন, বিদায়ও দেন। আসার সময় প্রসাদী গোলাপ, এলাচ দিয়ে শুভকামনা জানান, আবার আসতে বলেন। সেবকের দিকে ফিরে ইশারা করেন। আমি বুঝতে পারি। হেসে বলি, সঙ্গে সেই রাত্রে-রাখা পায়েসটা দেওয়া হচ্ছে বুঝি? আমি চাই যত ভার নামাতে, সাধু হয়ে আপনি দেন আবার বোঝা বাড়িয়ে!

তিনিও হাসেন। প্রকৃত সাধুর শিশুসুলভ হাসি।

সংস্কৃত ও হিন্দী জানতেন। পড়াশুনা শাস্ত্র-আলোচনায় আনন্দ পেতেন। মদ্‌মহেশ্বরে দীর্ঘকাল কঠোর যোগসাধনাও করেন। সেখানকার কয়েকটি অনুভূতির কাহিনীও শুনি। তাঁরই উৎসাহে ও প্রেরণায় আমার মদ্‌মহেশ্বর যাত্রা। কাছে বসিয়ে বহু কঠিন যোগাসনের পদ্ধতিও দেখান।

একবার চিঠি পাই, অসুস্থ বলে। শীতের সময় দক্ষিণে তাঁদের মঠের কাছে হাসপাতালে আছেন।

পরের বছর আবার উখীমঠে দেখা হয়। বলেন, দেহ এখন একটু ভাল।

তারও পরের বছর। আমার যাত্রার আগে চিঠি দিই। উত্তর আসে না। গুপ্তকাশী পৌঁছুই। স্থানীয় এক গাড়োয়ালী বন্ধু দেখা করতে আসেন। তাঁরই মুখে খবর শুনি। বিষণ্ণ মুখে জানান, শোনেন নি এখনও? শরীর যে তাঁর খুবই খারাপ। দেখতে গিয়ে আর কি করবেন। যাবেন না।

শুনে বলি, অতই যখন অসুখ, দেখতে যাওয়া তো আরও উচিত।

বন্ধু বলেন, গিয়ে বা দেখে কোনই লাভ নেই, শুধু মনেই কষ্ট পাবেন, তিনিও যদি চিনতে পারেন, আরও কাতর হবেন, তবু তার সম্ভাবনা নেই।

খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করি। জানতে পারি, কিছুকাল আগে দেহ একটু সুস্থ হয়, কাজকর্মও শুরু করেন। যোগাসনও আবার আরম্ভ করেন। একদিন শীর্ষাসন অবস্থায় হঠাৎ পড়ে যান। গুরুতর আঘাত পান। ঘাড় এখন বেঁকে গেছে। বুকের উপর মাথা ঝুলছে। মস্তিষ্কেরও বিকৃতি ঘটেছে। কোন কিছুর সম্বন্ধেই প্রায় জ্ঞান থাকে না। আহার নিদ্রা বন্ধ। একমুখ দাঁড়ি-গোঁফ। জটার বিপুর ভার। গায়ে সারাক্ষণ তেল মাখেন। নোংরা ময়লা কাপড় জড়িয়ে পড়ে থাকেন। মুখে অনবরত একই বাণী—'শিবোহহম্' 'শিবোহহম্'। মানুষ দেখলে চিনতে পারেন না। হঠাৎ কাউকে চিনতে পারলে হয়ত কেঁদেই ফেলেন, নয়ত হাসেন কিংবা রেগে গালি দিতে থাকেন।

বন্ধু বলেন, উঃ! দেখা যায় না—এমন বীভৎস দৃশ্য! তাই কিছুদিন থেকে আর তাঁর কাছে যাই না। ব্যবস্থা হচ্ছে, দাক্ষিণাত্যে তাঁদের মঠের কাছে সেই হাসপাতালে আবার তাঁকে পাঠাবার জন্যে।

একটু চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বলেন, সেই লোক! অমন সাধুপুরুষ! সবারই সঙ্গে কী আনন্দময় ব্যবহার—আদর-যত্ন! সদাপ্রসন্ন। কত লোকের কত উপকারই না করেছেন,—হঠাৎ থেমে আমার মুখের পানে তাকান, বলেন, আপনাকে আর বলব কি—আপনি তো তাঁর আপনজন—তবু যাবেন না, করবার আর কিছুই নেই, হয়ত আপনাকে দেখেও চিনতে পারবেন না—চিনলেও আরও কষ্ট পাবেন।

বন্ধু আবার চুপ করেন। দূরে বরফের পাহাড়ের দিকে তাকান। ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে বলেন, কতদিনের আমার পরিচয়! কত ঘনিষ্ঠতা। তবু যাই না কেন, জানেন? দেহের সঙ্গে তো ভালবাসা নয়, ভালবাসা ছিল তাঁর মনের সঙ্গে। সেই হৃদয়—সেই মনই যখন তাঁর হারিয়ে গেছে—শুধু ঐ দেহটাকে দেখতে গিয়ে কী হবে? কাছে গিয়ে করবারও তো কিছুই নেই। এখন কেদারনাথ যতশীঘ্র সেই ভাঙা দেহের মুক্তি দেন—মঙ্গল। তাই-ই কেবল প্রার্থনা জানাই।

নির্বাক হয়ে শুনি। কোথায় কি যেন হারাই! ভাবি, সাধু-শরীরেরও ক্ষয়, সে-ও কি এমনি করেই হয়!

গুপ্তকাশীর পর পাহাড়ের গা দিয়ে সোজা পথ। বহু নীচে মন্দাকিনীর উপত্যকা। মদ্‌মহেশ্বর গঙ্গার সঙ্গম। সেইদিকে নীল আকাশের বুকে বদরীনাথের বরফ-চূড়া। পথে আরও এগিয়ে দূরে সামনে কেদার-তুষার শিখর। পথের দুপাশে রামদানার ক্ষেত। রক্ত-রাঙা শীষগুলি, বাতাসে ঢেউ খেলে। পাহাড়ীদের ছোট ছোট ঘর। ছোট ছেলেমেয়ে দল বেঁধে পথের উপর ছুটে আসে। হাত পেতে সুই তাগা পাই-পয়সা চায়। নেচে নেচে ঘিরে চলে। সুর করে গান ধরে। তারই কয়টা কলি এখনও কানে বাজে। তীর্থযাত্রীর বিবরণ:

কোই খায় হালুয়াপুরি বরফি মিলাইকে
সাধু খায় সুকড়া টুকড়া চিমটা বজাইকে
কোই যায় হাতিঘোড়া পালকি সাজাইকে
সাধু যায় পাঁও পাঁও চিমটা বজাইকে।

গানের সুর যাত্রীর পায়ে যেন চলার ছন্দ তোলে।

এক মাইল এগিয়ে নালাচটি। দুপাশে সারি সারি ঘর, মাঝে মাঝে সোজা পথ। পথের মুখে প্রকাণ্ড এক গাছের ছায়া। চটির দাওয়ায় বা চায়ের দোকানের বেঞ্চে যাত্রী বসে, কেউ বা লাঠি হাতে বোঁচকা মাথায় ধীরে এগিয়ে চলে। আরও মাইলখানেক গিয়ে ডাইনে সরু পথ কালীমঠে নেমে যায়। কেদারের পথ পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে চলে ভেতাদেবী, নারায়ণকুঠী।

এখন সেখানে জেগে ওঠে মোটরের নতুন পথ। চওড়া, ধুলাভরা। দলে দলে মজুরেরা কাজ করে। পাহাড় ভাঙে, পাথর ভাঙে। সভ্যতার যান আসবে, তারই জন্যে ব্যস্ততা, বিপুল আয়োজন। নালাচটি পড়ে থাকে নীচে। ফেলে-দেওয়া ছেঁড়া চটির মতন।—পাহাড়ী ছেলেমেয়ে ভিক্ষা করতে ছুটে আসে না। বইখাতা হাতে পড়তে চলে স্কুলে। মেয়েদের পরনে শহরের ফুলকাটা রঙিন শাড়ি। চালচলনে সভ্যজগতের ছাপ।

হাঁটা পথ বিয়ঙ চটির কাছে নেমে যায়। তারপর, মৈখণ্ডার চড়াই।

বিয়ঙ পার হতে একবার এক বৃদ্ধ পাহাড়ী সঙ্গ নেয়। ভিক্ষা চায়, গরিব ব্রাহ্মণ, খেতে পাই না।

প্রতি বছরেই তাকে দেখি। ঠিক একই জায়গায় এসে পিছু ধরে। একই বাঁধা বুলি বলে ভিক্ষা করে। একবার স্থানীয় পরিচিত এক পাহাড়ীর সঙ্গে এইখানে দেখা। গল্প করে এগিয়ে চলেন। বুড়া ঠিক এসে হাজির। মুখে সেই একই বুলি। পকেটে হাত পুরি। সঙ্গী দেখে নিষেধ করেন। তাকে ধমক দেন। তখন শুনি, বৃদ্ধের সচ্ছল অবস্থা। জমিজমা, ঘরবাড়ি আছে। তবুও স্বভাব, ভিক্ষা করা। যাত্রী দেখলেই হাত পাতে।

ভাবি, কি জানি, একেই হয়ত দেখেছি প্রথমবারে—ছোট্ট ছেলে নেচে গেয়ে ভিক্ষা করে। এখন সে ছেলেমেয়ের দল গেছে। কিন্তু বৃদ্ধবয়সেও এর সে স্বভাব আছে।

পরের বছর। তাকে দেখি না। সেই পথ পার হতে থমকে দাঁড়াই। ফিরে গিয়ে চটিওলার কাছে খবর নিই। সে হেসে জানায়,—ওঃ! সেই বুড়ো? মারা গেছে ক'মাস আগে। বাবুজীর মনে আছে, দেখছি!

বোঝানো যায় না, সে-ও কেমন করে এই যাত্রা-পথের অংশ হয়ে থাকে!

বাস-পথ নতুন তৈরি হচ্ছে। বিয়ঙ-মৈখণ্ডার উৎরাই চড়াই এড়িয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে অনেকখানি ঘুরে চলে আসছে ফাটাচটিতে।

বহু রাত্রি কেটেছে এই ফাটায়। নিরিবিলি সুন্দর ডাকবাংলো। বাঁ দিকে দূরে কেদারের বরফ। সামনের পাহাড়ে সবুজ বন। সেখানে খোলা মাঠে নিশ্চিন্তে হরিণ চরে। ডাইনে পাহাড়গুলির মধ্যে দূরে মাথা উঁচু করে তুঙ্গনাথের চূড়া। বাংলোর সামনে লন-এ ইজিচেয়ার পেতে চুপ করে বসে থাকি। সামনে আঁকা ছবির মত দেখি। অকারণে কিসের টানে দু-তিন দিন কাটাই। মনে হয় নিজের ঘরে আছি। বৃদ্ধ চৌকিদার আপনজনের মতো কাছে এসে বসে। সুখদুঃখের কথা শোনায়। নিজের ঘর থেকে শাকসবজি, দুধ-দই আনে।

দু বছর আগে গিয়ে দেখি, নতুন চৌকিদার। খবর নিয়ে জানি, বুড়ারই ছেলে। বাপ শয্যাশায়ী।

বুঝতে পারি, মহাকাল এগিয়ে চলে। শুধু হিমালয়,—নির্বিকার, তেমনি দাঁড়িয়ে। ধ্যানমগ্ন উদাসীন ঋষি।

॥ ১২ ॥

রামপুর চটি। ধর্মশালার দোতলার এক পাশের ঘরে উঠি। অক্টোবর মাস। যাত্রীর ভিড় নেই। হঠাৎ অনেক লোকজনের গলা শুনি। সশব্দে উপরে আসে। আর এক দিকের ঘরগুলি দখল করে। নীচে ডাণ্ডি, কাণ্ডিওয়ালাদের সাড়াশব্দ বুঝতে পারি, বড় দল। একটু পরেই এক সেবা-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ঘরে ঢোকেন। বলেন, আপনি চলেছেন, নীচে চৌকিদারের কাছে জানলাম। একটু সাহায্যের আশায় এসেছি। এক বড় শেঠ এসেছেন তীর্থ করতে, তাঁরই সঙ্গে যাবার ও দেখাশোনার ভার পড়েছে।

আমি বলি, এই দলবল এল, টের পেয়েছি।

তিনি জানান, না, না, এটা সে-দল নয়, তবে তাঁদেরই লোকজন বটে। শেঠের আরও ভারী দল, কেদারের পথে এগিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে আমিও ছিলাম। তারপর হঠাৎ এল এই টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রামখানা হাতে দেন। তাতে লেখা,—পথে অপেক্ষা করো, আমি আসছি;—নির্মলা।

ভদ্রলোক বলেন, এখন ব্যাপারটা শুনুন। শেঠের এমনিতেই ভীষণ মেজাজ। তার ওপর টাকার গরম। তাঁর ধারণা, টাকা দিলে সব কিছু হয়, এ-পথেও সব কিছু পাওয়া যায়। তা কি সম্ভব? না পেলেই রাগ। স্ত্রীর সঙ্গেও সব সময়ে খটাখটি। প্রতি চটিতেই কোন না কোন ঘটনা ঘটছেই। এমনিতেই হয়রান হয়ে আছি। তার ওপর এই টেলিগ্রামটা আসতেই তিনি তো ক্ষেপে আগুন। স্ত্রীও রেগেমেগে বলেন, যাব না আমি তোমার সঙ্গে; আমি লোকজন নিয়ে একাই চললাম এগিয়ে,—থাকো তুমি এখানে। পথে দাঁড়িয়ে সে এক তুমুল কাণ্ড। স্ত্রী দলবল নিয়ে এগিয়ে যান ডাণ্ডি চড়ে। শেঠও ঝগড়া করতে করতে তাঁরই পিছু নেন। চুপিচুপি আমাকে হুকুম দেন, রুদ্রপ্রয়াগে ফিরে গিয়ে এই নির্মলাকে সঙ্গে করে আনতে। তাই এখন নিয়েও চলেছি তাঁরই দলবল। কিন্তু শুনছি, ইনি শেঠের উপপত্নী!—মহাঝঞ্ঝাটে পড়েছি। হৃষিকেশে আমার কর্তাদের যদি একটু জানান, এঁদের সেবার ভার থেকে আমাকে যেন মুক্তি দেন।

কিছুক্ষণ পরের ঘটনা। এক তরুণ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সিঁড়ির উপর দেখা। দেখি, তিনি আমাকে চেনেন। নিজের পরিচয় দিতে সঙ্কোচ করেন। পরে চিনতে পারি। তাঁর বাল্যকালে তাঁকে দেখা, তারপরে শুনেছিলাম, আশ্রমে যোগ দিয়েছেন। ভদ্র, সুশ্রী, ধীর, শান্ত যুবক। এখন মুণ্ডিত কেশ। পরনে সাদা ধবধবে ছোট থান। নিষ্পাপ, নির্মল মূর্তি। দেখে আনন্দ পাই। সাদরে ঘরে এনে তাঁর যাত্রার খোঁজ-খবর জানি।

আশ্রম থেকে একাই এসেছেন। হিমালয়ে এই তাঁর প্রথম আসা। বৃদ্ধ স্বামিজীরা সাবধান করেন, এ-সময়ে শীতের মুখে যাত্রী থাকে না, চটিও সব সময়ে খোলা পাবে না, বনজঙ্গলের পথ,—একা এই সময়ে না গেলেই হত!

সাহস দিয়ে বলি, এই তো আমিও চলেছি একা। ভয় কীসের? কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

তিনি জানান, এখন যেভাবে চলেছি, অনেক সুবিধে হলেও অস্বস্তি বোধ করছি। বাস ছেড়েছি রুদ্রপ্রয়াগে। সেইখানেই ধর্মশালায় দেখা এক শেঠের দলের সঙ্গে। শেঠের মহিলা অতি ভদ্র। আমাকে একা দেখে নিজে থেকেই ব্যবস্থা করলেন, তাঁদের দলের সঙ্গে চলতে। আমি কোনমতেই রাজী হই না, তিনিও শুনবেন না। মায়ের মতো জোর করেন। তাঁদেরই কুলি আমার যা সামান্য লোটা কম্বলের বোঝা, তাঁর হুকুমে বইছে। খাওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করেন। অতি আদর-যত্নে চলেছি। ভদ্রমহিলার বয়স বেশি নয়, যেমন রূপ, তেমনি আচার-ব্যবহার, নম্র। ধনী বলে কোন অহঙ্কার নেই। শুদ্ধাচারে মন্দিরে মন্দিরে দর্শন পূজা করে চলেছেন। তাই পথের কষ্ট আমার নেই। কিন্তু, এত আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য আমার মোটেই ভাল লাগছে না। হিমালয়ের তীর্থ-পথের স্বাদ যেন পাচ্ছি না।

নির্মলার প্রকৃত পরিচয় কী,—কে জানে? কিন্তু শেঠের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা প্রকাশ করতে মনে কোথায় যেন বাধে। বলার প্রয়োজনও দেখি না। শুধু বলি, এ-পথে সত্যিই যদি আনন্দ পেতে চাও, একাই

যাত্রা করো। দরকার নেহাত যদি মনে হয়, এখান থেকে পাহাড়ী একটি লোকের ব্যবস্থা করে দিই, সঙ্গে যাবে, তোমার সামান্য বোঝা বইবে, ডালভাত যা হয় রেঁধে দেবে। দেখবে, পথের কষ্ট, অসুবিধা যাই থাক, কত গভীর আনন্দে মন ডুবে থাকবে।

তাই ব্যবস্থাও হয়। দু মাস পরে তাঁর চিঠি পাই কলকাতাতে। লেখেন, ঠিকই বলেছিলেন। পরম আনন্দে যাত্রা শেষ করে ফিরেছি। কিন্তু জানি, এ শেষ নয়, হিমালয়ের সঙ্গে সত্যকার পরিচয়ের এই সবে শুরু।

ফাটার কিছু পর থেকে মাঝে মাঝে গভীর বনের ছায়া। রামপুরের পরও সেই বনপথের অংশ ছড়িয়ে থাকে। বড় বড় গাছ। পাহাড়ের বাঁকে জটলা করে দাঁড়িয়ে। গাছের গুঁড়ি ও ডাল পাক খেয়ে জড়িয়ে ওঠে সবুজ গুল্মলতা। দুই পাহাড়ের মাঝে পাহাড়ী ছোট নদী। কাঠের পুল। সবুজ পাতার সামিয়ানার তলা দিয়ে ঘুরে ঘুরে পথ ওঠে, নামে। স্যাৎসেঁতে আবহাওয়া। ভিজে পাতা, মাটির সোঁদা গন্ধ। জলের কলকল শব্দ। হঠাৎ হয়ত গাছের উপর খসখস শব্দ ওঠে। কয়েকটা কালো সিভেট ল্যাজ দুলিয়ে ছুটে গাছে চড়ে। মুখে সাদা দাগ। চকিত কোথায় নাম-না জানা কি এক পাখি শিস দিয়ে অলক্ষ্যে উড়ে যায়। ডালপাতার শব্দ ওঠে। একা পথ চলি আনমনে। হঠাৎ মৃদুস্বরে ভেসে আসে। সুমধুর কৃষ্ণভজন। বনের অন্তরে, পাতার মর্মরে, ঝরনার কলতানে সে-ধ্বনি যেন সুর মেলায়।

পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই সামনে দেখি দীর্ঘদেহ এক বৈরাগী। পরনে মোটা সাদা কাপড়। কোমরের দুদিক ঘিরে বুক ঢেকে গলার পিছনে গিঁট দেওয়া। খালি পা, খালি গা। কামানো মাথায় ও দাড়িতে কদিনের না-কামানো খোঁচা খোঁচা সাদা চুল। যেন কদমফুল। ফর্সা রঙ। মুখে মৃদু মধুর হাসি। গান গেয়ে পথ বেয়ে এগিয়ে আসেন হেলেদুলে। কাছে এলে দুজনেই দাঁড়াই। তাঁর উজ্জ্বল আনন্দ আমারও অন্তরে দীপ্তি ছড়ায়। মুখে আনন্দের হাসি ফোটায়। দুই করতল তুলে তাঁর বুকের উপর আমার দৃষ্টি টানেন। গলা থেকে ঝোলানো ঝুলায় তাঁর বুকে দোলে ছোট্ট সিংহাসন। পিতলের, কিন্তু দেখায় যেন সোনার। তারই মাঝে ছোট্ট এক বালগোপালের মূর্তি। হামা দিয়ে চলতে গিয়ে থমকে যেন থেমে গেছেন—ছোট্ট তাঁর ডান হাতখানি তুলে। মাথায় হেলানো অতি ছোট্ট ময়ূরের পালক। আকারে সবই অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু মনে হয় সারাবিশ্ব যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে তারই মধ্যে স্থান পায়। একবিন্দু শিশিরে সূর্যের আলো।

বৈরাগী কথা বলেন না। আমিও নয়। ক্ষণিক দাঁড়িয়ে তেমনি হেসে, দুলে, গান গেয়ে বনের পথে এগিয়ে চলে যান।

সেই পথ-চলা কবে শেষ করেছি। কিন্তু কৃষ্ণভজনের সেই সুর কানে শুনি আজও। বালগোপালের সেই মধুর মূর্তি চোখে ভাসে আজও এখনও।

॥ ১৩ ॥

ত্রিযুগীনারায়ণ। কেদারের ঠিক পথে নয়। পথ ছেড়ে চড়াই ভাঙতে হয় খানিকটা। রামপুর ছাড়িয়ে সীতাপুর। আগে এখানে চটি ছিল না। একবার দেখি একটা চালাঘর। এক পাহাড়ী উনুনে দুধের কড়া চাপিয়ে জ্বাল দেয়। ক্রমে চায়ের সরঞ্জাম আসে। এক এক করে নতুন ঘরও ওঠে। জলের পাইপও বসে। এখন ভাল চটি। অনেক যাত্রী এইখানেই রাত কাটানো সুবিধা মনে করেন। সীতাপুর ছাড়িয়ে গিয়েই পথের বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে কাঠের ফলকে লেখা—ত্রিযুগীনারায়ণ মার্গ—৩$\frac{১}{২}$ মাইল। ধীরে ধীরে সে-পথ ওঠে। চড়াই-শেষে শাকম্ভরী বা মনসা দেবীর মন্দির। দেবীকে পরিধেয় বস্ত্র—অন্তত কাপড়ের টুকরো দান পাণ্ডাদের বিধান। মন্দির অর্ধ-চন্দ্রাকারে ঘিরে পথ ঘোরে। মাইলখানেক বনের মধ্য দিয়ে সমতল পথ। সামনের পাহাড়ে সে-পথ শেষ হয় ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির ও বসতিতে। উঁচু জায়গা। প্রায় ৬০০০ ফুট। শীত আছে, জোর বাতাসও বয়।

ত্রিযুগীনারায়ণের চড়াই। কিন্তু একবার উৎরাই করে নামি এইখানে। সে-বছর গঙ্গোত্রীর পথ থেকে পাওয়ালির চড়াই শেষ করে এইদিকে নেমে আসি ত্রিযুগীনারায়ণে। ভাগীরথীর উপত্যকা থেকে মন্দাকিনীর উপত্যকায়। দিন দশেক লাগে সে-পথ আসতে। পাওয়ালির দুরূহ চড়াই-এর প্রসিদ্ধি আছে। আবার তেমনি আছে গহন বনের শ্যামশোভা। নির্ঝর-কল্লোলমুখর উপত্যকা। শৈলশিরে কোমল কচি ঘাসের স্নিগ্ধ প্রভা। নানা রঙের ফুলের অতিবিচিত্র বর্ণবিন্যাস। ও-পথে যাত্রী যাতায়াত অতি বিরল।

কেদারনাথ মহাদেব। কিন্তু ত্রিযুগী—নারায়ণ। প্রবাদ, এইখানে শিবপার্বতীর বিবাহ হয়। নারায়ণ সাক্ষী থাকেন। যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের সেই অনির্বাণ হোমাগ্নির শিখা আজও জ্বলে। যাত্রী মাত্রেই তাতে কাঠ ফেলে আহুতি দেন।

ফেরবার পথের শেষের অংশ ভিন্ন মুখে। এগিয়ে এনে কেদারের পথে নামিয়ে দেয় শোনপ্রয়াগে। শোনগঙ্গা বা সোমগঙ্গা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম। এই শোনগঙ্গার উৎপত্তি বাসুকিতালে, তাই বাসুকিগঙ্গাও বলে।

শোনপ্রয়াগে পুল পার হয়ে কেদারনাথের চড়াই আরম্ভ। এই পর্যন্তই আপাতত মোটরের পথ আনবার পরিকল্পনা। কেদারনাথ এখান থেকে প্রায় মাইল দশ।

খানিকটা চড়াই উঠে মুণ্ডকাটা গণেশের মন্দির। আরও এগিয়ে গৌরীকুণ্ড। আবার ৬,৫০০ ফুট-এ আসা। বড় চটি, ধর্মশালা। গরম জলের কুণ্ড। গৌরীদেবীর মন্দির।

গৌরীকুণ্ড থেকে আবার চড়াই। ধীরে ধীরে গেলে কষ্ট নেই। ছায়াশীতল বনময় পথ। চার মাইল দূরে রামওয়াড়া। ৮০০০ ফুট।

১৯২৮ সালের যাত্রায় এইখানে রাত কাটে। খান তিন-চার মাত্র ছোট চালাঘর ছিল। তাও সামনে খোলা। আশেপাশে বরফ পড়ে। হিমালয়ে সেই প্রথম হাতে পায়ে বরফের স্পর্শ পাওয়া। নিকটেই মন্দাকিনীর তুষারগলা ধারা। নদীর উপরও স্থানে স্থানে তুষার-আচ্ছাদন। অলক্ষ্যে জলের ধারা ছোটে. নদীর আকার ছোট, কিন্তু প্রচণ্ড হুঙ্কার। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে জল নামে পাহাড়-পথে। ও-পারে গভীর জঙ্গল। দু-একটা হরিণ ঘোরে।

চটির তিনদিকেই পাহাড় ঘেরা। পাহাড়গুলির মাথায় বরফ। কেমন যেন ভিজা ভিজা আবহাওয়া। রোদের নামগন্ধ নেই। দিনের বেলাতেও ঘোলাটে ভাব। কনকনে শীত। শীতের রাতে কে ভিজে কম্বল জড়িয়ে দিয়েছে গায়। বৌদিদির—সঙ্গী পূর্ণদার স্ত্রীর—হার্টের অসুখ। তবুও সাহস করে যাত্রায় আসেন। কিন্তু কেদারনাথ আরও তিন হাজার ফুট উঁচুতে,—১১,৭৫০ ফুট। তাই, সেখানে রাত কাটানোর ভরসা হয় না। ঠিক হয়, ভোরে রওনা হয়ে কেদারনাথ দর্শন, পূজাদি সাঙ্গ করে আবার এইখানে ফেরা ও রাত কাটানো। সেইমত করাও হয়।

তারপর কেদারে কতবারই যাই। কত রাতই কাটাই সেখানে। প্রচণ্ড শীতও পাই। নতুন তুষারপাতও হয়। কিন্তু কখনও দৈহিক কোন ক্লেশ বা অস্বস্তি বোধ হয় না। অনাবিল আনন্দে মন ভরে থাকে। দেহের ধর্ম অভ্যাসে সবই সহ্য হয়।

রামওয়াড়াতে রাত কাটিয়ে সকালে কেদার যাওয়ার অনেক সুবিধা। সাধারণত তাই আমি করি।

রামওয়াড়াতে এখন বড় বড় চটির পাকা ঘর, ধর্মশালা। সকালে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে। বিকালে এ-সব অঞ্চলে প্রায়ই বৃষ্টি, শিলাপাত হয়। রাত্রের বিশ্রামের পর দেহের নবীন উদ্যম, মনের স্নিগ্ধ প্রফুল্লতা পথচলার প্রেরণা আনে। কেদারের প্রসিদ্ধ চড়াইটুকু শেষ করতে কোন অবসাদই আসে না। সবাইকে সেই কথাই বলি। একবারের এক ঘটনা।

রামওয়াড়াতে পৌঁছে দেখি, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের দু-তিনটি দল হঠাৎ একই সঙ্গে সেদিন সেখানে হাজির। দুর্গম তীর্থপথে আকস্মিক মিলনের আনন্দ আছে। সকলে হৈ চৈ করে তারই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। কিন্তু বিষাদ ঘটে দেখি পরের দিন দুই বন্ধুর মধ্যে।

ধর্মশালার দোতলায় সারি সারি ঘর। তারই মধ্যে রাত্রে শোওয়ার আয়োজন হয়। দুজন কিন্তু কোনমতেই সেখানে শুতে রাজী হন না। সামনে ঢাকা লম্বা বারান্দা,—ঘরেরই মত। পাশাপাশি বিছানা পেতে শোন। দুজনেরই মুখে একই কথা, ঘরের মধ্যে একসঙ্গে শোওয়ার অসুবিধা আছে।

ভোরে উঠে দেখি, দুজনেই বিছানায় বসে মুখ গম্ভীর করে দুদিক ফিরে। দুজনারই মুখে-চোখে গভীর বিরক্তি, সারারাত না-ঘুমোনোর চিহ্ন। অভিযোগ দুজনেরই এক।

ব্যাপারটা শুনি। একজন বলেন, ঘুম হবার কি উপায় আছে? একটু তন্দ্রা আসে, পাশে শুনি বিরাট নাসিকাধ্বনি! ঠেলে জাগিয়ে দিয়ে বলি, একটু পাশে ফিরে শোন,—নাকটা একটু কম ডাকবে। অত বিকট শব্দে ঘুম আসে কখনও?

অপর বন্ধু বলেন, এমন কি আর শব্দ আমার? সবে একটু ঘুম আসছে উনি ঠেলে ভাঙিয়ে দেন, ধড়মড় করে উঠে বসতে হয়। দেখি উনি আমার কাঁচা ঘুমটি ভাঙিয়ে নিজে পড়লেন শুয়ে। তারপরই, সে কী নাকডাকা—মন্দকিনীর আওয়াজও ডুবে যায়! করি কি? অগত্যা ডেকে তুলে দিয়ে বলি, মশাই, এবার আপনি চিৎ না হয়ে পাশ ফিরবেন? সারারাত কি ঘুমুতে দেবেন না?

এবার সে-ভদ্রলোকের ধড়মড়িয়ে উঠে বসা, অপর বন্ধুর আবার শোওয়া, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম, নাকডাকা! এ-বন্ধুর আবার ঠেলে জাগিয়ে দেওয়া।

এইভাবেই দুজনের সারারাত না ঘুমিয়ে কাটে।

রামওয়াড়া থেকে কেদারনাথ মাত্র তিন মাইলের একটু বেশি। কিন্তু, চড়াইও তিন হাজার ফুটের উপর। হিমালয়-পথে চলার অভ্যাস না থাকলে দেহের ও শ্বাসের একটু কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। সব ক্লেশ হরণ করে—এ-পথটুকুর অপরূপ শোভা। গাছপালা ক্রমে শেষ হয়ে আসে। ছোট ছোট ঝোপঝাড়। নানা রঙের ফুল। শিলাখণ্ডগুলিরও বর্ণবিন্যাস। মন্দাকিনীর স্বচ্ছ জলের উচ্ছল ধারা। অপর পারের পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গহ্বর। তারই ভিতর থেকে কলকল রবে জলের ধারা নামে,—নিকষ কালো গাই-এর সোনালি বাঁট থেকে যেন দুধ ঝরে, পাত্র ভরা সাদা ফেনা জমে, গড়িয়ে পড়ে। সারি সারি ধারা নেমে গিয়ে মেশে মন্দাকিনীতে। চারিপাশে মাথা-উঁচু পাহাড়—বরফের চূড়া। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ ওঠে—এঁকে-বেঁকে। বহু উপরে দেখা যায় দেও-দর্শনের দু-একটা ঘর। যাত্রী চলে—দূর থেকে মনে হয় পিঁপড়ের সারি। উপর থেকে ফিরতি যাত্রী নামে তাড়াতাড়ি। মুখে তৃপ্তির হাসি। নীচে থেকে যাত্রী ওঠে অতি ধীরে। হাতের লাঠির উপর ভর দেয়। সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হাঁফ লাগে। খানিক দাঁড়ায়। ক্ষণিক বসে। চোখে মুখে করুণ চাহনি। ফিরতি পথের যাত্রীরা উৎসাহ দেয়। বলে, আর তো দূর নেই—এই তো চলে এলে! বোলো—কেদারনাথজী কী জয়!

নিস্তব্ধ পাহাড় যেন চমকে ওঠে। অবসন্ন যাত্রীর তন্দ্রা ছোটে। উৎসাহে এগিয়ে চলে। কে যেন অলক্ষ্যে হাত ধরে সস্নেহে নিয়ে চলেন। পথের পাশে ফুলেরা হাসে। নদীর স্রোত গান গায়। নীল আকাশে স্বর্গের আভাস দোলে।

দেও-দেখনী। অর্থাৎ, দেব-দর্শন।

পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট চটি। কিন্তু যাত্রীর মনে সুগভীর স্বস্তি। চড়াইপথের পরিসমাপ্তি। যেন দীর্ঘপথের শেষে অদূরে ফুটে ওঠে আপন ঘরের বাতায়নে ক্ষীণ আলোকশিখা।

চটি ছেড়ে অল্প গিয়ে পাহাড়ের বাঁক। পথ ঘুরতেই সামনে যেন রঙ্গমঞ্চের যবনিকা ওঠে। সুমুখে আকাশ জুড়ে বিশাল তুষারশিখর। কেদারের গিরিশ্রেণী। ২২,৭৭০ ফুট। সূর্যের কিরণ বরফের চূড়ায় রূপার মুকুট পরায়। তিন দিক পাহাড়ে ঘেরা। নদীর উপত্যকা যেন ভস্মস্তূপে ছাওয়া। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া শিলাখণ্ডের রাশি—debris। তারই মাঝে ছোট ছোট কয়েকটা ঘরবাড়ি, মন্দিরের চূড়া। পাশে ক্ষীণকায়া মন্দাকিনীর ধারা। মন যেন সেই দূর থেকে লুটিয়ে পড়ে মন্দিরের দ্বারদেশে। অবাক হয়ে যাত্রী দেখে। ভুলে যায় আপনাকে। এখন, যাত্রাশেষের তৃপ্তি নয়। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার, অসীমের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার সুগভীর আনন্দ।

চড়াই নেই। মাইলখানেক সোজা ময়দান। কোথাও ফুলে ছাওয়া, কখনও বরফে ঢাকা, মাঝে মাঝে জলের ধারা।

মন্দাকিনীর উপর ছোট পুল। বাঁধানো ঘাট। সারি সারি বাড়ি। পথের শেষপ্রান্তে কেদার-মন্দির। পিছনেই তুষার-শিখরের পটভূমি। মন্দিরের কয়েকটি ধাপ। বিশাল আকার নন্দী। ধুলাপায়ে মন্দিরে দেব-দর্শন করি।

একবার ভোরে এসে পৌঁছাই। দ্বার খোলা পাওয়ার কথা নয়। সিঁড়ি উঠে বাইরে থেকে প্রণাম করি। মুখ তুললেই দেখি মন্দিরের সেবক দাঁড়িয়ে। হাসিমুখে স্বাগত জানান,—আবার এসে গেছেন! এত সকালে! চলে আসুন। ওদিকের দরজা খুলে মন্দির পরিষ্কার করছি। ভেতরে দর্শন করুন।

নিস্তব্ধ মন্দির। যাত্রীশূন্য। দীপের স্তিমিত আলোক। কেদারনাথের সেই প্রাচীন, তবুও চির-নতুন—পাষাণ দেহ। একরাশ ফুলের আভরণ। ধূপ-চন্দন-ঘৃতের স্নিগ্ধ শীতল সুবাস।

সারা দেহমন দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। বুকে ধরে আলিঙ্গন করি।

কী নিবিড় শান্তি!

॥ ১৪ ॥

কেদারনাথ। ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থ। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। 'হিমালয়ে তু কেদারম্'।

তবু, লোকবসতি কম। ১৯২৮ সালে দেখি মাত্র আট-দশটি ঘর। দোকান-পাটের বালাই নেই। পাণ্ডার বই-এ লেখা—'পথ বিষম চড়াই ও বরফাচ্ছন্ন।' যাত্রীরাও অনেকেই ভয় পান। সকালে পৌঁছে পূজা সেরে আবার গৌরীকুণ্ডে নেমে যান। হাঁফ ছাড়েন। নিশ্চিন্ত হন। শীতের প্রকোপ আছে, ঠিকই। অতি নিকটে বরফের পাহাড়। কনকনে হাওয়া। রৌদ্রের তেজেরও তেমন উত্তাপ থাকে না। সূর্যের মুখ দেখা গেলেই, লোকে আমেজে রোদ পোহায়। কাপড়-জামা লেপ-কম্বল গরম করে।

মে মাসে—যাত্রার প্রথম দিকে— প্রায়ই, শীতকালে পড়া বরফ তখনও কিছু জমে থাকে। ১৯২৮ সালে পথের আশেপাশে বাড়িগুলির বাইরে আনাচে-কানাচে অনেক জমে ছিল। জুন-জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বরফ না পাওয়ারই কথা। অক্টোবরে আবার বরফ দেখা দেয়। হঠাৎ বেশি বৃষ্টি হলে প্রচুর তুষারপাতও হয়। তখন সারা শহর সাদা চাদরে যেন ঢেকে যায়। রৌদ্র উঠলে বরফ গলা শুরু হয়। বাড়ির ছাদে জমা বরফের স্তূপ—গড়িয়ে হয় সশব্দে নীচে পড়ে, না হলে জল হয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরতে থাকে। ছাদ থেকে বারান্দার গায়ে বরফের ঝুরি সারি সারি ঝোলে, টপটপ করে জল পড়ে। যেন বৃদ্ধ বটের গায়ে সাদা ঝুরির পাকা জটা, বৃষ্টির পর তাতে জল ধরে। কেদারনাথে কষ্ট করে দুদিন কাটিয়েও এদৃশ্য দেখার মাধুর্য আছে।

বরফের পাহাড়ের পটভূমিকায় কারুকার্যময় পাথরের সুন্দর মন্দির। যেন, হিমগিরির একান্তে সৌম্যকান্তি এক তপস্বী, ধ্যানাসনে স্তব্ধ নিশ্চল।

আর এখন? মন্দিরের পথে দুই পাশে বাড়ি ও দোকানের সারি। ভিড় করে মন্দিরের চাতাল পর্যন্ত এগিয়ে যায়। আশপাশে আরও নতুন ঘর ওঠে। বছর চারেক আগে মন্দিরের কাছে এক বাড়ি থেকে লাউড-স্পীকারে গান শুনে চমকে উঠি। বম্বে-ফিলম-এর 'লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা'—ঐ ধরনের গান। উত্ত্যক্ত হয়ে অনধিকার প্রবেশ করি। শুনি, গভর্নমেন্টের কোন এক প্রচার বিভাগ। হাত জোড় করে সবিনয়ে জানাই, ঐ উৎকট শব্দটা দয়া করে বন্ধ রেখে প্রচার-কার্য চালান। এখানে কি ও-সব মানায়?

ভদ্রলোক বললেন, এ যে খুব 'পপুলার' গান। সবারই মুখে চলছে।—পরে ভাল ভজনও দেব।—

ভাবি, এবার কি শ্মশান-যাত্রার পথেও চলবে সিনেমার গান!

মন্দিরের পিছনেও প্রকাণ্ড আর এক মন্দিরের সূচনা দেখি। শঙ্করাচার্যের সমাধি-মন্দির।

প্রবাদ, শঙ্করাচার্য এই কেদারনাথেই দেহরক্ষা করেন। মন্দাকিনীর ধারার নিকটে—মন্দির থেকে কিছু দূরে, একপাশে—একটা খোলা জায়গা দেখাতেন পাণ্ডাজীরা। মাঠের মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ। একবার একটা টিনের ছাউনিও ওঠে। পরের বছরই তুষারপাতে ভেঙে পড়ে। এখন স্মৃতি-মন্দির উঠছে কেদার-মন্দিরের ঠিক পিছনেই। শঙ্করের সমাধি-মন্দির গড়া পুণ্য কাজ। বিরাট কিছু হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু ভাবনা হয়, তুষার-পটভূমির অন্তরাল ঘটিয়ে কেদারের মন্দির ছাপিয়ে উঠবে না তো?

কেদারনাথে কয়েকটি কুণ্ড আছে। উদক, রেতস, রুদ্র, হংস, ঋষি। রেতস কুণ্ড মাঠের মাঝে। পাথরের ছোট মন্দির। জলের পাশে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে কথা বললে বা হাততালি দিলেই জলে বুদ্বুদ ওঠে। উদক কুণ্ডে নাকি পারদপদার্থ—mercury আছে।

কেদারনাথের পূর্বদিকে পাহাড়ের মাথায় অল্প উঠে ভৈরব-মন্দির, ভৈরবশিলা। যাত্রীরা অনেকেই যান। উপর থেকে নীচে কেদারশহরের দৃশ্য ভাল দেখায়।

মন্দিরের পিছনে বরফের পাহাড়। মাইলখানেক মাত্র দূরে। মাঝে ভাঙাচোরা পাথরের স্তূপ—debris—ছড়ানো ময়দান। মাঝে মাঝে জলাভূমি। ছোট ছোট ধারা।

বরফের পাহাড়ের ঠিক নীচের এক অংশে খাড়া কালো পাথর,—দেওয়ালের মত। ছোট এক জলপ্রপাতও। এককালে সেই উঁচু পাথরের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন বিসর্জন দেওয়া স্বর্গলাভের সহজ উপায় বলে প্রসিদ্ধি ছিল। বিশেষত সাধুদের মধ্যে। লোকে বলত,—ভৈরবঝম্প বা ভৃগুপন্থ।

ঐখানে যেতে ডানদিকের পাহাড়ের মধ্যে যে খাদ দেখা যায়—সঙ্কীর্ণ গিরিপথের মত কোথায় অদৃশ্য হয়,—সেই শুনি, মহাপ্রস্থানের পথ। কেউ দেখান এদিক দিয়ে, কেউ বা বদরীনাথের দিক দিয়ে সেই মহাপন্থ। বদরীনাথ অর্থাৎ চৌখাম্বা গিরিশিখরের উপর বাঁ পাশ দিয়ে এই পথের যোগাযোগ,—একই পথের দুইটা মুখ, কোন্‌টা শুরু, কোন্‌টা শেষ—তাই নিয়েই মতভেদ।

শোনা যায়, একই পূজারী কেদার ও বদরীর পূজা করতেন নিত্য এই পথে গিয়ে। পূজারীর এক ত্রুটির ফলে এই পথ অগম্য হয়ে যায়,—কে জানে, হয়ত প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায়।

এই কষ্টকর কাহিনীর সত্যতা বিচারে লাভ নেই। কিন্তু যা নিজ চোখে দেখা তাই লিখি।

সে-বছর কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে কেদারনাথ মন্দিরের পিছনে বেড়াতে বেড়াতে বরফের পাহাড়ের পাদদেশে আসি। হঠাৎ সবারই দৃষ্টি পড়ে পাহাড়ের উপর দিকে—সাদা বরফে এক কালো বিন্দু। নড়ে চড়ে। সাদা কাপড়ে যেন পিঁপড়ে ঘোরে। নিচের দিকে নেমে আসে। ক্রমে স্পষ্ট হয়। মানুষের মূর্তি। অবাক হয়ে সবাই তাকিয়ে থাকি। বিরাটদেহ এক সাধু নামেন। প্রকাণ্ড জটা পিঠের উপর ঝোলে। যেন চামর দোলে। দিগম্বর। কোথাও কোন আবরণের বালাই নেই। পায়ে জুতা নয়, দেহে আচ্ছন্ন নয়, মাথায় টুপি নয়, হাতে লাঠিও নয়। অথচ ঐ বরফের উপর শীতবোধের কোন চিহ্নই নেই। শূন্য হাতে নেমে আসেন স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিবেগে। যেন, বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে সহজভাবে নেমে আসা। এগিয়ে আসেন আমাদেরই দিকে।

রোদে ঝলসানো কৃষ্ণাভ রঙ। মুখভরা দাঁড়ি-গোঁফ। স্বচ্ছ উজ্জ্বল দৃষ্টি। কি যেন এক আলোর জ্যোতি ঠিকরে আসে—শুধু চোখ থেকেই নয়, সারা দেহ থেকে। জ্যোতির্ময়, অথচ এক শান্ত প্রসন্নতা। নির্লিপ্ত সজাগতা।

অবাক হয়ে ভাবি, হঠাৎ ধ্যান ভেঙে মহাদেবই কি হিমালয় থেকে নেমে আসেন, বাঘছাল ও ত্রিশূল ফেলে!

হেঁট হয়ে সবাই প্রণাম করি।

মানুষের কাছে দেবতা হয়ত মানুষই সাজেন। আশ্চর্য! ইশারা করে দেখান, ধূমপানের উপাদান কোন কিছু আছে কিনা। স্থানীয় এক সঙ্গী বিড়ি বার করেন। তিনি হাতে নিয়ে মুখে ধরান। একটানে নিঃশেষ হয়। টুকরাটা ফেলে দেন। মুখে মৃদু হাসি ফোটে!

জিজ্ঞাসা করি, কোথা থেকে এলেন? কোথা যাবেন?

মৌনী। হাত-ইশারায় দেখান—কেদার-শিখরের অপর দিকে, তারপর দু হাত বিস্তার করে দেখান—কেদারনাথ মন্দিরের দিকে।

কেদার-শিখরের অপর দিকে গঙ্গোত্রী-গোমুখ। তাই, স্বভাবতই বোঝা যায়—সেই দিক থেকে এলেন, কেদার-দর্শনে। ১৯৪৭ সালে সুইস অভিযাত্রীর দল ঐদিক দিয়ে কেদার-শিখরে ওঠেন।

কিন্তু, এই বরফের পাহাড় ডিঙিয়ে কি করে এলেন এই সাধু?—খালি পায়ে, খালি গায়ে, শুধু হাতে? কোন কিছুই সাজপোশাক, সরঞ্জাম না নিয়ে—এই ভাবে! এ কি সম্ভব! অথচ চোখের উপরই তো দেখি, বরফের উপর থেকে নামতে।

তারপর, শিশুর খেলা যেন শুরু হয়।

বাইনোকুলার দেখে হাত বাড়িয়ে চেয়ে নেন। নিজেই বেঁকিয়ে চোখে লাগান। লেন্স ঘুরিয়ে ফোকাস করেন। অতি সহজভাবেই, এ যেন নিজেরই ব্যবহার করা যন্ত্র। ছোট ছেলের মত খুশিভরা মুখ।

এক সঙ্গী ফটো নেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হন। সাধুকে জানান। তিনি ক্যামেরার দিকে তাকান। তখনই বোঝেন, ম্যুভি ক্যামেরা। আবার ইশারা করেন, অপেক্ষা করতে। ফিরে বরফের পাহাড়ে আবার উঠে চলেন। আশ্চর্য হই, ব্যাপার কী! খানিক উঠে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ান। বরফের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েন। অল্প মাথা তুলে, হাত ঘুরিয়ে দেখান—ছবি তোলা শুরু করতে। শুয়ে গড়াতে গড়াতে নেমে আসেন glissading করে!—স্বর্গধামের এই আশ্চর্য খেলা, ধরা থাকে মানুষের হাতে গড়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে।

নেমে এসে উঠে দাঁড়ান। তাকিয়ে হাসেন। মুখের হাসি তো নয়, মনে হয় হিমালয় থেকে গঙ্গার আনন্দধারা নামে, দেহমন স্নিগ্ধ ও শুদ্ধ করে। কীসের এক আনন্দে মনে শিহরণ জাগায়।

কথা নয়। ইশারা নয়। হেলেদুলে জটাভার দুলিয়ে পিছনে ফিরে সাধু চলে যান—কেদার মন্দিরের দিকে।

নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকি।

॥ ১৫ ॥

প্রতি তীর্থক্ষেত্রেই নদী বা সরোবর। কেদারনাথে মন্দাকিনী। নদীর প্রধান উৎস চোরাবালিতালে। গান্ধীজীর চিতাভস্ম ও অস্থি বিভিন্নস্থানে বিসর্জন করা হয়। এই চোরাবালিতালেও। অতএব, এর আধুনিক নামকরণও হয়—গান্ধীসরোবর।

মন্দিরের পিছনে অল্প এগিয়ে নদী পার হতে হয়। পাথরের উপর লম্বা কাঠ ফেলে পারাপারের ব্যবস্থা। তারপর, অপর পারে পাহাড়ি পথে ধীরে ধীরে বরফের পাহাড়ের দিকে উঠে চলা। কোথাও ঘাসে ছাওয়া পথ, কখনও বা পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে হাঁটা। বরফের পাহাড়ের কোলে হ্রদ। আশেপাশে বরফ। হ্রদের তীরে বড় বড় পাথর। শান্ত সুন্দর পরিবেশ। কেদার থেকে সকালে রওনা হয়ে হ্রদের ধারে বনভোজন করে স্বচ্ছন্দে বিকেলে ফেরা যায়। চড়াইও তেমন বেশি কিছু নয়। হ্রদের একদিক থেকে নদীর জন্ম। সশব্দে নীচে নেমে চলে। যেন সদ্যোজাত গো-বৎস। জন্মের পরই লাফাতে থাকে।

নদীর বাঁদিক দিয়েও আর এক পথ আছে। হ্রদের কাছাকাছি পৌঁছে জলের ধারা পার হতে হয়। জলের গভীরতা বা তোড় বেশি থাকলে সে পথে আসা অসুবিধা।

বাসুকিতালের পথ চোরাবালিতালের তুলনায় অনেক দুর্গম। পথের সৌন্দর্য আরও অপরূপ। বাঁ হাতে পাহাড়ে ওঠবার পায়ে-হাঁটা সরু পথের রেখা। সেই পথ ধরে একটানা চড়াই। নদীর ওপারে নীচে মন্দির, ঘরবাড়ি, লোকজন ক্রমশ ছোট হতে থাকে। আরও উপরে গিয়ে দেখায় যেন পটে আঁকা তিব্বতী ছবি। দূরে কেদারের তুষারশিখরশ্রেণী যেন কাছে চলে আসে, সুস্পষ্ট দেখায়। নিকটেই পাহাড়ের গায়ে ছোট-বড় জলপ্রপাত। নেমে চলা ঝরনার বিপুল ফেনিল উচ্ছ্বাস। পাহাড়ের কালো রঙের উপর উজ্জ্বল সাদা-বরণ রেখা। মহাদেবের বিশাল পাষাণ বুকে যেন শুভ্র উপবীত। বহু নীচে কেদার-শহরের নকশা-আঁকা তাঁরই ব্যাঘ্রাসন।

ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখি। ধীরে ধীরে উঠতে থাকি। মাথা তুলে দেখে হর্ষে পুলকিত হই,—এই কী, চড়াই তো এরই মধ্যে শেষ হয়ে এল! ঐ তো পাহাড়ের মাথা।

কিন্তু, মাথা ঘুরে যায় সেখানে পৌঁছে। খানিকটা সমতলক্ষেত্র। তারপর আবার পাহাড়, আরও চড়াই! মাথা তুলে পাহাড় দাঁড়িয়ে আকাশ ছুঁয়ে। বুঝতে পারি, যাত্রা সবে শুরু, কোথায় এখন শেষ!

মনে আছে, এখন বাসুকিতাল যাত্রার নিষ্ফল চেষ্টা।

প্রতি বছরই কেদারনাথে আসি। ভাবি, এবার বাসুকিতাল দেখতেই হবে। কিন্তু প্রতিবারই প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। যাওয়া কোনমতেই হয় না।

সে-বছর গঙ্গোত্রী-গোমুখ ঘুরে কেদার পৌঁছুই জুন মাসে। এসেই জানাই, এবার যাবই। গাইড-এর ব্যবস্থা করুন।

সকলেই নিষেধ করেন। মাথা তুলে পাহাড়ের উপর দিকে তাকান। গম্ভীর মুখে বলেন, যাবেন কোথায়? দেখছেন না, সব এখন বরফে ঢাকা? যাবার পথ পাবেন কোথায়?

জানি, যাত্রাপথ ছেড়ে অন্য কোন দিকে যাওয়ার প্রস্তাব শুনলেই, স্থানীয় অনেক পাহাড়িরা আছেন—বিশেষ করে পাণ্ডাজীরা—কোনমতে যাত্রার ভরসা দেন না। হয়ত, পথের দুর্গমতা ও যাত্রীর অকারণ পরিশ্রমের দুর্ভোগ কল্পনা করে সদুপদেশ দেন, যাবেন না।

তাই হেসে তাঁদের জানাই, যেতে যদি না পারি, না গিয়ে ফিরে আসব। চেষ্টা করে না পারলে মনে দুঃখ থাকবে না। পরে আবার চেষ্টা করা যাবে,—যাবার যেটা ভালো সময় বলবেন তখন।

আমার হাসি দেখে অলক্ষ্যে বোধ করি নাগবাসুকিও হাসেন।

উৎসাহের প্রেরণায় প্রথম চড়াই অনায়াসে শেষ করি। সেখানে দেখি, চারিদিক বরফে ঢাকা। ধোপ-ভাঙা সাদা চাদরে পাহাড় যেন গা ঢেকে ঘুমান। আশপাশের ঝরনাও সব বরফের অন্দরমহলে। দেখা যায় না, অলক্ষ্যে গুঞ্জন শুনি। বরফে চলতে পা পিছলায়, কোথাও বা হাঁটু পর্যন্ত ডোবে। একজন সঙ্গী

পিছলিয়ে গড়িয়ে চলেন নীচের দিকে। আতঙ্কে সবাই তাকাই। হাতের ছাতায় কোনমতে গতিবেগ রোধ করতে ছাতা ভাঙে, তবে নিজে বাঁচেন। কাঁপতে কাঁপতে উঠে আসেন।

গাইড বলে, আর এগুনো সম্ভব নয়, চারদিকেই সাদা বরফ। উঠতে হবে ঐ পাহাড়ের মাথার ওপর—তারপর অপর দিকে নামা—সেইখানে তাল। কিন্তু এখন বরফে সবই ঢাকা,—কোন্ দিক দিয়ে ওঠা যাবে, কিছুই বুঝছি না। ফিরে চলুন—নইলে বিপদ ঘটতে পারে—

'পারে'—নয়। বিপদ ঘটেই গিয়েছিল। যেখানে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনছি—হঠাৎ বুঝতে পারি,—পায়ের নীচের বরফ সরছে, পা যেন ডুবে চলেছে। ভাববার বা কিছু করবার আগেই—মুহূর্তের মধ্যে দেখি, কোথায় পায়ের তলায় বরফ বা মাটি? শূন্যে ঝুলছি, নীচে দুই পা দুলছে ঘড়ির পেন্ডুল্যামের মত। নীচে crevasse—অতল গহ্বর, কালো মুখ হাঁ করে গিলতে চায়!

আকস্মিক ঘটনায় প্রাণ যায়, আবার আকস্মিক ভাবে জীবন বাঁচেও।

নীচের বরফ সরবার সঙ্গে সঙ্গেই অজানিত ভাবেই দুই হাত ছড়িয়ে বিছিয়ে বোধ করি আশ্রয় খুঁজি, তাই সেই হাতেরই উপর দেহভার ঝুলে থাকে। নিমেষ মাত্র। হাতের ভরে তখনই লাফিয়ে গহ্বরমুখ থেকে বেরিয়ে আসি। সঙ্গীরা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপেন। কেদারনাথের উদ্দেশে দু হাত তুলে প্রণাম জানান। বলেন, আর নয়, চলুন এখনই ফিরে।

অতএব, ফিরেই আসি।

কিন্তু, আবার ফিরেও আসি ঐ বাসুকিতালের পথে পরের বছরই।

॥ ১৬ ॥

সেপ্টেম্বর মাস। বাসুকি যাবার প্রশস্ত সময় ঐ আগস্ট-সেপ্টেম্বরই। পাহাড়ের মাথার কাছে সামান্য হয়ত বরফ থাকে। না হলে সর্বত্রই পথে বরফ গলে যায়। অক্টোবর থেকে আবার নতুন বরফ পড়া আরম্ভ হয়।

যাত্রার পূর্বে ফলাহারীবাবার দর্শনে যাই। প্রণাম করি, আশীর্বাদ নিই।

বৃদ্ধ সাধু। কেদারনাথ তীর্থক্ষেত্রের এক অঙ্গ। বারো মাস ঐখানেই কাটান। মন্দিরের পাশে চালাঘরে। শীতকালেও। বোধ করি, বছর কুড়ি ওখানে আসন নিয়েছেন। একবার গিয়ে শুনি, প্রায় তুষার-সমাধি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেবছর শীতকালে অস্বাভাবিক রকম বেশি বরফ পড়ে। দু মাস পরেও কেদারে পৌঁছে তার প্রমাণ দেখি। তখনও চারিধারে সাদা বরফে ঢাকা। ফলাহারীবাবা বলেন, এত বরফ এখানে কখনও দেখা যায় নি। ছোট কুটিয়া বরফে চাপা তো পড়বেই। দরজা খোলবারও উপায় নেই। আলো বাতাস—সব বন্ধ। বোঝা গেল,—দেবতার ইচ্ছা, ঐভাবেই সমাধিস্থ হওয়া। তাই হোক। বাইরেও জমাট বরফ, ভেতরেও সারাক্ষণই ধ্যান। জানা নেই,—কদিন পরে বাইরে শব্দ শোনা যায়। লোকজন ভাবিত হয়ে নীচে গৌরীকুণ্ড থেকে চলে আসে। বরফ ভেঙে, সরিয়ে, কুটিয়ার দরজা খোলে। আবার আলোবাতাসে এ শরীর বেরিয়ে আসে;—এও তাঁরই লীলা! আটকও করেন তিনি, মুক্তিও দেন তিনি।—বলে হাসতে থাকেন, সরল শিশুর মতন। সামনে ধুনির জ্বলন্ত কাঠের মুখে খোঁচা দিয়ে ছাই সরান। গায়ে একটা কালো কম্বল জড়ানো! মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি, গোঁফ। রোদে পোড়া, হিমে ফাটা মুখের ও হাতের কালচে রঙ। সজাগ স্নিগ্ধ চোখের চাহনি। দর্শনে গেলেই সাদরে কাছে বসান, ভস্ম অথবা শুকনো ফল প্রসাদ দেন। বারো মাসই ঐ একই আহার। তাই নামও ফলাহারীবাবা। নিজের জন্য ভাবনা নেই, কিন্তু ভক্তদের ভাবনা তাঁর জন্য। তাই পরের বছরই ভক্তরা কুটিয়া দোতলা করে দেন, বেশি বরফ পড়লেও যাতে উপরের ঘরে থাকতে পারেন। তিনি দেখেন। হাসেন।

সে-বছর বাসুকিতাল যাওয়ার আগে তাঁরই কাছে যাই। খুশি হয়ে বলেন, এই তো ঠিক সময়। ঘুরে এস নিশ্চিন্ত মনে। আনন্দ পাবে। গেল বছর গিয়েছিলে,—ও-সময়ে কি কেউ যায়!

সঙ্গে কে যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করায় বলি এক গাইড ও স্থানীয় এক সাধু।

চেনেন দুজনকেই। বলেন, গাইড হুঁশিয়ার লোক আছে, সাধুটিও সৎসঙ্গ। সবকিছুর মধ্যে তো তাঁরই করুণা।

মাথা বেঁকিয়ে বাসুকিতালের পাহাড়ের উপর পানে তাকান। চুপ করে থাকেন। মন যেন উড়ে যায়

চোখের খাঁচার দুয়ার খুলে সেইখানে। মুখে অল্প হাসির আভাস ফোটে। আনন্দ দীপ্তি। পুবগগনে ভোরের আলোর অস্ফুট প্রকাশ।

ভাবি, ভাবেন কি?

প্রশ্ন করতে হয় না। নিজেই অতি ধীরে ধীরে বলেন, যেন আপন মনেই,—কি নিঃসীম নিস্তব্ধতা ঐখানে। এই তো সেদিনের কথা, এখনও শরীরে তার শিহরণ জাগে। জ্যোতি-দর্শনের নিবিড় অনুভূতি। সে বছর বাসুকিতালের ধারে একাই দিন কাটে। একা তো নয়,—এ শরীরের যেন কোন সত্তাই নেই। যোগাসনে সারাক্ষণই কাটে। হঠাৎ কিসের চমকে চোখ খোলে। তাকিয়ে দেখি, সন্ধ্যা নামে। চারিদিকে পাহাড়ে কালো ছায়া। হ্রদের জলে দিনের শেষ আলো। কোনদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। এমন কি হাওয়া-বাতাসেরও সামান্য কাঁপনও নেই। নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ। হঠাৎ জলে শিহরণ ওঠে হ্রদের ঠিক মাঝখানে। জলে পাথর ফেললে যেমন ঢেউ ওঠে, গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে,—তেমনি যেন ঢেউ দেখায়। অবাক হয়ে দেখি। জলের আলোড়ন বাড়তে থাকে। ক্ষণিকের মধ্যেই বিরাটকায় নাগবাসুকি ভেসে ওঠেন। আকাশে মাথা তুলে ফণা বিস্তার করেন। ফলার উপর উজ্জ্বল মণি। জ্বলতে থাকে স্থির বিদ্যুতের মত। সারা পৃথিবীতে যেন জ্যোতি ঠিকরে পড়ে। অসীম সমুদ্রের মাঝখানে যেন আলোকস্তম্ভ।—সে কি বিরাট রূপ!—

ক্ষণিক চুপ করে থেকে অতি মৃদুস্বরে বলেন, সেই একদিন এক মুহূর্তের দর্শন,—তবুও এখনও মন আলো করে আছে।—

চুপ করে শুনি। কেন জানি না, কোন তর্ক বা প্রশ্ন জাগে না মনে।

শুধু মনে হয়, সীমাহীন সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসে বসে যেন শুনি অজানা সুরের কোন এক সঙ্গীত-ধ্বনি।

সে-বছর বাসুকিতাল-যাত্রা অতি সহজ ও সুন্দর হয়। দুর্গম চড়াই অনায়াসে উঠে চলি। পাহাড়ের মাথায় সামান্যই বরফ। গতবারের তুষারক্ষেত্রের সেই বিভীষিকা দুঃস্বপ্নের মত হারিয়ে যায়। পাহাড়ের গা বেয়ে বহু জলধারা নামে। ফেনিলতরঙ্গ ভঙ্গে। নটরাজের জটার যেন বাঁধন খুলে পড়ে। পাথরের আশেপাশে ছোট ছোট গাছ—অজস্র ব্রহ্মকমল ফুল। যেমন রূপের ছটা, তেমনি উগ্রগন্ধের আকুলতা। যেন দেবতার পূজার অর্ঘ্য হওয়ার নীরব ব্যাকুলতা।

শ্রাবণ-ভাদ্রে কেদারনাথের সাজপূজা এই ব্রহ্মকমলেই হয়।

চড়াই-এর পর আবার চড়াই। তাও শেষ হয়। পাহাড়ের মাথায় শিলাস্তূপ। কোথাও বা তুষার। অপর দিকে খানিক উৎরাই। সেইখানেই হ্রদ। সওয়া মাইল চওড়া, মাইল দেড়েক লম্বা। পাহাড়ে-ঘেরা স্বচ্ছ নীল জল। জলে পাহাড়ের ছায়া দোলে। কোথাও গাছপালার চিহ্ন নেই। দূরে হ্রদের অপর দিকে হ্রদ ছেড়ে জল নেমে চলে। বাসুকি-গঙ্গার ঐ উৎপত্তি। নীচে নাম হয় সোন বা সোম নদী। সোন প্রয়াগে মন্দাকিনীতে মেশে।

হ্রদের চারিপাশে মহান মৌনতা। অপার শান্তি। মন-প্রাণ স্নিগ্ধ করে।

হিমালয়ের শৈলশিরে, গিরিনদীর তীরে তীরে অগণিত মনোহর মন্দির। কিন্তু কেদারতীর্থের ন্যায় প্রাকৃতিক শোভা আর কোথাও আছে কিনা জানি না। এই দুর্গম নিভৃত পর্বতাঞ্চলে এমন মনোমুগ্ধকর আবেষ্টনে কার কবিচিত্তে প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জাগে ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই। তবে জনপ্রবাদ আছে। মহাভারতীয় যুগের সেই প্রচলিত উপাখ্যান।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবগণ বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব গুরুজনের হত্যার পাপে মর্মান্তিক মানসিক পীড়া। পাপমুক্তির আশায় তীর্থে তীর্থে ঘোরেন। হিমালয়েও আসেন। দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় খুঁজতে থাকেন। এই কেদারভূমিতে তাঁর সন্ধানও মেলে। মহাদেবও পাণ্ডবদের এড়াবার জন্যে মহিষরূপে এইখানে মেদিনীমধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করেন। বিপুল বিক্রমে ভীমসেন নাকি তাঁকে পিছন থেকে জাপটিয়ে ধরেন। পাণ্ডবগণ শিবের আরাধনা করেন, তাঁরই কৃপায় পাপমুক্তও হন।

সেই উপাখ্যানেরই সাক্ষ্য দেন কেদারনাথ। প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠাও করেন পাণ্ডবগণ। তাই মন্দিরের গায়ে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিকৃতি।

তারপর, হয়ত সেই মহাভারতীয় যুগ থেকেই শুরু হয় হিমালয়ের এই সুদুর্গম সুদূর তীর্থযাত্রা। মন্দিরের ভিতরেও সেই কাহিনী পাষাণে রূপায়িত।

সেখানে আরাধ্য দেবতার প্রতীকও সেই মহিষেরই পশ্চাৎ অংশ। কালো এক শিলাখণ্ড। কেদারলিঙ্গ। রূপহীন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আকারবিহীন। পঞ্চকেদারের প্রধান কেদার।

কেদারনাথে এই শিলাখণ্ডেরই পূজা হয়। পূজারী অরূপের রূপসজ্জা করেন। বসনভূষণ পুষ্পমালায় সাজান। ধূপদীপ জ্বলে। কাঁসর ঘণ্টা শিঙা বাজে। ব্যোম ব্যোম ধ্বনি ওঠে। সুগম্ভীর মধুর সুরে পূজামন্ত্র পাঠ চলে। ভক্ত যাত্রীর দল নিবিষ্ট মনে ধ্যান করেন। পূজাশেষে দুই বাহু মেলে কেদারনাথকে নিবিড় আলিঙ্গন করেন। মনে অপূর্ব শিহরণ জাগে। কেন জাগে, কী জাগে,—সেই এক পরম রহস্য।

মানুষের গড়া সেই পাথরের মন্দিরের বাহিরেও প্রকৃতির বিরাট অপরূপ মন্দির। সেখানে দিগন্তব্যাপী সুনীল আকাশ—মন্দিরের চূড়া। চারিপাশে গগনচুম্বী গিরিশ্রেণী—মন্দিরপ্রাকার। তুষারমৌলি কেদার শৈলশৃঙ্গ—জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ। মন্দাকিনীর ধারা যেন পারিজাতের মালা। দেবতার চরণতলে কেদারমন্দির—যেন প্রস্ফুটিত ব্রহ্মকমলের অঞ্জলি। মেঘের পুঞ্জ ধূপধুনার ধূমায়িত কুণ্ডলী। অসীম গগনে চন্দ্রসূর্য গ্রহতারার লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।

প্রকৃতির এই মহান্ অনন্ত রূপেরও আর এক পরম রহস্যময় আকর্ষণ। দেশ-কাল-অতীত সেই গোপন রহস্যের মহিমা। মানুষের ক্ষুদ্র অন্তর কোন্ এক অজানা গভীর অনুভূতির স্পর্শ পায়।

যুগের পর যুগ কাটে। মানব-সমাজের আচার-ব্যবহারে বিপুল পরিবর্তন আসে। যাত্রা-পথ সহজ সুগম হয়। সভ্যতার যানবাহন চলে। নতুন যুগের মানুষের মনে নবীন ভাবধারার প্রেরণা নামে। যাত্রাপথের বিচিত্র নতুন সাজসজ্জা। নূতন বেশে নবীন যাত্রী।

কিন্তু, পথের ও পথিকেরই শুধু রূপভেদ। পথশেষের সেই চিরন্তন তীর্থপুরীর জ্যোতির্ময় রূপ নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত উজ্জ্বল থাকে। একাল ও সেকাল সেখানে প্রভেদ আনে না। অন্তহীন যাত্রার প্রবাহ চলে। সত্য শিবসুন্দরের অমৃতময় প্রশান্ত রূপের সন্ধানে যাত্রী চলে দলে দলে, ফিরে আসে বারে বারে—এই অমর অমরাপুরীতে।

Pilgrim's progress-এর সেই মুক্তিকামী জীবন-পথযাত্রীর অমোঘ মন্ত্র :

I'll fear not what men say,
I'll labour night and day
TO BE A PILGRIM

মণিমহেশ

॥ ১ ॥

ছেলেবেলায় শেখা,—পঞ্চনদের দেশ, নাম তাই পঞ্জাব। ঝিলাম, চিনাব, রাভি, বিয়াস ও সাটলেজ। ভারতীয় নাম,—বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আপন পথ বেয়ে নেমে আসে নদীগুলি।

শতদ্রুর দীর্ঘতম পথযাত্রা। জন্ম তার সুদূর মানস-সরোবর—রাক্ষসতাল অঞ্চলে—,হিমালয়ের পরপারে তিব্বতে। বিপাশা, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা যেন একই বাড়ির তিনটি মেয়ে। জন্ম তাদের হিমালয়ের যে-অংশে, এখন তার নাম হয়েছে হিমাচল প্রদেশ। বিতস্তা বা ঝিলামের জন্মভূমি কাশ্মীর।

নদীগুলির মধ্যে সবচেয়ে পূর্বদিকে শতদ্রু। পাঞ্জাবে নেমে এসে বিপাশা বা বিয়াস মিলিত হয় শতদ্রুর সঙ্গে। জলভারে স্ফীত হয়ে সাটলেজ এগিয়ে চলে পশ্চিম পাকিস্তানে।

অপরদিকে, সবচেয়ে পশ্চিমে নামে কাশ্মীর-সুন্দরী ঝিলাম। চন্দ্রভাগাও হিমাচলপ্রদেশের লাহুল-স্পিতি অঞ্চল থেকে ঘুরে এসে প্রবেশ করে জম্মু-কাশ্মীরে। পরে পাকিস্তানে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মিলন ঘটে। চন্দ্রভাগা আরও এগিয়ে চলেন। সঙ্গ পান ইরাবতীর। অপর দিক থেকে শতদ্রুও নেমে আসেন। পাকিস্তানের আরও দক্ষিণে পৌঁছে শতদ্রু ও চন্দ্রভাগার দুই ধারার সংযোগ হয়। পঞ্চনদীর জলভারে এইভাবে সম্মিলিত হয়ে নাম পায়—পঞ্চনদ। মাইল পঞ্চাশও যেতে হয় না। কৈলাস-মানস-সরোবরের সমীপবর্তী অঞ্চল থেকে উঠে হিমালয় পরিক্রমা শেষ করে বিরাট নদ সিন্ধু এসে হাজির হন। পঞ্চনদ ইনডাস-এর জলে হারিয়ে যায়। ইনডাসও যাত্রা সাঙ্গ করে আরব সাগরে। পশ্চিমে সিন্ধু, পূর্বে শতদ্রু,—যেন দীর্ঘ দুই বাহু মেলে অন্তর্বর্তী সব নদ-নদীর জলভার বুকে ধরে এক বিশাল নদ আত্মোৎসর্গ করে রত্নাকরের সুনীল বারিধিতে।

হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর স্তব্ধ মৌন প্রশান্ত রূপ। তারই বিরাট আবেষ্টনীর মধ্যে এই নদীগুলির হাস্যমুখর উচ্ছল চঞ্চল বাল্যজীবনের কাহিনী অতীব মনোহর।

ইরাবতীর ধারাপথ ধরে হিমালয়ে কয়েকদিন কাটানোর সুযোগ আসে। গন্তব্য প্রদেশে —মণিমহেশ। হিমগিরির তুষার-অঞ্চলে মনোমুগ্ধকর হ্রদ। তারই তীরে মণিমহেশ গিরিশিখর। কৈলাস শিখরেরই মতন স্বয়ম্ভু জ্যোতির্ময় লিঙ্গরূপী। স্থানীয় লোকেরা তার নাম দেয়, চম্বা-কৈলাস।

সেই তীর্থ-পথের এই কাহিনী।

॥ ২ ॥

পাঠানকোট স্টেশন। কলকাতা থেকে দীর্ঘ রেলপথ। হিমালয়ের পশ্চিম রাজ্যে প্রবেশ করার যেন সিংহদ্বার। বাস, মোটর চলাচলের সুপ্রশস্ত রাজপথ। যাত্রী-ভরা যানবাহন দিকে দিকে ছুটে চলে। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে। পঞ্চনদের বাল্যলীলা-নিকেতনে।

উত্তর-পশ্চিমে জম্মু হয়ে কাশ্মীরে। ঝিলাম চিনাবের দেশে।

পুবের দিকে খানিক গিয়ে এক শাখা-পথ ঘুরে যায় উত্তরে হিমালয়ের পানে। সেদিকে শৌখিন, অথচ শান্ত হিল্ স্টেশন—ডালহাউসি। তারই নীচে রাভি বা ইরাবতীর উপত্যকা। চম্বাভ্যালি।

আরও পুবে—ডালহাউসির পথ ছাড়িয়ে—বাস রাস্তা এগিয়ে যায়। আবার এক শাখাপথ হিমালয়ে প্রবেশ করে। সেদিকে সুন্দর পাহাড় হর ধরমশালা।

ধরমশালার পথ না ধরে আরও পূর্বাঞ্চলে এগিয়ে গেলে কাংড়ার উপত্যকা। তারপর কুলুভ্যালি। সেখানে বিয়াস বা বিপাশার যেন হিমালয়-রাজভবনে নাচের আসর। নীলশাড়ি পরে রূপবতী কন্যা নেমে আসেন তরঙ্গ-নূপুরে মধুর ঝঙ্কার তুলে।

বাস পথ ছড়িয়ে পড়ে। নূতন নূতন পথ জাগে। কুলুভ্যালির মণ্ডী ও আউট থেকে এগিয়ে চলে

আরও পূর্বদিকে। পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে। সিমলার হিল্ স্টেশনে এসে হাঁপ ছাড়ে। সেই পথে পড়ে শতদ্রু বা সাটলেজ নদ। ঘোলাটে জল। কেমন যেন রুক্ষ রূপ। দেখে মনে হয়, শাবল কাঁধে জোয়ান চলে, কাদামাখা গায়ে, আনমনে, আপন কাজে।

দুর্গম হিমালয়ের নিভৃত গোপনপুরে পাহাড়ী নদ-নদীর কত বিচিত্র বিভিন্ন রূপ!

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২।

ট্রেন ছেড়ে পাঠানকোটে নামি। একাই আসার কথা। কিন্তু যাত্রার মুখে হঠাৎ এসে যোগ দেন এক তরুণ সঙ্গী। নাম তার হিমাদ্রি। হিমালয়ের সঙ্গে সবে তার পরিচয় শুরু হয়েছে। বদরীনাথ ও হেমকুণ্ড ঘুরে আনন্দে মন মেতেছে। হিমালয়ের পথ চলার নেশা রক্তে লেগেছে।

এসে বলে, আমিও যাব। পুজোর ছুটির সঙ্গে আরও কদিন অফিস থেকে ছুটি নিচ্ছি। মাসখানেক ঘোরা যাবে। শুনে জানাই, কিন্তু আমার ত সময়ের টানাটানি নেই, কতদিন ওদিকে কাটাব, কি জানি। চম্বাভ্যালি দেখা নেই, সেইদিকে প্রথম যাওয়া। মণিমহেশ এতদিনে টানলেন মনে হয়। তারপর—কুলুর দিকে। পুরানো হলেও আবার যাওয়া। সেদিকের বন্ধুরা ডাকছেন। সেখান থেকে পাহাড়-পথে সিমলা। সিমলা থেকে পাহাড়ের হাঁটা-পথে মুসৌরি। তারপর ওদিকে পৌঁছুলে আবার গাড়োয়ালে যেতেই হয়। কেদারনাথজীর পুনর্দর্শন না করে যাত্রা সাঙ্গ করা ত চলে না। তাই পাঠানকোটে ট্রেন ছেড়ে ফেরবার ট্রেন ধরবার কথা দেরাদুন বা হরিদ্বারে।

হিমাদ্রি দমে না। বলে, এর মধ্যে যতখানি পারি সঙ্গে ঘুরব। অফিস থেকে ছুটি এর বেশি দেবে না।

হিমাদ্রির বয়স বছর পঁচিশ। উৎসাহী, করিতকর্মা। কিন্তু জানি, চার-পাঁচ বছর চাকরি-জীবনে ঢুকেও এখনও শিশুসুলভ সব স্বভাব ছাড়তে পারে নি। মাঝে মাঝে হঠাৎ রেগে যায়। তখন গুম হয়ে বসে থাকে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলে, ক্ষিদে নেই, খাবো না।—অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ঠাট্টা করে। নাম দেয়, খোকাবাবু। সে আরও রাগে।

বন্ধুরা সরে আসে, বলে, এখন আর ঘাঁটাসনে ওকে। একটু পরেই আবার ঠিক হয়ে যাবে।

হয়ও তাই। যেন হঠাৎ-ওঠা ঝড় হঠাৎ থামে।

তাকে বলি, সঙ্গে যাবে, চলো। কিন্তু, দুটি শর্ত। পথে যখন যা বলব মেনে নিতে হবে। অন্যায় কিছু বলব না, সে-বিশ্বাস রেখো। দ্বিতীয় কথা,—রাগ করতে পারবে না, কারও ওপর, যে কদিন আমার সঙ্গে থাকবে।

সে চোখ কুঁচকে বলে, বাঃ! তা কি করে হয়? রাগের কারণ হলে রাগ হবে না?

হেসে জানাই, সেই কথাই ত বলছি। রাগের কারণ না থাকলে রাগ ত হবেই না। কিন্তু কারণ ঘটলেও—অর্থাৎ তোমার মতে—তখনও রাগ করা চলবে না। সে সময়ে মনে করবে, এই ক'দিনের জন্যে যে প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছ, তারই পরীক্ষা চলছে, তাই হাসিমুখে মেজাজ ঠিক রাখতেই হবে।

এবার সে চিন্তিত হয়, তাই ত! এটা যে ভীষণ পরীক্ষা! কথা এখন দিতে পারি। রাখার চেষ্টাও করতে পারি। কিন্তু মনের ওপর অতখানি জোর! সে কি থাকবে? ফট্ করে যদি রেগে যাই?

আশ্বস্ত করি, চেষ্টা ত তুমি কোরো, তখন দেখবে, যে-কোন কারণেই হোক না কেন, কারও ওপর রাগ না করে হিমালয়ের পথে যদি ঘুরে আসতে পার,—মনের সে কী গভীর আনন্দ। গঙ্গায় অবগাহন স্নানে যেমন তৃপ্তি। এই কয়টা দিনের কথা ত। বরং এক কাজ কোরো, নেহাত যদি কখনও রাগ এসেই যায়, আমার ওপরই কোরো, সে-রাগের ভার আমি নিতে পারব।

সে হেসে ফেলে। বলে, বেশ বললেন বটে আপনি! আপনার ওপর রাগ,—সে কি করে হতে পারে?—আচ্ছা, ঠিক রইল এই কথা।

অতএব, সে-ও সঙ্গে আসে।

॥ ৩ ॥

দেশ-বিদেশে—বিশেষ করে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর মহান লাভ,—কত জায়গায় কত মানুষের সঙ্গে নিত্য নূতন যোগাযোগ। অচেনা, তবুও যেন পরম আত্মীয়। কত দিনের যেন দীর্ঘ পরিচয়। পথের আশেপাশে যেন আপন ঘর পাতা। বন-বিভাগের অফিসার, কর্মচারী—শহরের সদর দপ্তরে নয়,

বনের নির্জন এলাকায়—সকলেই যেন আপন জন।

গাড়োয়ালী এক বন্ধু তখন মণ্ডির ফরেস্ট অফিসার। নিজে থেকেই তিনি লিখে দেন চম্বার দপ্তরে। পাঠানকোট স্টেশনে নেমে দেখি, সবুজ ইউনিফর্ম পরা ফরেস্ট গার্ড। যেন, গাছপাতার সবুজ রঙ মেখে অরণ্যদূত স্বাগত জানায়। এগিয়ে এসে বলে, চম্বার বাস এখনই ছাড়ে, সীট ঠিক করে রাখা আছে।

টিকিট কেটে তখনই উঠে পড়ি।

পাঠানকোট থেকে চম্বা বাস পথে ৭৬ মাইল।

ডালহাউসি পর্যন্ত আমার চেনা পথ। সমতল ভূমি ছেড়ে এসে প্রথমে সেই ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী। পিছনে মাথা তুলে গিরিরাজ হিমালয়—ধওলাধর। এঁকে বেঁকে বাস ওঠে। পুরানো পথ অতীত স্মৃতি মনে টেনে আনে।

ডালহাউসির পাঁচ মাইল আগে রাণীক্ষেত। ডালহাউসির পথ ছেড়ে চম্বার বাস বাঁদিকে নতুন পথ ধরে এগিয়ে চলে। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকে নীচের দিকে ইরাবতীর উপত্যকায়।

বনের মধ্যে দিয়ে পথ। মাঝে মাঝে দু-একটা গ্রাম। বাস ছুটে চলে। হিমালয়ের গাছপালার—পাইনের স্নিগ্ধ সুবাস। প্রাণ জুড়ানো শীতল বায়ু। দেহ মন সজীব হয়ে ওঠে। চরণ চঞ্চল হয়। সভ্যতার যান ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলার আনন্দলাভের আশায় মন উন্মুখ হয়ে থাকে। গিরিদেবতা যেন জানতে পেরে তখনই সুযোগ দেন।

হঠাৎ বাস থামে। পাহাড়ের প্রকাণ্ড এক অংশ ক'দিন আগে ধ্বসে পড়ে বাস-পথ বন্ধ। মেরামতের কাজ চলে। প্রায় দু'মাইল ব্যবধান। ওদিকে আবার বাস পাওয়া যাবে, শুনি। পায়ে হাঁটার আকাঙ্ক্ষা এবার দুর্ভাবনা জাগায়। মালপত্রও তো নিয়ে যেতে হবে? হিমাদ্রি ছোটাছুটি করে লোক যোগাড় করে। বলে, একে নিয়ে আমি এগিয়ে যাই, ও-দিকেই বাস-এ আবার জায়গা রাখতে হবে। ধীরে-সুস্থে আপনি আসুন। এ-লোকটা কত চায় জানেন? পাঠানকোট থেকে চম্বার যা বাস ভাড়া, তার চেয়ে বেশি! চলুক ত, তখন দেখব ওদিকে গিয়ে।

মনে করিয়ে দিই, রাগারাগি না হয় যেন দেখো। হিমাদ্রি হাসে।

নিশ্চিন্ত মনে আমি চলি।

ওদিকে বাস ধরে আবার পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলা। নীচে দেখা যায়, ইরাবতীর উপত্যকা। অপর পাড়ে উঁচু পাহাড়। রুক্ষ, শুষ্ক। ক্বচিৎ কোথাও কয়েকটা গাছের সারি। সেই পাহাড়ের পায়ের কাছে, ইরাবতীর দক্ষিণ তীরে চম্বা শহর।

নদীর খানিক উপরে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। বহু ঘর বাড়ি। যেন সাজানো গোছানো সুন্দর খেলাঘরের শহর। নীচে একদিক থেকে নদীর সুনীল ধারা পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে পথ করে এগিয়ে আসে; শহরের দুই দিক ঘিরে আপন মনে চলে যায় অপর দিকের পাহাড় ভেদ করে। নীচে নদীর উপর সুন্দর লোহার পুল। এপারেও খান কয়েক বাড়ি ঘর, স্তরে স্তরে পাহাড়ের গায়ে চাষের ক্ষেত। ওপর থেকে দেখা যায়, পুল পার হয়ে বাস-পথ ঘুরে শহরে ওঠে।

এপারের পাহাড়ের উপর থেকে আরও একটা পথ এসে বাস-পথে মেশে। ডালহাউসি থেকে খাজিহার হয়ে সে পথ নামে চম্বার উপত্যকায়। ঐ পথে ডালহাউসি থেকে চম্বার দূরত্ব প্রায় কুড়ি। এখন জীপও চলে সেই পথে।

ইরাবতীর কূলে পাহাড়ে ঘেরা চম্বা শহর উপর থেকে রমণীয় দেখায়। পাহাড়ের কোলে ঘুমন্ত প্রশান্ত শিশু, নদীর নীলধারা যেন তার কণ্ঠমালা।

॥ ৪ ॥

রাভিভিউ P. W. D. বাংলো। সেইখানে উঠি। পুরানো বড় বাড়ি। নদীর অল্প উপরে শান্ত মনোরম পরিবেশ।

মণিমহেশ-পথের খবর জানবার জন্য ফরেস্ট অফিসারের বাড়ি গিয়ে দেখা করি। সাদর অভ্যর্থনা করে আলাপ করেন। শুনে আশ্চর্য হই, চম্বা বন-বিভাগের দপ্তর চম্বাতে নয়। ডালহাউসিতে। তাঁকে বলি, খবরটা জানা ছিল না। ডালহাউসি ঘুরে পারমিট নিয়ে স্বচ্ছন্দে আসতে পারতাম।

তিনি বলেন, তাতে ক্ষতি নেই। কাল টেলিফোনে সেখানে জানিয়ে দেব, আপনারা এখানে এসে গেছেন। পথে রেঞ্জারদের কাছে আপনাদের যাওয়ার খবর পাঠানো হয়েছে, আমি জানি। আপনারা রওনা হবার ব্যবস্থা করুন। দুর্ঘেটির বাংলোটা P. W. D.-র। কাল এখানে তাদের অফিসে গিয়ে পারমিট নিয়ে নেবেন যেন।

চা বিস্কুট খাওয়ান। অনেকক্ষণ বসে হিমালয়-পথের নানান গল্প শুনি।

চম্বা শহর দেখতে বড় হলেও ঘুরতে বেশি সময় লাগে না। শহরের মাঝখানে বিরাট ময়দান। স্থানীয় নাম চৌগান। মাঠ ঘিরে রাস্তা। নদীর দিকেও পাহাড়ের কোলে বড় বড় বাড়ি, সরকারী দপ্তর, দোকানপাটও। আরও একটু উপরে রাজপ্রাসাদ। এক পাশে রেফিউজিদের সারি সারি স্টল। পরিচ্ছন্ন শহর। প্রায় তিন হাজার ফুট উচ্চতা। তাই গরমও নেই, শীতও তেমন নেই।

ইংরেজ রাজত্বকালে চম্বা করদ রাজ্য ছিল। এই চম্বা শহর ছিল তার রাজধানী। চম্বার স্বাধীন রাজাদের প্রাচীন রাজধানী ভারমোর। হিমালয় পর্বত প্রদেশের আরও অন্তরালে অনেকখানি উপরে। মণিমহেশের পথে পড়ে। ইরাবতীর তীরে এই সুরম্য সমতল উপত্যকা এক রাজকুমারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কন্যার উৎসাহে রাজা সহিল বর্মা এইখানে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন—খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে। রাজকুমারীর নাম ছিল চম্পাবতী, এই রাজধানীর নামও হয় চম্পা, ক্রমে লোকমুখে চম্বা।

চম্বাতে প্রাচীন মন্দির আছে কয়েকটি। প্রাসাদের নিকটে পাশাপাশি ছয়টি। লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, চন্দ্রগুপ্ত, শিব, পঞ্চমুখ-শিবলিঙ্গ, গৌরীশঙ্কর ও লক্ষ্মী-দামোদর। মন্দিরগুলিতে অতি সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির সবচেয়ে প্রাচীন—খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর।

এই সব মন্দির, বিগ্রহ ও শহর স্থাপনা নিয়ে নানান মনোহর ও করুণ কাহিনীর প্রচলন আছে। তাই স্মরণ করে এখনও চম্বায় বিভিন্ন মেলা বসে।

প্রবাদ, রাজকুমারী চম্পাবতী রূপবতী বিদুষী মহিলা ছিলেন। শাস্ত্রাদি আলোচনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেই উদ্দেশ্যে এক মহাত্মার কাছে তিনি প্রতিদিন যেতেন। কন্যার এই নিত্য যাতায়াতে পিতার সন্দেহ জাগে। একদিন হঠাৎ গোপনে সেই মহাত্মার কুটিরে রাজা গিয়ে হাজির হন। কিন্তু মহাত্মা বা কন্যার কারও সাক্ষাৎ পান না। দৈববাণী শোনেন, এই অন্যায় সন্দেহের পাপের ফলে তিনি আর কখনও কন্যার দেখা পাবেন না। অনুতপ্ত শোকাতুর রাজা কন্যার দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে চম্বাতে এক মন্দির স্থাপন করেন। এখনও সেখানে নিত্য পূজা হয়। বৈশাখ মাসে এক মেলাও বসে।

চম্বাতে নতুন রাজধানী নির্মাণ সম্পর্কেও আর এক করুণ কাহিনীর প্রচলন আছে। নতুন শহর। কিন্তু জলাভাব। পাহাড়ের উপর থেকে নল কেটে জল আনার ব্যবস্থা হয়। তবু জল আসে না। স্বপ্নাদেশ হয়, মহারাণী বা তাঁর কোন পুত্র সেই নালায় প্রাণোৎসর্গ করলে জল নামবে। মহারাণী স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন। জলের প্রবাহও বইতে থাকে। মহারাণীর নাম ছিল নেন্না দেবী বা সুনয়না দেবী। তাঁরও স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। চৈত্রমাসের শেষভাগে সেখানেও মেলা বসে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও রমণীদের নিয়ে এই মেলা। নাম হয়, সুহি মেলা।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির স্থাপনা নিয়েও আর এক ঘটনার প্রবাদ প্রচলিত। রাজা সহিল বর্মা নিঃসন্তান ছিলেন। তখন রাজার রাজধানী ভারমোরে। একদিন চুরাশীজন মহাত্মা সেখানে উপস্থিত হন। সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা সন্তান লাভের বরদান করেন। রাজার দশ পুত্র ও এক কন্যা হয়। সেই কন্যাই চম্পাবতী। রাজা সন্ন্যাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চুরাশীটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কন্যার অভিলাষ অনুযায়ী চম্বা শহরে নতুন রাজধানী গড়েন। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরও ওঠে। দেবতার বিগ্রহ নির্মাণের জন্যে পাথরের সন্ধানে রাজকুমাররা যান। বিন্ধ্যগিরিতে ডাকাতের হাতে নয় রাজকুমারের প্রা ানাশ হয়। অবশিষ্ট একমাত্র পুত্র সেই পাথর এনে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে রাজা সহিল বর্মা সেই কুমার যুগাকরের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের নিকটে চর্পটনাথ নামে এক যোগীরও মন্দির আছে। চম্বাবাসীরা তাঁর পূজা করে নানান ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। শুনি পোলো খেলায় চম্বার টিম ভারতে সুনাম অর্জন করেছে।

এখন স্বাধীন ভারতে চম্বা হিমাচল প্রদেশের একটি জেলা মাত্র। ৩১২৫ বর্গমাইল বিস্তীর্ণ। জনসংখ্যা

২,১০,০০০। হিমালয়ের মধ্যে দু হাজার ফুট থেকে একুশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে এর বিস্তৃতি। জেলার প্রধান শহরও চম্বা।

চম্বারাজের রাজ্য গিয়েছে। তাই, রাজপ্রাসাদও শ্রীহীন। চাকচিক্য, ধনমর্যাদা কোন কিছুই নেই। রাজবাটীতে এখন স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরি। চম্বার প্রাচীন গরিমা এখন মিউজিয়ামের মধ্যে সযত্নে রক্ষা পায়। চম্বার শেষ রাজা ভুরি সিং এই প্রতিষ্ঠান প্রথম গড়ে তোলেন, তাই তাঁরই নামে এর নামকরণ। কাংড়া, বসৌলী ও পাহাড়ী চিত্রকলার অতি-সুন্দর অনেকগুলি নিদর্শন এখানে দেখা যায়।

মিউজিয়ামের নিকটেই হাসপাতাল।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে শহর দেখা হয়। তারই এক ফাঁকে P. W. D.-র দপ্তরে গিয়ে দুর্ঘেটির বাংলোতে থাকবার পারমিট্‌ও আনি। সেখানে খবর পাওয়া যায়, আজকাল নাকি চম্বা থেকে ভারমোর পর্যন্ত জীপ চলে। ৪৪ মাইল পথ। একদিনেই পৌঁছে দেয়। সেখান থেকে মণিমহেশ মাত্র দুদিন লাগে হেঁটে যেতে। খবর শুনে হিমাদ্রি উৎফুল্ল হয়। বলে, তাহলে এদিকে দুদিন বেঁচে যাবে, ওদিকে আরও কোথাও যাওয়া যাবে।

জীপের লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করে দিতে দপ্তরের এক কর্মচারী আগ্রহ দেখান। দেড়'শ টাকা ভাড়া চায় শুনে আর কোন কথা তুলি না। মনে মনে স্বস্তি বোধ করি। পায়ে হেঁটে চলার আশায় মন আনচান করে।

পরে, ঐ পথে হেঁটে যেতে দেখি, চম্বা শহরে বসে এ-সব অফিসাররা সঠিক কোন খবরই রাখেন না। ভারমোর পর্যন্ত তখনও জীপ যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়নি। তবে চম্বা থেকে বাস-এ ২২ মাইল দূরে গেহেরা পর্যন্ত ওপথে যাওয়া যায়। অতএব খোঁজ-খবর নিয়ে স্থির হয়, পরের দিন ভোরের বাস-এ রওনা হতে হবে। পোর্টার এখন এখানে পাওয়া সম্ভব নয়। পথে করে নিতে হবে। P. W. D.-র এক কর্মচারী সঙ্গে গিয়ে বাস-এর সীট রিজার্ভ করিয়ে দেন। সাগ্রহে তাঁর বাড়িতে নিয়ে চলেন। চা ও ভুট্টা খাওয়ান। অতিথিসেবায় নিজে আনন্দ পান, আমরাও তৃপ্তি পাই।

॥ ৫ ॥

ভোর ৫টা ১৫তে বাস ছাড়ে। চারটের মধ্যে উঠে তৈরি হই। দেখি মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে।

হিমাদ্রি চিন্তিত হয়, তাই ত! বাস স্ট্যান্ডে মাল নিয়ে যাবার জন্যে কুলিটার সাড়ে চারটেতে আসবার কথা। এই জলে আসবে ত?

বলি, ভেবে লাভ কি? দেখা যাক, আসে কি না। আসে ভাল, না এলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাস স্ট্যান্ড ত কাছেই।

কুলি আসে না। বর্ষাতি জড়িয়ে হিমাদ্রি বাস স্ট্যান্ডে যায়। ঐ জলে কেউই আসতে রাজি হয় না। অবশেষে টিকিট কাউন্টারের লোকটির সাহায্যে একজনকে যোগাড় করে।

মাল সামান্যই। দুজনের অল্প বিছানা। কয়েকটা জামা কাপড়। বিস্কুট ইত্যাদি কিছু খাবার। বাকি মালপত্র ডাকবাংলোর চৌকিদারের কাছে রেখে যাওয়া হয়। দিন সাতেকের ত ব্যাপার।

বৃষ্টির জন্যে বাস ছাড়তে দেরি হয়। একটানা বৃষ্টি চলে। কখন কমে, কখন বা প্রচণ্ড বেগে নামে।

বাস-এর মধ্যে বসে হিমাদ্রি বিষণ্ণ বদনে কি যেন ভাবে। জিজ্ঞাসা করি। বলে, এই দারুণ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল! ওপরে গিয়ে ত কিছুই দেখা যাবে না!

বলি, ভেবে লাভ কি বলো? আমার কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস, মণিমহেশ পরিষ্কার দর্শন দেবেনই নিশ্চয়। হিমালয়ের করুণা অশেষ জেনো। সেপ্টেম্বরের এ-সময়ে নীচে বৃষ্টি পাওয়া, আশ্চর্য কি?

বাস চলতে থাকে ইরাবতীর ধার দিয়ে। নদীর স্ফটিক স্বচ্ছ নীল জল বৃষ্টির ফলে ঘোলাটে হয়ে ওঠে। মাইল ১৪ যাবার পর বাস থেমে যায়। পথের নিকটে খানকয়েক ঘর। নদীর উপর পারাপারের লোহার ঝোলা পুল। জায়গার নাম বাগ্‌গা। পুলের উপর বাস চলে না। অপর পারে আর একটা বাস ধরতে হবে।

ভাগ্যক্রমে বৃষ্টিও থামে। ঝোলা নিয়ে সেই বাস-এ ওঠা। হিমাদ্রি আবার তাড়াতাড়ি গিয়ে জায়গা দখল করে।

নদীর অপর পার দিয়ে আরও আট মাইল গিয়ে গেহেরা। বেলা সাড়ে এগারোটায় পৌঁছে যাই। কতকগুলি দোকানঘর, সরাইখানা। একটা পাহাড়ী নদী এসে ইরাবতীর সঙ্গে মেশে। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে বাড়ি। ডাকবাংলো। খানিক উঁচুতে বনবিভাগের নতুন ছোট বাড়ি,—সারি সারি তিনখানা ঘর। সেইখানে উঠি। তাড়াতাড়ি দুপুরের কিছু আহারেরও ব্যবস্থা হয়। সঙ্গের মালপত্র নিয়ে যাবার জন্যে চৌকিদার একজন লোক ঠিক করে দেয়। দশ টাকা নেবে। ভারমোর পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

এখান থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরে দুর্ঘেটি। সেখানে আজ রাত কাটানোর কথা। দুর্ঘেটি থেকে কাল ১৫।১৬ মাইল গিয়ে ভারমোর। ভারমোর থেকে মণিমহেশ মাইল একুশ,—দুই দিনের পথ।

হিমাদ্রি বলে, এ আর কি? তিনদিনেই তাহলে ত পৌঁছে যাচ্ছি।

গেহেরাতে বেশিক্ষণ বিশ্রাম করতে মন চায় না। সামনে হাঁটাপথ। ছয় মাইল মাত্র হলেও আজকের মত পথচলা শেষ করে বিশ্রামস্থানে পৌঁছানোর স্বস্তি আছে। তাছাড়া, আকাশ মেঘে ভরা। আবার কখন বৃষ্টি নামে, কে জানে! তাড়াতাড়ি রওনা হই।

পথচলা শুরু হয়। মনে গভীর আনন্দ। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। নদীর উপত্যকা ধরে পথ চলে। জলধারার মত এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে। চড়াই উৎরাই নেই। মামুলী পাহাড়ী পথ। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা কম। ঝুরঝুরে মাটি, কাঁকর, ছোটবড় নানা আকারের পাথর। দু'দিকের পাহাড় খাড়া ওঠে। Gorge-এর মধ্যে দিয়ে নদী নামে।

নদী, পাহাড়, শান্ত প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের সুর মিলিয়ে আপনমনে চলতে থাকি।

দুর্ঘেটি পৌঁছবার মাইলখানেক আগে আবার বৃষ্টি নামে। জলের মধ্যে বর্ষাতি গায়ে এগিয়ে যাই। ছাতা খোলা দুষ্কর। বাতাসের জোরে উড়িয়ে নিয়ে যায়। মুখে চোখে জলের ঝাপটা লাগে। পথের উপর দিয়েও জলের ধারা বহে চলে। এভাবে পথচলারও আনন্দ আছে। কিন্তু পথে একটিও জনপ্রাণী দেখি না। হিমাদ্রিকে বলি, এদিকে লোকালয় নেই নাকি?

দুর্ঘেটি যখন পৌঁছই তখন আরও জোরে জল নামে।

নদী থেকে ৫০।৬০ ফুট উপরে সুন্দর ডাকবাংলো। পি ডবলিউ. ডি-র। নদীর দিকে বারান্দা। বারান্দায় উঠে বর্ষাতি খুলে মাথা-মুখের জল ঝাড়ি। পাশাপাশি দুখানা ঘর। কয়েক হাত দূরে রান্নাবাড়ি। চৌকিদার আসে। একটা ঘর খুলে দেয়। পাশের ঘরেও লোক। সাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসেন। স্থানীয় অফিসার। সবে নতুন এখানে এসেছেন। আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, কি করে এলেন?

কেন? হেঁটে।

এই বৃষ্টিতে!

পথে জল নেমে গেল। ছাতা বর্ষাতি রয়েছে। তাছাড়া, পাহাড়ে বৃষ্টি পাওয়ায় আশ্চর্য কি?

তিনি উদ্বেগ দেখিয়ে বলেন, কাজটা মোটেই ভাল করেন নি। পাহাড়ে বৃষ্টি যখন তখন আসে, ঠিকই। জলের মধ্যে পথও হাঁটতে হয়, দরকার থাকলে। কিন্তু যে-পথে এলেন, এদিকে বৃষ্টি হলেই ভীষণ পাথর গড়িয়ে পড়ে, ধ্বস নামে। তাই বৃষ্টি নামলে এ-পথে লোক চলে না।

আমি বলি, যাক্, ভাল ভাবে পৌঁছে গেছি। ভাগ্যে খবরটা জানা ছিল না, নইলে আজ আর দুর্ঘেটি পৌঁছানো হোত না। এ-বৃষ্টি আজ থামবার নয়। আরও ঘনঘটা করে আসছে।

কথা শেষ হতে না হতেই কাছাকাছি কোথায় পাহাড়ের ধ্বস নামাব বিকট শব্দ ওঠে।

অফিসার চমকে ওঠেন, শুনছেন? খুব বেঁচে গেছেন আপনারা।

ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। নাম বি. এন. মেহেতা। চা খেতে খেতে গল্প হয়, কোথায় চলেছি।

বাইরে একটানা ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি চলতে থাকে। মেঘগর্জন ওঠে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকায়। ইরাবতীর জলস্রোতের প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়।

॥ ৬ ॥

গেহেরাতে হিমাদ্রি হাঁটাপথের দূরত্ব শুনে বলে, তিন দিনেই ত মণিমহেশ পৌঁছে যাব।

কিন্তু, তিন রাত্রি কেটে যায় এই দুর্ঘেটিতেই।

আসার পর সেই যে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, সারারাত চলতেই থাকে। সকালে উঠে দেখা যায়,

থামবার কোনই লক্ষণ নেই। চারিদিক আবছা আঁধার। প্রচণ্ড বেগে তীক্ষ্ণ তীরের মত বৃষ্টির ধারা পাহাড়ের বুকে বেঁধে। কল্‌কল শব্দে চতুর্দিকে জলের তোড় নামে। নদীর বুকে অসংখ্য বুদ্বুদ ওঠে। যেন ফুটন্ত জল ছুটে চলে। ইরাবতীকে দেখে চেনবারই উপায় নেই। নীলবসনা উচ্ছল হাস্যময়ী অপরূপ সুন্দরীর মৃদু মন্দ চরণ ফেলে চলা নয়। উন্মাদিনী ভৈরবী মূর্তি। গৈরিকবসনা। সহস্র করে অগণিত শাণিত অস্ত্র। পাহাড়ের বুকে নিষ্ঠুর আঘাত হেনে কলহাস্যে ছুটে চলে। জলস্রোতেরও প্রচণ্ড বেগ। নদীর বুকে যে পাথরগুলি নিশ্চিন্তমনে আশ্রয় নিয়ে মাথা তুলে জেগে ছিল, যাদের ঘিরে ছোট ছোট ঢেউগুলি সাদা ফেনার মালা পরে খেলা করত, আজ আর সেগুলি দেখাই যায় না। জলের তলে অদৃশ্য হয়েছে। চারিদিকে ঘূর্ণিজল। চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে চলে। ডালপালা; চেরা কাঠ, গাছের গুঁড়ি,—এমন কি ডালপালাসমেত প্রকাণ্ড গাছও জলের তোড়ে ভেসে আসে। স্রোতের ঘূর্ণির মুখে ক্ষণিক ঘুরে-ফিরে নীচে নেমে চলে—চক্ষের পলকে। যেন, খড়কে কাটি! হঠাৎ কখনও দেখা যায়, দু'একটা জীবজন্তুর মৃতদেহ। জলের টানে হাতির দলও অনায়াসে ভাসিয়ে নিতে পারে, বেশ বোঝা যায়। নদীর জল ক্রমশ বেড়ে ওঠে চোখের সামনে,—দুই পাড়ের পাথর ও পাহাড়ের গা তারই সাক্ষ্য দেয়। পাহাড়ের মাথা থেকে ও গা বেয়ে অনবরত জলধারা নামে, নদীতে মেশে। যেদিকেই তাকাই,—জলপ্রপাত। কোথাও বা প্রচণ্ড শব্দ তুলে পাহাড়ের অংশ ভেঙে পড়ে। গোলাগুলির মত অসংখ্য পাথর কেবলই গড়িয়ে আসে উপর থেকে, ছিটকে নদীর বুকে পড়ে, জলের মধ্যে যেন বিস্ফোরণ হয়।

সারাদিন বারান্দা থেকে সকলে এই প্রলয়লীলা দেখি। একটানা দু'দিনব্যাপী পাহাড় ও নদীর এমন সংহারিণী মূর্তি আগে দেখি নি।

মেহেতা বলেন, অনেক ক্ষতি হল দেশের। তবে একজনের দুর্ভাগ্য অপরের সৌভাগ্য। এই দু'দিনে যে কাঠগুলো ভেসে গেল, এদের উদ্ধার করার কোন উপায় নেই। সব চলে গেল পাকিস্তানে। লক্ষ টাকার বেশি আমাদের দেশের লোকসান হয়ে গেল এতে।

দু'মাস পরে পাহাড় থেকে নেমে এসে পঞ্জাবে সেই সময় প্রবল বন্যার দুঃসংবাদ শুনি।

দুর্ঘেটির সামনে নদীর দুই দিকে খাড়া পাহাড় কাছাকাছি থাকায় দুই কূলে জলের প্লাবন ক্রমশ বেড়েই চলে। দশ ফুটেরও বেশি উপরে ওঠে। মাত্র আর কুড়ি-পঁচিশ ফুট উপরে বড় রাস্তা। তারই নিকটে দু'তিনটে চালাঘর, দোকান। যেভাবে জল বাড়ে, দোকানদার ও স্থানীয় লোকেরা ভয় পায়। রাত্রে এসে বাংলোর বারান্দায় ও রান্নাবাড়িতে আশ্রয় নেয়। তাছাড়া, পাথর পড়ারও আশঙ্কা আছে। ডাকবাংলোর এলাকা সেদিক থেকে খানিক নিরাপদ।

প্রাকৃতিক এই দারুণ দুর্যোগ, হিমাদ্রির মনেও গভীর উদ্বেগ। বলে, এইখানে এভাবে আটকে রইলাম, এক মাসের ছুটি যে!

বলি, হিমালয়ে এসে ও-সব নিয়ে ভাবে না। মনের আনন্দ হারিয়ে যায়।—কিন্তু নদীর চেহারা দেখছ? চেনাই যায় না। মনে রেখো, মানুষের রাগ হলেও এমনি তার চেহারা বদলায়,—যেন দুজন ভিন্ন লোক।

হিমাদ্রি চোখ কুঁচকে তাকায়, প্রশ্ন করে, কেন? এর মধ্যে রেগেছি একদিনও?

বলি, মোটেই না। সেইজন্যই ত বুঝতে পারবে বলে বলছি।

এদিকে আর এক বিপত্তি ঘটে।

দুর্ঘেটি পৌঁছবার পরই সেদিন বিকেলে গেহেরার কুলি এসে জানায়, খোরাকি নেই, দশটা টাকা চাই।

বলি, দশ টাকাই ত তোমার ভারমোর পৌঁছে পাবার কথা। তাই পাবে। খাওয়ার জন্যে ভাবনা নেই, আমাদের যা রান্না হচ্ছে,—একসঙ্গে খাব।

সে তখন জানায়, তার কে আত্মীয় থাকে এইখানে কাছেই। তার কাছে গিয়ে রাত কাটাবে, পরের দিন ভোরে এসে আমাদের সঙ্গে রওনা হবে। টাকার দরকার তার আত্মীয়কে দেবার জন্যে।

কথা শুনে কেমন যেন সন্দেহ জাগে। আবার ভাবি, গরিব লোক। হয়ত হঠাৎ বিশেষ কি প্রয়োজন হয়েছে।

পাঁচটা টাকা দিই। বলি, দেখ, অতি ভোরে রওনা হব, যত রাতই হোক, তুমি এখানে ফিরে এসে ঘুমিও।

তখন ত আর জানা নেই, এমনভাবে বৃষ্টি চলবে, এখানে আটকে থাকতে হবে। কিন্তু দু-দিনেও সে লোকটার দেখা নেই, কোন খবরও দেয় না।

দু'দিন পরে বৃষ্টি কমে, মাঝে মাঝে থামেও। তবু পাহাড়ের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়া চলতে থাকে, বাংলোতে বসে দেখতেও পাই।

পথ জনশূন্য। মেহেতা বলেন, আরও একদিন কাটিয়ে তবে রওনা হোন। কুলির ব্যবস্থা আমি একটা করে দেব। আপনারা চেষ্টা করলেও পাবেন না। এ-অঞ্চলের লোকেদের অদ্ভুত মনোভাব। অত্যন্ত গরিব। টাকা রোজগারের সুযোগও খুব কম। সুযোগ পেলেও খাটতে চায় না। বিশেষত গ্রাম ছেড়ে কোথাও যেতে চাইবে না,—যত টাকাই দিন না কেন। আশ্চর্য!

এ-পথে এগিয়ে যেতে আমাদেরও সেই অভিজ্ঞতা হয়।

॥ ৭ ॥

২৩শে সেপ্টেম্বর। সকালে মেঘহীন সুনীল আকাশ দেখা দেয়। মনেরও মেঘ কাটে। গত তিন দিনের দুর্যোগ দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়ে।

নতুন কুলি খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে আসে। আমরাও চায়ের সঙ্গে রুটি তরকারি খেয়ে নিই। পথে দুপুরে খাওয়ার পাট রাখি না।

নয়টার সময় যাত্রা শুরু। নদীর ধার দিয়ে পথ। নদীর স্রোত ও জলভার কমে আসে। পাড়ের ভিজে পাথরগুলি তার প্রমাণ দেয়। জলের মধ্যে দু'একটা পাথরের মাথাও আবার উঁকি মারে।

পথের উপর গড়িয়ে পড়া ছোট-বড় বহু পাথর। এক জায়গায় পথের খানিক অংশ ভেঙে নীচে নদীতে পড়েছে। অনেকখানি পাহাড়ের উপর উঠে সে জায়গাটুকু পার হতে হয়। পথে লোকচলাচলও আরম্ভ হয়, দেখি। যেন রাত্রি ভোর হওয়ায় পাখিরা বাসা ছেড়ে ছেড়ে চলে।

হিমাদ্রি বলে, ঐ দেখুন, সামনে যেন বায়োস্কোপের ছবি। লোকগুলি আসছে—কি অদ্ভুত বেশভূষা! এ-যেন কোন আজব দেশে এলাম।

তাকিয়ে দেখি। দু'দিকের গিরিশ্রেণী ভেদ করে নদী নামে। নদীর সমরেখায় পথও চলে। সেই পথ ধরে অপর দিক থেকে এক গদ্দী পরিবার আসে। তারাও যেন পাহাড় ভেদ করে নামে। পুরুষদের লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ দেহ। সুশ্রী রূপ। কারও মাথায় বিশাল পাগড়ি, কারও বা গোল টুপি। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা আলখাল্লা মতন। কোমরে পাকের পর পাক দিয়ে জড়ানো কালো লোমের মোটা দড়ি। এগিয়ে আসে হেলে দুলে লম্বা পা ফেলে। কিন্তু, পথ চলতেও দলপতির হাতে প্রকাণ্ড হুঁকা। নল টেনে তামাক খেতে খেতে আসে। মনে হয়, হিমাচলের পথ চলা এদের কাছে যেন আরাম-কেদারায় বিশ্রাম নেওয়া! সঙ্গে মেয়েরাও আছে। এক যুবতীও।

তার গায়ের রঙও যেমন সুন্দর, চোখ-মুখেরও তেমনি সুশ্রী গড়ন। অপূর্ব সুন্দরী। গলায় নাকে কানে অলঙ্কার। কিন্তু পরনে ঠিক গদ্দীরমণীর বেশভূষা নয়। ফুলকাটা সিল্কের রঙিন ঘাঘরা, জামা। মাথায় ওড়না। পাঞ্জাবী মেয়েদের মত পরা। শহর-ফেরা আধুনিকা গদ্দী তরুণী হয়ত। অবশ্য, কোমরে জড়ানো লোমের দড়ি।

হিমাদ্রিকে বলি, ঠিকই বলেছ, ছবির মতনই দেখাচ্ছে। এদেরই দেশে তো আমরা এসেছি। চম্বা জেলার ভারমোর সাব্-তহশীল—এই গদ্দীদেরই বাসভূমি। তাই ঐ অঞ্চলের আর এক নাম গদেরাম্।

হিমাদ্রি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে, কিন্তু কোমরে পাক দিয়ে জড়ানো ওটা কি—কোমর-বন্ধের মত? ছেলেমেয়ে, সবারই?

ঐটিই ত গদ্দীদের বেশভূষার প্রধান অঙ্গ। তোমার গলার পৈতার মত। ওকে বলে ডোরা। প্রকাণ্ড লম্বা উলের দড়ি। ৪০ থেকে ৬০ গজ নাকি লম্বা। ওজনেও দু'তিন সের ভারী। মেয়েরাও কোমরে জড়িয়ে রাখে, দেখছ! তাদের অবশ্য লম্বায় আরও ছোট হয়। পাহাড়ে থাকতে বা পথ চলতে নানান কাজে লাগে,—ভেড়াছাগল বাঁধা, পাহাড় থেকে পড়ে গেলে তাদের ঐটের সাহায্যে তোলা, তাঁবু ফেলা;—আবার দড়িগুলো এমনি শক্ত যে গাছে বা পাথরে বেঁধে নিজেরাও ঐ দড়ি ধরে দুর্গম পাহাড়ে ওঠা-নামা করতে পারে।

হিমাদ্রি বলে, দেখাচ্ছে যেন সন্ন্যাসীর জটা কেটে কোমরে জড়ানো।

বাঃ! চমৎকার ধরেছ ত! লোকে ওটাকে 'শিউজিকী জটা'-ই ত বলে। বলার কারণও আছে। সুন্দর এক উপাখ্যান। এরা সবাই শিবভক্ত। তাই ভারমোরের আর এক নামও—শিবভূমি। চলেছ মণিমহেশ—শিবের রাজ্যে। রাজ্যের নাম শিবভূমি, আশ্চর্য কি? কারও কারও মতে ঐ অঞ্চলই শিবের গদী—তাই থেকেই এদেরও নামকরণ গদ্দী।

হিমাদ্রি বলে, কিন্তু, এদের চেহারা ত পাহাড়ীদের মতন একেবারেই নয়। এখানে এরা এল কি করে?

ওদের ইতিহাস যতটুকু জানা আছে, শুনো পরে, এখন ওদের দাঁড় করাও দিকি। ফটো তুলতে দিতে আপত্তি হয়ত হবে না,—চেহারায়, বেশভূষায় জবর হলেও মুখচোখে বেশ হাসিখুশি, সরল ভাব।

নিকটে এলে আমরাও হাসিমুখে তাদের দিকে তাকাই। তারাও হেসে দাঁড়ায়। ভাষার অন্তরায় থাকে। তবু ইশারায় কথা চলে। ছবিও তোলা হয়।

সেদিন গদ্দী সম্বন্ধে হিমাদ্রির কৌতূহল সম্পূর্ণ মেটাতে পারি না, যেটুকু জানা ছিল তাই জানাই।*

রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে গদ্দীদের পূর্বপুরুষরা ছিল শকজাতি। আর্যদের সগোত্র। পুরাকালে মধ্য এসিয়ায় এরা ছিল ভ্রাম্যমাণ যাযাবর। ঘোড়া ও ভেড়ার দল নিয়ে সেখানে চারিদিকে ঘুরে বেড়াত। হঠাৎ একদিন তাদের শান্ত জীবনযাত্রার নির্মেঘ আকাশে প্রবল-পরাক্রম হূন জাতির আক্রমণের ঝঞ্ঝা দেখা দেয়। পশুদল নিয়ে শকেরা দিকে দিকে পালাতে শুরু করে। দু'হাজার বছরের আগের কথা। সেই শকেদেরই কয়েকটি দল চলে আসে দক্ষিণাঞ্চলে ভারতের দিকে। কোন কোন শাখা নেমে যায় ভারতের সমতল প্রান্তেও। বলশালী দলপতিরা সেখানে প্রবেশ করে রাজ্যস্থাপনাও করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁদের নামও থেকে যায়,—মগ, কদাফিস, কণিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব ইত্যাদি। কিন্তু পশুপালনের জাতিগত বৃত্তি যারা ছাড়ল না, তাদেরই বংশধরেরা আজও ঘুরে বেড়ায় হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে পশুদল নিয়ে। রক্তে তাদের যাযাবরের সদাচঞ্চল স্রোত। এদেরই একদল হিমাচল প্রদেশের বুশাহারে ও টেহেরি অঞ্চলে এখনও ঘোরে,—ঘোড়ার দল নিয়ে নয়, মহিষের পাল নিয়ে। "গুজর" সম্প্রদায় বলে তাদের পরিচয়। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অপর আর এক শাখা বিচরণ করে বেড়ায় চম্বা, মণ্ডী, লাহুল ইত্যাদি এলাকায়। তাদের নাম হয় "গদ্দী"। এরাও পশুপালন করে, কিন্তু ঘোড়াও নয়, মহিষও নয়,—মেষ ও ছাগের পাল। ভারতের শক-সম্রাট কণিষ্কের পৌত্র বাসুদেবের অনুকরণে হিন্দুধর্মও গ্রহণ করে।

কালক্রমে যাযাবর গদ্দীদেরও অনেকে মাটির ডাকে সাড়া দেয়। পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্মেও তাদের মন ঝোঁকে। তাঁবু ছেড়ে ঘর তোলে। নিজেদের পৃথক সমাজ ও বাসভূমিও গড়ে ওঠে। ভারমোর অঞ্চল এই গদ্দীদেরই আবাসস্থান। কিন্তু এখনও এদের প্রধান সম্পদ,—পালিত পশুদল,—ভেড়া ছাগল। শীতকালে তুষারপাতের আগে পশুপাল নিয়ে গ্রাম ছেড়ে কাংড়া, সুকেত, মণ্ডী প্রভৃতি হিমাচলের নিম্ন এলাকায় এরা দলে দলে নেমে চলে। শীতের ভয়ে নিজেদের সুখ-সুবিধার লোভে নয়, ভেড়া ছাগলের চারণভূমির সন্ধানে। বছরের অন্য সময়ে চম্বা ও লাহুল অঞ্চলেই পশুদল চরায়। ভেড়া-ছাগল চরাবার প্রয়োজনে এইভাবে ঘুরে বেড়ানোয় খেতের কাজে তাদের মনও তেমন থাকে না। আবার, আর এক দিকে গ্রামীণ জীবনের স্বাদ পেয়ে কেউ কেউ তাঁতের কাজে, সেকরার কাজে, কামারের পেশায়ও লেগে যায়। শেষোক্ত কাজগুলি ভারমোরে যারা করে তাদের জাতি হল—সিপি ও রেহরা। কারও কারও মতে তারা গদ্দী-সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। নিম্নজাতি বলে গণ্য হয়। কিন্তু যেমন ব্রাহ্মণেতর জাতিও পৈতা পরে, এরাও তেমনি কোমরে 'ডোরা' পরতে শুরু করে।

হিমাদ্রি বলে, কিন্তু, 'শিউজিকী জটা'র উপাখ্যানটা কি?

বলি, রাহুলের এই অভিমত হলেও গদ্দীদের নিজেদের বিশ্বাস, তাদের পূর্বপুরুষরা এখানে আসেন

রাজস্থান থেকে। 'চম্বা বংশাবলী'তে চম্বার প্রথম রাজার নাম পাওয়া যায়— জয়স্তম্ভ। প্রবাদ, তাঁর জন্ম হয় রাজপুতানার এক রাজবংশে। পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায় স্বদেশ ত্যাগ করেন। সন্ন্যাস নেবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁর গুরুদেব নিষেধ করেন। রাজপুত জীবনের আদর্শ অনুযায়ী চলবার আদেশ দেন এবং হিমালয়ের এই চম্বা অঞ্চলে সদলবলে চলে আসার নির্দেশও করেন। কুমার জয়স্তম্ভ এই পথে আরও একটু এগিয়ে 'খাড়ামুখে'র নিকটে পৌঁছুলে অগ্রচারী নামে এক ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেই ঋষি শিবের নিকট থেকে আগেই স্বপ্নাদেশ পান—জয়স্তম্ভকে এই প্রদেশে স্বাগত জানাতে এবং শিবের অঙ্গসজ্জা—টোপ (টুপি), চোলা (ঝোলা আলখাল্লার মত জামা) ও ডোরা (কোমরে জড়ানো লোমের দড়ি)—তাঁকে উপহার দিতে। জয়স্তম্ভ সেই শিব-বেশ ধারণ করে ভারমোরে এসে তাঁর রাজ্যস্থাপনা করেন। তাঁরই সঙ্গে ব্রাহ্মণরা আসেন পৌরোহিত্য করতে। বহু রাজপুত বা ক্ষত্রিয়রাও আসেন যোদ্ধারূপে। এঁরাও সকলেই সেই শিবের বেশই গ্রহণ করেন। নিজেদের শিবভক্ত বলে প্রচার করেন। ক্রমে এই শিবভূমিতে—শিবের গদ্দীতে—এঁদেরও নামকরণ হয় গদ্দী বলে।

আবার, ভিন্ন এক মতে, জয়স্তম্ভের পিতার নাম ছিল মরু ; তিনিই প্রথম ভারমোরে এসে অধিষ্ঠান করেন।

গদ্দীদের মধ্যে আরও এক ধারণা আছে, ৭৬০ খ্রীস্টাব্দে রাজা অজিয়বর্মণের রাজত্বকালে গদ্দীদের অনেক পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা দিল্লী ও পঞ্জাব থেকে এইখানে চলে আসেন।

হিমাদ্রি বলে, হয়ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এরা দলে দলে এ-অঞ্চলে এসেছিলেন।

বলি, তাই ঘটেছিল মনে হয়। মোট কথা, গদ্দীরা এখানকার আদি বাসিন্দা নয়। এক হাজার দেড় হাজার বছর বা তারও আগে বাইরে থেকে এসে এই অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে। রাজপুতানা, পঞ্জাব বা দিল্লীর গ্রীষ্মপ্রধান সমতলভূমি ছেড়ে এসে এই সুদূর দুর্গম পার্বত্য হিমাঞ্চলে কিভাবে তারা নতুন স্বতন্ত্র এক জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়। ভারমোরে গদ্দীরা নিজেদের ব্রাহ্মণ, ঠাকুর, ক্ষত্রী, রাজপুত বা রাণা বলে। Newell কিন্তু মনে করেন, ব্রাহ্মণরা ঠিক গদ্দী জাতিভুক্ত নয়। ক্ষত্রী বা রাজপুতরাই আসল গদ্দী। অথচ, ভারমোরবাসী সবাই আজকাল গদ্দীর মর্যাদা চায়। গদ্দীদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন, সন্দেহ নেই। এখানেও তারা হিন্দুধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। কিন্তু সকলেই শৈব। প্রধান দেবতা,—শিব। নিজেদের বেশভূষাও শিব-পার্বতীর অঙ্গসজ্জার অনুকরণে ধারণ করে বলে এখনও দৃঢ় সশ্রদ্ধ বিশ্বাস। ভারমোরে অন্য দেবদেবীর মন্দির থাকলেও শিবপূজারই প্রাধান্য। অথচ, রাজস্থান বা পঞ্জাবে শৈবধর্মের এমন বহুল প্রচার বা প্রভাব ছিল না। হিমালয় শিবের আবাসস্থান। মণিমহেশ শিখরও চম্বা-কৈলাস নামে প্রসিদ্ধ। তাই মনে হয়, যে-সময়ে গদ্দীদের পূর্বপুরুষরা এখানে আসেন তখন এখানে যে আদিবাসীদের বাস ছিল, তাদের দেবতা ছিলেন শিব। হয়ত তারা অনার্য-ই ছিল। রাজকুমার জয়স্তম্ভ এই সুদূর পার্বত্য দেশে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে দিয়ে রাজ্যস্থাপনার চেষ্টা না করে, স্থানীয় শৈবধর্ম মেনে নেন। সহজেই কার্যসিদ্ধিও হয়। রাজা দেবতারই প্রতিনিধি। অতএব, সেই দেবতারই বেশভূষায় সাজিয়ে জনগণও তাকে বরণ করে। এই হয়ত ঐ উপাখ্যানের মূল কথা। যে কারণেই হোক,—এদের বেশভূষার বৈশিষ্ট্য আছে, বিশেষ করে ঐ কোমরে জড়ানো ডোরা,— শিউজিকী জটা।

এ ত গেল ধর্ম ও বেশভূষা। পার্বত্য জীবনধারাও তারা ক্রমে সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করে নেয়। মধ্য এসিয়া থেকেই নেমে আসুক, অথবা ভারতের সমতল প্রদেশ ঘুরে হিমালয়ে উঠুক, এদের ধমনীতে প্রকৃতই যাযাবরের রক্তধারার প্রবাহ। তাই স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু। সব রকম আবহাওয়াই সহ্য করতে পারে। সৈনিক পেশা অবলম্বনও হয়ত এর আর এক কারণ। অপর দিকে পাহাড়ীদের মতনই এরা সরল প্রকৃতি, মনখোলা, হাসিখুশি, গান-বাজনা নাচে সহজেই মাতে। জীবননির্বাহের প্রয়োজনীয় সামগ্রীও অতি অল্প। যা কিছু একান্ত প্রয়োজন নিজেরাই করে নেয়।

গদ্দীদের জীবনযাত্রার ধারা যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে। পোশাকের বাহুল্য নেই। পুরুষদের মাথায় সাধারণত পাগড়ি, কখন বা টুপি,—বুসায়রি বা কুলুক্যাপ্-এর মত গোল, উপরে চ্যাপ্টা, সামনে রঙিন ভেলভেট। গায়ে সুতির শার্ট বা কুর্তা। তার উপর পট্টুর কোট অর্থাৎ চোলা, হাঁটুর নীচে পর্যন্ত ঝোলা। কোমরে জ[illegible]না সেই কালো লোমের দড়ি,—ডোরা। কোমরে দড়ি পাকিয়ে রাখার দরুন চোলা

বা কোট পেটের উপর উপর থলির মত ঝুলে থাকে,—তাকে বলে খুখ্—সেই ঝোলার মধ্যে নিজেদের ছোটখাট খুচরা মালপত্র ত রাখেই, এমন কি ভেড়ার বাচ্চা বা ছাগলছানাও নিয়ে যেতে দেখা যায়,—পেটের কাছে মুখ বার করে উঁকি মারে কেঙ্গারুর বাচ্চার মতন। এক একটা চোলা করতে ২০।২৫ গজ পট্টু লাগে। পরনে পট্টুর পাজামা, নীচের দিকে আঁটসাঁট টাইট—যেন যোধপুরী ব্রিচেস। গরমের দেশে এলে হাঁটুর নীচে থেকে খালিই থাকে। পায়ে মোটা চামড়ার মজবুত দেশী নাগরা।

মেয়েদের পরনেও ঐ ধরনের পট্টুর চোলা, এদের বলে চোলু,—গাউনের মত সারাদেহ ঢেকে ঝুলে থাকে। কোমরে এদের দড়ির পাক বা ডোরা। চোলুর উপর অনেক সময় হাতকাটা 'ভেস্ট' পরে। মাথায় কাপড়ের ফেট্টি,—বলে চাদরু। সারা অঙ্গভরা অলঙ্কার। মনে হয়, যার যা কিছু সম্পত্তি দেহ-ই তার 'সেফ-ডিপোসিট ভল্ট'-এর কাজ দেয়। অবশ্য আজকাল বেশভূষার পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

গদ্দীদের জীবনযাত্রার ধারাও বৈচিত্র্যময়! শীতের সুরু হতেই অক্টোবরের প্রথমেই গদেরানের ঘর ছেড়ে দলে দলে নেমে চলে পাহাড়ের নীচের দিকে। এ-যেন গ্রীষ্মকালে তুষার গলে পাহাড়ী ঝরনা নামে। শীতকালে পাহাড়ের এ-অঞ্চলে সব কাজকর্ম বন্ধ। খেত-খামারের কাজ নেই। চতুর্দিক বরফে ঢাকা। অন্য কোন কাজ করেও উপার্জনের সম্ভাবনা নেই। ভেড়া-ছাগলেরও চরে খাওয়ার এক কণা তৃণ নেই। কি হবে ঘরে নির্জীব হয়ে বসে দিন কাটিয়ে? 'চলো মুসাফির বাঁধো গাঁটরি'—যে যার মালপত্র নিয়ে ভেড়া-ছাগল তাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে পথে;—মালপত্র, তাই বা কি? সাজ-সজ্জা পোশাক? সে ত দেহেই আছে। নিজেদেরই হাতে বোনা। নিজেদেরই পালিত পশুদের লোম থেকে। তাই, এক চমৎকার প্রথাও এদের গড়ে ওঠে। যার ভেড়া-ছাগল যে রঙের উল দেয়, পট্টুর জামা পরবে সে সেই রঙেরই। দেখায়ও সুন্দর। নিজেদের ধনরত্নসম্ভার ঐ পালিত পশুদল। তাদেরই রঙে রঙ মিশিয়ে থাকবে না ত থাকবে কার? পথের আশ্রয়? সে-ও সঙ্গে চলে। ঐ পশুদেরই লোমে তৈরি কম্বল, গর্দু। গরম ত বটেই, তোশকের কাজ দেয়, বৃষ্টিও আটকায়। পথে পাহাড়ের গুহা মেলে, ভালই। না পাই, ঐ ত গাছের আচ্ছাদন। তাও নেই? পথ ত রয়েছে কোল পেতে। ঐ গর্দু জড়িয়ে পরম সুখশয্যায় আনন্দে বিশ্রাম করি, চল। মাথার উপর নীল আকাশে তারার চুমকি-বসানো সামিয়ানা। হঠাৎ যদি বৃষ্টি নামে? কেন, গর্দুর নির্ভয় আশ্রয়! খাদ্য? তারই বা ভাবনা কি? খেতে ফসল ফলে অপর্যাপ্ত ভুট্টা। তারই ছাতুতে সারা বছর কাটে। পথেও সঙ্গে চলে থলে ভর্তি,—চামড়ার ব্যাগে—স্কল্টুতে। নদী বা ঝরনা দেখে নিকটে আশ্রয় নেওয়া। জলের অভাব নেই। শুধু দু'একটা রাঁধবার বাসন সঙ্গে রাখা। শীত বোধ হয়? বা, বন থেকে শাক তুলেছ? পাথর সাজিয়ে বাতাস বাঁচিয়ে উনুন পাতো। আগুন জ্বালাও। বন জঙ্গল,—কাঠের আবার অভাব কি? এই ত কোমরে ডোরায় গোঁজা কাস্তেখানা, নাম জান না? দ্রাট্। এই দিয়ে এখনই আনছি কেটে কাঠ।

এলে ফিরে বন থেকে? কোমরে গোঁজা লম্বা ওটা কি রয়েছে? ঘুঙুর বাঁধা?—ওঃ! বাঁশুরী? জানালা—'লারি' রান্না চড়াক। চলো, গাছতলায় ঐ পাথরে বসে বাঁশুরী শোনাও। মাঠের সবুজ ঘাসের গদির উপর ভেড়া-ছাগল নিবিড় হয়ে ঝিমুতে থাক। তোমার কালো ভয়ঙ্কর কুকুরটা জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে তোমার পায়ের কাছে। হয়ত তোমার বাঁশুরীর তান ওরও মনে সাড়া জাগায়। তবু, কি সজাগ ওর দৃষ্টি। কি যেন অল্প শব্দ শুনেই চমকে ওঠে। কান খাড়া করে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে,—ভেড়া-ছাগলের দলের পানে। নাঃ! সবই ঠিক আছে। আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে মুখ গোঁজে।

বাঁশুরী থামল কেন? ওঃ। গান ধরবে? ধরো। তোমাদেরই লোকসঙ্গীত,—হাল আমলের সিনেমার গান যেন না হয়।

"কপ্‌ড়ে ধোআঁ কন্নে রোআঁ কুন্‌জুআঁ
মুকখোঁ বোল জবানী ও,
মেরে কুন্‌জুআঁ মুকখোঁ বোল জবানী ও।
হত্‌খাঁ বিচ রেশমী রমাল চন্‌চলো।
বিচ্চ ছল্‌না নশানী ও
মেরিএ জিন্‌দ, বিচ্চ ছল্‌না নশানী ও।

*   *   *   *

"ও কুন্‌জুয়া! অঝোরে মোর অশ্রু ঝরে 'কপ্‌ড়ে' কাচতে,—চলে এস, এস কাছে, ওগো, কও কথা মোর সাথে।"

"ও চন্‌চলো! হাতে তোমার রেশমী রুমাল, আঙুলে ঐ আংটি,—আমারই দেওয়া চির-প্রেম উপহার।"

"কুন্‌জুয়া ও! দেখ—কাজল উজল সেই আঁখি আমার, তোমার মন ভোলাতো কত! এখন বিষাদ-ঘন অশ্রুভরা মোদের বিফল-প্রেমের চিহ্ন এ ত!"

"ও চন্‌চলো! তোমার রাঙা হাতে রাঙা চুড়ি, তারই মাঝে মোর প্রেমের নিশান, ঐ যে সোনার বালাখানি!"

"ও কুন্‌জুয়া! আজ গভীর রাতে এস না যেন আমার কাছে! পাঁচ-পাঁচটা বন্দুক গাদা— উঁচিয়ে আছে বাড়িতে—তোমারই বুক লক্ষ্য করে!"

"চন্‌চলো রে চন্‌চলো! আসবই আমি মাঝরাতেতে। অমর মোর ভালবাসা তোমারই তরে। করবে কি আর সামান্য ওই বন্দুকে!"

"ও কুন্‌জুয়া! চলেছ তুমি বহুদূরে। প্রেমের চিহ্ন একটা আংটি যেও গো দিয়ে যাবার আগে।"

"চন্‌চলো রে চন্‌চলো! নগণ্য ঐ চিহ্ন নিয়ে করবে কি? সোনায় ভরা এই চম্বাদেশ, সাজাব তোমায় গয়না দিয়ে।"

"কুন্‌জুয়া! রাখো কথা;—কাল দিনশেষে যেও না চলে মোরে ফেলে। তোমায় ধরে রাখতে কাছে, এ প্রাণই আমার করব দান।"

"ও চন্‌চলো! কাল দিনশেষে দূরদেশে যেতেই আমায় হবেই হবে—কাজ রয়েছে ভারী ভারী,—যেতেই হবে তাড়াতাড়ি।"

প্রেম সঙ্গীত। তবু তারই মাঝে বন্দুকের উল্লেখ। গদ্দীদের পূর্বপুরুষরা এ-অঞ্চলে আসে যোদ্ধবেশে। পাঞ্জাব ও রাজস্থান ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান উৎস। জয়স্তম্ভও সঙ্গে আনেন সেই সৈন্যদলই। পরে চম্বা-রাজাদের মধ্যে যাঁরা বিজয়-অভিযানে যান ও রাজ্যসীমা বিস্তার করেন, গদ্দী সেনাদলই ছিল তাঁদের মুখ্য বল। এমন কি ভারমোর থেকে চম্বা শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হলেও সেখানেও চম্বারাজের সব সেনাদেরই "গদ্দীসেনা" নাম থেকে যায়। ইংরেজ আমলেও বৃটিশ সৈন্যদলে 'গদ্দী আর্মি' স্থান পায়। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখায়। গৌরবও অর্জন করে। তাই এদের ঘরেও বন্দুক, গানেও বন্দুক। আবার আর একদিকে যাযাবরের রক্ত,—পথের আকর্ষণ, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা—প্রেমেরও আবেদন মানে না। প্রেয়সী ছেড়ে চলে দূরদেশে।

ভেড়া-ছাগলের পাল নিয়ে নেমে চলে। মেয়ে পুরুষ—এমন কি ছোট ছেলেরাও পিঠে যা পারে বোঝা বয়। পথশ্রান্ত বালক বা শিশুকে বসিয়ে নেয় সেই পিঠের বোঝার উপর। বাহকের কাঁধের দু'দিক থেকে পা ঝুলিয়ে আরামে শিশু বসে থাকে, চোখে ঘুম নামলে ঢুলতেও থাকে। দিনের পর দিন পথ ধরে নেমেই চলে। মাসখানেক লাগে আপন ঠিকানায় পৌঁছাতে। সব দলই যে একই দিকে যায়, এমন নয়। কিন্তু, সবারই নির্দিষ্ট স্থান থাকে। কেউ নেমে যায় কাংড়া অভিমুখে, কেউ বা কাশ্মীর অঞ্চলে, অনেকে আবার পাঠানকোটের কাছাকাছি গ্রামগুলিতে। মাস চারেক সেখানে থাকা। আলস্যে বসে থাকা নয়। গ্রামবাসীদের কাজেকর্মে লেগে যায়,—কেউ বা গৃহস্থের বাড়ির কাজে, নয়ত ক্ষেতখামারে বা অন্য কোন কাজে সাহায্য করে। আবার ছোটখাট ব্যবসাও চালায়। পাহাড়ে অজস্র আখরোট ফলে, বন থেকে মধু সংগ্রহ হয়, তা ছাড়া গর্দু—মোটা মোটা কম্বল, পট্টু পশুলোম থেকে তৈরি হচ্ছেই। গ্রামের লোকদের কাছে এইসব বিক্রি করে। লাভও থাকে প্রচুর। নিপুণ ব্যবসাদার বলে গদ্দীদের নাম আছে। যতই হোক, রাজস্থান ও পঞ্জাবের রক্তধারার প্রভাব যাবে কোথা? পাহাড়ী অঞ্চলের একটা প্রবাদ,—'গদ্দী মিত্তর ভোলা, দিন্‌দা টোপি মাংতা চোলা'—গদ্দী বন্ধু এমনি ভোলা, দিয়ে টুপি মাগে চোলা,—অর্থাৎ সেই প্রকাণ্ড ঝোলা কোট।

মার্চ মাস এল। আবার, বাঁধো গাটরি। চল ফিরে পাহাড়ে গদেরানে। সেখানে শীত গেছে। বরফ গলছে। আবার ক্ষেতের কাজ। ঘরের ডাক। মাসখানেক আবার কাটে পথে। গ্রীষ্মের মুখেই ফিরে আসে ভারমোর অঞ্চলে। আবার গ্রামগুলি মুখর হয়ে ওঠে। পাখির কুলায়ে যেন পাখিরা ফেরে। শস্যক্ষেত্র সবুজ ওড়নায় মুখ ঢেকে আবার হাসতে থাকে। সভ্য জগৎ থেকে সঙ্গে আনা—ছোটখাট শৌখিন

জিনিসপত্র,—কিছু অর্থসঞ্চয়ও। গ্রামে গ্রামে মেলা শুরু হয়, নাচগান, নানান উৎসব, দেবতার পূজাও।

Newell গদ্দীদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন : "an extremely sensitive and religious people whose simplicity conceals an extremely deep national character."

কিন্তু মহাকালের চক্র ঘোরে। আধুনিক সভ্যজগতের জীবনধারার দুর্বার প্রবাহ হিমালয়ের এইসব দুর্গম অঞ্চলেও অনুপ্রবেশ করে। গদ্দীদেরও জীবন-প্রণালীর পরিবর্তন আনে। আজকাল ভারমোরে গভর্নমেন্টের নানান দপ্তর। আধুনিক কালের দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুবিধ উন্নতির প্রচেষ্টা! মোটর চলাচলের রাজপথও তৈরি হয়। তাই, গদ্দীদেরও অনেকে এখন ঐসব কাজে চাকরি পায়, উপার্জনও করে। শীতের সময় পাহাড়ের নীচের দিকে নেমে আসার, হয়ত, প্রেরণা থাকলেও আর প্রয়োজন বোধ করে না। যাযাবরের রোমাঞ্চকর জীবন ক্রমে স্বপ্নে মিলায়।

আজ, পথের উপর সাক্ষাৎ পাওয়া এই গদ্দী পরিবারও হয়ত চলে নিজেদেরই কোন প্রয়োজনে।

॥ ৮ ॥

আমরাও এগিয়ে চলি পথ ধরে সেই গদ্দীদেরই আজব দেশে,—গদেরানে—ভারমোরে। দেখতে চলি তাদের শিবভূমি। কেমনই বা সেই শৈলশিখর,—মণিমহেশ—চম্বার ছোট কৈলাস,—কোলে যার তুষার হ্রদ!

নদীর ধারা ধরে পথ চলে সর্পিল ভঙ্গিতে। নদী কখনও নিকটে কখনও বা কিছু উপরে। পূর্ব দিকে নদী ঘোরে, পথও বেঁকে যায়। এবার দুদিকের পাহাড় কাছাকাছি নয়। বিস্তীর্ণ উপত্যকা। ইরাবতীও যেন হাঁফ ছেড়ে হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেন। পথের পাশেই জলপ্রপাত। কয়েকদিনের বৃষ্টির ফলে প্রবল বেগে জল পড়ে। কাঠের পুল। বাতাসে জলকণা উড়ে এসে চোখে মুখে লাগে।

চড়াই নেই। পথ চলার শারীরিক ক্লেশও নেই। রোদের তাপও সকালে স্নিগ্ধ মনে হয়। সানন্দে এগিয়ে চলি। মাইলচারেক আসার পর বাঁ দিকে নদীর উপর বড় পুল। ভারমোরের রাস্তা পুল পার হয়ে অপর পারে যায়। আর এক পথ নদীর এই ধার দিয়ে পূর্বদিকে চলে। শুনি, সে-পথ সামনের পাহাড় পার হয়ে আজু রোড় সরাই পাশ দিয়ে যোগীন্দ্রনগরে পৌঁছয়।

পুল পার হয়ে আমরা অপর পারে আসি। কাছাকাছি লোকবসতি দেখি না। দু-একজন পথচারীর সাক্ষাৎ মেলে। জায়গায় নাম বলে খাড়ামুখ।

হিমাদ্রি বলে,—এই সেই খাড়ামুখ, যেখানে প্রবাদ, রাজকুমার জয়স্তম্ভ অগ্রচারী ঋষির সাক্ষাৎ পান।

হেসে বলি, এগিয়ে চল, দেখ তোমাকে আবার হয়ত কেউ স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছেন!

এপারে এসে পথ আবার বাঁ দিকে ঘোরে, ইরাবতীর দক্ষিণ তীর দিয়ে চলে। কিছু দূর যাবার পর দেখা যায় ডান দিক থেকে এক পাহাড়ী নদী এসে ইরাবতীতে মেশে। আমাদের পথও সেই নদীর যাত্রাপথ ধরে ডাইনে ঘোরে। ইরাবতীর মূল ধারার সঙ্গে এইখানেই ছাড়াছাড়ি। নতুন সঙ্গী—এই নদীর নাম বুধল, ভুডল বা ভুগুল। ইরাবতীর উপনদ। কুগ্‌টি পাশ-এ (Kugti Pass) এর উৎপত্তি। মাইল ত্রিশ দীর্ঘ উপত্যকা দিয়ে বহে আসে—ভারমোর বা ভুডল ভ্যালি নামে তার পরিচয়। নদীর বাঁ দিকের খাড়া পাহাড়ের গা কেটে পথ। কালো পাথর। মাথার উপরও সাপের ফণার মত কালো কালো পাথর ঝুলে থাকে। সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে যেন চলা। স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ভাব। ওপারেও নীচের দিকে পাহাড়ের খাড়া গা। মধ্যিখানে নদীর Gorge। ওদিকের পাহাড়ের উপর অংশ কিন্তু তেমন খাড়া নয়, ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে যায়। সেদিকে মাঝে মাঝে গাছের ঝোপ, সবুজ ঘাসে ছাওয়া মুক্ত আবহাওয়া। সকালের রোদে উজ্জ্বল দেখায়। নদীর দুই তীরে দুই ভিন্ন রূপ।

ক্রমে নদীর সঙ্কীর্ণ ধারাপথ অতিক্রম করে গিরিশ্রেণীর উন্মুক্ত অঙ্গনে পৌঁছুই। তখন বোঝা যায়, ক্রমশ ধীরে ধীরে পথ পাহাড়ের উপর উঠে এসেছে। বহু নীচে নদীর উপত্যকা। চারিদিকে ঘিরে বিস্তীর্ণ শৈলমালা। আকাশপানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়গুলির শিখরদেশে তুষারের শুভ্র প্রলেপ।

ভুডল নদীর সঙ্গ পাবার পর মাইল তিনেক এসে পথের ধারে ছোট দোকান। আশেপাশে ভুট্টার ক্ষেত। পথের অপর দিকেও ধাপে ধাপে ক্ষেতের জমি পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠে। সেদিকে কয়েকটা ঘরও দেখা যায়। গ্রামের নাম লাহুল।

দোকানদারের সঙ্গে হিমাদ্রি আলাপ করে। মিলিটারিতে ছিল। বারাকপুরেও কিছুদিন কাটিয়েছে। তাই কলকাতা থেকে আসছি শুনে যেন তার কত জানাশোনা অঞ্চল থেকে এসেছি তারই প্রমাণ দেখিয়ে বলে, হাওড়ার পোল দেখেছি, কালী মাকে দর্শন করেছি, বড়বাজার গিয়েছি।

দোকানে আর একজনও বসে। গ্রামের স্কুলমাস্টার। মণিমহেশের যাত্রী। শুনে দুজনেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন। বলেন, যাত্রা ত ক'দিন আগে এ-বছরের মত শেষ হয়েছে। এখন ও-পথে লোক চলাচল বন্ধ। বরফ পড়তেও সুরু হয়েছে। দেখুন না, ঐ সব পাহাড়ের মাথা, বরফে সাদা হয়ে আছে। মণিমহেশ ত আরও উঁচু। আপনাদের কষ্ট করাই সার হবে। পৌঁছতে পারবেন না। বুঝতে পারি, গত কয়েকদিনে বৃষ্টিতে পাহাড়ের উপর অংশে স্বভাবতই তুষারপাত ঘটেছে। এখন আবার রোদ ফুটেছে, আকাশও পরিষ্কার। অন্তত কয়েকদিন আবহাওয়া ভাল থাকবেই। নতুনপড়া বরফও অনেক গলে যায়।

তাই বলি, দেখি, এতদূর এলাম,—বুঝছেন ত সেই কলকাতা থেকে। চেষ্টা করে দেখা যাক্, যতদূর যাওয়া যায়। মণিমহেশ দর্শন যদি না দিতে চান পাব না।

মাস্টারজী বলেন, হাঁ, উ-তো ঠিক বাত। কালীমায়ের মন্দির আমাদের এদিকেও আছে, জানেন?

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখান, ভুডল নদীর অপব পারে পাহাড়ের গায়ে এক রাস্তা। বলেন, ঐ পথ সোজা চলে যায় তন্দা কালীদেবীর মন্দিরে। কুড়ি মাইল দূরে কালীছো পাশ। সেদিক থেকে উঠে অপর পারে পঙ্গীতে নেমে চন্দ্রভাগার ভ্যালিতে ত্রিলোকনাথের মন্দির।

কথা শুনে উৎসুক নয়নে তাকাই। ত্রিলোকনাথ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বহুদিনের। ভাবি সে-আশা আর এ-শরীরে পূর্ণ হবার নয়।

কিন্তু তা-ও হয় আরও কয়েক বছর পরে। চম্বার এদিক থেকে গিয়ে নয়। কুলু হয়ে রোটাংপাশ পার হয়ে লাহুলের ভিতর দিয়ে। হিমাদ্রির দৃষ্টি অন্য দিকে। লোলুপ নয়নে তাকায়, দোকানের পাশে ক্ষেতে তাজা পুষ্ট ভুট্টাগুলির দিকে।

বুঝতে পারি। জিজ্ঞাসা করি, দুটো কিনে পুড়িয়ে নেওয়া যাবে। দোকানে উনানে আগুনও রয়েছে দেখছি।

দোকানদার কিন্তু দিতে রাজি হয় না। গম্ভীর মুখে জানায়, ক্ষেত থেকে এখন মকাই তোলা চলবে না—সময় হয়নি।

হিমাদ্রি আশ্চর্য হয়ে বলে, কেন? খাওয়ার মত যথেষ্ট বড় হয়েছে।

দোকানদার বলে, খাওয়ার মত কথা বলছি না। এখানকার প্রথা মকাই তৈরি হলে দেবতাকে আগে উৎসর্গ করতে হয়, তারপর লোকে খায়।

হিমাদ্রি বলে, ভালই নিয়ম। তাহলে দেবতাকে এখনই দুটো ভোগ দিয়ে আমাদের প্রসাদ দাও, প্রণামীও পাবে।

সে বলে, তা কি করে হয়? পূজা আছে, উৎসব আছে,—গ্রামের সবাই মিলে করি। ও এখন পাওয়া যাবে না।

হিমাদ্রি হাল ছাড়ে না। জিজ্ঞাসা করে, এদিকে জঙ্গলে শুনেছি অনেক ভালুক আছে?

দোকানদার বলে, বহুৎ। ক্ষেতের কম লোকসান করে? মকাই পাকলে ত কথাই নেই। রাতভোর পাহারা দিতে হয়। এখন দিচ্ছিও।

হিমাদ্রি শুনে কূল পায়। বলে, তাই নাকি? মাঝে মাঝে লুকিয়ে এসে খেয়েও যায় বোধহয়?

দোকানদার জানায়, তা যায় বইকি। এই তো দুদিন আগে ক্ষেতের ঐদিকে ক'টা খেয়ে গেছে।

হিমাদ্রি হাঁফ ছেড়ে বলে, তাহলে আজও না হয়, আরও দুটো ঐভাবে খেয়েছে মনে করো।

মাস্টারজী হাসেন। দোকানদারকে বলেন, দুটো তুলে আন, দিয়ে দাও—যাও। গ্রামের ছেলেরাও ত ভাঙছে খাচ্ছে।

অবশেষে দোকানদারও হাসতে হাসতে যায়। গোটা ছয়েক তুলে আনে। আগুনে ভাল করে পোড়ান হয়। কোন মতেই দাম নেয় না। তাজা, গরম ভুট্টা চিবোতে চিবোতে আবার পথ চলি। কুলিও ভাগ পায়। অতি সুস্বাদু, রসাল। ক্ষুধাতৃষ্ণা দুই মেটায়। হিমালয়ে পথ চলার আনন্দ স্বাদ রসনাও গ্রহণ করে। হিমাদ্রিকে বলি, এই তো, তোমারও সাদর অভ্যর্থনাই হল দেখছি। দেশজয় নয় ভুট্টা বিজয়।

সারা চম্বায় ভুট্টাই প্রধান খাদ্য। সর্বত্রই ভুট্টার ক্ষেত। ফসল ফলেও প্রচুর। গ্রামে গ্রামে প্রতি বাড়ির ছাদে পাকা ভুট্টা শুকায়। দূর থেকে দেখে মনে হয়, সোনার পাত দিয়ে ঘরগুলি ছাওয়া! ভুট্টার আটা করে। তারই রুটি খাওয়ার সর্বত্র প্রচলন। বারোমাস এদেশের লোক এই খেয়ে কাটায়।

লাঙ্গল থেকে আরও মাইল তিনেক যাবার পর চেল্‌ড় ঘর। মাস্টারজী সাবধান করিয়ে দেন, চেল্‌ড় ঘরে বিরাট পাহাড় ধ্বসেছে, পথ বন্ধ। ওখানে পৌঁছুবার কিছু আগে, বাঁ দিকে একটা সরু পথ দেখবেন নীচে নেমে গেছে নদীর দিকে। সেই পথ ধরে নামবেন, মাইল দুই তিন ঘুরে আবার বড় রাস্তায় এসে উঠবেন।

পাহাড়ে বাঁক ঘুরে চেল্‌ড় ঘরের সেই প্রকাণ্ড ভাঙা অংশ দেখি। কে যেন খাবল মেরে পাহাড়ের বিরাট অংশ তুলে নিয়েছে।

চারিপাশে সবুজ গাছপালার মধ্যে পাহাড়ের যেন ক্ষতবিক্ষত দেহ।

বাঁ দিকের সেই সরু পথও আসে। দেখি, প্রায় পাঁচ ছয়শত ফুট নীচে ভ্যালিতে সে-পথ নেমে যায়, সেখানে গ্রামের কয়েকটা ঘরবাড়ি।

দূরে দেখি, কুলির দল রাস্তা মেরামতের কাজ করে। ভাবি, আবার নীচে অতখানি নামা, চড়াই ওঠা, মাইল তিন আরও বেশি ঘোরা,—দরকার কি? ভাঙা পথেই এগিয়ে যাই, প্রয়োজন হলে মজুরদের সাহায্য নেওয়া যাবে।

বিরাট ধ্বস। দু' এক জায়গায় খাড়া পাথর। তারই গায়ে ঝরনার জলের ধারা। কাদাগোলা ঘোলাটে জল। মজুররা নিজে থেকেই এগিয়ে আসে। হাত ধরে বিপদ্‌সঙ্কুল স্থানগুলি পার করে দেয়।

নিশ্চিন্ত মনে আবার চলতে থাকি। পথের উপর একপাল ভেড়া ছাগল। প্রকাণ্ড বড় লোম। আঁকাবাঁকা শিং। নিকটে পাথরের উপর বসে কয়েকটি গদ্দী। কোমরে সেই পাকানো দড়ি। হাতে হুঁকা।

আরও তিন মাইল গেলে দূরে দেখা দেয়—ভারমোর। প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের উপর অধিত্যকা। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। চাষের ক্ষেত। বড় বড় ঘরবাড়ি। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে গাছের সারি। দূরে শহরের পিছনে বরফের পাহাড়। মনে হয়, অতি নিকটে। শহরের উপরে পাহাড়ের গায়ে চীরগাছের বন।

হিমালয়ের নিভৃত দুর্গম অঞ্চলে রাজধানী গড়ার মতই সুন্দর পরিবেশ।

বিকাল সাড়ে চারটায় পৌঁছুই।

শহরে প্রবেশ করার মুখে ঝরনা। কয়দিন বৃষ্টির পর জলের স্রোত বেগে চলে। দূর থেকেই দেখি, রঙিন কাপড় গায়ে কে যেন এখানে ঘোরেন। কাছে এসে দেখি, ঝরনার জলের তোড় ক্ষেতের অংশ ভেঙেছে, তিন চারজন লোক ভাঙা অংশ মেরামত করার কাজে ব্যস্ত। পাশে দাঁড়িয়ে এক সাধুজী। গেরুয়াবসন। দীর্ঘ সবল দেহ। উজ্জ্বল বর্ণ। ঘুরে ঘুরে লোকগুলিকে নির্দেশ দেন, কোথায় কি করতে হবে। নিজেই হয়ত একটা পাথর সরান, কোথাও বা পাথর বসান। স্বামীজীর তত্ত্বাবধান দেখে আনন্দ পাই। সাধারণ হুকুম করা নয়, কর্তৃত্বের লেশমাত্র প্রকাশও নয়; যেন মূর্তিমান অনুপ্রেরণা।

ভারমোর মণিমহেশ তীর্থক্ষেত্রের দ্বারদেশ। ভাবি, মন্দিরের সিংহদ্বারে সাধু সন্দর্শন। সৌভাগ্যেরই নিদর্শন।

॥ ৯ ॥

এগিয়ে এসে শহরে ঢুকি। পথের পাশে সারি সারি ঘরবাড়ি। বনবিভাগ দপ্তরে খোঁজ নিই। এখানকার রেঞ্জ অফিসারের বাড়ি পাহাড়ের কিছু উপরে। সেখানে নিয়ে চলে। একতলা লম্বা বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান। দূরে বরফের পাহাড়ের পটভূমি। নীচে শহরের ঘরবাড়ি। বড় বড় দেওদার গাছের ছায়াতলে কয়েকটি মন্দির।

বাগানে চেয়ার পেতে অফিসার বিকালের পড়ন্ত রোদ পোহান। আমাদের দেখে উঠে আসেন। স্বাগত জানান। নাম, হেমরাজ সুড়। জানান, ডালহাউসির দপ্তর থেকে খবর পেয়েছেন। যাত্রার ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে, কোন চিন্তা নেই। এখন সুস্থির হয়ে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করেন।

জিজ্ঞাসা করি, ফরেস্ট বাংলো কোন্ দিকে? সেইখানে গিয়ে একেবারে বসলে হোত?

তিনি জানান, সেখানে চৌকিদারকে বলা আছে বটে, কিন্তু শহর থেকে মাইলখানেক দূরে একটু বাইরে। আমাদের আপত্তি বা অসুবিধা না থাকলে তাঁর এই বাড়িতেই থাকতে পারি। ঘর খালি পড়ে রয়েছে। তিনি এখন একাই আছেন। এখানে থাকার মস্ত সুবিধা, ছোটাছুটি করার হাঙ্গামা থাকবে না, যাত্রার সব আয়োজন এইখানে বসেই পরামর্শ করে হয়ে যাবে।

আমি জানাই, কিন্তু আপনার কোন অসুবিধে করতে চাই না। কালই সকালে যাত্রার ব্যবস্থা করিয়ে দিন। সবাই বলছে দেরি হয়েছে, ওদিকে বরফ পড়তে সুরু করেছে, যাওয়া যাবে না।

তিনি হেসে আশ্বাস দেন, পাহাড়ীরা ঐ রকমই ভয় পায় সাধারণত। কোন চিন্তা করবেন না। স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসবেন। আকাশের উত্তর-পূর্ব দিকে ফিরে তাকান। আকাশ-জোড়া বরফের পাহাড়। বিকালের পড়ন্ত রৌদ্রে ঝল্‌মল করে। সুড় বলেন, ঐ তো মণিমহেশ শিখর!—তাকিয়ে দেখি। মনে পুলক জাগে। যেন কাছে টানে। সুড় আশ্বাস দেন, বরফ কিছু গত ক'দিনে পড়েছে, তা তেমন বেশি কিছুই নয়। লোকজনের ব্যবস্থা এখনই হয়ে যাবে। কিন্তু থাকার ব্যবস্থা আমার এখানেই হোক। আমাদের অসুবিধে হওয়া ত দূরের কথা। জঙ্গলে পড়ে থাকি, আপনাদের কাছে পেলে কত আনন্দ। আসছেন কত দূর থেকে, কোথায় থাকবেন সেই বাংলোতে? ছাড়ছি না আপনাদের কোনমতেই।

তাঁর লোকজন ডাকেন। চা, খাবার আসে। আগামীকাল সকালে যাত্রার আয়োজন সেইখানে বসেই তখনই হয়েও যায়। প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে একজন ভারবাহক যাবে। বাকি জিনিস এইখানে থাকবে। তিন দিনের জন্যে নেহাত যা না হলেই নয়, তাই শুধু সঙ্গে রাখা।

সুড় বলেন, আমার ফরেস্ট গার্ডদেরও বলে দিয়েছি, তারা নিজেদের এলাকার মধ্যে প্রত্যেকে যেন আপনাদের সঙ্গে থাকে। কাল এখানকার গার্ড সঙ্গে চলবে।

এইবার নিশ্চিন্ত মনে স্থির হয়ে বসে পরিচয় সুরু হয়। জিজ্ঞাসা করেন, কোথা থেকে আসছি?

কলকাতা।

কলকাতা থেকে? এখানকার ডাক্তারসাহেবও যে বাঙালী।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, পাহাড়ীরা অনেক সময় উত্তর ভারতের বাসিন্দাকেও বাঙালী বলে ভুল করে। তাই জিজ্ঞাসা করি, উপাধি কি বলুন তো?

চ্যাটার্জি।

নিঃসন্দেহ হই। সুড় মুখ বাড়িয়ে পাহাড়ের অল্প নীচের দিকে তাকান। উল্লসিত হয়ে বলেন, ঐ ত উনি চলেছেন। ওঁর বাড়ি যে এই পাশেই।—চেঁচিয়ে ডাকেন, ডাক্তার সাহাব, ডাক্তার সাহাব—ইসারা করে জানান উপরে আসতে।

কাঁচা পাকা চুল। টক্‌টকে ফর্সা রঙ। দোহারা চেহারা। পরনে কোট, প্যান্ট। ধীরে পা ফেলে ভদ্রলোক উপরে উঠে আসেন। গম্ভীর মুখ। বাগানের গেটে ঢুকে অল্প দূর থেকেই সুড়কে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করেন, ডাকছ কেন?

চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে যাই। হাত তুলে নমস্কার করি। বলি, আসুন, আলাপ করা যাক, হিমালয়ের এত দূরে হঠাৎ বাঙালীর দেখা পাব, ভাবিনি।

তিনি অবাক হয়ে তাকান। বলেন, আরে! আপনি বাঙালী? ঘরে বসে দেখছিলাম বটে আপনাদের আসতে। আমার ধারণা হয়েছিল, পাঞ্জাবী। সুড়-এর কাছেই শুনেছিলাম, কে পার্টি আসছে মণিমহেশ যাবে বলে। বাঙলাদেশ থেকে আসছেন,—তা ত ভাবিনি। এই বয়সে দুর্গম পথে চলে এলেন? সাহস আছে ত! সঙ্গে কি একটি সঙ্গী? ক' বছর এখানে আছি, বাঙালী কাউকে এভাবে আসতে দেখিনি।

ভদ্রলোকের মুখে হাসির রেখা ফোটে। নিজেই চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন। সুড়কে বলেন, গরম চায়ের আবার অর্ডার করতে। তারপর বলেন, বলুন শুনি, কোথা থেকে আসছেন? নামটাও ত এখনও জানা হয়নি।

প্রশ্ন করি, আপনি কোথাকার তাই আগে শুনি।—সুড়-এর দিকে তাকিয়ে বলি, সুড় সাহেব, আমরা বাঙলায় যদি একটু বাত চিৎ করি, আপত্তি নেই ত?

সুড় বলেন, না, না, মনে করব কেন? আপনার দেশের লোক বলেই ত ডাকলাম।

ডাক্তার জানান, বাড়ি আর কোথায় হবে? কলকাতায় ভবানীপুরে। লেখাপড়াও ঐখানে। আপনার?

শুনে সংশয়ে পড়ি। পথে নিজের পরিচয় সহজে কাউকে দিতে চাই না, দেবার প্রয়োজনও দেখি না। তবু, নামটা বলতেই হয়। ডাক্তার চিনে ফেলেন। আনন্দিত হয়ে বলেন, দেখুন অদ্ভুত যোগাযোগ! দুজনের অত কাছাকাছি বাড়ি, অথচ কলকাতায় কখনও পরিচয় হল না— হল কোথায়? হিমালয়ের এই নির্জন, সুদূর, দুর্গম অঞ্চলে।

সুড় আশ্চর্য হয়ে তাকান। বলেন, ডাক্তারসাহেবের মুখে এই প্রথম হাসি দেখছি। আগে জানাশুনা ছিল নাকি?

তারপর হেসে বলেন, দেখুন ত ডাক্তারসাহেব সম্বন্ধে কোন কিছু বার করতে পারেন কিনা। পাশাপাশি এখানে থাকি। রোজই দেখা হয়। এত জানাশুনা, তবু বাড়িতে একবারও ডাকেন না, যেতে চাইলেও দেন না। নিজে চলে আসেন—এইখানে আমার ঘরে। একা থাকেন, কি করেন কে জানে! কখনও কলকাতায় যান না, এখানে ওঁর কাউকে আসতে দেখি না,—অথচ ক'বছর হয়ে গেল এখানে রয়েছেন। এখানেও লোকজনের সঙ্গে মেশামেশি করেন না, এক আমার সঙ্গেই যা একটু ভাব, কিন্তু তাও ত নিজের সম্বন্ধে আমাকেও কিছু জানতে দেন না।

গম্ভীর প্রকৃতির লোক হলেও ডাক্তারের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে, হাসিঠাট্টাও চলে। সুড় দেখে আরও আশ্চর্য হন। ডাক্তার বলেন, দেখুন তো মশাই! নিজের সম্বন্ধে আবার কাকে কি শোনাব? বলবার আছেই বা কি? চাকরি নিয়ে চলে এসেছি এখানে—এই দূরে। দিন কেটে যাচ্ছে মন্দ কি? নিরিবিলি জায়গা, কোন হাঙ্গামা হুজুগ নেই, নিজের কাজ করে যাই। মাসে মাসে বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠানো,—তাও ঠিকমত পাঠাই। আবার কি? এখানে এত দূরে কারও আসা কি সহজ কথা? এলেও তাদের থাকাও তো সম্ভব হবে না—ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া রয়েছে। গত বছর একবার দিল্লী যেতে হয়, সেই সময়ে সেখানে তারাও আসে, দেখাও হয়।—ছেড়ে দিন ও-সব কথা। মণিমহেশ যাত্রার কি ব্যবস্থা হচ্ছে শুনি। সুড় সাহেব, একজন হুঁসিয়ার লোক সঙ্গে দিচ্ছ নিশ্চয়?

সুড় সব ব্যবস্থার কথা জানান। ডাক্তার ও সুড়-এর কাছে ভারমোর ও মণিমহেশের নানান গল্প শুনি।

॥ ১০ ॥

সুড় বলেন, চলুন, নীচে শহরে যাব এখনই নাগাবাবার কাছে। আপনারাও দর্শন করে আসবেন। বিরাট যোগী।

জিজ্ঞাসা করি, এক স্বামীজীকে দেখলাম শহরে ঢোকবার মুখেই। তিনি অবশ্য নাগা নন, গেরুয়াধারী।

সব শুনে সুড় বলেন, তাহলে তাঁকেই দেখেছেন। তিনিই ত এখানকার—শুধু ভারমোর কেন, সারা চম্বার প্রাণ। গত ক'দিনের বর্ষায় হয়ত কারও ক্ষেতের জমি ভেঙে পড়েছে, খবর পেয়েই নিশ্চয়ই গেছেন লোকজন নিয়ে সাহায্য করতে। তারপর গল্প শুনি স্বামীজীর। যোগী শ্রীশ্রীজয়কিষণ গিরি মহারাজ। এখানে লোকে বলে, নাগা বাবা। বয়স কত কেউ বলতে পারে না। হিমালয়ের তুষার-রাজ্যে বহুকাল কঠোর তপস্যা করেন। তখন বিবস্ত্র অবস্থাতেই থাকতেন। তারপর এই ভারমোরে আসন নেন। প্রায় ষাট বছর এইখানেই আছেন। লোকালয়ে থাকলে সামান্য বস্ত্রখণ্ড বা কৌপীন ব্যবহার করেন। সারা বছর বরফ গলা জলে স্নান করেন,—শীতের সময় চারিপাশ বরফে ঘিরে থাকলেও। অসীম শক্তিশালী, তেজস্বী পুরুষ। সারা চম্বাতে এমন কেউ নেই যে, তাঁর নাম শোনেনি। সকলেই দেবতার মত ভক্তিশ্রদ্ধা করে। ছোট বড় সব কাজেই তাঁর পরামর্শ নেয়, আশীর্বাদ চায়। নিজের যোগ সাধনায় দিন রাত্রি কাটালেও মানুষের বিপদে আপদে প্রয়োজন হলেই নিজে থেকে এগিয়ে আসেন, সাহায্য করেন। লোকে বলে চম্বা রাজ্যে ঘাসের সামান্য শিষ পর্যন্ত নড়ে না, তাঁর নির্দেশ না পেলে। সুড় বলেন, আজ ঐ মাঠে সামান্য মেরামতের কাজ আর কী দেখলেন? চম্বার ও ভারমোরের যা কিছু উন্নতি সবই নাগাবাবার জন্যে। সংস্কারের অভাবে ভারমোরে প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হতে বসে, মেরামত করান, আবার শ্রী ফিরে আসে। মণিমহেশের যাত্রীরা এসে আশ্রয় পায় না, থাকবার ব্যবস্থা নেই,—ধর্মশালা ওঠে। পাহাড়ের দুর্গম রাজ্যে লোক চলাচলের অশেষ কষ্ট, প্রাণহানির আশঙ্কা,—যাত্রাপথ তৈরি হয়। ছেলেদের লেখাপড়া হয় না, স্কুল বসে। জলের অভাব ঘোচাতে পাহাড়ের মাথায় ঝরণার মুখে নল বসে, জল আনার ব্যবস্থা

হয়। রোগীর চিকিৎসা হয় না, হাসপাতাল খোলেন। মণিমহেশ যাত্রীদের নানা রকম অসুবিধা, কোনই বিধিব্যবস্থা নেই, অথচ পুণ্যকামী যাত্রীদের ভিড় হয়, সাধু সন্ন্যাসী অনেক ত আসেনই। প্রতি বছর যাত্রার সব কিছু আয়োজন ইনি করিয়ে দেন। এ-সব কাজ করতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। কোথা থেকে আসে, কি করে এত বড় বড় কাজ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে হয়ে যায়,—সবাই অবাক হয়ে দেখে। চম্বাবাসী এঁকে নামেই শুধু নাগাবাবা বলে না, মনেপ্রাণে নিজের পিতা বলে মানে, ভক্তি করে, ভালবাসে, সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে সব সময়েই চরণে আশ্রয় নেয়। তিনিও যেন বুকে করে ধরেন। এমন কঠিন কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত, তবু কী গভীর স্নেহ-ভালবাসা। চলুন দেখবেন গিয়ে।

কথামৃত শুনি। মন আনন্দে ভরে ওঠে। ভাবি কিছুই ত জানা ছিল না এঁর সম্বন্ধে। অথচ, দূর থেকেই আজ প্রথম দর্শনেই তাঁর মঙ্গলময় আলোর স্নিগ্ধ স্পর্শ অজানিতভাবেই অনুভূত হয় কেমন করে।

সুড় বলে চলেন, সারা চম্বাতে নাগাবাবার কী বিরাট প্রভাব, তার বহু ঘটনা বলতে পারি। একটা ছোট ঘটনা শোনাই। সাধারণ লোকের কথা ছেড়ে দিন, চম্বার স্বাধীন রাজা, এমন কি বড় বড় ইংরেজ অফিসাররাও এখানে এসে এঁর দর্শন করে যেতেন, পায়ের ধূলা নিতেন। নিজেদের বড় বড় কাজেও পরামর্শ চাইতেন। একবার ভারমোরে মদের একটা দোকান খোলার অনুমতি পায় এক বড় ব্যবসাদার। জায়গাও ঠিক হয়। ঐখানে মন্দিরগুলির নিকটে। সেইখানেই ত লোকদের বসতি, সকাল সন্ধ্যায় মেলামেশা। দোকান খোলা নিয়ে পাহাড়ীদেরও মহা উৎসাহ। অথচ স্থানীয় জনকয়েক ভাল লোকের আপত্তি। ওদিকে গভর্নমেন্ট সদর দপ্তরে ব্যবসাদাবটির প্রবল প্রভাব। অর্থবল ত আছেই। তাই কোন আপত্তি টেকে না। তিনি বুক ফুলিয়ে এখানে দোকান খোলার আয়োজন করেন। দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাতও দেখা দেয়। অগত্যা সাহেব কমিশনার নিজেই চলে আসেন এখানে অনুসন্ধানে। এসেই জিজ্ঞাসা করেন, নাগাবাবা কোথায়? সোজা তাঁর কাছে যান। সব ঘটনা বলেন। নাগাবাবা শুনে অভিমত জানান, নেহাত দোকান যদি খুলতেই দাও, মন্দিরের কাছে ত নয়ই, বাজারের মধ্যেও নয়—শহরের একদম বাইরে।

সাহেব আর কাউকে কিছু না জিজ্ঞাসা করে তখনই সেইমত অর্ডার দিয়ে ফিরে যান। বলেন, নাগাবাবার আদেশ। তার ওপর আর কারও কোন কথাই চলতে পারে না।—অথচ, খাস সাহেব কমিশনার! এখন মদের দোকান পাঁচ মাইল দূরে।

ডাক্তার গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে ছিলেন, এইবার কথা বলেন, আশ্চর্য দেশ, মশাই, এসব। আমাদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে এদের নাগাল পাওয়া যায় না। নাগাবাবা ত অসীম শক্তিশালী পুরুষ বটেই, এদেশের রাজাও বলা চলে। কিন্তু সাধারণ ঘটনাও যে-সব ঘটে দেখি, তার কার্য-কারণ ধরতে পারি না। তাই, এখন এ-সবে বিশ্বাসও করতে সুরু করেছি। আপনারা এলেন মণিমহেশ যাত্রায় অসময়ে। এই ক'দিন আগে রাধাষ্টমী তিথিতে যাত্রা হয়ে গেল। জন্মাষ্টমীতে হয় শুরু, রাধাষ্টমীতে শেষ। সে সময়ে এলে আরও কত কী দেখতেন।

আমি জানাই, ভিড়ের মধ্যে আমার ভাল লাগে না, তাই ইচ্ছে করে যাত্রার সময় এড়িয়ে সব জায়গায় যেতে চেষ্টা করি।

ডাক্তার স্বীকার করেন, সুস্থির হয়ে একান্তে দর্শন করতে হলে তাই করতে হয়। কিন্তু যাত্রার সময় কি রকম অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে, আমার নিজের যা দেখা তাই বলি শুনুন। যাত্রীরা সকলে এইখানে ভারমোরে জমায়েত হয়। সে-সময়ে ক'দিন ধরে যাত্রার আনুষঙ্গিক যেমন হয়ে থাকে নাচ গান উৎসব হৈ হট্টগোল চলতে থাকে, সে-সব কথা ছেড়ে দিন। এই নাগাবাবাকে ঘিরেই সব কিছু আয়োজন, কোথায় কি করতে হবে, না হবে,—পুঙ্খানুপুঙ্খ আদেশ সব তিনিই দেন। যাত্রা করার ক'দিন আগে থেকে অনুষ্ঠানাদি সুরু হয়। পূজাদি চলে। একজনের ওপর তখন দেবতার ভর হয়,—বলা হয় চেলা নাচানো। সহজ সাধারণ মানুষ, সম্পূর্ণ বদলে যায় দেবতা তার মধ্যে আবির্ভাব করার পরই। মূর্ছা হয়, তারপর ফুলতে থাকে, উঠে নাচতে সুরু করে, ভিন্ন স্বরে কথা বলে,—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সেই দেবতার কাছ থেকে তখন সব যাত্রীদের একে একে অনুমতি নিতে হয়, যাত্রায় কে যাবে, না যাবে। 'না' বললে যাবার আর উপায় নেই। প্রথম যখন এখানে আসি, এই সব নিয়ম-কানুন প্রথা শুনি। আমার এখানে থাকা, সরকারী ডাক্তার হিসাবে। যাত্রাতেও যেতে হবে 'ডিউটি'তে। তাই যাওয়া না-যাওয়ার অনুমতি চাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবু প্রথা অনুযায়ী যাত্রীদের সঙ্গে দাঁড়াতে হয়। দেবতা দেখে বলে ওঠেন, ওর

যাওয়া হবে না। শুনে মনে মনে হাসি! আমার যাওয়া আবার আটকায় কে? সব ব্যবস্থা করি যাওয়ার। যাত্রার আগের দিন। এইখানে পথ দিয়ে চলেছি। হঠাৎ পা মচকে এমনভাবে পড়ি, আর দাঁড়াবার উপায় নেই। পায়ের হাড় ভাঙে। যাওয়া তখন মাথায় ওঠে। ক'মাস প্লাস্টার করে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকা। —বিশ্বাস না করে উপায় কি বলুন? পবের বছর অনুমতি পাই, যাত্রা দর্শন সবই ভালভাবে হয়।

সুড় বলেন, কেন, গতবারের ঘটনাটা শোনান।

ডাক্তার বলেন, সে-ও এক ব্যাপার। নিজের চোখের ওপর না ঘটলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। চেলা-নাচানো যথারীতি চলেছে। একজন দেবতার কাছে জানতে চান—এবারকার যাত্রা কেমন হবে?—দেবতা উত্তর দেন মোটের ওপর ভালই। তবে চারজনের মৃত্যু আছে।—আশ্চর্য! ঘটলোও তাই। হঠাৎ পথে 'ল্যান্ডস্লাইড', ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে। হৈ-চৈ! লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক। কয়েকজনের আঘাতও লাগে, এবং মৃত্যুও ঘটে— তিনজনেরও না, পাঁচজনেরও নয়, ঠিক চারজনেরই!

বলি, আশ্চর্য হবার কথাই বইকি।

সুড় বলেন, মণিমহেশের গল্প জানেন তো? নাগাবাবার কাছে শোনা। আপনারাও তাঁর মুখে শুনবেন নিশ্চয়। কাশ্মীরে মুসলমানদের ঘোর অত্যাচার দেখে অমরনাথ এইখানে চলে আসেন। নতুন নাম নেন—মণিমহেশ। হিমালয়ের তুষার-রাজ্যে থাকেন। লোকে সন্ধান পায় না। একবার এক গদ্দী ভেড়া চরাতে ঐদিকের পাহাড়ে গিয়ে হাজির। শিবের নিজের পছন্দ করা নতুন কৈলাস, অপরূপ তার প্রাকৃতিক শোভা। গদ্দী দেখে তন্ময় হয়। মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখতে থাকে। হঠাৎ আকাশবাণী শোনে, কে যেন জিজ্ঞাসা করেন, এদিকে কোথায় চলেছিস, তোর কি চাই? চমকে উঠে গদ্দী চারপাশ দেখতে থাকে, মানুষও নেই, অথচ কথা বলে কে?—হঠাৎ সুমুখে এসে দাঁড়ান জটাজূটধারী এক বিরাট পুরুষ। আবার গদ্দীকে প্রশ্ন করেন, সে কি চায়।—গদ্দী হতভম্ব হয়ে যায়। বলে ফেলে, এক হাজার ভেড়া। সেই মহাপুরুষ তখনই বলেন, তথাস্তু। তাই পাবি। কিন্তু দেখিস, কখনও কাউকে এ-সম্পর্কে কিছু বলবি না। বললে আর আমার দেখা কখনও পাবি না।—মহানন্দে গদ্দী ফিরে চলে। এসে দেখে তার হাজার ভেড়া হয়েছে। কিন্তু, এ কী! তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, অথচ তার ভেড়ার দিকে আর কোনই আকর্ষণ নেই। তাদের দিকে তাকায় না, যত্ন নেয় না। সব সময়ে উন্মনা ভাব। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। একদিন এক মহাত্মা আসেন মণিমহেশ দর্শনে। পথ খুঁজে পান না। গদ্দীকে দেখে পথের সন্ধান করেন। গদ্দী বলতে রাজী হয় না। বহু অনুরোধের পর সঙ্গে নিয়ে দেখাতে চলে। তার ভেড়ার পাল ও একটা কুকুরও তাদের সঙ্গ নেয়। পাহাড়ের অর্ধেকের ওপর ওঠবার পরে হঠাৎ দৈববাণী হয়, আমার নিষেধ সত্ত্বেও এদের পথ দেখিয়ে আনছিস? থাক তুই ঐখানে।—গদ্দী না পারে এগোতে, না পারে পেছুতে। ভয়ে একে একে মণিমহেশের উদ্দেশে ভেড়াগুলি বলি দিতে থাকে। দুটো ভেড়া অবশিষ্ট থাকতে আবার বাণী শোনে, যেমন আছিস তোরা, তেমনি পাথর হয়ে ঐখানে থাক।—সেই থেকে গদ্দী, দুই ভেড়া, কুকুর ও মহাত্মা পাথর হয়ে ঐখানে আছেন। একটা সাপ ও একটা কাক অজানিতভাবে তাদের সঙ্গে আসে। তারাও পাথরে পরিণত হয়। এর পর থেকে গদ্দীরা মেলার সময় হাজার হাজার ভেড়া মণিমহেশের উদ্দেশে হ্রদের ধারে বলি দিতে থাকে। আপনাদের সঙ্গে যে ফরেস্ট গার্ড থাকবে সেই দেখাবে সেইসব পাথরের মূর্তি। ভেড়ার শিঙ ত দেখতেই পাবেন হ্রদের তীরে ছড়িয়ে আছে।—কিন্তু, আর দেরি নয়, নীচে চলুন। নাগাবাবার দর্শন করবেন, রোজ বিকেলে আমরা সবাই তাঁর কাছে গিয়ে বসি। চমৎকার সময় কাটে। মনও শান্তিতে ভরে থাকে।—আপনারা যখন কাল সকালেই যাত্রা করছেন, শহরও আজ ঘুরে দেখে নিন।

ডাক্তার চেয়ার থেকে ওঠেন। নিজের কাজে যান। বলেন, পরে আবার দেখা হবে।

সুড় বলেন, ডাক্তার সাহেব, রাত্রে আজ সবাই একসঙ্গে আহার করা যাবে। কোন আপত্তি শুনছি না, আসতেই হবে।

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলেন, দেখা যাবে।

পরে, রাত্রে আসেন বটে, কিন্তু খান না।

॥ ১১ ॥

সুডের বাংলো থেকে পাহাড়ের প্রায় দুশো ফুট নীচে ভারমোর গ্রামের কেন্দ্র। ব্রাহ্মণীর অরণ্যমধ্যে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখা যেন এক মহামূল্য প্রাচীন রত্ন।

পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে ঘরবাড়ি। পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরি। স্লেট পাথরে ঢাকা ছাদ। নীচে নেমে এসে এক ভিন্ন রাজ্য। ৭০০৭ ফুট উঁচুতে পাহাড়ের কোল জুড়ে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ। বিশাল বৃদ্ধ দেওদার-এর নিবিড় ঘন ছায়া। তারই আলো-আঁধারে এখানে-ওখানে ছড়ানো মন্দির। স্থাপত্য শিল্পকলার উজ্জ্বল উদাহরণ। যেন, তপোবনের তরুচ্ছায়ায় দীর্ঘ-দেহী প্রশান্ত মূর্তি যোগিগণ ধ্যানে মগ্ন। উন্নতশির, স্থির, নিশ্চল, চির মহামৌনী। নির্মল পরিচ্ছন্ন আবেষ্টন। মন্দিরগুলির একপাশে কয়েকটি দোকান। বসবাসের ঘরবাড়িও। গ্রামের এই কেন্দ্রের নাম শুনি—চৌরাশী। নামকরণ সম্পর্কে জনপ্রবাদও আছে।

ব্রাহ্মণীদেবীর বাটিকা ছিল এই অঞ্চলে। পাহাড়ের অনেকখানি উপরে এখন যেখানে তাঁর মন্দির, সেইখানে তিনি থাকতেন। ব্রাহ্মণীনালার উৎসমুখের নিকটে। দেবীর এক পুত্র ছিল। তার পোষা চকোর পাখিটিকে গ্রামের এক কৃষক মেরে ফেলে। শোকে অভিভূত হয়ে বালকের মৃত্যু ঘটে। তার চিতানলে জননী ব্রাহ্মণীও নিজের প্রাণ বিসর্জন করেন। তারপর থেকে গ্রামবাসিদের উপর সেই মৃত জননীর ও চকোরের প্রেতাত্মার উপদ্রব সুরু হয়। গ্রামের লোকেরা ভয় পায়। 'দেবী' বলে তাঁর পূজা দেয়। ঐ মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করে। কিছুকাল পরে মহাদেব ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষদের সঙ্গে নিয়ে মণিমহেশ যাত্রায় আসেন। বাটিকার নিকটে আশ্রয় নেন। ধুনি জ্বেলে বিশ্রাম করেন। ব্রাহ্মণীদেবী তাঁর এলাকার মধ্যে এই অনধিকার প্রবেশ দেখে কুপিতা হন। বিরাট রূপ ধারণ করে তাঁদের সামনে প্রকট হন। শিবকে তখনই আস্তানা গুটিয়ে চলে যাবার আদেশ করেন। ভোলানাথ সবিনয়ে অনুমতি চান, রাতটুকু শুধু কাটিয়ে যাবেন। সম্মতি দিয়ে দেবী নিজ মন্দিরে যান। ভোর হলে দেখা যায়, সেই ৮৪ জন সিদ্ধপুরুষ লিঙ্গমূর্তি পরিগ্রহ করে অধিষ্ঠান করছেন। সেই থেকেই এই ক্ষেত্রের নাম হয়ে যায় চৌরাশী। এখনও ৮৪টি ছোট বড় মন্দির ওখানে দেখা যায়।

শিব কিন্তু ব্রাহ্মণীদেবীকে বর দেন, মণিমহেশের সব তীর্থযাত্রী প্রথমে ব্রাহ্মণী-ধারায় স্নান করবে, ব্রাহ্মণীদেবীর পূজা দেবে, না হলে তীর্থফল পাবে না।

এই অঞ্চলের সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রাহ্মণীর নাম থেকেই ব্রহ্মপুর ও ক্রমে ভারমোর নামেরও উৎপত্তি।

পাহাড়ের উপর ব্রাহ্মণীনালার ধারা থেকে নল বসিয়ে ভারমোরের জল সরবরাহ হয়। সারা বছরই জলের প্রবাহ বইতে থাকে। এখন সেই স্রোত থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের আয়োজন চলে শুনি।

সুডকে হিমাদ্রি প্রশ্ন করে, দেবীর অনুমতি নিয়েছেন তো?

চৌরাশীর চত্বরে এসে দাঁড়াই। ঘুরে ঘুরে মন্দিরগুলি দেখি।

এ তো হিমালয়ের নিভৃত দুর্গম অরণ্যময় অঞ্চলের রোমাঞ্চিত আবেদন নয়। এ যেন ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির গ্রন্থশালার কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে দেখা চিত্রবিচিত্র এক অমূল্য পুঁথি। প্রস্তরফলকে লেখা শিলালিপি, নিপুণ শিল্পীর হাতে-গড়া প্রস্তর ও দারুময় মন্দির। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য। চম্বার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে এই লিখনগুলি সাহায্য করে। এ ছাড়া, "চম্বা বংশাবলী"তে ও কুলুর ইতিহাসে মরু বা জয়স্তম্ভের স্থাপিত রাজবংশের অনেক নৃপতিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুদীর্ঘ এই রাজবংশের ধারা। চম্বা শহরে দশম শতকে নতুন রাজধানী স্থাপনার পূর্বে অন্তত তিন চার শ' বছর ধরে এই ভারমোর থেকে রাজ্য শাসন করতেন চম্বার রাজারা। প্রায় দেড় হাজার বছর ব্যাপী এই রাজবংশের ইতিহাস। জগতের আর কোন ইতিহাসে একই রাজবংশের এমন সুদীর্ঘ জীবন ছিল কিনা জানি না। ইউরোপে অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ (Hapsburg) রাজবংশ ৬০০ বছর স্থায়ী ছিল।

তাম্র ও শিলালিপি রচিত বংশাবলী, রাজ-প্রশস্তি-বচন ও জনপ্রবাদ,—সব মিলে ভারমোরের যে পুরানো কাহিনী গাঁথে, আজ এই তপোবনের সভাতলে দাঁড়িয়ে মন্দিরগুলি যেন তারই আবৃত্তি শোনায়।

প্রাচীন রাজাদের মধ্যে ৬২০ খ্রীস্টাব্দে আদিত্যবর্মণ বা আদিবর্মণ রাজ্যভার পান। তিনিই প্রথম 'বর্মণ' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু এই বংশের প্রথম যে রাজার নাম ও কীর্তি বিপুল খ্যাতিলাভ করে, তিনি আসেন ৬৮০ খ্রীস্টাব্দে। নাম তাঁর মেরুবর্মণ। যুদ্ধ জয় করে তাঁর রাজ্যসীমা তিনি সুদূর প্রসারিত করলেও তাঁর স্থায়ী কীর্তি রেখে যান—এই ভারমোরে কয়েকটি অপরূপ মন্দির। দীর্ঘকাল পরেও এখনও সেই মন্দিরগুলি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মণিমহেশ বা হরিহর, লক্ষ্মণাদেবী, গণেশ ও নরসিংহদেব—এই মন্দিরগুলি তাঁরই আমলের। মণিমহেশ মন্দিরের সামনে পিতলের জীবন্ত প্রমাণ প্রকাণ্ড বৃষমূর্তি,—তাতে শিলালিপিও আছে। সূর্যমুখ মন্দিরও তাঁরই সময়ের বলে প্রচার। চম্বার রাজা কেউ ভারমোরে এলে প্রথমে এই সূর্যমুখ মন্দিরে পূজা করে তবে প্রাসাদে উঠতেন—এই প্রথা ছিল। লক্ষ্মণাদেবীর মন্দির ছাড়া অন্য মন্দিরগুলি ও কয়েকটি মূর্তি বিদেশী আক্রমণকারী 'কিরা' দলের অত্যাচারে কিছু কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শিলালিপিতে এই মন্দিরগুলি নির্মাণের শিল্পীগুরুর নামেরও উল্লেখ আছে—গুগা। দেবালয়গুলির সৌন্দর্যই তাঁর একমাত্র পরিচয়, অন্য কোন পরিচয় তাঁর জানা নেই। ভগবতী লক্ষ্মণাদেবীর মন্দিরের সুমুখভাগে কাঠের উপর কারুকার্য অতীব মনোহর। গণেশের মন্দিরে গজাননের অষ্টধাতুর মূর্তি। এ ছাড়া চতুর্দিকেই শিব-মন্দির। একটি বাঁধানো কুণ্ডও আছে। প্রবাদ, একদিন শিবপার্বতী গণেশকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করছেন। হঠাৎ পার্বতীর মনে পড়ে, সেদিন গয়ার তীর্থ জলে স্নানের পুণ্যতিথি। গয়ায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু এখনই আবার হিমালয় ছেড়ে গয়াযাত্রা! শিব সম্মত হন না। পার্বতী বিমর্ষ হন। মাতৃভক্ত গণেশ তখনই ভূমিতে শরনিক্ষেপ করেন। সপ্তধারায় জল নির্গত হয়। ভারতের সকল পবিত্র নদ-নদীর বারিধারা দিয়ে এই কুণ্ডের সৃষ্টি হয়। নামও হয়ে যায়—অর্ধগয়া।

এই সকল মন্দিরের বিস্তারিত বর্ণনা Hermann Goetz-এর Early Wooden Temples of Chamba-তে দেওয়া আছে।

৭৬০ খ্রীস্টাব্দে রাজা হন অজিয়বর্মণ। কারও-কারও বিশ্বাস, এঁরই রাজত্বকালে দিল্লী অঞ্চল থেকে যে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতরা এখানে আসেন তাঁরাই গদ্দীদের পূর্বপুরুষ।

৮২০ খ্রীস্টাব্দে রাজা হলেন মুষণবর্মণ। এর জীবন ইতিহাস ঘটনা-বৈচিত্র্যময়। অষ্টমশতকের শেষভাগে এঁর পিতা লক্ষ্মীবর্মণ কিছুকালের জন্য রাজা হন। কিন্তু বিদেশী 'কিরা' আক্রমণকারীগণ তাঁকে হত্যা করে রাজ্য অপহরণ করে। মুষণবর্মণ তখন মাতৃগর্ভে। রানীকে পালকির মধ্যে নিয়ে ওয়াজীর ও রাজপুরোহিত কাংড়া অভিমুখে পালিয়ে চলেন। পথিমধ্যে গর্ভযন্ত্রণায় কাতর হয়ে রানী এক গুহায় আশ্রয় নেন ও সন্তান প্রসব করেন। শত্রুদের হাতে প্রাণনাশের আশঙ্কায় সন্তানকে গুহায় ফেলে রেখে ফিরে আসেন। ওয়াজীর ও পুরোহিত প্রশ্ন করে ঘটনা জানতে পারেন। গুহায় গিয়ে দেখেন অনেকগুলি মূষিক রাজপুত্রকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে। শিশুটিকে তুলে নিয়ে তাঁরা চলে আসেন। এই কারণেই তাঁর নামকরণও হয় মুষণবর্মণ। পরে রানী ও পুত্র কাংড়ায় এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং সেই ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করেন। একদিন হঠাৎ সেই বালকের পদচিহ্ন চোখে পড়ায় ব্রাহ্মণ বিস্মিত হয়ে দেখেন রাজপদচিহ্নের লক্ষণ। রানীকে প্রশ্ন করেন। প্রকৃত বৃত্তান্তও অবগত হন। সুকেতের রাজার কাছে গিয়ে সব কথা জানান। সেই থেকে সুকেত রাজপরিবারে তাঁরা আশ্রয় পান। পরে সুকেত রাজকুমারীর সঙ্গে মুষণবর্মণের বিবাহ হয় এবং সৈন্যবল সংগ্রহ করে আবার ব্রহ্মপুর—ভারমোরে এসে তাঁর নিজের রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। মুষণবর্মণ রাজ্যভার ফিরে পাবার পর তাঁর রাজ্যকালের আর কোন ঘটনা জানা যায় না বটে, তবে তাঁর রাজ্য হবার পর থেকেই তাঁর রাজ্যে মূষিক হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয় এবং চম্বা রাজবংশে আধুনিককালেও সেই নিয়ম মেনে চলা হোত। প্রাসাদে বা আবাসস্থলে মূষিক দেখলেও মারা নিষেধ।

মনে পড়ে, রাজস্থানে বিকানীর জেলায় দেশনোকগ্রাম। সেখানে করনীমাতার প্রসিদ্ধ সুবিশাল মন্দির। শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায় মূষিকের দল,—চত্বরে, গর্ভগৃহে চতুর্দিকে। অথচ ইঁদুর মারা নিষেধ। যাত্রীদের পায়ের উপর দিয়ে ইঁদুর চলে যায়। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আধো অন্ধকারে অতি সাবধানে পা টেনে টেনে চলতে হয়,—পাছে অজানিত ভাবে পায়ের ভারে কোন মূষিকের প্রাণনাশ ঘটে।

জানি না, এই দুই বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা।

৯২০ খ্রীস্টাব্দে রাজা হন সহিলবর্মণ। চম্বার ইতিহাসে ইনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এঁরই রাজত্বকালে ভারমোর থেকে রাজধানী উঠিয়ে চম্বা শহরে স্থাপিত হয়। তাঁর কন্যা চম্বাদেবীর ও অন্যান্য আরও কয়েকটি প্রচলিত কাহিনী পূর্বেই বলেছি। তিনি বহু যুদ্ধে জয়ী হন। চম্বা রাজ্যের সীমানাও বিস্তৃত হয়। সহিলবর্মণের যুদ্ধ অভিযানে নিত্যসঙ্গী থাকতেন চর্পটনাথ নামে এক যোগী। রাজ্যপরিচালনায় ও নতুন রাজধানী স্থাপনার সকল কার্যেও সহায়ক ও উপদেষ্টা ছিলেন সেই যোগী। চম্বা সহরে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের নিকটে চর্পটনাথেরও এক মন্দির পরে স্থাপিত হয়। সহিলবর্মণ যে মুদ্রার প্রচলন করেন তাতেও এই যোগীর প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়।

সহিলবর্মণ পুত্র যুগাকরের হাতে রাজ্যভার দিয়ে আবার এই ভারমোরেই ফিরে আসেন ও এইখানেই চর্পটনাথ ও অন্যান্য যোগীদের সঙ্গে সন্ন্যাসজীবন যাপন করেন।

ভাবি, ভারমোরেরও কি বিচিত্র পরিণতি! রাজার এককালীন রাজধানী, আবার সিংহাসনত্যাগী সেই রাজারই সন্ন্যাসজীবনের যোগাশ্রম।

ভারমোরে রাজাদের প্রাচীন প্রাসাদ এখন নিশ্চিহ্ন। চৌরাশীর অল্প উপরে এক ময়দান—চৌগান। সেইখানেই প্রাসাদ ছিল বলে প্রচার।

চৌরাশীর প্রাঙ্গণে পুরানো কয়েকটা বাড়িতে এখন সরকারী দপ্তর বসে। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে সে-গৃহগুলিরও জীর্ণ অবস্থা। নতুন সরকারী ঘরবাড়ি এখন তৈরি হচ্ছে। সহর-সভ্যতারও অনুপ্রবেশ ঘটছে। এখন লোকসংখ্যা ৭২০। পুরুষ ৩৮১, মহিলা ৩৩৯।

॥ ১২ ॥

নরসিংহদেবের মন্দির সংলগ্ন নাগাবাবার আশ্রম। তিনিই এখন এই নির্বাপিতপ্রায় দেবস্থানের যেন শেষ জ্যোতি।

সুড খবর নিয়ে আসেন, 'বাবা' এইমাত্র দর্শন দেওয়া শেষ করে অন্দরে গেছেন, আপন সান্ধ্যক্রিয়াদিতে বসতে।

মনে মনে প্রণাম জানাই। বলি, কাল সকালে যাত্রার আগেও বোধহয় দর্শনের সময় থাকবে না। ফিরে এসে নিশ্চয় দর্শন মিলবে।

নিকটেই পুরানো কয়েকটি বাড়ি। জীর্ণ ম্লান অবস্থা। এখন সেখানে সরকারী তহশীলখানা ও ডাকঘর। রাজার পান্থশালায় এখন হাইস্কুল বসে। প্রাচীন গরিমা ও স্থাপত্য-সৌন্দর্য আধুনিককালের প্রয়োজনীয়তার যূপকাষ্ঠে প্রাণ হারায়।

ভারমোরের প্রধান মন্দির কিন্তু এখানে নয়। সহর থেকে দূরে পাহাড়ের বেশ খানিক উপরে। ব্রাহ্মণীদেবীর অতি প্রাচীন মন্দির। সেখান থেকেই জলের ধারা নীচে সহরে নেমে আসে। ভারমোরের প্রাচীন নাম ব্রহ্মপুর। এই ব্রাহ্মণীদেবীর নাম থেকে নামকরণ।

ব্রহ্মপুর লোকমুখে ভারমোর হয়।

ঘুরে ঘুরে প্রাচীন তীর্থগুলি দেখি।

নাগাবাবার এখন দর্শন না পাওয়ায় মনে দুঃখ থাকে না। ভাবি, সহরে প্রবেশ করার সময় অজানিত ও অযাচিত দর্শনে, কেন জানি না, মন তখনই শ্রদ্ধায় নত হয়েছিল। আবার যথাসময়ে নিশ্চয় দেখা হবে।

হয়ও তাই। তিনদিন পরে। মণিমহেশ যাত্রা শেষ করে এসে। তাঁর দর্শন যেন মণিমহেশ তীর্থযাত্রার এক অভিন্ন অংশ। সেদিন বিকালে সময়মত যাই। সুডই নিয়ে চলেন। ছোট হলঘরের মত চালা সাজান গোছান কিছু নয়। কিন্তু পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। পাথর বসানো ও মাটি-নিকানো মেঝে। আসবাবপত্র নয়,—আসন ও কম্বল বিছানো। ঘরে ঢুকেই মনে হয় শূন্য ঘর, কিন্তু অদৃশ্য কীসে যে পূর্ণ হয়ে আছে। নাগাবাবা সামনে বসে। গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। মাথা দাড়ি গোঁফ সব কামানো। দেহের উজ্জ্বল বর্ণ। চোখের প্রখর দীপ্তি, যেন আলো ঠিকরে আসে। অথচ, মুখের দিকে চেয়ে যখন কথা বলেন, সুস্নিগ্ধ কোমল দৃষ্টি। মনে হয়, অন্তর থেকে স্নেহের ধারা ঝরে পড়ে। সেই ধারাস্নানে শ্রোতার দেহ-মন নির্মল পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে। স্থির হয়ে তাঁর কথাগুলি শুনি। বিদ্যাবত্তার প্রকাশ নয়। চিরন্তন ধর্মের মূল

কথা,—তারই সহজ সরল ব্যাখ্যা। শুনতে প্রাণে আনন্দ জাগে।

প্রসাদ বিতরণে নাগাবাবার মহা উৎসাহ। যে যায়, তাকে বসিয়ে ভূরিভোজন করান। বিশুদ্ধ ঘি দিয়ে তৈরি হালুয়া, কিস্‌মিস্ বাদাম দেওয়া। অপূর্ব স্বাদ। অফুরন্তও তাঁর ভাণ্ডার। শুনি, যত দর্শনপ্রার্থীই আসুক, প্রসাদ বিতরণ চলতেই থাকে। গেলাস ভরা চাও আসে। চা ত নয়, যেন সে-ও এক সুখাদ্য। এলাচ, লবঙ্গ ইত্যাদি মেশানো। মণিমহেশের গল্প শোনান। বাঙলা দেশ থেকে আসছি শুনে শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রয়াগকুম্ভে দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁর প্রাণমাতানো ভজন শুনে কি অপরিসীম আনন্দ পান নাগাবাবা সেই কথা বলেন। তখন মনে পড়ে, শ্রদ্ধাভাজন দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবীর রচিত কুম্ভ সংক্রান্ত বইখানির কথা :—Kumbha India's ageless festival, তাতে পড়েছি বটে, চম্বাবাসী এক মহাত্মার সঙ্গে প্রয়াগে সাক্ষাৎকারের মর্মস্পর্শী বিবরণী। বই-এ ফটোও ছাপা হয়। কিন্তু, সে তো ভিন্ন সাজ অন্য মূর্তি। দাড়ি গোঁফ জটাধারী।

পরের দিন, ভারমোর ছেড়ে ফেরার আগে, নাগাবাবার নিকট বিদায় নিতে চলি। সে-সময়ে তাঁর যে জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখি, সে দৃশ্য ভোলবার নয়।

নাগাবাবার সাধন কক্ষ। উঁচু ছাদ, মন্দিরের মত। ঘরের কোথাও কিছু নেই। পাথরের মেঝের মাঝখানে মস্ত হেমকুণ্ড। তারই সামনে বিছানো বিশাল ব্যাঘ্রচর্ম। সেই আসনে বিরাজ করেন যোগী জয়কিষণ মহারাজ। পরনে শুধু কৌপীন। অনাবৃত দেহ। কপালে ভস্মের প্রলেপ। যেন, পাথর কেটে শিল্পীর গড়া মূর্তি। শক্তিমান্ তেজোদীপ্ত। উন্নতশির। কথা বলেন না। ধীরে কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি! তাকিয়ে দেখেন। নিস্পন্দ দেহ, শুধু মনে হয়, ঠোঁটের কোণে স্নিগ্ধ মধুর হাসির অস্ফুট রেখা। নয়নকোলে স্নেহাশীর্বাদের করুণাধারা। মাথা নত করে বেরিয়ে আসি। আনন্দে মন ভরে থাকে। যেন না-বলা কত বাণী প্রাণের গোপনপুরে শুনি।

কয় বছর পরে তাঁর তিরোধানের সংবাদ আসে। মনে হয়, কোথায় অমূল্য কি-যেন হারিয়ে যায়।

॥ ১৩ ॥

২৪শে সেপ্টেম্বর। সকাল আটটায় মণিমহেশ পানে যাত্রা সুরু। সুড ও স্থানীয় নতুন বন্ধুরা এগিয়ে দিতে কিছুদূর সঙ্গে চলেন। গ্রাম ছাড়িয়ে মাইল খানেক আসেন। ফিরে যেতে অনুরোধ করলে বলেন, চলুন, আরও একটু সঙ্গে যাই।

সামনে প্রকাণ্ড ধ্বস। রাস্তা ভাঙা। সেই পর্যন্ত এসে দেখিয়ে দেন, পাকদণ্ডীর কোন্ পথ ধরে পাহাড়ের চড়াই পথে চলতে হবে। সেইমত পথ ছেড়ে উঠতে থাকি। তাঁরা শুভেচ্ছা জানিয়ে ফিরে চলেন।

পাইন বনের মধ্যে দিয়ে চলা। গাছ ত নয়, যেন কত পরিচিত বন্ধুদের সমাবেশ। সুমিষ্ট সুবাস। সরু পথ। ঘুরে ঘুরে ওঠে। সকালের মধুময় আবহাওয়া। বাতাসের শীতল স্পর্শ। ধীরে ধীরে চড়াই উঠি, এগিয়ে চলি। সঙ্গে সুড-এর ব্যবস্থা করে দেওয়া একজন কুলি ও ফরেস্ট গার্ড। অনেকখানি আসার পর দুই দিকে দুটো পথ। ফরেস্ট গার্ড থমকে দাঁড়ায়। কোন্ পথে যাবে, সন্দেহ লাগে। ভাগ্যক্রমে আর এক ফরেস্ট গার্ড হঠাৎ হাজির হয়, ঠিক পথ বলে দেয়।

ভারমোর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ভ্রাঙ্গলা গ্রাম। পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি ঘরবাড়ি। ভারমোরের ফরেস্ট গার্ড এখান থেকে ফিরে যায়। নতুন গার্ড সঙ্গে চলে। সঙ্গের কুলিও আর যেতে চায় না। বলে নিজের গ্রাম থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। ফিরে যাব।

হিমাদ্রি বখশিশের লোভ দেখায়। কোনই কাজ হয় না। কেবলই বলে, অনেক দূরে এসেছি গাঁও ছেড়ে, আর এগোব না।

হিমাদ্রি প্রশ্ন করে, তবে যাবে বলে এসেছিলে কেন? মণিমহেশ কি তোমার ঘরের পাশে এসে থাকবেন?

ফরেস্ট গার্ড আর একটা লোককে আনে—এই গ্রাম থেকে।

নতুন ফরেস্ট গার্ড—নাম শেরচাঁদ। দেখতে সুশ্রী। সাহেবের মত রঙ। বেশভূষারও চাকচিক্য আছে। ভাল গরম ফুলপ্যান্ট। ডোরাকাটা রঙিন পশমী জ্যাকেট। লাল হলুদ কালো রঙ। হিমাদ্রি হেসে বলে, শেরচাঁদ, বাঘের মতনই তোমাকে লাগছে।

মাথায় ফরেস্ট গার্ডের সবুজ ক্যাপ। মুনিয়াল পাখির পালক গোঁজা। মালপত্র, যত সামান্যই হোক না, নিজে বয় না। আপন সরকারী পদের মর্যাদা সম্পর্কে সব সময়েই সজাগ। দেখে হিমাদ্রিকে বলি, তোমার এ.ডি.সি. চলল সঙ্গে।

বনের পথ ধরে আবার চলা। পথে লোকজন খুবই কম। দূরের বরফের পাহাড়গুলি আরও নিকটে আসে। শুনি, মণিমহেশের শিখর কাছের পাহাড়ে ঢাকা পড়ে আছে।

আরও মাইল চার গিয়ে পথের অল্প উপরে সাণ্ডি ফরেস্ট রেস্ট হাউস। সুন্দর বাংলো। ফুলের বাগানও। চৌকিদারকে ডাকাডাকি করেও পাওয়া যায় না। ঘরে তালা লাগানো। অগত্যা বারান্দায় বসে সঙ্গে-আনা পরোটা ও সবজি খাওয়া হয়। কিন্তু তৃপ্তি হয় না। ক্ষুধা মেটে, তৃষ্ণা যায় না। খোঁজাখুঁজি করেও এক ফোঁটা জলের সন্ধান মেলে না। গাছ ভরতি, টমাটো। তাই তুলে খাওয়া হয়। গলাও ভেজে।

এখনও নীচের দিকে পথ ভাঙা। জঙ্গলের রাস্তা ধরে ঘুরে চলি। পথঘাট শেরচাঁদের ভালভাবে জানা দেখি। পথের ভাঙা অংশ এড়িয়ে আবার পথে নামি। শেষের দিকে বড় ঝরনা।

বেগে জল সোজা নামে। চারিপাশে পাথর। জলে ভিজে পিছল হয়ে আছে। কোথাও বা পাথরের গা বেয়ে ধারা নামে। পাথরগুলির উপর দিয়ে জলস্রোত ডিঙিয়ে চলা। শেরচাঁদ এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করে।

মাইলখানেক সোজা পথ। নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলি। হাড়সার গ্রাম দেখা যায়। এ-পথের শেষ গ্রাম ও লোকালয়। বড় গ্রাম। মনে হয় আট হাজার ফুট-এর উপর উচ্চতা। পথের ডানদিকে সামান্য উপরে মন্দির। সব বাড়ির ঢালু ছাদের উপর ভুট্টা শুকায়। যেন গেরুয়া চাদরে ঢাকা। বেলা দুটো বাজে। ডানচু আরও পাঁচ মাইল।

শেরচাঁদকে বলি, চলো, এগিয়ে যাই; সেইখানেই আজ রাত কাটাব। কাল মণিমহেশের শেষ চড়াই সকালে ওঠার অনেক সুবিধা হবে।

সে জানায়, দেখি এখানে কতক্ষণ সময় লাগে। দুদিনের খাওয়ার জন্যে আলু, চাল, আটা সংগ্রহ করতে হবে, নিজের ও কুলির জন্যে কম্বলও ভাড়া নিতে হবে। তাছাড়া মণিমহেশের পাণ্ডাদের গ্রাম এইটে। একজন পাণ্ডাও সঙ্গে যাবে এখান থেকে। খাবার ও কম্বল যোগাড় হয়। পাণ্ডাও যোগ দেয়। আশ্চর্য হই শুনে, তার দাবিদাওয়া কোন কিছুই নেই, যে যেমন দেয়, তাই খুশিমনে নেয়। যাত্রীদের সঙ্গে যাওয়া তাদের কর্তব্য, তাই পালন করে।

ভাবি, অজানা পথ। সবাই ভয় দেখাচ্ছে, এখন যাওয়া সম্ভব হবে না,—সঙ্গে দু'একজন বেশি লোক থাকা,—মন্দ কি।

ব্যবস্থা সবই ঠিক হয়। কিন্তু হঠাৎ আবার বৃষ্টি নামে। শেরচাঁদ চিন্তিত হয়। বলে, পাহাড়ের ওপরে ডানচুতে বরফ পড়তে সুরু হবে, পৌঁছুতে পারা যাবে না, বিপদ ঘটতে পারে।

তার সুন্দর বেশভূষা জলে না ভেজে তাই ঘরের দাওয়ার কোণে আশ্রয় নেয়।

আমার ভাবনা অন্য দিকে। হিমালয়ের বৃষ্টি যখন হয় হঠাৎ নামে, আবার হঠাৎ থামে। যেন, দেবতার খেয়ালখুশি। বিচারবুদ্ধি দিয়ে সব সময়ে নাগাল মেলে না। এ-বৃষ্টি হয়ত এখনি থেমে যাবে। হাতে প্রচুর সময়। সামনে পথ পড়ে। কাল যদি আরও দুর্যোগ নামে! সাময়িক আরামের লোভে বা অবহেলায় বসে থাকি কেন?

শেরচাঁদকে উৎসাহিত করি, তুমি সঙ্গে রয়েছ। ভয় করি না কিছুই। চলো এগিয়ে যাই, এমন কিছু জল নয়। পৌঁছে যাব ঠিক।

আড়াইটের মধ্যেই যাত্রা করি। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি চলতে থাকে। অল্প পরেই থেমে যায়।

মাথার উপর নীল আকাশ উঁকি মারে। চারিদিকের গাছপালা জলে ভিজে ঝলমল করে। হিমাদ্রি আনন্দে বলে, এ-যেন ছোট ছেলেদের খেলা। এই ভাব; এই বিবাদ। এই হাসি, এই কান্না।

হাড়্সারের নীচে ভুডল নদী। নদীর অপর পারে, শুনি, চোবিয়াগ্রাম। পাহাড়ের মাথায় চোবিয়া পাশ্। সেখান থেকেও লাহুল যাওয়া যায়।

ভুডল নদী নীচে বাঁ হাতে রেখে এগিয়ে যাই। খানিক পরে পথ দু'ভাগ হয়। বাঁদিকের পথ নেমে যায় নদীর তীর ধরে, দূরে বরফের পাহাড়ের দিকে চলে। শেরচাঁদ বলে, ঐ রাস্তা ধরে মাইল বারো গেলে

কুগ্‌তি গ্রাম। সেদিকেও কুগ্‌তি পাশ্ হয়ে লাহুলে নামবার পথ। চন্দ্রভাগার উপত্যকায় ত্রিলোকনাথের নিকটে পৌঁছে দেয়। আমরা ধরি ডান দিকের পথ। পাহাড়ের গা দিয়ে মাইল খানেক এসে নীচে এক ছোট নদীর ধারে নামি। ডানচুনালা। ভুডল নদীতে গিয়ে মেশে। এই ডানচুনালা ধরে আমাদের যাত্রাপথ। ভুডল নদী বাঁদিকে পড়ে থাকে।

ডাইনে আমাদের পথ ঘোরে। ডানচুনালা সুন্দরী পাহাড়ী বালা। কলস্বনে বহে চলে। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে। কখনও জলের একেবারে কিনারায় পথে এসে নামে, কখনও বা নদী ছেড়ে কিছু ওপরে ওঠে। সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। দুই তীরে ঘন সবুজ গাছপালা। সামনে অল্প দূরেই বরফ ঢাকা পাহাড়ের চূড়া। দেখা যায়, উপর থেকে নদী নেমে আসে গিরিসোপান বেয়ে। সবুজ বন যেন তার উত্তরীয়। সাদা ফেনা যেন পায়ের রূপার নূপুর।

নদী নামে। পথ ওঠে। ধীরে ধীরে আনন্দে আমরাও চলি। মেঘহীন আকাশ। চিন্তাশূন্য মন।

পথের বাঁক ঘুরে হঠাৎ সামনে দেখি, এক সাধু পথের উল্টো দিক থেকে নেমে আসেন। একা। মাথায় অল্প জটা। গায়ে কম্বল। খালি পা। হাতে চিমটা। মুখে, চোখে, গায়ের রঙে নিদারুণ শীতভোগের সুস্পষ্ট চিহ্ন। কালচে ঝলসানো ভাব। ঠোঁট গাল ফাটা।

অভিবাদন করে প্রশ্ন করি, দর্শন করে এলেন?

বলেন, হাঁ। এই ত নামছি। তোমরা এদিকে কোথায় চলেছ?

উদ্দেশ্য শুনে গম্ভীর হন। হাত নেড়ে বলেন, মণিমহেশ! তাগৎ নেই হ্যায়। বহোৎ বরফ। লৌট যাও, লৌট যাও।

কথা শুনে মনে ভয় জাগে না। যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়ে। হেসে বলি, যতটুকু পারি এগিয়ে ত যাই। ভাগ্যে কি আছে দেখা যাক।

তিনি আবার ভয়াবহ পথ, নিদারুণ শীত ও প্রচুর তুষারপাতের উল্লেখ করেন। বারংবার হাত নেড়ে নিষেধ করেন এগিয়ে যেতে। গম্ভীর মুখে পাহাড় থেকে নেমে চলেন।

ভাবি, এ-সবই দেবতার পরীক্ষা মাত্র। অভীষ্ট লাভের পথে বাধার সুস্বাদ।

তিনদিন পরে এই সাধুজীর সঙ্গে আবার হঠাৎ-ই দেখা। মণিমহেশ দর্শনান্তে ভারমোরে ফিরে চলেছি। সাগুি ফরেস্ট বাংলোতে চৌকিদারের ঘরের সামনে দেখি সাধু ভোজন করেন, একমনে, পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। আবার অভিবাদন করি। হিমাদ্রি এগিয়ে যায়, হেসে জানায়, স্বামীজী, ঘুরে এলাম যে! শিউজী খুব ভাল দর্শন দিলেন!

সাধু কোন কথা বলেন না। মুখ গম্ভীর করে অন্যদিকে তাকান। দুদিন এখানে বিশ্রাম ও চৌকিদারের সেবা পেয়ে তাঁর চেহারা ফেরে দেখি।

ডানচুনালার শেষ অংশ যেন স্তরে স্তরে জলপ্রপাত। নদীর জল পাথর থেকে পাথরে লাফাতে লাফাতে নামে, আর আমরাও পাহাড় বেয়ে উঠি।

কিন্তু শারীরিক ক্লেশভোগেরও আনন্দ আছে। বেলা পাঁচটায় পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি পৌঁছই। হাঁফ ছাড়ি, মনে তৃপ্তি পাই। বিস্তীর্ণ মালভূমি। উন্মুক্ত উদার ময়দান সবুজ গালিচা পেতে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। মাঠের মাঝে মাঝে জলের ধারা। ক্ষীণকায় ডানচুনালাও। চারিদিকে ফুল। গাছপালার চিহ্ন নেই। শুধু একদিকে অনেক নীচে ডানচুনালার যে উপত্যকা ছেড়ে আসি,—সেইখানে গাছের ভিড়। মাঠের তিনদিক উঁচু পাহাড়ে ঘেরা, সবারই মাথা সাদা বরফে ঢাকা। মণিমহেশ শিখরের খোঁজ করি। শেরচাঁদ জানায়, এখান থেকেও দেখা যায় না। হঠাৎ দেখতে পাবেন, কাল হ্রদের কাছাকাছি গিয়ে।

মাঠের এক অংশে—নদীর অপর পারে—লম্বা কাঠের ছাউনি। ধর্মশালা। সেইখানে আজ রাত্রিবাস। কাছে গিয়ে দেখি, দোতলা। পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে উঠে দোতলায় ঢুকতে হয়। উপরে হেলানো কাঠের ছাদ, কাঠের মেঝে। সারি সারি তক্তা পাতা, মাথার উপরও পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে সাজিয়ে রাখা তক্তার সারি—সূক্ষ্মকোণে, Acute angle-এ। ফলে ঘরের ভিতর এমনই নিচু, ঢুকলে দাঁড়াবার উপায় ত নেই-ই, হামা দিয়ে চলাফেরা করা চলে। যেন কোন রকমে মাচানে ঢুকে রাত কাটানো। তাতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু প্রমাদ গণি, যখন দেখা যায়, মাথার উপরকার চালার তক্তাগুলির মধ্যে পরস্পরে সদ্ভাব নেই, বিচ্ছিন্নভাবে সাজানো, লম্বা লম্বা ফাঁক, শুয়ে বেশ আকাশ দেখা চলে। সৌন্দর্য উপভোগের

পক্ষে ভালই, কিন্তু রাত্রে নিশ্চিন্ত সুস্থির বিশ্রাম—সুদুরপরাহত। বৃষ্টি নামলে বা তুষারপাত হলে বসে বসে ভেজা। অতএব নীচে থাকাই ঠিক হয়। সেখানেও একদিকে পাহাড়ের গা, অপর তিনদিক খোলা। হু-হু করে কনকনে বরফের বাতাস ঢোকে। সাধারণত ভেড়াছাগল সেখানে আশ্রয় পায়, তাই মেঝে ভরতি তাদের বিষ্ঠা ও শুকনা ঘাস। শেরচাঁদ জানায়, এরই ওপর কম্বল বিছিয়ে আরামে রাত কাটান, বেশ গরমে থাকবেন!

হিমাদ্রি বলে, এমন গদি, নরম ও গরম হবে নিশ্চয়, কিন্তু গন্ধটা যে প্রাণান্তকর।

শেরচাঁদ কোথায় চলে যায়। একটু পরে ফিরে আসে। সঙ্গে একজন গদ্দীর পিঠে কিছু কাঠ, লোটাভরা দুধ। বলে, এখানে কয়মাসের জন্যে ভেড়াছাগল চরাতে যে-সব গদ্দীরা এসেছিল, সবাই এখন ফিরে গেছে। এরা দু-তিনজন এখনও রয়েছে, কাল-পরশুর মধ্যে এরাও নেমে যাবে।

ভেড়ার দুধ। তা হোক। কফি দিয়ে গরম গরম খেতে অপূর্ব লাগে, ঘরের মধ্যে আগুনও জ্বলে। আরাম পোহানো যায়। বাইরে বৃষ্টিও শুরু হয়।

হিমাদ্রি বলে, সব প্রোগ্রাম যেন সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা। পথ চলতে এ-বৃষ্টি নামলে আমরা ত ভিজতামই, বিছানাপত্রও শুকনো থাকত না। এখন আরামে শোয়া যাক। কিন্তু যা বিকট দুর্গন্ধ!

মাঝ রাতে প্রচণ্ড শীতে ঘুম ভাঙে। আগুন নিবেছে। পায়ের দিক থেকে ঘরে হু-হু করে হাওয়া ঢোকে। গরম গেঞ্জি, পুলওভার, মঙ্কি-ক্যাপ, গরম মোজা, গরম প্যান্ট—যা কিছু আছে সব পরে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেছি,—তবু মনে হয়, খালি গায়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডাজলে ভাসছি। হাড়ের মধ্যে বরফের বাতাস প্রকৃতই হুল ফোটায়।

দুজনে হি-হি করে কাঁপি। কোনরকমে রাতটা কাটলে হয়। দেহের এমন অস্বস্তি, অথচ মন-ভরা অসীম আনন্দ। বাইরে দেখা যায় গাঢ় নীল আকাশ, অযুত তারার হীরক-হাসি, তুষার-শিখরের রহস্যময় হাতছানি। মণিমহেশ!—কাল দর্শন পাব।

॥ ১৪ ॥

হিমাচলের আশ্চর্য মহিমা। সারারাত ঘুম নেই। তবু দেহের গ্লানি বা অবসাদও নেই। প্রসন্ন মনে পূর্ণ উদ্যমে যাত্রার আয়োজন হয়। ফেলে-আসা পথ—সে যেন কোন্ অতীত যুগের জগৎ। আজ এক নবীন মানুষ নতুন জগতে জাগে।

সকাল আটটায় যাত্রা। ছয় মাইল দূর—মণিমহেশ হ্রদ।

সকালের শীতের প্রকোপ ত আছেই, তার উপর হিমাচলের তুষার-শীতল বাতাস। চারিদিকের পাহাড়ের মাথায় কাল রাত্রে পড়া আরও নতুন বরফ। সকালের শীতে যেন সাদা চাদর আরও টেনে মাথা মুখ ঢেকে, রোদের আশায় অতি-বৃদ্ধদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা। আমরা চলি প্রথম দিকে কয়েক-পা দ্রুতপদেই। সহজে শরীরে তাপ নামে। শীতবোধও দূর হয়। কিন্তু সামনেই মণিমহেশের প্রসিদ্ধ শেষ চড়াই। তাই, আবার যথারীতি ধীরপদে চলতে থাকি। আকাশ নির্মেঘ। মনেও গভীর আনন্দ। ভাবনা-চিন্তা শূন্য। পাথর বিছানো পথ। কেবলই উঠে চলে। খাড়া পাহাড়, পাথর কেটে ধাপ করা। কোথাও বা পাথরের উপর পাথর সাজানো,—সিঁড়ির মতন। এক এক জায়গায় এক হাঁটুর উপর উঁচু হাতে ভর রেখে উপরের ধাপে ওঠা। কখনও কখনও আলগা পাথর, অসমানও। অতি সাবধানে পা রেখে উঠতে হয়। কালো বড় বড় শিলা। জল ও বরফের সংস্পর্শে এসে কোথাও বা অতীব মসৃণ। উঠবার পথে তেমন ভয়ের কারণ থাকে না। কিন্তু বুঝতে পারি ফেরবার পথে সতর্কতার প্রয়োজন হবে। এসময়ে পাথরের উপর মাঝে মাঝে কচিৎ জলের ধারা পেলেও বরফ কোথাও নেই। বৃষ্টির সময় এ-পথের দুর্গমতা কল্পনা করা যায় না। বরফে ঢাকা পড়লে হয়ত চলাই যায় না। পথের এই অংশের নামও তাই বান্দরঘাঁটি। মানুষ চলার উপযোগী জায়গা নয়। হাতে পায়ে ভর রেখে ওঠা। তবুও, উঠতে তেমন কিছু কষ্টবোধ হয় না। অতি ধীরে—যত ধীরেই হোক না কেন—না থেমে এক এক পা করে উঠতে থাকলে অতি দুরূহ চড়াইও এক সময়ে শেষ হয়ই। বান্দরঘাঁটির চড়াইও দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়। পিছনে দূরে দেখা যায়, ডানচুর মালভূমি, ধর্মশালা নদীর শীর্ণ রেখা। ডানদিকে সামনের পাহাড়ের এক অংশে ডানচু নদীর জলধারা পাহাড়ের উপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে। ওখানে নদীর নাম অমরগঙ্গা। সুন্দর

জলপ্রপাত। শেরচাঁদ বলে, যাত্রার সময় ঐ ধারার নীচে মাথা পেতে স্নান করার প্রথা। লোকে বলে একসময়ে জলের তোড়ের মুখে মেয়েরা পাশের পাথর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ত, প্রাণও দিত। ঐ ধরনের আত্মদানের নাকি মর্যাদা ছিল, মহান পুণ্যকর্ম বলে যাত্রীরা মানত। এখন অবশ্য সে-সব ধারণা গেছে।

বান্দরঘাঁটির পরও আবার চড়াই। ভৈরবঘাঁটি। মনে সঙ্কল্প ও স্ফূর্তি রেখে উঠলে কোন চড়াই অসাধ্য নয়। এ-চড়াইও শেষ হয়। বিশাল এক পাহাড় ধ্বসার অতীত চিহ্ন দেখি। বড় চড়াই-এর পর খানিকটা সমতলভূমি। পথ চলায় পায়ের পাতা সোজা পড়ে, স্বস্তি বোধ করি। কিন্তু, দেহের আরাম, ক্লেশ সবই সাময়িক। সুমুখে আবার পাহাড়ের শ্রেণী। পাথরের পর পাথর। তারই মধ্যে দিয়ে ঘুরে পথ ওঠে। গিরিশ্রেণীর মাথায় আসি। গিরিপথের মত দেখতে লাগে। মনে করি, এই বুঝি চড়াই-এর সমাপ্তি। গুরু-গম্ভীর হিমালয়েরও বিচিত্র পরিহাস-স্পৃহা। উপরে উঠে দেখা যায়—সামনে আরও উঁচু পাহাড়।

হোক আবার চড়াই, মনে ভয়-ভাবনা নেই। পরম আনন্দ জাগে—নতুন জগতের স্বাদ পেয়ে। বরফের রাজ্যে এসে পৌঁছুই। চারিদিকে শুধু পাথর, বরফ ও জলের ধারা; নিকটেই ছোট হ্রদ। পাণ্ডা বলে, গৌরী কুণ্ড, এইখানে মণিমহেশ তীর্থযাত্রী সকলেরই স্নান করা বিধি। পথের পাশে তুষার-গলা ছোট নদী। নীল স্বচ্ছ ধারা। জলের ভিতর প্রতি বালুকণাটি দেখা যায়। নদীর উপর ছোট তক্তা ফেলা। সেতুর কাজ করে। ওপরে আবার চড়াই। বিশেষ কিছু নয়। ঢালু পাহাড়ে গা। নতুন পড়া বরফে ছেয়ে আছে। পায়ের চাপে কাঁচের মত বরফ ভাঙে। আনন্দে উঠে চলি। আর অল্প উঠে সুমুখের ঐ চড়াইটুকু শেষ হলেই মণিমহেশ হ্রদ। শেরচাঁদ বলে, ফিরে তাকান—ওদিকে ঐখানে মণিমহেশ শিখর।

এখন মেঘে ঢাকা, কিছুই দেখা যায় না।

ফিরে তাকাই। দেখি, হালকা ফগ্-এ আচ্ছন্ন সেদিকের দিগন্ত। হিমাদ্রি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। অতি বিষণ্ণ বদনে বলে, কিছু যে দেখি না ওদিকে! এত কষ্ট করে আসা,—শেষে কি—

থামিয়ে দিই কথার মাঝে। উৎসাহ দিই, এগিয়ে চলো, ভাবনা কিসের? করুণাময় হিমালয়, যাত্রা কখনই ব্যর্থ হবে না, দেখো।

দেখতে দেখতে হ্রদের ধারে উঠে আসি। বেলা সাড়ে বারোটা। ছয় মাইল পথ—চার ঘণ্টার উপর লাগে আসতে। হ্রদের নিকটে নতুন ফরেস্ট-বাংলো। সবে সম্পূর্ণ হয়েছে। হিমাদ্রি বলে, এর কথা ত কেউই বলেনি। আমাদের সুড সাহেবও নয়। জানা থাকলে এইখানেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা যেত। এ-যে স্বর্গরাজ্য!

প্রায় চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে হ্রদ। মাইলখানেক হয়ত পরিধি। চারি পাশে বরফের পাহাড়। হ্রদের তীরেও মাঝে মাঝে বরফ পড়ে। হ্রদের জলের উপরও তুষার আচ্ছাদন, কোথাও মনে হয় আধ ইঞ্চি পুরু হবে। যেন ঘন দুধের উপর সাদা মোটা সর। কোথাও কোন মন্দির নেই, দেব-মূর্তিও নেই। হ্রদের একপাশে জলের নিকটে মাটিতে কয়েকটি ত্রিশূল পোঁতা; কয়েকটি শিবলিঙ্গও। শেরচাঁদ বলে, যাত্রীদের রেখে যাওয়া। যাত্রার সময় যাত্রীরা হ্রদের তীরে তাঁবু খাটায়। সারারাত ভজন ও কীর্তন চলে। গদ্দীরা দলে দলে বহু ভেড়া বলি দেয়।

দেখি তাই, ভেড়ার শিঙ অনেক ছড়িয়ে আছে চারিধারে।

হ্রদের আশপাশে ঘুরে ফিরে দেখি। হ্রদের উপর মেঘের ম্লান ছায়া।

হঠাৎ মেঘ চিরে রোদ ফোটে। হ্রদের ও চারিদিকের শুভ্র তুষারের লক্ষ-প্রদীপে আলোকশিখা যেন কাঁপতে থাকে।

হিমাদ্রি উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, দেখুন, দেখুন—তাকিয়ে দেখুন!

সামনের ফগ্ অকস্মাৎ উড়ে চলে। দিগন্তের আবরণ মুক্ত হয়। যেন দেবতার মন্দিরের রুদ্ধ দুয়ার খোলে।

চারি পাশের তুষার-কিরীট গিরিপ্রহরী। তারই মাঝে নীল আকাশে মাথা তুলে, মণিমহেশ-শিখর। সবার মধ্যে বিরাজ করেও স্বতন্ত্র। উন্নত-শির, ধ্যান-গম্ভীর। ত্রিকোণ আকৃতি। যেন, শিবলিঙ্গ।

সাগরবক্ষ থেকে ১৮,৬৫৪ ফুট উঁচু। শিখরের গায়ে কোথাও তুষার, কোথাও বা পাথর। যেন পূজা-শেষে শ্বেত পদ্ম ও বিল্বপত্রের পুষ্পাঞ্জলির নিদর্শন। পাথরগুলি এমনি বিচিত্রভাবে সাজানো, দেখায় যেন শিখরের গায়ে সহস্র ত্রিশূল গাঁথা। কোথাও বা মনে হয় জীব-জন্তুর আকার। চূড়ার অনেক নীচে

তুষারাবৃত সেই ধরনের কয়েকটি পাথর দেখিয়ে শেরচাঁদ বলে, ঐ হল গদ্দী, ভেড়া, মহাত্মা, কাক ও সাপের পাথরে পরিণত মূর্তি। মনে পড়ে, সুড-এর বলা কাহিনী।

তিব্বতে কৈলাস-শিখর যেন দেবতার প্রতীক, এখানেও তেমনি মণিমহেশ-শিখরই স্বয়ং শিবলিঙ্গের প্রতিকৃতি। তারই পাদদেশে তুষার-গলা নির্মল হ্রদের প্রশান্ত বিস্তৃতি। যেমন, কৈলাসের কোলে গৌরীকুণ্ড।

হ্রদের একপাশে একটি পাথরের উপর একা স্থির হয়ে বসি। অদৃশ্য নিম্ন-উপত্যকা থেকে আবার পুঞ্জীভূত মেঘকুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে। মণিমহেশের অঙ্গ ঘিরে ধীরে বায়ুভরে ওঠে। দেখায় যেন, বেদিমূল থেকে ধূপ-ধুনার ধূম ঘুরে ঘুরে ওঠে। মণিমহেশ সেই ধূমের আবরণে অদৃশ্য হন। বাতাসে সে ধূমরাশি পুনরায় ভেসে যায়। মণিমহেশও আবার প্রকাশ পান। সূর্যের আলো পড়ে, রূপার অলঙ্কারে সজ্জিত-দেহ গিরিরাজ উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করেন। হ্রদের অপর অংশে স্বচ্ছ জলে মণিমহেশের প্রতিবিম্ব কাঁপে।

শব্দহীন মহান নিস্তব্ধতা। স্বর্গীয় অনুপম শোভা। শান্ত সমাহিত ধ্যানমগ্ন বিরাট হিমালয়। একদৃষ্টে দেখতে থাকি। আবার হারিয়ে যাই অসীমের মাঝে। পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধন, যশ, মান, অভিমান সবকিছুই নিরর্থক মনে হয়। অতি স্নিগ্ধ সুগভীর প্রশান্তি অন্তর উজ্জ্বল করে রাখে। হিমালয়-পথের এই অপার্থিব অমূল্য দান নতশিরে প্রাণভরে গ্রহণ করি।
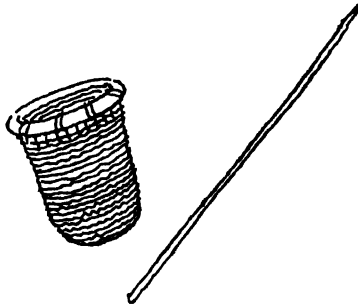
ত্রিলোকনাথ

॥ ১ ॥

বহুদিনের আশা, ত্রিলোকনাথ ও মণিমহেশ একই যাত্রায় দর্শন হবে। এই দুই তীর্থস্থানের মধ্যে দূরত্ব বেশি নয়। উভয়ই হিমাচল প্রদেশে। চম্বা জেলার মধ্যে। মণিমহেশ ভারমোর সাব-তহশীলে, ত্রিলোকনাথ পঙ্গীতে। কিন্তু নিকট হলে হবে কি? মাঝখানে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বিশালকায় প্রহরী। মাথায় তার শুভ্র বিপুল তুষার-শিরস্ত্রাণ। তবুও এরই কাঁধের উপর দিয়ে যাওয়া চলে,—মণিমহেশ দেখে ত্রিলোকনাথে। ভাগ্যবান, সক্ষম, সাহসী যাত্রীরা ক্বচিৎ যায়ও। দুর্গম হলেও অগম্য নয়। সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণীর শিরোভাগে মাঝে মাঝে গিরিপথ,—কুগ্‌টি পাস্ কালিছো পাস্ ইত্যাদি। সেই শৈলপ্রাকার অতিক্রম করে অপরদিকে নামা। এপারে মণিমহেশের দিকে ইরাবতীর উপত্যকা, ডামচুনালার উৎস। অপরদিকে চন্দ্রভাগা বা চিনাব নদী। তারই তীরে—পাহাড়ের কিছু উপরে ত্রিলোকনাথের মন্দির। হিন্দু দেবতা, অথচ পূজারী বৌদ্ধ লামা। ধর্মসংকরের বিচিত্র পরিবেশ। দর্শনলাভের কুতূহল বাড়ে।

কিন্তু মানুষের সব আকাঙ্ক্ষাই তো পূর্ণ হবার নয়। মণিমহেশের দর্শন ঘটে জীবনের অপরাহ্নে। মনে সাহস থাকলেও দেহের শক্তি কমে। তাই মণিমহেশ থেকেই ত্রিলোকনাথের উদ্দেশে প্রণাম জানাই। ভাবি ত্রিলোকনাথ এ জীবনে অ-দৃষ্ট রইলেন। মনে তাতে ক্ষোভ বা দুঃখের ছায়া ফেলে না। জানি, এ জীবনে কত কী-ই তো অদেখা রয়ে গেল! বিরাট সৃষ্টির কতটুকুই বা এক জীবনে দেখা যায়! কিন্তু কে যেন অলক্ষ্যে হাসেন। ক'বছর পরেই যেন করুণা করেই পাতা-ঝরা গাছে আবার ফুল ফোটান। ত্রিলোকনাথে চলি। তবে চম্বা মণিমহেশের পথে নয়। কুলুভ্যালি হয়ে রোটাং পাস্ অতিক্রম করে। সে পথ অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ।

হঠাৎ একদিন কি করে ঐ পথে পা বাড়াই, নিজেই আশ্চর্য হই।

॥ ২ ॥

তিন বছর আগের কথা। ১৯৬৭ সাল। কলকাতায় ক'দিনের জন্য আসি। খবর পেয়ে ডাক্তার বিশ্বাস দম্পতি দেখা করতে আসেন। এসেই বলেন, দাদা, এ বছর হিমালয়ের কোন্ দিকে যাই বলুন তো? নতুন কোনখানে যেতে হবে। আপনার কিন্তু সঙ্গে আসা চাই। প্রশ্ন শুনে মনের গভীর কোণে বিদ্যুৎ-চমকের মত আলো খেলে। আশার দমকা হাওয়ায় বিস্মৃতির ভস্ম ওড়ে। ত্রিলোকনাথের না-দেখা মূর্তি যেন চকিতে হেসে আবার মনের গোপনে লুকায়।

বলি, সঙ্গী হতে রাজি আছি,—না-দেখা দুটি জায়গা যদি দেখিয়ে আনতে পার।—ত্রিলোকনাথ ও বৈষ্ণোদেবী।

মণি ও ভক্তি আকাশ থেকে পড়েন,—নাম শুনিনি কখনও! ও-সব আবার কোথায়? আপনার কাণ্ড! কোত্থেকে নাম শোনেন সব?

বলি, কুলু ঘুরে এসেছ তো? রোটাং পাস্ পার হয়ে ওদিকে নেমে লাহুল। লাহুলের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমে আরও এগিয়ে পঙ্গী। সেইখানে ত্রিলোকনাথ। আর বৈষ্ণোদেবী হলেন অন্যদিকে! পাঠানকোটে ফিরে জম্মু যেতে হবে, সেখান থেকে দূরে পাহাড়ের মধ্যে গুহামন্দির। দেখ, রাজি থাক তো এখনই বেরিয়ে পড়তে আমিও তৈরি।

মুখে বলি কথাগুলি, কিন্তু বেশ বুঝি হৃদয়ের গোপন কোণে কার যেন ডাক শুনি।

* * *

আবার পাঠানকোট। আবার সুন্দরী বিপাশা। আবার মনোহর মানালী। সবই পুরাতন। কিন্তু নবীন সাজসজ্জা। আমিও দেখি, নতুন চোখে। আজ এই পথই যে নিয়ে চলে সেই ত্রিলোকনাথের রাজসভায়।

মানালীতে এক রাত্রি কাটাবার ব্যবস্থা মণি করেন প্রসিদ্ধ শেরপা ওয়াংডির সহায়তায়। বশিষ্ঠ কুণ্ডের নিকটে। শেরপা গাইড স্কুল। দোতলা সুন্দর বাড়ি। একতলার বড় ঘরের টেবিল চেয়ার এক পাশে সরিয়ে মেঝেতে কার্পেট, কম্বল বিছানো হয়। তারই উপর পাতা ঢালা বিছানা। ওয়াংডির প্রাণখোলা হাসিখুশি ব্যবহার। আন্তরিক আদর-যত্ন। মনের আনন্দে সময় কাটে। মণি শেরপা স্কুলের প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ যোগাড় করেন। মেঝেতে ছড়িয়ে পাতেন। পা গুটিয়ে বসে ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্টমনে দেখতে থাকেন। হঠাৎ উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, ও দাদা! এই তো ম্যাপ-এ ত্রিলোকনাথ! জায়গাটার তাহলে 'ইমপর্টান্স' আছে নিশ্চয়। কলকাতায় সেই ছোট ম্যাপটায় ও-রকম কোন নামই পাই নি। সত্যি বলতে কি মনটায় তেমন উৎসাহ পাচ্ছিলাম না,—কোথায় চলেছি, ম্যাপ-এ নাম নেই! কোথা থেকে বিদ্‌ঘুটে জায়গার খবর আনেন আপনি—তাই ভাবছিলাম। যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ও তো রোটাং পাস্ পার হয়ে এই ধার দিয়ে যেতে হবে—বলে ম্যাপ-এ আঙুল বুলিয়ে দেখান। হিমালয় যাবার গভীর আনন্দ ও প্রবল উৎসাহ মুখে-চোখে ফুটে ওঠে। ওয়াংডিকে ডেকে বলেন, এই তো পেয়ে গেছি, ওয়াংডি সায়াব! কালই রওনা হতে হবে,—লোকজন জিনিসপত্র যা ব্যবস্থা করার করে দিন। কিন্তু আরও পরামর্শ আছে। যাচ্ছিই যখন রোটাং পার হয়ে ওদিকে, তাহলে কেলং হয়ে বরালাচা পাস্ পর্যন্তও দেখে আসা যাক। আর দেখুন তো, ফেরবার পথে আবার রোটাং দিয়ে না ফিরে চন্দ্রা নদী ধরে এই এগিয়ে যাব স্পিতির দিকে—তারপর এইখানে কোন একটা পাস্ 'ক্রশ' করে পার্বতী-ভ্যালি দিয়ে ফিরে আসব কুলুভ্যালিতে,—কি বলেন? 'গ্র্যান্ড প্রোগ্রাম' হবে! দেখুন ম্যাপ-এ।

ওয়াংডি হাসেন। বলেন, ম্যাপ দেখতে হবে না আমাকে। আমার ও-সবই জানা পথ। চমৎকার প্রোগ্রাম, সন্দেহ নেই। অবশ্য রোটাং-এর চেয়ে ওদিকের পথ দুর্গম বেশি। তা হোক, পার্বতী-ভ্যালি দিয়ে ফেরা, তা হতে পারত, কিন্তু সময়টা একটু দেরি হয়ে গেছে আপনাদের পক্ষে। আজ হল অক্টোবরের সাত তারিখ,—তাই না? ত্রিলোকনাথ ও লাহুল ঘুরে এ-সব পাস্ যখন পার হতে যাবেন, ততদিনে বরফ পড়ে যাবে খুব,—

মণি সোৎসাহে বলেন, সে তো ভালই,—কি দাদা, আপনি যে চুপচাপ? কোন উৎসাহই দেখাচ্ছেন না?

বলি, আমার শুধু ত্রিলোকনাথ দেখবার জন্যেই আসা, আর ফেরবার পথে বৈষ্ণোদেবী। অন্য কোন দিকে যাওয়ার আগ্রহ নেই। তোমরা যেতে চাও ঘুরে এস, আমি কোথাও এক জায়গায় বসে অপেক্ষা করব।

মণি বলেন, তা কি করে হয়। যাই হোক, সব ব্যবস্থা করে কাল রওনা তো হওয়া যাক।

পরের দিন সেইমত যাত্রাও করা হয়। ত্রিলোকনাথ-পথে যানবাহন চলাচলের সঠিক সংবাদ জানা যায় না। কেউ বলে, লাহুলে জীপ ট্যাক্সি চলছে, ত্রিলোকনাথের পথেও হয়ত যায়। ভাবি, যায় যাবে, না গেলে পায়ে হাঁটা, তাতেই তো আনন্দ।

কোন্ দিকে কত দূরে যাওয়া হবে, বরফের রাজ্যেই বা ক'দিন থাকা যাবে, তখনও সবই অনিশ্চিত। ওয়াংডি তাই সঙ্গে একজন বিচক্ষণ শেরপা গাইডও দেন। মালপত্র বইবার লোক তো চলেছেই। রেশনও সঙ্গে। শ্রীমতী ভক্তি কলকাতা থেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রচুর এনেছেন। এখান থেকেও চাল, ডাল, আটা, আলু, ঘি যা নেবার নেওয়া হয়।

মানালী থেকে রাহালা পর্যন্ত এখন নিয়মিত বাস চলে। কোঠির সেই পুরানো ডাকবাংলো ছাড়িয়ে আরও মাইল দুই এগিয়ে রাহালা নদী। তারই ধারে এসে বাস থামে। মোটরের বড় রাস্তা অবশ্য রোটাং অতিক্রম করে আরও এগিয়ে গেছে। মিলিটারি ও পি. ডবলিউ. ডি.-র ট্রাক, লরি, জীপ সেদিকে যাতায়াতও করে। কিন্তু যাত্রীবাহী বাস এখনও যায় না। তবে ঐ সব ট্রাক, লরি, জীপ-এ ব্যবস্থা করতে পারলে জায়গা পাওয়া যায় শুনি।

বাস-পথ এগিয়ে আসায় রাহালার সেই শান্ত নির্জন পরিবেশ এখন কোলাহলমুখর। অনেকগুলি অস্থায়ী কাঠের ঘরবাড়ি উঠেছে, তাঁবু পড়েছে, দোকানপাটও বসেছে।

মণি কলকাতা থেকে দুখানা তাঁবু সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। লোকালয় থেকে খানিক দূরে নদীর ধারে সে-দুটি খাটানো হয়। চারিদিকে বিশাল পাহাড়। বড় বড় গাছের ছায়া-শীতল বন। নৃত্যভঙ্গে নেমে চলে পাহাড়ি ঝরনা। আশেপাশে ছড়ানো ছোট বড় শিলারাশি। তারই মধ্যে আমাদের রঙিন দুটি তাঁবু। দূর

থেকে দেখায় যেন পাহাড়ের গায়ে দুটি প্রকাণ্ড প্রজাপতি। ঝরনার পাশে পাখা মেলে পাশাপাশি বসে।

জলতরঙ্গের একটানা মধুর সঙ্গীত। ঘুমঘোরে রাত্রী কাটে তাঁবুর মধ্যে মনের আনন্দে।

॥ ৩ ॥

সকালে তাঁবু গুটিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। খবর পাওয়া যায়, ট্রাক বা লরিতে এখান থেকে জায়গা মিলবে না। 'মারি'তে গিয়ে পাওয়া যাবে নিশ্চয়। অর্থাৎ পাহাড়ের অর্ধেকের বেশি চড়াই এখন হেঁটেই ওঠা। নিরাশ হবার কিছুই নেই। পাহাড়ে হাঁটার আনন্দ পেতেই আসা।

মোটরের পাকা সড়ক রোটাং-এর উপর উঠে স্বভাবতই বহু ঘুরে ঘুরে। লম্বা চক্কর দিয়ে, কিংবা অজগরের মত পাহাড়কে বেষ্টন করে, আমরা ধরি পাকদণ্ডীর পথ। এ যেন পাহাড়ের গায়ে মই লাগিয়ে চড়া। পথের দূরত্ব অনেকখানি কমে, কিন্তু একটানা চড়াই ওঠায় দম লাগে, অভ্যাসও প্রয়োজন। মাঝে মাঝে রাজপথে ও হাঁটাপথে ক্ষণিকের দেখা, যেন হাত মিলিয়েই আবার ছাড়াছাড়ি। এ পথ নাক-সোজা উঠে চলে, বড় রাস্তা আবার ঘোরে।

ধীরে ধীরে উঠি। তাতে কষ্ট কম। দেখতে দেখতে রাহালার বসতি—লোকজন, মোটর, তাঁবু, ঘরবাড়ি খেলাঘরের খেলনার আকৃতি নেয়। ক্রমে পাহাড়ের আড়ালে লুকায়। গাছপালার এলাকাও ছাড়িয়ে আসি। এখন কেবলই পাথর, বালি, কাঁকর। হঠাৎ মেঘ আসে। এক পশলা বৃষ্টি হয়। নিকটেই এক গুহা দেখে সবাই আশ্রয় নিই। বৃষ্টি থামে। আমরাও আবার চলি। এই পাহাড়ের মাথায় পৌঁছুই। মনে হয় বুঝি চড়াই শেষ। কিন্তু সামনেই দেখি আরও উঁচু আর এক পাহাড় মাথা তুলে। সেই পাহাড়ের কোলে বিশাল প্রান্তর। মনোরম মালভূমি। গাছপালাশূন্য। শুধু পাথর ও শিলাস্তূপ ছড়ানো। মাঝে মাঝে ঝরনাধারা। চারিদিক রোদে ঝলমল করে। অথচ শীতের প্রখরতাও আছে। এখানেও আবার দেখি অস্থায়ী অনেক কাঠের ঘরবাড়ি, বহু তাঁবু সামিয়ানা। লোকজনের ঘোরাঘুরি। চায়ের দোকানপাট। সাধারণ হোটেল বা সরাইখানা। কোনটার নাম নেপালী, কোনটার তিব্বতী, কোনটার লাহুলী, আবার চম্পা হোটেল, পাঞ্জাবী হোটেলও। নামগুলি দেখেই বোঝা যায়, ভারতের কত বিভিন্ন প্রদেশবাসীর এখানে সমাবেশ। খাকী বেশভূষা-পরা মিলিটারি দল, পি. ডবলিউ. ডি.-র অফিসার, কর্মচারী কনট্রাকটরের দলবল। যেন মৌমাছির চাক। বনবন করে সব ঘোরে। বহু ট্রাক, লরিও। কোথাও সারি বেঁধে থাকা, দু'-একটা সশব্দে পাহাড়ে ওঠে, বিরাট পাহাড়ের গায়ে দেখায় যেন কালো পোকা।

এই জায়গারই নাম—মারি। নাম শুনিনি এর আগে কোনবার। আসিনিও এইখানে। হয়ত তখন এর অস্তিত্বই ছিল না। রাহালা থেকে যে-পথে রোটাং চলেছি এবার, পূর্ব পরিচয়ের কোথাও কোন সূত্র খুঁজে পাই না। মনে হয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ এটা। এমন কি সেই রোটাং পথের প্রসিদ্ধ ঝড়ের মত প্রচণ্ড হাওয়াও এবার এ-পথে মেলে নি।

মারিতে অত যানবাহন দেখে আশা জাগে, নিশ্চয় কোন ট্রাক-এ জায়গার ব্যবস্থা হবে, রোটাং-এর মাথায় পৌঁছে যাব অল্পক্ষণেই। কিন্তু বহু চেষ্টা ও তোষামোদেও কোন লরির কর্তাদেরই মন ভেজে না। অগত্যা দ্রাক্ষাফল যে অম্ল, তাই জাহির করে, তখনই হাঁটাপথে আবার চড়াই ওঠা শুরু হয়।

॥ ৪ ॥

এই মারিতেই কিন্তু লাহুল থেকে ফেরবার পথে আসি ট্রাক-এ করে। ট্রাকটা ওদিকে কোকসারে পাই শেষ মুহূর্তে। পথে রোটাং পাস্ থেকে এদিকে নামবার সময় নতুন তৈরি রাস্তার অংশ সে-সময়ে কাদায় ভরা ও অতি পিছল। ট্রাক অনেকক্ষণ কাদায় আটকে থাকে। ফলে বহু চেষ্টার পর এই মারিতে যখন পৌঁছুই তখন রাতের আঁধার নামে। বাধ্য হয়ে রাত কাটাতে হয় এইখানে। সে রাত্রের অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। তাই এখন হেলায় ফেলে-যাওয়া মারিও চিরকাল মনে থাকে।

সে-রাত্রে ট্রাক ছেড়ে এখানে নামি গভীর অন্ধকারের মধ্যে। এখানে ওখানে কয়েকটা টিমটিমে আলো। আঁধার বনে যেন জোনাকি জ্বলে। লোকজনও তাঁবুর বাইরে কেউ নেই। জনমানবহীন পল্লী। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। পরের দিনই মানালী পৌঁছুব। তাই এক রাতের জন্যে কেন আর তাঁবু ফেলা? কোন রকমে কাটানো যাক ঐ একটা সামিয়ানার মধ্যে। ব্যবস্থাও তাই তখনই হয়েও যায়। হোটেলের

বাইরে চুপচাপ, কিন্তু ভিতরে তখনও পাট ওঠে নি। দু-চারজন খেতে বসেছে। পাশে আর একটা তাঁবু। সেইখানে শোওয়ার আয়োজন। অর্থাৎ এলোমেলো ভাবে কয়েকটা খাটিয়া পাতা, দু-চারটে তক্তা বিছানো। তার উপর লোকজনও কোথাও শুয়ে, আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। দেবেই তো,—যা প্রচণ্ড শীত। আলোর টেমিটা জ্বালিয়ে রেখে আমরাও তিনজনে কোনমতে তিন জায়গায় কম্বল বিছাই। স্লিপিং ব্যাগ-এর আশ্রয় নিই; মুখ ঢাকা দিয়ে শোওয়া আমার অভ্যাস নয়। দম যেন আটকে আসে। কিন্তু মুখ না ঢেকেই বা থাকি কি করে? হাতকয়েক দূরে আমার মুখোমুখি তাঁবুতে ঢোকবার মুখ। দরজা বা পর্দার কোন বালাই নেই। ওদিকে তাকালেই মনে হয় বাইরের অন্ধকার যেন মুখ হাঁ করে আমার চোখে-মুখে কনকনে বাতাসের ফুৎকার করে। অগত্যা উঠতে হয়। একটা বড় প্ল্যাস্টিক সীট বেঁধে গুঁজে কোন রকমে টাঙানো হয়। এবার নিশ্চিন্ত মনে শুই। কখন ঘুমিয়েও পড়ি। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভাঙে। প্রথমে বুঝতেই পারি না, জেগে উঠেছি, না স্বপ্নই দেখি। টেমি নিবেছে। তাঁবুর ভিতর আবছা অন্ধকার। আমি কি বিছানায় শুয়ে? অথবা বরফজলে চিৎ-সাঁতার কেটে ভেসে আছি? সারা মাথা, মুখ, গায়ের উপর স্লিপিং ব্যাগ জব্‌জবে ভিজে, তেমনি ঠাণ্ডাও। তাঁবু ফুঁড়ে জল পড়েছে নাকি? কোনরকমে টর্চ বার করে জ্বালি। গায়ের উপর আলো পড়তেই দেখি, এ কি! বরফে সারা শরীর ঢাকা! জীবন্ত এ তুষার সমাধি হল কখন? ঘাড় ফিরিয়ে তাঁবুর প্রবেশপথের দিকে তাকাই। প্লাস্টিক সীট গেল কোথায়? খুলে কোন্‌দিকে উড়ে গিয়ে পড়ে আছে। সুমুখে তাঁবুর সেই বিরাট হাঁ। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। কোথায় সেই কালো দানব? বাইরে আলোয় আলো। কী স্নিগ্ধ সেই আলোর রূপ! বুঝতে পারি, কখন তুষার-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। এখন চারিদিক শান্ত। শুভ্র তুষার ও রাত্রের আঁধার মিশে গিয়ে দেখায় যেন অতি কোমল নীলাভ আলো। থাকতে পারি না। উঠে পড়ি। বিছানার উপর থেকে একরাশ তুষারকণা ঝরে পড়ে। তাঁবুর ভিতরে মেঝের উপরও স্তূপীকৃত বরফ খোলাপথে ঢুকে জমে আছে। তাঁবুর বাইরে আসি। যেদিকে তাকাই—শুধু সাদা, কেবলই সাদা। এত শুভ্রতাও জগতে আছে? তাঁবু, ঘরবাড়ি, ট্রাক, মোটর কোথাও কোন কিছুই দেখা যায় না। অদৃশ্য এক যাদুকর যেন বিরাট এক সাদা চাদর দিয়ে জগতের সব কিছুই লুকিয়ে রাখে।

ধরণীর বুকে এই বিশাল অমলিন শুভ্রতা, মাথার উপর তেমনি গাঢ় নীল নির্মল আকাশ, তারই মধ্যে লক্ষ তারার হীরকদ্যুতি। যেন বাতায়ন খুলে দীপ জ্বেলে তারাগুলি তাকিয়ে দেখে সাদা নীলের মিলন-মেলা।

বিপুল বিস্ময়ে দেখতে থাকি। আনন্দে ভরে ওঠে মন। শীতের কথা মনেই আসে না। কি অবস্থায় শয্যা ছেড়ে বাইরে আসি তাও ভুলি। উৎসাহবশে বরফের উপর কয়েক পা এগিয়েও চলি। ফলও পাই। পায়ে যে 'বাটা'র রবারের চটি,—সে কথা মনে পড়ে, তুষারের উপর ধরাশায়ী হয়ে। তাকিয়ে দেখার কেউ নেই, দেখে হাসবারও নেই। আপন মনেই হাসি। বলি, এ পতন 'স্বরগ সমান'।

আবার ফিরে এসে শয্যাগ্রহণ। এবার আর তাঁবুর মুখ বন্ধ করা নয়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি বাইরের প্রকৃতির পানে। আধঘুমে, জাগরণে অদ্ভুত অনুভূতির মধ্যে রাত কাটে। সকালের আলো আসে তাঁবুর ভিতর। প্রচণ্ড শীত। সবাই জাগে। কিন্তু বিছানা ছাড়ে না। মণি ঘাড় তুলে বলেন, দাদা, দেখছেন খোলা দরজা দিয়ে? বাইরে সব বরফে ঢেকে গেছে! রাত্রে যা ভীষণ শব্দ! শুনেছিলেন বাতাসের কী হুঙ্কার! জোর 'স্নো ব্লিসার্ড' হয়ে গেছে। এখন আবার আকাশ পরিষ্কার,—আরে আরে! ও ছেলেটার কাণ্ড দেখুন —এই বাচ্চা! ঢুকে পড় কম্বলের মধ্যে, মরবি নাকি ডবল নিউমোনিয়া হয়ে? শুয়ে পড়, শুয়ে পড় এখুনি—

কিন্তু কে কার কথা শোনে! তাকিয়ে দেখি, তাঁবুর মধ্যে আর এক কোণে চৌকিতে এক তিব্বতী পরিবার শুয়ে কম্বল জড়িয়ে, তারই মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট ছেলে—বছর তিন-চার বয়স। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। যাকে বলে দেহে একটা সুতাও নেই। ছোট ছেলে, তা না হয় নেই। কিন্তু দেহে এই প্রচণ্ড শীতের কোন কাঁপুনি নেই, কোন শীতবোধই নেই! তাও বুঝি, অত ছেলেমানুষ, তাই অবুঝ। কিন্তু ওর বাপ-মাও নির্বিকার। ছেলেটা খালি গায়ে দাঁড়িয়ে গোঁ গোঁ করে কি যেন বলে, বাপ-মাও কথা কয়, কিন্তু তাড়াতাড়ি কম্বলের মধ্যে ঢুকতে যে বলে না, তা বোঝা যায়।

ডাক্তার মণি বিচক্ষণ শিশু-চিকিৎসকও। তাই আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বাপ-মাকে ধমক দেন। তারা এবার মুখ তুলে আমাদের দিকে ফিরে তাকায়। মণি ইশারা করে ছেলেটাকে ঢাকা দিতে বলেন। তারা

বড় বড় দাঁত বার করে হাসে। কোন ব্যস্ততা বা আগ্রহই দেখায় না।

ভাবি, দেহের ধর্মই এই। যতই সহানো যায়, ততই সইতে শেখে। তিব্বতীর কাছে এ শীত অতি সাধারণ। তাই তারা মানেও না, বোঝেও না।

মনে পড়ে, অনেকে কৌতূহলী প্রশ্ন প্রায়ই করেন, "হিমালয়ের বড় বড় সাধু-সন্ন্যাসী, তাঁরা নাকি বরফের মধ্যেও থাকেন? আশ্চর্য ক্ষমতা!" প্রকৃত সাধুরা অবশ্য যোগাভ্যাসের সাহায্য পান ঠিকই কিন্তু শুধু দৈহিক তিতিক্ষার এই রূপটাই সাধুদের মহত্ত্বের প্রকৃত কোন পরিচয়ই নয়,—সেদিন সেই তিব্বতী অবোধ উলঙ্গ শিশুটি সেই সহজ উত্তরই স্মরণ করিয়ে দেয়।

॥ ৫ ॥

মারি ছাড়িয়ে আবার রোটাং-এর চড়াই শুরু। আবার পাকদণ্ডীর খাড়া পথ। বেশ অনেকখানি উঠে বড় রাস্তা পাই। এবার সেই পথ ধরেই চলা। পাহাড়ের গা কেটে বাঁক ঘুরে ঘুরে রাস্তা এগিয়ে চলে। চড়াই ওঠার আর কষ্ট নেই। বেলা বাড়ে। সামনেই এক ঝরনার ধারা। তারই নিকটে পথের উপর পাথর সাজিয়ে শেরপা উনুন পাতে, রান্না করে। দুপুরে ক্ষণিক বিশ্রামও হয়।

বিশ্রামের পর আবার সামান্য চড়াই। ধীরে ধীরে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে দেয়। এতক্ষণে দেখে চিনতে পারি,—এই তো সেই সুপরিচিত রোটাং পাস্। ১৩,৪০০ ফুট উঁচুতে। এখানেও এখন দুটো কাঠের ঘর হয়েছে, হোটেল বসেছে; চায়ের সরঞ্জাম তো আছেই,—ট্রাক-ড্রাইভার ও অন্যান্য দু-চারজন পথচারীর হাবভাব দেখে মনে হয়, অন্য পানীয়েরও সরবরাহ চলে।

পথ চলতে শীতবোধ কম থাকে। বিশ্রামে শীতের প্রকোপ বাড়ায়। ওদিকে মেঘেও রোদ ঢাকে। বেলাও শেষ হতে চলে। তবুও অদূরে সেই ক্ষুদ্র বিয়াস্-কুণ্ড—বিয়াস রিখি—বিপাশার এক উৎসমুখ—আবার দেখে আসি। মনে ভরসা থাকে, রোটাং-এর অপর দিকে বাকি পথটুকু নামবার জন্যে ট্রাকে জায়গার ব্যবস্থা হবেই। কিন্তু খোঁজ নিয়ে হতাশ হতে হয়। দু-তিনটি লরি আসে, কেউই নিতে চায় না। এদিকে ঘনঘটা করে মেঘ জমে। তুষার-কণাও অল্প ঝরতে থাকে। ভাবি, সবেগে তুষারপাত শুরু হতেই বা কতক্ষণ। আরও দুটো ট্রাক সামনে দেখা দেয়। নিতেও রাজি হয়। কিন্তু উঠে বসব কোথায়? ছাউনি দেওয়া লরি। ভেতরে মাল বোঝাই,—বেশির ভাগ লম্বা কাঠের তক্তা, লোহালক্কড়ও। কোন রকমে তারই উপর চেপে বসা। কিন্তু ঘাড় বেঁকিয়েও বসা চলে না, মাথায় ত্রিপলের ছাউনি ঠেকে। কোমর বেঁকিয়ে ঝুঁকে বসা,—পাহাড়ের পথে চলন্ত বাসে তাও অসম্ভব। এঁকেবেঁকে ঝাঁকুনি দিয়ে বিকট শব্দ তুলে গড়গড়িয়ে ট্রাক নামতে থাকে—পাহাড়ের গা বেয়ে অগত্যা হাতখানেক চওড়া তক্তাটার উপর কোন রকমে পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ি। হাতের কাছে যা পাই শক্ত করে ধরে থাকি, ঝাঁকুনিতে গড়িয়ে না যাই। ট্রাকের পিছন দিক খোলা। দেখি, বাইরে প্রবলবেগে তুষারপাত চলতে থাকে। চেঁচিয়ে সঙ্গীদের ডাক দিই। তাঁদেরও প্রায় সম-অবস্থা। মনে মনে হাসি পায়। ভাবি, খাটিয়ায় চড়ে কাঁধে যাওয়া,—সে-ও কি এমনি দোলানিই দেয়? তখন আবার হাতে ধরবার উপায় থাকে না, দড়ি দিয়ে বাঁধা। তবে তখন মস্ত সুবিধে—বোঝবার বোধ হয় শক্তি থাকে না। অদ্ভুত সব ভাবনা মনে জাগে। সময়ও কাটে। পাস্-এর উপর থেকে অনেকখানি নামাও হয়। কোথা দিয়ে কোথায় চলি, কিছুই জানতে পারি না। শুধু এইটুকু দেখি, বাইরে তুষারপাত বন্ধ হয়, সন্ধ্যার তরল ছায়া গাঢ় হয়ে ওঠে।

হঠাৎ ট্রাক থামে। শুয়ে শুয়ে শুনি, পথের নিকটে ছোট এক লোকালয়ে এসেছি। রোটাং-এর এইদিকে নেমে এই প্রথম বসতি। নাম গ্রাম্‌ফু। আবার ট্রাক চলে। আর সামান্যই পথ বাকি। মাইল দুই মাত্র। কোক্‌সার পৌঁছে যাই। ট্রাক থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ানো তো নয়, এ যেন হাড়গোড় সব খুলে ট্রাকে বয়ে আনা, এইবার জোড়াতাড়া দিয়ে আবার সহজ মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

ভাবি, এর চেয়ে তুষারপাতের মধ্যেও অন্ধকারে পথ হাতড়ে হেঁটে নামা আরও বোধ করি সহজ হত, রোমাঞ্চকর তো বটেই।

কোক্‌সার দেখে কিন্তু মনে স্বস্তি পাই। ট্রাক-এর মধ্যে থেকে কারামুক্তি তো আছেই, সামনের ডাকবাংলোটিও সুন্দর। সাজানো-গোছানো পরিচ্ছন্ন। নিশ্চিন্ত আরামে আশ্রয় নিই। কোক্‌সারের পরিচয় কাল পাওয়া যাবে। আজ এখন রাত্রির অন্ধকার, দেহেও অপরিসীম অবসাদ।

দিনের আলো ফোটে। নির্মেঘ সুন্দর প্রভাত। কোক্সার যেন প্রসন্ন বদনে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু প্রিয় মিলনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস নয়। ধীর স্থির গম্ভীর মুখে আনন্দের প্রচ্ছন্ন আভাস।

রোটাং পাস্ যেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশের সিংহ-দ্বার। পাস্-এর দু-দিকে দুই অপরূপ রাজ্য। ওদিকে কুলু। সেখানে বনভূমির শ্যাম-শোভা। উচ্ছলিত বিপাশার মনোহর রূপলাবণ্য!

এ-দিকে লাহুল। রুক্ষ, শুষ্ক, নীরস, কঠোর। শুধু উলঙ্গ পাহাড়। মহামৌনী হিমালয় যেন তপস্যামগ্ন। ভস্মাবৃত নগ্নদেহী। শৈলশ্রেণী যেন দিগন্তবিস্তৃত পিঙ্গল জটাভার। মাথার উপর তুষারের শুভ্র প্রলেপ। দেখেই মনে হয় যোগীরাজ মহাদেবের শ্মশানভূমিতে এলাম বটে। একমাত্র কমনীয় স্নিগ্ধ রূপ ঐ সুনীলবসনা চন্দ্রা নদীর। অল্প নীচেই দু-পাশের গিরিশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে তরঙ্গভঙ্গে বহে চলে। চন্দ্রা নামের সার্থকতা রাখে। এ যেন ধ্যানরত চন্দ্রমৌলির চূড়া থেকে খসে পড়া চাঁদেরই কণা।

এ নদী নেমে আসে পূর্ব দিক থেকে স্পিতি হয়ে। এর উৎপত্তি উত্তর-লাহুলে বরালাচা পাস্ (১৬,২০০ ফুট)-এর নিকটে। সেই পাস্-এরই আর এক অংশ থেকে জন্ম নেয় ভাগা নদী। লাহুলের এই দুই প্রধান নদী একই পাহাড়ের কাছাকাছি জন্ম নিলেও ঘুরে ঘুরে নেমে আসে দুই বিপরীত দিক দিয়ে। পরে চন্দ্রা ও ভাগা—এই দুই ধারার মিলন হয় টাণ্ডিতে। শুধু জলেরই মিলন নয়, নামেরও মিলন ঘটে। মিলিত নদীর নতুন নামকরণ হয়—চন্দ্রভাগা বা চীনাব্। প্রায় ষাট বছর আগে Lt. Col. Bruce কাক্‌টি রিজ—Kakti Ridge-এর উপর থেকে এই দুই নদীর উপত্যকা একই সঙ্গে দেখেন ও তাঁর Kulu & Lahul বইখানিতে বর্ণনা দেন।

কোক্সারে নদীর দুই পাড়ের পাহাড়ের বিস্তার পূর্ব থেকে পশ্চিম অভিমুখে। চন্দ্রা নদীও তাই এখানে পশ্চিমবাহিনী।

ত্রিলোকনাথের পথও এখান থেকে পশ্চিমমুখী। স্পিতির উল্টো দিকে।

রোটাং-এর অপর দিকে যেমন মারির বসতি, এদিকে তেমনি কোক্সার। রোটাং থেকে প্রায় ৩,২০০ ফুট নামা। ঘরবাড়ি, ছাউনি, তাঁবু, সরাইখানা, ছোট দোকানপাট। লরি, ট্রাক, জীপ-এর যাতায়াত। মিলিটারি ও কন্ট্রাকটারদের ঘোরাফেরা। সদাচঞ্চল কর্মব্যস্ততা।

কিন্তু মারি পাহাড়ের গায়ে। কোক্সার নদীর উপত্যকায়। প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াও তিব্বতী। নদীর উপত্যকাভূমিও অনেকখানি উঁচু। কুলুর দিকে বিপাশার তীরে মানালী মাত্র ৬৫০০ ফুট উঁচুতে। এদিকে চন্দ্রার কূলে কোক্সার প্রায় ১০,২০০ ফুট। অর্থাৎ এখন যে রাজ্যে এলাম এর নিম্নতম ভূভাগ কোথাও আর নয়-দশ হাজার ফুটের কম নেই। বাতাসও বিশুষ্ক। রোদেরও তেমন তেজ নেই। সারাক্ষণই প্রচণ্ড বেগে বাতাস ছোটে। গায়ে যেন সূচ ফোটে। এ-অঞ্চলে বৃষ্টিও পড়ে কম। জলভরা মেঘ রোটাং-এর গিরিপ্রাচীরে বাধা পায়, কুলুর দিকেই জলভার উজাড় করে। লাহুলে মেঘ থেকে তুষার ঝরে। চারিপাশে পাহাড়ের চেহারা দেখেই বোঝা যায়, বছরের অনেক সময়ই বরফে ঢাকা থাকে। প্রকৃতির ওই বিচিত্র অভিনব রূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও মন ভুলিয়ে রাখতে পারে না। ত্রিলোকনাথের পথে যান চলাচলের খোঁজখবর নিতে হয়। জানা যায়, এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে কীর্তিং। সেই পর্যন্ত জীপ ট্যাক্সি পাওয়া যায়। ত্রিলোকনাথ সেখান থেকে আরও মাইল কুড়ি মাত্র,—হাঁটাপথ। কিন্তু আজ কীর্তিং-এর মোটর কখন ছাড়বে বলা যায় না, তবে দুপুরের আগে নয়ই।

ভালই হয়। নদীর অপর পাড়ে পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড গুহা। তারই ভিতর তিব্বতী মঠ। তাই দেখতে চলি।

নদীর উপর পুল। ওপারে নদীর চরে ছোট গ্রাম। সামান্য ক্ষেত। পাহাড়ের গায়ে অল্প উঠেই প্রকাণ্ড গুম্ফা। তারই ভিতর পাথর দিয়ে গাঁথা দোতলা মঠ। ছোট বড় কামরা, দালান। পাহাড়ের খাড়া গায়ে এমনিভাবে তৈরি বাইরের প্রচণ্ড বাতাস সহজে ঢোকে না। গুহার দেওয়ালে টাঙানো রঙিন তিব্বতী টঙ্কা, কোথাও বা প্রাচীর-চিত্র। বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি। কয়েকজন লামা থাকেন দেখি,—সেই লাল আলখাল্লা গায়ে, মাথায় টুপি, হাতে মালা, সারাক্ষণ মুখে গুঞ্জরন—ওঁ মণিপদ্মে হুঁ। আগ্রহের সঙ্গে মঠ দেখান। কৈলাস মানস সরোবরের পথে দেখা গুম্ফাগুলির কথা মনে আসে।

দেখতে দেখতে সারা সকাল আনন্দে কেটে যায়।

॥ ৭ ॥

বেলা দেড়টায় জীপ ট্যাক্সি ছাড়ে। এখানে এরই নাম বাস। যাত্রী ভরতি। কতজনই বা লোক ধরে? ড্রাইভারের পাশে দুজন। পিছনে লম্বা দুটো বেঞ্চ। তিনজন করে একদিকে বসা চলে, কিন্তু ঠেসাঠেসি করে বসে চারজন করে। দু-বেঞ্চের মাঝখানে মালপত্র রাখা।

পুল পার হয়ে বাস অপর পাড়ে আসে। তারপর বাঁ দিকে বেঁকে চন্দ্রার দক্ষিণ কূল ধরে চলে। সোজা রাস্তা। নদীর অপর দিকে রোটাং-এর গিরিশ্রেণী। মাথায় বরফ। খাড়া পাহাড়। মাঝে মাঝে গিরিখাদে পাহাড়ী ঝরনা। কোথাও বা জলপ্রপাত। ঐ দিকে Gundla Peak, Snow Peak-M.।

এদিকে পথের ডান হাতেও লাহুলের পাহাড়। কয়েক মাইল অন্তর ধারে ধারে গ্রাম। নাম শুনি শিশু, গোশুলা ইত্যাদি। দু-তিন শো ফুট নীচে চন্দ্রা নদী। গ্রামে বাস থামে। বসবার জায়গা নেই, তবু যাত্রী ওঠে। মালপত্রের উপর বসে। গাড়ির ছাউনি নেই। পিছনে রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। পথের পাশে চায়ের দোকান। নেমে খাওয়া হয়। পরস্পরের চেহারা দেখে হাসি। কোক্‌সার ছাড়বার পর ঘণ্টাখানেকও সময় কাটে নি। এরই মধ্যে যেন দেহের উপর দিয়ে কুড়ি-পঁচিশ বছর কেটে গেছে—এমনই সবারই মুখে চোখে মাথায়—সর্বাঙ্গে বার্ধক্যের ছাপ। সারা দেহ ধুলায় ভরা। মুখে চুলে পাংশু আবির মাখা। ধুলার তুফান তুলে জীপ ছুটেছে, দেখেছি বটে, কিন্তু নিজেরাও যে সেই ধূলিতে স্নান করছি, তখন বোঝা যায় নি। সমস্ত পথই এমনি ধূলিময়। অথচ লাহুলী গ্রামগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়িঘরের গড়নও ভিন্ন ধরনের। পাথর দিয়ে তৈরি দেওয়াল। বাড়িগুলি চারকোনা। উপরে সমতল ছাদ। বাড়ির বাইরে প্রায়ই সাদা চুনকাম করা। দোতলা তিনতলা বাড়ি তো আছেই। এমন কি পাঁচ-ছ'তলা উঁচু দু-একটা বাড়িও দেখা যায়। শুনি, স্থানীয় জমিদার বা ঠাকুরদের প্রাসাদ। লাহুলের গ্রামের যেমন বৈশিষ্ট্য, তেমনি লাহুলীদেরও বেশভূষা, ধর্ম, আচারব্যবহার, ভাষা এমন কি মুখের চেহারাও কুলুঅধিবাসীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের উপর তিব্বতী প্রভাব খুবই বেশি।

কোক্‌সার থেকে ২৪ মাইল এসে দেখা যায় ডান দিকে অর্থাৎ উত্তর দিক থেকে আর এক বড় নদী নেমে আসে। এরই নাম ভাগা নদী। সামনে বাঁ দিকে নীচে চন্দ্রা ও ভাগার মিলন। ঐখান থেকে যুক্তধারার নাম হয় চন্দ্রভাগা। সঙ্গমস্থলের নাম টাণ্ডি (৯,৫০০ ফুট)। মোটরপথ ঘুরে যায় ডানদিকে। ভাগার বাম তীর ধরে। সামান্য কিছু দূর যাওয়া। তারপরই ভাগার উপর পুল। পুল পার হয়ে পাহাড়ের খানিক উপরে উঠেই মোটর রাস্তা দু-ভাগে ভাগ হয়। একটা রাস্তা ভাগার ধার দিয়ে উত্তরমুখে আরও এগিয়ে যায় লাহুলের আরও অন্তর্বর্তী অঞ্চলে। এই মোড় থেকে মাত্র চার মাইল ঐ পথে গেলে লাহুলের প্রধান শহর কেলাং। ১০,৫০০ ফুট উঁচুতে। তারও পরে আরও উত্তরে বরলাচা পাস্। 'পাস্' অতিক্রম করলে লিংটি প্লেন্‌স্—লিংটির সমতল প্রান্তর। গ্রীষ্মকালে কাংড়া-কুলুর গদ্দীরা আসে সেই সুদূর লিংটির চারণভূমিতে তাদের ভেড়া-ছাগল চরাতে। লিংটির পর লাডাক ও তিব্বত।

ও-পথ আমাদের গন্তব্য নয়। সেই দুই পথের সংযোগস্থলে এসে আমাদের বাস বাঁদিকের পথ ধরে, ভাগা নদী ছেড়ে চন্দ্রভাগার দক্ষিণ কূল ধরে এগিয়ে চলে।

তিব্বতী আবহাওয়া হলেও এখানে অনেক গাছপালা দেখি। সবই উইলো ও পপ্‌লার। শুনি, কেলাং-এ যে মোরাভিয়ান মিশনারিরা এসে দীর্ঘকাল বসবাস করেন, তাঁরাই প্রায় একশো বছর আগে এই জাতীয় গাছের প্রথম আমদানি করেন, গ্রামে গ্রামে চারা লাগিয়ে দেন। এখন লাহুলের অনেক গ্রামের নিকটে উইলো বা পপ্‌লারের বন। হিমালয়ের এ-অঞ্চলের রুক্ষ শুষ্ক পরিবেশে এই সবুজ গাছগুলি এখন প্রকৃতির শোভাময় সম্পদ।

দু-একটা গ্রামে লোকে গাড়ি দাঁড় করায়। বসবার, দাঁড়াবার কোথাও জায়গা নেই, তবুও লোক উঠবে নাকি। কলকাতার বাস-এ ঝোলার প্রথা এদেরও জানা বুঝি? দেখি, তা নয়। আসছে কাল এই বাস ফিরবে কোক্‌সারে। তাই কালকের জন্যে সীট-এর আগাম ভাড়া দিয়ে রাখে। কোক্‌সার থেকে কীর্তিং ত্রিশ মাইল; যাত্রীপিছু ভাড়া আট টাকা। অথচ দেখি, সাধারণ গ্রামবাসীরাও এ টাকা খরচ করতে কোনই সঙ্কোচ বোধ করে না। মনে হয়, এখানকার লোকজনের সাধারণ অবস্থা ভালই।

বেলা দেড়টায় কোক্‌সার ছেড়েছি। ত্রিশ মাইল পথ মাত্র। বেলা থাকতেই কীর্তিং পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু মাইল তিনেক পথ বাকি থাকতেই মোটরের ইঞ্জিন বিকল হয়। সন্ধ্যাও নামে। লাহুলের রাতের শীতের হিমস্পর্শ পথের উপর দাঁড়িয়েই সহ্য করি।

অন্ধকারের মধ্যে কীর্তিং পৌঁছই। ডাকবাংলোয় থাকবার ঘরও পাই। দু-তিনজন স্থানীয় অফিসার এসে আলাপ করেন। বলেন, সরকারী কয়েকটি দপ্তর এখানে আছে, তাই পাকা বাড়িও কয়েকটা হয়েছে। নিকটেই ছোট গ্রাম। বাংলো ছাড়ালেই পথের বাঁকে বড় ঝরনা। তারই জলস্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে।

তাঁদেরই কাছে শুনি, কোক্‌সার থেকে এখানে গাড়ি যাতায়াতের কোনই নিশ্চয়তা নেই। কখন যাবে, যাবে কিনা সঠিক কেউ বলতে পারে না। ডাক্তার বিশ্বাস তাই ড্রাইভারের হাতে একটা চিঠি কোক্‌সারের দপ্তরে লিখে পাঠান, চারদিন পরে—১৫ই অক্টোবরে সকালে এখান থেকে আমাদের ফেরবার জন্যে একটা পুরা জীপ যেন কীর্তিং-এ রিজার্ভ থাকে।

কাল সকাল থেকে হাঁটাপথ। মাত্র কুড়ি মাইল। ধীরেসুস্থে দু-দিনে যাওয়া। গাড়ির ব্যবস্থার জন্যে আর দুশ্চিন্তা নেই। আত্মনির্ভরতার পরম স্বস্তি বোধ হয়।

॥ ৮ ॥

কীর্তিং-এ বসতি ক্ষুদ্র হলেও নতুন বাড়িঘর তৈরি হয় দেখি। বাংলোর এলাকা থেকেই দেখা যায় সেই বেগবতী ঝরনাধারা। কিছু নীচে চন্দ্রভাগা নদী।

বাংলো ছেড়ে সকালে রওনা হই। সারাদিনে দশ মাইল হাঁটা। থিরোটি পর্যন্ত যাওয়া। তাও শুনি চড়াই উৎরাই নেই। সাধারণ সমতল পথ। মোটর চলাচলের জন্য সদা প্রস্তুত। সেই পথ দিয়েই চলা। আরামে এগিয়ে চলি। হিমালয়-পথের দুর্গমতার স্বাদ পাই না। দেহের কোন কষ্টবোধ নেই। মনেও কোন অজানা পথের ভয়, ভাবনা বা কৌতূহলও জাগে না। এ যেন ভোরে উঠে একটু বেড়াতে বেরোনো। বাঁ পাশে নদী। নদীর ধার দিয়ে সোজা বড় রাস্তা। ডান দিকে পাহাড়, কখনও কাছে আসে, কখনও দূরে সরে। নদীর অপরপারের পাহাড়ের মাথায় বরফ। পথের সামনে বহু দূরেও বরফের পাহাড়। সাড়ে নয় হাজার ফুটের উপর দিয়ে চলা। তাই শীতের প্রখরতা আছে। সকালের রৌদ্রতাপ স্নিগ্ধতার আমেজ আনে। মনের আনন্দে সবাই এগিয়ে চলি। ইচ্ছা করলে দশ মাইল এমন পথ অনায়াসে শেষ করে দুপুরের আগেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়। কিন্তু কি হবে সেখানে বাংলোতে বসে দিন কাটিয়ে? তাই স্থির হয় সারাদিন পথেই কাটানো যাক। মাইল ছয় যাবার পরে পথের ধারে যেখানে ছায়া ও জলের ধারা পাওয়া যাবে সেইখানেই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম হবে। বিকালে আবার বাকি পথটুকু এগোনো। সেও হবে যেন সান্ধ্যভ্রমণ। শেরপাকে সেইমত বলাও হয়। ওরা যেন ওদের চায়ের পাট শেষ করেই যাত্রা করে। আমরা ধীরে পথ চলব। ওরা এগিয়ে যাবে, মনোমত জায়গা দেখে অপেক্ষা করবে।

অতএব আমরা চলি ধীরেসুস্থে। চারিদিকের সৌন্দর্য উপভোগ করি। ভাবনালেশহীন প্রশান্ত চিত্ত। মাঝে মাঝে গ্রাম। ক্বচিৎ দু-একটা ঝরনা। কোথাও বা পপ্‌লার ও উইলোর বন। গ্রামের কাছে ক্ষেতের জমি। গ্রামবাসীদের চেহারা দেখে আনন্দ পাই। সবারই সুন্দর স্বাস্থ্য, বেশভূষাও পরিচ্ছন্ন। এ-অঞ্চলে দারিদ্র্যের ম্লান ছায়া কোথাও চোখে পড়ে না। গ্রামগুলিও আবর্জনাশূন্য। সাধারণত নদী বা ঝরনার নিকটে গ্রাম। কোথাও জলের অভাব থাকলে দূরের কোন ঝরনা থেকে পাইপ-এর সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা। গ্রামের পিছনেই আকাশে মাথা তুলে বরফের পাহাড়। আবার একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে পথ। দু-পাশে ঘরবাড়ি, ছোট ছোট গলি। হঠাৎ শ্রীমতী ভক্তির ডাক শুনি, দাদা দেখুন, বিক্রী করবে কিনা জিজ্ঞেস করুন না।

তাকিয়ে দেখি, গলি দিয়ে বড় রাস্তায় নামে একটা লোক, হাতে দুটো তাজা ফুলকপি।

পাহাড়ে এসে পর্যন্ত বাঁধাকপি প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে, ফুলকপি একদিনও দেখি নি। কিন্তু লোকটা দিতে নারাজ। ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

হাতে অপর্যাপ্ত সময় থাকারও বিপত্তি আছে। ভক্তি বলেন, দাদা, খোঁজ করা যাক, কোথাও পাওয়া যাবেই। কাছাকাছি কারও ক্ষেতে হয়েছে নিশ্চয়।

অতএব গ্রামের মধ্যে কপি-সন্ধানের পর্ব শুরু হয়। এখানে-ওখানে অলিগলিতে ঢুকি, লোক দেখলেই দুজনে প্রশ্ন করি। কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে আমাদের আগ্রহ দেখে পিছু নেয়। বকশিসের লোভ দেখিয়ে তাদেরও দিকে দিকে পাঠানো হয়। তবুও কোথাও সন্ধান মেলে না।

অগত্যা নিরাশ হয়ে বিরস বদনে ভক্তি এ-গ্রাম ছাড়েন। কিন্তু কপির আশা ত্যাগ করেন না। বলেন, চলুন এগিয়ে, পরের গ্রামে নিশ্চয় পাব।

কিছুদূর এগিয়ে আবার এক গ্রাম। পথের ধারে বড় দোতলা বাড়ি। সামনে বাঁধানো চাতাল। পাশে জলের ধারা। পথ থেকে চার-পাঁচ ধাপ উঠে বাড়িতে যাবার পথ। ধাপের উপর তিনটি পাহাড়ি তরুণী বসে গল্প করে। ভক্তির পরদেশী বেশভূষা দেখে কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলে। ভক্তির নজর অন্যদিকে। ডেকে বলেন, দাদা, ঐ যে বড় বাড়িটার পিছনে—প্রকাণ্ড ক্ষেত—নিশ্চয়ই আছে, জিজ্ঞেস করুন।

বলি, এরা সব তোমারই বন্ধু,—তোমার দিকে হাসিমুখে তাকাচ্ছে, তুমিই বল।

ভক্তি হাতের ইশারায় বোঝাবার চেষ্টা করেন। তারা হেসেই আকুল। একজন উঠে যায়। ফিরে আসে মস্ত একটা বাঁধাকপি হাতে। একরাশ বড় বড় গাজরও। তখনই ক্ষেত থেকে তুলে আনা, তাজা মাটি মাখা। ভক্তি তবু ছাড়েন না। বলেন, এ নয়, এ নয়—ফুলকপি, ফুলকপি—কী নাম বল তোমরা?—এইরকম,—ইঙ্গিতে বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেন।

তারা বোঝে। খিলখিল করে হাসে। হাত ঘুরিয়ে দেখায়,—নেই, সব খতম। তবু একজন আবার উঠে যায়, ছোট একটা ফুলকপি নিয়েও আসে। ভক্তির মুখে বিজয়লাভের আনন্দ-দীপ্তি ফোটে। ফুলকপি ও গাজরগুলি হাত বাড়িয়ে নেন। বাঁধাকপিটা নিতে চান না। এখনও সঙ্গে আছে, বলেন।

মেয়েগুলি কিন্তু সবজির দাম নেয় না কোনমতেই। ভাব দেখায় এর আবার দাম! খেয়ো তোমরা।—আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে।

মণি ফটো তুলতে তুলতে আসেন। তাই পিছিয়ে ছিলেন। এসে সঙ্গে যোগ দেন। গ্রাম ছাড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ধারা। পরিষ্কার জল। পথের ধারে পাথরের উপর বসা হয়। মাইল ছয়েকের উপর আসা হয়েছে। অতি ধীরে ধীরে আসা। তাই এগারোটা বাজে কিন্তু এখনও শেরপাদের দেখা নেই কেন? তাদের তো কখন এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করার কথা। আসবে এখনই নিশ্চয়। পকেটে সকালে ভক্তির দেওয়া প্রত্যেকের স্বতন্ত্র প্যাকেট—কাজু, কিসমিস, লজেন্স। আমি একা ঘুরলে এ-সবের কোন কিছু পাটই রাখি না, রাখার প্রয়োজনবোধও করি না। এখন সঙ্গগুণে আহারেরও বিলাস বাড়ে। বিশ্রাম নিয়ে প্যাকেট খুলে মুখে দিই। ধারার জল অঞ্জলি ভরে পান করি। টাট্‌কা গাজরগুলিও যেন সতৃষ্ণ নয়নে মুখের পানে তাকায়,—কাদা-মাখা গায়ে রক্তবর্ণ চক্ষু মেলে। তাদেরও বাসনা পূরণ করি, নিজেরও রসনা তৃপ্তি পায়। ভালো করে ধুয়ে সবাই মিলে খাই। দেখতে কত বড়, তবু কত কচি, রসাল। কেমন একটা সুগন্ধও। গ্রীষ্মের পর হঠাৎ একদিন যখন বৃষ্টি নামে, বাতাসে নতুন ভিজা মাটির যেমন সুবাস আনে, তাজা গাজরের স্বাদও তেমনি সারা মন মিষ্ট মাটির মাধুর্যে ভরে রাখে। ডাক্তার মণি বলেন, কি মিষ্টি দেখেছেন? 'ফুল অব্ ভিটামিন'—ভিটামিনে ভরতি। বলি, কাঁচা খেতেও এত ভালো তা জানা ছিল না। রান্না করে তবে এসব খাই কেন? আগুন আবিষ্কার করে মানুষ বুদ্ধির পরিচয় দিল, কাজেও লাগল অনেক, কিন্তু এই তাজা সব্জিগুলো রেঁধে খেতে শুরু করে এদের গুণগুলোই নষ্ট করে দেয় দেখছি। আবার সব কাঁচা শাক-সব্জি খাওয়া শুরু করলে মন্দ কি?—আরও এটা চিবোতে চিবোতে বলি, এ যে appetiserও দেখছি, যত খাচ্ছি খিদে যেন আরও বেড়ে চলেছে।—কিন্তু লোকগুলোর এখনও দেখা নেই, গেল কোথায়?

আধ ঘণ্টার উপর কেটে যায়। তবু শেরপারা আসে না। অযথা বসে থাকতে মন চায় না। আবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। অনেকক্ষণ পরে আবার এক সুন্দর ঝরনা পাওয়া যায়। বারোটা বাজে। ঝরনার ধারে পাথরের উপর গাছের ছায়ায় বসে তিনজনে অপেক্ষা করি। দূরে ফেলে-আসা পথের বাঁক। সেই দিকে চোখ রেখে প্রতি মুহূর্তে ভাবতে থাকি—এই—এইবার এল বুঝি। কিন্তু কোথায় কে? বেলা বাড়ে। সূর্য ঢলে পড়ে। গাছের ছায়াও সরে। আমরাও উঠে অন্যত্র বসি। আশায় আশায় আরও সময় কাটে। মণি গম্ভীর মুখে উঠে বসে। ঘড়ি দেখে বলে, দুটো বাজতে চলল। আর বসে লাভ কি? কখন আসবে? কখনই বা রান্না করবে? খাবার ইচ্ছেও আর নেই। পথও প্রায় শেষ করে আনা গেছে—বোধ হয় মাইল

দুই বাকি। চলুন দাদা, ডাকবাংলোতে গিয়ে বসা যাক। আশ্চর্য মানুষগুলো! সকাল থেকে আট ঘণ্টা হয়ে গেছে, এখনও পাত্তা নেই!

এত দেরির কারণ আমিও খুঁজে পাই না। তবুও তাকে বলি, রাগ হওয়ার কথাই বটে, তবু মেজাজ খারাপ করলে যাত্রার আনন্দই যাবে। কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। চলো আস্তে আস্তে আগানোই যাক।

জুতা জামা পরে ঝোলা কাঁধে আবার সবাই পথে নামি। মন-মেজাজ ভারী। ক্ষুধার অন্ন না জুটলে এমনি হয়। কয়েক ঘণ্টা আগে সেই গাজর-ভক্ষণের পরিতৃপ্তি ও মনের আনন্দও স্বপ্নে মিলায়।

পথে নামতেই বাঁকের মুখে শেরপাকে দেখা যায়। সঙ্গে পোর্টার চারজনও। নির্বিকার নিশ্চিন্ত মনে গল্প করতে করতে আসে।

মণি অপেক্ষা করেন না। বলেন, আমি এগুচ্ছি দাদা, খাওয়ার ইচ্ছে আর মোটেই আমার নেই, কথাও বলতে চাই না ওদের সঙ্গে,—মেজাজ সামলাতে পারব না। আপনারা খেতে চান, খেয়ে পরে আসবেন।

ভক্তির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকি। শেরপারা আসে। প্রশ্ন করে জানি, একজন পোর্টারের পায়ে নতুন জুতায় ফোস্কা পড়ায় ধীরে ধীরে বসতে বসতে এসেছে।

পোর্টাররা শেরপার চেনা লোক, পথ ভোলবারও সম্ভাবনা নেই। তাই তাদের তিনজনকে পিছনে রেখে আমাদের খাবারের ঝোলা যে পোর্টারের সঙ্গে আছে তাকে নিয়ে শেরপার চলে আসা উচিত ছিল,—বেলা আড়াইটা বাজে—খাওয়ার মালপত্র ওদের সঙ্গে—তবু অভুক্ত আমরা চলেছি,—এসব কথার মর্মার্থ বোঝবার ক্ষমতা তার নেই দেখি। অম্লান বদনে বলে, সেই জন্যেই তো হাজির হলাম।

এক ঘণ্টার মধ্যে থিরোটি পৌঁছে যাই। একটা পাহাড়ি নদী এসে চন্দ্রভাগায় মেশে। শুনি, লাহুল জেলার এই অবধি সীমা। এবার শুরু হয় চম্বা জেলা,—পঙ্গী সাব-তহশীল।

গ্রামের মধ্যে পাহাড়ি নদীর উপর ছোট পুল। ওপারে অল্প এগিয়ে প্রকাণ্ড ময়দান। তারই মাঝে ডাকবাংলো। অন্যান্য খানতিনেক বাংলোও। সামান্য ফুলের বাগানও। বাংলোর পিছনে খোলা জমি। তারপরই চন্দ্রভাগা নদী। স্বচ্ছ সবুজ জলের স্রোত। অপর পারে চম্বার গিরিশ্রেণী। বাংলোর ঘরে কাঁচের শার্সি। নদীর দিকে দরজা জানালা খোলা রাখার উপায় নেই। বরফের মত ঠাণ্ডা প্রচণ্ড হাওয়া, ধুলাও ওড়ে তেমনি। ঘরে বসেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখি। সারাদিনের আহার সন্ধ্যার মুখেই সারা হয়। তারপর শীতের রাতের দীর্ঘ বিশ্রাম।

॥ ৯ ॥

ভোরে ঘুম ভাঙে। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হই। ত্রিলোকনাথ এখান থেকে দশ মাইলও দূর নয়। কিন্তু আজ আমরা যাব পুরো দশ মাইলই। ত্রিলোকনাথ ছাড়িয়ে প্রায় মাইলখানেক আরও এগিয়ে উদয়পুর। সেইখানে ডাকবাংলো। রাত্রিবাসের সেখানে সুব্যবস্থাও। ত্রিলোকনাথে গ্রাম আছে, মন্দিরে যাত্রীশালাও আছে, কিন্তু শুনি, অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন গ্রাম। যেমন নোংরা তেমনি দুর্গন্ধও। তিব্বতী ছোট বস্তি। তাই এমন দুর্দশা। অতএব উদয়পুরে রাত কাটিয়ে আগামীকাল ত্রিলোকনাথ দর্শন করে আবার এই থিরোটিতে ফেরাই সুবিধাজনক।

মণি বলেন, দাদা, আজ আর পথে খাওয়ার পাট রাখা নয়। সকালে রওনা হয়ে সোজা উদয়পুরে গিয়ে ডেরায় ওঠা। দশ মাইল পথ। এও সোজা রাস্তা। কোনই কষ্ট হবে না। সেইমতই ব্যবস্থা হয়। চন্দ্রভাগার তীর ধরে চলা। আজকার পথে গাছপালা অনেক আছে। মাঝে মাঝে বনভূমিও। ক্বচিৎ দু-একটা গ্রাম। পথে লোক চলাচল বিরল। মাইল পাঁচ-ছয় যাবার পর নদীর অপর পারে ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় ত্রিলোকনাথ দেখা যায়। নদী থেকে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়ের গা। সাত-আটশো ফুট উঁচু হবে মনে হয়। পাহাড়ের উপর সমতল মালভূমি। যেন চন্দ্রভাগা নদীর তীরে, পিছনের প্রকাণ্ড পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা বিশাল টেবিল। সেই সমতল ভূমির কিনারায় নদীর দিকে ঝুঁকে থাকা কতকগুলি ঘরবাড়ির জটলা। কালি-মাখা কালচে রঙের সব ছাদ,—পাহাড়ের মাথায় যেন কাকের বাসা। তারই মধ্যিখানে মাথা উঁচু করে মন্দিরের সাদা চূড়া। জনতার পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে মুক্ত আকাশে যেন মাথা তুলে হাঁফ ছাড়ে। এপাশে বহু নীচে চন্দ্রভাগার খাদ। পিছনে বিরাট গিরিশ্রেণী। মাথায় তার অল্প তুষার ঢাকা। সেই গিরিপ্রাচীর ভেদ করে নামে পাহাড়ি নদী। ঐসব পাহাড়ের পিছনেই কোথাও নিশ্চয়

মণিমহেশ শিখর—চম্বা কৈলাস। হয়ত দূরের ঐ কোন্ এক ঝরনার খাদের পথ ধরেই নেমে আসে সেই দুর্গম গিরিপথ—ভারমোর, হাড়সার হয়ে কুগ্‌টিপাস্ অতিক্রম করে। ক'বছর আগে মণিমহেশের পথ থেকে ত্রিলোকনাথের স্বপ্ন দেখি, আজ এইদিকে দাঁড়িয়ে মণিমহেশের স্মৃতি মনে আসে।

ত্রিলোকনাথ যাবার জন্য চন্দ্রভাগার উপর পুল। ওপাশে নদীর ধারে ছোট গ্রাম। আমরা চলি এপার দিয়ে উদয়পুরের পানে এগিয়ে। এখনও তিন-চার মাইল যেতে হবে। পথ চলি আর তাকিয়ে দেখি ত্রিলোকনাথের দিকে। কত দিনের আকাঙ্ক্ষিত আজ নয়ন-পথবর্তী। মনভরা আনন্দ। দেহ যেন ভেসে চলে উৎসাহে।

উদয়পুর পৌঁছুবার মাইলখানেক আগে চন্দ্রভাগার উপর দেখি আর এক পুল। বুঝতে পারি, কাল এই পুল দিয়েই আমাদের ওপারে যাওয়া, ত্রিলোকনাথে ওঠা। মন্দির দেখে আবার পাহাড়ের অন্য ধার দিয়ে নামা ও অপর পুল পার হয়ে থিরোটির পথ ধরা।

উদয়পুরের দিকে এগোই, ত্রিলোকনাথও পিছনে দূরে সরেন। কেবলই মনে হয়, আজ এখনই দর্শন করে যাই। কেন আর কালের জন্যে ফেলে রাখা? আবার তখনই মনে হয়, দর্শন? সে তো কাল হবেই। পাওয়ার চেয়ে পাওয়ার আশায় থাকার আনন্দ আরও মধুর। এগিয়ে চলি উদয়পুরে। পৌঁছে যাই এগারোটার মধ্যেই।

চম্বা জেলার পঙ্গী সাব-তহশীলে উদয়পুর প্রধান কেন্দ্র। নদীর ধারে পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। লোকালয়ে প্রবেশ করার আগে পথের পাশে বেড়াদেওয়া সরকারী কৃষিক্ষেত্র ও বাগিচা। আরও এগিয়ে এসে চোখে পড়ে অদূরে খানকয়েক সুন্দর নতুন বাড়ি। প্রতিটির স্বতন্ত্র প্রশস্ত এলাকা। গেটও। পরে শুনি, এসবই সরকারী দপ্তর ও বাংলো। স্থানীয় পাহাড়িদের এমন আধুনিক বাড়ি করার রুচিবোধ নেই, হয়ত সঙ্গতিও নেই। এ যেন স্বল্পতুষ্ট সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে টেরিলিন বুশশার্ট-প্যান্ট পরা সভ্যজগতের প্রতিনিধিরা। নতুন আরও ঘরবাড়ি তৈরিও হয় দেখি। এরই মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রমণীয় দোতলা বাংলো। যেমন রাজ্যের প্রধান শহরে রাজ্যপালের প্রাসাদ। গেটের সামনে এসে জানতে পারি, সেইটেই ইনস্পেকশন বাংলো। গেট খুলে ভিতরে যেতে সঙ্কোচ বোধ হয়। পথচারী সাধারণ মানুষকে এখানে থাকতে দেবে তো? না, কোন বাধা নেই। চৌকিদার নীচের ঘর খুলে দেয়। বলে, ওপরে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আছেন। ভাবি, তা থাকুন। আমরাও খাসা থাকব এইখানে। পাশে ডাইনিং রুম, কিচেন, আলমারি ভরা ক্রকারি—সব কিছুরই ব্যবস্থা। ভাবি, জীবনধারার কি বিচিত্র প্রহসন! দেবতা ত্রিলোকনাথ,—আজ স্বয়ং পড়ে থাকেন দুঃস্থ মলিন পরিবেশে, আর তাঁরই দর্শনপ্রার্থী আমরা থাকি সুশ্রী সৌখিন প্রাসাদে।

লাঙ্গল ও পঙ্গীতে এসে পর্যন্ত দেখি ডাকবাংলোতে থাকবার কোথাও অসুবিধা নেই। অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয় না। ঘরও খালি থাকে। এমন দূরদেশে আসছেই বা কে? চৌকিদারও যাত্রী পেলে খুশি হয়।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে রোদে বসি। চারিদিকে পাহাড়। ন-দশ হাজার ফুট উঁচুতে আছি। তার উপর উন্মুক্ত ময়দান। অদূরে চন্দ্রভাগা। দূরে আকাশে মাথা তুলে বরফের পাহাড়। হিমশীতল বাতাস। রোদের পরশ যেন দেহ-মনের পরম বিলাস।

দোতলায় সামনে খোলা ছোট ছাদ। ইঞ্জিনিয়ারও সেখানে বসে রোদ পোহান। উপরে উঠে যাই। আলাপ করি। ত্রিলোকনাথের খোঁজখবর নেওয়াই উদ্দেশ্য। নিঃসঙ্গ দেশে গল্প করার সঙ্গী পেয়ে তিনিও আহ্লাদিত হন। চীফ ইঞ্জিনিয়ার,—অর্থাৎ এ-মুল্লুকের হর্তাকর্তা। শিক্ষিত, অমায়িক ব্যক্তি। পাঞ্জাবে বাড়ি। বলেন, এ-সব এককালে পাঞ্জাবেরই এলাকাভুক্ত ছিল, এখন হিমাচল প্রদেশ হয়েছে। চম্বা অঞ্চলে বহুকাল আছেন। পাহাড়ে ঘুরেছেনও অনেক। ডাক্তার বিশ্বাসদেরও উপরে ডাকিয়ে আনেন। সাদর অভ্যর্থনা জানান। চেয়ার আনিয়ে বসতে দেন। তারপর জমিয়ে গল্প শুরু করেন। বলেন, ত্রিলোকনাথ দর্শনে চলেছেন, খবর রাখি সব। কিন্তু এলেনই যদি, এত দেরি করে কেন? আমার হেড্‌কোয়ার্টার্স এইখানে। আর তিনদিনের মধ্যেই এখানকার পাততাড়ি সব গুটানো হবে। শীতের 'সিজন' শুরু হয়ে এল,—এখন ক'মাস এখানকার কাজকর্ম বন্ধ। ক'দিন আগে এলে এখানে কিছুদিন কাটাতে পারতেন। খুব ভালও লাগত আপনাদের। দেখছেনই তো কি সুন্দর জায়গা, চমৎকার আবহাওয়াও। তাছাড়া, সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের অনেক দুর্গম অঞ্চলও আপনাদের দেখিয়ে আনতে পারতাম—

মণি বলেন, এখন ব্যবস্থা হতে পারে না? দেরি কোথায়? অক্টোবরের মাঝামাঝি। এই তো পাহাড়ে বেড়াবার সব চেয়ে ভাল সময়।

ইঞ্জিনিয়ার জানান, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু হিমালয়ের সব অঞ্চল সম্বন্ধে ও-কথা তো খাটে না। উদয়পুর এ-সময়ও খারাপ নয়। শীত অবশ্য দিন দিন বাড়বে। তবু, এখানে ঘোরা না হয় হল। তারপর ফিরতে হবে তো? রোটাং-এ বরফ পড়ে দুর্গম হয়ে যাবে যে। রাস্তাও কখন বন্ধ হয়, বলা যায় না। দেখছেন তো সামনে নদীর অপর পারের ঐ পাহাড়গুলোর মাথা? ক'দিন থেকে রোজ বিকেল হলেই ওদিকে বরফ পড়া শুরু হয়। বরফের লাইন পাহাড়ের নীচের দিকে দিন দিন কেমন নেমে আসছে। সকালবেলায় ওদিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন।

আমরা স্বীকার করি, ঠিক তাই বটে। এ ক'দিনই নজর করছি, রোজ দুপুরের পর ওদিকের পাহাড়ের মাথা মেঘে একেবারে ঢেকে যায়, বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘের গর্জনও ওঠে, আমরা ভাবি, এই বুঝি বৃষ্টি এল এখুনি, কিন্তু একফোঁটাও বৃষ্টি পাই না। সকালে যখন পরিষ্কার আকাশ, তখন দেখা যায় ঐদিকের সব পাহাড়ের মাথায় বরফ যেন আরও বেড়ে গেছে।

ইঞ্জিনিয়ার বলেন, ঐ তো! ঠিকই দেখেন। এখানে বৃষ্টি বেশি হয় না। জল হলেই বরফ। আর ক'দিন পরে তাই হবে। কিন্তু তার আগেই রোটাং সাধারণের পক্ষে বন্ধ হয়ে যাবে। সেইজন্যেই গভর্নমেন্টের নিয়ম, ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে এখানকার সব দপ্তর গুটিয়ে নেওয়া—যেটুকু না হলেই নয়, শুধু সেইটুকু রাখা। আপনারাও এদিকে বেশি দেরি করবেন না, ত্রিলোকনাথ দর্শন হলেই ফিরতি পথে রওনা হবেন, না হলে রোটাং পার হতে মুশকিলে পড়বেন।

মণির মুখের দিকে তাকাই। বলি, তোমার বরলাচা পাস্, স্পিতি ঘোরা এ যাত্রায় করবে কিনা দেখ।

ইঞ্জিনিয়ার বলেন, আর একদিন আগে এলে আপনাদের আজ ত্রিলোকনাথ দর্শন হয়ে থাকত, আজই আপনারা ফিরে যেতে পারতেন কোক্সারে।

মণি বলেন, কি করে?

তিনি জানান, একটু পরেই আমার এক জীপ মানালী চলেছে এখান থেকে,—সাধারণ গাড়ি এখনও এ পর্যন্ত আসা চালু হয় নি, সরকারী জীপ দরকার হলে যাওয়া-আসা করে, আজই যাবে মালপত্র নিয়ে।

আমরা বলি, তাতে দুঃখ নেই। যেমন এসেছি, তেমনি করেই ফেরা যাবে। ত্রিলোকনাথ দেখা সম্বন্ধে জানবার কিছু থাকে তো বলুন শুনি।

ত্রিলোকনাথ যাওয়ার পথ ঠিকই অনুমান করা গিয়েছিল। এখান থেকে মাইলখানেক ফিরে গিয়ে নদীর উপর সেই পুল পার হওয়া, ওপারে চড়াই ওঠা, সামনের পাহাড়ের মাথায় সেই মন্দির।

ইঞ্জিনিয়ার বলেন, কোনই অসুবিধে নেই। স্বচ্ছন্দে পৌঁছে যাবেন। আমার একটা লোকও না হয় সঙ্গে দেব। কিন্তু ওখানকার দর্শনের ব্যাপারটা জেনে রাখুন, না হলে যাত্রাই বিফল হয়ে যাবে।

আগ্রহ সহকারে শুনতে থাকি।

তিনি বলতে থাকেন, মন্দির-মঠ-গুম্ফা—যে নামই বলুন,—এখন সম্পূর্ণ দখলে আছে তিব্বতী লামাদের হাতে। দেখবেন গিয়ে তারা ভেতরে সাজিয়ে-গুছিয়ে কেমন বসেছে। তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম মতে পূজাঅর্চনা চলেছে, বিগ্রহও যা আছে বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধমূর্তি বলেই তারা পরিচয় দেয়। তা দিক। সব ধর্মেরই ভগবান মূলে একই। ওরা নিজেদের মতানুসারে ব্যাখ্যা করছে। কিন্তু আসল ব্যাপার হল, ওটা হিন্দু মন্দির, বিগ্রহও খাঁটি হিন্দু দেবতার। ওদের হাতে পড়ে মন্দির, দেবতা সবই এখন ঢাকা পড়ে গেছে। এ নিয়ে আমি অবশ্য কোন মন্তব্য করছি না, আপনাদেরও ওখানে করবার কিছু নেই। তবু যেটা করবেনই—ভুলবেন না যেন—সেটা এই। মন্দিরে ঢুকবেন দর্শন করতে, এক বুড়ো লামার তখন খোঁজ নেবেন, অভিবাদন করে তাঁকেই অনুনয় করবেন তিনি নিজে সঙ্গে থেকে যেন দর্শন করান। লামাটি ভাল। তখন হাসি মুখে ভেতরে নিয়ে যাবেন। বিগ্রহের সামনে গিয়ে দেখবেন যেমন সাধারণত হয় সাজগোছ বেশভূষায় মূর্তি ঢাকা, মুখটুকু শুধু দেখা যায়। প্রণাম করে প্রণামী কিছু দিন বা না দিন, বুড়ো লামার হাতে একটা টাকা গুঁজে দেবেন নিশ্চয়। তারপরই বলবেন—হিন্দী বুঝবে—ইশারা করেও বোঝাবেন—বিগ্রহের ওপরকার সাজসজ্জা সরিয়ে নিরাবরণ মূর্তিটি দেখাতে। প্রথমে হয়ত একটু ইতস্তত করবে, এদিক ওদিক চাইবে, কিন্তু ঐ টাকাতেই কাজ হবে—খুলে তখন মূর্তি দেখাবে, মুখেও

বলবে—'শিব শিব'।—দেখবেন তখন কি দর্শন পান। ভারতের অনেক জায়গায় ঘুরছি, বহু বিগ্রহই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, কত সুন্দর মূর্তিও তার মধ্যে দেখেছি, কিন্তু দেখবেন হিমালয়ের এই কোন্ অজানা অঞ্চলে লুকিয়ে থাকা এই মূর্তিটি,—এমন আর কোথাও দেখি নি।—বলতে বলতে থামেন, তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবেন, মুখে চোখে আনন্দের দীপ্তি ফোটে। নিজে থেকেই আবার বলেন, আশ্চর্য সুন্দর! অথচ এই মন্দির বা বিগ্রহের ইতিহাস কিছু জানা নেই। জনপ্রবাদ একটা শোনা যায়—যে ধরনের কাহিনী অন্য অনেক তীর্থক্ষেত্রেও চলে আসছে—তবে এখানে গল্পের শেষটা একটু ভিন্ন রকমের।

কাহিনীটি শোনবার কৌতূহল প্রকাশ করি। তিনি বলেনও, গল্পের গোড়ার দিকটার নূতনত্ব কিছু নেই। তবু সবটা বলি। ঐ অঞ্চলে এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অনেকগুলি গরু ছিল। রাখাল রোজ বনের মধ্যে সেগুলি চরাতে নিয়ে যায়। কিন্তু রোজই দিনের শেষে ঘরে ফিরলে দেখা যায় কোনও গরুর বাঁটে এক ফোঁটাও দুধ নেই। রাখাল কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারে না। গৃহস্থ রোজই বকাবকি করেন, তাতেও কোন ফল হয় না। কয়েকদিন এইভাবে যায়। একদিন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে রাখাল ব্যাপারটা জানতে পারে। দেখে, গরুগুলো যখন নিশ্চিন্ত মনে চরে বেড়ায়, হঠাৎ কোথা থেকে সাতটি সুন্দর মূর্তি এসে হাজির হয়, সব দুই দুইয়ে নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু ঘরে ফিরে রাখালের এ-সব কথা কোনমতেই মনে পড়ে না। বন থেকে ফেরবার সময় একদিন ভাবে, এক কাজ করা যাক, একটা গরুর মাথায় পাথর বেঁধে দিই, ঐটে দেখলেই সব কথা মনে পড়বে। করেও তাই। গোয়ালে এসে গরুগুলো হুড়মুড় করে ঢোকে, সেখানে পাত্রে অপর গাই-এর দোহা দুধ রাখা ছিল, গরুর মাথায় বাঁধা পাথর খুলে সেই পাত্রের ওপর পড়ে, পাত্র ভাঙে, দুধও নষ্ট হয়। গৃহস্থ রেগে রাখালকে মারতে যান, গরুর দুধ সব খাইয়ে আনিস্, শিং-এ আবার পাথর বেঁধে এনেছিস্? পাথর! হাঁ ঠিক তো! রাখালের সব কিছু মনে পড়ে যায়। সব ঘটনা তখনই মনিবকে জানায়ও। পরদিন গৃহস্থ দলবল লাঠিয়াল নিয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সেই সপ্তমূর্তি যথানিয়মে আসেন, এরা ঘিরে ফেলে। ধরে বেঁধে নিয়ে গ্রামে চলে। মূর্তিগুলির কিন্তু ভয়-ভাবনা নেই; ওজর-আপত্তি নেই, হাসিমুখে চলেন। এরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, অবাক হয় রূপ দেখে। মানুষ না দেবতা! কি মিষ্টি কথা! মূর্তিরা অনুনয় করেন, গ্রামে নিয়ে যাবে, চল, আমরা নিজেরাই যাব তোমাদের পেছনে পেছনে। কিন্তু বাঁধন খুলে দাও, এ কি মানায় আমাদের? কথা দিচ্ছি পালাব না। কিন্তু একটা শর্ত। গ্রামে পৌঁছুবার আগে কোন কারণেই পিছনে ফিরে আমাদের দিকে তাকাতে পারবে না, তাকালেই আর আমাদের দেখতে পাবে না। এঁদের রূপে ও কথায় মুগ্ধ হয়ে গ্রামবাসীরা রাজী হয়। বাঁধন খুলে দিয়ে এগিয়ে চলে। বলে, পিছু পিছু ঠিক এস কিন্তু। একটু পরেই পিছনে সুমিষ্ট সুরে নাচ, গান, বাজনার মধুর ধ্বনি ওঠে। গ্রামবাসীরা আনন্দে আত্মহারা হয়। শর্ত ভোলে। অবাক হয়ে পিছনে ফিরে তাকায়। অমনি নিমেষে গান-বাজনার সুর মিলিয়ে যায়, মূর্তিগুলিও চোখের পলকে অদৃশ্য হয়,—কেবল একটিমাত্র মূর্তি পাষাণে পরিণত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই মূর্তিটিই এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়—ঐ মন্দিরে। আর কিছু বলব না,—দেখবেন গিয়ে কাল, কী সেই মূর্তি।

আবার কি যেন ভাবেন, তারপর বলেন, দেখুন, হিন্দু দেবদেবীর মন্দির এ-অঞ্চলে আরও আছে। কেই বা তার খোঁজ রাখে, কেই বা তাদের ইতিহাস লেখে? এই সুদূর দেশে—দুর্গম হিমালয়ে—কারা কবে এ-সব প্রতিষ্ঠা করেন,—এ-ও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। উদয়পুর গ্রামে এখনও তো যান নি—ঘুরে দেখে আসুন একটু পরেই। সুমুখের এই রাস্তা ধরে আরও আধ মাইল এগিয়ে গেলেই গ্রাম আরম্ভ,—ঐ পাহাড়ের ওদিকে খানকয়েক ঘর দেখা যাচ্ছে। ঐ গ্রামের মধ্যেই দেখবেন, অনেক কালের পুরানো আর এক মন্দির। এখনও নিয়মিত ওখানে পূজার্চনা চলে। আমাদের হিন্দুমতেই। ঐ গ্রামেই পূজারীর বাস।

বেয়ারা চা দিয়ে যায়। বলেন, নিন, চা খান, শীতের দেশ, যে কোন সময়েই চা চলতে পারে।

জিজ্ঞাসা করি, চন্দ্রভাগা এদিক দিয়ে এগিয়ে গেছে কোথায়? আপনি আরও ভেতরে নিশ্চয় কত জায়গা দেখে এসেছেন!

তিনি বলেন, সেই গল্পই তো করতে যাচ্ছিলাম। ঘুরতে হয়েছে আমাকে এখানে বহু, যেতেই হয় কাজের ব্যাপারে। অনেক দুর্গম জায়গাতে। এ-সবই আমার এলাকার মধ্যে। এই নদী ধরে একশ মাইল এগিয়ে গেলে কাশ্মীর। জম্মু কাশ্মীর হয়ে তারপর পাঞ্জাবে—পাকিস্তানে—নেমেছে এই চিনাব। যেতেন যদি এই নদীর ভ্যালি দিয়ে—পথ আছে যাবার—আরও কত সুন্দর দৃশ্য তো পেতেনই, বহু বিচিত্র

অভিজ্ঞতাও হোত। কথা হচ্ছিল এইসব হিন্দু মন্দির এখন লামাদের দখলে চলে আসার। কিছু মনে করবেন না, আমার আবার ও-সব ধর্মের ব্যাপারে কোনই 'ইনটারেস্ট' নেই। যে যেমন ইচ্ছে পুজো-আচ্চা করুক, আমার যায় আসে না। তবে ঐ সব পুরানো মন্দির ও মূর্তি সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল আছে। হিন্দু 'ফিলসফি'ও সামান্য কিছু পড়েছি, সব যে বুঝি তা বলি না, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ যে এইসব মন্দির ও মূর্তির সাহায্যে ভারতের ইতিহাসের ও সংস্কৃতির অনেক লুপ্ত তথ্য উদ্ধার করা যেতে পারে। তিব্বত, নেপাল—হিমালয়ের এই উত্তর অংশে ঘুরলেই দেখা যাবে, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়ে গেছে—কেমন করে ধীরে ধীরে আমাদের দেবদেবী অনেকেই বৌদ্ধদের দেবতা পর্যায়ে স্থান পেয়েছেন, আমরাও বুদ্ধদেবকে অবতার বলে মেনে নিয়েছি। বৈদিক যুগের সেই কয়টি মাত্র দেবতা কিভাবে হিন্দুধর্মে অসংখ্য দেবদেবীতে পরিণত হলেন, আবার তাঁদেরই অনেকে লামাদের ধর্মমতে ও শিল্পকলায় নতুন বেশে ও নতুন নামে রূপায়িত হলেন,—এইসব মন্দিরে গেলে সেইসব প্রাচীন মূর্তি ও চিত্র যেন মূক হয়ে তাকিয়ে থাকে ভাষা পাবার জন্যে। কিন্তু আমাদের দেশের ক'জনই বা এই নিয়ে মাথা ঘামায়? অবশ্য এই সম্পর্কে একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য কি জানেন? হিন্দু শিল্পীরা মূর্তি বা চিত্রের মধ্যে বৌদ্ধ দেবতার প্রতি কোথাও অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন বলে দেখা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধদের হাতে হিন্দু দেবদেবীর লাঞ্ছিত ও পদদলিত হওয়ার নিদর্শন কোন কোন মূর্তিতে দেখা যায়। এটা নিছক ধর্মবিদ্বেষ। তাই সে কথা থাক। আমি ধর্মসংস্কারের কথাই বলছি। এই দেখুন না, আরও একটা মন্দিরের খবর দিই। এই চন্দ্রভাগার পাশের পথ দিয়ে আরও মাইল চল্লিশ এগিয়ে গেলে একটা ছোট্ট গ্রাম। সেখানেও আমাদের বাংলো আছে। ঐখান থেকে পাহাড়ের মধ্যে একটা নিভৃত অংশে খুব প্রাচীন মন্দির আছে, প্রকাণ্ড এক গুহাও। এখন সবই ভাঙাচোরা পড়ে আছে। কেউ যায় না। পূজা তো দূরের কথা। আমি একবার খবর শুনে দেখে এসেছি। এ-বছর আবার যখন ঐ ইনস্পেকশন বাংলোতে যাই বাংলোর খাতাতে দেখি, দুই জার্মান সাহেবের নাম। জার্মান সাহেব! এখানে কি করতে এল? খোঁজ নিই। তখনই শুনি কিছুকাল হল তিব্বত থেকে এক লামা এসে ঐ গুহায় বাস করছেন। তিনি নাকি অলৌকিক শক্তিশালী উচ্চস্তরের মহাত্মা। কোথা থেকে কি করে খবর পেয়ে তাঁরই দর্শনে চলে এসেছে এই বিদেশীরা। অথচ, আমরা এখানে থেকে কোন কিছুই জানি না। তাড়াতাড়িতে এবার আমার নিজের আর ওখানে যাওয়া হয় নি। খোঁজখবর ভাল করে নিতে বলেছি—ঠিক ব্যাপারটা জানবার জন্যে। ভাল কথা, আমি তো গল্পই করে চলেছি। গ্রাম দেখতে যাবেন তো বেরিয়ে পড়ুন। বিকেল এখানে বেশিক্ষণ থাকে না,—সূর্য ডুবলেন, অমনি প্রচণ্ড শীত বোধ হবে।

অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমরাও তাড়াতাড়ি রওনা হই।

উদয়পুরের এ অংশ যেন পশ্চিমের শহরের আগেকার দিনের ক্যানটনমেন্ট এলাকা। ছিমছাম বাড়ি, প্রকাণ্ড কমপাউন্ড। মাঠ পার হয়ে রাস্তা ঘুরে যায় অর্ধচন্দ্রাকারে। পাহাড়ের বড় বাঁক। খাদের মধ্যে দিয়ে নেমে আসা বড় ঝরনা। এ-সময়ে ক্ষীণ ধারা। পথ যায় পুলের উপর দিয়ে। ঝরনার আশেপাশে অনেকগুলি বড় বড় গাছপালা; এদেশে তারা যেন বিদেশী আগন্তুক। একই জায়গায় জটলা করে 'কলোনি' বসায়। স্থানটি মনোরম। উদয়পুর জায়গাটাই সুন্দর। কয়েকদিন শান্তভাবে কাটাবার মত। এগিয়ে গিয়ে পথ গ্রামে ঢোকে। দু-পাশে বাড়ি। ছোট গ্রাম। তাহলেও পরিচ্ছন্ন। কয়েকটা গরু দেখে দুধের সন্ধান করা হয়। এক ফোঁটাও পাওয়া যায় না। মনে পড়ে, ত্রিলোকনাথের উপাখ্যানের কথা।

গ্রামের বাড়িগুলো ছাড়িয়েই মন্দির। পথের উপর নয়। পাশে পাহাড়ের সামান্য উপরে। কয়েকটা ধাপও আছে। দূর থেকে দেখে মনে হয়, কাঠের প্যাগোডা আকারের মন্দির, পাহাড়ে কোথাও কোথাও যেমন হয়। কাছে গিয়ে দেখি, তা নয়। প্রাচীন স্থান। পাথরেরই মন্দির—শিখর-যুক্ত। বাইরে কাঠের আচ্ছাদন। ভিতরেও পাথরের গর্ভগৃহ; কিন্তু সামনে মণ্ডপে কাঠের স্তম্ভ, অলিন্দেও কাঠের ফ্রেম। কাঠের উপর সুন্দর কারুকার্য। বিভিন্ন মূর্তিও খোদাই করা। রামায়ণের কোন কাহিনী, দশমহাবিদ্যা, প্রকাণ্ড ত্রিবিক্রম মূর্তিও। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—অষ্টভুজা মহিষাসুরমর্দিনী। ধাতুমূর্তি। কে কবে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন কি জানি। কার্তিকী অমাবস্যায় মেলা বসে, শুনি। ভাবি, যে দেবতারই তীর্থক্ষেত্র হোক—শিবস্থান বা বিষ্ণুমন্দির—জননীর আরাধনা সর্বত্রই। মনে পড়ে, রাবণকে বধ করে সীতা উদ্ধার করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রও দেবী দুর্গারই আরাধনা করেন, অভীষ্টও সিদ্ধ হয়। আবার, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই পার্থসারথি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেবী দুর্গারই স্তব করতে বলেন। অর্জুনের সেই

দেবীস্তোত্র প্রসিদ্ধ। পাণ্ডবদের যুদ্ধজয়ও হয়।

আমার কামনা অতি সামান্য। বহুদিনের বাসনা, ত্রিলোকনাথ দর্শন। সেই অভিলাষ পূরণের পূর্বে জগজ্জননীর এমন অভাবিত দর্শন মনে শিহরণ জাগায়। ভক্তিভরে প্রণাম করি।

হঠাৎ মনে পড়ে, আজই তো বিজয়া দশমী।

॥ ১০ ॥

সকালে উঠে যাত্রা। গতকালের আসার পথে ফেরা। তবু মনে হয়, না-দেখা নতুন পথ। মনে আজ এমনই নবীন উৎসাহ। একটু পরেই হবে ত্রিলোকনাথ দর্শন।

মাইলখানেক এসে পুরানো পথ ছাড়ি। নদীর ধারে নামি। পুল পার হই। ওপারে নদীর কূল ধরে কিছুদূর সমতল পথে চলা। তারপরই চড়াই শুরু। ধীরে ধীরে পথ ওঠে। এদিকে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছপালা। বনপথ এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে চলে। মাঝে মাঝে ছোট ঝরনা। বনের মধ্যে কোথাও কোন পাখির ডাক শুনি না। চড়াই উঠার পরিশ্রম পাহাড়ের সকালের শীতকে দূরে ঠেলে। চড়াই-এর দুর্দমতা নেই। আনন্দ পাই উঠতে। মনে হয়, মাইল দুই ঘুরে ঘুরে ওঠা। এই পাহাড়ের কাঁধের উপর পৌঁছই। সমতল ভূমি। অদূরে ছোট গ্রাম। চাষ-আবাদ করে দেখি, গ্রামবাসী লাহুলী। সকৌতুক দৃষ্টিতে তাকায়। প্রশ্ন করে, কোথায় চলেছি? আবার নিজেই তখনই বলে, ত্রিলোকনাথে? হাবভাব ও কথার মধ্যে স্পষ্ট বোঝা যায়, ত্রিলোকনাথের সম্পর্কে তাদের কেমন যেন এক নিস্পৃহ নির্লিপ্ত ভাব। এত নিকটে বাস, তবু যেন নিঃসম্পর্ক। সাংসারিক বিপর্যয়ে এ যেন অতি নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। কাছে থেকেও বহুদূরে। ত্রিলোকনাথ? তিনি তো এখন ভিন্নধর্মী দেবতা!

এ-গ্রাম ছাড়িয়ে আরও আধ মাইল সোজা যাওয়া। প্রকাণ্ড খোলা মাঠ। তারই পাশ দিয়ে পথ। মনেই হয় না পাহাড়ের প্রায় হাজারদশেক ফুট উপর দিয়ে চলি। ডান দিকে মাঠের শেষে মাথা তুলে চম্বার গিরিশ্রেণী। বাঁ দিকে সুমুখে খানিকটা উঁচু জায়গায় ত্রিলোকনাথ গ্রাম, গ্রামের মাঝে মন্দির। ওরই পিছন দিকে চন্দ্রভাগার খাদ। এখান থেকে দেখা যায় না, বোঝাও যায় না।

গ্রামে ঢুকি। তিব্বতী ছেলে মেয়ে পুরুষ ঘোরে। ঝাঁকড়া চুল, লম্বাটে মুখ, কানে মাকড়ি, গলায় মালা। যেমন কাপড়চোপড়ের দুর্দশা, গ্রামও তেমনি নোংরা। দুর্গন্ধময় আবহাওয়া। হবার কথাও। পথে আবর্জনা তো আছেই, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও চোখের সামনে দেখি পথের উপরই বসে কাজ সারে। লোকগুলিকে দেখেই মনে হয় অত্যন্ত গরিব। সন্দেহ হয়, কোনরকম উপার্জনের পন্থা নেই। এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের সঙ্গেও কোন মেলামেশা বা হৃদ্যতা নেই। কেন যে এ-ভাবে এখানে পড়ে আছে, এলই বা কিসের টানে, বুঝি না। এ যেন তীর্থক্ষেত্রে ভিখারীর পাল, অথচ ভিক্ষা চেয়ে হাতও পাতে না। শুধু মন্দিরকেই আঁকড়ে ধরে থাকা। অথচ মনে হয়, দেবতারও করুণার ভিখারী নয়। সর্বহারা মানুষ এরা।

মন্দির-এলাকায় এসে স্বস্তি পাই। এ জায়গাটা তবু পরিষ্কার।

কাঠের বড় দরজা। পার হয়ে ভিতরে চলি। অল্প গিয়েই মন্দিরের আঙ্গিনা। তিন দিক ঘিরে ঘরদালান। কোথাও দোতলাও। আর এক দিকে মাথা তুলে বড় মন্দির। পাথরে তৈরি। উপরে সাদা রং। উড়িষ্যার মন্দিরের মতন আকার ও শিখর। মন্দিরের দরজায় তালাবন্ধ। দরজার সুমুখে উঠানের মাঝামাঝি প্রকাণ্ড বেদীমত। যেন শিবালয়ে বৃষ স্থাপনের বাঁধানো বেদী। তারই পাশ দিয়ে দোতলায় একটি ঘরে ওঠার সিঁড়ি। দু-তিনটি লামা উপর থেকে উঁকি মারেন। যাত্রী দেখে নেমে আসেন। অন্য আরও কয়েকজন যাত্রী আছে। উঠানের ধারে বারান্দায় তারা আশ্রয় নিয়েছে। পোঁটলাপুঁটলি খোলা, জিনিসপত্র ছড়ানো। দেখেই বোঝা যায়, দু-একদিন এখানে বাস করছে। দুজন পুরুষ, দুটি মেয়ে, গুটিতিনেক ছোট ছেলেমেয়ে। একটা পাত্রে কি যেন মেখে বাচ্চাগুলি খাওয়ায় ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করে শুনি, স্পিতির লোক। এদেরও ঝাঁকড়া চুল, গায়ে ঝলঝলে আলখাল্লা। বৌদ্ধ। হেঁটেই এসেছে তীর্থযাত্রায়। অনেকেই আসে। এরা বিশ্বাস করে, ত্রিলোকনাথ তাদের একটা তীর্থ। পরে, এখান থেকে কীর্তিং-এ ফেরবার হাঁটাপথে এই রকম কয়েকটি যাত্রীদলকে আমরা আসতে দেখি। দল বেঁধে আসে, মেয়ে-পুরুষ। কাঁধে-পিঠে ঝোলাঝুলি, বস্তা। সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ে। সবারই মুখে, মাথায়—সর্বাঙ্গে ধুলা ভর্তি। দেহে পথ চলার ক্লান্তি। তবু পথ চলে উৎসাহভরে, যেন মনের আনন্দ পথে ছড়াতে ছড়াতে। তীর্থযাত্রীর সেই চিরন্তন আনন্দময় রূপ। যেমন দেখেছি কেদার-বদরীর পথেও। শুনি জুলাই মাসে ত্রিলোকনাথে প্রতি বছর মেলা

বসে। দু-দিন থাকে। প্রায় হাজারখানেক যাত্রী তখন এখানে আসে। কিন্তু তাতে হিন্দু যাত্রীই বেশি থাকে।

লামা দুজন উঠানে নেমে আসেন। কুঁচকানো মুখ-চোখ বৃদ্ধ লামাটিও এর মধ্যে আছেন। তাঁরই হাতে চাবি দেখে নিশ্চিন্ত হই। এগিয়ে হাসিমুখে অভিবাদন করি। তিনিও প্রসন্ন মুখে মন্দিরে আসতে ইঙ্গিত করেন। দরজা খোলেন। ভিতরে ঢুকেই প্রকাণ্ড লম্বা হলের মত। সারি সারি স্তম্ভ—পাথরের, কাঠেরও। পাথরেরই মন্দির। মধ্যখানে ক্ষুদ্র গর্ভগৃহ। তারই সুমুখে এসে সকলে দাঁড়াই। বৌদ্ধ মঠের মত ধূপদীপ মোমবাতি জ্বলে। দুটি অখণ্ড জ্যোতি প্রদীপও জ্বলতে থাকে। শুনি, যাত্রীমাত্রেরই এতে ঘি দেওয়ার প্রথা। লামা "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" বলে বৌদ্ধমন্ত্র গুঞ্জন করতে থাকেন। বিগ্রহ সাজসজ্জায় ঢাকা। মুখখানি শুধু দেখা যায়। প্রণাম করে ধূপ-বাতি জ্বালানো হয়। লামার হাতে একটা টাকা দিতেও ভুল হয় না। তারপরই একটু হেসে বলা ও ইশারা করা;—আবরণ সরিয়ে একবার মনের সাধ মিটিয়ে বিগ্রহ দর্শনের একটু সুযোগ দিন—বহু দূর দেশ থেকে আসছি।

একটু ইতস্তত করেন। মৃদু হাসেন। তারপর মাথা নেড়ে যেন সম্মতি জানান। এগিয়ে গিয়ে বিগ্রহের উপরের সাজপোষাক একপাশে সরিয়ে ধরেন, মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে মুখে বলতে থাকেন, 'শিব'-'শিব'-'শিব'। এ যেন আঁধার ঘরে হঠাৎ আলোর দীপ্তি ফোটে। নিশ্চল নিস্তব্ধ রঙ্গমঞ্চে নৃত্যছন্দের হিল্লোল জাগে। অবাক হয়ে দেখি। এ কী অপূর্ব মূর্তি! নটরাজ শিব। নাচতে নাচতে হঠাৎ চমকে থমকে দাঁড়িয়ে।

সাদা ধবধবে পাথর। ফুট দেড়েক উঁচু। নাচের ভঙ্গিমায় বাঁ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো, অপর পা-ও নাচের ছন্দে বেঁকিয়ে সামনে তোলা। ষড়ভুজ। ছয় হাতেও নাচের ছন্দ যেন সারাদেহে তরঙ্গ তুলে ছড়িয়ে পড়ে। মাথার উপর জটার মাঝে আর একটি অতি ক্ষুদ্র সুন্দর মূর্তি। পদ্মাসনে আসীন। লামা বলেন, 'অনাজ গুরু'। শুনে ভাবি 'অনাজ' কি অনাদির কথ্য রূপ? কিন্তু অনাদি গুরুর কথাও তো শুনি না। 'আদি গুরু' শোনা যায়। কোন কোন বৌদ্ধ মূর্তির শিরোভাগে সম্প্রদায় অনুযায়ী আদি বুদ্ধের ক্ষুদ্র মূর্তি দেওয়ার শাস্ত্রমত ও প্রথাও আছে বটে। অথবা, কি জানি, এই ক্ষুদ্র মূর্তি কি গঙ্গা দেবীরই? তখনই আবার ভাবি, 'ত্রিলোকনাথ' নাম কি বৌদ্ধ দেবতাদের নামের তালিকায় পাওয়া যায়? 'ত্রৈলোক্য-শঙ্কর' শোনা যায় বটে। কিন্তু সে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি। বৌদ্ধ শিল্পকলায় সৌম্যমূর্তি নটরাজ স্থান পেলেন কবে, কি ভাবে, কি জানি!

কিন্তু অকারণ এই ভাবনা। কৌতূহলী মন তখনই মন্ত্রমুগ্ধের মত ফিরে আসে সামনের অপরূপ মূর্তির পানে। দেখি উজ্জ্বল, নিষ্কলঙ্ক, শ্বেতপাথরের মূর্তি। তবু মনে হয় কুসুমকোমল। স্তব্ধ নিশ্চল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তবু মনে হয়,—প্রাণবন্ত, ছন্দোময়; যেন নাচের ফাঁকে ক্ষণিকের স্তব্ধ ভাব, শুভ্র সমুজ্জ্বল মর্মরতলে এখনও যেন প্রাণের স্পন্দন ফোটে।

মনে পড়ে, সেই প্রবাদ কাহিনী। সেই সপ্ত মূর্তির অলক্ষ্যে নৃত্যগীত। ছয় সাথীর আচম্বিতে অদৃশ্য হওয়া। শুধু এই এক মূর্তির থেকে যাওয়া—পাষাণে পরিণত হয়ে।

অপরূপ সাবলীল ছন্দোময়ী মধুর মূর্তি।

তন্ময় ও মুগ্ধ হয়ে আমরা দেখতে থাকি। বাইরে এসেও আবার লামাকে নিয়ে ফিরে যাই—আবার দর্শন করি। বার বার দেখেও সাধ মেটে না।

মণি বলেন, দাদা, এ কী দেখে গেলাম! যাত্রা সত্যিই সার্থক হল।

মন্দিরের বাইরেও এক মহান দৃশ্য।

পাহাড়ের গা বেয়ে মন্দিরের ছাদে ওঠা যায়। পিছনে দূরে নীল আকাশে যেন 'হংসশুভ্র মেঘের ঝালর'। দিগন্তজোড়া তুষার-শিখর। অমলধবল। সে-ও যেন শ্বেতপাথরে গড়া। সেই তুষারশৃঙ্গের বেদীতলে মানুষের হাতে তৈরি পাথরের কারুকার্যময় মন্দিরের চূড়া। দেবতার সামনে এ যেন হোমকুণ্ডে অগ্নিশিখা। মন্দিরশিখর থেকে চারদিকে লম্বা করে সারি সারি টাঙানো রশি। তারই গায়ে ঝোলানো নানা রঙে রঙিন পতাকা। শিখরের চারিপাশেও মাথা তুলে রং-বেরংয়ের ধ্বজা। বাতাসের বেগে সেই পতাকাগুলি মৃদু-মধুর শব্দ তুলে তরঙ্গভঙ্গে দুলতে থাকে।

ভাবি, এ যেন ধ্যানমৌন হিমালয়ের দৃষ্টিতলে সারা বিশ্ব নটরাজেরই ছন্দে মেতে নৃত্য করে, মহান সঙ্গীতের ঐক্যতানে ঝঙ্কার তোলে।

যেন জগতের পূতিময় পঙ্কের মাঝে ফুটে থাকে সোনার কমল।

বৈষ্ণোদেবী

কাশ্মীরের অমরনাথ তীর্থের নাম সারা ভারতে কে না জানে? হিমগিরির হিমাঞ্চলে বিরাট গুহা। তারই অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক সৃষ্টি,—তুষারগঠিত স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। হাজার হাজার যাত্রী চলে দর্শনে। শুভ দর্শন—শ্রাবণী পূর্ণিমায়।

কিন্তু, সেই কাশ্মীরেরই আর এক পার্বত্যগুহার নিভৃতাঞ্চলে, জম্মুর সন্নিকটে, প্রসিদ্ধ তীর্থ বৈষ্ণোদেবী,—তার সংবাদ বাঙালীর কাছে তেমন প্রচার নেই। অথচ, কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে,—এমন কি, উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলেও,—এমন লোক আছেন কিনা সন্দেহ, যিনি এ তীর্থের নাম শোনেন নি। শুধু শোনা নয়। লক্ষ লক্ষ যাত্রী চলে বৈষ্ণোদেবীর দর্শনে। অনেকেই যান,—একবার নয়, দুবার নয়,—বারংবার। বছরের পর বছর। বাঙালীর বার্ষিক দুর্গোৎসবের মতন এই তীর্থযাত্রার দুর্জয় আকর্ষণ। মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব সবাই দল বেঁধে চলেন,—এই পার্বত্য তীর্থপথ আনন্দ-মুখর করে, ভক্তিস্রোতের প্লাবন বইয়ে। তীর্থযাত্রার যে-প্রকৃত পরম রসানুভূতি, অগণিত যাত্রীদের মধ্যে যে অপরূপ একাত্মবোধের প্রেম-সূত্র,—এই পথে যেমন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, এমন আর কোন তীর্থপথে দেখি নি।

অথচ, এই যাত্রা-পথ দীর্ঘ নয়, দুর্গমও নয়। দুদিনের মাত্র ক্ষণস্থায়ী যাত্রা। কিন্তু, তারই অতুল আনন্দ অনন্ত হয়ে চিরদিন থাকে মনে। আমার যাত্রা কি ভাবে হয়, তাই বলি।

জীবনে দেখা যায়, কোন কোন ঘটনা ঘটবার আগে তার যেন ছায়া ফেলে। সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেও যেমন উষার আলোর আভাস ফোটে।

বৈষ্ণোদেবীর প্রথম নাম শুনি, হিমালয়ের আর এক যাত্রা-পথে। অপরিচিতের মুখে। অতর্কিত ভাবে।

সংবাদদাতার কণ্ঠে বিস্ময়পূর্ণ প্রশ্ন, হিমালয়ে ঘোরেন দেখি, অথচ বৈষ্ণোদেবীর দর্শন হয় নি!

হয় না তার পরও কয়েক বছর। ভাবি, সব ঘটনারই কি দিনক্ষণ স্থির থাকে? নির্ধারিত সময় এলে তবেই ঘটে।

হঠাৎ উপস্থিত হই উত্তর ভারতের এক শহরে। স্থানীয় এক বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে কন্ট্রাকটারি কাজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। বিরাট এক অট্টালিকা তোলেন হালফ্যাশানের। জোর করে নিয়ে চলেন তাঁর প্রাসাদ দেখাতে। 'ডাইনিং হল'-এ টেবিলে সাজানো নানাবিধ খাদ্যসম্ভার। দেখে মনে হয়, খাওয়ানোর ছলনায় প্রাচুর্যের প্রদর্শনী। কাশ্মীর থেকে আনা মাশরুম, পদ্মডাঁটা-মৃণাল ইত্যাদিরও ব্যঞ্জন। অল্প কিছুকাল আগে পর্যন্ত কাশ্মীরে ছিলেন, তারই গল্প শোনান। হঠাৎ তাঁর স্বর শান্ত ও ভক্তিপ্লুত হয়, বৈষ্ণোদেবীর কথা বলতে। অবাক হন শুনে, এখনও দর্শন করার সৌভাগ্য হয় নি আমার! নিজে থেকেই কাগজে লিখে দেন কোথা থেকে কী ভাবে যেতে হয়।

মনে মনে হাসি। এ প্রাসাদে আমার আসা, যেন বৈষ্ণোদেবীর যাত্রাপথের বিবরণ পেতেই!

ফিরে আসি কলকাতায়। পাঞ্জাবী এক ভদ্রলোক আসেন দেখা করতে। তাঁরই এক জরুরী কাজে। আসবার কথা ছিল কয়েকদিন আগে। এসেই জানান, বৈষ্ণোদেবীর যাত্রায় চলে যাওয়ায় এই বিলম্ব। সোজা চলে এসেছেন সেখান থেকে। ভাবি, এ-যেন গুহাবাসিনী সন্ন্যাসিনী জননীর দূত মারফত অনুজ্ঞা, চলে এসো এখনই। মনেপ্রাণে অভূতপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করি।

বেশ বুঝতে পারি, এতদিনে এবার সময় এল যাবার।

১৯৬৭ সাল। ত্রিলোকনাথ দর্শন করে সঙ্গীদের সঙ্গে মানালীতে ফিরি। মানালী থেকে কাংড়ায় আসি। ভোরে উঠে বহু বছর পরে আবার চলি জ্বালামুখী দর্শনে। ফিরে এসে কাংড়ায় বাস্ বদল করে পাঠানকোটে আসা। সেখানে নেমে জম্মুর বাস্ ধরা। জম্মু পৌঁছুতে রাত নটা বাজে। ঘুরতে ঘুরতে

আমাদের আসা, তাই এই বার-বার ওঠা-নামা, হয়রানি।

ইদানীংকালে কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপেই সোজা জম্মু পৌঁছনোর সুব্যবস্থা হয়েছে।

জম্মুতে ট্যুরিস্টদের জন্যে যাত্রীশালা। বিরাট অট্টালিকা। হল্ঘর। কিন্তু যত্নের অভাবে ও যাত্রীদের অপব্যবহারে অপরিচ্ছন্ন। খবর নিয়ে জানি, বৈষ্ণোদেবী যেতে কাল সকালে এরই নিকট থেকে কাটরার বাস ধরতে হবে। অতএব, এখানে রাত কাটানো সুবিধা। তবুও নোংরা দেখে মন উঠে না। তা ছাড়া, কাল এখানে মালপত্র কিছু রেখে যাওয়ার ব্যবস্থাও দেখি না। নিকটে এক হোটেলে গিয়ে উঠি। নাম 'ব্লিস্' হোটেল। সারাদিনব্যাপী বাসযাত্রার ধকলের পর দেহ প্রকৃতই আরাম উপভোগ করে।

সকালে বাস্-স্টেশনে হাজির হই। মালপত্র হোটেলেই থাকে। আগামীকাল বিকেলে আবার এখানেই ফিরে আসা। দুটো দিনের জন্যে কতটুকুই বা প্রয়োজন! বৈষ্ণোদেবীর পাহাড়ের ওপরে শীত হবে, তাই গরমজামা বা সোয়েটার, একটা গরম চাদর, পাতবার জন্যে বিছানার চাদর, রবারের হাওয়া-বালিশ,—এই হলেই চলে যাবে। নেহাত প্রয়োজন হলে সেখানে ধর্মশালায় কম্বলও ভাড়া পাওয়া যায়, শুনেছি। কিন্তু, সাধারণের ব্যবহৃত সেসব শয্যা, গায়ে দিতে বা পেতে শুতে মন চায় না। অথচ তীর্থপথে চলার আনন্দ,—মোটঘাট যত হালকা হয়। শুধু বাইরের বোঝাই নয়, মনও যত ভারশূন্য থাকে।

কাটরার যাত্রী অনেক। বাসও ছাড়ে একাধিক। স্থানাভাবের ভাবনা থাকে না। সকাল সাড়ে আটটায় রওনা। কাটরা জম্মু থেকে ৩১ মাইল দূর।

বাস্ চলতে শুরু হতেই সারা গাড়ি মুখরিত হয়ে ওঠে—'জয় মাতাদী' 'জয় মাতাদী' ধ্বনিতে।

কান খাড়া করে শুনি,—'মাতাজী' নয়, 'মাতাদী'-ই বলে। 'দী' বোধ করি 'জী'-এরই রূপভেদ।

শহর ছেড়ে ঘুরেফিরে বাসের রাস্তা। ছোটখাটো পাহাড়, টিলা, মাঠ, পাহাড়ী নদী পেরিয়ে এগিয়ে চলে। দূরে দেখা যায় গাঢ় নীল পাহাড়ের শ্রেণী। আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। বাস্ সেই দিকেই হেলেদুলে ছুটে চলে—তারই কোলে ওঠার যেন বায়না ধরে।

বাস্-এর পিছন দিকের বেঞ্চে দুটি তরুণ পাঞ্জাবী বসে। পরনে রঙ-বেরঙের বুশ্শার্ট, প্যান্ট। ট্রান্জিস্টার খুলে সবে সিনেমার কি এক গান ধরেছে। অমনি সামনের বেঞ্চের যাত্রীরা পিছন ফিরে তাকায়। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে 'জয় মাতাদী' রব তোলে। সমবেত কণ্ঠে সুমধুর কীর্তন ধরে। অন্যান্য সব যাত্রীও তখনই যোগ দেয়। ট্রানজিস্টারের আওয়াজ ডোবে। ছোকরা দুটি লজ্জা পায়। ট্রানজিস্টার বন্ধ করে। অল্প পরে তারাও কণ্ঠ মেলায় কীর্তনের সুরে। ঝগড়া নয়, নিষেধ নয়, জোরজুলুম নয়,—মাতৃনামের অনাবিল আনন্দ-মহিমায় দলে টানা।

জম্মু থেকে মাইল পাঁচেক এসে নগরোটা গ্রাম। গ্রাম ছাড়িয়ে পাহাড়ী পথ উঁচুতে উঠতে থাকে। আরও ১৬ মাইল গিয়ে নন্দিনী গুম্ফা। পাহাড়ের মধ্যে। চা ইত্যাদির দোকান। আরও তিন মাইল এগিয়ে ডোমেল। শ্রীনগরের রাস্তা একদিকে বেঁকে যায়,— শুনি, এখান থেকে ১৫৮ মাইল। আমরা যাব ভিন্ন পথে কাটরা,—আর সাত মাইল মাত্র।

পথ এবার খানিক উৎরাই। হঠাৎ আবার 'জয় মাতাদী'র উচ্ছ্বসিত ধ্বনি বাস কাঁপিয়ে তোলে। জানলা দিয়ে যাত্রীরা উৎসুক নয়নে তাকায়। আঙুল তুলে দেখায়,—ঐ অদূরে সুমুখে পাহাড়—ত্রিকূট পর্বত। ওরই তিন চূড়ায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অধিষ্ঠান। ঐ পাহাড় অতিক্রম করে অপর দিকে খানিক নামলে বৈষ্ণোদেবীর 'দরবার',—অতি নিভৃত গুপ্ত গুহা। সেখানে বিরাজ করেন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মহাশক্তিত্রয়ী,—মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাকালী। প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টি সেই গুহার অভ্যন্তর।

অশেষ কৌতূহল নিয়ে ত্রিকূটের দিকে তাকিয়ে থাকি। ভাবি, যবনিকার অন্তরালে যাত্রাশেষে কী গোপন রহস্য অপেক্ষা করে, কি জানি!

পাহাড়ের গায়ে অনেকখানি উপরে সাদা সাদা ঘরবাড়ি।

সহযাত্রী একজন বলেন, ঐটে মাঝপথ,—অদ্-কন্ওয়ারি।

মনে পড়ে আমার পূর্ব-সংবাদদাতাদের বিবরণ। অদ্-কন্ওয়ারি,—অর্থাৎ আদ-কুঁয়ারি,—আদি-কুমারী। বৈষ্ণোদেবী আদিকুমারী নাম পেলেন কি করে, সে-কাহিনীও তাঁদেরই কাছে শোনা।

দেবী ভাগবতে আছে, মহাদেবী দুর্গার অপর এক নাম—বৈষ্ণবী। তিনি স্বয়ং বলেন, সাধুদের সংরক্ষণের ও দুর্বৃত্ত-দানবদের নিধনের জন্য যুগে যুগে শক্তিরূপে তাঁর আবির্ভাব, বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ।

নূনং সর্বেষু দেবেষু নানা নাম ধরাম্যহম্।
ভবামি শক্তিরূপেণ করোমি চ পরাক্রমম্॥
গৌরী ব্রাহ্মী তথা রৌদ্রী বারাহী বৈষ্ণবী শিবা।
বারুণী চাথ কৌবেরী নারসিংহী চ বাসবী॥

আবার সপ্ত মাতৃকা অষ্ট মাতৃকার নামের মধ্যেও বৈষ্ণবী দেবীর উল্লেখ।

সেই বৈষ্ণবীই লোকমুখে বৈষ্ণীদেবী,—ক্রমে বৈষ্ণোদেবী হন।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণের শক্তিরূপিণী বৈষ্ণবীদেবীর আবির্ভাব বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা।

এই তীর্থাঞ্চলে যে কাহিনীর বহুল প্রচার তার সারাংশ এই : দেবী বৈষ্ণবী কুমারী কন্যারূপে রত্নাকর সাগরের উপকূলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে তপস্যারত থাকেন। পরে রামচন্দ্র তাঁকে বরদান করেন, কলিযুগে কল্কি অবতারের সময় তিনি তাঁর শক্তি হবেন। নির্দেশ দেন, উত্তর ভারতের ত্রিকূট পর্বতের নির্ঝরিণী-বিধৌত এক নির্জন গুহার মধ্যে তিন মহাশক্তির অধিষ্ঠান,—সেইখানে গিয়ে বৈষ্ণবী যেন তপশ্চর্যা করেন। দানবরাজ ভৈঁরোকে নিধন করে জগতে সুখশান্তির তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন। সহস্র সহস্র ভক্ত যাবে তাঁর দর্শনে।

বৈষ্ণবীদেবী সাগরসৈকত থেকে চলে আসেন হিমালয়ে এই ত্রিকূটের পাদদেশে। প্রবল পরাক্রম দুর্ধর্ষ দৈত্যরাজ ভৈঁরোর অত্যাচারে এ দেশ তখন জর্জরিত। সেই ভৈঁরো অপূর্ব সুন্দরী কুমারী বৈষ্ণবীকে একদিন দেখতে পান। তাঁর রূপে মুগ্ধ হন। পত্নীরূপে পাওয়ার লোভে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাঁকে হরণ করতে চলেন। ভৈঁরোর বিকৃত মনোভাব বুঝতে পেরে দেবী পাহাড়তলি ছেড়ে গিরিশিখরের দিকে উঠতে থাকেন। ভৈঁরোও সসৈন্যে তাঁকে অনুসরণ করেন। দেবীর অস্ত্রবলে ঐ আদি-কুমারীতে দানবসেনা নিহত হয়। পরে ভৈঁরোরও শিরশ্ছেদন ঘটে। গিরিচূড়া পেরিয়ে বৈষ্ণোদেবী পাহাড়ের অপর দিকে চলে যান সেই গুপ্ত গুহায় এবং কল্কি-অবতারের আগমন প্রতীক্ষায় শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যাননিমগ্ন থাকেন।

কিন্তু, এ-যুগে দেবীর সেই গুপ্ত-অবস্থানের কথা প্রকাশ পেল কি ভাবে?

এ-প্রশ্নের জবাব দেয় সেই প্রাচীন কাহিনীর ছায়াবলম্বনে এ-কালেও আর এক অনুরূপ ঘটনার প্রচার।

কাটরার উপকণ্ঠে হন্‌শালী নামে এক প্রাচীন গ্রাম আছে। প্রায় সাতশ' বছর আগে সেখানে শ্রীধর নামে এক পণ্ডিত বাস করতেন। তিনি ছিলেন বৈষ্ণোদেবীর পরম ভক্ত। নিত্য তাঁর পূজা-অর্চনায় ব্যাপৃত থাকতেন, নিয়মিত বালিকাদের আমন্ত্রণ করে এনে বিধিমত কুমারী-পূজা করতেন। বৈষ্ণোদেবী শ্রীধরের একনিষ্ঠ ভক্তি দেখে প্রসন্ন হন। একদিন স্বয়ং এসে সেই কুমারী বালিকাদলে যোগ দেন। শ্রীধর তাঁরও পাদপূজা করতে বসেন। রক্তাম্বর ভূষিতা এই বালিকার অপূর্ব রূপ দেখে পরমাশ্চর্য বোধ করেন। ভাবতে থাকেন, কই! এঁকে তো আগে কখনও দেখি নি,—আমাদের গ্রামের মেয়েও তো ইনি নন! কোথা থেকে এলেন?

সমবেত বালিকাদের পূজা শেষ হলে যে-যার ঘরে ফিরে যান, শুধু এই বালিকাই একা অপেক্ষা করেন। শ্রীধরকে তখন তিনি বলেন, দেখ, তোমায় এক কর্তব্যপালন করতে হবে। নিকটের সকল গ্রামের বাসিন্দাদের আগামীকাল ভাণ্ডারায় নিমন্ত্রণ করে এসো।—এই আদেশ দিয়েই তিনি অকস্মাৎ অন্তর্ধান করলেন।

শ্রীধর বিস্ময়বিমূঢ়। ভাবেন, বালিকাটি কে? এত রূপ! এই অলৌকিক অদৃশ্য হওয়া! বৈষ্ণোদেবীই কি তবে কৃপা করে দর্শন দিয়ে গেলেন? কিন্তু, এ কী অসম্ভব আদেশ!

আমার সংগতি কোথায় যে গ্রামবাসীদের ভাণ্ডারা দিই!

তবুও, দেবীর অনুজ্ঞা, পালন করতেই হবে। মন্ত্রমুগ্ধের মত তিনি গ্রামে গ্রামে চলেন। ভাণ্ডারায় গ্রামবাসীদের নিমন্ত্রণ করেন। পথে একদল যোগী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁদেরও আসতে বলেন। সাধুদের দলপতি গোরখনাথ বলেন, আমাদের ডাকছ,—তোমার স্পর্ধা তো কম নয়! ভোজন দিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রেরও নেই, কোন্ সাহসে তুমি আমাদের ভাণ্ডারায় ডাক?

শ্রীধর তখন সেই বালিকাবেশিনী দেবীর আদেশের কথা তাঁকে খুলে বলেন।

গোরখনাথের কৌতূহল জাগে। ভাণ্ডারায় যোগ দিতে রাজি হন।

পরদিন শ্রীধরের ক্ষুদ্র কুটিরের বাইরে নিমন্ত্রিতদের সমাগমে ভিড় জমে। সেই সাধুদলও আসেন। লোকে লোকারণ্য। শ্রীধরের মনে গভীর দুশ্চিন্তা। এত লোক! বসাই কোথায়? পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যও তো নেই!

এমনি সময়ে হঠাৎ আবার দেবীর আবির্ভাব। এসেই তিনি কুটিরে প্রবেশ করেন। নিমন্ত্রিতদেরও ভিতরে আসতে বলেন। এ কী আশ্চর্য! ক্ষুদ্র কুটির, তবুও অত লোকের বসবার স্থানাভাব হয় না! দেবী স্বয়ং তাঁদের পরিবেশন করে খাওয়াতে শুরু করেন। হাতে তাঁর একটিমাত্র পাত্র, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার! যে-যা খাদ্যবস্তু চায়, তাই থেকে বার করে দেন। সাধুদলও বিস্মিত। সেই দলে ভৈরব নামে এক যোগী ছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন, এ বালিকা নিশ্চয় অলৌকিক ক্ষমতাপন্না কোন দেববালা। নিকটে আসতেই তিনি তাঁকে বলেন, আমি যা চাই তাই পাব তো? আমি সুরা ও মাংস খাব।

দেবী বলেন, সে কী! বৈষ্ণবগৃহে ঐজাতীয় খাদ্যপানীয় অচল, শুধু সাত্ত্বিক আহারই এখানে দেওয়া চলবে।

ভৈরব একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকায়। রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করে। দেবী তাঁর অসদুদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তখনি অদৃশ্য হন।

যোগী ভৈরব যোগবলে জানতে পারেন, দেবী ত্রিকূট পর্বত অভিমুখে বায়ুরূপ পরিগ্রহ করে চলেছেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ তাঁর অনুসরণ করেন।

পাহাড়-পথে বৈষ্ণোদেবীর সঙ্গ নেন পবননন্দন হনুমানজী।

পরে অনুসরণকারী দুর্বৃত্ত ভৈরবের মস্তক ছেদন ও দেবীর গুহায় অবস্থান করার কাহিনী সেই পুরাণ-উপাখ্যানেরই অনুরূপ।

ওদিকে, ভক্ত শ্রীধর এই অকস্মাৎ অন্তর্ধানে মুহ্যমান হন, অনশন ব্রত গ্রহণ করে নিত্য দেবীর ধ্যান করতে থাকেন। অবশেষে দেবী তাঁকে স্বপ্নের মাঝে দেখা দেন। ত্রিকূট পাহাড়ে তাঁর গোপন গুহার পথেরও সঙ্কেত প্রকাশ করেন। শ্রীধর পরদিন থেকে স্বপ্নলব্ধ নির্দেশ অনুযায়ী পাহাড়ে পাহাড়ে সেই গুহার অন্বেষণে ঘোরেন, একদিন গুহাটির আবিষ্কারও হয়। শ্রীধরের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী নিঃসন্তান শ্রীধরকে বরদান করেন, তাঁর চার পুত্রসন্তান লাভ হবে এবং তাঁরাই পুরুষানুক্রমে মাতার পূজা করবার অধিকারী হবেন। সেই শ্রীধরের বংশধরেরা এখনও মাতার পূজারী।

শ্রীধরের প্রচারের ফলে বৈষ্ণোদেবী তীর্থজগতে প্রসিদ্ধিলাভ করে এবং তাঁরই প্রদর্শিত দেবীর সেই যাত্রাপথ ধরে আমারও আজ এই পুণ্যযাত্রা।

বেলা সাড়ে দশটায় কাটরায় বাস পৌঁছায়। পাহাড়তলিতে সমতলভূমি। ২৯১৮ ফুট উঁচুতে। ছোট শহর। সামনেই মাথা তুলে ত্রিকূট পর্বত। সাত হাজার ফুটেরও উপর উঁচু। বাস স্ট্যান্ডের নিকটে ট্যুরিস্ট হোস্টেল। দোতলা প্রকাণ্ড নতুন বাড়ি। আশপাশে কয়েকটি ধর্মশালা। অদূরে রামমন্দির। মহালক্ষ্মীমন্দির। স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজের সমাধিমন্দির ইত্যাদি।

কাটরাতে অযথা কালক্ষেপ করি না। হাঁটা-পথে এখনই নয়-দশ মাইল যেতে হবে। পাহাড়ের চড়াইও কম নয়। মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি।

মালবাহকের দল ঘিরে ধরে। আমাদের সঙ্গে আছেই বা কী! তবুও, একটি পাহাড়ী ছেলেকে সঙ্গে নেওয়া নয়। নাম বলে, ওম্প্রকাশ। কিট্ ব্যাগে ভরা চাদরগুলি, সঙ্গে-আনা কিছু খাবার এবং জলের ফ্লাস্কটি তার জিম্মায় দেওয়া হয়।

দুপুরে হেঁটে চড়াই ওঠা, গরম বোধ হবে, তাই গরমজামা, সোয়েটারও আপাতত সে-ই নেয়,—নিজে চেয়ে।

ওম্প্রকাশ বলে, বড় রাস্তা ধরে না গিয়ে বাজারের মধ্যে দিয়ে চলুন, 'শর্টকার্ট' হবে। কিছুদূরে গিয়ে আবার ঐ রাস্তায় পড়ব।

শহর ছোট হলেও বাজার ছোট নয়। বাঁধানো রাস্তার দুপাশে সারি সারি দোকানপাট। ফুলফল, মিঠাই সাজানো। মায়ের পূজার বিবিধ সামগ্রী। স্তূপাকার নারিকেল। তীর্থের ছবি। বাসন-কোশন।

কাশ্মীরী পণ্যবস্তু ; পশমী জামা, কাপড় ইত্যাদি। পাণ্ডাদের বাড়ি। যাত্রীনিবাস। দেশী হোটেল। যাত্রীদের যা-কিছুর প্রয়োজন সবেরই ব্যবস্থা। চারিদিকে যাত্রীদের আনাগোনা। দলে দলে পূজার সামগ্রী কেনে,—নারিকেল, কুল, শুকনা মেওয়া, রঙিন সুতার মালা। রঙিন কাপড়ের টুকরা কিনে ধ্বজা বানায়। হেঁটে পাহাড়ে ওঠার জন্যে খড়ের তৈরি জুতাও কেউ কেউ কেনে। চামড়ার জুতা,—দেবস্থানে অচল। নগ্নপদে যাওয়াই বিধান। অনেকে তাই চলেনও দেখি। খাবারের দোকানে ভিড়। চলার আগে যাত্রীরা আহার-পর্ব শেষ করে নেয়। আমরাও করি। গরম পুরী, সব্‌জি, দই মিঠাই। কিন্তু পেটভরে খাওয়া নয়। সুমুখের চড়াই-পথ আঙুল তুলে যেন নিষেধ জানায়। বাজার ছাড়িয়ে আধ-মাইলটাক আসার পর পথের উপর প্রকাণ্ড তোরণ। 'দর্‌শনী দরওয়াজা'। পাশে বিশাল এক হনুমান মূর্তি। এখান থেকে দর্শন,—সুমুখেই ত্রিকূট পর্বত। সেই দিকে তাকিয়ে যাত্রীরা ধ্বনি তোলে,—জয় মাতাদী।

পাথরবাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে খানিক নামা। নীচে বড় রাস্তায় পড়া। পাশেই কলকল স্বরে শিলাকীর্ণ পথে বয়ে চলে পাহাড়ী নদী। বাণগঙ্গা বা বালগঙ্গা। প্রবাদ, বৈষ্ণোদেবী এখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করেন। বাণ নিক্ষেপ করে পৃথিবীর বুক থেকে জলধারা বহান। নামও তাই বাণগঙ্গা। এই নদীতে তিনি স্নান করেন, কেশদাম সিক্ত হয়,—তাই 'বালগঙ্গা' নামেরও প্রচার। মায়ের বাহন ব্যাঘ্র। সেই বাঘ তৃষাতুর হয়ে জলপান করে। ভৈঁরো দেখতে পান। বৈষ্ণোদেবীও দূর থেকে দানবরাজকে দেখেন। স্থানত্যাগ করে পাহাড়ের উপর দিয়ে উঠতে থাকেন। আমরাও সেই পথ অনুসরণ করি। নদীর ধার দিয়ে চলা। অল্প এগিয়ে লোহার ছোট ঝোলা পুল। নদীর ধারে ছোট মন্দির। চা ও মিঠাই-এর দোকান। যাত্রীরা নদীর জলে স্নান করে। এ-তীর্থযাত্রার এই প্রথা। আমরাও নেমে জল স্পর্শ করি, মাথায় ছিটাই। পাহাড়ী নদীর ক্ষীণধারা। বাণগঙ্গা পার হয়েই দুইটা পথ। সামনের চওড়া ভাল রাস্তা—ঘোড়া চড়ে যাবার। সে পথ ঘুরে ঘুরে পাক দিয়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ে ওঠে। দু-চারজন মাত্র যাত্রী সেই পথ দিয়ে এগিয়ে যায়,—ঘোড়ায় চেপে ছোট ছেলেমেয়ে কোলে নিয়ে। বাঁদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে সোজাসুজি উঠে হাঁটা-পথ। এখানে সিমেন্ট বাঁধানো প্রশস্ত সোপানশ্রেণী। আমরা এই পথই ধরি। ওম্‌প্রকাশ জানায়, ঘোড়ার রাস্তায় যাওয়া তক্‌লিফ কম, কিন্তু সময় নেবে অনেক বেশি। ঐ কোন্ দিক দিয়ে কত ঘুরে গেছে, দেখছেন! সিঁড়ির পথ দিয়ে গিয়েও আমরা মাঝে মাঝে ও পথ পাব,—পরে 'থক্‌ওয়াট' হন তো ঐ পথেও কিছুক্ষণ চলবেন।

বাঁধানো সিঁড়ির দুধারে ভিখারীর দল। আঁচল পেতে বসে। ভারতের তীর্থস্থানের এরা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভাবি, এদেশের ভিক্ষাবৃত্তি কি অভাবে, না স্বভাবে? যাত্রীরাও বিশ্বাস করে, দানে পুণ্য। যে যা পারে দিতে দিতে চলে। কিন্তু, এখানেই চমকে উঠি ফেরবার সময় নামবার পথে। দুজন ভিখারিণীর মুখে বাঙলা ভাষা শুনে। এত দূরেও পূর্ব বাঙলার 'রেফিউজি'! গাল পাড়ছে কোন্ যাত্রী পয়সা দেয় নি বলে! বাঁধানো সিঁড়ি সবখানি নয়। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা কেটে বা পাথর সাজিয়ে ধাপের মত। তাই বেয়ে ধীরে ধীরে ওঠা। সারাদিন এইভাবে উঠতে হবে পাহাড়ের চড়াই। পাহাড়ের রূপসজ্জা নেই। শুষ্ক কর্কশ ভাব। কাঁকর পাথর, শিলাস্তূপ। কোথাও বা কয়েকটা ঝোপঝাপ। ক্বচিৎ দু'একটা বড় গাছ। এই নীরস রুক্ষ রাজ্যে তারা যেন অনাহূত আগন্তুক। কিন্তু তবুও দশদিক আনন্দে মুখর। বাতাবরণ প্রেমরসে টইটম্বুর। দলে দলে দর্শনার্থী যাত্রী ওঠে, দর্শনান্তে যাত্রী নামে। সবারই কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে রব ওঠে—জয় মাতাদী, জয় মাতাদী! অনেকেরই হাতে লাল, হলুদ ও বিভিন্ন রঙের ঝাণ্ডা। গতির ছন্দে দেহ দুলিয়ে, হাত তুলে নিশান নেড়ে, বলতে থাকে :

ফিন্ ভি বোলো—জয় মাতাদী।
জোর্‌সে বোলো—জয় মাতাদী।
প্রেম্‌সে বোলো—জয় মাতাদী।

এ যেন মাতৃপ্রেমে বিভোর হয়ে পথ চলা। আমরাও ভেসে চলি তারই উত্তাল তরঙ্গতালে। অকুণ্ঠিত কণ্ঠে কখন অজানিতে তাদেরই গলার সঙ্গে স্বর মিলাই, প্রেম্‌সে বোলো—জয় মাতাদী, সবকোই বোলো জয় মাতাদী!

আধ মাইলের উপর সোজা সিঁড়ির চড়াই। তবুও তার দুরূহতা প্রেমানলে যেন গলে তরল হয়ে যায়। আসে চরণপাদুকা। ৩,৩৭৮ ফুট উঁচুতে। পাশেই মন্দির। দেবীর বিগ্রহ। শিলাখণ্ডে চরণচিহ্নও। প্রবাদ,

বৈষ্ণোদেবী এখানেও ক্ষণিক বিশ্রাম করেন। নীচে ভৈঁরোকে হঠাৎ দেখতে পান। ত্বরিতগতিতে আবার চলেন। এখানে ফেলে যান তাঁর চরণপাদুকা।

মন্দিরের নিকটে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য ছাউনি। পানি প্যিউ—জলসত্র। চায়ের দোকান। বিশ্রামের লোভে যাত্রীরাও ক্ষণিক বসে। কিন্তু অপর যাত্রীদের উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে 'জয় মাতাদী' 'জয় মাতাদী' অক্লান্ত ধ্বনি তাদের বিশ্রামের আবেশ ভোলায়—নবীন প্রেরণা নিয়ে তারা দলে যোগ দেয়।

ঘোড়া-চলা-পথ এসে হাঁটাপথের সঙ্গে যেন কাটাকুটি খেলে। সে পথ আবার সোজা বাঁ দিকে এগিয়ে যায় পর্বত আবেষ্টন করে উঠতে। হাঁটাপথ সুমুখে পাহাড়ের গা বেয়ে খাড়া ওঠে। দুই রাস্তার মোড়ের পাশে সাময়িক ভাবে ত্রিপল টাঙানো। একদল যাত্রী বাজনা বাজিয়ে নামকীর্তন করেন। গানের মধুর সুর পাহাড়ের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যাত্রীর মন প্রেমানন্দে আমোদিত করে। ভাব-বিহ্বল যাত্রীদল পথশ্রম ভোলে। আবার হাঁটাপথে সোপান বেয়ে 'জয় মাতাদী' রব তুলে উঠতে থাকে।

পিছর ফিরে তাকাই। বহু নীচে কাটরার বাড়িঘর দেখা যায়। পিপীলিকার মত লোকজন ঘোরে। পাহাড়ের গা বেয়ে সারিবদ্ধ যাত্রীদল উঠে আসে শিলাময় সোপান বেয়ে। শ্রান্ত গতি, তবু অসীম উৎসাহ। সারা পাহাড়ে প্রতিধ্বনি ওঠে 'জয় মাতাদী' রব। যেন প্রতি কণ্ঠে দোলে প্রেমস্বর্ণসূত্রে-গাঁথা মাতৃনামের মালা।

মাথা তুলে উপরদিকে তাকাই। অনেক উপরে দেখা যায় সাদা সাদা বাড়িঘর,—আদকুমারী। সঙ্গীদের দেখাই, ঐ ওখানে উঠতে হবে!—পাশ দিয়ে ক'জন যাত্রী নামে। একজনের কাঁধে একটি ছোট ছেলে। বছর দুই-তিন বয়স। শিশুর কপালে জ্বলজ্বল করে সিঁদুরের লাল টিকা। গলায় লাল সুতার ও ফুলের মালা। কাঁধে চেপে এক হাতে বাহকের মাথা ধরে আছে। অপর হাতে গেরুয়া রঙের ছোট্ট নিশান। কচি হাতের মুঠায় সেই ঝাণ্ডা ধরে নাড়তে থাকে। আমাদের দেখে শিশুসুলভ মিষ্টকণ্ঠে উৎসাহে রব তোলে—'জয় মাতাদী'—'জয় মাতাদী'! আমরাও হেসে তার সাড়া দিই। শিশুর সেই মধুর স্বরের প্রেরণায় সাগ্রহে সোপান বেয়ে উঠে চলি।

পথের ধারে মাঝে মাঝে পানীয় জল বিতরণের ব্যবস্থা। এক জায়গায় পাকা এক বিশ্রাম ঘর। গাছের ছায়া কোথাও নেই। পাহাড়ের রুক্ষ ভাব। দুপুরবেলা। কিন্তু মাতৃকরুণা যেন হালকা মেঘরূপে আকাশ ছায়। চড়াই ওঠার তবু খানিক ক্লান্তি কমে। আদকুমারী নিকটে আসে। বড় রাস্তাও ঘুরে এসে দেখা দেয়। এবার 'ময়দান' পথ অর্থাৎ সমতল পথ। আদকুমারী পৌঁছে যাই। ৪,৭৮৪ ফুট উঁচুতে। চরণপাদুকা থেকে মাইল দুই দূর।

বাঃ! এ তো রীতিমত বড় জায়গা। পাহাড়ের গায়ে অনেকখানি সমতলভূমি। ভগবতীর মন্দির। প্রশস্ত উন্মুক্ত বাঁধানো প্রাঙ্গণ। নিকটেই রেলিঙ-ঘেরা বাঁধানো কুণ্ড। ঘাটের ধাপ। পরিষ্কার টলটলে জল। ফল-ফুলের দোকান। চায়ের স্টল। হালুইকরের দোকানে পুরী ভাজা হচ্ছে।

মন্দিরের নিকটে পাহাড়ের গায়ে গর্ভগুহা। আঁকাবাঁকা সরু,—পাঁচ-ছ' গজ লম্বা। যাত্রীরা অনেকে এক দিক দিয়ে ঢুকে অপর দিকে বার হয়। কিংবদন্তী, পাপীরা পার হতে পারে না, তাই স্থূলকায় যাত্রীরা প্রবেশ করতে ভরসা পায় না! এই গুহার মধ্যে অবস্থান করে বৈষ্ণোদেবী এখানে শিবির স্থাপনা করেন। ভৈঁরোর সৈন্যদল ধ্বংস করে তাঁকে পরে সংহার করেন। তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করে দূরে নিক্ষেপ করে দেন। তাই আদকুমারীর স্থানমাহাত্ম্য।

এক ধারে প্রকাণ্ড ধর্মশালা। যাত্রীরা অনেকে এখানে রাত্রিবাস করেন। ধর্মশালায় কম্বল দেবার ব্যবস্থাও আছে। নিকটে চীর গাছের জঙ্গল। শান্ত পরিবেশ। সুন্দর দৃশ্য। বহু নীচে কাটরা দেখা যায়। পাহাড়ে উঠে-আসা যাত্রাপথও সুস্পষ্ট,—ওপর থেকে যাত্রীরা নামছে, নীচে থেকে উঠছে,—সবারই মুখে জয় জয় ধ্বনি,—কেউ ধীরে ওঠে, কেউ লাফিয়ে আসে, কেউ নাচে,—সবাই গায়, রঙিন নিশান নাড়ে। নিশ্চল পর্বতগাত্রে অগণিত যাত্রীদলের চলচ্চঞ্চলতা। বেলা আড়াইটে বাজে। ধর্মশালায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম লাভ হয়। কিঞ্চিৎ জলযোগ করে আবার হাঁটা শুরু। এবার যেন আরও বেশি খাড়া চড়াই। সিঁড়ির পথ ছেড়ে ঘোড়ার রাস্তা ধরে কঠিন পথটুকু ধীরে ঘুরে গিয়ে শেষ করা হয়। পাহাড়ের অনেক উপরে হাতিমাথায় পৌঁছাই। পাহাড়ের মাথার গড়ন হাতির মাথার মতন,—তাই এই নামকরণ। মনে পড়ে, বদরীনাথের পথে যোশীমঠের নিকটে এই ধরনের এক হাতিপর্বত পাণ্ডাজীরা দেখান।

হাতিপাহাড় ৬,২০০ ফুট উঁচু। পথের পাশে যাত্রীদের বিশ্রামগৃহ। এখান থেকে নীচের দৃশ্য আরও খোলে। বহুদূরে সমতলভূমিতে চন্দ্রভাগা নদী দেখা যায়। কতকগুলি গ্রাম। আকাশের গায়ে পীরপঞ্জল গিরিশ্রেণীর দু'একটা তুষারশিখরও মাথা তুলে আপন গরিমা জানায়।

এবার ধীরে ধীরে পথ আরও উঠে চলে। কিছুদূর গিয়ে এই পথের সব চেয়ে উঁচু জায়গা—সাঁজীছত—৬,৫৮৩ ফুট। এখানেও চায়ের ও খাবারের দোকান। পথের চড়াই শেষ। যাত্রীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্ষণিক বিশ্রাম নেয়,—আবার 'জয় মাতাদী' ধ্বনি তুলে চলতে থাকে।

সিঁড়ি ও বড় সড়ক এখানে মিলিত হয়। পাহাড়ের গা বেয়ে এবার সরল পথ। সর্পিল ভঙ্গিতে এগিয়ে চলে। এক দিকে খাদ, আর এক দিকে পাহাড়ের গা। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলা। সুশীতল আবহাওয়া। মাইল দেড় দুই গিয়ে ভৈঁরো ঘাঁটি। নিকটে ভৈরব-মন্দির। এইখানে ভৈঁরোর দেহচ্যুত ছিন্ন মস্তক এসে পড়ে। মৃত্যুর পূর্বে দানবরাজের সেই ছিন্ন মস্তক দেবীর কাছে আপন পাপ স্বীকার করে, ক্ষমাভিক্ষা চায়। করুণাময়ী বৈষ্ণবী তাঁকে আশীর্বাদ করেন, যাত্রীরা আমার দর্শনের পর তোমাকেও দর্শন পেতে আসবে, তবেই তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।—ঘোর পাপীও মৃত্যুর পর এইভাবে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অতএব, বৈষ্ণোদেবীতে যাবার পথে ভৈরব দর্শন প্রথা নেই। এখানেও দোকান,—চা, জলসত্র।

এইবার পাহাড়ের অপর দিকে উৎরাই। পথও আবার দু'ভাগ হয়,—সিঁড়ি ও সড়ক।

পাইন চীর দেওদারের গহন অরণ্য। লোকে বলে, মাতা কা বাগ,—মায়ের বাগান। এখনও মাইল দেড় দুই নেমে গেলে তবে বৈষ্ণোদেবীর 'দরবারে' পৌঁছনো। পাথর বসানো পাকদণ্ডির সিঁড়িপথে নামলে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো সম্ভব ভেবে সেই পথই ধরি। কিন্তু বনের মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হয়ে আসে। পায়ের নীচে পাথরগুলিও ভাঙাচোরা, অসম, পিচ্ছিল। অস্পষ্ট আলোকে ভালভাবে দেখাও যায় না। অগত্যা ঘোড়া চলার সড়ক ধরে চলতে হয়। নীচে দূরে বৈষ্ণোদেবীর দরবারের বাড়িঘর দেখা যায়। উৎসাহে এগিয়ে চলি। আঁধারও ঘনিয়ে আসে। হঠাৎ দূরের বাড়িগুলিতে বিজলী বাতি একসঙ্গে জ্বলে ওঠে। রাতের আকাশ যেন নীচে পাহাড়ের বুকে নেমে সারি সারি উজ্জ্বল তারা ফোটায়। চারিদিকে ঘনকালো পাহাড়ের বিভীষিকা। তারই মধ্যে দূরে ঐ যেন ধ্রুবতারার আলোকবর্তিকা।

যাত্রীরা নবীন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়। জয় মাতাদী রব তোলে। উৎরাই পথে গতিবেগ বাড়ে।

গ্রামে পৌঁছানোর কিছু আগেই পথের ধারেও ইলেকট্রিক আলো। আশেপাশে সাধুদের কুটিয়া। কোথাও বা ছোট গুহার মধ্যে ধুনি জ্বেলে বসে কোন মহাত্মা।

৬-১৫তে পৌঁছে যাই ধর্মশালায়। দোতলা লম্বা পাকা বাড়ি। ওপরের বারান্দার একপাশে খালি জায়গায় আস্তানা বিছানো হয়। এখানকার উচ্চতা ৫,৭৩০ ফুট। কাটরা থেকে দূরত্ব মাইল নয়-দশ।

পাহাড়ের গায়ে উঁচু মন্দির। তাই ঘিরে পাহাড়ের ধাপে ধাপে ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ধর্মশালা, মন্দিরের ও সরকারী দপ্তর ইত্যাদি। চারিদিকে যাত্রীদের ব্যস্তভাবে ঘুরাঘুরি। শুনেছি, গুহা-মন্দির।

একসঙ্গে বেশি যাত্রীর ভিতরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই টিকিট নেওয়ার ব্যবস্থা। নম্বর অনুযায়ী সার বেঁধে যাওয়ার নিয়ম।

আজ এসেই শুনি যাত্রীর ভিড় নেই। দপ্তরে দাঁড়ানো মাত্রই টিকিট মেলে। অবাক হই দেখে, ভিড় নেই, অথচ আমাদের আগে আজ যাত্রী এসেছে ৭৪৯ জন; আমাদের নম্বর পড়ে ৭৫০ থেকে। ভাবি, ভিড়ের সময় প্রতিদিন যাত্রী আসে কত!—সারা বছর ধরে যাত্রীপ্রবাহ নিত্যই চলতে থাকে। যাত্রী সমাগম বেশি বাড়ে আশ্বিনের নবরাত্র থেকে চার মাস। ধর্মশালার নিকটে, মন্দিরের নীচে জলের ধারা। ঝরনার জল পাইপের সাহায্যে সরবরাহ করা। হাতমুখ ধুয়ে দর্শনের উদ্দেশ্যে মন্দিরের দিকে চলি। ধর্মশালায়, রাস্তায় সর্বত্রই যাত্রীর ভিড়। কেউ দর্শনে চলেন, কেউ দর্শন করে ফেরেন, কেউ বা দর্শনের অপেক্ষায় আছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী যাত্রী, তবে বেশির ভাগ কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবী। আমাদের থাকাকালীন মাত্র একটি বাঙালী পরিবার দেখি। ভদ্রলোক জম্মুতে কাজ করেন, সুযোগ পেলেই দর্শনে আসেন। কলকাতা থেকে এসেছি শুনে আশ্চর্য হন। বলেন, এর আগে কলকাতা থেকে একবার একজনকে মাত্র আসতে দেখেছি।

পথের উপর পাহারারত সিপাই টিকিটের নম্বর দেখে নির্দেশ দেয়, পাশেই পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি বাঁধানো ধাপ, জুতো খুলে উপরে দালানে উঠে যেন অপেক্ষা করি।

রাস্তায় ঐভাবে জুতো ফেলে রেখে যাওয়া? অনেকেই করে দেখি। নির্ভাবনায়, নিঃসঙ্কোচে। তবুও, আমরা ফিরে চলি ধর্মশালায়। রেখে আসি জুতা ওম্‌প্রকাশের জিম্মায়।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে পাহাড়ের কোলে প্রকাণ্ড উন্মুক্ত চত্বর। যাত্রী ভরা। একটা বড় পাঞ্জাবীদল আসর জমিয়ে সিমেন্টের মেঝেতে বসে। খোল করতাল খঞ্জনী বাঁশি বাজিয়ে ভজন করছে। তারই একপাশে আমরাও দাঁড়াই। কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে কে জানে। সামনে লম্বা কিউ। নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবী কীর্তনের দলের মধ্যে থেকে এক তরুণী মহিলা গাইতে গাইতে উঠে দাঁড়ান। সুশ্রী, সুবেশা। টকটকে মুখের রঙ। ছিপছিপে লম্বা গড়ন। টানাটানা চোখ নাক। লাল রঙের উজ্জ্বল শাড়ি পরনে। উঠে দাঁড়ালেন যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। গা-ভরা অলঙ্কার। আলো পড়ে ঝিকমিক করে। নাকে ঝোলে মস্ত সোনার নথ। হাতে রূপার ত্রিশূল। তাতে নানা রঙের কাপড়ের টুকরো ঝোলে। সেই ত্রিশূল দুলিয়ে মহিলা মূল গায়েনের সুর ধরেন। অতি মধুর কণ্ঠ। তেমনি গভীর ভক্তিভাবের অপূর্ব অভিব্যক্তি। তন্ময় হয়ে গাইতে থাকেন ত্রিশূল তুলে, হেলেদুলে, নৃত্যের ভঙ্গিতে। সুরের তালে তালে। দলের আর সকলে ভাবোন্মত্ত হয়ে বাঁশি, মাদল, করতাল বাজাতে থাকেন, গানের প্রতি পদের শেষে ধুয়া ধরেন। অপর যাত্রীরাও উল্লাসভরে যোগ দেয়। থেকে থেকে 'জয় মাতাদী' 'জয় মাতাদী' ধ্বনি মন্দিরপ্রাঙ্গণ ঝঙ্কৃত করে। মনে হয়, নিশীথরাতের হিমালয়ও স্তব্ধ হয়ে একাগ্রমনে এই অমৃতময় রসমাধুরী উপভোগ করেন।

আমরাও কখন অজানিতে সেই দলের পাশে বসে পড়ি, তাদেরই সঙ্গে মিশে যাই। অন্তরে এক অবর্ণনীয় আনন্দস্রোত বইতে থাকে।

ঘণ্টাখানেক কোথা দিয়ে কেটে যায়। সামনের 'কিউ'-এর যাত্রী এগিয়ে গেছে। আমরাও উঠে তাদের পিছু নিই। চত্বরের অপর প্রান্তে পৌঁছাই। এখানে শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঢাকা-দেওয়া বারান্দা। কীর্তনের দল একই ভাবে গাইতে থাকেন, ওঠেন না, হয়ত পরে একসঙ্গে সদলবলে আসবেন। ধীরে ধীরে কিউ এগোয়। আমরাও পা পা করে এগিয়ে যাই। দেখি, চত্বরের শেষভাগে আবার কয়েকটা ধাপ। ধাপের শেষে লোহার ফটক। পুলিশ পাহারা। এক একবার গেট খোলে। কয়েকজন যাত্রী ভিতরে অদৃশ্য হয়। আবার গেট বন্ধ। খানিক অপেক্ষা। আবার গেট খোলা। কয়েকজন যাত্রীর ভিতরে অন্তর্ধান। আবার গেট বন্ধ। যাত্রীরা ফেরে না কেউই। বোঝা যায়, অপর দিকে বাইরে বার হওয়ার নিশ্চয় আর এক পথ আছে। ক্রমে আমরা কিউ-এর সামনে পৌঁছুই। ভাবি, গেট দিয়ে ঢুকেই এইবার গুহার মধ্যে প্রবেশ। কেমন গুহা, কত বড় গুহা, অন্ধকারে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হবে না তো,—ভাবনার ও কৌতূহলের অন্ত থাকে না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেট পার হই। কিন্তু গুহা কই? খোলা আকাশের তলায় চতুষ্কোণ আর এক চত্বর। শ্বেতপাথর বসানো মেঝে। হাতখানেক চওড়া শতরঞ্চি লম্বা করে পাতা। সমরেখায় ছয় পঙ্‌ক্তি। সারি সারি লোক বসে। পিছনের ফাঁকা লাইনে আমরা বসে পড়ি। প্রায় শ'দেড়েক যাত্রীর বসবার আয়োজন। প্রতি লাইনে জন-পঁচিশ যাত্রী ধরে।

এতক্ষণে সেই বহুবাঞ্ছিত গুহার দর্শন মেলে। প্রতীক্ষারত যাত্রীদের সম্মুখে—চত্বরের শেষপ্রান্তে—বৈষ্ণোদেবীর গুহার প্রবেশপথ। পাহাড়ের গায়ে শ্বেতপাথরে গাঁথা ফটকের মত; দরজাবিহীন। তোরণের মাথায় মন্দিরশিখরের আকার। ডান পাশে মাটিতে একটা বাঘের মর্মর প্রতিকৃতি। মায়ের বাহন, তাই গুহাদ্বারে তার অবস্থিতি। প্রবেশদ্বারের মাথায় লোহার শিকলে টাঙানো পিতলের ঘণ্টা। তোরণের পিছনেই পাহাড়ের গুহামুখ। যেন মুখব্যাদান করে আছে। তারই ভিতর এক এক পঙ্‌ক্তির যাত্রী—জন পনেরো করে—একে একে ঘণ্টা নেড়ে গুহার ভিতর প্রবেশ করছে। পিছনের সারির যাত্রীরা খালি হওয়া সামনের সারিতে এগিয়ে বসে। নীচে থেকে একদল নতুন যাত্রী এসে পিছনের সারি দখল করে।

পনেরো-কুড়ি মিনিট লাগে এক এক দলের ভিতরে গিয়ে দর্শন করে ফিরে আসতে। তারা বেরিয়ে এসে চত্বরের আর এক দিকের একটা দরজা দিয়ে নেমে যায়,—অপর এক সিঁড়ি বেয়ে সদর রাস্তায়।

অবশেষে আমাদের পালা আসে। ঘণ্টা নেড়ে গুহামুখে আসি। প্রবেশ করতেই প্রকাণ্ড এক কালো পাথর গতিপথ রোধ করে। গুহাদ্বার যেন ছিপি এঁটে বন্ধ করতে চায়। বাইরে থেকে গুহার ভিতর দেখা না যায়, এমনি ভাবে বিশাল পাথরটা পাহাড় ফুঁড়ে মাথা তুলে বিরাজ করে। হামা দিয়ে তারই উপর উঠে অপর দিকে যাওয়া। এবার শুরু, সরু সুড়ঙ্গ মতন। ভাগ্যে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা আছে, তাই ছিদ্রপথ দেখা যায়। কিন্তু এ কি মানুষ যাবার পথ। পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে দিয়ে কোনমতে যাওয়া।

সোজাসুজি চলবার উপায় নেই। এঁকেবেঁকে কাত হয়ে পাশ কেটে এগুনো। গুহার দেওয়ালের গায়ে হাত দিয়ে কোনমতে চলা। হিমশীতল পাহাড়ের সেই স্পর্শ। পায়ের তলায় সূঁচ ফোটায় কাঁকর, পাথরকুচি। গুহার দু'দিকের প্রাচীরের ব্যবধান আরও সঙ্কীর্ণ হয়। সামনের যাত্রীরা এগিয়ে চলে, তাই দেখে মনে ভরসা জাগে। বোঝা যায়, যাত্রী নিয়ন্ত্রণের অত কড়াকড়ি কেন? এ কি! গুহা যে আরও অপরিসর হয়ে আসে! সুমুখেও পাথরের অবরোধ! তারই একটু উপর দিকে দেওয়ালের গায়ে গবাক্ষের মতন। সামনের যাত্রী পাথরের গা বেয়ে উঠে তারই মধ্যে ঢোকে। অপর দিকে অদৃশ্য হয়। দাঁড়িয়ে ভেবে লাভ নেই। কোথা দিয়ে বাতাস এসে গুহার মধ্যে খেলে, তাই রক্ষা। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টবোধ নেই। পাথরের গা বেয়ে উঠে গবাক্ষপথে প্রথমে পা দুটি গলিয়ে দেহটাকে অপর দিকে কোনমতে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেওয়া। সেদিকে মেঝেতে পা পড়তেই চমকে উঠি। এ যে জলের মধ্যে নামা! কুলুকুলু রবে ঝরনার স্রোত বয়ে চলে গুহাতলে। জলের স্রোত যে দিক থেকে আসে সেই পানে চলা। পা ফেলে চলতে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ ওঠে। দু'পাশের দেওয়ালে হাত ঠেকিয়ে ধীরপদে আরও এগিয়ে যাওয়া। খানিক যাবার পর ঝরনার উৎস-মুখ। গুহার মেঝেতে পাথরের মাঝ থেকে কলকল করে জলধারা বেরিয়ে আসে। অল্প গিয়ে পাথর কেটে তিনটি ধাপ। ধাপের শেষে আবার এক গুহার মুখের মতন! তারই ভিতর দিয়ে প্রবেশ। এতক্ষণে প্রায় একশ' ফুট এসে গুহার সঙ্কীর্ণ পথের নাগপাশ থেকে মুক্তি মেলে। উপস্থিত হই গুহার প্রকৃত গর্ভগৃহে। বৈষ্ণোদেবীর দরবারে। অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত কক্ষ, ছাদও উঁচু। জন-দশেক যাত্রী দাঁড়িয়ে দর্শন করতে পারে। মসৃণ নিকষকালো পাথর কেটে প্রকৃতির হাতে গড়া এই গুহাগৃহ। মানুষের আনা বিজলী আলোয় ঝলমল করে। কোথা দিয়ে হাওয়াও এসে বইতে থাকে। দেবায়তনের সুপবিত্র পরিবেশ। ধূপধুনার স্নিগ্ধ সুবাস। বিজলী বাতি থাকলেও নিষ্কম্প ঘৃতপ্রদীপ জ্বলে। ভক্তগণ বিশ্বাস করেন, হিমালয়ের এই নিভৃত গুহার অভ্যন্তরে বৈষ্ণোদেবী অদৃশ্য অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানে আজিও তপস্যারত, যাত্রীরা দর্শন পায়, পাথরের বেদির উপর প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতীর। শ্রীঅরবিন্দ মহাশক্তিরূপিণী জগন্মাতার এই ত্রিবিধ মহারূপের বর্ণনা দিয়েছেন এই মর্মে তাঁর The Mother' গ্রন্থে (অনুবাদ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত) :

"মা একই, তবে তিনি আমাদের সম্মুখে নানারূপে আবির্ভূতা; বহু তাঁর শক্তি ও মূর্তি, বহু তাঁর প্রকাশ ও বিভূতি।" "যে নানা দেবীমূর্তি ধরে তিনি কৃপাভরে তাঁর সৃষ্ট জীবের কাছে আপনাকে প্রকাশ করেছেন তাদের কল্যাণে—এরা সকলে অপেক্ষাকৃত সহজগ্রাহ্য, কারণ এদের গুণ ও ক্রিয়া অধিকতর নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ।"

মহাকালীতে "মূর্ত তার ভাস্বর বীর্য ও অদম্য আবেগ, তাঁর যোদ্ধৃভাব, তাঁর সর্বজয়ী সংকল্প, তাঁর প্রখর ক্ষিপ্রতা আর প্রতাপ।"..."তাঁর মধ্যে আছে এক দুর্বার তীব্রতা, পূর্ণসিদ্ধির দিকে শক্তির বিপুল আবেগ, সকল সীমা সকল বাধা চূর্ণ ক'রে ছুটে চলে এমন দিব্য প্রচণ্ডতা। তাঁর সমগ্র ভাগবতী প্রকৃতি ঝঞ্ঝারুদ্র কর্মের প্রভায় প্রস্ফুরিত—তিনি রয়েছেন ক্ষিপ্রতার জন্য, আশু ফলদায়ী প্রক্রিয়ার জন্য, সাক্ষাৎ সঘন আঘাতে সব পরাভূত ক'রে সম্মুখে আক্রমণের জন্য। অসুরের প্রতি ভয়ঙ্কর তাঁর মুখমণ্ডল, ভগবদ-বিদ্বেষীর উপর নির্মম নিদারুণ তাঁর চিত্ত। বিশ্বলোকের রণরঙ্গিণী তিনি—সংগ্রামে কখনো পশ্চাৎপদ নন।"

অপর পক্ষে, "মহালক্ষ্মীর দাবি—অন্তরের ও অন্তরাত্মার সৌন্দর্য সুসঙ্গতি, চিন্তার ও অনুভবের সৌন্দর্য সুসঙ্গতি, বহির্মুখী প্রত্যেক কর্মের ও প্রত্যেক চলনের সৌন্দর্য সুসঙ্গতি, জীবনের ও জীবনের আবেষ্টনের সৌন্দর্য সুসঙ্গতি।"..."কারণ ভালবাসা ও সৌন্দর্যের ভিতর দিয়েই তিনি মানুষ-কে ভগবানের পাশে আবদ্ধ করেন। তাঁর সমুচ্চতম দৃষ্টিতে জীবন হয়ে ওঠে যেন স্বর্গের একখানি শ্রী-ভূয়িষ্ঠ কারুশিল্প, নিখিল সত্তা হয়ে ওঠে অপার্থিব আনন্দের একখানি কাব্য ; এক লোকোত্তর শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য সম্মিলিত সুসজ্জিত হয়"......"বীর্যকে সেই ছন্দ শিখিয়ে দেন যাতে তাদের কর্মের প্রচণ্ডতা সুপরিমিত সুসমঞ্জস হয়ে ওঠে, সিদ্ধির উপর এমন মাধুর্যমন্ত্র ঢেলে দেন যাতে সে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।".....'অথচ এই মনোহারিণী দেবীকে প্রসন্ন করা বা তাঁকে ধরে রাখা সহজ নয়।" "এমন মানব-হৃদয়ে যদি তাঁর অবস্থান হয় যাকে তিনি দেখেন স্বার্থপরতা দ্বেষ ঈর্ষা হিংসা অসূয়া দ্বন্দ্ব ঘিরে রেখেছে, দেবোদ্দিষ্ট আধারে যদি মিশে থাকে বিশ্বাসঘাতকতা বুভুক্ষা অকৃতজ্ঞতা, ভক্তিকে যদি

প্রাণাবেগের স্থূলতা, কামনার রূঢ়তা অশুদ্ধ ক'রে থাকে—তবে এমন হৃদয়ে এই সৌম্যা শ্রীময়ী দেবী তিষ্ঠিবেন না। এক দিব্য ঘৃণায় তাঁর অন্তর ভ'রে ওঠে,—তিনি স'রে চলে যান। জোর করবার, আয়াস করবার মত প্রকৃতি তাঁর নয়।"

আর, মহাসরস্বতী "মায়ের কর্মশক্তি, তাঁর পূর্ণ সৌষ্ঠবের, শৃঙ্খলার প্রেরণা।.....কার্য নিষ্পাদনের ক্ষমতায় পরম নিপুণা, স্থূল প্রকৃতির নিকটতমা। মহেশ্বরী সাজিয়ে ধরেন বিশ্বশক্তিরাজির বৃহৎ ধারাগুলি, মহাকালী দেন তাদের চলবার বল ও বেগ, মহালক্ষ্মী ব্যক্ত করেন তাদের ছন্দ ও পরিমিতি। কিন্তু মহাসরস্বতী পর্যবেক্ষণ করেন তাদের সংগঠনের ও প্রয়োগের সব খুঁটিনাটি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমাবেশ, বিভিন্ন বলের সার্থক সংযোগ, ফলের এবং সাফল্যের অব্যর্থ যথাযোগ্যতা। জিনিসের প্রয়োগনীতি, গঠনরীতি, কারুপদ্ধতি মহাসরস্বতীর রাজ্য। সিদ্ধকর্মীর অন্তরঙ্গ ও যথাযথ জ্ঞান, সূক্ষ্মবোধ ও ধৈর্য, তার অন্তর্জ্ঞানী মনের, সচেতন হস্তের, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির নির্ভুলতা মহাসরস্বতী আপন প্রকৃতির মধ্যে নিরন্তর ধ'রে রয়েছেন, এবং যাকে তিনি বরণ করেন তাকে এ-সকল সম্পদ দান করতে পারেন।"......"আপন সৃষ্টিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে যদি অনন্তকাল ধ'রে পরিশ্রম করা প্রয়োজন হয় তার জন্য তিনি প্রস্তুত। ......সদয়া, সুস্মিতা, তিনি রয়েছেন আমাদের কাছে কাছে, সর্বদা সাহায্য ক'রে চলেছেন, সহজে তিনি বিমুখ বা নিরাশ হন না ; পুনঃপুনঃ ব্যর্থতার পরেও তিনি সমানে উৎসাহ দিচ্ছেন, প্রতি পদক্ষেপে তিনি আমাদের হাত ধ'রে নিয়ে চলেছেন—তাঁর শুধু একমাত্র দাবি, আমাদের সঙ্কল্প যেন হয় অব্যভিচারী, আমরা যেন হই ঋজু, একনিষ্ঠ।"*

হিমালয়ের নিভৃতাঞ্চলে বৈষ্ণোদেবীর গোপন গুহার অভ্যন্তরে জগজ্জনীর এই ত্রিবিধ রূপের পূজা হয়। বেদির সুমুখে করজোড়ে নতশিরে দাঁড়াই। তাকিয়ে দেখি, মায়ের চিরপ্রচলিত বিভিন্ন বিগ্রহ মূর্তি নয়, তিনটি কৃষ্ণবর্ণ শিলাখণ্ড। চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেবীপ্রতিমা নয়,—অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস মাত্র,—প্রতীকমাধ্যমে ভাব ও মনের অনুভবের প্রকাশ।

শিলাখণ্ডগুলি রক্তবর্ণ বসনে ও পুষ্পভারে সমাচ্ছন্ন। নিকটে আর কয়েকটি স্থাপিত বিগ্রহও পাণ্ডারা দেখান।

যাত্রীরা ভক্তিভরে পূজামন্ত্র পড়েন। পুষ্পঅর্ঘ্য ও নানান উপচার উৎসর্গ করেন। বেদিমূলে প্রণাম জানান। পূজারী কপালে সিন্দুর-টিপ দেন। গলায় প্রসাদী লাল সুতার মালা পরান। মুঠাভরে হাতে মায়ের প্রসাদ দেন,—হাতে নিয়ে দেখি, সুগন্ধি ফুলের সঙ্গে কয়েকটি খুচরা পয়সাও!

বিস্ময় জাগে মনে, ভারতের আর কোন তীর্থক্ষেত্রে এমন প্রথা কি আছে? পূজারী, পাণ্ডা, সাধারণত সর্বত্র দেববিগ্রহের সামনে বসেও যাত্রীদের উত্যক্ত করে তোলেন 'প্রণামী' 'প্রণামী' চেয়ে—আর এখানে বৈষ্ণোদেবীর দরবারে মায়ের তরফ থেকেই— অর্থের আশীর্বাদ,—স্থানীয় ভাষায় বলে, খাজানা!

পরম আশ্চর্যময় তীর্থ বৈষ্ণোদেবী। যেমন বিচিত্র আকৃতিবিশিষ্ট পার্বত্য গুহা, তেমনি ভক্তি-প্রেম-সুধাসিঞ্চিত এর যাত্রাপথ।

*　　　*　　　*

বারো বছর পূর্বে বৈষ্ণোদেবীর তপস্যাক্ষেত্র সেই নিভৃত দুর্গম গুহা দর্শন করে এসেছি। এখন এক বন্ধুর মুখে সংবাদ শুনি, গত ২০শে মার্চ ১৯৩৪ সনে সেই গুহার এক অংশের পাথর ফাটিয়ে অপর এক কৃত্রিম গুহামুখ বা টানেলের সৃষ্টি হয়েছে,—সেই সুড়ঙ্গ পথ ৩৯·৬১ মিটার লম্বা, ১·৮২ মিটার চওড়া, ২·২১ মিটার উঁচু,—যাত্রীদের গুহা থেকে নির্গমনের সুগম পথ শুভাকাঙ্ক্ষী কর্তৃপক্ষ খুলে দিয়েছেন। এখন নাকি আর পূজার্থী যাত্রীদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় না। কলিকালের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযুগ,—চাঁদে মানুষ নামছে, বৈষ্ণোদেবীর রহস্যময় গুহা ভেদ করে যাত্রীদের যাতায়াতের সুখ-সুবিধার প্রবর্তন,—আশ্চর্য কী!

বৈষ্ণোদেবীর তপস্যান্তে কল্কি অবতারের আবির্ভাবের দিন আগত কিনা, তাই ভাবি।

রেণুকা হ্রদের তীরে

পশ্চিম-হিমালয়ের নিভৃত শান্ত পরিবেশ। গিরিমালার আবেষ্টনে রমণীয় স্বচ্ছ সরোবর। অদূরে বনতলে ঋষির আশ্রম। স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়া। ধ্যানমৌনী শৈলশ্রেণী। ধীরগতি কলস্বনা নির্ঝরিণী। কুঞ্জে কুঞ্জে পাখির কাকলি। নির্ভয়ে ঘোরে হরিণ-হরিণী। বাইরে তপোবনের শান্তি। আশ্রমিকদেরও মনে কাম-বাসনা-বিহীন গভীর প্রশান্তি।

ঋষি জমদগ্নি। বিদর্ভরাজ প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকা তাঁর সহধর্মিণী। রাজনন্দিনী কুটির থেকে স্নান করতে চলেন সরোবরে। এখন ঋষিভার্যা। ধীর চরণ। স্থির মন। হঠাৎ জলকেলির আনন্দোচ্ছ্বাস শান্ত বনভূমিতে শিহরণ জাগায়। রেণুকার চমক লাগে। সচকিতে গাছের আড়ালে আত্মগোপন করেন। কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলেন সরোবরে। একি! ঐ তো গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ! মহিষী ও সঙ্গিনীদের নিয়ে জলক্রীড়ায় প্রমত্ত! কি অবাধ আমোদপ্রমোদ! রেণুকা লজ্জাভরে চোখ নামান। আবার লুকিয়ে দেখতেও থাকেন। ভুলে যান আশ্রমের পরিবেশ। শান্ত মন সংযম হারায়। চিত্তবিকার ঘটে। ঋষিপত্নী কামাতুর হৃদয়ে কুটিরে ফেরেন। সর্বজ্ঞ জমদগ্নি ক্রোধান্ধ হন। আশ্রমধর্মের অবলাঞ্ছনা! একে একে পুত্রদের ডাকেন। আদেশ করেন, এখনই মাতার শিরশ্ছেদ করো।

মাতৃহত্যা! চার পুত্র স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কুপিত ঋষি অভিশাপ দেন, পিতৃআজ্ঞার লঙ্ঘন। পশুপক্ষীর মত জড়স্বভাব হোক তোদের।

পঞ্চম পুত্রকে ডাক দেন। একই আদেশ করেন। হিমালয়ের মত অটল, মায়ামমতাহীন, উন্নত-শির সেই পুত্র। পিতৃ-আদেশ পালনে এগিয়ে চলেন। কুঠারাঘাতে আপন জননীর শিরশ্ছেদ করেন। মাতৃহত্যার রক্তপাতে ধরিত্রী শিউরে ওঠেন। রক্তাক্ষরে চিরকালের জন্য কলঙ্ক-ইতিহাস রচিত হয়—মাতৃ-হত্যাকারী পরশুরাম!

কিন্তু, এই দুরপনেয় কলঙ্কভার বহন করার দুর্জয় শক্তি জগতে একমাত্র সেই পরশুরামই রাখেন। এ যেন নির্বিকারে নীলকণ্ঠের হলাহল পান।

বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার এই জামদগ্ন্য পরশুরাম। তবু মানব-দেহী। তাই ধরাশায়ী ছিন্ন মাতৃমুণ্ড দেখে কি ভাবেন কি জানি! কিন্তু ওদিকে মুনি জমদগ্নি পুত্রের প্রতি সুপ্রসন্ন হন। বলেন, যা চাও, বর নাও।

এতক্ষণে মানুষ পরশুরাম সজাগ হন। একে একে বর চেয়ে নেন। বরপ্রাপ্তির ফলে জননী নিষ্পাপ হয়ে পুনর্জন্মলাভ করেন। গ্লানিকর পূর্বস্মৃতিও বিস্মৃত হন। ভ্রাতৃবর্গও সুস্থ সজীব হয়ে ওঠেন। মাতৃহত্যার পাপস্পর্শ থেকে নিজেও মুক্তি পান। যুদ্ধে অজেয় হন। সুদীর্ঘ জীবনলাভও করেন।

আরও এক উপাখ্যানের প্রচলন আছে।

দুর্ধর্ষ, অত্যাচারী ক্ষত্রিয়রাজ সহস্রবাহু কার্তবীর্যের মহিষী ছিলেন মেনুকা,—রেণুকারই এক ভগিনী। একদিন রেণুকা বনপ্রান্তে গিরিনদীতে স্নান করতে চলেন। হঠাৎ সাক্ষাৎ সহস্রবাহুর সঙ্গে। রাজা সদলবলে বনে শিকারে এসেছেন। ঋষিপত্নী ভার্যা-ভগিনীকে দেখে মহারাজ রঙ্গভরে বলেন, কী গো, তোমাদের আশ্রমের দোরগোড়ায় এসে গেলাম, খাওয়াবে না আমাদের সকলকে?

রেণুকা লজ্জা বোধ করেন, সমস্যায় পড়েন। রাজার দলবল, এত লোকজন! আহারের ব্যবস্থা সে কি কখনও ঋষির আশ্রমে সম্ভব? তবুও স্বামীর শরণাপন্ন হন। জমদগ্নি হাসেন। বলেন. ঠিক আছে, ভাবনা কিসের? ইন্দ্রদেবকে ঋষি স্মরণ করেন। তাঁর কামধেনু ও ধনভাণ্ডারী কুবেরের সাহায্য পান। বিরাট ভোজের আয়োজন হয়। রেণুকাদেবীও নানান বসনে-ভূষণে বিভূষিত হয়ে নিজ হাতে পরিবেশন করেন। কার্তবীর্য দেখে-শুনে স্তম্ভিত। অনুসন্ধানে জানতে পারেন, কামধেনু ও কুবেরের উপস্থিতি। দাবি জানান, এ দুটি আমার চাই-ই। কামধেনু সঙ্গে নিয়ে কুবের তাড়াতাড়ি ইন্দ্রলোকে ফিরে যান। বিক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ সহস্রবাহু জমদগ্নি ও তাঁর চারপুত্রকে হত্যা করেন। রেণুকা সভয়ে হ্রদের জলে আত্মবিসর্জন দেন। কার্তবীর্য আশ্রমের দ্রব্যাদি বিপর্যস্ত করে, হোমধেনুগুলি হরণ করে সদম্ভে ফিরে যান। পরশুরাম তখন

ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে সেই সুদূর মহেন্দ্রপর্বতে তপস্যারত। সংবাদ পেয়ে শ্বেত অশ্বে আরোহণ করে ত্বরিতগতিতে চলে আসেন। কার্তবীর্যের সহস্রবাহু ছিন্ন করে তাঁর প্রাণনাশ করেন। তারপর শুরু হয় সেই জীবনধারী অবতার পরশুরামের নৃশংস হত্যালীলা। ব্রাহ্মণ হয়েও ভাগ্যদোষে তাঁর অসাধারণ ক্ষত্রিয়বৃত্তি। ক্ষত্রিয়-জাতি-ধ্বংসকার্যে প্রবৃত্তি। কথিত আছে একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। রামায়ণে ও মহাভারতে তাঁর নানান কাহিনী শোনা যায়।

ওদিকে, কার্তবীর্যের হত্যার পর দেবতা ও ঋষিদের প্রার্থনার ফলে রেণুকাদেবী হ্রদ থেকে উদ্ধৃত হন, পুনর্জীবন লাভ করেন। হ্রদের নামকরণও হয় তাঁরই নামে—রেণুকা হ্রদ। হিমাচলপ্রদেশে সিরমুর জেলায়, নাহান শহর থেকে আটাশ মাইল দূরে, হিমালয়ের কোলে সেই প্রসিদ্ধ হ্রদ।

একবার হরিদ্বার বাসকালে সেই রেণুকা হ্রদ দেখতে যাওয়ার সুযোগ হয়।

সেবছর হরিদ্বারে উপস্থিত হই বর্ষা শেষ হবার আগেই। যাওয়ার বিশেষ এক কারণ থাকে।

শ্রদ্ধেয় স্বামী আনন্দের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় 'কুয়ারি গিরিপথে' আছে। বৈচিত্র্যময় তাঁর জীবনী। মহাত্মা গান্ধীর এক প্রধান সহকর্মী ছিলেন। আজন্ম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। পরিব্রজ্যা নিয়ে হিমালয়ের বহু দুর্গম অন্দরে কন্দরে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছেনও। সাধুজগতেও খ্যাতি তাঁর প্রভূত। কৌসানীতে এসে 'গঙ্গাকুটির'-এ কয়েক বছর ধরেই নিভৃত হিমালয়বাসের অসীম আনন্দ ভোগ করেন। ওদিকে বয়সও বাড়ে। দেহে রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটে। পাহাড় ছেড়ে নেমে আসতে বাধ্য হন। চলে আসার আগে চিঠিতে জানান, কৌসানীর সঙ্গে চিরসম্বন্ধ ঘুচিয়ে হিমালয় ছেড়ে চলেছি, অতি বড় দুঃস্বপ্নেও ভাবা যায়নি। ঠাকুরের যেমন ইচ্ছা তাই-ই তো হবে। দুঃখ নেই এতেও।

কিন্তু হিমালয় ছাড়লেও পাহাড় ছাড়তে পারেন না। বম্বে শহর থেকে প্রায় আশি মাইল দূর। আরব সাগরের উপকূল। সেই সমুদ্রতীরে ছোট এক পাহাড়। হোক না ছোট, তবুও তো পাহাড়! তারই মাথায় নির্জন নিরালায় তাঁর বাস শুরু হয়। মাঝে মাঝে সেখানে আমিও যাই। সাধুসঙ্গের মহতী শান্তি আকর্ষণ করে। নিয়মিত পত্রালাপ তো থাকেই।

এই বছর বর্ষার মধ্যে তিনি জানান, একটা সুখবর দিই। ডাক্তারের ছাড়পত্র পেয়েছি। মাস দুই হরিদ্বার-অঞ্চলে কাটানোর অনুমতি মিলেছে। আবার, সেই হিমালয়! সেই গঙ্গাকিনারে বাস! ভাবতেও মন আনন্দে ভরে ওঠে। এসো না চলে? আবার দুজনে একসঙ্গে কাটানো যাক। পঁচাশি বছর বয়স হল, —এ-দেহ আর ক'দিন! কাণ্ডারীর পথ চেয়ে সাগরতীরে তো বসেই আছি!

চিঠি পেয়েই চলে আসি। হরিদ্বারের গঙ্গার ধার। সৎসঙ্গ। পরম আনন্দে দিন কাটে। জাহ্নবীর পবিত্র ধারারই মত।

বর্ষার শেষ বর্ষণ একদিন বিদায় চায়। বৃষ্টি থামে। মেঘের ফাঁকে শরতের গাঢ় নীল আকাশ উঁকি মারে। দিগন্তে হিমালয়ের নীলাভ-রেখা ক্রমে আরও স্পষ্ট হয়। দু-একটা সাদা বরফের চূড়া পিছনে যেন গোপনে মাথা তোলে। আবার হিমালয়ের কোলে ছুটে যেতে মন আনচান করে। হঠাৎ ছোট্ট এক সুযোগও আসে।

এক বন্ধু সস্ত্রীক এসে হাজির। হিমালয়ে ঘোরা তাঁদেরও নেশা। ঘুরেছেনও প্রচুর। আবার এসেছেন হরিদ্বারে। বলেন, এবার ভাবছি হরিদ্বার থেকে বাস্-এ সিমলা যাই; তারপর সেদিকের পাহাড়-অঞ্চলে কোথাও প্রবেশ করা যাবে।

এইভাবে ঘোরাফেরা যেন তাঁদের নিত্যকর্ম, সহজধর্ম—এমনি দ্বিধাহীন উত্তর দেন। আমার মনেও সুপ্ত উৎসাহ জেগে ওঠে। বলি, তা হলে মাঝপথ পর্যন্ত সঙ্গী হতে পারি। ঐ পথে পাহাড়ের প্রথম স্তরেই পড়বে—নাহান। সিরমুর জেলায়। নাহানে নেমে আমি চলে যাব—রেণুকাহ্রদে। পাহাড়ে ঘেরা বনজঙ্গলের মধ্যে শুনেছি সুন্দর হ্রদ।

কথা শুনে বন্ধুর মনেও আগ্রহ জাগে। বলেন, রেণুকা-হ্রদ? কই? ওটার খবর তো এতদিন জানা ছিল না! চলুন তাহলে আমরাও দেখে আসি, সেটাই বা বাদ থাকে কেন?

বলি, দেখুন কি আশ্চর্য যোগাযোগ। কোথায় হিমালয়ের সেই পূর্বাঞ্চলে নেফাতে পরশুরামকুণ্ড।

সে-বছর একই সঙ্গে দেখে আসা গেল। আবার হঠাৎ-ই কেমন এখানে দুজনের দেখা। একই সঙ্গে এবার যাওয়া পশ্চিম হিমাচলে রেণুকা-হ্রদে—সেই পরশুরামেরই কাহিনী-বিজড়িত আর এক তীর্থে।

তখনই গিয়ে স্বামী আনন্দকে জানাই। তিনি শুনে খুশী। আশ্চর্য হয়ে বলেন, সে কী! রেণুকা-দর্শন হয়নি এতদিন? ঘুরে এস—ঘুরে এস, আনন্দ পাবে। ডাক্তারের নিষেধ না থাকলে আমিও আবার যেতাম;—হঠাৎ চুপ করে যান। কি যেন ভাবেন। তারপর শান্তকণ্ঠে বলেন, নাঃ, ডাক্তারের অনুমতি থাকলেও আর যেতাম না। যাওয়ার যে-আকর্ষণ ছিল তাই যে আর নেই!

ভাবি, আগেকার দিনের সেই পায়ে-হেঁটে তীর্থযাত্রা করার যে আনন্দ আধুনিক যুগে হারিয়ে গেছে, তারই ইঙ্গিত করেন। আমার ভুল ভাঙে তখনই। দেখি, তাঁর মুখে চোখে ভক্তিভাবের শান্তমধুর আভাস প্রকাশ পায়। ধীর স্বরে বলেন, যেতাম ওখানে আমি প্রায়ই। স্থানের আকর্ষণ প্রথমে ছিল বটে, কিন্তু প্রাণের টান এল আর এক দিক থেকে। বিরাট এক মহাত্মা থাকতেন ওখানে,—গঙ্গাপুরীজী!

নামটি উচ্চারণের মধ্যে প্রতি অক্ষরে যেন তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমের সুস্নিগ্ধ চন্দনগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

আবার ধীরে ধীরে নামটি বলেন, গঙ্গাপুরীজী। এখনও চোখের ওপরে তাঁর সেই সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি ফুটে ওঠে। সে-যুগের সন্ন্যাস-মার্গের তিনিও ছিলেন এক দীপশিখা। যেমন শাস্ত্রজ্ঞানী, তেমনি মহাযোগী, তেমনি কর্মীপুরুষও। তাঁর কথা তোমাকে কখনও বলিনি বুঝি? আশ্চর্য!

স্বামী আনন্দের স্মৃতি-প্রদীপ্ত আরক্ত মুখখানির দিকে নির্বাক প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকি। আপনা থেকেই তিনি বলতে থাকেন, গঙ্গাপুরীজীর প্রথম দর্শন পাই কবে জানো? ১৯৩৪ কিংবা ১৯৩৬ সালে। সেবারে আবার তখন চলেছি গঙ্গোত্রীর পথে। তার আগে তাঁর নাম শুনেছি। কিন্তু দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি। সেইবারে হল; এবং দর্শনমাত্রই আকৃষ্ট হলাম। আমার ধারণা, তাঁর শরীর ছিল কুমায়ুনের। ভারতের সর্বতীর্থ পরিক্রমা করে উত্তরাখণ্ডেই আসন পাতেন। গঙ্গাতীরে ছোট্ট এক কুটিয়ায় থাকেন। শাস্ত্রবিদ্, যোগী পুরুষ বলে বিপুল খ্যাতি। তারপর তাঁর স্বভাব-মধুর স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়াতলে বহুবারই আশ্রয় নিয়েছি।

স্বামী আনন্দ আবার চুপ করে কি ভাবেন। যেন, স্মৃতিচারণ করেই বলতে থাকেন, লোকেদের কত ভুল ধারণা থাকে দেখেছ? সাধারণ লোক হিমালয়ের সাধুসন্তের উল্লেখ শুনলেই ভাবে, কঠোর কঠিন নীরস কর্কশ যোগী পুরুষ। ভস্মমাখা দেহ। রুক্ষ আচরণ। জগতের হিতাহিত বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য। নির্বিকার। কেউ কেউ আবার বিজ্ঞের মত বলে থাকেন, এ-সব সাধুরা অলস জীবন কাটিয়ে যান, জগতের কোন কল্যাণই করেন না। আমি ভাবি, যাঁরা এ-সব বলেন, তাঁদের ক'জনই বা প্রকৃত উচ্চকোটির সাধুর দর্শন পেয়েছেন, এবং চাক্ষুষ দু-একজনকে হঠাৎ কোথাও দেখলেও এইসব মহাপুরুষদের ঠিকমত বিচার করার বিদ্যা-বুদ্ধি-ক্ষমতা ক'জনই বা রাখেন? ভাগ্যবলে যারা এঁদের সংস্পর্শে এসেছে, তারাই জানে, এইসব মহাত্মাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন, যাঁরা কঠিন সাধনাবলে শুধু ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন করেই ক্ষান্ত হননি, সাধারণ মানুষের মধ্যেও মিলেছেন, মিশেছেন, জনহিতকর বহু কর্মও সাধন করেছেন। এই গঙ্গাপুরীজীকেও দেখেছি, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, শাস্ত্রজ্ঞানী, তবুও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যেখানেই তিনি তীর্থ-ভ্রমণ করেছেন, সেখানকার ইতিহাস, লোকাচার, স্থানীয় অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, চারিত্রিক গুণাবলী, দুর্বলতা—এমন কি খাদ্যাখাদ্যের রুচিভেদ,—সর্ববিষয়েই তিনি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করতেন। আসাম থেকে হিন্দুকুশ পর্যন্ত হিমালয়ের সকল তীর্থক্ষেত্র তিনি পর্যটন করেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে। সেকালের বড় বড় সাধুমহাত্মাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁদের কয়েকজনের নাম করলেই বুঝতে পারবে—বাবা বিশুদ্ধানন্দ কালীকমলিওয়ালে, মঙ্গলনাথ, কৈলাসগিরি, কেশবানন্দ, মুরলীধর, কৃষ্ণাশ্রম, তপোবন স্বামী, ব্রহ্মপ্রকাশ, বিষ্ণুদত্ত—এঁদের কেউ কেউ এই তো সেদিন পর্যন্তও ছিলেন। তুমিও তো দর্শন পেয়েছ তাঁদের কয়েকজনেরই। গঙ্গাপুরীজীকে দেখা হল না তোমার, তাঁকে দেখলে দেখতে, সকলেরই তিনি কি গভীর শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র ছিলেন। তার একটা কারণ, নিজে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। কোন স্বতন্ত্র আশ্রমেরও প্রতিষ্ঠা করেননি। উন্মুক্ত আকাশের মত ছিল তাঁর উদার ধর্মমত—সর্ববিশ্বব্যাপী। নির্বিচারে মানুষের সেবা ও উপকার করাই ছিল তাঁর বহিঃজীবনের ধর্ম। ভারতের বিভিন্ন ধর্মমতের ও সম্প্রদায়ের শাখা-

প্রশাখার উৎপত্তি, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্যের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে তিনি ছিলেন জীবন্ত জ্ঞানকোষ। মধ্য-হিমালয়ের যে কোন প্রদেশের,—বিশেষত কুলু, কাংড়া, হিমাচলপ্রদেশ—গাড়োয়াল কুমায়ুনের ভৌগোলিক তথ্য ছিল তাঁর নখদর্পণে। অমন ব্রহ্মজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ—কি করে জাগতিক বিষয়েও এত সজাগ থাকতেন, আশ্চর্য বোধ হত। তাঁর কাছে যখনই যেতাম, মনে অনুভূতি জাগত, যেন অসীম জ্ঞানসমুদ্রের তটে এসে বসেছি।

স্বামী আনন্দ আবার ক্ষণিক চুপ করেন। তারপর মৃদু হেসে বলেন, এই শ্রেণীর মহাত্মাদের ক্রিয়াকলাপ বিচার করা কি সহজ ব্যাপার? শ্রীভগবান অর্জুনকে সেই বলেছিলেন :

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥

এঁরা ছিলেন সেই পর্যায়ের যোগী। অবাক হতে হয় এই সব মহাত্মাদের কর্মক্ষমতা দেখে। সারাদিনের খাদ্য ছিল, ভিক্ষালব্ধ দুখানা মোটা রুটি। পরনে কৌপীন। তৃণশয্যা। অনন্ত আকাশতলে আশ্রয়। স্বামী বিবেকানন্দের 'সন্ন্যাসীর গীতি' : The song of the Sannyasin-এ আছে না—

Have thou no home. What home can hold thee friend?
The sky thy roof, the grass thy bed, and food,
What chance may bring, well cooked or ill, judge not.
No food or drink can taint that noble Self.
Which knows Itself. Like rolling river free
Thou ever be, Sannyasin bold! Say—
"Om Tat Sat. Om!"

এইসব মহাত্মারা সেই সন্ন্যাসীরই দল। অথচ, সর্বত্যাগী এই সন্ন্যাসীদেরই প্রচেষ্টায় সারা উত্তরাখণ্ডের তীর্থপথে সাধুসন্তদের জন্যে ব্যবস্থা হত ছত্রের লঙ্গরখানা, প্রতিষ্ঠা হত ধর্মশিক্ষা ও শাস্ত্রাধ্যায়নের জন্যে বিদ্যাপীঠ, যাত্রীচলাচলের জন্যে পথঘাটের পত্তন, নদীপারাপারের দড়ির পুল, ধর্মশালা, চিকিৎসালয় ইত্যাদি। এ-সব কথা এখন ভাবতেও বিস্ময় লাগে। গঙ্গাপুরীজী ছিলেন সেই মহাপুরুষদেরই অন্যতম। বছর কুড়ি আগে রেণুকা-হ্রদের তীরে গিয়ে থাকা শুরু করেন। তাঁরই দর্শনে যেতাম সেইখানে।

জিজ্ঞাসা করি, শেষ কবে গিয়েছিলেন?

বছর পনেরো আগে। তখনই তাঁর বয়স ৮৫ হয়ে গেছে। তার পর দু'একটা চিঠি তাঁর পাই। কিন্তু কবে তাঁর দেহাবসান হয়, তা আর জানতে পারি না। তাঁর অবর্তমানে রেণুকায় যেতে মনও আর চায় না। ঘুরে এস তোমরা। শান্ত স্থান। ভালই লাগবে। এখন মোটরের পথও নিশ্চয় হয়ে গেছে অনেক দূর!

বলি, খোঁজখবর যতটা পাই, নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। দিন তিনেকের মধ্যেই ঘুরে আসব। তখন নতুন-রেণুকার গল্পও শোনাব।

সাধুর মুখে সাধু-সন্তের কথা,—শুনে মনে আনন্দ জাগে। গঙ্গাপুরীজীর দর্শন পাইনি, তাতে ক্ষোভ থাকে না মনে।

জানি, যা পাইনি, বা যা নেই—তার জন্য দুঃখ করে লাভও নেই। দেখা যাঁর সঙ্গে যখন হবার কথা, ঠিকই হয় সেই সময়। এখন তো চলি, দেখে আসি রেণুকাহ্রদ।

যাত্রার দুদিন আগে দেরাদুনে যাই। হরিদ্বার থেকে সিমলার বাস যায় দেরাদুন হয়ে। তাই সঙ্গী বন্ধুকে জানাই, দেরাদুনে নির্দিষ্ট দিনে বাস ধরব। ইতিমধ্যে রেণুকার পথঘাট সম্পর্কে যেটুকু খোঁজখবর পাই নিয়ে রাখব।

সেদিন দেরাদুনে ঠিকমত বাস-ঘাঁটিতে আসি। বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হই। কনডাকটার নাহানের টিকিট দিতে চায় না। বলে, নৌঘাট পর্যন্ত পাবেন। যমুনার অপরপারে গিয়ে আর এক বাস। নাহানের টিকিট তখন নেবেন।

যাব নাহান, তবুও সরাসরি টিকিট দেবে না, ব্যাপার বুঝি না। নৌঘাট পর্যন্তই টিকিট কেটে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশ পায় নৌঘাটে পৌঁছে।

দেরাদুন থেকে নৌঘাট মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ। ঘাটে পৌঁছুবার মাইল দেড়েক আগে হার্বার্টপুর। বড় জায়গা। এখান থেকে একটা রাস্তা চলে যায় চাকরাতার দিকে। তাই উল্টামুখে বাসপথ যায় সাহারানপুরে। তৃতীয় পথটি নৌঘাটের। অল্পক্ষণের মধ্যেই যমুনার ধারে গিয়ে বাস দাঁড়ায়। দূরে দিগন্ত-বিস্তৃত হিমালয় গিরিশ্রেণী। পার্বত্য-রাজ্য ছেড়ে যমুনা এখানে সমতলভূমির উপর দিয়ে বয়ে চলে। কিন্তু দেখতে সমতল হলেও ঠিক তা নয়। মূল হিমালয় ও শিবালিক শৈলশ্রেণীর মধ্যবর্তী উচ্চপ্রদেশ—'ডুন'-এরই এক অংশ।

বেলা এগারোটা। রোদের তেজ বোধ হয়। তা হোক। ঐ তো নদী। পার হয়ে অপর পারে এখনই তো আবার আর এক বাস-এ চাপা। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই নাহান পৌঁছানো। সেখানে পাহাড়ের উপর। উৎসাহভরা মন নিয়ে বাস থেকে নামি। মালপত্র নিয়ে এগিয়ে চলি জলের কিনারায়। খেয়া নৌকায় উঠে এখনই ওপারে যেতে হবে। কিন্তু কোথায় নৌকা? শুকনা বালির চরের উপর কাত হয়ে পড়ে। আর, দু-কূল ছাপিয়ে যমুনার দুরন্ত স্রোত কলকল রবে ছুটে চলে। নৌকা চালায়, সাধ্য কার? এ-যেন উন্মাদিনী পার্বত্যতনয়া। আলুলায়িতকুন্তলা। কলহাস্যে দিগন্ত মুখরিত। পাশে হেলায় পড়ে, যেন ফেলে-দেওয়া খেলার সামগ্রী—নৌকাখানি।

তখন শুনি, দিনদুয়েক থেকে খেয়া পারাপার বন্ধ। ক'দিন আগে যে বর্ষা গেছে, পাহাড় থেকে তারই ঢল নেমে চলেছে।

পরস্পরে বলাবলি করি, এখন বোঝা গেল, এই কারণেই টিকিট দিয়েছে এই ঘাট পর্যন্ত। অথচ, তখন জানালেই তো পারত, খেয়া বন্ধ।

কিন্তু, তখনই দেখি, খবরটা না দেবার সামান্য একটু কৈফিয়ৎও আছে। নৌকাচলা বন্ধ হলেও পারাপারের একটা ব্যবস্থা এখনও চালু রয়েছে।

নদীর দুই পাড়ে কাঠের উঁচু খুঁটি। তারই উপর কাঠের মঞ্চ। মই বেয়ে উঠতে হয়। সেই দুই খুঁটিতে তার ও মোটা দড়ি বাঁধা এপার থেকে ওপার। তাইতে ঝোলে দোলনার মত ছোট একটা কাঠের চৌকি। জন দুই লোক পা গুটিয়ে তাতে বসতে পারে। এপারে উঠে বসলে ওপার থেকে টেনে নেয়, আবার ওপারের দুজন যাত্রী তেমনিভাবে এপারে আসে। মাঝখানে ক'হাত নিচেই খরস্রোতা কালিন্দীর সেই ভয়ঙ্করী মূর্তি। তা হোক। এতে আমাদের ভয় নেই। হিমালয়ের পথে এ-অভিজ্ঞতা নতুন নয়। কিন্তু, দুর্ভাবনা জাগে দুই কারণে। প্রথমত, স্থানীয় পারাপার-যাত্রীরা এরই মধ্যে 'কিউ' বেঁধে সেই মই-এর নীচে স্থান অধিকার করে। দুজন করে পার হয়। পারাপারে দেখি সময় নেয় এক এক খেপে প্রায় পনেরো মিনিট। অর্থাৎ ঘণ্টায় আটজন। অপেক্ষমাণ যাত্রী রয়েছে চল্লিশজন। ওপারের বাস এসে কি ততক্ষণ দাঁড়াবে? তাকেও তো সময়মত পাহাড়পথ ভেঙে সিমলায় পৌঁছুতে হবে।

বেশি ভাবতে হয় না এই নিয়ে। মিনিট কুড়ি পরেই অপর পারে বাস দেখা দেয়। যাত্রী নামিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। মিনিট দশেক অপেক্ষা করে। কয়েকবার হর্ন দেয়। এপারে বসে অসহায়ভাবে শুনি। যে-কজন যাত্রী পায় তাদের নিয়ে সিমলার পথে বাস আবার পাড়ি দেয়। যেন, আমাদের বুকভরা আশা নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে ধুলা ছড়িয়ে অদৃশ্য হয়। আমাদের নিয়ে যাবার দায়িত্ব তার নেই। আমাদের টিকিটের নির্ধারিত সীমা ফুরিয়েছে। ও বাস-এর দ্বারস্থও হতে পারিনি।

একটা চালাঘরের মধ্যে বসে পরামর্শ চলে,—এখন উপায়? একদল শিখযাত্রী আছেন, মেয়েছেলে নিয়ে। তাঁরাই পন্থা বলে দেন। তখন জানতে পারি, যমুনার অপর পারে মাইল তিনেক গেলেই শিখদের এক প্রসিদ্ধ তীর্থ—পউনটা সাহেব। সেখান থেকে নাহান যাবার অন্য বাস পাওয়া যেতে পারে।—যদি নদী পার হয়ে ওপারে কোনমতে পৌঁছুনো যায়। এবং তখনই দুর্ভাবনার দ্বিতীয় কারণ অকরুণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাকিয়ে দেখি, নদীর জল বেড়ে চলে হু-হু করে। ঝোলাপুলে অপরপারে যে-মাচার উপর নামতে হয়, সেখান থেকে মই বেয়ে এখন যাত্রী নামে দেখি, একহাঁটু জলের মধ্যে। তারপর, কোনরকমে ভিজে কাপড়চোপড়ে পাড়ে ওঠা। পরের খেপে দেখি, সেখানের জলের বেগ ও গভীরতা আরও বাড়ে। তীরস্থ লোকেরা দড়ি বেঁধে একটা ভেলা ভাসায়। মাচাস্থ যাত্রীকে কোনমতে তীরস্থ করে। পরের বার স্রোতের টানে তাও অসম্ভব হয়। দড়ির পুলে পারাপার অগত্যা বন্ধও হয়ে যায়।

ভাবনার আর কোন কারণ থাকে না। বন্ধু হেসে বলেন, অতঃ কিম্?

যাত্রায় বেরিয়ে রেণুকা দর্শন না করে আবার হরিদ্বারে ফেরা—কল্পনার অতীত। নদীর জল না নামা

পর্যন্ত এইখানেই দুদিন অপেক্ষা করতে হয়, তাতেও প্রস্তুত।

শিখ ভদ্রলোকই এক নতুন মতলব দেন, ফিরে যান হার্বার্টপুরে। সাহারানপুরের বাস ধরুন। সেখান থেকে যমুনানগর হয়ে ঐ পউনটা সাহেবে পৌঁছুবেন।

তথাস্তু। অনিশ্চিতের আশায় বসে থাকার চেয়ে ঘোরাপথেও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা থাকে। আবার মালপত্র নিয়ে রওনা। সাহারানপুরেও সেইমত পৌঁছুই। সেখানে অল্পপরেই যমুনানগরের বাসও পাই। বাস ছাড়েও ঠিক সময়ে। কিন্তু, ভাগ্যের বিড়ম্বনা এড়ায় সাধ্য কার? শহরের মধ্যে খানিক যেতেই রেলপথের লেভেল-ক্রশিং। সেদিন মুসলিম কি এক পর্ব। বিরাট মেলা বসেছে। রাজপথ লোকে লোকারণ্য। জনতা ভেদ করে মানুষ পায়ে হেঁটে যেতেই পথ পায় না, বাস চলবে সেখান দিয়ে? দু-ঘণ্টা বাস-এর মধ্যে বসেই কাটাতে হয়। বসে বসে দু'ঘণ্টা যমুনার ঢেউ গুনে কেটেছে, আবার এখন কাটে কত রকমের কত বিভিন্ন বেশভূষার বিচিত্র জনতরঙ্গ দেখে।

বসে বসে ভাবতে থাকি, জীবনের নাটক দেখি জীবন্ত রঙ্গমঞ্চে। আমি শুধু নির্বিকার দ্রষ্টা।

সময় কেটে যায়। আবার বাসও চলে। যমুনানগরে পৌঁছুই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। শহরে ঢোকবার কিছু আগে যমুনার উপর মস্ত পাকা পুল। এখানে মানুষের কাছে নদী হার মেনেছে।

বড় নতুন শহর। বড় রাস্তা। দু-পাশে দোকানপাট, ঘরবাড়ি। মাথার উপর রাতের অন্ধকার। শহরের বুকে এখানে-ওখানে বৈদ্যুতিক আলোর জ্বলন্ত দৃষ্টি। ঘুরে ঘুরে বাস চলে। একটু পরেই তার যাত্রা শেষ। শুনি, শহরের বাইরে তার ঘাঁটি। রাত কাটানো যায় কোথায়, তারই পরামর্শ চলে। পাহাড়-পর্বত অরণ্য-প্রান্তর হলে সে-ভাবনা থাকে না। সেখানে যেন প্রকৃতি-মায়ের আঁচল পাতা। যেখানে হোক কোলের কোণে স্থান মেলেই। এখানে যে সভ্য-শহর। ইট-পাথরের পাকা বাড়ি। আশ্রয়েরও তাই খোঁজাখুঁজি। এক সহযাত্রী বলে, দেশী হোটেল আছে, কিন্তু নোংরা হবে।

পথের পাশে বাস দাঁড়ায়। সুমুখে দেখি, নামাঙ্কিত বোর্ড—বনবিভাগের বিশ্রামাগার। অচিন দেশে হঠাৎ-দেখা বন্ধু এসে যেন ডাক দেয়। আর কথাবার্তা নয়। মালপত্র নিয়ে তখনই নেমে পড়ি। বাংলোয় ঢুকতেই ফরেস্ট-অফিসারের সঙ্গে দেখা। পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে ঘোরার ফলে কয়েকজন ডি. এফ. ও-র সঙ্গে ভালভাবেই জানাশোনা। পাঁচ মিনিটেই এঁর সঙ্গেও আলাপ জমে। বলেন, আপনারা যে আমাদেরই বনজঙ্গলের বাসিন্দা দেখি! দুটা ঘরই এখানে খালি। স্বচ্ছন্দে এসে রাত কাটান। সকালে নাহানের বাস ধরার জন্যে তাড়াহুড়া থাকবে না। কম্পাউন্ডে ঢুকেই গেটের পাশে যে খালি বাসটা দাঁড়িয়ে আছে,—দেখেছেন নিশ্চয়,—সেইটেই কাল সকালে নাহানে যাবে। এইখান থেকেই ছাড়ে। চা খেয়ে চেপে বসবেন।

ভাবি, এ কি স্বপ্ন দেখি?

সুখস্বপ্নের মতনই আরাম ও আনন্দে রাত কাটে।

পরদিন। সকাল সাড়ে ছ'টায় বাস ছাড়ে। পউনটা সাহেব পৌঁছয় ন'টায়। সেই কালকের 'ওপারের' পউনটা সাহেব। আজ এলাম প্রায় ২২ ঘণ্টা পরে। দীর্ঘপথ ঘুরে। এ-যেন মাথার পিছন দিয়ে হাত ঘুরিয়ে নাক ধরা! তা হোক। আর দেড় ঘণ্টার পথ নাহান এখান থেকে। সেখানে পৌঁছেই আবার তখনই বাস পাব। বিকেলের মধ্যেই রেণুকা-দর্শন।

উৎসাহ-বশে আবার ভুলি—do not count your chickens before they are hatched!

হাঁটাপথের সুবিধা অনেক। স্বাধীন মতে চলা যায়, থাকা যায়, আপন খেয়াল খুশি মত প্রোগ্রামও বাঁধা যায়।

কিন্তু, স্বাধীনদেশের যান্ত্রিক যান-বাহন? তার জালে পা পড়লে আর পরিত্রাণ নেই।

এখানেও তাই ঘটে। শুনি, এ-বাস নাহান আর যাবে না। এখনই আর এক বাস আসছে, সেইটে যাবে। কিন্তু সেই 'এখনই' হতে কেটে যায় চার ঘণ্টা! বাস-ঘাঁটিতে বসে বসে নৌঘাটের খবর নিই। খেয়া এখনও চলেনি, কবে চলবে তাও জানা নেই। পউনটা সাহেবের অত নিকটে অপেক্ষা করেও গুরুদ্বারের ভিতরে গিয়ে দেখা হয় না,—যদি 'এখনই' বাস এসে পড়ে!

কয়েক মাস পরে সাহিত্য-রসিক এক শিখ বন্ধুর কাছে একটা খবর শুনে সেদিন পউনটা সাহেব

গুরুদ্বারের ভেতরে গিয়ে না দেখে আসার জন্যে অনুশোচনা হয়। তিনি বলেন, অতক্ষণ ওখানে বসে রইলেন, দেখে এলেন না একবার? দেখলে আনন্দ পেতেন। শিখ কবি ও সাহিত্যিকদের জন্যে থাকবার অতি-সুন্দর আয়োজন আছে। তাঁরা যে-কেউ ওখানে একান্তে বাস করে আপন সাহিত্য-সাধনা করতে পারেন।

ভারতে এমন সুব্যবস্থা কোথাও কোন প্রতিষ্ঠানে আছে, আমার জানা ছিল না।

বাস ছাড়ল একটায়। এ-পথটুকু আসতে ভালই লাগে। সমতলভূমি ছেড়ে বাস-পথ ক্রমশ গিরিশ্রেণীর নিকটে এগিয়ে আসে। দিগন্তের সেই নীল পাহাড় সুস্পষ্টও হয়ে ওঠে। পথের পাশে পাহাড়ি নদী এসে পাশাপাশি ছুটতে থাকে। সামনে এক পাহাড়ের মাথায় নাহান শহরের বাড়ি-ঘর ফুলের মত ফুটে ওঠে। বাসও যেন তাই দেখে পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকে।

আবার হিমালয়ে! স্মৃতি-সমুদ্রে মন ভাসে।

শহরের প্রান্তে পাহাড়ের কোলে সমতল প্রান্তর। বাস-ঘাঁটি। বেলা আড়াইটা। নাহান ৩,০৫৭ ফুট উঁচু। ছোট পাহাড়ি শহর। পরিচ্ছন্ন। খবর নিয়ে শুনি, অল্প আগেই রেণুকার বাস ছেড়ে গেছে। পরের বাস—সেই পাঁচটায়!

দেরাদুনের এক পরিচিত অফিসারের শ্বশুর থাকেন এখানে। সুন্দরলাল শর্মাজি। তাঁর দপ্তরে টেলিফোন করি। তিনি এসে যান। বলেন, আপনাদের তো গতকাল এখানে পৌঁছানোর কথা ছিল। আমার জামাতা দেরাদুন থেকে খবর দিয়েছিলেন, বাস-স্ট্যান্ডে আমি অপেক্ষাও করেছিলাম।

পথে একদিন দেরি হওয়ার কারণ তাঁকে জানাই। তিনি বলেন, দিন তিনেক আগে তিনিও নীচে থেকে এখানে ফিরেছেন,—ঐ দড়ির ঝোলায় তাঁকেও পার হতে হয়েছে। অতি বিপজ্জনক ব্যবস্থা। পাহাড়ি হয়েও ওভাবে আসবার মোটেই তিনি পক্ষপাতী নন।—পীড়াপীড়ি করেন, এখানে আজ রাত-কাটানোর জন্যে। বলি, যে রকম বাধা ডিঙিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আগে রেণুকা-দর্শন করে আসা যাক। কাল ফেরবার পথে এখানে রাত কাটানো যাবে।

রেণুকার পথের সব খবরাখবর জানিয়ে দেন। এখান থেকে ২৮ মাইল দূরে দদাহু। বাস যায় সেই পর্যন্ত। সেখান থেকে হ্রদ মাত্র মাইলখানেক। আজ দদাহুতে রাত্রিবাস করতে পারি। সেখানকার এক ব্যবসায়ী,—ভরত সিংজী। আমাদের হাতে তাঁকে চিঠি লিখে দিচ্ছেন। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আর, কোন রকমে আজই যদি হ্রদে পৌঁছুতে পারি, তা হলে কথাই নেই,—হ্রদের ধারেই অতি-মনোরম রেস্ট হাউস।

বাস-এ যাত্রীর ভিড় হয়। আমরা আগে থেকে টিকিট কেটে স্থান অধিকার করেছি। বাস ছাড়বার মুখে এক প্রৌঢ় যাত্রী এসে হাজির হন। পরনে খদ্দরের পা-জামা, খদ্দরের মোটা লম্বা কোট। দোহারা লম্বাটে চেহারা। একটা গালের নীচে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। বোধ হয় ফোড়ায় ভুগছেন। দাড়ি গোঁফ ক'দিন কামানো সম্ভব হয়নি। তাই মুখের চেহারা আরও রুক্ষ শুষ্ক দেখায়। যাত্রীদের মধ্যে অনেকে তাঁকে চেনে দেখি। একজন খাতির করে বসবার জায়গা ছেড়ে দেয়। সুন্দরলালও চেনেন। তাঁকে দেখে যেন নিশ্চিন্তও হন। জিজ্ঞাসা করেন, আপনিও এতেই দদাহু ফিরছেন? ভালই হল। আমার এই বন্ধুরা চলেছেন রেণুকা-দর্শনে। ভরত সিং-এর নামে একটা চিঠি এঁদের হাতে দিয়েছি। আপনি যখন সঙ্গেই চলেছেন, তাহলে কোন ভাবনা নেই। এঁদের থাকবার যাতে একটা ব্যবস্থা হয়, দেখবেন যেন।

তিনিও এক কথায় আশ্বাস দেন, ঠিক আছে।

বাসও ছেড়ে দেয় তখনই।

শহরের মধ্যে বাস ঢোকে। খানিক গিয়ে চক-এর মত এক কেন্দ্রে দাঁড়ায়। কয়েকজন যাত্রী নামে। নতুন যাত্রীও ওঠে। কনডাকটার এগিয়ে আসে যাত্রীদের টিকিট দেখতে।

সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কাছে এলে তিনি টিকিটের পয়সা বার করে দিতে যান। কনডাকটর নেয় না। বলে, রাস্তার ধারে ঐ টিকিট দেওয়া হচ্ছে, নেমে গিয়ে কেটে আনুন।

ভদ্রলোক আপত্তি তোলেন, এইমাত্র তো ঐ যাত্রীর কাছে বাস-এর মধ্যেই পয়সা নিয়ে টিকিট দিলে, আমাকেই বা দেবে না কেন?

কনডাকটার কর্তৃত্ব দেখিয়ে বলে, ওকে দিয়েছি, আমার খুশি। আপনাকে দেব না, সেও আমার খুশি।

নিয়ম হল, ঐখানে টিকিট কেটে বাস-এ ওঠা। আপনাকেও তাই করতে হবে।

ভদ্রলোক দৃঢ়কণ্ঠে জানান, নিয়ম সবারই ওপর সমানভাবেই প্রয়োগ করতে হবে। সে-নিয়ম যখন চোখের সামনে দেখছি, মানা হচ্ছে না, তখন আমার ওপরও চোখ রাঙিয়ে জোর করে চালানো চলবে না। পয়সা নিয়ে টিকিট দাও এখানে।

বচসা বেধে যায়। লোকজন জড় হয়। বাস-এর কয়েকজন যাত্রী ভদ্রলোককে সমর্থন করে। কনডাকটারের রোখ আরও চাপে। তাঁকে বাস ছেড়ে নেমে যেতে হুকুম করে। তিনি বলেন, নামব কেন? এই তো টিকিটের দাম দিচ্ছি।

কনডাকটার শাসায়, দেখিয়ে দিচ্ছি এখনই কি করে ঘাড় ধরে নামাতে হয়! এ-গাড়ি আজ আর যাবে না, যতক্ষণ তুমি গাড়িতে থাকবে,—বলে সজোরে সবেগে আস্ফালন করে গাড়ি থেকে সে নিজেই নামে। ড্রাইভারকে বলে দেয়, খবরদার, গাড়ি যেন না চালানো হয়।—ভদ্রলোকও নির্বাক হয়ে ইস্পাতের মত কঠিন শরীর করে বসে থাকেন। যাত্রীরা সন্ত্রস্ত। ওদিকে সন্ধ্যা নামে। পাহাড়ের পথ। দদাহু পৌঁছুতে কত বিলম্ব হয়, কে জানে?

আমাদের আরও দুশ্চিন্তা, এই ভদ্রলোকই যে আমাদের দদাহু-বাসের বল-ভরসা!

অল্পপরে কনডাকটার বুক ফুলিয়ে ফেরে। সঙ্গে উর্দিধারী পুলিশ। পিছনে কৌতূহলী জনতা। পুলিশ গাড়িতে ঢুকে এসে তাঁকে নামতে বলে। ভদ্রলোক তাঁর বক্তব্য স্পষ্টভাবে তাকে বোঝান, নিয়ম মেনে চলতেই আমি অভ্যস্ত। কিন্তু যেখানে চোখের সামনে দেখছি কর্মচারী নিয়ম মানছে না, তখন শুধু আমারই ওপর সে-নিয়ম খাটানো, মানবো কেন? কে আমাকে নামায়, দেখি।—বলে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকেন।

ভাবি, আজ বুঝি নাহানেই রাত কাটাতে হয়! কোথায় গতকাল রেণুকায় পৌঁছানোর কথা;—আর দু-দিন ধরে পথে পথেই এখনও বেঘোরে সময় কাটে! রেণুকা-দর্শনের কি এতই দর্শনী-মূল্য?

কিন্তু অভাবনীয় ভাবেই তখনই সমস্যার সমাধান ঘটে। পুলিশটি বিচক্ষণ, শান্তস্বভাব। হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে বলে, দিন আপনার পয়সা,—আমিই টিকিট কেটে এনে দিচ্ছি।

এতক্ষণে বাস চলে। শহর ছাড়িয়ে আর এক পাহাড়ের আরও উপরে উঠতে থাকে। কয়েক মাইল এগিয়ে সিমলার পথ ছাড়ে। ডান দিকে ভিন্ন আর এক মোটর সড়ক। সন্ধ্যার অন্ধকার বাইরে গাঢ় হয়। আকাশ ঘিরে মেঘও জমে। পাহাড়ী এক নদীর উপর পুল পার হয়ে আবার পথ উঠে চলে। নাম শুনি, জালাল নদী। এক জায়গায় এক জলপ্রপাতের আবছা সাদা জলের ধারা দেখা যায়—Badolia falls.

সাড়ে সাতটায় দদাহু পৌঁছুই। পাহাড়ে-ঘেরা জায়গা অন্ধকার লাগে। কয়েকটা দোকানপাট, ঘরবাড়ি। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মনে হয়, কালো দৈত্যাকার পাহাড়ের গায়ে ওৎ পেতে বসে এক পাল জানোয়ার,—আঁধারে মিশে আছে দেহ, শুধু কটমট করে চোখগুলি জ্বলে।

বাস থামতেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ভরত সিংজীর নামে-লেখা চিঠিখানি চেয়ে নিয়ে নেমে যান। মালপত্র নিয়ে আমরা ধীরেসুস্থে সব-শেষে নামছি, এমনি সময়ে তিনি ফিরে আসেন। সঙ্গে একটি তরুণ পাহাড়ী ছেলে। বলেন, ভরত সিংজী গ্রামে নেই। এই তাঁর ছেলে। এই-ই সব ব্যবস্থা করবে। আচ্ছা, আমি আসি।—বলে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে অন্ধকারে তখনই অদৃশ্য হন। ধন্যবাদেরও প্রতীক্ষা করেন না।

ছেলেটির নাম বিজেন্দ্র ঠাকুর। বয়স বছর ১৭/১৮। সরল নম্র ব্যবহার। বলে, পিতাজী বাইরে গেছেন। দুদিন পরে ফিরবেন। চলুন আমাদের বাড়িতে। সেইখানে থাকবেন। কোন অসুবিধা হবে না, আমি আপনাদের সেবা করবার সুযোগ পাব।

বাস-স্ট্যান্ডের পাশেই যাত্রীদের প্রতীক্ষালয়। নতুন-তৈরি একতলা পাকা বাড়ি। সামনে বারান্দা। একপাশে দপ্তরের বড়বাবুর থাকবার ঘর। পাশেই প্রকাণ্ড হল্। দু-পাশের দেওয়ালের গায়ে সিমেন্টের লম্বা বেঞ্চের মত গাঁথনি। একধারে আর একটা ছোট কামরা,—টিকিট কাউন্টার। হল্-এর অপর প্রান্তের দরজা দিয়ে ঢুকে আরও একটা ঘর। সেখানে বাস-চালক ও কনডাকটারদের রাত-কাটানোর আস্তানা। হল্-এর সঙ্গে সংলগ্ন স্নানঘর, শৌচাগার। নতুন বলেই এখনও বেশি অপরিষ্কার হবার সময় আসেনি। তা হলেও এরই মধ্যে জলের পাইপ-লাইন বিকল হয়েছে; মুখ-ধোওয়ার বেসিন-ভরতি নোংরা কালো জল।

তা হোক। বিজেন্দ্রকে বলি, এই হল্‌ঘরেই রাতটুকু কাটাই। অসুবিধে হবে না। ঐ সিমেন্টের বেঞ্চের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়া যাবে। ছারপোকারও ভয় নেই। কাল ভোরে উঠেই তো রেণুকা যাওয়া,—ফিরে এসে আবার এইখান থেকেই সামনে বাস-এ ওঠা। এইখানেই থাকা ভাল। কাল রেণুকা-দর্শন যাতে ভালভাবে হয়, তার ব্যবস্থা করে দিয়ো।

সে শুনে খুশি হয় না। তার একান্ত ইচ্ছা, তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখে, খাওয়ায় দাওয়ায়।

তাকে বোঝাই, তোমার বাড়িতে নিশ্চয় একবার ঘুরে আসব। এখান থেকে একটু দূরে পাহাড়ের উপর বলছ—কেন আবার এই অন্ধকারে এই মালপত্র নিয়ে সেখানে ওঠা-নামা? এখানেই বেশ রাত কেটে যাবে। তুমি বরং এখন যদি একটু দুধের ব্যবস্থা করে দিতে পার, ভাল হয়।

বিছানাপত্র হল্‌-এর মধ্যে এনে রাখা হয়। এমনি সময়ে এক ঝলক আলোর মতন হঠাৎ দরজা দিয়ে ঢোকেন এক সুশ্রী সাধুমূর্তি। সহাস্য মুখে হিন্দীতে বলেন, মুখার্জি! এসে গেছেন তা হলে? বহুৎ আচ্ছা। থাকবার ঠিকমত ব্যবস্থা হয়েছে?

অবাক হয়ে তাঁর মুখের পানে তাকাই। এখানে পূর্ব-পরিচিত ব্যক্তি কোথা থেকে এলেন?

বছর পঁয়ত্রিশ বয়সী সাধু। গেরুয়াধারী নন। ধবধবে সাদা সদ্য-পাট-ভাঙা বেশভূষা। মাথাভরা কোঁকড়া চুল। তেল-চকচকে। ঢেউ খেলে কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। কালো কুচকুচে কোঁকড়ানো দাড়ি-গোঁফ। আলো লেগে ঝলমল করে। সুশ্রী মুখ চোখ। চালচলনে, চোখের চাহনিতেও একটা সদাই কর্মব্যস্ত ভাব। হাসিমুখে আমার ও আমার সঙ্গীর দিকে তাকান। দেখে চিনতে পারি না। হিমালয়ের অন্যত্র কোথাও পরিচয় হয়েছিল নাকি? ভেবেও মনে আসে না। জিজ্ঞাসাই করে ফেলি।

তখন প্রকাশ পায়, নামের পদবীটা এইমাত্র বাইরে কার কাছে জেনেছেন। তাই, কৃত্রিম পরিচয়ের অভিব্যক্তি। ইনিও থাকেন রেণুকাহ্রদের তীরে এক আশ্রমে। বছর তিনেক হল এসেছেন।

ভাবি, ভালই হল। রেণুকা দেখার ব্যবস্থা এবার সহজেই হয়ে যাবে। ব্যবস্থা আর কি? সঙ্গে একটা লোক পেলেই হল, যে জানে-শোনে, ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে আনবে।

তিনি উৎসাহ দিয়ে বলেন, কোন চিন্তাই নেই। নিজেই সকালে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ভোরে তৈরি হয়ে থাকবেন,—ঠিক সাড়ে ছটায়।

হল্‌-এর চারপাশে তাকিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নেন। জিজ্ঞাসা করেন, এখানে থাকবার সব ঠিক আছে? অসুবিধে নেই কোন? খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা?

বলি, বিজেন্দ্র সব দেখাশুনা করছে। কোনই ভাবনা নেই আমাদের।

বিজেন্দ্রের পিঠ চাপড়ে বলেন, ঠিক ভাবে সব দেখো, কোন কষ্ট না হয় এঁদের। আচ্ছা, কাল সকালে ঠিক সাড়ে ছটায় তৈরি থাকবেন যেন,—আমিই সঙ্গে থেকে সব দর্শন করিয়ে দেব।

আবার ঝড়ের মত বেরিয়ে যান। যেমন আসা, তেমনি যাওয়া, তেমনি মুখের তোড়।

বিজেন্দ্র কোন মন্তব্য করে না। একটু যেন গম্ভীর হয়। প্রশ্নের জবাবে শুধু বলে, হাঁ, উনি থাকেন বটে সেই হ্রদের ধারে এক আশ্রমে।—দুধ আনতে হবে কোন পাত্রে, দিন, নইলে দেরি করলে আর হয়ত পাওয়া যাবে না।

পাত্র নিয়ে তখনই বেরিয়ে যায়।

বিজেন্দ্র কাজের ছেলে। গুছিয়ে-গাছিয়ে সব কিছুরই ব্যবস্থা করে দেয়। তার বাবা এসে না ভাবেন, অতিথিদের সেবা হয়নি। তাদের বাড়িতেও একবার না ঘুরিয়ে এনে ছাড়ে না। বাপের বড় কারবার আছে। তারই কাজে বাইরে গেছেন। স্কুলে পড়া শেষ করে বিজেন্দ্র এখন দোকান চালাতে বাপকে সাহায্য করে। তার মহা ভাবনা, ঠিকমত আমাদের যত্ন হচ্ছে কিনা। রাত্রে যাবার আগে বলে, কাল আপনাদের সঙ্গে রেণুকায় যাব। সাড়ে ছ'টার আগেই আসব।

বলি, ঐ স্বামীজীও ঠিক সাড়ে ছ'টায় তৈরি থাকতে বলে গেছেন।

সে চুপ করে মৃদু হাসে।

বাড়ি ফেরবার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। বলে, রাত্রে আমিও এখানে এসে থাকব নাকি?

আমরা নিষেধ করি,—না, নিশ্চিন্তমনে তুমি বাড়ি যাও। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করো। কাল সকালে এস। আমাদের সব ব্যবস্থাই তো করে দিয়েছ।

দ্বিধাজড়িত চরণে সে চলে যায়। যাবার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, হল্-এর এই সদর দরজাটা বন্ধ রাখতে পারলে ভাল হয়। দেখবেন চেষ্টা করে।—কাল সকালে আসব। নমস্তে।

তার দুর্ভাবনার কারণটা অল্প পরেই প্রকাশ পায়। দুজন ড্রাইভার-কনডাকটার আসে, পাশের ছোট ঘরে যায়। আবার বেরিয়ে যাবার সময় জানিয়ে দেয়, রাত্রে এ-সদরদরজা যেন ভেতর থেকে বন্ধ না থাকে। তারা খেতে যাচ্ছে। ফিরতে একটু রাত হতে পারে।

তার পরেই টিকিট-দপ্তরের বড়বাবুর আবির্ভাব। বছর চল্লিশ বয়স। আমার সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলেন। অতি অমায়িক। এসেই হেঁট হয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, কসুর হয়েছে আমার। আপনি আমার বাবার মতন। আমি আপনার ছেলে। খবর পাইনি। এই পাশের ঘরের মধ্যে ছিলাম। ঐটে আমার কোয়ার্টার্স। আজ চারদিন হল এখানে বদলি হয়ে এসেছি। আলমোরার কাছে আমার বাড়ি। পরিবার ছেলেমেয়ে সঙ্গে এনেছি। আপনাদের জন্যে রুটি সবজি বানিয়ে পাঠিয়ে দিই—আপনি আমার পিতা আছেন,—বলে আবার হেঁট হয়ে নমস্কার করে।

এত অনর্গল বকার কারণ সহজেই বোঝা যায়। ভরভর করে মুখে সুরার তীব্র গন্ধ। রক্তরাঙা আঁখি। আবিল দৃষ্টি।

কোন রকমে তাকে বিদায় করা হয়। একটু পরে আবার ফিরে আসে তার টিকিটঘরের চাবি নিয়ে। হাত জোড় করে বলে, কাঁদ কাঁদ সুরে,—পিতাজী! কি ভাবে আমি সেবা করব ভেবে পাচ্ছি না। এই পাশের টিকিটঘরের চাবি এখানে রেখে গেলাম। ভেতরে বড় টেবিল, বেঞ্চি পাতা আছে। আলাদা গোসলখানাও। ঐ ঘরে গিয়ে থাকুন আপনারা।—জোর করে চাবিটা রেখে দিয়ে চলে যায়। একটু পরে তার এক সহকর্মী আসে। উত্তেজিত হয়ে বলে, আপনাদের কাছে নাকি ঐ টিকিটঘরের চাবি? সে কী কথা? সরকারী দপ্তর! ফিরিয়ে দিন চাবি এখনই।—ভাবটা দেখায় এমন, যেন আমাদেরই দোষ।

সদর দরজা ভেজিয়ে রেখেই শুতে হয়। বাতাসে বন্ধ থাকে না। খুলে যায়। আলোও জ্বলতে থাকে। সিমেন্টের বেঞ্চে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি। হিমালয়ের কত খোলা জায়গাতেও রাত কেটেছে। নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে কম্বল-শয্যা-পাশে জিনিসপত্র ছড়িয়ে রেখে কেমন অঘোরে ঘুমিয়েছি। আর আজ এখানে? কী বিচিত্র জগৎ! কত চরিত্রের মানুষ! রাতভোরই কি রঙ্গমঞ্চে এই নাটক দেখব?

তাই-ই হয়। সেই কনডাকটর-ড্রাইভাররা ফেরে। কত রাত তখন, কি জানি! একজন তার মধ্যে মদ খেয়ে চুর। ধরে ধরে তাকে আনে। স্খলিত চরণে সে চলে। বিজড়িত কণ্ঠে কি সব বকতে থাকে। হাত ঝাঁকানি দিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়। দেওয়ালের উপর ধাক্কা খায়। তার সাথী তাকে সামলাবার চেষ্টা করে। তারও মুখে জড়ানো কথা। এক চোখ কানা দু-চক্ষু-অন্ধকে পথ দেখায়।

চোখ চেয়ে চেয়ে অনেক রাত পর্যন্ত এই সব নাটকীয় দৃশ্যই দেখতে হয়।

সকাল ছটার মধ্যেই তৈরি হয়ে থাকি। জিনিসপত্র এখানেই থাকবে। খালি হাতে যাওয়া। দুপুরের মধ্যে এখানে ফেরা। নাহানের বাস ধরা। হ্রদ এখান থেকে মাত্র মাইলখানেক দূর। দেখে ফিরে আসতে কতটুকুই বা সময় লাগবে?

সাড়ে ছটার আগেই বিজেন্দ্র আসে। সাধুজীর জন্য অপেক্ষা করা হয়। সাড়ে ছটা বেজে যায়। তবু দেখা নেই। না হোক, অপেক্ষা করার আর দরকার বা কি? বিজেন্দ্র স্থানীয় ছেলে। সেও তো ওসব অঞ্চল ভালই চেনে।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে সাধুর সঙ্গে পথে দেখা। হনহন করে চলেছেন। সকালেও ধোপদুরস্ত চেহারা। চোখাচোখি হতেই দাঁড়িয়ে যান। বলি, আমরা তো তৈরি। রওনা হয়েছি। আপনিও আসছেন তো? একটু আশ্চর্য ভাব দেখিয়ে বলেন, আমি? কোথায়? রেণুকায়? আমি তো চলেছি একটু পরে নাহানে। জীপ এসে গেছে। সিমলা থেকে বেতারকেন্দ্রের ক'জন শিল্পী এসেছেন, পাবলিসিটি দপ্তরের ফটোগ্রাফারের দলও আছে, তাদের সঙ্গে নিয়ে এখনই যেতে হবে নাহান-এ। জানেন না? আজ সেখানে মস্ত মেলা। আপনারাও তো বিকেলে নাহানে ফিরছেন? সেই মেলাতেই আবার হয়ত দেখা হবে—আচ্ছা, একটু তাড়াতাড়ি আছে আমার—জীপ এখনই ছাড়বে।

আবার ঝড়ের মতন রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হন।

ভাবি, মেলার রঙ্গ এখান থেকেই দেখি বটে।

গ্রামের পাশেই পাহাড়ি নদী। নামও গিরিনদী। বিস্তীর্ণ বালুচর। মাঝে মাঝে নদীর স্রোতধারা। হেঁটে পার হতে হয়। শেষের প্রধান ধারায় জলের গভীরতা আছে, স্রোতের টানও আছে। তাই কাঠের পুলও আছে। পুল পেরিয়ে ওপারে ওঠা। সেদিকেও কয়েকটি ঘরবাড়ি। দোকানও। ছোট গ্রামের মত। নদীর ধার দিয়ে পথ। গ্রাম ছাড়িয়ে পাহাড়ের নীচে পৌঁছাই। দু-পাশে গাছপালা। ছোট ঝরনা। তারই এক ক্ষুদ্র ধারা দেখিয়ে বিজেন্দ্র বলে, প্রবাদ, এইখানে পরশুরাম মাতৃহত্যা করেন।

কোন কিছুই তার স্মারক চিহ্ন নেই। গতানুগতিক পাহাড়ি ছোট ধারা। পাহাড়ের কোণে অল্প জল জমা। গাছপালা শিলাখণ্ডে স্থানটি যেন সলজ্জে সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকে।

ভাবি, ভালই করে। পিতৃভক্ত পরশুরামের সেই কীর্তি গোপন থাকাই ভাল।

আরও খানিক এগিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে সামান্য চড়াই। পথের ধারে পাথরের তোরণ। পাশে মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড এক যাত্রীশালা। বিজেন্দ্র বলে, এখন খালি দেখছেন। মেলার সময় এলে দেখতেন, লোক দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। সে-সময়ে সেই পউনটা সাহেব থেকেও ঐ হ্রদের নিকট পর্যন্ত আসবার জন্যে আরও একটা পথ খুলে যায়। কাঁচা রাস্তা, মাঝপথে একটা নদীও পড়ে, তাই বর্ষাকালে সে-পথে বাস চলে না। জিজ্ঞাসা করি, মেলা হয় কখন?

বলে, দীপান্বিতার পর, কার্তিক একাদশীতে। দশ হাজারেরও বেশি যাত্রী সমাগম হয়। একাদশীতে পরশুরামের শোভাযাত্রা বেরোয়—সেই গিরিনদীর নিকট থেকে। তারপর রেণুকাহ্রদে পৌঁছে বিগ্রহ মায়ের চরণ স্পর্শ করেন। যাত্রীদেরও সেই সময়ে তীর্থস্নান করতে হয়। পূর্ণিমা পর্যন্ত মেলা থাকে। তারপর আবার স্নানান্তে মেলা ভাঙে।—পাহাড়ের একটু ওপরে উঠুন, পাশের ঐ সরু পথটা ধরে,—ওপরে ঐ এক নতুন মন্দির হয়েছে পরশুরামের,—সেটাও দেখে আসবেন।

সামান্য চড়াই। নতুন মন্দির। পাথর দিয়ে বাঁধানো। পাহাড়ের নীচে হ্রদ দেখা যায়। প্রায় গোলাকৃতি। বিজেন্দ্র বলে, ওটা কিন্তু রেণুকা হ্রদ নয়। পরশুরাম হ্রদ। মায়ের নামে যেটা এখানকার আসল হ্রদ,—সেটা সামনের ঐ পাহাড়টার ওধারে। এখান থেকে দেখা যায় না। দুটো হ্রদের মধ্যে যোগাযোগও নেই। নীচে হ্রদের ধারে ঐ ঘরগুলাও ধর্মশালা। মেলার সময় সব ভর্তি থাকে। পাশে ওধারে ঐ রঙিন বাংলোটা রেস্ট হাউস—

বিজেন্দ্র দেখিয়ে দেখিয়ে বলে বটে, আমার কিন্তু সেদিকে নজর নেই। তাকিয়ে দেখছি, পাহাড়-ঘেরা হ্রদ। টলটল করে গাঢ় নীল জল। তাতে শোভা পায় রাশি রাশি ফোটা পদ্ম। রঙের অপূর্ব বাহার। পুত্র যেন সযত্নে বুকে ধরে রাখে ডালিভরা পদ্মের গুচ্ছ। মায়ের চরণে নিবেদন করার উদ্দেশে।

নেমে আসি হ্রদের ধারে। জলের পাশ দিয়ে ঘুরে চলি। ধর্মশালার ঘরগুলি ছাড়িয়ে এসে দেখি, বেড়া ও তার দিয়ে ঘেরা এলাকা। কর্তৃপক্ষরা ছোট পশুশালার ব্যবস্থা করেছেন। সারি সারি খাঁচার মধ্যে ধরে-রাখা,—কয়টা ভালুক, হরিণ। কতকগুলি পাখিও। হ্রদের আশপাশে পাহাড়ের গায়ে গভীর জঙ্গল। শুনি, সেখানে বাঘ, ভালুক, হরিণের বাস। তাই ভারী সুবিধা! কয়েকটা ধরে এনে খাঁচায় পুরে রাখা। বনের স্বাধীন প্রাণীকে এইভাবে জঙ্গলের ধারেই বন্দী করে রাখার আনন্দ বা সার্থকতা কোথায় বুঝি না।

মনে পড়ে, ক'বছর আগেকার এক ঘটনা। গিরনার-এ বেড়াতে গেছি। জুনাগড় শহর গিরনার পাহাড়ের নীচেই। সেই পাহাড়ের চারপাশেও জঙ্গল। সেখানেও নাকি সিংহের বাস। জুনাগড়ে একটা বড় পশুশালা আছে। দেখতে যাই। কয়েকটাই সিংহ সেখানে ধরে রাখা। একটা খাঁচার সুমুখে লেখা দেখি, ক'দিন মাত্র আগে সেই সিংহটা ধরা পড়ে। জঙ্গলে নয়। পশুশালার এলাকার মধ্যে। বন্দী সিংহের ডাক শুনে হয়ত এইখানে এসে ঘুরছিল। খাঁচায় ঢুকে ধরা দিতে সে হয়ত কোন বাধাও দেয়নি। আগে-ধরে-রাখা সিংহটাও তো তার স্বজাতি—আপন প্রিয়জনই যে নয়, তাই বা কে বলে? হয়ত সেই কারণেই নিজে এসে ধরা দেওয়া।

বন্য পশুরও প্রাণ আছে। স্নেহ-মমতার বাঁধনও বোঝে।

হ্রদের তীরে বাগান। ফুল ও ফলের গাছ। গাছের ছায়ায় বসবার বেঞ্চ। কোথাও বা শিল্পীর হাতে-গড়া পাথরের মূর্তি—রেণুকাদেবীর, বীণাবাদিনী সরস্বতীর, কোথাও বা হরিণ ইত্যাদির। ভাস্করের নাম ক্ষোদিত করা, পড়ি।—চ্যাটার্জি।

দুটা ছোট মন্দিরও আছে। একটা রেণুকার, অপরটি পরশুরামের। কিন্তু, আজীবন দুর্ভাগ্যবতী রেণুকা। পাষাণ মূর্তি ধরেও শান্তি নেই। কিছুদিন আগে প্রাচীন সুন্দর বিগ্রহ মন্দির থেকে চুরি যায়। অপহারী ধরা পড়ে। তাই রেণুকাদেবী এখন থাকায়, অপরাধীর বিচারের অপেক্ষায় সাক্ষ্যস্বরূপ পুলিশ হেফাজতে! হায় রে দেবীর দুর্দশা।

ঘটনা শুনে ও হ্রদের আশপাশ দেখে মনে দুঃখ জাগে। কোথায় সেই রেণুকার স্বামী অরণ্যবাসী জমদগ্নি ঋষির আশ্রম! কোথায় সেই হ্রদের তীরের শান্ত তপোবন! বনের পশুপক্ষীর স্বাধীন বিচরণ! এখন সভ্য জগতের মানুষ এসে নিজের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বনের পশুকে খাঁচায় ভরে। মন্দিরের বিগ্রহ পাচার করে। আর, সাজানো শৌখিন বাংলো-প্যাটার্নের রেস্ট হাউস? তারও কাহিনী শুনি। হিমালয়ে প্রায় চার হাজার ফুট শীতোষ্ণ এই স্থান। তবুও, এ বাংলো এখন এয়ার-কণ্ডিসান্ড্। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাকি এখানে একবার শুভাগমন ঘটে।

হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রাচীন ঋষির তপস্যাক্ষেত্রে এ-সব দেখতে শুনতে মনে তৃপ্তি পাই না। এগিয়ে চলি হ্রদের ধার দিয়ে। দু-ফার্লং যাবার পর বাঁক ঘুরতেই পাহাড়ঘেরা আর এক হ্রদ। চারিপাশে বাঁকাচোরা পাহাড়ের তলদেশ। হ্রদের আকারও তাই আঁকাবাঁকা। দেখায় যেন পাহাড়ের মাঝ দিয়ে দু-কূল ছাপিয়ে ভরা নদী চলে এঁকে-বেঁকে। হ্রদের পরিক্রমা শুনি মাইল তিন চার। একপাশে এখানকার সব চেয়ে যে উঁচু পাহাড়—মনে হয় ছ'সাত হাজার ফুট উচ্চতা—তারই চূড়ায় জমদগ্নি মুনির আশ্রম। বিজেন্দ্র বলে, পাহাড়ের ওপরে উঠলে এই হ্রদের আকৃতি দেখায় মানুষের আকারের মতন। ঠিক যেন বিশাল এক মানুষের দেহ পড়ে আছে। এই পাহাড়গুলির খাঁজে। মাথা, কাঁধ, শরীর, পা—সব কিছুই যেন হ্রদের তটরেখায় আঁকা। লোকে বলে, রেণুকাদেবীরই প্রতিচ্ছবি। নামও তাই রেণুকাহ্রদ।

হ্রদের তীর দিয়ে আরও এগিয়ে যাই। এতক্ষণে কেমন যেন ভাল লাগে। চলি যেন কীসেরই আকর্ষণে। পাশে হ্রদ। গভীর জল। পাহাড়ের ও গাছপালার ছায়া পড়ে ঘন কালো দেখায়। যেখানে জলে আকাশের প্রতিবিম্ব সেখানে স্থির জল নীল কাঁচের মত ঝকঝক করে। কোথাও বা গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোক তির্যকভাবে জলে বেঁধে। বাতাসে হঠাৎ ঢেউ তোলে। দেখায় যেন ভাঙা কাঁচের টুকরা ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ কোথাও প্রকাণ্ড মাছ জলের ভিতর থেকে উপরে লাফিয়ে ওঠে। জলকণা ছড়িয়ে চকিতে অন্তর্ধান করে। জলের বুকে চক্রাকারে তরঙ্গ ওঠে। মাছ পালায়, ঢেউ থাকে।

পথের আর এক পাশে বন। শান্ত নীরব। তপোবনের আবহাওয়ার স্পর্শ আনে। আরও এগিয়ে চলি। বিজেন্দ্র বলে, হ্রদ পরিক্রমা করবেন নাকি?

বলি, খানিক দূর তো দেখি। এতক্ষণে মন টেনেছে চারিপাশের পরিবেশ।

বাঁধানো এক ঘাট। অদূরে সাধুর আশ্রম। ঘাটের সামনে জলের ধারে দাঁড়াই। জল স্পর্শ করি। মাথার ওপরে ছিটাই। মনে নিবিড় শান্তি অনুভব করি।

হঠাৎ মনে পড়ে, পুণ্যস্মৃতি গঙ্গাপুরীজীর কথা। ক'বছর আগে এলে দর্শন পেতাম সেই মহাত্মার। ভাবি, কি জানি, হ্রদের অদূরে ঐ কুটিয়াতে হয়ত তিনি থাকতেন,—স্বামী আনন্দও আসতেন হয়তো এইখানেই—বছরের পর বছর তাঁরই সন্দর্শনে।

অস্ফুটে প্রশ্ন করি বিজেন্দ্রকে, গঙ্গাপুরীজীর নাম শুনেছ? তাঁর কুটিয়া ছিল কোন্‌খানে?

বিজেন্দ্র আশ্চর্য হয়। আমার মুখের পানে তাকায়। বলে, চেনেন নাকি তাঁকে? ঐ তো বসে রয়েছেন কুটিয়ার বারান্দায় এইদিকেই চেয়ে।

হঠাৎ আকাশ থেকে একরাশ পুষ্পবৃষ্টি হলেও এমন আনন্দের চমক জাগাতো না।

উনিই গঙ্গাপুরীজী? এখনও জীবিত? আমাকেই যেন দেখেন মনে হয়!

হ্রদের তীর ছেড়ে আনন্দের ভারে ধীরে পা ফেলে চলি সেইদিকে। অল্পখানিক পাড়ের উপর ওঠা। উচ্ছ্বাস নয়, আবেগ নয়, চাঞ্চল্যপ্রকাশের এ সময়ও নয়। আশাতীত পুণ্যদর্শন প্রাপ্তির সুমহান প্রশান্তি।

ফুল ফলের কয়েকটি গাছ। সামনে আশ্রমের টানা বারান্দা। মাটিতে কম্বল-আসনে স্থির হয়ে বসে সেই শতবর্ষীয় মহাত্মা। গঙ্গাপুরীজী।

গেরুয়াবাস। দেখতে, সবল সুস্থ দেহ। উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ। দাড়ি-গোঁফ-মাথা কামানো। চক্ষে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সুস্নিগ্ধ প্রসন্ন বদন।

পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি। হাত তুলে আশীর্বাদ করেন। স্নেহার্দ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে আসছি?

হাসিমুখে জানাই, স্বামী আনন্দের কাছ থেকে,—হরিদ্বারে তাঁরই সঙ্গে আছি।

তাঁর কপালে বলিরেখায় অল্প কম্পন দেখা দেয়। ভ্রূকুঞ্চনে আশ্চর্যের ভাব প্রকাশ করেন। বলেন, স্বামী আনন্দ? স্বামী আনন্দ এখনও বেঁচে আছেন?

হেসে বলি, স্বামী আনন্দও তাই বলেন, আপনিও কি আর এ-দেহে আছেন?

এবার মহাত্মার মুখে হাসির আভা ফোটে। প্রফুল্ল বদনে বলেন, স্বামী আনন্দ আছেন তা হলে এখনও? তবে এতদিন তাঁর চিঠি আসেনি কেন?

বলি, তাঁরও মুখে শুনে এলাম ঐ একই প্রশ্ন। অনেককাল আপনার সংবাদ পাননি,—এ দেহ ত্যাগ করেছেন নিশ্চয়!

হ্রদের জলের দিকে তাকিয়ে এবার শতায়ু তাপস আপন মনে হাসেন। সরল শিশুর মতন। বলেন, বাঃ! এও এক মায়ার খেলা। দুজনেই দুজনকে শেষ করে রেখেছি। স্বামী আনন্দের বয়স হল এখন কত?

বলি, ৮৫ বছর।

তিনি বলেন, সবে পঁচাশি? হাঁ,—সেই রকমই হবে। এ-শরীরের একশ' হয়ে গেছি।

জিজ্ঞাসা করি, দেহ কেমন আছে?

হাসেন। বলেন, দেখছ কেমন?

ভাবি, দেখছি যেমন, তাতে একশ' বছর মনেই হয় না। চোখের জ্যোতি,—এখনও প্রখর। ইতিমধ্যে এখান থেকে হ্রদের ধারে আমার সঙ্গীকে ঘুরতে দেখে, ডাকতে পাঠিয়েছেন। বলেন, ওখানে ঐ কি তোমার সঙ্গী? এখানে আসুন, বিশ্রাম করুন, চা এনে দিক।

কথা বলছি স্বাভাবিক স্বরেই। তবুও পরিষ্কার শোনেন, উত্তর দেন।

বলেন. শুধু পায়ের জোরটা কমেছে, স্বচ্ছন্দে ওঠাবসা ঘোরাঘুরিতে অসুবিধা বোধ হয়।

আশ্রমিক আর এক সাধু আসেন। বয়স তাঁর বেশি নয়। হিমালয়ে ঘুরেছেন প্রচুর। পাঁচবার কৈলাস-মানসসরোবর গেছেন। সেই সব প্রসঙ্গ ওঠে। গঙ্গাপুরীজী চুপ করে শোনেন। হাসেন। বলেন, এই শরীর যখন সে সব অঞ্চলে যায়, সে কি এখনকার কথা? পথঘাট তো তখন ছিলই না। সেসব কালের কাহিনী বলেন। এমনভাবে বর্ণনা দেন, যেন চোখের সামনে ছায়াছবি দেখি। মনে হয়, কালের আদি নেই, অন্তও নেই। আশ্রমে কয়েক দিন কাটিয়ে যেতে বলেন। আমারও প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তবুও থাকা হয় না। কিন্তু যে সময়টুকু তাঁর সান্নিধ্যে কাটে, মনে হয়, মূল্য দিয়ে তার বিচার চলে না, কালের মানদণ্ড দিয়ে মাপাও যায় না। অনাদি অনন্ত তৃপ্তি মন পরিব্যাপ্ত করে রাখে।

বিদায় নিয়ে প্রণাম করে পূর্ণ হৃদয়ে চলে আসি।

হরিদ্বারে ফেরবার সময়েও সেই ঘুরে বাস-পথে আসা। তাই আবার দুদিন দেরি হয়। হরিদ্বারে স্বামী আনন্দের কাছে পৌঁছুতেই সস্নেহে বলেন, দেরি দেখে ভাবনা হচ্ছিল। যাক, ভালভাবে ফিরে এলে, নিশ্চিন্ত হলাম।

বলি, অতি-আনন্দের একটা খবর উপহার দেব, প্রস্তুত হোন।

তিনি নিস্পৃহভাবেই হাসেন। বলেন, কি খবর শোনাতে চাও আমাকে? নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছ, তাতেই আমি খুশি।

তখন বলি, শুনবেন তা হলে? দর্শন ও প্রণাম করে এলাম—গঙ্গাপুরীজীকে।

পুলক-বিস্ফারিত নয়নে স্বামী আনন্দ আমার পানে তাকান। দু-নয়ন অশ্রু-উজ্জ্বল দেখায়। দু-হাত বাড়িয়ে আমাকে আলিঙ্গন করেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, গঙ্গাপুরীজীর শরীর আছে এখনও? দর্শন করে এলে? আমিও যাবই আবার তাঁর দর্শনে।

সব কাহিনী তাঁকে শোনাই। বলি, আপনার যাওয়া হবে কি করে? এই বয়সে—ঐ রাস্তায়—তার ওপর ডাক্তারের নিষেধ পাহাড়ে যাওয়া?

তিনি স্থির কণ্ঠে বলেন, জানি, সব জানি। তবুও যাবই,—তাও জানি।

যানও তিনি তাই। হরিদ্বার থেকে আমি ফিরে আসার পর সে-খবর পাই। দেরাদুন থেকে তিনি লেখেন, রেণুকা ঘুরে এলাম ভালভাবেই—গঙ্গাপুরীজীকে দর্শন করে। একরাত তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে এলাম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এখন তিনি মাত্র দেড় ঘণ্টা নিদ্রা যান। সে-রাত্রে সেটুকুরও অবকাশ হয়নি। দুজনে পাশাপাশি কম্বল-শয্যায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি। যে অমৃত-মধুর আনন্দ নিয়ে ফিরেছি, ভাষায় কি তা ব্যক্ত করা যায়?

ভাবি, কবে—কোথায় কীভাবে কার দর্শন মেলে, তা কী কেউ বলতে পারে?
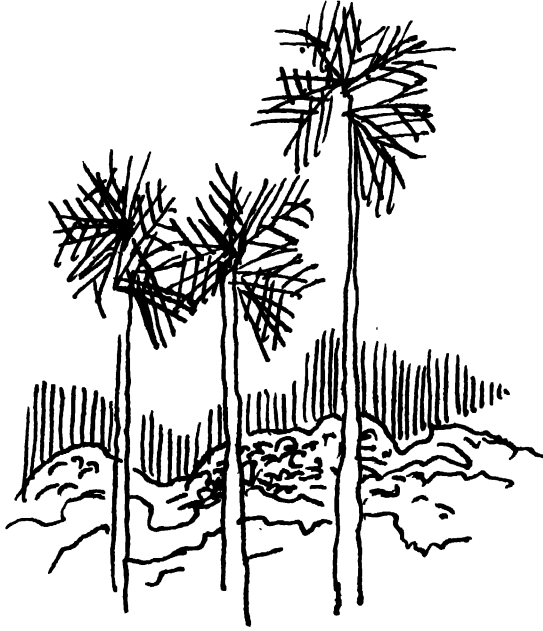
পরশুরাম কুণ্ড

॥ ১ ॥

হিমালয়ের সুদূর পশ্চিম অঞ্চলে হিমাচল প্রদেশে রেণুকা হ্রদ। আবার, ভারতের অপর প্রান্তে সেই হিমালয়েরই পূর্ব-উপান্তে পরশুরামের জীবন-কাহিনীর সূত্র ধরে আরও এক প্রসিদ্ধ কুণ্ড তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করে। সেখানে শান্ত তপোবনের সৌম্য কান্তি নয়, দুর্ধর্ষ পার্বত্য নদীর উচ্ছৃঙ্খল গতি। সেখানে প্রবাদ, মাতৃহত্যার পাপক্ষালনের জন্য পরশুরাম ব্রহ্মকুণ্ডের পবিত্র জলে স্নানের সঙ্কল্প করেন। বহু অন্বেষণেও ব্রহ্মকুণ্ডের সন্ধান পান না। অবশেষে, আসামের পূর্বোত্তর অঞ্চলে হিমালয়ের পাদদেশে উপস্থিত হন। সেইখানে গিরিপথ বেয়ে নেমে আসে লৌহিত্য নদ। দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতে তার উৎপত্তি। সেই নদীর তীরে এসে পরশুরাম কুঠার দিয়ে পাহাড়ের বুকে আঘাত করেন। নির্দেশ দেন, অলক্ষ্য ব্রহ্মকুণ্ডের জলধারা যেন সেই পর্বতছিদ্র থেকে নির্গত হয়। ক্ষুদ্র দুই ধারাও তখনই বাহির হয়। অপরিসর এক কুণ্ডের সৃষ্টি করে। পরশুরাম সেই কুণ্ডে স্নান করেন। পাপমুক্ত হন। অদৃশ্য-ব্রহ্মকুণ্ড থেকে আনা সঞ্চিত সেই জলরাশি পরশুরাম কুণ্ড নামে পরিচিত হয়। কিন্তু নদীরও বুঝি প্রাণ আছে, আকাঙ্ক্ষাও আছে। সমীপ-প্রবাহী লৌহিত্য নদ পুণ্যলোভাতুর হয়, কুণ্ডের জলে এসে মেশে। আবার অপর দিকে নদীর আকারে বয়ে চলে। ব্রহ্মকুণ্ডের জলে এই অবগাহনের পুণ্যবলেই লৌহিত্যের নব নামকরণ হয়—ব্রহ্মপুত্র।

তিব্বতে মানস-সরোবরের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে যে বিরাট নদ পূর্বমুখী বহে আসে, সে দেশে তার নাম সাঙ্-পো। অনেকে মনে করেন সেই-ই প্রকৃত ব্রহ্মপুত্র। তিব্বতের পূর্বাঞ্চলে পৌঁছে সেই নদ দক্ষিণে নামে। হিমালয় পর্বত-ব্যূহ ভেদ করে। আসাম প্রদেশের সমতলভূমিতে প্রবেশ করে পশিঘাটে। আসামের সেই দিকে তার নতুন নাম ডিহাং বা সিয়াং। আরও মাইল কুড়ি এগিয়ে আসার পর ডিহাং ও লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্রের সংযোগ হয়—সদিয়ার নিকটে। বিরাট নদ বয়ে চলে আসামের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নামে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই পরশুরাম কুণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রও পাপনাশক লৌহিত্য নদের অশেষ গুণকীর্তন করে।

কালধর্ম জগতে বিপুল পরিবর্তন আনে। এককালের সুদূর দুর্গম তীর্থ সহজ সুগম হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাচীন কুণ্ডেরও অবস্থান্তর ঘটে। আসামের ঐ অঞ্চল নেফা নাম পরিগ্রহণ করে। সম্প্রতি নতুন নাম হয়েছে,—অরুণাচল।

মাত্র কয়েক মাস আগে কিভাবে নেপার এই প্রসিদ্ধ পরশুরাম কুণ্ডে উপস্থিত হই, তারই এই সামান্য কাহিনী।

॥ ২ ॥

১৯৩৪ সাল। ফেব্রুয়ারী মাস। শীতকাল কাটে সাঁওতাল পরগণার স্নিগ্ধমধুর বাতাবরণে। শীতের শেষ দেখা দেয়। মনের কোণেও আবার হিমালয়ের ডাক শুনি। হঠাৎই চিঠি পাই এক পুরনো বন্ধুর। অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই জানান পরশুরাম কুণ্ডে যাওয়ার তাঁর ইচ্ছা। তখনই মনে পড়ে, কতকালের সে বাসনা আমারও। বছর চল্লিশ আগে একবার যাবার আয়োজনও হয়। সেকালে অতি দুর্গম তীর্থ বলেই তার খ্যাতি শুনি। অধ্যাপক পদ্মনাভ বিদ্যাবিনোদের এক পুস্তিকাতে বিবরণীও পড়ি। ব্রহ্মপুত্র ও আরও কয়েকটি ভয়াবহ নদী পারাপার। গভীর অরণ্যপথ। দুর্গম পাহাড়। অসভ্য পার্বত্য আদিবাসী। পায়ে হাঁটা। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার অভাব;—ইত্যাদি। ভারতের তীর্থগুলির মধ্যে অতি-কঠিন সেই তীর্থ। শুধু সাধু-সন্ন্যাসীরাই ও-পথে যাত্রী হন। যাত্রার আগ্রহও আমার তাই বাড়ে। তবু আয়োজন করেও যাওয়ার সৌভাগ্য হয় না। হঠাৎ বাধা পড়ে। তারপর ও-পথের আর কোনও খবরই রাখি না। এতকাল

পরে সেই পথ যেন আবার হঠাৎ এসে ডাক দেয়।

বন্ধুর সঙ্গ নেবার ইচ্ছা জানাই। অনুরোধ করি পথঘাটের খবর যেন তিনিই নেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিও করে রাখেন। আমি শুধু সময়মত গিয়ে যথাস্থানে যোগ দেব। তিনি করেনও তাই। নতুন নেফার লোহিত জেলার সদর শহর—তেজু। সেখানকার ডেপুটি কমিশনারের দপ্তরে লিখে সংবাদাদি ও পারমিট আনিয়ে রাখেন। বন্ধু সস্ত্রীক যাবেন, তাও জানান। কথা থাকে, ১১ই মার্চ রাত্রে তিনসুকিয়া স্টেশনে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেব।

॥ ৩ ॥

কলকাতা থেকে ট্রেনযোগে তিনসুকিয়া যেতে হয় গৌহাটি হয়ে। দীর্ঘ পথ। প্রায় তিনদিন সময় যায়। আজকাল প্লেনের যুগ। ঘণ্টাকয়েকেই পৌঁছে দিতে পারে।

আমি এই সুযোগে গৌহাটিতে দু'রাত্রি কাটিয়ে যাই। অনেক দিনের বন্ধুবান্ধব। প্রিয়জনের আন্তরিক সঙ্গসুখে তৃপ্তি পাই। অভাবিতভাবে পরশুরাম তীর্থপদের ব্যবস্থাদিরও বিশেষ আয়োজন হয়। স্থানীয় উচ্চপদস্থ এক বন্ধু নিজে থেকেই বলেন, নেফা নাগাল্যান্ডের আনাচ-কানাচে আমার ঘোরা। সর্বত্র জানাশোনা লোকজন। আগে একটু জানালে সব ব্যবস্থা অনায়াসে করে রাখতাম। ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে ওপারে যানবাহনের কি আয়োজন করেছেন শুনি?

স্বীকার করি, যা কিছু করার সেই সঙ্গী বন্ধুই করেছেন,—কি করেছেন আমার জানা নেই। আমি শুধু স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছি,—যার টানে যাওয়া, তিনিই নিশ্চয় নিয়ে যাবেন। তবে, সঙ্গীর কাছে এইটুকু শুনেছি, তিনসুকিয়া থেকে ব্রহ্মপুত্রের ঘাট পর্যন্ত বাস্ চলে, তারপর 'ফেরি স্টিমার'। ওপারে সদিয়া থেকে তেজু পর্যন্ত আবার পাবলিক বাস্। তেজু থেকে পরশুরাম হেঁটে যাওয়া-আসা,—মাইল ত্রিশ পথ। তার জন্যে তৈরি থাকতে বলেছেন। মাঝে অবশ্য নৌকা করে লোহিত নদী পারাপার আছে।

বন্ধু হেসে ওঠেন। বলেন, ওভাবে ঘোরাফেরায় আপনারা অভ্যস্ত জানি। কিন্তু, যেমন সহজে কথাগুলি বললেন, ও-সব অঞ্চলে অত সহজে তখনই তখনই সব ব্যবস্থা হয় না। ওপারে বাসে যাবেন—বাস্ পেলে তো? দিনে কখন ছাড়বে, মোটে ছাড়বে কিনা, ছাড়লেও কতদূর সেদিন যাবে, জায়গাও তাতে পাবেন কিনা—কোথায় কখন আটকে গেলেন কেউ বলতে পারে না,—সাহায্য করারও কাউকে পাবেন না। ও-সব মোটেই কাজের কথা নয়। সময় বড্ড অল্প। যেটুকু পারি এখান থেকেই এখুনি ব্যবস্থা করছি।

কাজের লোক। কাজও তাঁদের হাতে ঠিকই হয়ে যায়। তখনই 'ট্রাঙ্ক-কল্' চলে যায় তেজুতে। ফিরতি খবরও আসে। ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে সদিয়ার ঘাটে জীপ এসে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে। তেজু থেকে পরশুরাম কুণ্ডে যাওয়ার ব্যবস্থাও যথাসম্ভব হবে। আবার ওদিকে গৌহাটিতে যে-বন্ধুর আতিথেয়তায় আছি, তিনিও তিনসুকিয়াতে তাঁর বিশেষ পরিচিত গৌরীশঙ্করজীকে টেলিফোনে জানান, যাবার পথে তাঁর কাছে সেখানে রাত কাটাব।

আমার কোন নিষেধই মানেন না। বলেন, হোক না এক রাত্রি। স্টেশনে কাটাতে যাবেন কেন? দেখবেন কত খুশী হবেন ওঁরা আপনাদের পেলে।

ভাবি, কি জানি, মাথা পেতে বরণ করে নেবার প্রস্তুতি দেখলে পথের কষ্টও কি এমনি পালায়?

॥ ৪ ॥

তিনসুকিয়ায় পৌঁছুই রাত প্রায় পৌনে এগারোটায়। সঙ্গী সস্ত্রীক ঘণ্টা তিনেক আগে পৌঁছেছেন। স্টেশনেই দেখা হয়। গম্ভীর মুখে জানান, রিটায়ারিং রুম খালি নেই, আর ওয়েটিন রুমও ভরতি। তা হোক। এক রাত্রের ব্যাপার—প্ল্যাটফর্মে কাটানো যাবে। এর পরে যাত্রাপথে হয়ত গাছতলাতেই কাটবে—এখন থেকে অভ্যাস করা ভাল,—বলতে বলতে মুখে হাসি ফোটে। হিমালয়ের জানা-অজানা বহু জায়গায় ঘুরেছেন তাঁরা। এখনও ঘোরেন। তাই মনভরা তাঁদের হিমালয়-পথের আনন্দ।

কিন্তু, কার ব্যবস্থা কোথায় কে করে রাখেন, কেউ জানে না।

গৌরীশঙ্করজীর দূত এসে হাজির। জোর করে নিয়ে চলেন তাঁর বাড়িতে। বলেন, সব আয়োজন

সেখানে প্রস্তুত। স্টেশন এলাকার পাশেই বাড়ি। হোক এত রাত। কোনই অসুবিধে হবে না।

বাড়ি তো নয়, রাজপ্রাসাদ। আদর-আপ্যায়ন-যত্নও অপরিসীম। আন্তরিকতায় পূর্ণ। পরম আনন্দে রাত কাটে।

পরের দিন সকালে টেলিফোনে খবর নিয়ে গৌরীশঙ্করজী জানান, সৈখোয়াঘাট থেকে 'ফেরি' ছাড়বে বেলা দশটায়। সেখান থেকে বাসে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমার মোটর ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আসবে। পরশুরাম কুণ্ডে আমরা কয়েকবারই ঘুরে এসেছি, বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে। এখন কোন কষ্টই নেই। আগে বাবা-ঠাকুরদাদের কাছে শুনেছি বটে, যাওয়ার রাস্তা তো ছিলই না, যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি বিপজ্জনক যাত্রা ছিল। কিন্তু একটা কথা, যাতায়াতের এখন সুবিধা হলেও, আপনারা এলেন একেবারে অসময়ে,—বর্ষার মধ্যে। এসময়ে পথঘাটের কি অবস্থা, জানি না।

সঙ্গী বন্ধু আশ্চর্য হন, মার্চ মাসের আজ বারো তারিখ,—এরই মধ্যে বর্ষা! কাল রাত্তিরে অবশ্য সারারাতই বৃষ্টি হয়েছে, শব্দ শুনেছি। এখনও দেখছি আকাশে ঘনঘটা। আমি ভাবছি, এ বুঝি হঠাৎ দুদিন বাদলা নেমেছে!

গৌরীশঙ্করজী হাসেন। বলেন, না, না, এ তো ক'দিন ধরে চলেছে, চলবেও। এদিকের বর্ষা ফেব্রুয়ারিতেই নেমে যায়, তারপর চলতেই থাকে ক'মাস ধরে। সেইজন্যেই তো পরশুরাম কুণ্ডে যেতে হয়—ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যে। ওখানকার মেলাও বসে পৌষ-সংক্রান্তিতে,—যখন আপনাদের দিকে গঙ্গাসাগরের মেলা।

সঙ্গী প্রশ্ন করেন, কিন্তু শীতকালে পাহাড়ের মধ্যে ঠাণ্ডা ভীষণ হবে?

''তা তো একটু হবেই। জামাকাপড় থাকলে ভাবনা কি? কিন্তু, বর্ষা একবার নামলে নদী পার হওয়া অসম্ভব,—পথঘাটও ভেঙেচুরে বন্ধ হয়ে যায়। এখুনি কি হয়েছে, কি জানি। যাক, এসেছেনই যখন ভালয় ভালয় দর্শন করে আসুন। ফেরবার সময় কিন্তু দু-চারদিন এখানে থাকতেই হবে, এখন যাত্রার মুখে আটকাব না। আনন্দ নিয়ে ফিরুন, একসঙ্গে ক'দিন কাটিয়ে আমরাও আনন্দ পাব।''

॥ ৫ ॥

তিনসুকিয়া থেকে সৈখোয়াঘাট মাত্র তেরো মাইল। চওড়া পাকা সড়ক। গৌরীশঙ্করজীর দামী বড় মোটর গাড়িও। সকাল আটটায় রওনা হই। তবুও, গৃহকর্ত্রী সাদরে পেট ভরে খাইয়ে দেন। বলেন, কোথায় কখন আবার খেতে পাবেন, ঠিক কি?

তখনও আকাশভরা মেঘ। রাজপথে রাজশকট ছুটে চলে। আরামে গদিতে বসে থাকি। গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে বাতাস এসে চোখে-মুখে লাগে। দেহ-মন খুশীতে ভরে ওঠে। ভাবি সেই দুরূহ পরশুরাম-যাত্রার এখন কি এই পরিণতি? আধঘণ্টাও লাগে না সৈখোয়াঘাট পৌঁছে যাই। অনেকগুলি ঘরবাড়ি, দোকানপাট। শুনি, ক'বছর আগে ব্রহ্মপুত্রের প্রবল বন্যার প্রকোপে পুরনো শহর এখন নদীগর্ভে। নতুন শহর গড়ে ওঠে। অপর পারে সদিয়ারও সেই একই অবস্থা।

বাঁধের নীচে এসে মোটর থামে। পাকা সড়ক শেষ হয়। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও নামে। ভাবি, তা হোক। পৌঁছে তো গেলাম। ঐ বাঁধটুকু পার হলেই 'ফেরি'তে আশ্রয়।

কিন্তু, তখনই জানতে পারি, সুখের এ আশা অলীক স্বপ্ন। বাঁধ থেকে নেমে ব্রহ্মপুত্রের বিশাল চর। তিন মাইল পেরিয়ে তবে ফেরিঘাট। ক'দিনের বর্ষায় সুদীর্ঘ বালুচর এখন জলকাদায় দুর্গম। ভাল মোটরে ওদিকে যাওয়া অসম্ভব। লরি ও জীপ-ট্যাক্সি যারা সাহস করে নিয়ে যায়, কাদায় আটকে বিপদেও পড়ে। তবে দু-একটা ঘাটে পৌঁছয় না যে এমনও নয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে সন্ধান করি। বহু খোঁজাখুঁজির পর যাত্রী-ভরা একটা জীপ-ট্যাক্সি পাওয়া যায়। কোন রকমে তাতেই ধরে-ঝুলে চাপতেই হয়। সাধারণ ভাড়া, শুনি, বারো আনা। আমাদের মাথা পিছু নেয় পাঁচ টাকা!

একের উপায়হীন দুর্ভাগ্য অপরের সৌভাগ্য যোগায়। ন্যায়-অন্যায় বিচারের অবকাশ থাকে না। চরের ঐ দুস্তর দূরত্ব,—মালপত্র নিয়ে হেঁটে যাওয়া, সময়মত 'ফেরি' ধরা—সম্ভব নয়। আজকের দিন নষ্ট তো হবেই, ওপারের তেজুর জীপও ফিরে যাবে।

ঝুলতে ঝুলতে জীপে যেতে দেখি আর ভাবি, পথের যা ভয়াবহ দুর্গতি,—তিন মাইল পথ—পাঁচ

টাকাই বা এমন বেশি কি? জলকাদার এমনি গভীরতা, কয়েকটা লরি, জীপ আটকে কাত হয়ে পড়ে আছে, মাঝে একটা খালের স্রোতও গাড়িসমেত পার হতে হয় 'ফ্ল্যাট ফেরি'র সাহায্যে।

ঘাটে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। আপাতত বৃষ্টি থামে। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে দেখি, নদীর বিশাল বিস্তৃতি। অপর পার যেন দেখাই যায় না। ঘন মেঘ-ভরা কালো আকাশ সুদূর দিক্‌চক্রবালে যেন নদীর গৈরিক জলে মিশতে চায়। দূর-দূরান্তের অসীম উন্মুক্ততা মনেও বিপুল প্রসারতা আনে।

প্রকাণ্ড ফেরি-স্টীমার। এখনই ছাড়বে। যন্ত্র-দানব হুঙ্কার ছাড়ে। টিকিট কেটে তাড়াতাড়ি 'ডেকে' উঠি। যাত্রীতে ভরা। তবু, সামনে উঠেই খালি জায়গা পাই। হাত-পা ছড়িয়ে আরামে বসি। তাকিয়ে দেখি, অল্প পিছনেই যাত্রীর ঠেসাঠেসি ভিড়। সঙ্গী হেসে বলেন, আসবেন—আগে খবর দিয়েছিলেন বুঝি জায়গা রাখতে?

স্টীমার ছাড়ে। জল কেটে সশব্দে এগিয়ে চলে। নদীর স্রোতের প্রতিকূলে চলা। সহসা প্রবল বেগে বৃষ্টি নামে। তেমনি ঝড়ের মত প্রচণ্ড বাতাসও ওঠে। এতক্ষণে বোঝা যায়, ডেকের এই অংশ কেন যাত্রীশূন্য। ক্ষণিক আগের সুবিধা এবার অসুবিধাই আনে। জলের ঝাপটায় চোখের পলকে সারা দেহ ভিজিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে হুল ফোটায়। কাঁপতে কাঁপতে কোনমতে ব্যাগ খুলি। গরম পুলওভার বার করি। 'পলিথিন সীট' দিয়ে জলের হাত থেকে বিছানাপত্র বাঁচাবার চেষ্টা করি। মনে উৎসাহ জাগে, এতক্ষণে দুর্গম তীর্থের সামান্য রোমাঞ্চ-স্পর্শ পেলাম। অল্প পরেই আবার বৃষ্টি থামে। রোদও ওঠে। গায়ের ভিজে জামাকাপড়ও শুকায়।

চারিদিকে কেবলই জল। মাঝে মাঝে বিশাল চর। শুনি, পাঁচটা নদী এখানে মেশে। এখন চলি ব্রহ্মপুত্রের উজান বেয়ে। সওয়া ঘণ্টা যাওয়ার পর আর এক নদীর মুখে প্রবেশ করি। অল্প এগিয়ে সদিয়া। ব্রহ্মপুত্রের সেই পারে নেফা।

॥ ৬ ॥

সদিয়ার ঘাটে স্টীমার লাগে। এপারে হাঁটাহাঁটি নেই। পাড়ে উঠেই সামনেই দেখি আমাদের জীপ। মালপত্র সহজেই মোটরে তোলা হয়। অন্য কোন জীপ বা বাস দেখি না ওখানে। শুনি, এখান থেকে মাইলখানেক গেলে নতুন-গড়া শহরের মধ্যে পাকা সড়ক। সেইখানে যাত্রীরা বাস পেতে পারে।

ঘাটে জনতার মধ্যে থেকে এক যুবক এগিয়ে আসেন। প্যান্ট, বুশ শার্ট পরা। মাথায় হ্যাট। সপ্রতিভ ভাবে প্রশ্ন করেন, আপনাকে আগে দেখেছি মনে হচ্ছে।

কোথায় দেখেছেন? এখানে তো নয়ই। এদিকে এই আমার প্রথম আসা। আপনি কি করেন এখানে?

পি. ডবলিউ. ডি.-তে কাজ। এখানে আছি বছর চারেক। কিন্তু আপনাকে আগে দেখেছি নিশ্চয়। কলকাতায় কি?

বলি, তাও সম্ভব নয়। ক্বচিৎ কখনও যাই সেখানে, গেলেও বাড়ির বাইরে যাই না।

দাঁড়ান, দাঁড়ান—এবার চিনেছি ঠিক—বলেই হেঁট হয়ে প্রণাম করে। চোখ কুঁচকে হাসিভরা মুখে বলে, মধুপুরে দেখা,—সেই গিয়েছিলাম ট্রেনিং ক্যাম্প করতে!

আশ্চর্য হই। সোৎসাহে বলি, বাঃ! ঠিক ধরেছ। সে তো আট বছর আগেকার কথা। একদিন রোদে মাঠে জরিপের কাজ শিখছিলে, ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকলে জল চেয়ে। তোমাদের ক্যাম্প ছিল পানিখোলায়,—মজুমদার নিবাসে। ধরেও নিয়ে গিয়েছিলে একদিন তোমাদের 'ক্যাম্প-ফায়ারে'। কিন্তু, কতটুকুর জন্যেই বা দেখা। খুব চিনেছ তো আজ এইখানে—আট বছর পরে।

আপনারা চলেছেন এদিকে কোথায়?

পরশুরাম কুণ্ড শুনে বলে, আমার কিন্তু এই চার বছরেও দেখা হয়নি। এদিকে কাজে ঘুরি, কত দিকে,—গেলেই হয়, তবুও যাওয়া হয় না।

বলি, এমনই হয়। হাতের নাগালে থাকলে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

বেশিক্ষণ কথা হয় না। তবুও, হঠাৎ এভাবে দেখা হওয়ায় আনন্দ পাই। জীপ ছাড়ে। ছেলেটি দাঁড়িয়ে থাকে। হাত নাড়ে। মনে মনে ভাবি, কবে কোথায় ক্ষণিকের পরিচয়! আবার এখানে এমন ভাবে হঠাৎ দেখা হয় কেন? শুনি, জগতে নাকি কোন কিছুই অকারণে ঘটে না। এরও কি কোন নিগূঢ় কার্যকারণ

সম্বন্ধ আছে?

এ প্রশ্নের সার্থক উত্তর পাই ক'দিন পরে ফেরবার পথে। স্টীমার থেকে সেদিন ওপারে সৈখোয়াঘাটে নেমেছি। মনে তখন দারুণ দুশ্চিন্তা—ঘাট থেকে সেই কাদাভরা তিন মাইল চর। মালপত্র নিয়ে পার হই কি করে? দূরে দাঁড়িয়ে একটিমাত্র জীপ। কয়েকজন যাত্রী ছুটে গিয়ে দখল করে। আমাদেরও আশাভরসা কাদায় ডোবে। যাবার কোন উপায় দেখি না। ঠিক এমনি সময়ে একটি যুবক এগিয়ে আসে। হাসিমুখে প্রশ্ন করে, খুব তাড়াতাড়ি যাত্রা শেষ করে ফিরলেন তো?

সেই একই রকম এরও বেশভূষা। কিন্তু, নাঃ—এ তো সে নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিত। জিজ্ঞাসা করি, আমাকে চেন নাকি তুমি? কোথায় দেখা হয়েছিল?

সে হেসে বলে, দেখা আগে কখনও হয়নি। আজই এই প্রথম হল। তবে, চেনা? চিনতে কোনই অসুবিধে হয়নি। দেখেই চিনেছি। বন্ধুর কাছে সব শুনেছি তো। যাবার পথে আপনাদের সঙ্গে হঠাৎ তার কেমন দেখা। সে এখন 'ট্যুরে', আমি ফিরছি এই সৈখোয়ায়—দশ দিন পরে। কিন্তু, দাঁড়ান—এই তিন মাইল বিশ্রী রাস্তা, যাবেন কিভাবে? এত মালপত্র নিয়ে?

বলি, সেই কথাই তো দাঁড়িয়ে ভাবছি।

তখনই হেসে বলে, কিছুই ভাবতে হবে না। চুপ করে একপাশে দাঁড়ান। মালগুলা শুধু দেখিয়ে দিন। দপ্তরের মালপত্র নিয়ে যেতে এসেছে ঐ আমাদের লরি—লোকজনও হাজির। ওরাই সব তুলে নেবে। আপনারাও চাপবেন ওইতে। অবশ্য একটু কষ্ট হবে লরিতে।

কষ্ট! হায় ভগবান! কোথা থেকে কিভাবে তুমিই সব যুগিয়ে দাও অবাক হয়ে ভাবি। এ কি তোমারই দূত?

আরামে চলে আসি সৈখোয়া শহরে। তার নাম বলে, আদ্যনাথ। তাকে জানাই, যাবার পথে তোমার বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ কেন দেখা—আজ তার হেতু বুঝলাম। কার্য-কারণের যথার্থ মর্ম বুঝি আমরা কতটুকুই বা?

॥ ৭ ॥

সদিয়ার ঘাট থেকে পাকা সদর রাস্তায় পৌঁছুতে খানিকটা মাঠ কাদা, গলিপথ পার হতে হয়। জীপ-এর কাছে এসব কিছুই নয়। তার পর আসে নতুন শহরের ঘরবাড়ি, দোকানপাট। ডাকবাংলোও। শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছু দূর আসার পর রাস্তার উপর গেট। নেফার চেক-পোস্ট। আমাদের জীপে সরকারী আরদালি। ছাড়া পেতে সময় লাগে না। জীপ ছুটে চলে। দু-পাশে ঢেউ খেলানো, পাহাড়ী জায়গা। মাঝে মাঝে গভীর জঙ্গল। বুনো কলাগাছ বাঁশঝাড় প্রচুর। আগে নাকি হাতি, বাঘ, হরিণ দেখা যেত প্রায়ই। আজকাল সভ্যতার যানবাহন চলে, বন কেটে বসতি বসে, বনের প্রাণীও দূর জঙ্গলে সরে যায়।

সরকারী বিবরণীতে লেখে, নেফার লোহিত জেলার আয়তন—২৩,৪৬২.৮ বর্গ কিলোমিটার। তার মধ্যে অরণ্যভূমি—১৪,৮৫৬.৫৮ বর্গ কিলোমিটার। মোট লোকসংখ্যা ৩৬,০৫০। অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে—১.৫৪ মাত্র। অধিবাসীদের মধ্যে উপজাতির সংখ্যা —২৭,৪৬৭। শুনি বছরে নাকি প্রায় পঞ্চাশটা বুনো হাতি এ-জেলাতে ধরা হয়। ভাবি, প্রকৃতির হাতে সাজানো প্রকৃতই এই হাতির বাসভূমি। তাই তো জঙ্গলে এত বাঁশ, কলাগাছ।

পথের পাশে পাহাড়ী ঝরনা। দু-একটা ওরই মধ্যে বড় নদী। দূরে হিমালয়ের গিরিশ্রেণী। আকাশের বুকে যেন তুলি দিয়ে গাঢ় নীলের তরঙ্গায়িত প্রলেপ। সেই পাহাড়-অঞ্চল থেকেই সারি সারি নদীর ধারা নামে। সবই অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের জলে গিয়ে মেশে। আগেকার দিনে এই ধরনের নদী যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করত। এখন আমরা চলি সবেগে নিশ্চিন্ত মনে মোটর চড়ে। প্রায় সব নদীর উপর পাকা সেতু। যেখানে নেই, নতুন তৈরি হয় দেখি।

কচিৎ কখনও দু-একটা গ্রাম। গ্রামের নিকটে চাষের জমি। নেফার অরণ্যই এ দেশের প্রধান সম্পদ।

১৯৩৪ সালে শুধু বনমহলের আয় হয়—১৮,১৬৪০০ টাকা, খরচা পড়ে—৫,৪০১৫৮ টাকা। উপজাতিদেরও বনের সঙ্গেই নিবিড় সম্পর্ক।

জীপ এগিয়ে চলে। নতুন দেশের রহস্যময় আবেদন। হঠাৎ মন ফিরে যায় সদিয়ার ঘাটে। আট বছর

আগে কোথায় মধুপুরে দেখা সেই ছেলেটি। কিভাবে আজ আবার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ। আট বছর! কতদিনের কথা! আশ্চর্য লাগে। কিন্তু তখন ভাবি, না, কালের অনন্ত সাগরে আটটা বছর জলবুদ্বুদের কণাও নয়। কত যুগযুগান্তের সুদূর অতীত নেফার এই অজানা পথের পাশেই ঐ গভীর অরণ্যে গুপ্ত হয়ে থাকে। পরে সেই সব কাহিনী শুনি।

ঐ সদিয়ারই নিকটে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে কুণ্ডিন বা কুণ্ডিল নদীর সঙ্গম। প্রবাদ, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক রাজার রাজধানী ছিল কুণ্ডিন নগরে—এই নদীর তীরে। নেফা হিমালয়ের পাদদেশে, এই লোহিত জেলায় এখনও নাকি সেই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। রুক্মিণীনগরও।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বহু লীলাকাহিনী আছে। রুক্মিণীহরণেরও আছে রোমাঞ্চকর বিবরণী। লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণী। অতএব, মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে বরণ করে। কিন্তু রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্ম বা রুক্মী কৃষ্ণবিদ্বেষী। ভগিনীর কৃষ্ণপ্রেম জানতে পেরে অবিলম্বে কৃষ্ণবৈরী চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করেন। রাজপুত্রীর বিবাহ। দিকে দিকে নিমন্ত্রণ যায়। বিরাট উৎসবাদিরও আয়োজন হয়। বিবাহের দিন এগিয়ে আসে। ভগ্নহৃদয় শোকাকুলা রুক্মিণী গোপনে প্রেমপত্র লিখে দূত পাঠান শ্রীকৃষ্ণের কাছে। কিভাবে তাঁর উদ্ধার সম্ভব তারও বিশদ পরামর্শ দেন সেই চিঠিতেই। বিবাহের আগের দিন কুলদেব যাত্রা। কুণ্ডিন নগরে বিরাট ধুম। ঐ যাত্রায় নববধূকে প্রাসাদের বাইরে অম্বিকার মন্দিরে যেতে হয়। তাঁর হরণের সেই সুবর্ণ সুযোগ। প্রিয়তমের চরণে আত্মসমর্পণ করে প্রার্থনা করেন শুভলগ্ন যেন বয়ে না যায়, শৃগাল যেন সিংহের বলি অপহরণ না করে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৫২শ অধ্যায়ে অপূর্ব মাধুর্যময় ও সকরুণ সেই প্রেমপত্র ও আত্মনিবেদন। সংবাদ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ রথে চড়ে এক রাত্রিতেই চলে আসেন সেই সুদূর দ্বারকা থেকে এই কুণ্ডিন নগরে। যথাসময়ে রুক্মিণিকেও হরণ করেন। বিপক্ষ দল বাধাও দেন, কৃষ্ণ বলরাম আদির যুদ্ধও করতে হয়। সেই যুদ্ধেই শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রধান অংশগ্রহণ করেন রুক্মিণী-ভ্রাতা রুক্মী। প্রিয়তমা রুক্মিণীর কাতর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীর প্রাণনাশ করেন না; কিন্তু, শ্যালকের মস্তক মুণ্ডন করে ছেড়ে দেন। রুক্মিণী কৃষ্ণের প্রধানা মহিষী হন।

ভাগবতের এই কাহিনীর অন্তরালে লীলা-মাহাত্ম্য যেখানেই থাকুক, এর ঘটনাবলী ও বর্ণনাভঙ্গি এমনই জীবন্ত যে তারই অবলম্বনে আধুনিক কালেও সার্থক উপন্যাস রচনা চলে। চরিত্র-চিত্রগুলিরও এমনই চিরন্তন রূপ।

এসব কাহিনীর হয়ত কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। শুধু কবিকল্পনা। তবুও, সেই অতীত কাহিনীরই অঞ্জন মেখে ওখানকার একশ্রেণীর উপজাতি নিজেদের এখনও দেখে—সেই রুক্মীরই বংশধর বলে। যেখানে কুণ্ডিন নগর বা ভীষ্মকনগর ছিল বলে প্রসিদ্ধি, তারই নিকটে একশ্রেণীর মিশ্‌মি উপজাতির বসবাস। এদের নাম 'চলিকটা' বা 'ইদু' মিশ্‌মি। নেফার অন্যত্র যে দিজু বা দিগারু শ্রেণীর মিশ্‌মিদের দেখা যায়, তাদের থেকে এরা ভাষায়, আচার-ব্যবহারে, প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র। বিশেষত তারা সকলেই দীর্ঘ কেশ রাখে, শুধু চলিকটা মিশ্‌মিরাই চুল কেটে ফেলে। এদের ছিন্নকেশ কি সেই অতীতকালে পিতৃপুরুষের লাঞ্ছনারই চিহ্ন? 'ইদু'ও কি হিন্দুরই অপভ্রংশ? ভীষ্মক রাজার নাম থেকে 'ভীষ্‌মি' হয়ে মিশ্‌মি শব্দের উৎপত্তিও বিচিত্র কি! আরও আশ্চর্য বোধ হয়,—কোথায় দ্বারকা, আর কোন্ সুদূরে এই কুণ্ডিন। শ্রীকৃষ্ণ এলেন কি এক রাতে আকাশ-পথে বিমানযোগে? সেকালেও যাত্রা কি আজকের মত সুগম ছিল?

থাক বা না থাক, মহাভারতের যুগে ভারত প্রকৃতই মহান ছিল।

॥ ৮ ॥

সদিয়া থেকে প্রায় মাইল চল্লিশ দূরে তেজু। দেড় ঘণ্টায় পৌঁছে যাই। নেফার লোহিত জেলার সদর শহর। নদীর নামে জেলারও নামকরণ। পাহাড়ের ঢালু গায়ে নতুন উপনিবেশ। নীচের দিকে ঘরবাড়ি ক'বছর আগে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এখন পাহাড়ের উঁচু জায়গায় আবার বাড়িঘর নতুন তৈরি হয় দেখি। মনোরম পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। ছককাটা রাস্তা। সাজানো সারি সারি বাড়ি। বাড়ির সামনে বেড়া-ঘেরা ফুল-বাগিচা। দূরে হিমালয়ের গগন-চুম্বী প্রাচীর। নিকটে তেজু নদী। ডাক বাংলোটিও ছবির মত। সেইখানেই থাকবার ব্যবস্থা হয়।

ভারতের এই সুদূর প্রান্তেও অনেকগুলি বাঙালী। অন্তরঙ্গের মত নিজেরাই এসে আলাপ করেন। সাদরে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে চলেন। প্রবাসিনী গৃহলক্ষ্মীরা সযত্নে ভূরিভোজনের আয়োজন করে নিজেরা তৃপ্তি পান, আমাদেরও তৃপ্ত করেন। কেউ সরকারী দপ্তরে চাকরি করেন, অনেকে মিলিটারিতে, কেউ বা পি. ডবলিউ. ডি.-তে। দুজন বাঙালী ডাক্তারও আছেন। সকলের একই অনুযোগ, এলেনই যদি এতদূরে, কাল পরশুরাম দর্শন করে পরশুই চলে যাবেন? তা কি হয়? ক'দিন এখানে আটকে রাখবই। —পরম আত্মীয়ের মত দাবি জানান।

তখনই আবার দুঃখ করেন, নেফায় এলেন, অথচ নেফার তো কিছুই দেখা হল না। এখন থাকলেও হবে না—বর্ষা নেমে গেছে। দেখবার কত জায়গা ঐ সব হিমালয় পাহাড়ের মধ্যে। এই তো ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত। তাই মিলিটারির কড়া ব্যবস্থাও। এখান থেকে চীন ও বর্মা দুই-ই খুব নিকটে। পাহাড়ের মধ্যে আমাদের সব ঘাঁটিতে এখন জীপের রাস্তা হয়েছে। অবশ্য চারপাশেই পাহাড়ী নদী,— বর্ষায় কখন জলের ঢল নামে ঠিক নেই, নামলেই যাতায়াত বন্ধ। তার ওপর পাহাড়ের ধস নামা তো আছেই। এবার আসুন, শীতকালে—হায়লিং, ছাগলাগাম, ওয়ালং—কত জায়গায় ঘুরে আসতে পারবেন, —অবশ্য 'স্পেশাল পারমিট' নিয়ে। এখন কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। দেখবেন আজ রাত্রে বা কাল যদি আবার বৃষ্টি হয়—পরশুরাম কুণ্ডও যেতে পারবেন কিনা সন্দেহ। বর্ষায় এদিকের নদীর যা হিংস্র রূপ। না দেখলে কল্পনাই করা যায় না।

তাঁদের বলি, কাল পরশুরাম কুণ্ড দর্শন যাতে হয়, তারই ব্যবস্থা এযাত্রায় করে দিন। আবার আসব না হয় শীতকালে, তখন অন্যদিকে ঘোরা যাবে।

তাঁরা আশ্বাস দেন, বৃষ্টি আর না হলে কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু আবার জোর জল যদি নামে,— লোহিত পার করিয়ে দেয়, সাধ্য কার! আকাশে মেঘ কি রকম থমথম করছে, দেখছেন তো?

চিন্তিত মুখে এক অফিসার আসেন। সকলেই উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করেন, খবর পেলেন নাকি?

তিনি বলেন, হ্যাঁ, এইমাত্র লোক এল। খবর মোটেই সুবিধের নয়। লোহিতের ওপর সরকারী ফেরিবোটের এঞ্জিন খুলে তুলে রাখা হয়েছে,—এখন তো আর যাত্রী যাবার সময় নয়। নদীতেও জল বেড়েছে খুব। কাল তাই পার হবার একমাত্র ভরসা দেশী নৌকা, তাও কালকের অবস্থা দেখে বোঝা যাবে সে-নৌকাও চলবে কিনা।

সকলেই চিন্তিত হয়ে ওঠেন, অত দূর থেকে এলেন,—অথচ এমনি অসময়ে!

আমার কিন্তু ভয়-ভাবনা নেই। যা হবার হবে, যিনি সব কিছু করবার তিনিই যা করবার করবেন।

অফিসার খবর দেন, পাঁচদিন পরে গভর্নর আসছেন তেজুতে। আসাম থেকে হেলিকপ্টারে, এখানে 'এয়ার-স্ট্রিপ' হয়েছে কিনা। ঘণ্টাখানেক বোধ হয় লাগে আসতে।

ভাবি, শ্রীকৃষ্ণের তবে একরাত্রিতে দ্বারকা থেকে আসা, এমন কি কষ্ট-কল্পনা!

॥ ৯ ॥

তেজুতে নতুন শিবমন্দির স্থাপন হয়েছে। দেখতে যাই। সঙ্গে নিয়ে চলেন মহাবীর শর্মাজী,—'পরশুরাম কুণ্ড তীর্থ বিকাশ সমিতি'র উৎসাহী সুযোগ্য সম্পাদক। বড় মন্দির। প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গও। মনে হয় ফুটতিনেক উঁচু। মন্দিরটি সম্পূর্ণ নতুন। কিন্তু শিবলিঙ্গটি প্রাচীন। লোহিত জেলার উত্তর অঞ্চলে সেই ভীষ্মক নগরের ধ্বংসাবশেষের কথা সবিস্তারে শুনি। শর্মাজীর কাছে জানতে পারি, সেই প্রাচীন ভগ্নস্তূপের চার মাইল দক্ষিণে হুট্‌জু বা হাজু নদীর বাঁ তীরে সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন দেবীমন্দির আছে। তাম্রেশ্বরী দেবী। তান্ত্রিক তীর্থক্ষেত্র। কিছুকাল আগে পর্যন্ত নরবলির প্রথা ছিল। সেই দেবীমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় আধ মাইল দূরে ঐ হাজুনদীর বাঁ তীরে এক বিশাল কুড়ি ফুট উঁচু স্তূপ ১৯৬০ সালে গভর্নমেন্টের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কয়েকজন কর্মীর হঠাৎ নজরে পড়ে। সেইখানেই এই শিবলিঙ্গটি পাওয়া যায়। তেজুতে আনার ব্যবস্থাও হয়। স্তূপের খননকার্যও চলতে থাকে। বড় এক মন্দিরের ভগ্নাংশ প্রকাশ পায়। মাত্র চার মাস আগে—১৯৬৯ সালের ২০শে নভেম্বর—সেই লিঙ্গটি এখানে এই নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে নেফার ঐ উত্তর প্রদেশ খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে চুতিয়া রাজবংশের অধীনে থাকে। পরে ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মী অহোম-বংশীয়রা

সেই রাজ্য দখল করেন। মন্দিরের ভাঙা ইটগুলির রূপ ও আকার থেকে অনুমান করা হয়, শিবমন্দিরটি সেই অহোমদের আমলেই তৈরি।

অবলুপ্ত লিঙ্গ আবার সুন্দর মন্দিরে সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা পেলেন। নতুন নতুন ধর্মকেন্দ্রেরও স্থাপনা হল। আবার কতকালের জন্য?—তাই ভাবি।

॥ ১০ ॥

সুখশয্যায় রাত্রি কাটে। তেজু বোধ হয় হাজার ফুটও উঁচু নয়। তবু শীত বোধ হয়। শীতবোধের অন্য কারণও থাকে। সারারাতই থেকে থেকে বৃষ্টি নামে। কখনও জোরে, কখনও ধীরে। মনে হয়, এ যেন তরণী তীরের কাছে এনে দেবতার খেলা,—কূলে নামতে দিই, কি না দিই!

সকালেও আকাশে মেঘ। তবে বৃষ্টি নেই। সাড়ে আটটায় জীপে রওনা। স্থানীয় এক অফিসার,—সোম এবং মহাবীর শর্মাজী সঙ্গে চলেন। শর্মাজী বহুবার গেছেন। বলেন, আবার একবার তীর্থও হবে, ওখানেও এক নতুন মন্দির হচ্ছে, তার কাজও কতদূর হল দেখে আসব। তাছাড়া খেয়াঘাটে পারাপারের ব্যবস্থাটা কোনরকমে করতেই হবে,—এসেছেন কতদূর থেকে!

লোহিতের ধারে তিমাই ঘাট তেজু থেকে তেরো মাইল। জীপ চলে। রাস্তা ভালোই। শহর ছাড়িয়ে মাইল দুই তিন যাবার পরই বনজঙ্গল। পাহাড়ও কাছে আসে। পথের ধারে জঙ্গল কেটে ছোট বসতি। অদ্ভুত ধরনের লম্বা-গড়ন চালাঘর। জমি থেকে ছ'সাত ফুট উঁচু। সারি সারি কাঠের খুঁটির উপর প্রকাণ্ড লম্বা চালা। মাথায় ডাল পাতার ছাউনি। এক প্রান্তের ছাদের চাল ধনুকের মত বেঁকানো,—সেখানটায় দেখায় যেন ধুচুনি টুপি। ঐখানেই ঘরে ঢোকবার পথও। শুনি, দিগারু বা তারাঁও মিশ্‌মিদের আদর্শ গ্রাম। নাম, টায়েংকঙ্। পরশুরাম কুণ্ড থেকে ফেরবার পথে নেমে দেখে যাই। একটা সরু তক্তার গায়ে খোঁদল কেটে উপরে ওঠার সিঁড়ি। সুমুখে গোল ছাদটুকুর নীচে বারান্দা। তার পর লম্বা করিডর। তারই কোলে সারি সারি ছোট ছোট কুঠরি। চেরা বাঁশের দেওয়াল, মেঝেও। দরজা নেই। প্রায় খান বারো ঘর, পাশাপাশি। প্রত্যেকটিতে এক-একটি স্বতন্ত্র পরিবার থাকে। সামান্যই মালপত্র। ঘরগুলিও পরিচ্ছন্ন। লোকজন সে-সময়ে বিশেষ নেই, প্রায় সবাই কাজে গেছে। পাশেই আর একটা ছোট চালা। পাঠশালা বসে। মাস্টার মশাই দেখে বেরিয়ে আসেন। কথা বলতে গিয়ে আশ্চর্য হই,—বাঙালী। তিনিই ঘুরিয়ে দেখান। বলেন, এদের গ্রামে সাধারণত থাকার প্রথা,—ঐ ভাবে একই চালার তলায় পাশাপাশি ঘরে।

সকৌতুকে প্রশ্ন করি, মারপিট, ঝগড়াঝাঁটি হয় না?

হেসে বলেন, অতি ক্বচিৎ কখনও।—এখনও তো সুসভ্য হয়নি!

তিমাই ঘাটের রাস্তা ক্রমে নদীর ধারে নামে। সুমুখে কিছুদূরেই হিমালয়ের বিরাট গিরিশ্রেণী। তারই ভিতর দিয়ে পথ করে লোহিত নদ সমতলভূমিতে নেমে আসে। পথের বাঁ পাশেও ছোট পাহাড়। পাহাড় ও নদী-জলের মধ্যে ব্যবধান বেশি নয়। অল্পদূরে যাবার পরই দেখা যায়, বর্ষার প্রকোপে ও নদীর স্রোতে রাস্তা ভেঙেছে। তিমাই ঘাটও আর দূর নয়, আধ মাইলও হবে না। অদূরে পাহাড়ের গায়ে নদীর পাড়ে দু-তিনটে চালাঘর, ঐখানেই পারাপারের নৌকা অর্থাৎ পারঘাট। জীপ ছেড়ে নামি। নদীতীরে স্তূপাকার শিলারাশি। পাথর থেকে পাথরে পা ফেলে বাকি পথটুকু অতিক্রম করি। নটার পর পৌঁছে যাই। শর্মাজী ও সোম মাঝিদের সঙ্গে কথা বলেন।

মনে হয়, চার-পাঁচশ গজ চওড়া নদী। একটানা স্রোতের দুরন্ত গতি। হু হু শব্দে সজোরে জল অনবরত ছুটে নেমে চলে। পাথরে বাধা পেয়ে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দে ছিটকে ওঠে। পাড়ে এসে ঢেউ ভাঙে। নদীর বুকেও উন্মত্ত তরঙ্গ। বর্ষার জলের তোড় তো আছেই, তার উপর অদূরে বিরাট হিমালয়ের সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়ে ঝড়ের মত প্রচণ্ড বাতাসও হুঙ্কাররবে নেমে আসে। যেন পর্বতকারার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে উল্লসিত নদী ও বাতাস প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছুটে চলে।

সোম উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে এসে জানান, মাঝিদের সঙ্গে কথা হল। ভীষণ জলের টান। বাতাসও প্রচণ্ড। পার হওয়া এখন কোনমতেই সম্ভব নয়। দেখছেন তো ঐ ছোট্ট ডিঙি নৌকা! খড়কুটোর মত কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। মাঝিরা বলছে, বৃষ্টি আর না নামলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই স্রোতের বেগ কমে আসবে, বাতাসও হয়ত একটু শান্ত হবে। কিন্তু আকাশের অবস্থাও তো ভাল দেখছি না। পেছন ফিরে

তেজুর দিকে তাকিয়ে দেখুন। ঐ দুটো পাহাড়ের ফাঁকে—কী ভীষণ কালো মেঘ উঠছে! বিদ্যুৎও কেবলই চমকাচ্ছে, মেঘগর্জনও শোনা যাচ্ছে, আবার জোরে জল নামল বলে মনে হয়।

বলি, ওদিকে তাকাবেন না, নদীটা পার হবার অবস্থা হলেই পার করিয়ে দিন, তার পর পাহাড়ে ঝড়বৃষ্টি নামে, ক্ষতি নেই, ঠিক পৌঁছে যাবই। পাহাড়ই যে আমার ঘর।

শর্মাজীও এগিয়ে আসেন। গম্ভীর মুখে সেই একই বার্তা জানান, এখনই পার হওয়া অসম্ভব। একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক। জিজ্ঞাসা করি, কুণ্ডটা ঠিক কোন্ দিকে দেখান তো?

তিনি লোহিত নদের উপর-অংশ দেখান, যেখানে পাহাড়ের পাঁচিল ভেদ করে নদীর জল সমতলভূমিতে নামে। বলেন, সামনের ঐ বাঁ দিকের পাহাড়ের পিছন দিয়ে নদী আসছে, এখান থেকে বোঝাই যায় না। বাঁ দিক থেকে এসে ডাইনে ঐ পাহাড়টার পিছনে খানিক গিয়েই আবার ঘুরে এই সামনে চলে আসছে। ডাইনে ঐ যে পাহাড় তারই পিছনে ঐ বাঁকের মুখে আপনাদের পরশুরাম কুণ্ড। নদী পার হয়ে ঐ পাহাড়ে উঠে আবার অপর দিকে নদীর ধারে নামা,—এই তো সামনেই—নদীটা কোনমতে পার হলেই পৌঁছে যাব।

সোম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, তা তো যাব, কিন্তু নদীর যা অবস্থা! আজ কি পার হওয়া চলবে? বাতাসটাও কী প্রচণ্ড বেগে বইছে! এখানে দাঁড়ানোও যেন কষ্টকর। চলুন বরং ঐ চালাঘরটার মধ্যে গিয়ে বসা যাক।

তাই করাও হয়।

অপেক্ষায় সুফলও আনে। স্রোত ও বাতাস দুই-ই কমে। মাঝিরা এসে ডাক দেয়। সোম বলেন, আপনাদের ভাগ্য ভাল। তবে, ওদিকের তেজুর আকাশের মেঘ আরও ভীষণ হয়ে উঠছে। ফেরবার সময়ে পরশুরাম কুণ্ডের ওপারেই রাত কাটাতে না হয়।

শর্মাজী আশ্বাস দেন, তাতে অসুবিধে নেই, সমিতি থেকে এখন পাকা ধর্মশালা করে দেওয়া হয়েছে।

হেসে বলি, সোমের দুশ্চিন্তা সেদিক দিয়ে নয়। দরকার হয়, আমরা তাই কাটাব। সোম বরং যে-করে হয় ফিরে যাবেন নিজের বাড়িতে—সময়মত সেখানে খবর দেবেন আজ বিকেলে যে ফিরে গিয়ে ওঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ,—খাবার জিনিস নষ্ট না হয়!

বেলা দশটায় ঘাট ছাড়ি। মিনিট পাঁচ-সাত লাগে নদী পার হতে। দাঁড়ের চেয়ে স্রোতেই টেনে নিয়ে যায়। হালেই প্রকৃত কাজ দেয়।

ওপারে চরের উপর চালাঘর। ফেরবার পথে এখানে একদল মিশ্‌মি মেয়েপুরুষকে দেখি নদী পার হবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করে। সঙ্গে তিনটে হাতি। হাতিগুলি অবশ্য পারের যাত্রী নয়, দূর গ্রাম থেকে আসার বাহন মাত্র। এখন আমাদের কুণ্ডে যাবার সময়েও অপর পার থেকে আর এক মিশ্‌মি সহযাত্রী নৌকায় আসে। এপারে মাইল তিন দূরে পাহাড়ের উপর বনের মধ্যে তার গ্রাম। ধর্মশালা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে চলে। বিচিত্র তার বেশভূষা। ফরসা রঙ। সবল সুন্দর স্বাস্থ্য। গলায় হার, কানে মাকড়ি। কোমর থেকে পা পর্যন্ত উলঙ্গ, শুধু পরনে একটা লেঙটি। অথচ, খালি গায়ে হাতকাটা বুকখোলা 'ওয়েস্ট-কোটে'র মত ছোট রঙিন জামা। কোমরের কাছে লম্বা তলোয়ার ঝোলে, সাজ-সজ্জারই যেন অংশ। মুখ হাসিখুশি; যেন নির্মল আকাশে প্রভাতের আলো!

শর্মাজী বলেন, এই সব মিশ্‌মিরাই হল পরশুরাম তীর্থ-যাত্রার একটা অঙ্গ। যাত্রীদের সঙ্গে থাকে, সাহায্য করে, যে যা দান করে খুশীমনে নেয়। এখানকার প্রবাদ জানেন তো? পরশুরাম এই তীর্থক্ষেত্রে জনকতক ব্রাহ্মণাদি বসিয়ে যান। তারা ক্রমে পাহাড়ী আদিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে, বর্ণসঙ্করও ঘটে। কারও কারও মতে এইসব এখানকার 'দিগারু'রা আগে ছিল 'দ্বিজবর' আর দিজু মিশমি'রা ছিল 'দ্বিজমিশ্র'।

শুনতে মন্দ লাগে না।

নৌকা থেকে নেমে চর পেরিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে সোজা পথ। পাশেই পাহাড়। অল্প দূরে নদী। কোথাও লোকজন, সাড়াশব্দ নেই। পশুপক্ষীরও নয়। ধীরে ধীরে পথ পাহাড়ে ওঠে। মনে হয় পাঁচ-সাতশ' ফুটের বেশি নয়। পাহাড়ের গায়ে খানিকটা সমতলভূমি। এগারোটার পরেই পৌঁছুই। ঘাট থেকে মাইল দুইও হবে না। কতকগুলি ভেঙে-পড়া চালাঘর। যাত্রার সময়ে ব্যবহার হয়েছিল বোঝা যায়। অল্প

উপরে প্রকাণ্ড পাকা ধর্মশালা। ঘরের ভিতর সারি সারি চৌকি পাতা। বড় জানালা। রাত্রিবাসের অসুবিধা নেই। ধর্মশালার এক অংশে ছোট একটা ঘরে এক সাধু থাকেন। মন্দিরের মত বিগ্রহাদি রাখেন। শুনি, আগে প্রাচীন এক সাধু পরশুরাম কুণ্ডে থাকতেন, কয়েক বছর হল দেহরক্ষা করেছেন। একজন বেহার-বাসী ব্রাহ্মণ পূজারীকেও দেখি। কিছুদূরের এক গ্রাম থেকে আসেন। যাত্রী যাতায়াত বন্ধ হলে তাঁর আসাও বন্ধ হয়।

ধর্মশালায় অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে কুণ্ড অভিমুখে যাত্রা করি। সোম তাগাদা দেন, বেলা সাড়ে এগারোটা বাজেনি, কি রকম অন্ধকার করে এল! মুষলধারে বৃষ্টি নামল বলে! তাড়াতাড়ি কুণ্ডে ঘুরে আসাই ভাল। এখনও খানিকটা চড়াই বাকি। তারপর খাড়া উৎরাই। কুণ্ড থেকে ফেরবার পথে চড়াই বেশি। বনের মধ্যে পাহাড়ী পথ, তার ওপর পাথর, জলে পিছল হয় খুব। সাবধানে চলবেন যেন।

॥ ১১ ॥

ধর্মশালা ছেড়ে এসেই অল্প চড়াই। ফার্লঙ খানেক এগিয়ে ডান দিকে খোলা মাঠ। সেইখানে নতুন মন্দির তৈরি হয় দেখি। প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এল। শর্মাজী জানান, এখানে পরশুরামের মূর্তি বসবে। শিবস্থাপনাও হবে। নিয়মিত পূজার ব্যবস্থাও থাকবে। জয়পুর থেকে মূর্তি আসছে।

ভাবি, কোন্ পূজারী ভার নেবে এই নিত্যসেবার? বিজন বনে এসে থাকতে যাবে কে? কেনই বা? সাধু-সন্ন্যাসী হয়, সে আর এক কথা। ভালই তো ছিল, মন্দিরহীন তীর্থ, মূর্তিহীন পূজা! ধ্যান-গম্ভীর পর্বত, নিবিড় বন, নিঃসীম স্তব্ধতা, জনমানবহীন নিঃশব্দতা, প্রকৃতির অপার শান্তি,—তীর্থভূমির সেই তো প্রকৃষ্ট পরিবেশ।

আবার অরণ্য-পথ। ধীরে ধীরে চড়াই। পাহাড়ের গা কেটে সরু পথ। বাঁ দিকে বহু নীচে লোহিতের উপত্যকা। দুর্গম হিমালয় পথের মধুর স্মৃতি মনে ভাসে। সানন্দে এগিয়ে চলি। পরিচিত গানের সুর যেন প্রাণে শুনি। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে। অতি সামান্যই। ছাতা খোলারও প্রয়োজন হয় না।

আধ মাইলটাক যাবার পর উৎরাই শুরু। ঘুরে ঘুরে পথ নামে পাহাড়ের গা বেয়ে। এঁকেবেঁকে। যেন, শ্লেটের উপর খড়ি বুলিয়ে অবোধ শিশুর হাতে আঁকা হিজিবিজি রেখা।

হুড়মুড় করে নেমেই চলি। এতদিনে সত্যই এসে গেলাম সেই পরশুরাম কুণ্ডে। ঐ তো গাছের ফাঁকে লোহিতের স্রোতরেখা ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। উপর থেকে দেখা সেই দূরের নদী কত কাছে আসে। ধর্মশালা থেকে কুণ্ড মাইলখানেক দূর। বেলা বারোটায় পৌঁছে যাই। অমনি দেখি হঠাৎ আকাশের মেঘ চিরে ক্ষণিকের তরে রোদ ফোটে। নদীজল, বনভূমি আলোকে ঝলমল করে। মনে হয়, কে যেন হেসে চকিতে লুকায়। কিন্তু কই? কুণ্ড কোথায়? নদীর তীরে বড় কালো পাথরের স্তূপ। হয়ত পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া, অথবা নদীর স্রোতে বয়ে আসা। নদীর প্রবল প্রবাহ। ডান দিক থেকে আসে। তীরে সশব্দে আঘাত করে। আবার কলকল নিনাদে উদ্দাম বেগে বাঁ দিকে ঘুরে বয়ে যায়। নদীর বুকে, পাড় থেকে হাত চল্লিশ দূরে একটা দ্বীপ। মাটি, কাঁকর, পাথরের স্তূপে গড়া দোতলা উঁচু টিলার মত। দু-একটা গাছও আছে। দ্বীপের অপর দিকে লোহিতের প্রধান স্রোতঃপথ। কিন্তু, কুণ্ড? কুণ্ড কই?

পাথরের গা বেয়ে জলের কিনারায় নামি। এতক্ষণে পূজারী দেখান, তীরের কাছে নদীর বুকে পাঁচ-ছ হাত মাত্র পরিধি গোল গামলার মত ছোট একটা গর্ত। নদীর স্রোত তারই উপর দিয়ে বয়ে যায়। ঐ শুনি, এখনকার পরশুরাম কুণ্ডের অবশিষ্ট চিহ্ন। পাড়ের উপর পাথরের গায়ে দুটো ফোকর, তারই ভিতর থেকে অল্প জলের ধারা বার হয়, নদীর জলে এসে মেশে। শর্মাজী বলেন, ঐখান থেকেই অদৃশ্য ব্রহ্মকুণ্ডের ধারা নামছে ঐ কুণ্ডে, পরশুরাম কুঠারাঘাত করে ঐ ধারা আনেন। প্রকৃত ব্রহ্মকুণ্ড কোথায়, তা কেউ জানে না। ভুল করে এই পরশুরাম কুণ্ডকেই ব্রহ্মকুণ্ড বলে থাকে, ম্যাপেও সেইমত নাম দেয়, কিন্তু আগেকার সেই প্রসিদ্ধ পরশুরাম কুণ্ডও এখন আর নেই। যে ছোট কুণ্ড জলের ভেতর দেখছেন, বর্ষা নেমেছে, নদীর জল বেড়েছে, তাই ডুবে আছে,—জল কমে গেলে তবু কুণ্ড বলে মনে হয়, কিন্তু আদত কুণ্ডের ওটা সামান্য একটা চিহ্নমাত্র। কুড়ি বছর আগে এলে সে কুণ্ড দেখতে পেতেন। আমরাও দেখেছি। ১৯৫০ সালে এদিকে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়,—সে সময়ে কাগজে পড়েছিলেন নিশ্চয়। তারই ফলে লোহিতে ভয়ঙ্কর বন্যা নামে, চারিদিকে পাহাড় ধসে, নদীর পাড় ভাঙে, গতিপথও বদলে যায়।

ঐ যে নদীর মধ্যে দ্বীপ দেখছেন, আগে কোন দ্বীপই ওখানে ছিল না। এখান থেকে নদীর পাড় ঘুরে পৌঁছত ওরই কাছাকাছি, আর এখানে মধ্যিখানে ছিল কুণ্ড— আরও অনেক বড়। ত্রিশ-চল্লিশ হাত তার ব্যাস হবে। ব্রহ্মকুণ্ডের জলের ঐ দু'ধারাও সে-সময়ে পাহাড়ের ফোকর থেকে বার হয়ে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত গিয়ে ত্রিধারায় কুণ্ডের মধ্যে লাফিয়ে পড়ত তিন চার হাত উঁচু থেকে। কুণ্ডের দুদিকের অংশের সঙ্গে নদীর যোগাযোগ থাকায় দেখাত, নদী এক কোণ থেকে কুণ্ডে ঢুকে আর এক পাশ দিয়ে বার হয়ে যেত। এখন সেসব বোঝবারই উপায় নেই। পাহাড় ধসে অত বড় দ্বীপ জেগেছে, নদীর পথ ঘুরেছে, নদী ও কুণ্ড সব একাকার হয়েছে। ব্রহ্মকুণ্ডের ধারা-দুটিও ছোট হয়ে লোপ পেতে বসেছে।

শুনে বলি, এখন বুঝতে পারছি, পদ্মনাভ বিদ্যাবিনোদ মশায়ের বইয়ে আঁকা সেই নক্‌শা ও বর্ণনার সঙ্গে কেন কোন মিলই পাচ্ছি না। তিনি এসেছিলেন তো সেই ষাট বছর আগে। তখন যাত্রাপথও ছিল ব্রহ্মপুত্রের অপর পার দিয়ে চৌখাম হয়ে,—নৌকা করে, হেঁটে,—অনেক রকম কষ্ট স্বীকার করে আসা।

শর্মাজী বলেন, সেকালে কুণ্ডে পৌঁছুতে হত পাহাড় ডিঙিয়ে,—আজ যেমন এলাম এমন ভাবে নয়। নদীর তীর ধরে যাত্রীরা আসত, নদীর চরের কুণ্ডের ধারে রাত কাটাত। এখন থাকবার ব্যবস্থা কেমন করা হয়েছে বলুন, পাহাড়ের ওপরে ঐ ধর্মশালায়! এ-জায়গাটা মাত্র হাজার ফুট উঁচু, কিন্তু তিনদিকেই পাহাড়, নদীর ধার, বাতাসের জোর, আবার পৌষ-সংক্রান্তিতে মেলা, প্রচণ্ড শীত বোধ হয় এইখানটায়। ওপরে ধর্মশালার পাকা ঘরে যাত্রীরা থাকতে পারবে এখন আরামে।

হেসে বলি, তা ঠিকই। কিন্তু এদিকে কুণ্ডটাই যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল!

মনে মনে ভাবি, তাই-ই বোধ হয় ভাল। পরশুরামের দর্পচূর্ণ করেন শ্রীরামচন্দ্র। তাঁর মাতৃহত্যার কলঙ্কময় কাহিনীর এই স্মৃতিচিহ্নও এখন লুপ্ত করেন শক্তিরূপিণী ধরিত্রীর সংহারিণী মূর্তি।

দর্শনান্তে ফিরে চলি। আবার দু ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে। সজল স্নিগ্ধ পরশ দেহমনে তৃপ্তি আনে। হঠাৎ মনে আসে, দেব-দেবীর পূজাশেষে আম্রপল্লবে সেই শান্তিজলের সিঞ্চন,—সুর করে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ, আমাদের মাথা পেতে নেওয়া সেই বারিবিন্দুর অপূর্ব স্পর্শানুভূতি। আজও মনে আনে সেই আনন্দ।

* * * *

নিরাপদে তেজুতে ফিরে আসি নির্ধারিত সময়ে। স্থানীয় পরিচিত অনেকেই ব্যগ্র হয়ে খবর নিতে আসেন। উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করেন, যেতে পেরেছিলেন পরশুরাম কুণ্ডে? আপনাদের রওনা হওয়ার ঘণ্টা দুই পরেই এখানে যা দুর্যোগ,—প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি, শিলাপাত, অনবরত বাজ পড়া! শিলা পড়ে চারদিক একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল,—তারপর নামল মুষলধারে বৃষ্টি। এমন ঝড়বৃষ্টি, শিল—বহু বছর এদিকে দেখা যায়নি। সবাই আমরা ভেবেই অস্থির, আপনাদের না-জানি কী দুর্ভোগই হচ্ছে! এ ঝড়-জলে নদী পারাপার তো দূরের কথা,—কোন বিপদ-আপদ না ঘটলেই হয়। উঃ! আমাদের যেভাবে দুশ্চিন্তায় কেটেছে সারাদিন!

সোম আমার দিকে তাকান। হেসে বলেন, এই দিকের আকাশে সেই যে দেখেছিলাম ঘনঘটা কালো মেঘ, বিদ্যুৎ-চমক, সে-সবই তাহলে তেজুর ওপরেই দুর্যোগ নামিয়েছে?—তারপর তাঁর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমাদের ওখানে চমৎকার 'ওয়েদার'—মেঘলা দিনের ছায়া, অতি সামান্য দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি,—আর, কুণ্ডের ধারে সেই পৌঁছানো, অমনি এক ঝিলিক রোদই দেখা দিল। অতি আরামে আনন্দের যাত্রা হয়েছে।

সবাই শুনে অবাক!

আমার মনের গোপন পুরে কি জানি কার স্মরণ জাগে, গভীর কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরে।

পৃথিবীর পর্বতরাজির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিমালয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করানোর সময়ও শ্রেষ্ঠত্বের উপমান দিয়েছেন, "স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ"। ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক মতে হিমালয় গিরিশ্রেণী প্রায় দেড় হাজার মাইল বিস্তীর্ণ। মহাকবি কালিদাস সেই দেবতাত্মা নগাধিরাজের বিস্তারের বর্ণনা দেন,—পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।—পূর্ব ও পশ্চিম সাগরে অবগাহন করে পৃথিবীর মানদণ্ডের ন্যায় তার প্রসার।

সেই হিমালয়েরই প্রায় এক তৃতীয়াংশ নেপালরাজ্য। প্রায় পাঁচশত মাইল দীর্ঘ। এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং তাদের দুই শাখা-গিরি ছাড়াও নেপালে ছয়টি ছাব্বিশ হাজার ফুটেরও উপর সু-উচ্চ শৈলশৃঙ্গের অবস্থান। চোদ্দটি পঁচিশ হাজারেরও উপর এবং কুড়ি হাজারের উর্ধ্বে—বহুসংখ্যক। ঐ সকল শিখরাবলীর মধ্যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পঞ্চম শিখর ধবলগিরি—২৬,৮১০ ফুট উঁচু। সপ্তম শৃঙ্গ-অন্নপূর্ণা—২৬,৫০৪ ফুট। উভয়ের অবস্থিতির ব্যবধান মাত্র বাইশ মাইল। সেই সঙ্কীর্ণ অন্তরাল পথ বেয়ে ধেয়ে নেমে আসেন ক্ষুরধারা গিরিনদী কালীগণ্ডকী। নদীর দুই তটে আকাশস্পর্শী ঐ দুই শৈলশিখর। নদীবক্ষ থেকে প্রায় ১৮,৫০০ ফুট উঁচুতে তাদের শিরোদেশ। পৃথিবীর আর কোথাও,—এমন কি, হিমালয়ের অপর কোন অঞ্চলেও, এমন সুবিশাল দুই পর্বতের অন্তর্বর্তী অপ্রশস্ত পথে কোন নদী নেমে আসে বলে জানা নেই। তুষারকিরীট ধবলগিরি,—যেন স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁরই অঙ্গলীনা শুভ্রবসনা দেবী ভগবতী অন্নপূর্ণা। আর, কালীগণ্ডকী—যেন জনক-জনকী কোলে উচ্ছল চঞ্চল ক্রীড়ারতা দেবশিশুকন্যা।

জগতে অতুলনীয় হিমালয়ের এই অঞ্চলের পরম রমণীয় পরিবেশ।

সেই ভূস্বর্গেরই মধ্য দিয়ে মুক্তিনাথ তীর্থের যাত্রাপথ।

কিন্তু, এই প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্য ও অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সম্ভার ছাড়াও অপর আর এক কারণেও মুক্তিনাথ অঞ্চলের প্রসিদ্ধি আছে।

হিন্দুদের অধিকাংশ ধর্মানুষ্ঠানেই শালগ্রাম শিলার প্রয়োজন। সেই শালগ্রাম শিলার সন্ধান ভারতে একটিমাত্র স্থানে পাওয়া যায়, নর্মদা নদীর দু'এক অংশে, সামান্য কিছু। আর বেশি দেখা যায়,—নেপালের ঐ কালীগণ্ডকী নদীর গর্ভে বা উপকূলে। বিশেষত সেই নদীরই উৎসমুখের নিকটে,—মুক্তিনাথে ও মুক্তিনাথ ছাড়িয়ে হিমালয়ের আরও উপরে তিব্বত সীমান্তে দামোদরকুণ্ডে। এই কারণেই, কালীগণ্ডকীর আর এক নাম—শালগ্রামী বা নারায়ণী। নেপাল হিমালয়ের ঐ প্রদেশের পরিচয়ও শালগ্রাম পর্বত নামে। সেই পুণ্যভূমিতে জন্মের ফলে, সেখানকার নদনদী পর্বত বৃক্ষলতা সবই পবিত্র ও পূজ্য।

সারা ভারতের বহু হিন্দু গৃহস্থগৃহে এই শালগ্রামশিলার নিত্যপূজার বিধি,—তিনিই হয়ত কুলদেবতা। আবার সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীর কুটিয়াতেও এঁর অধিষ্ঠান। এক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী জটার মধ্যে নিত্য শিলাধারণ করেন, অথবা বুকে ঝুলিয়ে রাখেন। আশ্চর্য লাগে ভাবতে, কী কারণে এই শিলার এমনভাবে বহুল প্রচার ও বিপুল প্রভাব লাভ হয়। কেই বা কোন্ যুগে শুরু করেন? কেনই বা এই শিলাখণ্ড পবিত্রতার প্রতীক স্বরূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মার শিলীভূত রূপ বলে স্বীকৃতি পায়? নিরাকারের কী কারণেই বা এই আকার প্রাপ্তি? কালীগণ্ডকী নদীবক্ষেই বা ইঁহার অবস্থান কেন?

সেই রহস্যময় পুণ্যক্ষেত্রের ও অপার সৌন্দর্যময় মুক্তিনাথ তীর্থপথেরই এই কাহিনী।

সস্ত্রীক ডাক্তার বিশ্বাস। মণি ও ভক্তি সঙ্গে থাকলে পথের কোন ব্যবস্থাদির জন্য আমার দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না।

রেলপথে এসে পৌঁছুই গোরখপুরে। সেখান থেকে আবার ট্রেনে যেতে হবে নওতনওয়া। নেপাল সীমান্তের সন্নিকটে। তারপর, নেপালে প্রবেশ করে—ভৈরোয়া। নেপাল হিমালয়ের পাদদেশে। ভৈরোয়া থেকে যাওয়া পোখরায়,—পাহাড়ের উপর।

আপাতত গোরখপুরে পৌঁছে সারাদিন কাটানো। মণিরা চলে যান তাঁদের এক আত্মীয়ের বাসস্থানে। আমি আতিথ্যগ্রহণ করি বন্ধু মিত্রের বাংলোয়। তিনি সে সময়ে ওখানকার মহাধ্যক্ষ—কমিশনার।

মণি বলেন, দাদা, নওতনওয়ার ট্রেন তো সেই বিকেলে। সারাদিন চুপচাপ বসে থেকে কি হবে? কিছুক্ষণ পরেই আমরা আপনার কাছে চলে আসব, বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণস্থান কুশীনগর দেখে আসা যাবে।

সেইমত ব্যবস্থাও হয়ে যায়। গোরখপুর থেকে প্রায় ৩৪ মাইল দূর। একুশ বছর আগে একবার সেখানে গিয়েছিলাম। এবার গিয়ে দেখি, ইতোমধ্যে বুদ্ধদেবের আড়াই হাজারতম জন্মবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে সেখানে অনেকগুলি নতুন মঠ মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা ও স্থানটির বহুবিধ সংস্কার হয়েছে।

সেখান থেকে ফিরে এসে মণি বলে, এটা তো সহজেই দেখে আসা গেল। কিন্তু বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনীও তো নেপাল রাজ্যে, ভৈরোয়া থেকে মাত্র ২১ মাইল দূর। সেটাও এই যাত্রায় দেখে যেতে পারলে ভাল হয়। ভৈরোয়ায় পৌঁছে খবর নেওয়া যাবে, কি বলেন? লুম্বিনীতে আপনি সেবার গিয়েছিলেন এই গোরখপুর থেকেই, না?

বলি, তোমার ঠিকই মনে আছে। সেটা ছোটখাট একটা অ্যাডভেনচারই হয়ে গিয়েছিল। শোনো তাহলে সে-গল্প। শুনেছি, এখন লুম্বিনী যাওয়ার সোজা পথ, এখান থেকে মিটারগেজ-লাইন রেলপথে নৌগড় স্টেশন—৪৬ মাইল দূর। সেখান থেকে বাস-এ ১৬ মাইল গেলে নেপাল সীমান্ত—তারপর আরও পাঁচ মাইল এগিয়ে লুম্বিনী। এভাবে যাওয়ার ব্যবস্থা তখন সম্ভবত ছিল না, তাই আমার যাত্রার আয়োজন হয় ভিন্নপথে। সেটা ১৯৪৪ সাল। পূজার ছুটিতে বাড়ির সকলে এসে রয়েছি লক্ষ্ণৌ-এ। একদিন মেজদাদা জানালেন, তাঁকে কদিনের জন্যে গোরখপুর যেতে হবে একটা সভার অধিবেশনে যোগ দিতে। গোরখপুর নাম শুনে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, শুনেছি ওখান থেকেই কুশীনারা ও লুম্বিনী যেতে হয়। যদি জায়গা দুটি দেখতে যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পার আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

মেজদা আশা দেন, সভাতে যোগ দিতে নিশ্চয় ঐ অঞ্চলেরও লোকজন আসবেন মনে হয়, তাঁরা কেউ হয়ত ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। যেতে চাও তো সঙ্গে চল।

অতএব, তাঁর সঙ্গ ধরি। গোরখপুর-এ পৌঁছে কুশীনগর দেখতে যাওয়ার কোনই অসুবিধা হল না —যেমন এবারও হয় নি। তবে তখন রাস্তাঘাট এত ভাল ছিল না, যানবাহনেরও এমন আয়োজন ছিল না। তা হলেও, স্বচ্ছন্দেই দেখা হয়ে গেল। কিন্তু লুম্বিনী? পথের খোঁজ নিয়ে জানা গেল—এখান থেকে অনেকখানি দূর, যাতায়াতের কোন বিধিব্যবস্থাও নেই। তবুও, ভাগ্য ভাল, যাত্রার আয়োজন একটা হয়ে গেল।

মেজদা এসে জানান, সোহরৎগড়ের রাজা,—বড় জমিদার বোধ হয়—এসেছেন সভায় যোগ দিতে। তিনি বলেছেন, সোহরৎগড়ে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে লুম্বিনী যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। রাস্তা ভাল নয়, তার ওপর বর্ষায় সম্ভবত পথের মাঝে দু'একটা পুলও ভেঙে গেছে, এ-সময়ে মোটরে যাওয়া যাবে না, হাতির ব্যবস্থা করে রাখবেন, আমি যেন অধিবেশন শেষ হওয়ার একদিন পরে ট্রেনে সোহরৎগড়ে চলে আসি।

উদ্গ্রীব ও উৎসুক হয়ে দুদিন কাটিয়ে দিই। নির্দিষ্ট দিনে মাঝরাতে সোহরৎগড় স্টেশনে ট্রেন থেকে নামি। ছোট্ট স্টেশন। প্রায় জনশূন্য, অন্ধকার। ছায়ামূর্তির মত একজন এগিয়ে আসেন, পরিচয় দেন, তিনি রাজার ম্যানেজার, আমাকে নিতে এসেছেন। যুগপৎ আনন্দ ও সাহস পাই। স্টেশনের অদূরে রাজপ্রাসাদ। ম্যানেজার জানান, ব্যবস্থা সব ঠিক আছে। ভোরবেলায় রওনা হতে হবে। তিনিও সঙ্গে যাবেন। এখান থেকে মোটরে যতদূর যাওয়া যায়, এগোনো যাবে, হাতি আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন, যেখানে ভাঙা পুল সেইখানে সে অপেক্ষা করবে। বাকি পথ হয়ত যেতে হবে হস্তিপৃষ্ঠে।

রাত্রের আহার সেরেই এসেছিলাম, তাই এখন রাজপ্রাসাদে রাতের বাকি ক'ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া। বিরাট এক হল ঘর। একপাশে পালঙ্কে শয্যা পাতা। ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভোরে ঠিকমত তৈরি থাকব আশ্বাস দিয়ে বিদায় দিই। প্রফুল্ল মনে শয্যাগ্রহণ করি। কিন্তু, ঘুমাব কি? অস্ফুট আলোকে তাকিয়ে দেখি, হল-এর মধ্যে চারিপাশে দাঁড়ানো ও দেওয়ালে টাঙানো,—বাঘ, ভালুক, গণ্ডার, গউর প্রভৃতির 'স্টাফ'-করা কারও পূর্ণদেহ, কারও বিশাল মাথা, শাখাপ্রশাখাযুক্ত শিঙ ইত্যাদি। রাজাবাহাদুর যে মস্ত শিকারী তারই জাজ্বল্য প্রমাণ। ভাবি, এ তো রাজপ্রাসাদে ঘুমোনো নয়, গভীর অরণ্যমধ্যে হিংস্র জীবজন্তুর নিষ্পলক জ্বলন্ত দৃষ্টির শরবিদ্ধ হয়ে যেন আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শয়ান!

এতগুলি প্রাণিহত্যা! তাদের প্রেতাত্মা আজ বুঝি বা আমাকে ঘিরে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। জগতে অহিংসা ধর্মপ্রচারক বুদ্ধদেবের জন্মস্থানের সন্নিকটে এ কী হিংসাত্মক পরিবেশ!

চোখে ঘুম আর আসে না। ভোর হবার বহু পূর্বেই তৈরি হয়ে ম্যানেজারের আগমন অপেক্ষায় সময় কাটাই। তিনি আসতেই জিজ্ঞাসা করি, রাজাবাহাদুর তো মস্ত শিকারী দেখছি।

তিনি জানান, আশিটা বাঘ মরেছে তাঁর হাতে! আপনি পৌঁছেছেন কাল অনেক রাতে, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। ওবেলা লুম্বিনী থেকে ফিরে এসে সাক্ষাৎকার হবে। আমরা বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব। চলুন—মোটর তৈরি।

চলেছি বুদ্ধদেবের জন্মস্থান দর্শনে। অন্তর আগ্রহে আকুল। মোটর ছুটে চলে। দু পাশে ধু-ধু করে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মরুভূমির মতন। মাঝে মাঝে দু-একটা গ্রাম। দূর দিগন্তে আকাশের বুকে ছায়াসম হিমালয়ের সুদীর্ঘ গিরিপ্রাকার। প্রথম কিছুদূর পথ ভাল। তারপর গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা। বর্ষার পর, ভাঙাচোরাও। তবু মোটর চলে—এঁকেবেঁকে, লাফিয়ে, ধীরে গাড়ি পার হয়ে যায়। ম্যানেজার বলেন, মাঝপথে একটা বড় নদী আছে, সেইটের পুলই ভেঙে যায় বর্ষার তোড়ে। সেইখানে পৌঁছে আমাদের মোটর ছাড়তে হবে। বলা আছে, হাতি ওখানে অপেক্ষা করবে। নদীর নিকটে পৌঁছে দেখি, হাতি সেইখানেই রয়েছে বটে। কিন্তু মোটর ছেড়ে আমাদের হাতির পিঠে চাপতে হয় না। পুলের উপরকার কয়েকটা কাঠের তক্তা বর্ষাকালে স্থানচ্যুত হয়ে নদীগর্ভে পড়ে রয়েছে—যেন দন্তহীন মানুষের মুখবিবরের মত পুলের ফোকলা চেহারা। কিন্তু বুদ্ধিমান মাহুত ভোরে পৌঁছে হাতিকে দিয়ে খসে-পড়ে-যাওয়া কয়েকটা তক্তা ওপরে তুলিয়ে পুলের যথাস্থানে আবার এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে, গাড়িটাকে কোনমতে সাবধানে পার করিয়ে নেওয়া সম্ভব। এরপর আর কোন ভাঙা পুল নেই। হাতি তাই এখন আপন কর্তব্য সেরে নদীর ধারে বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে খেতে ব্যস্ত।

আমরাও নিশ্চিন্ত মনে মোটর চেপে এগিয়ে যাই, একঘণ্টার মধ্যেই লুম্বিনী পৌঁছুই।

ম্যানেজার মন্তব্য করেন, আপনার ভাগ্য খুব ভাল। এখন দেখছি দুপুরের মধ্যেই আমরা প্রাসাদে ফিরতে পারব,—এখানে দেখতে কতটুকুই বা সময় লাগবে?

প্রকৃতই তাকিয়ে দেখি, ঘুরে দেখবার বিশেষ কিছুই নেই।

লুম্বিনীর এখনকার নাম রুমিন দাই। দেখে বিশ্বাসই হয় না,—বুদ্ধদেবের জন্মস্থানের এখন এই পরিণতি। মাঠের মাঝে ছোট্ট একটা গ্রাম। কয়েকটা চালাঘর। ভগ্নপ্রায় একটা বৌদ্ধস্তূপ। ক্ষুদ্রকায় নবনির্মিত এক বৌদ্ধ মন্দির। অদূরে অশোকের একটা শিলাস্তম্ভ। বজ্রাঘাতে আংশিক বিনষ্ট। তারই গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি,—বুদ্ধ শাক্যমুনি এখানে জন্মেছিলেন—সেই পাঠোদ্ধার করেই এই বিস্মৃত প্রসিদ্ধ স্থানটির প্রকৃত পরিচয় জগতে পুনরায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন ভগ্নস্তূপে কিছু খননকার্য শুরু হয়েছে,—তারই ভিতর থেকে পাওয়া গেছে—বুদ্ধমাতা মায়াদেবীর শাল তরুশাখা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মূর্তি,—পায়ের নিকট শিশুবুদ্ধ।

এই পুণ্য স্থানটির দুরবস্থা দেখে মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু, মন্দিরে প্রবেশ করে লামা সযত্নে গোপনে-রাখা যে অমূল্য রত্নটি অতি সঙ্গোপনে বার করে দেখান তাতে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অতি ক্ষুদ্রকায় স্বচ্ছ স্ফটিকের ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি। যেন হীরা কেটে তৈরি। অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। লামা হাতে ধরে দেখতে দেন। দিনের আলো স্ফটিকে বিচ্ছুরিত হয়ে মূর্তির মধ্যে কেমন বিভিন্ন বর্ণের প্রতিফলন ফুটে ওঠে—অবাক হয়ে দেখি। যেন সাতরঙা রামধনু-মূর্তির অভ্যন্তরে ঘুরতে থাকে। স্বচ্ছ শুভ্র স্ফটিকের মূর্তি,—দেখায় যেন রঙিন জল জমাট করে তৈরি! অতি বিচিত্র ও অপার সৌন্দর্যময় সেই

মূর্তি আজও সেখানে সংরক্ষিত রয়েছে কি না জানি না, কিন্তু আমার অন্তর্লোকে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। এখনও কোথাও কোন ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি দেখলে তখনই সেই মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মনে এক অনৈসর্গিক অনুভূতি নিয়ে আবার মোটরে চড়ি, ফেরার পথে যাত্রা করি। তখন কি আর জানি, লুম্বিনীযাত্রার অ্যাডভেঞ্চার সেই ফিরতিপথেই ঘটবার অপেক্ষায় রয়েছে।

আধাআধি পথ চলে এসেছি। মোটর তেমনি ঝাঁকানি দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ দিয়ে চলেছে। এক জায়গায় পথের বাঁ পাশে অল্প নীচে ধানক্ষেত, ডানদিকে বিশাল এক পুষ্করিণী,—পথ থেকে পাঁচ-ছয় হাত নীচে। জলাশয়ের পাড় দিয়ে রাস্তা। যথেষ্ট চওড়া পথ। তবুও, মোটরচালক ডানদিক চেপে একেবারে পুকুরের ধার ঘেঁষে কেন গাড়ি চালায় বুঝি না। বাঁদিকে অতখানি খালি রাস্তা ছাড়বার কোন কারণই নেই। শুধু তাই নয়—যেভাবে গাড়ির চাকা বেঁকে ঝাঁকানি দিয়ে চলেছে—গাড়ি পুকুরের জলে— আর ভাবতে হয় না। মোটর প্রকৃতই পুকুরের পাড় ধ্বসিয়ে জলের দিকে কাত হয়ে যায়। ম্যানেজার আঁতকে উঠে চেঁচান! এই!—আর এই এই! ততক্ষণে পাড়ের গড়ানে নরম মাটিতে চাকা বসে গাড়ি ধীরে ধীরে জলের দিকে হেলে পড়ছে। অপর দিকের দুই চাকা জমি ছেড়ে ওপরপানে উঠছে। আমরাও গাড়ির মধ্যে কাত হয়ে যাচ্ছি। কথাগুলি লিখতে সময় লাগছে—ঘটনাটা ঘটে কিন্তু চক্ষের পলকে। এবং, যেমন অকস্মাৎ দুর্ঘটনার সূত্রপাত, তেমনি আকস্মিক ভাবেই গাড়ির কাত হয়ে পড়ার হঠাৎ কি কারণে গতিরোধও। অবিলম্বে আকাশমুখী দরজা খুলে, হেলে-পড়া গাড়ির গা বেয়ে আমরা একে একে নেমে পাড়ের ওপর বার হয়ে দাঁড়াই। তাকিয়ে দেখি, সভ্যজগতের সুবিবেচক শটকখানি যেন দয়া করে আমাদের মুক্তিলাভের সুযোগটুকু দিয়েই আবার ধীরে ধীরে জলের দিকে আরও বেঁকে কাত হতে লাগলেন। গাড়ির ভিতর জলপ্রবেশও শুরু হল।—আতঙ্কে দেখতে থাকি, এখনই বুঝি বা গাড়ির সলিলসমাধি ঘটে! কিন্তু, ভাগ্যক্রমে অর্ধমগ্ন অবস্থাতেই মোটর স্থাণু হয়ে থেকে যায়।

'খুব বেঁচে যাওয়া গেছে'—বলে মুখে হাসি ফুটিয়ে ম্যানেজারের দিকে তাকাই। দেখি, বেচারীর ভয়ে বিশুষ্ক বিবর্ণ বদন। কাঁপা গলায় বলেন, এখন উপায়? গাড়ি ওঠানো যাবে কী করে? আপনিই বা ফিরবেন কীসে? রাজাবাহাদুরকে কৈফিয়ৎ দেব কী?

জিজ্ঞাসা করি, হাতিটা চলে গেছে? তাকে আনানো যায় না?

তিনি বলেন, তাকে তো তখনই সোহরৎগড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে এসেছি—এতক্ষণে সেখানে পৌঁছেও গেছে।

তাহলেও জল থেকে মোটর তোলবার ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিছু দূরে একটা গ্রাম। ম্যানেজার সেখান থেকে লোকজন ডাকিয়ে আনেন। বড় বড় বাঁশ সংগ্রহ হয়। তারই সাহায্যে বহু চেষ্টায় মোটর উদ্ধার হয়। অবশ্য ঘণ্টা তিনচার সময় লাগে। বরাত ভাল, এঞ্জিন বিকল হয় নি।

নিশ্চিন্তমনে মোটরে বসে আবার ফিরতি পথ ধরা।

ম্যানেজারের মুখে কিন্তু তখনও দুর্ভাবনার মেঘভার। ঘটনাটার গুরুত্ব হালকা করার অভিপ্রায়ে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলি, ছোটখাট অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল, বেশ মজা লাগল। আমার ট্রেন সন্ধ্যাবেলায় —ফিরে গিয়ে রাজাবাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্টেশনে পৌঁছনোর যথেষ্ট সময় রয়েছে,—কী বলেন? তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন, হাঁ তা রয়েছে। যাবার পথে হাতি চড়ে যেতে হলে যেমন সময়ে ফিরতাম, এখন সেই সময়েই ফিরব। আমার কিন্তু আপনার কাছে একটা বিশেষ অনুরোধ আছে।—এ ঘটনাটা যেন রাজাবাহাদুরকে জানাবেন না, তাহলে আমাদের আর রক্ষা থাকবে না।

তাঁর দিকে তাকাই, বলি, আপনাদের দোষ কোথায়? এ তো স্রেফ অ্যাকসিডেন্ট।

তখন তাঁর দুর্ভাবনার প্রকৃত কারণ শুনি।

এ-মোটরের যে চালক, কি কারণে, সে আজ ভোরে আসতে পারেনি। গাড়ি যে চালিয়ে এনেছে সে ড্রাইভার নয়, গাড়ির "ক্লিনার", গাড়ি ধোওয়া মোছা পরিষ্কার করা তার কাজ। সেই সুযোগে একটু আধটু গাড়ি চালানো শিখেছে। তার না আছে লাইসেন্স, না আছে এতদূর গাড়ি চালিয়ে আনার অভিজ্ঞতা।

চালক না আসায় আমার লুম্বিনীযাত্রা একেবারে ভেসে যায় দেখে ম্যানেজার অগত্যা এই ব্যবস্থা করতে রাজী হন।—কথা শুনে তখন বুঝতে পারি, গাড়ি অমন এঁকেবেঁকে চলার কারণ তাহলে শুধু

কাঁচা রাস্তার অসম অবস্থাই নয়। চালকের অক্ষমতাও। জলে পড়ার কারণও তাই।

ফিরে গিয়ে আমিও অবশ্য রাজাবাহাদুরকে দুর্ঘটনার কথা জানাই নি। জানাবার কথাও মনে ওঠে নি। কেন না, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অল্পক্ষণের জন্যই, কথাও হয় দু-চারটে মাত্র। আর সেটুকু সময়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছি, তাঁর কী বিশাল বপু! একটা প্রকাণ্ড কৌচ জুড়ে বসে রয়েছেন। সে কলেবর বহন করে কেউ যে চলাফেরা করতে পারে তাই যেন বিশ্বাস হয় না। অথচ, তাঁরই হাতে প্রাণ হারাল অতগুলো অরণ্যচারী প্রাণী। আশিটা বাঘ! বনের জন্তু কি তাঁর দেহের বিপুলতায় বিস্মিত হয়ে পালাতে ভুলেছিল!

যাই হোক, আমার লুম্বিনীদর্শনের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে আমার ভুল হয়নি।

রাজাবাহাদুরের কথা বলতে মনে পড়ে আমার এক বন্ধুর মুখে শোনা আর এক মহারাজার শিকার-অভিযানের কাহিনী। তিনিও ছিলেন মস্ত শিকারী এবং অধিকারীও ছিলেন বিশাল দেহভারের। হাতি চড়ে শিকারে বার হতেন। মহারাজার শিকার-যাত্রা,—তাঁর প্রয়োজনমত সব আয়োজনও সঙ্গে চলত। বই পড়ারও তাঁর খুব শখ, তাই বইও সঙ্গে থাকত। সেই স্থূলকায় মহারাজাকে হাতির পিঠে তুলে বসিয়ে দেওয়া হলে, তাঁর পিছনে উঠে বসত তাঁর এক বিশ্বস্ত অনুচর। মহারাজা সুস্থির হয়ে বসলে হাতি উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করত। মহারাজা তখন পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে চাইতেন,—দেও, চশমা দেও। অনুচর চশমা এগিয়ে দিত। মহারাজ চোখে চশমা লাগিয়ে আবার হাত বাড়ালেন, আভি কিতাব দেও। —বইও তখনই তাঁর হাতে আসত। তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকতেন; ওদিকে হাতিও হেলেদুলে চলে বনের পথে। হঠাৎ হয়ত মাহুত হাতিকে দাঁড় করায়, আঙুল তুলে ইঙ্গিতে মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সামনে বাঘ! মহারাজও তখনই দেখতে পান। কিন্তু, হাতে বই! আস্তে আস্তে বইখানা পিছনে ধরে অনুচরকে অস্ফুটস্বরে বলেন, কিতাব পাকড়ো। তারপর চোখ থেকে চশমা খোলেন। আবার হাত বাড়ান, অনুচরকে বলেন, চশমা পাকড়ো। চশমা দিয়ে হাত খালি হতে হুকুম দেন, রাইফেল দেও। —অনুগত অনুচর তখনই তাঁর হাতে টোটাভরা রাইফেল ধরিয়ে দেয়। এতক্ষণে রাইফেলধারী শিকারী মহারাজা মাহুতকে প্রশ্ন করেন, শের কাঁহা?

ওদিকে শের কি আর ততক্ষণ মহারাজার লক্ষ্যভেদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে?

তবুও, সেই মহারাজের হাতেও নাকি বহু বাঘ ভালুক প্রাণ হারিয়েছিল!

গল্প শুনে মণি বলে, ভৈরোয়া থেকে এবার লুম্বিনী অভিযান কীরকম হয়, বা হয় কি না, দেখা যাক।

বিকেলে ট্রেন ধরতে গোরখপুর স্টেশনে আসি,—নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই। এ আমার চিরকালের স্বভাব। যাত্রার জন্য তৈরিই যদি হয়ে থাকি তবে আর অযথা বাড়িতে বসে সময় কাটানো কেন? স্টেশনে গিয়ে বরং অপেক্ষা করা যাক। এ-স্বভাব হয়ত পিতৃদেবের কাছে তাঁর এক অভিজ্ঞতার গল্প শোনার ফল। তিনি গল্প করতেন, ট্রেন যাত্রায় তাঁর একবারকার দুর্ভোগের ঘটনা। হাইকোর্টের পুজার ছুটিতে সে বছর তিনি দেওঘরে গিয়ে রয়েছেন। তারই মধ্যে একটা জরুরী মিটিং-এ যোগ দিতে একদিনের জন্যে তাঁকে কলকাতায় আসতে হয়। মিটিং শেষ করে এক বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রের মোঘলসরাই প্যাসেঞ্জার ধরতে হাওড়া স্টেশনে এসেছেন,—পরদিন সকালে দেওঘর পৌঁছুতেন। তাঁর সরকার মশায়কে বলে দিয়েছেন, মালপত্র নিয়ে ট্রেন ছাড়বার অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে যেন স্টেশনে চলে আসেন। তাঁর, কিন্তু আসতে কিছু বিলম্ব ঘটলেও ট্রেন ছাড়তে তখনও অনেক সময় আছে। প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে তাঁরা দেখেন, ট্রেনে সেদিন প্রচণ্ড ভিড়, প্রথম শ্রেণীর কামরাতেও শোওয়ার জায়গা খালি নেই। কামরাগুলি দেখতে দেখতে তাঁরা এগিয়ে যান,—কী বিরাট লম্বা ট্রেন। এঞ্জিনের কাছাকাছি এসে দেখেন, একটা প্রথমশ্রেণীর কামরায় একজন মাত্র সাহেব-যাত্রী বসে বই পড়ছেন, অপর বার্থ খালি! তখনই তাইতে উঠে মালপত্র তুলে সরকার মশায় সবে বিছানাটা খুলে বার্থের ওপরে পাততে শুরু করেছেন, ট্রেন ছাড়ার বাঁশি বাজল। একী! এখনও তো সময় হয়নি। বাবা বলেন, দেখ দিকিনি, বলেছিলাম একঘণ্টা অন্তত আগে আসতে,—ট্রেন ছাড়বার সময় নিশ্চয় বদলেছে—নেমে পড় শিগগির। তাঁরা নেমে যান, ট্রেনও মন্থরগতিতে চলতে আরম্ভ করে। বাবা নিজেই বিছানা বিছিয়ে আরাম

করে শুয়ে পড়েন,—সারাদিন পরিশ্রম গেছে কম। ওদিকের বার্থের সাহেব কিন্তু বই-এর পাতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আড়চোখে বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকান। শেষ পর্যন্ত সাহেব কৌতূহল দমন করতে না পেরে প্রশ্ন করেন, কতদূর যাবেন আপনি? বাবা নিশ্চিন্তভাবে উত্তর দেন,—দেওঘর,—কাল সকালে পৌঁছুব। সাহেব তখন জানান, এটা যে তারকেশ্বর প্যাসেঞ্জার! মোঘলসরাই প্যাসেঞ্জারের সামনের দিকে প্ল্যাটফর্মে এটা আজ দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

বাবা তখনই উঠে বসেন, "সেকী"! তাড়াতাড়ি বিছানা গুটান। লিলুয়া স্টেশন আসতেই মালপত্র নিয়ে নেমে পড়েন। যথা সময়ে মোঘলসরাই প্যাসেঞ্জার এসে দাঁড়ালে দেখেন, সে-ট্রেনে ভিড় আরও বেড়েছে—কোন মতে উঠে বেডিং-এর উপর বসে সারারাত কাটান।

জানি না, ছেলেবেলায় সেই গল্প শোনার ফলেই কিনা, আমারও স্বভাব হয়েছে ট্রেন ছাড়বার অনেক আগে স্টেশনে এসে অপেক্ষা করা। এখানেও তাই আসি। তাছাড়া, আমাদের যাত্রার সব মালপত্র আমার সঙ্গে রয়েছে। মণিরা আসবেন তাঁদের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে সময়মত। টিকিটগুলি আছে তাঁদের কাছে।

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখান থেকেই ছাড়বে। কামরায় মালপত্র তুলে সাজিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বসি। সময় কাটে, কিন্তু মণিদের দেখা নেই। গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা বাজে। উদ্বিগ্ন হয়ে গাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াই। লম্বা প্ল্যাটফর্ম। সেই অপরপ্রান্তে প্ল্যাটফর্মের প্রবেশ পথ। দরজা খুলে ঝুঁকে দেখতে থাকি। কই! সারা প্ল্যাটফর্মে কোথাও তাঁদের চেহারা দেখা যায় না। আমার ব্যস্ততা দেখে অপর যাত্রীরা প্রশ্ন করেন, "আর কারও আসার কথা আছে নাকি?"

তাঁদের বলি, সঙ্গীরা এসে পৌঁছন নি, যদি ট্রেন এখনই ছেড়ে দেয় দয়া করে মালপত্রগুলো বাইরে নামিয়ে—কথা শেষ না হতেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। তাড়াতাড়ি দু-তিনটে মাল হাতে নিয়ে নেমে পড়ি, বাকিগুলো অপর যাত্রীরা চলন্ত ট্রেন থেকে ঠেলে প্ল্যাটফর্মে ফেলে দিতে থাকেন। মনে পড়ে যায় রাবণ সীতা হরণ করে আকাশপথে চলেছেন, সীতাদেবী গা থেকে এক একটা অলঙ্কার খুলে ফেলে দিচ্ছেন।

যাক। মালগুলো সবই নেমেছে, যদিও প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। সেগুলো একজায়গায় জড় করে রাখি,—মুখ তুলে তাকাতে থাকি, ট্রেন স্টেশন ছেড়ে দূরে অদৃশ্য হয়। ওদিকে প্ল্যাটফর্মের প্রবেশদ্বারে মণিদেরও আবির্ভাব হয়।

মণির হাতে নতুন টাইমটেবল। উত্তেজিত হয়ে খুলে দেখায়, ট্রেন ছাড়বার সময় হতে এখনও পনেরো মিনিট বাকি—তার নিজের হাতের ঘড়ি অনুযায়ী এবং স্টেশনের ঘড়িতেও। ট্রেন ছাড়ল কি করে?

জোর কৈফিয়ৎ তলব করে স্টেশন মাস্টারের নিকটে গিয়ে। তিনি নির্বিকার চিত্তে জানান, টাইমটেবিলে সময়টা ভুল ছাপা হয়েছে, পরে সাময়িক পত্রিকাদিতে এই ভুল জানিয়ে ঠিক বিজ্ঞপ্তিও করা হয়েছিল, কেউ সে বিজ্ঞাপন যদি না দেখেন, তার জন্যে রেলকর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

তর্কাতর্কি কিছুক্ষণ চলে। কিন্তু, তাতে এখন আর লাভ কি? রাত্রে আর একটা ট্রেন আছে, তাইতেই অগত্যা যেতে হবে। আপাতত এখন আবার যে যার ডেরায় ফেরা।

কিন্তু, এ জগতে লাভক্ষতির ফলাফল নির্ণয় করা সহজ নয়। এই ট্রেন ধরতে না পারার অবসরে মণিদের ভাগিনেয়—"বঙ্কু"—গোরখপুরে পৌঁছে আমাদের দলে যোগ দিতে সক্ষম হয়। আমরা খুশি হই।

রাত্রের ট্রেন রাত একটার পর নওতনওয়ায় পৌঁছুল। বন্ধুবর মিত্রের স্থানীয় লোকজন ইতোমধ্যে আমাদের ট্রেন বিভ্রাটের সংবাদ পেয়ে যান, সেই গভীর রাত্রেও তাঁরা স্টেশনে উপস্থিত থাকেন।

নিকটস্থ ডাকবাংলোতে বাকি রাতটুকু কাটানোর ব্যবস্থাও করিয়ে রাখেন।

সকালে উঠে জীপ-এ ও সাইকেল রিকশায় মালপত্র সমেত ভৈরোয়া অভিমুখে সদলবলে যাত্রা করি। মাত্র মাইল চার পাঁচ পথ। বেলা নয়টায় পৌঁছে যাই। নেপাল সীমান্তে চেক পোস্টে মালগুলির কোন কোনটা খুলে দেখে,—বিশেষ হয়রানি ভোগ করতে হয় না। যেটুকু করতে হয় মণি ও ভাগনে 'বঙ্কু' হাসিমুখে সে ভার সামলে নেন।

ভৈরোয়া নেপাল রাজ্যে। হিমালয়ের পাদদেশে। সমতলক্ষেত্র। অদূরে দীর্ঘ প্রলম্বিত হিমালয়ের গিরিশ্রেণী। তবুও, স্থানটি কেমন-যেন শ্রীহীন। ধূলিধূসরিত, কঙ্করজর্জরিত নীরস পরিবেশ। যেন সুশ্রী পুরুষের কর্দমাক্ত নগ্ন পদতল। সাজানো শহর নয়, ছড়ানো লোকালয়। লোকজনও যেন কী রকম!

ভারত-নেপাল সীমান্তে হওয়ায়—দুই দেশেরই লোক দেখা যায়। দেখেই, কেন জানি না, সন্দেহ হয়, চোরাকারবারির মস্ত আড্ডা।

যাক, তাতে আমাদের কী? আমরা তো ক্ষণিকের যাত্রী, এখনই প্লেন ধরে পাহাড়ের উপর পোখরায় চলে যাব। যা ভাবা যায়, তা কি আর সব সময়ে হয়? মাঠের মধ্যে এরোড্রোম। কয়েকটা ছড়ানো ঘর, এয়ার-অফিসের দপ্তর। খবর নিতে গিয়ে শুনি, প্লেন কখন আসবে, কখন যাবে—তার কোনই নিশ্চয়তা নেই। অথচ, রয়াল নেপাল এয়ারলাইন। তবে, আজ প্লেন এলেও তাতে যাওয়ার টিকিট পাওয়া সম্ভব নয়, সে-সংবাদ পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। কাল থেকে অপেক্ষমাণ যাত্রী ভিড় করে দাঁড়িয়ে। অতএব আজ এইখানেই রাত্রিবাস।

অগত্যা লোকালয়ে ফিরে রাতকাটানোর জায়গার সন্ধান চলে। দু'একটা হোটেল নামে যা রয়েছে, সেখানে থাকার চেয়ে মাঠে পড়ে থাকা ভাল। যেমন নোঙরা, তেমনি অব্যবস্থাও। মনে হয় যেন চোর জোচ্চোরের ডেরা। এমনি সময়ে এক মুসলমান ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি সাদরে আমন্ত্রণ জানান, তাঁর নিজের বাড়িতে থাকবার জন্য। সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থাও করে দেন। খালি বাড়ি, তাঁর পরিবারবর্গ এখন এখানে নেই। বাড়ি মানে দু-খানি মাত্র কামরা। তাঁর ব্যবসার জিনিসপত্রও এখানে থাকে। তবে রাস্তার ধারে খোলা বারান্দা দেখে বলি, এইখানেতে রাত কাটানোর কোন অসুবিধা হবে না। মাথার উপর ছাদ রয়েছে, আবার কী?

মণি বলে, এরই ফাঁকে আজ লুম্বিনী ঘুরে আসা সম্ভব কিনা খোঁজখবর নেওয়া যাক।

সেখানেও বাধা দেখা দেয়। একদিনে দেখে ফিরে আসা সম্ভব নয়। ২১ মাইল যাত্রাপথ, কিন্তু, মাঝপথে নদীর উপর পুল নেই, অথচ এখন বর্ষার পর নদীতে জল থাকবে, মোটর করে সব পথ এ সময়ে যাওয়া চলবে না।

মুসলমান আশ্রয়দাতার আদরযত্নের কোনই ত্রুটি থাকে না। কিন্তু, রাত্রে রাস্তার ধারে বাইরের বারান্দায় শায়িত অবস্থায় নিদ্রার বিঘ্ন ঘটায় অসংখ্য মশকবাহিনীর অবিরাম গুঞ্জরন ও সুতীক্ষ্ণ দংশন। শুধু তাই নয়। রাস্তার একটা কুকুরের সারারাত্রিব্যাপী, কেন জানি না, ঘেউ ঘেউ চিৎকার! পরের দিন মালপত্র নিয়ে এরোড্রেমের দিকে রওনা। পরে এক বাঙালী ডাক্তার ও তাঁর ভাই-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। এখানেও বাঙালী? হঠাৎ দুদিনের বাসিন্দাও নয়। বছর ত্রিশ এইখানেই ব্যবসা চালাচ্ছেন। বেশিক্ষণ কথা বলার অবসর থাকে না। তাড়াতাড়ি এরোড্রোমে পৌছুতে হবে—যে কোন সময়ে প্লেন এসে যেতে পারে। নিশ্চিন্ততার মধ্যে এই—সেখানে পৌছেই প্লেনের টিকিট পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু উপরি গুনগার দিয়ে। ঘুষ নয়। টিকিট ঘরে কাউন্টারের সামনে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মণি নেপালী নোটের তাড়া বার করে চারখানা টিকিটের দাম গুনে গুনে হিসাব করে দিতে ব্যস্ত। সদয়প্রাণ এক ব্যক্তি পাশ থেকে সাবধান করে দেন টাকা ঠিকমত গুনে পকেটে রাখুন—অতগুলো নোট অযথা বার করছেন কেন?—মণি একটু অন্যমনস্ক হয়ে তার পানে তাকাতে গেছে মাত্র—কিন্তু কোথায় কে? ম্যাজিকের মত লোকটি অন্তর্হিত, কাউন্টারে ধরে রাখা বাকি নোটের গোছাটিও অদৃশ্য।

পাশের লোক কয়টি সহানুভূতি জানায়, কী হল? পকেটমার নাকি?

এ নিয়ে হইচই করেও লাভ হয় না। মণি টিকিট হাতে এসে বলে, জায়গাটা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বার হতে পারলে বাঁচা যায়।

কিন্তু প্লেনের কোন খবরই কেউ দিতে পারে না। রেডিও দপ্তরে গেলে যদি জানা যায়। সেখানে গিয়ে পরিচয় লাভ হয়—বাঙালী রেডিও অফিসারের সঙ্গে। মিস্টার রায়। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে কাটে। পোখরায় থাকবার ব্যবস্থা কি হতে পারে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, বেতারে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, যদি হোটেলে আগে থেকে জায়গা ঠিক করে রাখতে পারে।

এদিকে বেলা বাড়ে। দুপুর হয়। তবুও প্লেনের কোন খবর নেই। মাঠের মধ্যে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াই। কত রকম যাত্রী। তার মধ্যে আলাপ হয়ে যায় এক বাঙালী তরুণের সঙ্গে। কন্‌ট্রাকটারির ব্যবসা। এখানে এসেছে কাজ নিয়ে। ভৈরোয়া থেকে পোখরা পর্যন্ত বড় রাস্তা তৈরি হচ্ছে—বাস ও মোটর চলাচল যাতে সম্ভব হয়। ভারত সরকারের সাহায্যে এই কাজ চলেছে। বছরখানেকের মধ্যে রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে।—ছেলেটি এমনভাবে কথা বলে, যেন তারই টাকায় তারই প্রচেষ্টায় এই কাজ হচ্ছে!

যাই হোক, শুনে ভাবি, রাস্তাটা হলে এইভাবে প্লেনের আশায় দুদিন এখানে বসে থাকার অস্বস্তি থেকে যাত্রীরা নিস্তার পাবে।

এখন সেই রাস্তা হয়েছেও শুনেছি। ভৈরোয়া থেকে পোখরা বাস-এ যাওয়া যায়। প্লেনও অবশ্য আছে। তাছাড়া কাঠমাণ্ডু থেকে পোখরা আসারও এখন নতুন বাসপথ তৈরি হয়েছে—প্রায় শ'খানেক মাইল পথ—সে-পথেও নিয়মিত বাস চলে। আমাদের যাত্রাকালে পোখরা-কাঠমাণ্ডু প্লেন চলত, এখনও চলে। অতএব, কাঠমাণ্ডু থেকে পোখরা যাতায়াতও এখন সহজ হয়েছে। সেইপথে যাত্রীরা অনেকে যাচ্ছেনও।

এরোড্রোমে ঘণ্টা পাঁচেক অপেক্ষার পর অবশেষে প্লেন আসার শব্দ শোনা যায়। বায়ুযানও দর্শন দেন। ঘুরে ঘুরে ভৈরোয়ার মাঠে অবতরণ করে। প্লেন থেকে নেমে আসেন দুই পাইলট। প্লেনের রেডিও অফিসারও এসে এখানকার রেডিও অফিসার রায়ের সঙ্গে কথা বলেন। রায় এগিয়ে এসে মণির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন,—বাঙালী মুসলমান, নাম আনিস হোসেন। তিনি মণিকে দেখেই চিনতে পারেন,—আরে! মণিদা! আপনি এখানে! আমার দাদা মহবুবর চুয়াডাঙায় আপনার সহপাঠী ছিল, আমি আনিস হোসেন,—মনে পড়ে? দুজনেরই সে কী আনন্দ! পরস্পরের আত্মীয়স্বজনের খবর করেন দুজনেই মহা উৎসাহে।

মণি এখন কলকাতার বিচক্ষণ চিকিৎসক। আর, মহবুবর ও আনিস পাকিস্তানবাসী, ভিন্নদেশী। কিন্তু দেশ দ্বিখণ্ডিত হলেও হৃদয়ের বন্ধন অলক্ষ্যে সমভাবে অটুট থাকে। স্বধর্মের বা খণ্ডিত স্বদেশের ভেদাভেদ সেই নির্মল সংযোগ ছিন্ন করে না।

প্লেন তখনই ছাড়ে। আনিস আমাদের সাদরে ডেকে নেন প্লেনের 'কক্-পিট'-এ। তাঁর যন্ত্রপাতি দেখান—ছোট ছেলে যেমন বন্ধুদের পেয়ে তার আপন খেলাঘরের রাজত্ব দেখায়।

হিমালয়ের গিরিশ্রেণী এখন আমাদের তলদেশে। মনে হয়, নীচে যেন ঢেউ-খেলানো ঘন সবুজ সমুদ্রের বিস্তার। আর আদূরে নীল আকাশে মাথা তুলে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে শুভ্রফেনশীর্ষ বিশাল তরঙ্গ—হিমালয়ের তুষারকিরীট সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণী।

আনিস দেখান, সামনে ঐ মচ্ছপুছারে, ও পাশে ঐ ধওলাগিরি, তারই এদিকে অন্নপূর্ণা,—ঐ হল হিমলচুলি, দূরে ঐ মানসলু, দাঁড়ান আপনারা হেঁটে যাবেন ঐ ধওলাগিরি আর অন্নপূর্ণার মাঝখান দিয়ে—ঐ অন্নপূর্ণার পিছন দিকে—

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি। দেখায় যেন কত নিকটে! স্বপ্নরাজ্যে যেন বিচরণ করি।

কিন্তু ওদিকে কখন আকাশ থেকে প্লেন নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে। সবুজ পাহাড়গুলির গাছপালা আপন আপন আকার ধারণ করছে। যেন সহস্র বাহু মেলে প্লেনকে লুফে নিতে চায়। তারই মাঝে মাঝে দেখা দিল, ফিউয়া হ্রদের নীল জল—স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল।

প্লেন নেমে আসে যেন বায়ুস্রোতে সাঁতার কেটে—প্রকাণ্ড পাখির মত ডানা বিছিয়ে! পাহাড়ের মাথায় সমতলভূমি। কয়েকটা বাড়িঘর। ওপর থেকে দেখা ক্ষুদ্র সচল বিন্দুগুলি ক্রমে ফুটে ওঠে মানুষের রূপ নিয়ে। আনিস বলেন, এসে গেলাম পোখরায়—আধঘণ্টাও লাগল না।

পোখরা নেপাল রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান শহর। কাঠমাণ্ডু হল রাজধানী। তারপরই বড় শহর পোখরা। প্রায় ২,৯০০ ফুট উঁচুতে। একটা পাহাড়ের মাথায়। প্লেন নেমেছে শহর থেকে মাইল দেড় দুই দূরে। বিস্তীর্ণ ময়দানে। অল্প দূরে, Sun-n-Snow হোটেল। সেখানে খবর নিয়ে জানা যায়, ঘরভাড়া খুব বেশি, অথচ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা নেই; ঘরও খালি নেই, বিদেশী যাত্রী দলে ভরে রয়েছে। টুরিস্ট অফিসার—ভদ্র নেপালী যুবক। আগন্তুক যাত্রীদের সাহায্য করতে আগ্রহী। কিন্তু, নিরুপায়। মালগুলো ওখানে বারান্দায় আপাতত রেখে দেওয়া হয়। নিকটে নেপালী এক হোটেলের সন্ধান পেয়ে মণি ও ভাগ্নে বন্ধু সেইদিকে এগিয়ে যায়। ভক্তি ও আমি ধীরে ধীরে তাদের লক্ষ্য করে পিছু নিই।

মণিরা পৌঁছুতেই হোটেলের কর্ত্রী—সাজগোছ করা সুশ্রী এক নেপালী মহিলা, একরাত্রির জন্য থাকতে দিতে রাজী হন। ভেতরে নিয়ে গিয়ে ছোট ছোট খুপরি মত সাজানো ঘর দেখান। মণি ভাবে একটা রাত কাটানোর ব্যাপার, চলে যাবে কোনমতে। তাই তাকে জানায়, এখনই আসছি, অপর দুই সাথীকে নিয়ে।

রাস্তায় এসে আমাদের ডাক দেয়, আসুন, হয়ে যাবে এইখানেই। ঘরগুলো ছোট, তবে জায়গাটা সাজানো গোছান, পরিচ্ছন্ন,—চারদিকে গাছপালায় ঘেরা—যেন কুঞ্জবন।

সদলবলে আমরা পৌঁছুলে মূর্তিমতী ভদ্রগৃহলক্ষ্মী ভক্তিকে দেখেই হোটেলকর্ত্রীর মুখের চেহারা বদলায়, মতেরও পরিবর্তন ঘটে। স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, এখানে স্থান হবে না।

মণি বিরক্ত হয়। বেরিয়ে আসার পথে তখন নজর পড়ে, বাইরের দিকে ওরই মধ্যে একটু বড় ঘরে টেবিল চেয়ার পাতা, কয়েকজন খদ্দের বসে—টেবিল সাজানো বোতল গেলাস! হোটেলকর্ত্রী এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে খুব হাসি-ঠাট্টা সুরু করে, আমাদেরই উদ্দেশ্য করে কি না কি জানি!

ফিরে আসি টুরিস্ট অফিসারের ঘরে। তিনি সব শুনে মুচকে হাসেন, বলেন, ঐখানে গিয়ে ঢুকেছিলেন! এক কাজ করুন। এইদিকে শেরপাদের একটা হোটেল রয়েছে—নামও সুন্দর—অন্নপূর্ণা হোটেল। সেখানে জায়গা পেয়ে যেতে পারেন। ঘুরে দেখে আসুন। মালপত্র এখানে এখন থাক। কাল মুক্তিনাথের পথে সঙ্গে যাওয়ার পোর্টারের ব্যবস্থা কি করতে পারি আমি দেখছি।

সেই অন্নপূর্ণা হোটেলেই আমাদের রাত কাটানোর আয়োজন হয়ে যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। ভদ্র ব্যবহারও। ভাষাবিভ্রাটই কিছুটা অসুবিধা সৃষ্টি করে। ওরা হিন্দী জানে না, ইংরেজি তো নয়ই। আমরা তিব্বতী বুঝি না, নেপালীও নয়। অগত্যা পরিষ্কার বাঙলায় কথা বলি, হাত মুখ নেড়ে কি চাই-না-চাই বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, কাজও চলে যায় তাইতেই।

আগামী কাল সকালে আমরা মুক্তিনাথ রওনা হতে চাই। যাতায়াতে কেউ বলে ১৪০ মাইল, কারও মতে ১৫০। পথে কোথাও মাইল-পোস্ট নেই, নেপাল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই তীর্থযাত্রাপথে কোনও রকম ব্যবস্থাদিই নেই। পথে অনেকগুলি গ্রাম পড়ে, কিন্তু দু'চারটি বড় গ্রামে ছাড়া কোথাও দোকানপাটও নেই। তাই যাত্রীদের আশা ভরসা নির্ভরস্থল গ্রামবাসীদের সৌজন্য ও আতিথেয়তা। তাদের ছোট কুটিরে, কোথাও বা পাকাঘরে—আশ্রয় নেওয়া, তাদের দেওয়া ভাত-রুটি, তরি-তরকারী যা পাওয়া যায়, তাই খাওয়া। অবশ্য দাম দিয়ে। অর্থাৎ যেন 'পেয়িং-গেস্ট'। অতএব সঙ্গে কিছু আহার্যের সংস্থান বা রসদ নিয়ে চলা ভাল। পোর্টার ও গাইডের ব্যবস্থাও করতে হয় পোখরাতে। টুরিস্ট অফিসার বলেছেন, সাহায্য করবেন। তাই তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করতে চলি। তিনি জানান, "মুশকিল হচ্ছে, এখন দশেরার সময়—নেপালের সবচেয়ে বড় উৎসব—কাল আবার মহাষ্টমী, ঘর ছেড়ে এ-সময়ে কেউ বাইরে দূরে যেতে চায় না। তবুও, অনেক চেষ্টা করে চারজন নেপালী পোর্টারের ব্যবস্থা করেছি।" দলের সর্দার ভীমবাহাদুরকে তখনই ডেকে আলাপ করিয়ে দেন। সে কয়েকবারই মুক্তিনাথে গেছে। তা ছাড়া, রান্নার কাজও চালিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কাল তাদের পূজা সেরে রওনা হতে কিছু দেরি হবে—বেলা সাতটা বাজবে। উপায়ান্তর নেই। আমরা তাতেই রাজী। ঠিক থাকে, ধীরে সুস্থে আমরা হাঁটব। যাতায়াতে দিন সতেরো লাগতে পারে,—পোখরা থেকে পোখরায় ফেরা। তবে, দামোদর কুণ্ডে যাওয়ার ব্যবস্থা হলে আরও সপ্তাহখানেক দেরি হবে। পোর্টাররা নেবে, দৈনিক ১৪ (নেপালী টাকা), খাওয়ার খরচা তাদের নিজস্ব।

সে সময়ে ভারতীয় একশ টাকায়—নেপালী ১৬০ টাকা বিনিময় মূল্য ছিল।

পোখরা স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে। পাহাড়ের শিরোদেশে বিস্তীর্ণ শ্যামল উপত্যকা। মনেই হয় না পাহাড়ের উপরে রয়েছি। চারিপাশে বহুবিধ ফল-ফুলের তরুশ্রেণী। কয়েকটি সুন্দর হ্রদও আছে। তার মধ্যে ফিউয়া হ্রদটি সব চেয়ে বড়। এয়ারপোর্ট থেকে মাইলখানেক দূরে। কিন্তু, চোখ মন আকর্ষণ করে পোখরার উত্তরে দিগন্ত জুড়ে গগনস্পর্শী বিশাল গিরিশ্রেণী। অতিশুভ্র নির্মল তুষার আবৃত সারি সারি শিখরাবলী। ঘননীল আকাশে অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি ছড়ায়। পশ্চিমপ্রান্তে ধবলগিরির অংশ, পূর্বপ্রান্তে মানসল, গণেশ হিমল ও ল্যাঙটাঙ। মাঝখানে—অন্নপূর্ণা (সাউথ) অন্নপূর্ণা-১ মচ্ছপুছারে, অন্নপূর্ণা-৩,-৪,-২, ও লামজুঙ হিমল। সব চেয়ে নিকটে মচ্ছপুছারে শিখর—২২,৯৫৮ ফুট উঁচু। শুচিশুভ্র বসনে অবগুণ্ঠিতা পরমা সুন্দরী জননী যেন শ্যামাঙ্গী পোখরা শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। রৌদ্রদীপ্ত তুষারচূড়া মায়ের মুখের প্রসন্ন হাস্য।

এই গিরিশ্রেণীর আকৃতিরও এক বৈশিষ্ট্য আছে। মৎপুচ্ছ থেকে মচ্ছপুছারে নামের উৎপত্তি। মাছের

লেজের মতনই এর আকার। আকাশের নীলসাগরে যেন ভাসমান বিশালকায় মৎস্য। এই দৃশ্যের সেখানেও শেষ নয়। ফিউয়া হ্রদের জলে মচ্ছপুছারের প্রতিচ্ছায়া পড়ে। গগনের মাছ ঝাঁপিয়ে ধরা দেয় ধরার হ্রদে। নীল সরোবরে বাতাসে তরঙ্গ তোলে, মাছও যেন জলকেলি করে। অপূর্ব দেখায়।

এখন অবশ্য সে-দৃশ্য দেখার সুযোগ হয় না। মুক্তিনাথ যাত্রা সাঙ্গ করে ফিরে এসে পোখরায় দুদিন কাটাই, পোখরার এই রমণীয় সৌন্দর্য উপভোগও করি।

এখন যাত্রার পূর্বে পোখরার উত্তর দিগন্তব্যাপী সুদীর্ঘ তুষারগিরি মালার অপরূপ শোভা বিমুগ্ধ নয়নে দেখি, উদীয়মান সূর্যের প্রথম আলোকপাতে স্নিগ্ধসমুজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি, কিছু পরেই তারই আবার রৌদ্রদীপ্ত রৌপ্যবর্ণ।

হিমালয়ের কোলে পোখরা এক অপরূপা সুন্দরী নগরী।

১৯৬৫ সাল। ৪ঠা অক্টোবর।

সকালে মালপত্র গুছিয়ে পোর্টারদের অপেক্ষায় থাকি। আটটার পর তারা আসে। কিন্তু, সংখ্যায় একজন কম। ভীমবাহাদুর জানায়, সে-পোর্টারও আসবার জন্য তৈরি ছিল, তার বৌ তাকে আটকে দিয়েছে—মহাষ্টমীর দিন বাড়ি ছেড়ে যেতে দেবে না।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে ভীম আর একজনকে জোগাড় করে। কিন্তু তাকেও ঘরে গিয়ে কাপড় কম্বল আনতে হবে, কদিনের জন্যে বাইরে চলেছে—বাড়িতে জানানো দরকার। ভাবি, ঘরে তারও তো বৌ আছে, সেও যদি আবার আটকে পড়ে? ভীমবাহাদুর জানায়, আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে ওর জিনিসপত্র আনব। আপনারা ততক্ষণ বাজারের নিকট অপেক্ষা করবেন।

এইভাবে বাধা পেয়ে আমাদের যাত্রা করতে বেলা নটা বেজে যায়।

শহরের বাইরে এদিকটায় লোকবসতি কম। পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলেছি তাও মনে হয় না। সমতল পথ। দু-পাশে কোথাও ক্ষেতভূমি, কোথাও বা গাছপালা ঘেরা ক্ষুদ্র পল্লী। সামনে আকাশে মাথা তুলে মচ্ছপুছারের তুষার গিরিশ্রেণী,—সকালের রোদে ঝলমল করে। হিমালয়ের পথে পথচলার প্রারম্ভে সেই তুষারদীপ্তি মনে নবীন উৎসাহের দীপশিখা জ্বালায়। দেখি, গ্রামের বাড়িগুলি থেকে মেয়ে-পুরুষ বেরিয়ে আসে, দলে দলে এগিয়ে চলে শহর অভিমুখে। দশেরা উৎসব,—সবাই চলেছে মন্দিরে পূজা দিতে। পরনে রঙিন বেশভূষা। হাতে পূজার ডালি—ফল-ফুল, নৈবেদ্য, মেয়েদের অঙ্গভরা অলঙ্কার। মুখে চোখে আনন্দের আলো। যাত্রার শুরুতে এই সুপবিত্র শুভদৃশ্য মনে স্নিগ্ধ প্রসন্নতা আনে।

মাইল দুয়েক যাবার পর পথের দুপাশে বাড়িঘর আরম্ভ হয়। দৃশ্যপটেরও পরিবর্তন ঘটে। বড় বড় দোতলা তিনতলা বাড়ি। পাথর বিছানো পথ। যেমন লোক চলাচল করে, তেমনি গরুর দলও নির্বিবাদে ঘোরে। পথের মাঝখানে ছোট মন্দির। পথ জড়ে পূজার্থীদের ভিড়। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পথের উপরকার দৃশ্য দেখে শিউরে উঠি। দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান—মহিষ, ভেড়া, ছাগল। রক্তগঙ্গা যে প্রকৃতই পথ বেয়ে বইতে পারে, তার ধারণা ছিল না। মন্দিরের সামনে থেকে রক্তের থকথকে বিভিন্ন ধারা বয়ে আসে—পথের একপাশে থেকে অপর পাশে! যেন, রক্তবর্ণ বিষাক্ত সরীসৃপ লকলকে জিব বার করে সরসর করে চলেছে। কোন রকমে পাশ কেটে লাফিয়ে সেই রক্তধারাগুলি পার হই। সারা অঙ্গ ঘিনঘিন করে ওঠে।

হিমালয়ের বুকে সহস্র ঝরনাধারার অপরূপ সৌন্দর্য মন ভরে দেখেছি। কিন্তু মানুষের কৃতকর্মের ফলে এ কী বীভৎস দৃশ্য। পথে এগিয়ে যেতে যেখানেই মন্দির সেখানেই আজ এই রক্ত নদীর প্রবাহ পথ পঙ্কিল করে। তাড়াতাড়ি শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে মন উদ্‌গ্রীব হয়। কিন্তু, ভীমবাহাদুরদের জন্য অপেক্ষা না করে উপায় নেই। মন্দির এড়িয়ে বাজারের নিকটে এক কবিরাজের ভেষজশালার সমুখে রোয়াকে সকলে বসি। বেলা বাড়ে, তবুও তাদের দেখা নাই। যাত্রার শুরুতেই এই বিলম্ব মনে বিরক্তি জন্মায়। ভাবি স্বল্প মাল নিয়ে আপন আপন বোঝা নিজে বহে চলার শিক্ষা, অভ্যাস ও সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই এই পরনির্ভরতা,—অতএব দুর্ভোগও।

ঐ বুঝি আসে ঐ যেন দেখা যাচ্ছে—করতে করতে একঘণ্টা কেটে যায়। অবশেষে, সত্যই তারা আসে। আমাদের পথচলাও আবার শুরু হয়। বেলা এগারোটা বেজে গেছে। আজ দুপুরে আর রান্নার

পাট বসানো চলবে না। এখান থেকেই মিষ্টি কেনা হয়, পথে কোথাও চা পেলে, তারই সঙ্গে খাওয়া যাবে।

হোটেল থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ পার হয়ে এলে শহরের বাজার এলাকা শেষ হয়। আমাদের অবশ্য দু'ঘণ্টা কেটে গেছে।

রাস্তা এবার সামান্য নেমে যায়। পথের নিকটে শাইনিং হসপিটাল ও একটা বড় মাল্টিপারপাস বিদ্যালয়। ডানদিকে মাঠের কোলে পাহাড়ী নদী Yamdi Khola। কিছুদুর যাওয়ার পর পথ ছেড়ে নদীর ধারে নামতে হয়—একটা নড়বড়ে কাঠের মই-সিঁড়ি বেয়ে। নদীর উপর ভাঙা পুল। পাথরের উপর পা রেখে ডিঙিয়ে নদী পার হওয়া। ওপারে পৌঁছে গ্রাম—লোয়ার হুন্‌জা বা হিয়াংজা। নেপালী বসতি। পথ সামান্য চড়াই উঠে আবার সমতল ক্ষেত্রে আসে। বিস্তীর্ণ চাষের জমি। আবার লোকবসতি,—বড় বড় সামিয়ানা, তাঁবু ছোট ছোট ঘর। বাসিন্দারা নেপালী নয়। তিব্বতী শরণার্থীদের আস্তানা—কলোনি। আমেরিকানদের অর্থসাহায্যে তৈরি। তিব্বতীদের হস্তশিল্পকর্মকেন্দ্র। জায়গায় নাম হয়েছে তিব্বতীয় হুন্‌জা। প্রায় ৩,৫০০ ফুট উঁচুতে। পোখরা বাজার থেকে প্রায় ঘণ্টাদেড়েকের পথ। দুপুর প্রায় একটা বাজে। সেইখানেই একটা তাঁবুর মধ্যে হোটেলে বসে দুপুরের আহারপর্ব শেষ করা গেল—অর্থাৎ শুধু চা ও মিঠাই। তবে এই সুযোগে প্রথমদিনে পথ হাঁটার মাঝে ক্ষণিক বিশ্রাম লাভও হয়।

বেলা দুইটায় আবার পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া। অল্প চড়াই উঠে পুনরায় বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। নদীর ধারে লম্বা উপত্যকা। আধঘণ্টা যাওয়ার পর বেশ বড় গ্রাম—এর নামও হুন্‌জা, তবে আপার হুন্‌জা। এখানেও গ্রামের মন্দিরের সামনে পূজার্থীর ভিড়। মহিষ বলি হয়েছে, কুড়ুল দিয়ে কেটে মাংস ভাগ করা হচ্ছে। গ্রামের মধ্য দিয়ে সোজা লম্বা রাস্তা। পথের ধারে বড় বড় গাছ, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতপ্ত পথে স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করে বিরাজ করে,—নিকটেই জলের ধারাও। পথক্লান্ত পথিককে যেন প্রলোভন দেখিয়ে নিকটে ডাকে। আমরা সে-আহ্বানে সাড়া দিই না—এগিয়ে চলি। যাত্রা শুরু করতেই আজ বিলম্ব হয়েছে—যতদূর সম্ভব আজ একটানা এগিয়ে যাওয়াই উদ্দেশ্য।

লোকালয় ছাড়িয়ে আসি। চোখ ও মন যেন হাঁফ ছাড়ে—খাঁচায় বন্দী পাখি মুক্তি পায়। ইয়ামদি খোলার উন্মুক্ত প্রশস্ত উপত্যকা সুমুখে ছড়িয়ে পড়ে। ওপারে পাহাড়, এপারে পাহাড়,—মাঝখানে বালুকাকীর্ণ উপকূলবহুল নদীবক্ষের উদার বিস্তার। নদীর চরে ধানক্ষেত। ক্ষেতের পর ক্ষেত—যতদূর দৃষ্টি চলে। নদীর স্বচ্ছ নীল ধারা দিনের আলোয় ঝিকমিক করে, ধানক্ষেতের বুকেও বাতাসে তরঙ্গ তোলে। পথের পাশে ক্ষুদ্রাকার জলসেচন ধারা—ইরিগেশন ক্যানাল। নদীর মূলধারা থেকে খাল কেটে নিয়ে আসা। ভীমবাহাদুর প্রশ্ন করে, কোন্ পথ ধরে যেতে চান? নদীর চরে নেমে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আলপথ বেয়ে? কিংবা এই নালার ধারার পাশে যে পথ—তাই ধরে?

আমরা নালা ধরেই এগিয়ে চলি। আল বেয়ে চলতে গিয়ে ক্ষেতের মধ্যে কোথায় জলের ভিতর পড়ি,—দরকার কী?

হুন্‌জা ছাড়িয়ে ঘণ্টা দেড়েক যাবার পর ধানক্ষেতের প্রান্তে আবার এক গ্রাম। সুইকোট—৩,৬০০ ফুট। অর্থাৎ আজ সারাদিন প্রায় সমভূমি দিয়েই চলেছি। গ্রামের পাশে ছোট ময়দান। সেখানে নাগরদোলা বসানো হয়েছে। বালকবালিকাদের জটলা। প্রাণখোলা অনাবিল আনন্দ, তেমনি কুতূহলী উন্মাদনা। পথের পাশে আর এক জায়গায় কী-যেন কেন্দ্র করে মেয়ে ও পুরুষদের ভিড়। সাপ খেলানো, না, ভালুক নাচ? পাশ দিয়ে যেতে ঘাড় উঁচিয়ে দেখি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরাতে হয়।

বীভৎস দৃশ্য! বলি-দেওয়া মোষের ছাল ছাড়ানো চলেছে—দগ্‌দগে লাল মাংস প্রকাশ পাচ্ছে, দেহের কোন কোন অংশ কালো চামড়া ঢাকা মাটিতে রক্তধারা, লোকগুলোর রক্তমাখা হাত, দর্শকদের চোখে লোলুপ দৃষ্টি। একঝলকের দেখা মাত্র। তবুও কে যেন চোখে সুঁচ বেঁধায়, মনে কষাঘাত করে। মানুষ কী নৃশংস!—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যাই। গ্রামের মাঝামাঝি প্রকাণ্ড পিপল গাছ। গুঁড়ি ঘিরে বাঁধানো চত্বর, চৌতারা। মনোরম বিশ্রামস্থল। সেখানেও দু-তিনজন গ্রামবাসী কাকে ঘিরে বসে। এক বিদেশী পর্যটক রুক্‌স্যাক্ নামিয়ে রেখে বিশ্রাম নিচ্ছে। মণি দাঁড়িয়ে আলাপ করে। আমেরিকান। একাই চলেছে। কুলি দল নিয়ে। টুকুচে-শিখরে ওঠার বাসনা। এই পথেই কয়দিন পরে টুকুচে গ্রাম পড়বে। সেইখান থেকেই শিখর অভিযানের পথ। মণি আলাপ করতে থাকে। আমি আর দাঁড়াই না। ধীরে ধীরে

এগুতে থাকি। ভীমবাহাদুর জানিয়েছে, আধ মাইলটাক আরও যাবার পর নদীর অপর পারে যেতে হবে। তারপর ওদিকে যে পাহাড় তারই গা বেয়ে পথ—মাইলখানেকের চড়াই উঠে নৌডাণ্ডা। সেইখানে আজ রাত কাটানো।

একা একা আপন-মনে চলার অসীম আনন্দ। ডানদিকে পাহাড়, বাঁ পাশে নদী। সমতল পথ। চারিদিক নিস্তব্ধ। বিকাল বেলা, ধীরে ধীরে পা ফেলে চলি। হিমালয়ের পথে পথ চলার অপূর্ব পরিতৃপ্তি মন ভরে রাখে। দেখতে দেখতে আধ মাইল পথ শেষ হয়। রাস্তা নেমে যায় নদীর বুকে—বালুচরে। অগভীর জলধারা। পারাপারের পুল নেই। জুতা মোজা খুলে হাতে নিই। খালি পায়ে ছপছপ করে জল পার হই।

কিছুক্ষণ থেকে মেঘ করে এসেছে, এখন ঘনঘটা হয়ে আসে। ওপারে পৌঁছুতেই বৃষ্টি নামে। পথের ধারে কুঁড়ে ঘরে দোকান। সেইখানে ঢুকে বেঞ্চে বসে পা মুছে আবার জুতা মোজা পরি, বৃষ্টিও থেমে যায়। সুমুখে চড়াই। বেলা পড়ে এসেছে। আকাশেও মেঘ জমেছে। তখনই রওনা হই, দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে নিই, নৌডাণ্ডা কতদূর?—সে বলে, মাইলখানেক মাত্র—এই পাহাড়ের মাথায়।

ধীরে ধীরে চড়াইপথে উঠতে থাকি। বনের মধ্যে দিয়ে পথ, অনবরত উঠেই চলে। যাত্রার প্রথম দিনে পথ হাঁটা। অনভ্যাসের জড়তা ও পথচলার ক্লান্তি স্বচ্ছন্দ গতির অন্তরায় ঘটায়। তার উপর, আজ সারাদিন সোজা পথে আসার আরাম দিনশেষে চড়াইপথের দুরূহতাকে যেন দ্বিগুণ করে তোলে। ভাবি, এক মাইল মাত্র পথ, এখনই পৌঁছে যাব। ঐ তো উপরে গাছের ফাঁকে বাড়ি দেখা যায়। উৎসাহভরে পথটুকু শেষ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। চারপাশে তাকাই। ভীমবাহাদুররা তো অনেকক্ষণ আগে এগিয়ে এসেছে,—কোথায় উঠল? এক গ্রামবাসীকে দেখে জিজ্ঞাসা করি,—নৌডাণ্ডা?—সে মাথা নেড়ে জানায়, —না। হাত তুলে দেখায়—পাহাড়ের আরও উপরে—ঐ ওধারে।

আবার চলা। আরও চড়াই। আবার গ্রাম। ভাবি, এবার নিশ্চয় এটা নৌডাণ্ডা।

আশান্বিত হয়ে পুনরায় খোঁজ নিই, আবার নিরাশ হতে হয়। ভাবি, এক মাইল কি এতই দীর্ঘ! এ যে শেষই হয় না। এইভাবে আরও দু'একটা গ্রাম পার হয়ে অবশেষে নৌডাণ্ডা পৌঁছাই। ৪,৭৮২ ফুট উঁচুতে। সুইকোট থেকে আসতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে। পোখরা থেকে মাইল এগারো।

গ্রামে প্রবেশ করে ভীমবাহাদুরদের দেখতে পাই। স্কুলবাড়িতে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করেছে। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামে। বাইরে সন্ধ্যার ছায়া যেন মধ্যরাত্রের ঘন অন্ধকারের রূপ নেয়। ভাবনা হয় সঙ্গীদের জন্য। এই দুর্যোগের মধ্যে অন্ধকারে সেই অজানা বনের পথে পথ চিনে আসবে কি করে? তার উপর এমন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত। পথও নিশ্চয় পিচ্ছিল হয়ে গেছে। ভীমবাহাদুর ও অপর ভারবাহকরা, সবাই চলে এসেছে,—পথ দেখিয়ে সঙ্গে আনার লোকও কেউ নেই। ভীমবাহাদুরকে বলি, তোমরা জনদুই লণ্ঠন, ছাতি, লাঠি নিয়ে পথ ধরে ফিরে যাও এখনই। সঙ্গে করে সাবধানে নিয়ে এস।

বলামাত্র তারা অবিলম্বে রওনা হয়। উদ্বিগ্ন আমি অপেক্ষা করি। টেবিল ও বেঞ্চগুলি সরিয়ে পাশাপাশি রেখে চৌকির মত সাজিয়ে রাখাই। ফরাসের মত বিছানা পাতানো হয়—তাঁরা এসেই যাতে বিশ্রাম নিতে পারেন।

কিছুক্ষণ পরেই সঙ্গীদের সাড়াশব্দ পাওয়া যায়। বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে হাজির হন। অন্ধকার বনপথে আসতে যথেষ্ট হয়রানি ভোগ হয়েছে। বেঞ্চে এসে ভিজা জুতা মোজা খোলেন। হঠাৎ নজর পড়ে তাঁদের পায়ের দিকে—ওকি! অত রক্ত। কোথাও পাথরে আঘাত লেগে কেটেছে নিশ্চয়? কিন্তু, একজনের নয় —সবারই!

আমারও পায়ের দিকে এতক্ষণ দৃষ্টি দিই নি, তাঁরাই দেখান, ঐ যে আপনার বিছানাপত্র রক্তে লাল হয়ে গেছে। ভারবাহকরা এসে সকলে পায়ের জোঁক ছাড়াতে বসে। তারাও আক্রান্ত হয়েছে দেখা যায়। মনে পড়ে, সকালে ও দুপুরে বলির সেই রক্তাক্ত দৃশ্য। মানুষের হাতে সেখানে নিরীহ জীবের হত্যা, আর এখানে এখন রক্তপায়ী জলৌকাবাহিনীর মানুষের দেহের রক্তপান।

প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ নয়। খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক গড়ে তুলে জগতের সৃষ্টিরক্ষার রাজকার্য চলে!

পরদিন। ভোর হতেই আবার পথিক জীবনের দৈনন্দিন কার্যাবলী শুরু হয়। সাড়ে চারটায় শয্যাত্যাগ করি। মালপত্র বাঁধি। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে প্রস্তুত হই। বন্ধুকেও ডাক দিতেই ওঠে। মণিরা ক্ষণিক

গড়িমসি করে, তারপরেই দেহের জড়তা দূর করে তৈরি হয়।

ঘরের বাইরে বার হয়ে দেখা যায়, বৃষ্টি নেই, কিন্তু চারদিক ঘন কুয়াশায় ছেয়ে আছে। শুনেছিলাম, এখান থেকে চারিপাশে দৃশ্য অপরূপ। এখন যাবার সময় দেখতে না পেলেও মুক্তিনাথ থেকে ফেরবার পথে সে-দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ হয়। পাহাড়ের এই মাথার উপর থেকে দেখা যায় দক্ষিণদিকে বহুনীচে পোখরার উপত্যকা, যেন সবুজ গালিচা বিছানো, তারই মাঝে ছোট ছোট বাড়ি ঘর যেন ফুলকাটা নক্‌শা করা, একধারে ফিউয়া হ্রদের স্বচ্ছ জলপুঞ্জ যেন প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম আঁকা। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নৌডাণ্ডার অপর দিকে তাকালে দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে। সেদিকে গগনস্পর্শী বিশাল তুষারশৃঙ্গরাজি অন্নপূর্ণা হিমল, মচ্ছপুছারে। যেন সস্নেহ দৃষ্টি মেলে ডাকতে থাকে। ঐ গিরিশ্রেণীর প্রাকারের অপর দিকে মুক্তিনাথ। তাই মানচিত্রে দেখা যায় পোখরার উত্তরে মুক্তিনাথের অবস্থান। আমাদের পথ কিন্তু এখন চলেছে পশ্চিমমুখী। এইভাবেই চলবে দিনচারেক। কয়টি গিরিশ্রেণী পার হয়ে পৌছুব কালীগণ্ডকী নদীর ধারে। সেই নদী মুক্তিনাথ অঞ্চল থেকে নেমে আসে দক্ষিণবাহিনী হয়ে। কালীগণ্ডকী হবেন আমাদের পথ-প্রদর্শিকা,—তারই উপত্যকা ধরে পথও তখন হবে উত্তরমুখী।

আপাতত নৌডাণ্ডার পাহাড়ের মাথায় গিরিশিরা দিয়ে পশ্চিমমুখে চলা। গ্রাম ছাড়িয়ে এসে ভিন্নমুখী তিনটি পথ। ডানদিকের রাস্তা গেছে গ্রামের ভিতর। বাঁদিকের পথ বাদলুণ্ড যায়। মধ্যিখানের পথ ধরে আমাদের এগিয়ে যাওয়া। পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে গেলেও মাঝে মাঝে সামান্য চড়াই। এইভাবেই পথ উঠে যায় প্রায়, ৫, ৬০০ ফুট-এ।

মাটিভরা পথ। গতরাত্রের বৃষ্টিপাতে পিচ্ছিল। মাঝে মাঝে মাঠের মধ্যে অল্প জলও জমে রয়েছে ডোবার মতন। কোথাও বা পথের ধারের পাথর-বাঁধানো চবুতর। যাত্রীদের ক্ষণিক বিশ্রাম স্থান। ছোট ছোট দু'একটা গ্রামও আসে। গ্রামবাসীদের কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলেই বিদেশী দেখে প্রশ্ন করে,—ঘর কাঁহা! কৌ যাঁউ?—আমরাও হাসিমুখে উত্তর দিই,—কোল্‌কাত্‌তা!—সামনে হাত তুলে দেখিয়ে বলি,—মুক্তিনাথ।

নৌডাণ্ডা থেকে ঘণ্টাদেড়েক গিয়ে খারে গ্রাম (৫,৪০০ ফুট)। এক বিদেশিনী মহিলা চায়ের দোকানের সুমুখে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। পাশে রাখা রঙিন রুক্‌স্যাক্‌।

এগিয়ে চলি। পথ এবার পাহাড়ের এপাশ দিয়ে নামতে থাকে। এদিকের পাহাড়ের গায়ে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় —সাবট্রপিকাল বনাঞ্চল। পথের বাঁদিকে একটা ছোট পাহাড়ী নদী, জঙ্গল ভেদ করে ধাপে ধাপে শিলাকীর্ণ পথে নেমে চলে। পথও তার সঙ্গ ধরে। কিছুদূর নামার পর ছোট উপত্যকা। পার হয়ে এসে সামনের পাহাড়ের গা দিয়ে পথ সোজা এগিয়ে যায়। পাহাড়ের উপর থেকে একজায়গায় ধস্‌ নেমেছে —ধসে-পড়া পাথর বালি, মাটির মাঝ দিয়ে ঝরনার ধারা নৃত্যভঙ্গে নেমে চলে। সাবধানে ভাঙাপথটুকু পার হতে হয়। গেরুয়াবাস এক সাধু অপরদিক থেকে আসেন দেখি। কাছে এলে তিনিও দাঁড়ান, আমিও দাঁড়াই। হিন্দীতে প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে আসছি, কোথায় চলেছি। তাঁরও কিছু পরিচয় পাই। নেপালী শরীর। হৃষিকেশে ও বারাণসীতে কয়েকবছর কাটিয়েছেন। এখন আসন পেতেছেন পোখরায়। মুক্তিনাথ-অঞ্চলে পূর্বাশ্রম ছিল। প্রতিবছরেই মুক্তিনাথ দর্শনে আসেন। এবারও দর্শন করে ফিরছেন। পথে কয়েকজন গ্রামবাসীদের নাম দিলে,—যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়। ধন্যবাদ জানিয়ে অভিবাদন করে আবার যে যার পথ ধরি।

অল্প এগোতেই লুম্‌লে গ্রাম (৫,১০০ ফুট)। খারে প্রায় শ'তিনেক ফুট নীচে। আসতে সময় লেগেছে প্রায় ঘণ্টাখানেক। ভাবি, এক ঘণ্টা! কখন কেটে গেল কোথা দিয়ে। ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা সময়, মন তার খবরও রাখে না। হিমালয়ে পথে চলতে পা চলে, সময় যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ-যেন ট্রেনে বসে জানলা দিয়ে আপন মনে তাকিয়ে থাকা।—গাছপালা মাঠ সব যেন বাইরে ছুটছে, গ্রামের পর গ্রামও আসে, ছুটে চলে যায়—দূর থেকে দূরান্তরে,—আর আমি যেন স্থানকালের উর্ধ্বে স্থির হয়ে বসে রয়েছি—অনাদি অনন্তকাল থেকে।

এখানেও লুম্‌লে গ্রাম পিছনে পড়ে থাকে। আপনমনে বিভোর হয়ে এগিয়ে চলি। আবার পথের পাশে গ্রাম আসে। দু'তিনটে মাত্র চালাঘর। বন্ধুর ডাক শুনে ফিরে তাকাই। দেখি, দোকানে বসে চা খাচ্ছে। বলে, মামা, আসুন, চা খেয়ে যান।—দোকানের কর্ত্রীকে বলে, দিদি, আর এক গ্লাস চা। পেছনে

আরও দুই সঙ্গী আসছেন—তাঁদের মধ্যে শুধু মাই-জি চা খান—তার দামও রেখে দিন।

গ্রামের নাম শুনি চন্দ্রকোট (৫,১২৫ ফুট)। লুম্‌লে থেকে সমতল সোজা পথ, আধ ঘণ্টা লাগে আসতে। এখান থেকে অন্নপূর্ণা ও মচ্ছপুছারের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়।

বন্ধু বলে, চলুন, আমরা এগিয়ে যাই। পথ এবার ঐ নেমে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। সেই উৎরাই পথে নামতে থাকি। ঘন বন বড় বড় চির ও পাইন গাছ। তারই ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে তুষারশিখরগুলি উঁকি মারে। ছায়াশীতল পথে হুড়হুড় করে নেমে যেতে উৎসাহ জাগে। পথ কোথাও এঁকে বেঁকে পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে নামে, কোথাও আবার পাথর কেটে বা সাজিয়ে সিঁড়ির মত ধাপ—সরাসরি নেমে যাওয়া। ঘণ্টাখানেক নামার পর মোদীখোলা নদীর ধারে পৌঁছুই। অপর পারে বড় গ্রাম। নদীর কূলে বাড়িঘর আঁকা ছবির মত দেখায়। বাম তীর ধরে খানিক এগিয়ে গিয়ে পারাপারের ঝোলা পুল। পার হয়ে গ্রামে প্রবেশ করি। নাম শুনি, বীরথাটে (৩,৪০০ ফুট)। অর্থাৎ চন্দ্রকোট থেকে ১,৭০০ ফুট নেমে আসা। গ্রামের আর এক প্রান্তে ভুরুংডিখোলা নদীর সঙ্গে মোদীখোলার সঙ্গম। নদীর ঠিক উপরে স্কুলগৃহে আশ্রয় নেওয়া হয়। গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর এসে আলাপ জমান। তাঁদের মধ্যে একজন কলকাতায় এসেছিলেন, উৎসুক হয়ে তিনি প্রশ্ন করেন, আপনারা এলেন কি করে গঙ্গা পার হয়ে? পাকিস্তান বেতার খবর প্রচার করেছে, হাওড়ার পুল বোমা বর্ষণে তারা উড়িয়ে দিয়েছে।

হেসে বলি, ও-সব যুদ্ধকালীন মিথ্যাগুজবের অপপ্রচার। বোমাও পড়েনি, পুলও ভাঙেনি। বিশ্রাম নিয়ে মোদীখোলায় স্নান করতে নামি। এই মোদীখোলা নদীর উপত্যকা দিয়ে অন্নপূর্ণা অভিযানের মূল শিবির—বেস ক্যাম্পে যাওয়ার পথ। নদীর জল যেমন পরিষ্কার তেমনি তুষীরশীতল। জলে নামতেই গায়ে কাঁপন জাগে। তারপরই দেহে কী পরম তৃপ্তিবোধ! জলের ধারে শিলাখণ্ডের উপর বসে গায়ে পায়ে সাবান লাগাই, জলে নেমে অবগাহন করি। সাবানের ফেনা চকিতে জলের স্রোতে ভেসে গিয়ে কেমন মিশে যায়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। মনেও এক স্নিগ্ধ পবিত্র ভাব জাগে। মনে পড়ে যায়, R.L. Stevenson-এর সেই প্রসিদ্ধ ভ্রমণকাব্য Travels with a Donkey in the Cenvennes-এ পাহাড়ী নদীর জলে স্নানের বর্ণনা :

"To wash in one of God's rivers in the open air seems to me a sort of cheerful solemnity or semi-pagan act of worship."

দুপুরের আহার সেরে তাড়াতাড়ি যাত্রা করতে হয়। ভীমবাহাদুর জানিয়েছে, কাল উলেরির বড় চড়াই, প্রায় সাত হাজার ফুট-এ উঠতে হবে। আজ এখন পথ প্রায় সোজা চলে গেছে তাই অন্তত সুদামে গ্রাম পর্যন্ত এগিয়ে রাত কাটাতে হবে। কাল সকালে তাহলে চড়াই উঠতে তেমন কষ্টবোধ হবে না।

মোদীখোলা ছেড়ে এসে ভুরুণ্ডীখোলার বামতীর ধরে পথ। পাহাড়ের গা বেয়ে কখনও অল্প উপরে ওঠে, আবার নদীর ধারে নামে। পাহাড়ীপথে সাধারণ মামুলি চড়াই উৎরাই। বড় বড় গাছের বন, তারই মধ্যে দিয়ে পথ। এক জায়গায় পথ দুভাগে ভাগ হয়—একটা নেমে যায় নদীর বুকে, শুকনা বালুচরের উপর দিয়ে এগিয়ে চলে। ভারবাহকরা সেই পথ ধরে। আমরা চলি বনপথ দিয়ে। সেপথও কিছু পরে নদীর ধারে নেমে জলের পাশ দিয়ে যায়। হঠাৎ আকাশে ঘনঘটা করে মেঘ দেখা দেয়। টিপটিপ করে বৃষ্টিও শুরু হয়। গুরুগুরু মেঘ গর্জন ওঠে। পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলে। প্রবল বর্ষণের উপক্রম দেখা যায়। মনে দুশ্চিন্তা জাগে, নিজেরা তো ভিজবই, বিছানাপত্রও ভিজে একসা হবে। ভারবাহকরাও মেঘ দেখে নদীর চরের পথ ছেড়ে নিকটে চলে আসে। ভীমবাহাদুর এগিয়ে এসে বলে, তাড়াতাড়ি চলুন, নদীর ধারে ঐ গ্রামের কোন বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া যাক—জোর বর্ষা নামছে।

গ্রাম পর্যন্ত যাওয়ার সময় থাকে না। পথের অদূরে একটা ছোট চালাঘর। তারই ভিতর ত্বরিতপদে প্রবেশ করি। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিও নামে।

এই জলের মধ্যে আজ আর এগুনোর সময় ও উৎসাহ থাকে না। এই ঘরের মধ্যেই রাত্রি বাসের ব্যবস্থা হয়। নেপালী গৃহকর্ত্রী থাকতে দিতে রাজী।

বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ে। এখন আশ্রয় পেয়ে মনে হয় ভাবনা নেই। বাইরের বৃষ্টির ধ্বনি, মেঘের গর্জন মনে পুলকলহরী তোলে।

একখানা ছোট্ট ঘর নিয়ে বাড়ি। তারই মধ্যে গৃহস্থের সপরিবার বাস—শোয়া, খাওয়া, থাকা, সংসার

পাতা। দরজার নিকটে একটু জায়গা পরিষ্কার করে আমরা মালপত্র রাখি, শয্যা পাতি। জলের ছাট এসে ঘরের মধ্যে ঢোকে, ছাদ ভেদ করেও দু'এক জায়গায় জল পড়ে। উপায় নেই।

মণি ভীমবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে গ্রামের নাম কী?—সে বলে, লাম্‌ভারে।

মণি হেসে বলে, বুঝেছি,—নামভাড়ালি!

ঘরখানি ছোট হলেও পরিচ্ছন্ন। একপাশে কাঠের তাকে সাজানো বাসনপত্র। ঘরের মাঝখানে মেঝেতে উনুন। আগুন জ্বলছে। উনুনের কিছু উপর দিকে ঘরের ছাদ থেকে টাঙানো কয়েকটা লোহার সিক। তাতে সারি সারি কাঁচা মাংস ঝোলানো। নীচে উনান জ্বলে—ওপরে মাংস ঝলসে শুকায়। আমাদের শয্যা পাততে হয়েছে উনানের নিকটে। উঠে দাঁড়াতে গেলেই মাথায় মাংস ঠেকে,—গা ঘিনঘিন করে ওঠে। সেই উনানেই আমাদেরও রান্না চাপে। বাড়ির দুটি ছেলেমেয়ে এই জলেও কোথায় বাইরে ছিল, ভিজে নেয়ে তারা ঘরে ঢোকে। শুধু তারাই নয়—সঙ্গে একটা মোষের বাচ্চাও। আমাদের বিছানা থেকে হাত পাঁচ ছয় দূরে সেটাকে একটা খুঁটিতে বেঁধে বসিয়ে রাখে। ভক্তি বলে, ও-ও আমাদের সারারাতের সঙ্গী!

বঙ্কু বলে ওঠে, মামা, শুধু ও একাই নয়,—ঐ দেখুন প্যাঁক প্যাঁক করে ঢুকছে হাঁসের দল। ঘরে ঢুকেই তারা ডানা ঝাপটে গায়ের জল ঝাড়ে।

মণি চেঁচিয়ে ওঠে, ভীমবাহাদুর! ওগুলোকে একটু ও-পাশে তাড়িয়ে সরিয়ে দাও, বাবা। বিছানা যে! ভক্তি বলে, ঐ দেখুন, ঐ আবার কারা ঢুকছে!—এবার কোঁকর কোঁক করতে করতে মুরগির দল। যাক —ছেলেমেয়ে দুটো তাদের ধরে একটা ঝুড়ির ভিতর পুরে ঢাকা দেয়।

মণি বলে, এযে দেখি, Noah's ark হতে চলল। আরও অন্য জীবজন্তুও আসবে নাকি?

নাঃ। আর কিছু আসে না। শুধু গৃহস্বামী আসেন। আর মাঝরাতে গায়ের উপর দিয়ে কয়েকটা ইঁদুরের ক্রমান্বয়ে যাতায়াত চলে। ওদিকে বাইরে বৃষ্টি চলতে থাকে। আমরাও খাওয়া দাওয়া সেরে,— সেই মোষের বাচ্চা মুরগি ও হাঁসের সঙ্গে খানিক ঘুমিয়ে খানিক জেগে রাত কাটিয়ে দিই। মোষের বাচ্চাটা কোন উৎপাত করে না, শুধু একটা বোটকা গন্ধের উৎস হয়ে থাকে, কিন্তু হাঁস ও মুরগির দল সারারাত ছটফট করে, মাঝে মাঝে কুঁই কুঁই শব্দ করে।

আশ্চর্য মুরগির সময়নিষ্ঠা! ভোর হতেই ডাক ছাড়ে। বিছানা ছেড়ে বাইরে যাই, দেখে নিশ্চিন্ত হই, বৃষ্টি নেই। আকাশ মেঘশূন্য। দিনের আলো ফুটলে আবার সাজসজ্জা করে পথ চলা শুরু।

৬ই অক্টোবর। গত রাত্রের বিচিত্র পরিবেশের কথা মনে পড়ে। সেও যেমন ছায়াছবির মতন স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে, এখন চোখের উপর তেমনি সম্পূর্ণ বিপরীত আর এক চিত্র জগৎ দেখি। তখন ছিল জীবজন্তু নিয়ে প্রাণীজগৎ, এখন প্রকৃতির রূপরাজ্য। বাঁ দিকে সেই ভুরুণ্ডী নদীর উচ্ছল জলস্রোত —সুমুখের ঐ শৈলশ্রেণীর জটাজাল ভেদ করে নেমে আসে। নদীর অপর পারেও উত্তুঙ্গ গিরিপ্রাচীর, ঘন বনে ঘেরা সারা অঙ্গ। আজ সকালে এগিয়ে গিয়ে ঐ নদী পার হয়ে অপর পারের ঐ পাহাড়েরই উপর উঠে যাবে পথ। অজানা সেই পথের ডাকে সাড়া দিয়ে এখন এগিয়ে চলি এপারের পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে—ভুরুণ্ডির তীর ধরে। কিছুদূর যাবার পর সামান্য চড়াই। মাইলখানেক গিয়ে সুদামে গ্রাম। গতকাল রাত কাটানোর কথা ছিল এইখানে। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দু-তিনখানি বড় পাকা বাড়িও রয়েছে। গ্রাম থেকে বেরিয়ে এক ব্যক্তি পথ ধরেন।

আমাদের দেখে দাঁড়ান। সেই এক প্রশ্ন, কোথা থেকে আসছি, কোথায় চলেছি?—তিনি নিজে চলেছেন ভিন্নগ্রামে, পূজা-উৎসবে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে।

শুনে ভাবি, আর আমরা সেই পূজার সময়েই আত্মীয়স্বজন ছেড়ে চলে এসেছি হিমালয়ে—এই দূরদেশে! কত বিচিত্র মানুষের মন।

আবার কিছুদূর বনের মধ্যে দিয়ে পথ। তারপর পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। ধান, ভুট্টা, জোহার, রামদানা প্রভৃতি চাষ হয়। ক্ষেতের এক অংশে লালচে ফুল ধরে আলো করে আছে। রামদানা হয়ত। ক্ষেতের ধারে দু-খানা চালা ঘর। গ্রামের নাম হিল্‌লে (৪,৮০০ ফুট)। বঙ্কু দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়েছিল। এখন সেই ঘরের সুমুখে দাঁড়িয়ে। আমাদের ডাক দেয়, চলে আসুন, দিদির কাছে এখানে এক

গেলাস করে চা খেয়ে নেবেন—সামনেই তো চড়াই আসছে।

ঘরে ঢুকে উনুনের নিকটে বসে চা পান করি। দেখি, উনানের আগুন ও ছাই সরিয়ে দিদি কী-যেন বার করেন।

বন্ধু প্রশ্ন করে, কী ওগুলো?

আলু পোড়া!

বা! দেখি দেখি পাহাড়ে হাঁটার পথে চায়ের সঙ্গে গরম আলুপোড়া। চমৎকার জমবে। নুন নেই দিদি?

আছে বই কি। হাসিমুখে দিদি উঠে বার করে আনেন।

কিন্তু, একি। রক্তচক্ষু লবণ যে! লঙ্কাচূর্ণ মেশানো।

বন্ধু আলুতে তাই মাখিয়ে মুখে দেয়। বলে, বাঃ! এই তো অমৃত। খেয়ে দেখুন।

আমি বলি, আমার আলুনি আলুই অমৃত। এ-পথে লঙ্কা খেয়ে পেটে লঙ্কাকাণ্ড ঘটানোর কোনই লোভ নেই। ক'টা আলু হাতে দাও—খেতে খেতে এগিয়ে চলি।

ভাবি, স্থাল-কাল পরিবেশ ভেদে দ্রব্যগুণেরও কেমন তারতম্য ঘটে। এখানে আলুপোড়া খাওয়ার এমন উৎসাহ, আনন্দ ও তৃপ্তি, আর সভ্যসমাজে 'আলুপোড়া' কী-ই না কদর্থ!

সেই আলুপোড়া হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আবার পথে।

আধমাইলটাক যেতেই ডান দিকের পাহাড় থেকে একটা ঝরনা নেমে আসে—নীচে গিয়ে ভুরুণ্ডী নদীতে মেশে। সঙ্গমের নিকটে দু-তিনটে ঘর। ঝরনার উপর কাঠের পুল। পেরিয়ে গিয়ে বাঁদিকে ঘুরে ভুরুণ্ডীর উপরও বড় পুল। অপর পারে পৌছে চড়াই শুরু। ধীরে ধীরে পা ফেলে উঠতে থাকি। উঠছি তো উঠছিই। পাথর সাজানো সিঁড়ি। মাথা হেঁট করে সমানতালে, অতি ধীরগতিতে চলি। অযথা দ্রুত গিয়ে হাঁফিয়ে না পড়ি সেদিকে সজাগ থাকি। জানি, এতে পথচলা সহজ স্বাভাবিক হয়, পথের মাঝে থেকে থেকে বিশ্রাম নেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। আধঘণ্টার উপর এইভাবে একটানা উঠে, পথের বাঁকে একটা ঘর আসে। নিকটে ঝরনাধারা। এক বৃদ্ধ নেপালীকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, উলেরী?

উপর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলে,—ঐ তো ওখানে, এসে গেছে।

ভাবি, বাঃ! তবে আর কী! এইখানেই সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করি।

ঘরের একধারে কয়টা বড় শশা রাখা, পাশে পাত্রে দুধের মত ওটা কী?

টাটকা ঘোল! চমৎকার। বিশ্রাম নিয়ে তাই পান করি। কচি শশাও খাই। ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই মেটে। শুধু উদরপূর্তিই নয়, মনেরও কেমন পরিতৃপ্তি।

বৃদ্ধাকে জানাই, তিন সঙ্গী আসছেন পিছনে, তাদেরও খাওয়াতে হবে।

তাঁদের আসতে অনেকক্ষণ বিলম্ব হয়। ক্লান্ত হয়ে পৌছান, বসে বিশ্রাম নেন। আমিও আর দেরি না করে পথে নামি। এগিয়ে চলি। সামনের ঐ বাঁক ঘুরলেই নিশ্চয় উলেরী এসে যাবে। বাঁক আসে, পথ ঘোরে, আরও উপরপানে পথ ওঠে। কিন্তু, কোথায় উলেরী! তাহলে এবার ঐ সামনের বাঁক ঘুরলেই দেখা পাব। সে-বাঁকও আসে, কিন্তু উলেরী আসে না। অথচ, সেই বৃদ্ধ জানাল, চলে এসেছি! হিমালয়ে পথের দূরত্ব বোধের এমনি মতভেদ! স্থানীয় পাহাড়ীর চোখে,—এই তো এখানে! আর চড়াই পথের যাত্রীর কাছে, কই! কোথায়! আরও ক-ত-দূ-রে!

অবশেষে, পাহাড়ের গায়ে পাথর-বাঁধানো ঝরনাধারার মুখ দেখে মন আশ্বস্ত হয়, নিশ্চয় এবার পৌছে গেছি—ঐ তো গ্রামের দু-তিনটি মেয়ে ঘড়ায় জল ভরছে! মুখ ঘুরিয়ে তারা তাকায়, পরস্পরে কী বলাবলি করে। দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি, উলেরী? হাসিমুখে ঘাড় নাড়ে, আমারও মুখে হাসি ফোটে।

গ্রামের বাড়ি ঘর শুরু হয়। ভীমবাহাদুররা এখনও পৌছয় নি। রাস্তার ধারে একটা বাড়ির তিন দিক ঢাকা একপাশ-খোলা বারান্দায় এসে সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করি। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা পৌছানও। মালবাহকদের দেখা নেই। অনেকক্ষণ পরে ভীমবাহাদুর আসে বটে, কিন্তু একা। অথচ, অপর পোর্টারদের কাছে রান্নার মালপত্র। তারা না এলে রান্না চড়ানোর উপায় নেই। ভাবি, স্নানটা তো সেরে আসি। চলে যাই গ্রামে ঢোকার মুখে সেই বাঁধানো জলধারার নিকটে। ধারার মুখে পরিষ্কার জলের তোড়, কিন্তু বাঁধানো জায়গাটি নোঙরা, শ্যাওলা ও কাদায় পিচ্ছিল। গ্রামবাসীরা বাসনপত্র মাজে, তারই জঞ্জাল। মনে

পড়ে, গতকালের নদীতে অবগাহন স্নানের তৃপ্তি। এখানে কোন রকমে গা মাথা ধুয়ে চলে আসি।

মালপত্র তখনও পৌঁছয় না। এল অনেক বেলায়—ঘণ্টা দুই বাদে। এত দেরি কেন? কারণ দেখায়, নীচে কোন্ এক গ্রামে খাওয়াদাওয়া সেরে এল। অথচ, তাদের না আসার জন্যে আমরা যে অভুক্ত রয়েছি, সে-কথা তাদের মনে ওঠে নি। এখন আর বকাবকি করে লাভ নেই। ভীমবাহাদুরকে বলে দেওয়া হয়, খাওয়ার মালপত্র যে-বাহকের কাছে থাকবে প্রতিদিন যেন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, পেছিয়ে না পড়ে।

ভাগ্যক্রমে যে বাড়ির বারান্দায় আশ্রয় নেওয়া হয়েছে সেই গৃহের বুদ্ধিমতী গৃহিণী নিজেই আহারের কিছু ব্যবস্থা করে দেন। তাই দুপুরের খাওয়া আজ বিকালে সাঙ্গ হয়।

আজ আর এগোনো সম্ভব নয়। মণি ও ভক্তি বলে, ভালই হল। চড়াইটা উঠতে আজ বেশ ক্লান্তিবোধ হয়েছে, নিশ্চিন্তে এখানে বিশ্রাম নেওয়া যাক।

কিন্তু রাত কাটানো হবে কোথায়? এই একদিক খোলা বারান্দায়? উপায় তো নেই। খোঁজাখুঁজি করে অন্যত্র কোথাও স্থান মেলে নি। অগত্যা বারান্দায় সেই অনাবৃত দিক প্লাসটিক পর্দা টাঙিয়ে ঘরে পরিণত করা হয়। কিন্তু রুদ্ধ বাতাসে বসে বেলা কাটাতে মন চায় না। গ্রাম দেখতে বার হই। তখন নজর পড়ে গ্রামের অপর প্রান্তে স্কুলবাড়ি। দেখে ভাবি, খোঁজ করলে নিশ্চয় ওখানে থাকার জায়গা পাওয়া যেত। যাক্, এখন আর আপসোস করে লাভ নেই। হিমালয়ের পথে যখন যেখানে যেমন আশ্রয় মেলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকাই নিয়ম।

উলেরী উঁচু জায়গা। ৬,৮০০ ফুট। হিল্‌লে থেকে আসতে ঘণ্টা দুই-এর পথ। মুক্তিনাথ যাত্রাপথে এইটুকুই একমাত্র নামকরা বড় চড়াই। সে-চড়াই-এর এখানেই শেষ নয়। কাল আরও খানিক উঠতে হবে। তারপর এই গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে অপরদিকে আর এক নদীর উপত্যকায় নামা।

পর্বতের উচ্চদেশে পৌঁছুলে দূরস্থিত গিরিশিখরগুলির অবারিত মনোহর দৃশ্য দেখার আনন্দ লাভ হয়। এখান থেকেও অন্নপূর্ণার তুষারচূড়াগুলির উপর অস্তমান সূর্যের আরক্ত আভা নয়ন মুগ্ধ করে। আবার, পাহাড়ের নিম্নদেশে দৃষ্টি নামালে দেখা যায়, বহু নীচে ভুরুণ্ডী নদীর উপত্যকা, নদীর শীর্ণ রেখা, সবুজ বনময় পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে ক্ষেত, ছোট ছোট গ্রাম, আমাদের ফেলে আসা আঁকা-বাঁকা পথের আঁচড়-কাটা।

সন্ধ্যায় গান-বাজনার শব্দ ভেসে আসে। বন্ধু এসে খবর দেয়, ওদিকে গ্রামের মধ্যে নাচ হচ্ছে, দেখতে চলুন। সবাই মিলে যাই। আজ বিজয়া দশমী। দশেরার উৎসব। আশপাশের গ্রাম থেকে ছেলে-মেয়েরা সাজসজ্জা করে এখানে এসে মিলিত হয়েছে—গান বাজনা নাচের জলসা চলেছে। মেয়েদের গা-ভরা গহনা—রঙিন বেশভূষা। সমবেত কণ্ঠে গান চলেছে, কোমরে হাত দিয়ে নাচও হচ্ছে। কিন্তু, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার উৎসাহ থাকে না—সুরা বিতরণের প্রস্তুতি দেখে সরে আসা গেল নিজেদের আস্তানায়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত নিস্তব্ধ পাহাড়ে গান-বাজনার শব্দ শোনা যেতে লাগল।

৭ই অক্টোবর। সকালে আবার যাত্রা। গ্রাম ছাড়িয়ে এসে অল্প চড়াই। তারপরই বন শুরু। পথ সোজা চলে। চারিপাশে বড় বড় গাছ। কোথাও বা ঝোপঝাড়। মনে হয়, বনের মধ্যে কখনও আলো ঢোকে না। স্যাঁতসেঁতে ভাব—যেন বৃষ্টি হয়ে গেছে অল্প আগে। বনের মধ্যে মাঝে মাঝে কলকল শব্দ তুলে ঝরনার ধারা নেমে চলে। একমনে পথ ধরে চলেছি। হঠাৎ চমকে উঠি, পিছন থেকে এক যাত্রী দ্রুতগতিতে এসে পাশাপাশি চলতে থাকে। নেপালী, কিন্তু সাধারণ গ্রামবাসীর পোশাক নয়। পরনে হাফ্-প্যান্ট, খাকী শার্ট, পিঠে রুক্স্যাক্। হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করে, মুক্তিনাথ চলেছেন বুঝি? কোথা থেকে আসছেন?

পথ চলতে চলতে গল্প করি। তার পরিচয়ও পাই। হাঁ, এই অঞ্চলেই তার গ্রাম। শিখাতে। ভারতীয় সেনাবিভাগে কাজ করে। এখন আসাম থেকে আসছে। তিন বছর পর দেশে ফিরছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় কোনমতেই ছুটি মেলে নি, অথচ বাড়িতে মায়ের অসুখ বলে দেশে ফেরবার তাগাদা আসছিল বারংবার। অনেক চেষ্টার পর কিছুদিনের ছুটি পেয়ে এখন বাড়ি চলেছে। সে যে আজ ফিরছে বাড়ির কেউ খবর জানে না, কিন্তু পথের মাঝে সে দুঃসংবাদ জেনেছে, মায়ের মৃত্যু হয়েছে, তার একটি ছোট ভগিনীও মারা গেছে। তাই এতদিন পরে বাড়ি চলেছে, তবু মনে তার আনন্দ নেই, পা যেন চলতে গিয়ে পিছিয়ে আসছে, তবুও আজই সে বাড়ি পৌঁছুবেই। 'যাই বাবুজী, আপনি আসুন ধীরে ধীরে'—বলে

পা চালিয়ে এগিয়ে যায়।

জঙ্গলের পথে জোঁকের বেশ উপদ্রব। মাটি থেকে জুতো বেয়ে ওঠে, গাছের ডাল থেকে গায়ে জামার উপর পড়ে। সারাক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলি। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে সর্‌সর্‌ শব্দ শুনে চমকে উঠি। বিরাট গিরিগিটি—যেন কুমীরের ছানা। গাড়োয়ালের পথেও এই ধরনের বহুরূপী দেখা যায়। পথের একধার থেকে অপর পাশে ছুটে পালায়।

কিছুক্ষণ থেকে জলের তোড়ের শব্দ শোনা যায়। সামনে বোধ হয় ঝরনা আসছে। না, জলপ্রপাত নয়, পাহাড়ের গা দিয়ে পথ অল্প নামে, নীচে ছোট পাহাড়ী নদী। রাশি রাশি শিলাখণ্ডের অবরোধ অতিক্রম করে খরস্রোতে নেমে চলে। নদীর বুকে ও দুই তীরে কালো কালো প্রকাণ্ড বোলডারস্—গণ্ডশিলা; জলের ছিটা লেগে ভিজে আছে, কালো রঙ আরও কালো দেখায়। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে গহ্বর। যেন কালো মুখ হাঁ করা। দুই পাড়ের বড় বড় গাছ নদীর দিকে হেলে রয়েছে, কোথাও ডালপালা ভেঙে নদীর বুকেই পড়ে আছে। চারদিকের ছায়াপাতে জলের রঙও কালিবর্ণ। আশপাশ কেমন যেন আবছায়া অন্ধকার, ছমছমে ভাব, তারই মাঝ থেকে ওঠে জলস্রোতের অবিরল কলধ্বনি এবং পাথরে তার প্রতিধ্বনি।

নদীর উপর কাঠের পুল। পার হয়ে এসে ওপারে অল্প চড়াই উঠতেই প্রাণ যেন হাঁফ ছাড়ে। পাহাড়ের কোলে উন্মুক্ত ময়দান। সবুজ ঘাসে ছাওয়া। এখানে ওখানে ছড়ানো কয়েকটা বড় বড় পাথর। সকালের রোদ পড়ে চারিদিক যেন হাসছে। মণি বলে, দাদা, আপনারা এগোতে চান, এগোন। আমি ঐ পাথরটায় আরাম করে বসে একটু বিশ্রাম উপভোগ করি, এ যেন সবুজ লন-এ সাজানো বেঞ্চি পাতা! ময়দান পার হয়ে আবার জঙ্গল। পথের চড়াইও। তবে গতকালের মত দুরূহ নয়। মাঝে মাঝে বনের মধ্যে ফাঁকা সমতল জায়গা। কিন্তু লোকবসতি কোথাও দেখি না। ওক গাছের গহন বন। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে অজস্র স্ট্র বেরির চারা। লাল ফল ধরে রয়েছে। সবাই সোৎসাহে সংগ্রহ করি, পরস্পরে বিতরণ করে আনন্দ পাই, মুখে দিয়ে অম্লমধুর স্বাদে রসনার তৃপ্তি মেটাই। অলক্ষ্যে পথও এগিয়ে যায়। প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘোড়েপানি পৌঁছাই। গভীর বনে ঘেরা খানিকটা খোলা জায়গা। পথের দু-পাশে দু-খানা ঘর। অল্প দূরে আরও ঘর থাকলেও ব্যবহার উপযোগী নয়। একটা ঘরের ছাদে টালি দেওয়া, ভীমবাহাদুর বলে, এই সরাইখানাতে আজ রান্না খাওয়া হবে। উলেরী থেকে আসতে প্রায় ঘণ্টা তিনেক লাগল। বেশ শীত বোধ হয়। হবার কথাও। ৯,৩০০ ফুট উঁচুতে রয়েছি। শুনি, আরও শ' পাঁচেক ফুট উঠলে তবে এই পাহাড় পার হয়ে যাওয়ার পাস্—গিরিবর্ত্ম।

ঘরের ভিতর ঢুকেও কনকনে ঠাণ্ডা মনে হয়। এখানেও দোকানে 'দিদি'। তাঁর উনানের আগুনের কাছে গিয়ে বসতে ইশারা করেন। ঘরের বাইরে আঙুল দেখিয়ে জানাই,—ওখানে রোদে বসব।

করিও তাই। একটা প্রকাণ্ড চওড়া পাথরের উপর পা ছড়িয়ে বসে রোদ পোহাই। দেহ বিশ্রাম পায়, মনও শান্তিতে ভরে থাকে। কিন্তু বেশিক্ষণ বসা হয় না। ভাবি, একটু পরেই তো ভীমবাহাদুরের ডাক শুনব, ভোজন তৈয়ার! সঙ্গে চাল ডাল এসেছে, দিদির কাছে আলু কিনতে পাওয়া গেছে। দিদির উনানে আগুনও রয়েছে। কতক্ষণই বা লাগবে তৈরি হতে? অতএব খোঁজ করি, ঝরনা নেই নিকটে? মুখ হাত ধুয়ে আসব।

আছে বই কি? ঐ ওধারে বনের মধ্যে এগিয়ে যাও—জল পাবে। তবে সাবধান। বনের মধ্যে বেশি ঢুকো না—ভালুকের সাক্ষাৎ পাওয়া বিচিত্র নয়।

বনের অন্তরালে অপরূপা ঝরনা। কলকলতানে যেন গান গেয়ে বয়ে চলে। চারিপাশে বড় বড় শিলাগুলি স্তব্ধ হয়ে শোনে। বনস্পতির দল অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে। মুখ হাত ধুয়ে সেই আসর ছেড়ে আসতে মন চায় না।

কিন্তু, পথের ডাকে সাড়া দিতে তৈরি হতেই হবে। খাওয়াদাওয়া সেরে ক্ষণিক বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা। গভীর বন। কিছুদূর চড়াই পথ। উঠে আসি এই পাহাড়ের কাঁধের উপর; এই চড়াই-এর শেষ সীমান্তে—অর্থাৎ গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে এবার নামতে হবে অপর দিকে।

সাধারণত পাস্-এ বা গিরিদ্বারে পৌঁছে বহুদূরব্যাপী রমণীয় দৃশ্য দেখার সুযোগ আসে। এখানে কিন্তু তার ব্যতিক্রম। প্রায় ৯,৮০০ ফুটের উপরে থেকেও আশপাশ দেখা ছাড়া কোথাও দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ার

উপায় নেই। পথের চারিপাশ ঘিরে বড় বড় গাছপালার নিবিড় অরণ্য। হয়ত পথ ছেড়ে নিকটে কোথাও খোলা আরও উঁচু জায়গায় উঠলে দেখা যায়। সে-চেষ্টা না করে অপর দিকে নামতে শুরু করি। সে-দিকেও পথ কিছুদূর বনের মধ্যে দিয়ে চলে। তারপর গাছপালা কিছুটা পাতলা হতেই সামনে কে যেন হঠাৎ জানলা খোলে, দূরে দেখা দেয় দিগন্তবিস্তৃত আকাশস্পর্শী শৈলশ্রেণী—প্রখর সূর্যালোকে তুষার চূড়ায় রজতদীপ্তি। অনুপম দৃশ্য। অন্নপূর্ণা হিমল নয়, ধবলগিরির বিশাল ধবলশিখর। পথ এখন ক্রমান্বয়ে নামে, তাকেই যেন লক্ষ্য করে, তারই চরণ রেণুর লোভে। বহু নীচে দেখা যায় বিস্তীর্ণ উপত্যকা, পাহাড়ের গায়ে গ্রামের ঘরবাড়ি। প্রায় হাজার দুই ফুট নেমে এসে চিত্রে গ্রাম (৭,৭০০ ফুট)। ভীমবাহাদুর আগেই পৌঁছে ছিল, কোথা থেকে কয়টা তাজা ভুট্টা পুড়িয়ে রেখেছে। আমরা পৌঁছুতেই খেতে দেয়। বলে, আপনারা আসুন ধীরে ধীরে, আজ শিখায় রাত কাটাব, সেখানে ঘর ঠিক করতে এগিয়ে চললাম।

এখন আর বন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পথ নয়। পাহাড় যেন হাত-পা ছড়িয়ে বসে। স্তরে স্তরে পাহাড়ের গা নীচের দিকে নেমে গেছে। মাঝে মাঝে গ্রাম, চাষের জমি। ফালটে গ্রাম (৭,৫০০ ফুট) ছাড়িয়ে আসি। আরও প্রায় হাজারখানেক ফুট নামলে শিখাগ্রাম আসবে। সোৎসাহে নেমে চলি। পাথর দিয়ে বাঁধানো সোপান শ্রেণী দিয়ে ধাপে ধাপে পথ নামে। দেখি, নীচে থেকে দলে দলে যাত্রীরা উপরে আসে। পিঠে বোঝা, হাতে লাঠি। চড়াই ওঠার ক্লান্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। প্রশ্ন করে জানতে পারি, দশেরার উৎসবে মুক্তিনাথ দর্শনের পর এখন আপন আপন গ্রামে ফিরছে। আমরা এখন দর্শনে চলেছি শুনে আশ্চর্য প্রকাশ করে।

শিখাগ্রামে পৌঁছুই। ৬,৬০০ ফুট উঁচুতে। পাস্-এর উপর থেকে নামতে প্রায় ঘণ্টাতিনেক লাগে। পাহাড়ের গায়ে অনেকখানি সমতলভূমি জুড়ে গ্রাম। নদীর উপত্যকা আরও অনেক নীচে। ভীমবাহাদুর কোথায় ঘর ঠিক করে অপেক্ষা করছে বোঝা যায় না। গ্রামে ঢোকবার মুখে স্কুলের সুন্দর দোতলা পাকা বাড়ি। একতলায় একটা দোকানঘর। ভক্তি ও বন্ধু কিছুক্ষণ আগে পৌঁছে সেইখানে বসে। মণি ও আমি তাদের দেখে ঘরে ঢুকি, সেইখানেই বসি। এখানেও দোকানে 'দিদি'। ভক্তি গিয়ে তার পাশে বসে আলাপ করে। বন্ধু চায়ের ফরমাশ দেয়। দিদি কি আনতে উঠে যান। এমন সময় খরিদ্দার যাত্রী আসে। ভক্তিকে 'দিদি' ভেবে সিগারেট কিনতে চায়! সবাই হেসে উঠি।

ভীমাবাহাদুর আমাদের খোঁজে আসে। নিয়ে চলে তার মনোনীত বাসস্থানে।

শিখা সমৃদ্ধ গ্রাম। বৌদ্ধমন্দির, ডাক্তারখানা, দোকানপাট, অনেকগুলি পাকা বাড়ি ছাড়িয়ে এসে গ্রামের প্রায় শেষে একটা দোতলা বাড়ির উপরের ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করেছে। লোকালয়ের একান্তে হওয়ায় শান্ত নির্জনতা তো আছেই; তা ছাড়া ঘরের মধ্যে থাকলেও সারাক্ষণই জানলা দিয়ে সোজা দেখা যায়—ধবলগিরির অমলধবল মনোমুগ্ধকর অবারিত দৃশ্য। চন্দ্রদেবও করুণাভরে সারারাত্রি অকৃপণ হস্তে জ্যোৎস্না বিতরণ করেন। স্বর্ণাভ আভরণে মণ্ডিত হয়ে ধবলগিরি বিরাজ করেন, গভীর রাত্রি পর্যন্ত সেই শোভা দর্শনের অপূর্ব আনন্দ প্রাণ ভরে উপভোগ করি। মণি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ঐ তুষার শিখরের রূপশিখা থেকেই হয়ত এ গ্রামের নাম হয়েছে—শিখা!

৮ই অক্টোবর। পদযাত্রার পঞ্চম দিন। আবার পথচলা। ভারবাহীরা যে-যার মাল বেঁধে রওনা হয়। আমরাও প্রস্তুত। ভীমবাহাদুর বলে, আজ পথ গেছে ঐ দেখুন সোজা এই পাহাড়ের গা দিয়ে, তারপর ঐ দূরে ওখানে পাহাড়টাকে ডিঙিয়ে অপরদিকে নামে।

তাকিয়ে দেখি, এদিকের পাহাড়ের গায়ে তেমন বনজঙ্গল নেই,—কেমন যেন ন্যাড়ান্যাড়া। মাঝে মাঝে দু-একটা ধস্ নামার ধ্বংসাবশেষ—পাহাড়ের গায়ে যেন ক্ষতচিহ্ন। দূরে সামনের দিকে ধনুকাকারে পাহাড়টা ডাইনে বেঁকে সেদিকের পাহাড়ের সঙ্গে মিলেছে—ঐ মিলনক্ষেত্রের মাথার কাছে ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের মত অল্প খাঁজের ব্যবধান। শিখা থেকে পথ বার হয়ে পাহাড়ের গায়ে আঁচড় কেটে চলে গেছে সেই সেখানে। বহু নীচে নদীর উপত্যকা, আর এই গিরিশ্রেণীর পিছনে আকাশে মাথা তুলে রৌদ্রকরোজ্জ্বল ধবলগিরির শুচিশুভ্র শিখর। রূপবতী শিখার মনোমোহন শোভা।

শিখা ছেড়ে এগিয়ে চলি। পথ অল্প নামে। একটা বড় ঝরনা পার হয়। একটা ছোট গ্রাম ছাড়িয়ে এসে পাহাড়ের গায়ে বিরাট ধস্। পেরিয়ে এসে মামুলি চড়াই উঠে দুই পাহাড়ের মাঝের সেই খাঁজের কাছে পৌঁছে যাই—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। সেখান থেকে ফিরে তাকাই শিখার দিকে, কতদূরে এখন

দেখায় সেই পিছনে ফেলে আসা গ্রামখানি—যেন পাহাড়ের পটে আঁকা ছবি।

খাঁজের নিকটেও ছোট গ্রাম। ঘাড়—৫,৮০০ ফুট উঁচু। এবার পাহাড়ের অপর দিকে গিয়ে নামা। আবার বনের ভিতর দিয়ে পথ হড়হড় করে নামতে থাকে। কোথাও পাথরের উপর দিয়ে, কখনও পাথর সাজানো সোপান বেয়ে। মাঝপথে একটি মাত্র গ্রাম। দেখা যায়, বহু নীচে ঘাড়খোলা নদীর উপত্যকা। সেইদিকে অনবরতই নেমে চলেছি। প্রায় কাছাকাছি পৌছে দেখি, পথ দু-ভাগে ভাগ হয়েছে। একটা যায় সুমুখপানে, অপরদিকে ডানদিকে। দুটাই নেমে যায় নদীর ধারে। ওপারে খানকয়েক ঘর। দাঁড়িয়ে ভাবি, কোন্ পথ ধরলে পারাপারের পুল পাব! ভক্তিও এসে যায়। তাকে বলি, তুমি অপেক্ষা কর এখানে, সামনের পথ ধরে নেমে গিয়ে দেখে আসি কোন্‌টা আমাদের পথ, নইলে অযথা নদীর ধারে গিয়ে আবার চড়াই ভেঙে ফিরে আসতে হবে।

সামনের পথ ধরে নেমে যাই নদীর ধারে। দেখি, নিকটে কালীগণ্ডকীর সঙ্গে ঘাড়খোলা নদীর সঙ্গম। ঘাড়খোলার উপরে গাছের দুটো মোটা গুঁড়ি পাতা—নদী পারাপারের জন্য। অপর পার থেকে দুটি বিদেশী যাত্রী এইদিকে আসে দেখি। চড়াই উঠে ভক্তিকে ডেকে আনি। ভীমবাহাদুরও এসে যায়। বিদেশী যাত্রী দুটিও নদী পার হয়ে নিকটে আসে। আলাপ হয়। আমেরিকান। মুক্তিনাথ দেখে ফিরে চলেছে। ভক্তি তাদের ছবি তোলে। সাবধানে পুল পার হয়ে ওপারে পৌছাই। নিকটেই কালীগণ্ডকী,—আজই প্রথম সাক্ষাৎ। এই নদী ধরেই এখন থেকে আমাদের মুক্তিনাথের পথ। দক্ষিণবাহিনী নদী, তাই আমাদের পথ হবে উত্তরমুখী। এই নদীর তীর ধরে দক্ষিণ দিকে নেমে যায় অপর আর এক পথ—বাদলুঙে।

সঙ্গমের নিকটে মন্দির। কয়েকটা দোকানঘরও। একটা ঘরে আশ্রয় নেওয়া হয়। স্থানটির উচ্চতা ৩,৮০০ ফুট। মালপত্র রেখে ভীমবাহাদুর রান্না চড়ানোর আয়োজন করে। বাড়ির বারান্দায় কম্বল বিছিয়ে আমাদের বিশ্রামের স্থানও করে দেয়। আমার নজর পড়ে, পথের অদূরে গাছের ছায়ায় পাথর-সাজানো চৌতারা মতন। ঘর ছেড়ে চলে যাই সেখানে। গাছের ছায়ায় তারই উপর আরামে পা ছড়িয়ে বসি। পাতার ফাঁক দিয়ে কয়েকটি সূর্যকিরণ গায়ের উপর যেন ডুরেকাটা চাদর বিছিয়ে দেয়। নদীর উপর দিয়ে বয়ে-আসা মন্দ-মধুর হাওয়া যেন তালপাখা হাতে বাতাস করতে থাকে। তৃপ্তিতে মন ভরে তোলে। তাকিয়ে থাকি দূরের আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়গুলির দিকে। সতৃষ্ণ নয়নে। ভাবি, ঐ দিকেই কোথায় হয়ত যাব!

হঠাৎ চোখে পড়ে, পথ বেয়ে আসে আবার দুই বিদেশী যাত্রী। পিঠে রুক্‌স্যাক্, পরনে হাফপ্যান্ট, বুশ শার্ট। মুখভরা ক'দিনের না-কামানো দাড়ি-গোঁফ। মাথায় আলুথালু কটা চুলের রাশি। রোদে-পোড়া মুখের গাঢ় লাল রঙ। নিকটে পৌছুতেই আমার দিকে তাকায়। হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে অভিবাদন জানায়। প্রশ্ন করি, কোথা থেকে আসছে?

দুজনেই জার্মান। একজন ডাক্তার, অপরজন ইঞ্জিনীয়ার। বয়স ত্রিশের মধ্যে। জার্মানী থেকে এসেছে —হিমালয়-পরিভ্রমণে। এই প্রথম আসা। মাসখানেক এ-অঞ্চলের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে এখন দেশে ফিরে চলেছে। হাঁ, আবার হাতে কিছু অর্থসঞ্চয় হলেই হিমালয়ে আসবে। না, মুক্তিনাথ তাদের দেখা হয়নি, অনুমতিপত্র ছিল না। ঝুমসুম থেকে ফিরে আসতে হয়েছে।—জানি, তাঁদের আসা মুক্তিনাথের উদ্দেশ্যে নয়,—শুধু হিমালয়ের পথে পথে ভ্রমণ করাই তাঁদের আকাঙ্ক্ষা—'to travel not to go anywhere, but to go'.

বেশিক্ষণ তাঁরা দাঁড়ান না। আবার চলা শুরু করেন। হাসিমুখে বিদায় চেয়ে। যেন, ঝরা পাতা বাতাসে উড়ে যাওয়া, হঠাৎ কোথাও মাটিতে ক্ষণিক আটকে থাকা, আবার হাওয়ার বেগে উড়ে চলা। পথ চলাতেই আনন্দ।

ভীমবাহাদুর জানিয়ে যায়, ভোজন তৈরি হতে দেরি নেই। চলি, ঘাড়খোলের নদীজলে স্নান করতে। একটা পাখি জলের ধারে পাথরের ওপরে নিশ্চল হয়ে বসে—যেন ধ্যানমগ্ন। হঠাৎ উড়ে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে, পাখা ঝাপটে আবার তখনই ফিরে এসে পাথরে বসে। সেও কি আমার মত স্নানার্থী? অবগাহনের আনন্দ স্বাদ সেও কি জানে?—না, না, স্নান নয়। তার ঠোঁটে ধরা ছোট মাছ। পাখিটা মাথা দুলিয়ে খায়।

আমি স্নান সেরে আহার পর্ব সমাপ্ত করি। আবার চৌতারায় এসে লম্বা হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিই। ভীমবাহাদুর জানিয়েছে, জিনিসপত্র গুছিয়ে যাত্রা করতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি।

হিমালয়ের কোলে, নীল আকাশের নীচে, গাছের ছায়ায়, পাথরের উপর শুয়ে থাকা—সে এক অপার্থিব অনুভূতি,—মায়ের কোলে শায়িত শিশুর যেন স্বর্গসুখ।

হঠাৎ চোখ চাইতেই চমকে উঠি। পাশেই কে একজন দাঁড়িয়ে। পাহাড়ীদের বেশভূষা। কপালে তিলককাটা। নিজের পরিচয় দেন, স্থানীয় ব্রাহ্মণ। দুঃস্থ অবস্থা।—কোথায় চলেছেন মুক্তিনাথ? বেশ, বেশ। মুক্তিনারায়ণ আপনার মঙ্গল করুন। গরিব ব্রাহ্মণ,—তীর্থপথে কিছু দান করলে পুণ্যলাভ হয়,—জানেন নিশ্চয়?

আবার চোখ বুজে চুপ করে তার কথাগুলি শুনি। অনর্গল বকে চলে, দামোদরকুণ্ডে যাবেন না? দুর্গম,—তা হলেও দেখে আসুন,—এই তো মাসখানেক আগে ভারত থেকে এক মাহাত্মা এসেছিলেন—তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে আনলাম।—আবার নিজের দৈন্যের কথা জানাতে থাকেন।

কিছু দিয়ে তাঁকে বিদায় করি। তিনি যান বটে, কিন্তু অল্প পরেই আবার ফিরে আসেন দেখি। কপট নিদ্রায় চোখ বুজে থাকি। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বাক্যের ঝুলি আবার খোলেন,—তীর্থের কত মাহাত্ম্য, দানের কত পুণ্য ইত্যাদি।

আমার বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটে, মনে বিরক্তি জাগে, তবু কিছু বলি না, নড়িচড়িও না,—যেন কত ঘুমে বিভোর। সংযমের পুরস্কার পাই,—নিদ্‌গ্যয়া—বলে অবশেষে তিনি চলে যান।

কিন্তু এই ব্রাহ্মণের কথা আবার মনে পড়ে বছরখানেক পরে। কাশীতে সে সময়ে রয়েছি। হঠাৎই এক মারাঠী সাধুর সঙ্গে পরিচয় হয়। কৈলাস-মানস-সরোবর, অমরনাথ, মুক্তিনাথ, কেদার-বদরী প্রভৃতি বহু তীর্থযাত্রার কাহিনী শোনান, হিন্দী এক পত্রিকায় তাঁর পরিভ্রমণের রচনাও প্রকাশিত হয়েছে দেখান, তখন তাঁরই মুখে দামোদরকুণ্ড যাত্রার কথাও শুনি—এবং এই ব্রাহ্মণই যে সে-পথে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন, তাও প্রকাশ পায়।

ভাবি, এ-জগতে কার সঙ্গে কবে কোথায় যোগাযোগের সূত্র অলক্ষ্যে গ্রথিত হয়, কেউ কি জানে?

আবার জুতা জামা পরে যাত্রা। কালীগণ্ডকীর বাম তীর ধরে কিছুদূর যেতেই নদীর উপর লোহার ঝোলাপুল। পুলের উপর দাঁড়িয়ে বেগবতী পার্বত্যনদীর প্রচণ্ড জলস্রোত দেখি। প্রবল বেগে ধেয়ে নামে। সবুজ জলে অসংখ্য ফেনশীর্ষ তরঙ্গ তুলে।

নদীর অপর পারে পৌঁছে আবার নদী ধরে পথ। বাঁদিকেও নদীর ধার দিয়ে আর এক পথও নিম্নমুখে নেমে যায়—বেণী ও বাদলুঙ অভিমুখে। সেধার দিয়েও পোখরা পৌঁছানো যায়। ভাবি, ফেরবার সময় সে পথটাও দেখে গেলে হয়।

এখন এগিয়ে চলি যেদিক থেকে নদী নামে, সেদিক পানে। সাধারণ চড়াই উৎরাই করে প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে যাওয়ার পর বড় গ্রাম পাই। তাতপানি। নাম থেকেই বোঝা যায়, নিশ্চয় নিকটে কোথাও উষ্ণজলের প্রস্রবণ আছে। হাঁ, ঠিক তাই-ই। অল্পদূরে, নদীর ধারে। কিন্তু এখন যাবার সময়ে দেখা হয় না। ক'দিন পরে মুক্তিনাথ থেকে ফেরবার সময়ে দেখে আসি। যাত্রাপথ ছেড়ে গ্রামের নীচে নদীর ধার দিয়ে খানিক গেলেই ঝোপঝাপের আধ-অন্ধকারে তপ্তজলের নির্ঝর ও কুণ্ড। জল বেশি গরম নয়। গ্রামের নিকটে হলেও—অথবা হয়ত সান্নিধ্যের কারণেই স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়।

তাতপানি গ্রামখানিও হুন্‌জাগ্রামের মত পথের দু-পাশে লম্বা ছড়ানো,—তিন ভাগে বিভক্ত। গ্রাম ছাড়িয়ে চলি। কখনও নদীর পাশ দিয়ে, কখনও তার সঙ্গ ছেড়ে পাহাড়ের খানিক উপর উঠে, আবার কিছুপরেই নদীর নিকটে নেমে। মাঝে মাঝে গ্রামও আসে। একটা চালাঘরের সামনের উঠানে মরা গাছে শশা ঝুলতে দেখে ভাবি, বিক্রি করলে খাওয়া যেত। কিন্তু তখনই দ্রাক্ষালোভী শৃগালের মনোভাবের মত মনে হয়, অত বড় শশা।—নিশ্চয় পাকা, খেতে ভাল নয়!

আবার এগিয়ে চলি। আর একটা গ্রাম পার হতে দেখি, ভীমবাহাদুর দাঁড়িয়ে। হাতে তার ওগুলা কী? বাঃ! বড় বড় শশা। আমাদের হাতে দেয়। ছুরি বার করে কেটে সবাই ভাগ করে নিই। লবণেরও অভাব হয় না। হিমালয়ের শশা, তার বিরাট আকারে নিজ জন্মভূমির মর্যাদা ধরে, কিন্তু বর্ণচোরা—দেখতে পাকা মনে হলেও মুখে নিতেই দেখি, কচি, নরম সুস্বাদু!

হাতে নিয়ে খেতে খেতে পথ দিয়ে চলি।—এ যেন মায়ের দেওয়া মুড়ি কোঁচড় ভরে নিয়ে গ্রামের পথে খেতে খেতে চলা!

আবার আর এক গ্রামে পৌঁছে দেখি, বন্ধু এক ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে? উৎফুল্লকণ্ঠে ডাক দেয়, মামা, চলে আসুন এখানে। মামীমারা কোথায়? 'দিদি'কে ভুট্টা পোড়াতে বলেছি—এখনই তৈরি হয়ে যাবে। সকলে মিলে ভুট্টাও খাই।

এ-যেন হিমালয়ের অচেনা অজানা স্থান নয়—পথে-পথে আপনঘর।

পথ অনেকখানি সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। টানেলের মত দুটা গুহার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে এসে এগিয়ে যায়। নদীর অপর পারে আর এক নদী এসে মেশে কালীগণ্ডকীতে। নাম শুনি মিরিস্‌টি খোলা। কালীগণ্ডকীও যেন বিস্তারিত বুকে তাকে আলিঙ্গন করে। এবার পথের দু-পাশে দেখা দেয় ধানক্ষেত। ওপারের পাহাড়ের গায়ে উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলপ্রপাত। এপার থেকেও তার গম্ভীর জলোচ্ছ্বাস শোনা যায়। গণ্ডকীর জলস্রোতের কলধ্বনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন দ্বৈত যন্ত্রসঙ্গীত বাজে!

পথের সুমুখ দিয়ে একটি লোক এগিয়ে কাছে এসে দাঁড়ায়। এসেই প্রশ্ন করে, কোথা থেকে আসছি, কোথায় চলেছি।—সেই একঘেয়ে প্রশ্ন কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ধরনধারণ আলাদা। পরিচয় পাই, পুলিশের লোক,—এগিয়ে গেলেই চেকপোস্ট।

অল্প যেতেই পাহাড়ী নদী। তেমন চওড়া না হলেও স্রোত আছে। লাফিয়ে জল পার হওয়া আমার পক্ষে কঠিন। জুতামোজা খুলতে যাব, কোথা থেকে এক নেপালী তরুণের আবির্ভাব। আমাদের দিকে তাকায়, কোন কথা বলে না, দুটো বড় পাথর ঠেলে এনে জলের মধ্যে দেয়, মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে নিজে অনায়াসে জল ডিঙিয়ে চলে যায়। পাথরের উপর পা রেখে জুতা না ভিজিয়ে সহজেই আমরাও পার হয়ে আসি।

পৌঁছে যাই দানায়। ৪,৭৫০ ফুট। পোখরা থেকে ৪০ মাইল দূরে। তাতপানি থেকে ঘণ্টা দুই লাগল। গ্রামে ঢোকবার মুখে পুলিশ চেকপোস্ট। আবার জিজ্ঞাসাবাদ করে। পথের দু-ধারে শুরু হয় পাথরের পাঁচিল ঘেরা বড় বড় বাড়ি। সাজানো বাগানে গাছে গাছে লেবু ও কমলা ঝুলছে। আশ্চর্য হই,—কোন বাড়িতে লোকজন দেখি না কেন? অথচ, বাড়ি ও বাগিচা দেখে পরিত্যক্ত মনে হয় না!—পরে জানতে পারি, মুক্তিনাথের পথে পাহাড়ের উচ্চ অঞ্চলে তুকুচে ও ঝুমসুম গ্রামের ধনী ব্যবসায়ীদের এগুলি শীতকালীন বাসগৃহ।

দানাগ্রামের মধ্যস্থলে পৌঁছাই। সেখানে লোকজন, দোকানপাট, ডাকঘর, থানা। একধারে একটা একতলা বাড়িতে ভীমবাহাদুর থাকবার ব্যবস্থা করে। ঘরে বসেই দেখা যায়, গ্রামের কিছু নীচে কালীগণ্ডকী। নদীর উপর ঝোলাপুল ওপারে পাহাড়ের গায়ে গ্রামগুলির সঙ্গে সংযোগ রেখেছে।

আমাদের আশ্রয়স্থলের নিকটে একটা দোতলা বাড়ি,—পঞ্চায়েত গৃহ।

মুক্তিনাথ থেকে ফেরবার সময় এখানকার এক ছোট্ট ঘটনা এখানে শুনাই। সেই পঞ্চায়েত বাড়িতে সেদিন জনসমাগম দেখে কৌতূহল হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এসে আমাদের সঙ্গে আলাপও করেন, মুক্তিনাথ যাত্রাপথ সম্পর্কে আমাদের মতামতও জানতে চান। আমরা বলি, রাস্তা ভালই। তবে, নেপাল সরকারের তরফ থেকে যাত্রীদের সুখসুবিধার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা আছে বলে মনে হল না। এমনকি পথে কোথাও মাইল-পোস্ট বা পথ-নির্দেশক কোন চিহ্ন নেই,—চটী বা ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা। নেপালী গ্রামবাসীদের আতিথেয়তার সুখ্যাতি করি। তাঁরাই যেন যাত্রাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তখন তাঁদের কাছে খবর পাই, কিছুকাল থেকে এই যাত্রাপথের উন্নতির ও সমুচিত ব্যবস্থাদির চেষ্টা চলেছে, সম্প্রতি মিটিং ও আলোচনা হয়ে কয়েকটি পরিকল্পনার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। এঁদেরও সেই সূত্রেই এখানে আসা।

সেই নেপালীদের মধ্যে একজনকে বিশুদ্ধ বাঙলা ভাষায় কথা বলতে দেখে যেমন আশ্চর্যবোধ করি, তেমনি আনন্দও পাই। জিজ্ঞাসা করি, বাঃ! আপনি তো চমৎকার বাঙলা জানেন! কলকাতায় ছিলেন নাকি? নেপালী ভদ্রব্যক্তিটি উত্তর দেন, দার্জিলিঙে কয়েক বছর থেকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল, সেই সুযোগেই বাঙলাটা রপ্ত হয়ে গেছে।—তারপরই একটু চুপ করে থেকে ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেখা ফুটিয়ে হঠাৎ রূঢ় মন্তব্য করেন, আপনারা কোলকাতার লোক, আপনাদের ধারণা নেপালী মানেই বাড়ির দরওয়ান, চৌকিদার। তখনই প্রতিবাদ জানাই, সে কী কথা। আমারই তো কলেজজীবনে দুজন সহপাঠী বন্ধু ছিলেন নেপালী। তাঁদের একজন এখন কলকাতায় আপনাদেরই কনসাল, এই তো এখানে আসার

সময় দেখা করে এলাম। কিন্তু, এতে তাঁর মনের কোণের পুঞ্জীভূত কালিমা ঘুচল কিনা জানি না।

ভাবতে থাকি, এই বেদনাময় বিরূপ মনোভাবের জন্য দায়ী কারা?

পরদিন যথারীতি ভোরে উঠলেও যাত্রা করতে প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজে। গণ্ডকীর উপত্যকা ধরে পথ প্রায় সমতলই। সামান্য কোথাও চড়াই উৎরাই। মাঝে মাঝে গ্রাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর খানিক উৎরাই নেমে একটা ঝরনার উপর কাঠের পুল। পার হয়ে বাঁদিকে তাকাতেই অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। বিরাট গিরিশ্রেণী যেন তাঁর বিশাল বক্ষ প্রসারিত করে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে, অনাবৃত দেহের শোভা বর্ধন করে শুচিশুভ্র যজ্ঞসূত্র!

পাহাড়ের বহু উপর থেকে প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে অপরূপা ঝরনাধারা। যেমন বিপুল তার জলভার, তেমনি প্রচণ্ড তার উচ্ছলন। নাম তার রূপসী। প্রকৃতই রূপসী। স্বর্গ থেকে যেন কোন্ এক অপ্সরা জলদেবীর রূপ নিয়ে ধরার বুকে নৃত্যভঙ্গে ঝাঁপিয়ে নামে শৈল সোপান বেয়ে। তার দীর্ঘতনুঘেরা ফেনশুভ্র রেশমী উত্তরীয়,—নৃত্যের ছন্দে ছড়িয়ে পড়ে। তারই উপর সূর্যের কিরণছটা ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণ ফোটায়।

মুক্তিনাথের পথে রূপসী সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত।

এখানকার উচ্চতা ৫,০৫০ ফুট। একটা পথ এখান থেকে ডাইনে নীচের দিকে নামে, কালীগণ্ডকীর উপর কাঠের পুল পার হয়ে ওপারে যায়। অপর পথটি বাঁদিকে উঠে চলে ঝরনার দিকে। আমরা চলি উপরের সেই পথ দিয়ে। পাশেই ভোটিয়াদের একটা ছোট দোকান। রূপসীর ধারা পার হই কাঠের পুলে। মুখে চোখে প্রপাতের বাষ্পকণার শীতলস্পর্শ অনুভব করি। ঝরনার অদূরে এক শিলাখণ্ডের উপর বসে কিছুক্ষণ এই অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করি।

তারপর, আবার পথচলা। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের বেশ খানিক চড়াই ওঠা। রূপসী ছাড়িয়ে মিনিট পঁয়তাল্লিশ চলার পর চড়াই শেষ হয়। কাপ্‌রে গ্রামে পৌঁছাই (৫,৯০০ ফুট)। পথের দু-পাশে ঘর বাড়ি। মাঝে মাঝে ফাফরের খেত, কোথাও বা ছোট বাগান,—লেবু শশা ফলে রয়েছে। গ্রামের যেন শেষ নেই, একটা পার হতেই আর একটা আসে। পথের সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে একজন আসেন, সঙ্গে পায়ে হেঁটে অপর দু-তিনজন। নিকটে এলে ঘোড়া থামিয়ে নেপালী সওয়ার সেই মামুলী প্রশ্ন করেন, কোথায় চলেছি ইত্যাদি। ভাবি পুলিশকর্তা নাকি?—না, নিজেই পরিচয় দেন, পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক। মুক্তিনাথ যাত্রাপথের সুব্যবস্থার জন্য এঁরাও মিটিং করে ফিরছেন। সঙ্গে মুক্তিনাথের পূজারীও রয়েছেন। দুশ্চিন্তা হয়, মন্দির বন্ধ রেখে অফিসারের সঙ্গ ধরেছেন নাকি? আমাদের দর্শনের ব্যবস্থা করবেন কে? ইনি ফিরবেন কবে?—জিজ্ঞাসা করি। উভয়েই আশ্বাস দেন, সেখানে পূজারী আছেন, কোন অসুবিধা হবে না।

অফিসার পকেট থেকে কাগজ বার করে সহকারীর নামে দু-ছত্র চিঠি লিখে আমার হাতে দেন। সেখানকার ধর্মশালার তত্ত্বাবধায়ককেও পূজারী একটা চিঠি লেখেন। অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, পথে টুকুচেতে থাকবেন বোধ হয়? সেখানে ঠাকুর প্রসাদজির কাছে যাবেন, আমার নাম করবেন, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।—কথা শেষ করে, শুভযাত্রা কামনা করে ঘোড়া চালিয়ে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে চলে যান।—আমরাও আমাদের পথ ধরি, মনে মনে ভাবি, যাক্ একটা কাজ হল!

বন্ধুও নিষ্ক্রিয় বসে নেই। এই অবসরে খোঁজ পেয়েছে, গ্রামবাসী একজনের কাছে দই ও ঘোল রয়েছে। সকলে বসে তারই অনেকখানি সদ্ব্যবহার করা গেল। এদেশে ঘোল নিছক পানীয় নয়, খাদ্য বিশেষ। আর দধি তো পুষ্টিকর বটেই। খাঁটি ঘনদুধে তৈরি।

এইভাবে সবাই দেহরূপ এঞ্জিনে কয়লা ভরে আবার হাঁটা শুরু করি।

পাহাড়ের গা দিয়ে চলেছি। ডাইনে কিছু নীচে কালীগণ্ডকী। অপর পারেও উঁচু পাহাড়। দু-দিকের পাহাড় যেন নদীর পথরোধের দুরভিসন্ধি নিয়ে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে। অশেষ শক্তিশালিনী ভীমা কালীগণ্ডকী খড়্গহস্তে দুই পাহাড়ের মাঝে সঙ্কীর্ণ পথ কেটে নেমে চলেন। তাঁর উন্মত্ত তরঙ্গমুখে উচ্ছ্বসিত অট্টহাস্য।

নদীর দুই তটে দুই সুবিখ্যাত গিরিশ্রেণী—একদিকে ধবলগিরি (২৬,৮১০ ফুট), অপর দিকে অন্নপূর্ণা (২৬,৫০৪ ফুট)—তারই মধ্যবর্তী গণ্ডকীর গিরিখাত। দুই পর্বতচূড়ার মধ্যে ব্যবধান মাত্র বাইশ মাইল।

আর এখানকার নদীবক্ষ মাত্র হাজার চারেক ফুট উঁচু।

নদীর দুই তটে কালো কালো বিশাল শিলাখণ্ড—গণ্ডশৈল। এক জায়গায় দুই দিকের পাহাড় এতই কাছাকাছি আসে—যেন পরস্পরের অঙ্গস্পর্শ করে। বন্যপশু তো বটেই, মানুষও, বোধ করি, লাফিয়ে অপর পারে যেতে পারে। নদী এখানে নীচে খাদের মধ্যে যেন গুহাপথে সবেগে চলে। মনে পড়ে, বদরীনাথ ক্ষেত্রে মানাগ্রাম ছাড়িয়ে বসুধারার পথে সরস্বতী নদীর উপর সেই ভীমসেন পুল—প্রাকৃতিক শৈলসেতু, ও সেখানে নদীর ভয়ঙ্কর মূর্তি। এখানেও গণ্ডকীর প্রবাহে পদে পদে জলপ্রপাত—cascades,—স্রোতের ভীষণ গর্জন। আমাদের পথ গিয়েছে নদীর দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে, ঘুরে ঘুরে,—এঁকেবেঁকে। পাথর কেটে কোনমতে এই সঙ্কীর্ণ পথ সৃষ্টি। কোথাও কোথাও পাহাড়ের গায়ের পাথর কেটে সোপানশ্রেণী। সাবধানে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। এই ভয়াবহ রুদ্রমূর্তি পার্বত্য পরিবেশে হঠাৎ শুনি মধুর ঘণ্টাধ্বনি। সুপরিচিত শব্দ। মুখ তুলে সুমুখপানে তাকাই। দেখি, পথ দিয়ে সার বেঁধে অশ্ব ও অশ্বেতরবাহিনী এগিয়ে আসে। পাহাড়ের খাড়া কালো অঙ্গে যেন সচল পিপীলিকা শ্রেণী। জানি, তিব্বতের সঙ্গে হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশের বাসিন্দাদের যে ব্যবসা বাণিজ্য চলে, তারই পণ্য সামগ্রী বহন করে এই সব পশুদল। আমাদের এপথও আরও উত্তরে গিয়ে হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করে। এখানেও তাই এদের উপস্থিতি। যদিও, নেপালেও সম্প্রতি তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসার যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে। দেখতে দেখতে সেই ঘোড়া ও খচ্চরেরর দল এগিয়ে আসে। পথ এমনই সঙ্কীর্ণ তাদের যাওয়ার জন্যে পাশ দেওয়ার স্থান নেই। তাদের পিঠের দু-পাশে ঝোলানো বোঝার ধাক্কায়, হয় একদিকে পাহাড়ের গায়ে নিষ্পেষণ, নয় তো অপর দিকে পাতালবাহিনী করালমূর্তি কালীগণ্ডকীর গর্ভে সলিলসমাধি। তাড়াতাড়ি পথের পাশে একটা পাথরের গা বেয়ে পথ ছেড়ে খানিক উপরে উঠে দাঁড়াই। খচ্চরগুলি হুড়াহুড়ি করে এগিয়ে আসে। সার বেধে পার হয়ে যায়। গলায় তাদের ঘণ্টা ঝোলে, মাথায় রঙিন ঝালর দোলে, পিঠের উপর কার্পেটের মত ফুলকাটা জিন্—তারই দু-পাশে ঝোলানো মালের ভার। একটা দল আসে, পার হয়। আবার আর এক দল, তারপরও আরও কয়েকটা,—যেন শেষই হয় না। প্রতি দলে তিব্বতী জোব্বা গায়ে, মাথায় টুপি দু-একজন লোক, সঙ্গে ভীষণাকৃতি কুকুরও। এভাবে আমার এখনই পথ ছেড়ে দাঁড়ানোর আরও এক কারণ,—ভীমবাহাদুর সাবধান করে দিয়েছে, আর একটু এগোলেই পথ আরও সঙ্কীর্ণ। এখান থেকে দেখাও যায় সুমুখে,—পাহাড়ের গায়ে যেন পথের কোন চিহ্নই নেই। মনে হয়, পাহাড়ের গা খাড়া দেওয়ালের মত সোজা যেন নেমে গেছে নদীর বুকে। মালবাহী পশুদল চলে গেলে পথ ধরে কয়েক পা যেতেই দেখি—খাড়া পাহাড়ের গা কেটে কোনমতে লোক যাতায়াতের অতি সরু পথ,—মাঝে আবার কোথাও মাথার উপর সাপের ফণার মত—কাটা-পাথরের খিলান, দূর থেকে দেখায় যেন সুড়ঙ্গ, ডাইনে পাহাড়ের ঢালু গা সোজা নেমেছে নদীবক্ষে—পথের সেপাশে ধারে রেলিঙ-মত পাথর সাজানো—হাতখানেক উঁচু পাঁচিল। নদীর জলস্রোতের হুঙ্কার সেই সুড়ঙ্গ মুখে দ্বিগুণ প্রতিধ্বনি তোলে। পাহাড় যেন গাল ফুলিয়ে ব্যোম ব্যোম গভীর গম্ভীর নিনাদ করে।

তারই মধ্যে হঠাৎ কানে আসে আবার ঘণ্টাধ্বনি। তাড়াতাড়ি পাহাড়ের গা ঘেঁষে কোনরকমে দাঁড়াই। দুটা খচ্চর কী কারণে পিছিয়ে পড়ে,—এখন সামনে এসে যায়। তার চালক লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসির ভাব দেখিয়ে খচ্চরের মুখের লাগাম ধরে, এক এক করে সাবধানে পার করে নিয়ে যায়।

পথের কোথাও কাঠের ঝুলন্ত সাঁকো মতন,—পাথর কেটে সেখানে পথ করা সম্ভব হয়নি, দু-দিকের পথের প্রান্ত সংযোগ করায় কয়েকটা তক্তা বিছিয়ে।

এই ধরনের পাথর-কাটা পথ পার হয়ে এসে রাস্তা কাঠের মই বেয়ে নীচে নদীর বুকে নামে। নদীও এখানে যেন বুক ছড়িয়ে চওড়া হয়ে থাকে। আমরা উন্মুক্ত অঞ্চলে পৌছে হাঁফ ছেড়ে দাঁড়াই। এবার নদীর বুকে বালি ও পাথরের উপর দিয়ে খানিক হেঁটে গিয়ে আবার পাড়ের উপর ওঠা। ভীমবাহাদুর জানায়, এখন বর্ষার পর নদীতে জল বেশি থাকায় আমাদের ঐ পাহাড়ের গায়ে পাথর-কাটা পথ দিয়ে আসতে হল। নদীর জল কমে গেলে তখন নদীর শুকনা বালুচরের উপর দিয়ে লোক চলাচল করে।

অল্পদূরে যাবার পর নদী ছেড়ে উঠে এসে চড়াই ভেঙে পাহাড়ের খানিক উপরে পৌছাই। একটুকরা

সমতল ভূমি। একখানা মাত্র চালাঘর। মণি ভীমবাহাদুরকে বলে, তেষ্টা পেয়েছে, দেখ না, এখানে যদি জল পাওয়া যায়। ভীমবাহাদুর জানায়, এরা তিব্বতী—আর একটু এগুলে গ্রাম আসবে।

আসেও তাই। পথের পাশেই কয়েকটা চালা ঘর। পথের উপর খড় বিছানো। রোদে শুকাচ্ছে। বন্ধু দেখেই বলে, এ তো ভুট্টার বিচালি! নিশ্চয় তা হলে ভুট্টা পাওয়া যাবে!

সহজেই সংগ্রহও হয়। অতএব, ভাজিয়ে খই করে খাওয়া,—পরম তৃপ্তি সহকারে।

আবার চলা। পাহাড়ের গা দিয়ে ধীরে ধীরে ওঠা। গণ্ডকীর সঙ্গে কিছুকালের মত ছাড়াছাড়ি। পাহাড়ের কোলে ঘাসা গ্রাম। পৌঁছুতে দুপুর হয়। ৬,৬০০ ফুট উঁচুতে। কাপ্‌রে থেকে ঘণ্টাতিনেকের পথ। পোখরা থেকে ৪৬ মাইল দূর। গ্রামে প্রবেশ করার মুখে পথের মাঝে কয়েকটা বৌদ্ধ চোরটেন—ধর্মস্তূপ। এগিয়ে যেতেই ডানদিকে সারি সারি বাড়ি। তারই একটার ছাদ-দেওয়া, সম্মুখ-খোলা রোয়াকে আমরা এ-বেলার মত আশ্রয় নিই। পাশের বাড়ির মধ্যে কোথায় ভীমবাহাদুর রান্নার ব্যবস্থা করে।

বারান্দার নীচেই রাস্তা। রাস্তার অপর দিকে পথের ধার দিয়ে বয়ে চলে হাত দুই তিন চওড়া নালার মত জলধারা। পরিষ্কার চক্‌চকে জল—যাকে বলে কাকচক্ষু। কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। মনে হয়, দূরের কোন ঝরনা থেকে খাল কেটে গ্রামের সামনে দিয়ে বইয়ে নিয়ে যাওয়া। রাস্তা থেকে মাঝে কয়েকটা পাথর সাজিয়ে জলের ধারে নামবার ছোট ছোট ঘাটের মতন। অর্থাৎ গ্রামের ঘরগুলির সামনে, রাস্তার অপরদিকে, যেন সারি সারি প্রত্যেক বাড়ির নিজস্ব ঘাট। সেই জলপ্রণালীর অপর পারে বিস্তীর্ণ ক্ষেত। ক্ষেতের ওধারে উত্তুঙ্গগিরিশ্রেণী। তারই একস্থানে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে এক জলপ্রপাত। এখান থেকে শব্দ শোনা যায় না! মনে হয়, ধূসর পাহাড়ের গায়ে ধবধবে সাদা কাপড় ঝোলে, বাতাসে দোলে।

এপারে গ্রামের পিছনেও পাহাড়,—সেখানে অল্প উপরে পাইন বনের মাঝে সুন্দর একটি বাংলো—যেন গাছের ডালে সবুজ-পাতার মাঝে পাখি বসে।

ধবলগিরি ও অন্নপূর্ণা পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী গিরিখাত ভেদ করে পাহাড়ের এই উত্তরাঞ্চলে এসে ভিন্ন পার্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করি। এদিকে পাহাড়ে ভিজা স্যাঁতসেঁতে জঙ্গল নেই। শুকনা খটখটে আবহাওয়া। Blue Pine বন। ও-অঞ্চলের পোকামাকড় গিরিগিটিরও এদিকে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ, গাছপালা, কীটপতঙ্গেরই পরিবর্তন নয়, গ্রামবাসীদেরও আকৃতি, প্রকৃতি, বেশভূষারও রূপান্তর দেখা যায়। শুনি, এইখান থেকে প্রকৃত থাকালিগ্রাম শুরু।

থাকালিরা নেপালী হলেও ভোটিয়া সম্প্রদায়ের। হয়ত, এদের পূর্বপুরুষরা এককালে তিব্বত থেকে এদিকে এসে বসবাস করতে থাকে। তিব্বত ও নেপালের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের এরাই ছিল মাধ্যম। এদের বেশভূষা তিব্বতীয় ধরনের। ভাষাও নেপালী নয়। ধর্মেও বৌদ্ধ। মুক্তিনাথের পথে যত এগিয়ে যাব, এদের সঙ্গে তত বেশি পরিচয় ঘটবে।

এখন তাদেরই একজনের বাড়ির বাইরের রোয়াকে কম্বল বিছিয়ে যেমন চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করি, তেমনি গ্রামবাসীদের দু-চারজনকেও লক্ষ্য করি। পথের ওপারে খালে নেমে মেয়েরা কেউ ঘড়ায় জল ভরে নিয়ে আসে, কেউ বা পাথরের উপর আছড়ে কাপড়-চোপড় কাচে। এ বাড়ির গৃহকর্ত্রী বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন, রোয়াক পেরিয়ে যাবার সময় আমাদের দেখে মুচকে হেসে মাথা নাড়েন, ভাবটা যেন, আমার এখানে বিশ্রাম করছ? বেশ বেশ!

কয়টা ছোট ছেলেমেয়ে পথের ধারে খেলা করে। একটি ছোট মেয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে। তার কোলের ওপর শিশুটি নিশ্চয় তারই ছোট্ট ভাইটি হবে; এমনি নিশ্চিন্তভাবে দিদির কোলে, বুকে মাথা রেখে বসে—যেন গদি-দেওয়া আরাম কেদারায় শুয়ে! ক্ষুদে ক্ষুদে ঢুলুঢুলু চোখ, ফোলা ফোলা লাল টুকটুকে গাল,—যেন, ডল্ পুতুলটি! দিদিরও ভাবটা যেন খেলার পুতুল কোলে নিয়ে বসে। তাদের মা বোধহয় কোন কাজকর্মে ব্যস্ত।—ওকি! ওদিকে বাড়ির ঢালু চালের ওপর একটা বাচ্চা হামা দিচ্ছে! ওখানে উঠল কি করে? হামা দিয়ে নীচে গড়িয়ে পথের ওপর পড়ে বুঝি! দেখতে পায় নীচে খেলারত ছেলের দল। দুজন ছুটে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যায় বাড়ির শ্লেট-পাথর-বিছানো চালের উপর,—বাচ্চাটাকে ধরে। কিন্তু তাকে কোলে নিয়ে এরাই বা নামবে কি করে? তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবি। দেখি, কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে যায় পাহাড়ের গায়ে সার বেঁধে ওপর থেকে নীচে রাস্তা পর্যন্ত। বাচ্চাটাকে

একজন তার পাশের ছেলেটির হাতে দেয়, সে আবার দেয় তার পরের ছেলেটিকে—'রিলে' করে। এইভাবে চক্ষের পলকে শিশুটি পরস্পরের কোল থেকে পথের উপর পৌঁছে যায়! আমাদের ভাবনা কাটে। ছেলেদের বুদ্ধি ও তৎপরতায় চমৎকৃত হই।

অনেক বাড়ির ছাদে রাশিকৃত কুমড়া। ভুট্টাও শুকাচ্ছে। পাশের বাড়ির বাগানে লকলকে কচি লাউ ডগা দেখে ভক্তি উৎফুল্ল হয়। বন্ধু বলে, মাইমা, দেখ না যদি পাওয়া যায়।

সহজেই জোগাড় হয়। রন্ধনপটীয়সী গৃহিণী বঙ্গবধূ পথক্লান্তির দেহাবসাদ ভুলে বিশ্রামশয্যা ছেড়ে উঠে চলেন, বলেন, অমন কচি তাজা ডাঁটাগুলো যখন পাওয়াই গেল, আমিই যাই আজ ঐদিয়ে ঝোল রাঁধতে,—ভীমবাহাদুর কি আর এ-সব রাঁধতে পারবে? কোথায় সে উনুন পেতেছে, বন্ধু, চল তো গিয়ে দেখি। সেদিন ভক্তির হাতের রান্না সেই ঝোলের স্বাদ এখনও যেন মুখে লেগে রয়েছে!

দুপুরে বিশ্রামের পর আবার হাঁটার জন্য তৈরি। যদিও, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে। মণির আলস্য বোধ হয়। বলে, দাদা, আকাশের ঐ দিকে কীরকম ঘন কালো মেঘ! জোর বৃষ্টি নামতে পারে। আজ বরং এখানেই রাত কাটান যাক।

তার প্রস্তাবে রাজী হই না। বলি, হিমালয়ে বৃষ্টি তো যখন-তখন আসতেই পারে,—আর তখন পথে থাকলে ভিজতেও হয়। মেঘ দেখে পথ চলা বন্ধ করা চলবে না,—ওঠ, বেরিয়ে পড়া যাক।

যাত্রা আবার শুরু করা হয়।

পথের মাঝে আবার তিব্বতের মত চোরটেন—মণিপ্রাচীর! মাঝে মাঝে গলার ঘণ্টা ঝালর ঝোলানো মালবাহী ঘোড়া খচ্চরের দল, তিব্বতীয় পোশাক পরা লোকজন,—সেই কৈলাসের পথের মতন।

কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামে। মণি বলে, জল এল তো দাদা, দেখছেন?—হেসে বলি, থেমে গেলে তখন আর পড়বে না, যতক্ষণ পড়বে ততক্ষণ বৃষ্টিও থাকবে। বর্ষাতি গায়ে বৃষ্টির মধ্যেই সবাই চলি। পথের পাশে মাঝে মাঝে দু-একটা কুঁড়ে ঘর। তারপর শুরু হয় মনোরম বনপথ। চারপাশে বড় গাছপালা,—তারই তলা দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে পথ যায়। অল্প চড়াই উৎরাইও আছে। হঠাৎ বৃষ্টিধারার বেগ বাড়ে,—ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ে। মণি বলে, দাদা, দেখছেন তো!

দেখছি তো বটেই। কাকভেজা ভিজছিও। দুটো বড় গাছের নীচে সবাই মিলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। গাছের ডালপালায় কি আর ও-জল আটকায়! ভেজা বন্ধ হয় না, তবে চোখে মুখে বৃষ্টির ঝাপটা খাওয়া কিছুটা রোধ হয়।

অল্প পরে বৃষ্টি থামে। মেঘমুক্ত নীল আকাশ দেখা দেয়। আমরাও পথ চলা আবার আরম্ভ করি। বনভূমিও শেষ হয়। খানিকটা ধসে-পড়া পাহাড়ের গা দিয়ে নীচের দিকে নামা। সেখানে লেতে খোল নদী। নদীর উপর সদ্য বৃষ্টি ধোওয়া ঝকঝক করে নতুন-তৈরি কাঠের সেতু। পুলের দু-দিকে লাল নীল রঙের পতাকা। ওপারে খানকয়েক ঘর। তারপরই খানিক চড়াই,—পাহাড়ের গা বেয়ে পথ ওঠে। সন্ধ্যা ছায়ায়, আবছায়া আলোয় দিনশেষের চড়াই পথ—তেমন বেশি কিছু না হলেও—দেহে ক্লান্তিবোধ আনে।

চড়াই শেষে পাহাড়ের কাঁধে সমতল মালভূমি, চাষের জমি। তারপরই আরম্ভ হয় লেতে গ্রাম (৮,০০০ ফুট)। ঘাসা থেকে মাইলচারেক দূর। পথে বৃষ্টি পাওয়ায় পৌঁছুতে ঘণ্টা দুই-এর কিছু বেশি সময় লাগল। পথের দু-পাশে বাড়ির পাঁচিল, মাঝে সরু পথ। অনেকখানি এগিয়ে সুন্দর এক পাকা বাড়ির প্রকাণ্ড হল-ঘরে আশ্রয় পাওয়া গেল। শেরপাদের দেশে পরে যেমন দেখেছি, এখানকার থাকালিদেরও তেমনি একই প্রথার গৃহব্যবস্থা। একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যেই উনুন, রান্নাবান্না, সেখানেই খাওয়াদাওয়া, বসা, রাত্রে শোওয়া, একপাশে ভাঁড়ার, জিনিসপত্র সাজানো, ঝকঝকে বাসনকোসন, আর এক কোণে বুদ্ধমূর্তি—পূজার সাজসরঞ্জাম। তবে, এখানেও, পথে নেপালীদের ঘরে যেমন, উনানের ক'হাত উপরে সিক-এ ঝোলানো সারি সারি কাঁচা মাংসপিণ্ড।

ঘরের একধারে আমাদের শয্যা পাতা হয়। বাইরে আবার বৃষ্টি নামে। আট হাজার ফুট উঁচুতে রয়েছি,—তার উপর পথে বৃষ্টিতে ভিজে আসা,—বেশ শীত বোধ হয়। পুরাহাতা গলাবন্ধ সোয়েটারটা

আজ প্রথম বার করি। কলকাতায় আলমারিতে নেপ্‌থলিনের গুলি দেওয়া ছিল—সেকথা ভুলে যাই। গুলিগুলা ছড়িয়ে পড়ে, আশেপাশে গড়িয়ে যায়। সতর্ক হয়ে সবগুলি খুঁজতে থাকি। মনে আশঙ্কা হয়, যদি একটা কোথাও পড়ে থাকে,—ঘরের মধ্যে গৃহস্বামিনীর একটা ছোট ছেলে ঘোরাফেরা করছে, যদি দেখতে পেয়ে খাদ্য ভেবে মুখে দেয়! টর্চ নিয়ে ভাল করে চারপাশ খুঁজে দেখি।

রাত্রি হলে একদল তিব্বতী ব্যবসায়ীও এসে ঐঘরেই আশ্রয় নেয়। এ যেন ধর্মশালায় একঘর যাত্রীর সঙ্গে রাত কাটানো। গৃহস্থের ছোটছেলেটি অসুস্থ। সারারাত কাশে। কাশির দমকে যেন তার দম আটকে আসে। মণি ডাক্তার। চিন্তিত হয়। মন্তব্য করে, এ যে হুপিং কাফ! এর ওষুধ আনি নি তো সঙ্গে!

পরদিন পদযাত্রার সপ্তম দিন। ভোরে উঠেও আজও যাত্রা করতে বিলম্ব হয়।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে পথ। আশপাশে খেত। কাল সন্ধ্যা নেমেছিল এখানে পৌঁছুতে, দূরের দৃশ্য অন্ধকারে ঢাকা ছিল। আজ দিবালোকে প্রকাশ পায়। গগন আলোকিত করা বিরাট তুষারশিখরাবলী। একদিকে অন্নপূর্ণার নীলগিরি, অপর দিকে ধবলগিরি, তারই কোলে গ্রামের নিকটে টুকুচে শিখর।

পথ আবার কালীগণ্ডকীর সঙ্গ ধরে। লেতে থেকে আধ ঘণ্টা আসার পর কালাপানি গ্রাম (৮,৪০০ ফুট)। গণ্ডকীর উপর কাঠের পুল। ওপারে পাহাড়ের গায়ে রাস্তা দেখা যায়। এপারেও পথ নদী না পেরিয়ে সোজা চলে যায়। একা চলেছি। দাঁড়িয়ে ভাবি, কোন্ পথ ধরে যেতে হবে? দু-দিকেই লোক চলাচলের পদচিহ্ন। অমন ভাল পুল যখন, যাত্রাপথ ঐদিকেই হবে। পুল পার হয়ে অপর পারের রাস্তা ধরে এগুতে যাব, পথের ধারের বাড়ি থেকে এক মহিলা বেরিয়ে আসেন। আমাকে এ-পথে যেতে দেখে যা বলেন তা দুর্বোধ্য হলেও তাঁর হাতের ভঙ্গি ও সঙ্কেত থেকে সুস্পষ্ট হয়, ওপার দিয়ে মুক্তিনাথের যাত্রাপথ।—অতএব, আবার পুল পার হয়ে ফিরে আসা। পুরানো পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া। পরে জানতে পারি, অপর পারের পথও খোবাং-এ এ-পথের সঙ্গে মিলিত হয় বটে, কিন্তু বর্ষাকালে সংযোগ থাকে না, ওদিকের নদীর উপর পুল ভেঙে যায়, এখনও তাই ভাঙা। একা আপন মনে এগিয়ে চলেছি। ডাইনে কালীগণ্ডকী, বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে বন,—fir, birch, কিছু কিছু cypressও।

খানিকদূর আসার পর পথ যেন সূক্ষ্ম দেহ ধরে পাশের জঙ্গলে পড়ে। আবার পথ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। জঙ্গলের মধ্যে খানকয়েক ঘর। দু-তিন জন লোকও দেখি। এগিয়ে জিজ্ঞাসা করি,—মুক্তিনাথ?—ইসারা করে দেখিয়ে দেয়, নেমে যেতে হবে নদীর বেড্-এ বালুচরে। তাই করি। বালির উপরই মানুষের পায়ের ছাপও দেখতে পাই। সেই চিহ্ন ধরে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে পথ আবার নদীর চর ছেড়ে পাড়ে ওঠে। জঙ্গলের সঙ্গে ধরে। একটা জলশূন্য শুকনা নদী পার হয়ে খানিক যেতেই দুটো চালাঘর। পথের পাশে দুই বিদেশিনী অভিযাত্রী বিশ্রাম করছেন। চোখাচোখি হতেই হাসিমুখে অভিবাদন জানান। যাত্রা শেষ করে তাঁরা এখন ফিরে চলেছেন। মনভরা আনন্দের পশরা নিয়ে। চোখে মুখে তৃপ্তির আভা। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, এইবার দেখবেন এ-পথের আরও কেমন মনোমুগ্ধকর দৃশ্য,—এগিয়ে যান, উপভোগ করুন। তারপরই হেসে যোগ করেন, একটু এগুলে চড়াই-এর মুখে ছোট একটা চায়ের দোকানও পাবেন, সেখানে একটু বসবার সুযোগ যেন হারাবেন না।

হাসিমুখে তাঁদের প্রতি-সম্ভাষণ জানিয়ে এগিয়ে যাই।

নদীর এখানে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। ডান দিকে বাঁক ঘুরে নদী নেমে আসে। পথও তারই উপকূল ধরে ধনুকাকারে বেঁকে যায়। পথের বাঁ পাশে বড় বড় গাছ। অতি মনোরম ছায়াশীতল পরিবেশ। পথ যেন পাহাড়ের গায়ে ঢেউ খেলে কখনও কিছু উপরে ওঠে আবার নীচে নামে। ছোট ছেলেদের মত যেন see-saw—ঢেঁকিকল খেলে। পাশেই গণ্ডকী। নদীর বুকে স্বর্ণবরণ বালুচর, মাঝে মাঝে শিলাস্তূপ। জলধারার সবুজ রঙ। পথের সামনে ও পাশে দেখা যায় কোথাও ধবলগিরির, আবার কোথাও অন্নপূর্ণার কোন তুষার শিখর। চারিপাশে হিমালয়ের অপূর্ব সৌন্দর্য। চলতে চলতে দাঁড়িয়ে যাই। মন ভরে আকণ্ঠ পান করি সেই অতুলনীয় শোভা, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। মণি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। মৃদুকণ্ঠে আক্ষেপ জানায়, কী চমৎকার জায়গা দাদা!—Ideal camping ground—সব ছেড়েছুড়ে এসে কুটির বেঁধে যদি থাকতে পারতাম এখানে!

আধ মাইলটাক আরও এগিয়ে গেলে সামনে নেমে আসে আর এক বড় নদী, Gatte খোলা,—কালীগণ্ডকীতে মেশে। মিলনের আগে নদী যেন হাত বাড়িয়ে বুক ছড়িয়ে আসে। সাগরে বিলীন হওয়ার

আগে বড় নদীর মোহনায় যেমন বদ্বীপের সৃষ্টি হয়, এখানেও ক্ষুদ্রাকারে তেমনি ঘটে। দিকে দিকে জলের ধারা, মাঝে মাঝে বালির দ্বীপ। প্রধান ধারার উপর পারাপারের কাঠের পুল।—পশ্চিমে দেখা যায় ধবলগিরির তুষার চূড়া (২৬,৮১০ ফুট)। মনে হয়, এখান থেকেই য়েন প্রায় আঠারো হাজার ফুট সোজা উঠে গেছে আকাশমুখী।

নদীর অপর পারে পৌঁছে নদীতীরে চালাঘর। বন্ধু বলে, ঐ নিশ্চয় সেই মেমসাহেবের বলা ছোট্ট চায়ের দোকান। চলুন, সবাই গিয়ে খেয়ে আসি।

চা পানান্তে আবার চলা। খানিকটা চড়াই পথ। পাহাড়ের ওপাশে নেমে আবার গণ্ডকীর সঙ্গ পাওয়া।

নদীর ধারে, পাহাড়ের গায়ে বেশ বড় গ্রাম আছে। নাম শুনি লারজুং। ৮,৪০০ ফুট। বাড়ির পর বাড়ি পার হয়ে চলি। মাঝে একটি নদীও পার হই। আবার পথের পাশে বাড়ি। গ্রাম যেন শেষই হয় না। কত বড় গ্রাম? তখন শুনি, সে-গ্রাম ছাড়িয়ে চলে এসেছি। এখন পথ চলেছে খান্তিগ্রামের মধ্য দিয়ে। হিন্দুরা বলে দেবীস্থান। অথচ, গ্রামগুলিতে সম্পূর্ণ তিব্বতীপ্রভাব। লোকজনের পোশাক পরিচ্ছদে, ভাষাতে, গ্রামের চেহারাতেও। বাড়িগুলি কাঠের বা পাথরের তৈরি। গ্রামে প্রবেশের পথে বা শেষ সীমায় পথের উপর তোরণ। ভিতরে দেওয়ালের গায়ে বা ছাদের নীচের দিকে 'সিলিং'-এ সুন্দর রঙিন-প্রাচীরচিত্র,—সযত্নে জাল দিয়ে ঢেকে রাখা। বুদ্ধদেবের বা বোধিসত্ত্বের বিভিন্ন ধরনের মূর্তি আঁকা। পথের দু-পাশে বাড়ি তো আছেই, মাঝে মাঝে পথের মাথার উপরও কাঠের ঘরের মতন--যেন দু-দিকের বাড়িতে উপর দিয়ে যাতায়াতের সেতু। পথের পাশে দোকানপাট, হোটেল সব কিছুই রয়েছে।

গ্রামগুলি পার হয়ে এসে পাহাড়ের কোল ছেড়ে পথ নীচে নদীর বুকে নামে। নদীর 'বেড'—নদীগর্ভে দীর্ঘপ্রসারিত। বালির উপর দিয়ে এখন চলা, মাঝে মাঝে ক্ষীণাঙ্গী জলধারা ডিঙিয়ে যাওয়া। সমতলপথ,—চড়াই উৎরাই-এর কোন প্রশ্ন ওঠে না। ধু-ধু করে নদীর বুক, চিকমিক করে সামনের বালুচর, নদীর জলপ্রবাহেও সূর্যকিরণের ঝিকমিক, দূরে সামনে, যেন নদীর শেষ প্রান্তে, দেখা যায়—অনেকগুলি ঘর বাড়ি।—ঐ, শুনি, টুকুচে,—থাকালিদের প্রধান গ্রাম। আজ এবেলা আমাদের এখানে আহার বিশ্রাম।

নদীবক্ষে বালির উপর নেমে সেদিকে তাকিয়ে দেখে ভাবি, ও আর পৌঁছুতে কতক্ষণ! সোজা বালির উপর দিয়ে হাঁটা, হন্ হন্ করে পা চালিয়ে কিছুক্ষণেই পৌঁছে যাব!

তখন কি আর জানি, এই আপাত-সহজ পথেও এগিয়ে যাওয়ার কঠিন পরিপন্থী দুর্জয় বায়ুবেগ। হাঁটতে গিয়ে দেখি, নদীর উপত্যকায় সামনে থেকে ঝড়ের মত বাতাস ছুটে আসে। এ যে নদীবক্ষে জলস্রোতের উজান নয়, পবনের প্লাবন। দ্রুত এগিয়ে চলব, সাধ্য কী! সামনে ধাক্কা দিয়ে পেছিয়ে দেয়। মনে পড়ে, মানসসরোবর যাত্রাকালেও তিব্বতে এই ধরনের বাতাসের সম্মুখীন হতে হয়েছিল! শুধু বায়ুবেগই নয়, উড়িয়ে আনে ধূলাবালি। তীক্ষ্ম শরের মত উড়ে এসে হাতে মুখে চোখে যেন সূঁচ ফোটায়। ভীমবাহাদুর বলে, আজ ও কাল দুদিন এই ঝড়ের মত হাওয়া পেতে হবে। একটু বেলা হওয়ার পর থেকেই এ বাতাস ওঠে, সারাদিন চলে। ভোরে এ-জায়গা পার হতে পারলে এ বাতাস থাকে না।

ভাবি, এখন তো সূর্যকে ঠেলে পেছিয়ে দিয়ে ভোর আনানো যায় না! নিজেরই চোখে কৃত্রিম ভোরের ছলনা সৃজন করি। সেই প্রবল বাত্যার সম্মুখে নতি স্বীকার করে, চোখে নীল চশমা লাগিয়ে, মাথা হেঁট করে, দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতে থাকি,—এ যেন প্রচণ্ড বাতাসের প্রতিকূল স্রোতে সন্তরণের চেষ্টা। ফলে, অমন সহজ সুগম পথও দুর্গমতর রূপ ধরে, টুকুচে গ্রামও যেন কেবলই চোখের উপর দূরে সরে যেতে থাকে,—এগিয়ে চলেও যেন কোনমতে পৌঁছান যায় না। কিন্তু গ্রাম তো প্রকৃতই সরে না,—দৃষ্টি ও মনের ভ্রমমাত্র। শম্বুক গতিতে হাঁটলেও আমরা প্রতিপদক্ষেপে এগিয়েই যাই এবং অবশেষে টুকুচের নিকটে পৌঁছাইও। দেবীস্থান থেকে আসতে একঘণ্টারও ওপর সময় লেগেছে।

গ্রামের সন্নিকটে বাঁ দিকের পাহাড়ের ওপর থেকে এক নদী নেমে আসে, গণ্ডকীতে মেশে। আমাদের পথও গণ্ডকীর বক্ষ ছেড়ে পাহাড়ের গায়ে ওঠে, সেই ছোট নদী পার হয়। নদীর উপর রঙচঙে কাঠের সেতু। এতক্ষণ সম্ভবত বাতাসের বিরুদ্ধে চলার পরিশ্রমে শীতের প্রাবাল্য বোধ হয়নি। এখানে সোজা পথে বায়ুর হিমশীতল স্পর্শ দেহে শিহরণ জাগায়। গরম সোয়েটার গায়ে দিয়ে গ্রামে ঢুকি। লেতে থেকে ঘণ্টাচারেকের উপর লাগল এখানে পৌঁছুতে। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ৮,৫০০ ফুট উঁচুতে, চারিপাশে কাঠ ও

পাথরের তৈরি বাড়িগুলি যেন এক জায়গায় জড় করা। উঁচু উঁচু পাঁচিল ঘেরা। বোধ হয়, প্রচণ্ড বাতাসের আক্রমণ রোধ করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা। গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন দিকে পথ গিয়েছে। ক'দিন আগে পথে সাক্ষাৎ পাওয়া সেই পঞ্চায়েত অফিসারের বলে-দেওয়া এখানকার ঠাকুরপ্রসাদজির নাম ভুলি না। একটা দোকানের সামনে ক'জনকে দেখে তাঁর বাড়ির সন্ধান নিই। সঙ্গীদের দোকানে বসিয়ে রেখে সংবাদদাতাকে সঙ্গে নিয়ে দেখতে চলি, সেখানে ওঠা চলে কিনা। পথপ্রদর্শক লোকটি অল্প হিন্দী জানায় সুবিধা হয়। কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলি। জানতে পারি, ঠাকুরপ্রসাদজি এ-অঞ্চলের নাম-করা ধনী ব্যবসায়ী। জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি করেন?—বলেন, দরজির কাজ, দোকান আছে।

দুপুরের আহারের ব্যবস্থার কথা ভেবে জানতে চাই, "দুধ বা ভাল দই মিলবে?"—"এত বেলায় দুধ হয়ত পাবেন না, দই জোগাড় হতে পারে।"—তখনই দুটো টাকা তাঁকে দিই, ঠাকুরপ্রসাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তিনি যেন দই কিনে আমাদের দিয়ে যান। গ্রামের একপ্রান্তে উপস্থিত হই। একটা লম্বা বিরাট দোতলা পাকা বাড়ির সুমুখে পাথর বাঁধানো প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। একপাশে উঁচু পাঁচিল। উঠানের এক অংশে বৌদ্ধ চোরটেন। সদর দরজার সামনে দুটো ঘোড়া দাঁড়িয়ে। এক ব্যক্তি ঘোড়ার উপর বসে। অপর জন উঠতে উদ্যত। পথপ্রদর্শক দেখিয়ে দেয়, ঐ ঘোড়ায় চাপছেন ঠাকুরপ্রসাদজি।—আপনি গিয়ে আলাপ করুন। আমি আপনার সঙ্গীদের পাঠিয়ে দিচ্ছি,—দই-ও নিয়ে আসছি,—বলেই তখনই চলে যায়।

এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরপ্রসাদকে অভিবাদন জানিয়ে বলি, আপনার পরিচয় পেয়েছি পথে অফিসারের কাছে। এবেলা এখানে কোথায় বিশ্রামস্থান পাওয়া যাবে যদি বলে দেন।

সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি বলেন, কোথায় আবার? আমার এখানেই থাকবেন। কিন্তু শুধু এবেলা কেন? রাত্রিটাও এখানে কাটিয়ে যান। একটা বিবাহ উপলক্ষ্যে আমাকে এখনই চলে যেতে হচ্ছে, ফিরতে হয়ত সন্ধ্যা হবে,—আসুন আপনাদের থাকবার ব্যবস্থা করিয়ে দিয়ে রওনা হই।

সঙ্গীরাও এসে পড়েন। সবাইকে নিয়ে তিনি বাড়ির মধ্যে চলেন।

এ যেন আমাদের দেশের সেকালের জমিদারদের চকমিলানো অট্টালিকা। বাড়ির মাঝখানে প্রকাণ্ড বাঁধানো উঠান। তারই চারিদিক ঘিরে দোতলা মহল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে, খোলা বারান্দার কোলে সুন্দর সাজানো একটা ঘর খুলে দেন। দুজনের অনায়াসে শোবার মত পালঙ্ক—ধবধবে শয্যাও পাতা। মেঝেতে ঘরজোড়া কার্পেট বিছানো। সোফা সেট্। দেওয়ালের গায়ে আলমারি,—জামাকাপড় রাখা। খোলা শেলফ্-এ খানকতক বই। একপাশে টেবিল চেয়ার।

জিজ্ঞাসা করেন, এটাতে হয়ে যাবে? পাশে আরও খালি ঘর রয়েছে,—তাও ব্যবহার করতে পারেন। এটা আমার এক ছেলের ঘর, সে এখন কাঠমাণ্ডুতে। সেখানে পড়াশুনা করছে।

অভ্যর্থনার বহর দেখে আশ্চর্য হই। বলি, এখানে যথেষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু, রান্নার জায়গা? সঙ্গে আমাদের লোক আছে, দু-একটা বাসন ও উনান পেলেই সেই সব করে নেবে।

তিনি হেসে বলেন, থাকবেন আমার বাড়িতে, আর খাওয়ার ব্যবস্থা হবে না? স্ত্রী নিজেই সব এখনই করে দেবেন—চলুন, আলাপ করিয়ে দিই।

বারান্দা ও কয়েকটা ঘর পেরিয়ে অপর দিকে অন্দর মহলে নিয়ে যান। স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ঠাকুরপ্রসাদ হিন্দী ও ইংরেজী জানেন। স্ত্রী ইংরেজী তো জানেনই না, হিন্দীজ্ঞানও সামান্যই।

তাঁর জিম্মায় আমাদের রেখে ঠাকুরপ্রসাদ তখনই চলে যান। ভক্তি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ভাঁড়ার ও রান্নার ঘরে বসে আলাপ জমায়।

আমরা আমাদের ঘরে ফিরে আসি। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হই। অদূরে কালীগণ্ডকী। তার অপর পারে তুষারকিরীট নীলগিরি পর্বত (২৩,৬৯৮ ফুট),—অন্নপূর্ণা শৈলমালার এক অংশ। পাহাড়ের বুকে সূর্যকিরণ পড়ে নীলগিরি নামকরণের সার্থকতা প্রচার করে,—প্রকৃতই তার সারা দেহে স্নিগ্ধ নীলাভা ফুটে থাকে।

হঠাৎ মনে পড়ে, ঠাকুরপ্রসাদের স্ত্রীকে বলা হয়নি, আমাদের ব্যঞ্জনে যেন লঙ্কা না দেন। পাহাড়ে ঘোরার সময় লঙ্কা আমরা আদৌ খাই না বলে প্রচার করি। না হলে, পাহাড়ীদের সাবধান করিয়ে দিলেও তাদের অল্প ঝালও আমাদের মুখে প্রচণ্ড ঝাল বোধ হয়।

রান্নার জায়গায় গিয়ে দেখি, মহিলা এরই মধ্যে নানান সবজি সংগ্রহ করেছেন,—বাঁধাকপি, মটরশুটি পর্যন্ত বিরাজমান। এ-সবই এখানে এঁদের বাগানে ফলে।

তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চলছে, এমন সময় ভীমবাহাদুর বাইরে থেকে ডাক দিয়ে জানাল দুধ ও দই নিয়ে সেই লোকটি এসেছে। উৎফুল্ল হয়ে গৃহস্বামীকে খবরটা জানিয়ে বাইরের ঘরের দিকে চলি, তিনিও পিছু পিছু আসেন। সিঁড়ির কাছে লোকটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মহিলা গম্ভীর হয়ে যান, রুক্ষস্বরে তাকে আদেশ করেন, তক্ষুনি যেন নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। আমার পানে বিস্মিত দৃষ্টি ফেলে বলেন, ঐ লোকটাকে বলেছিলেন দুধ, দই আনতে? ও যে দরজি। ওর হাতে-আনা জিনিস খাবেন কী! আমাদের বাড়ির ভেতর ওদের ঢোকাই নিষেধ। দই আমার ঘরেই আছে আপনাদের দেব আমি।

আমি তো স্তম্ভিত! এখানেও জাতিভেদ! বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও! ভীমবাহাদুরকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে দিই, দইটা আমাদের পাত্রে রেখে দিক, দুপুরে ঘোল করে খাওয়া যাবে। দুধটাও বাইরে কোথাও আগুন জ্বালিয়ে গরম করে রাখুক।

দ্বিপ্রহরের আহার আজ গুরুভোজে পরিণত হয়। তারপর ঘরে এসে বিশ্রাম। খোলা শেল্‌ফে বইগুলির মধ্যে দেখি, Maurice Herzog-এর Annapurna বইটি,—সর্বপ্রথম অন্নপূর্ণা শিখর বিজয়ের সেই রোমাঞ্চকর অপূর্ব কাহিনী!—আর এখন আমি সেই অন্নপূর্ণারই পাদমূলে বসে! বইটি হাতে নিয়ে মলাট উলটাতেই দেখি, Herzog-এর স্বাক্ষর। ঠাকুরপ্রসাদের পুত্রকে সাদর উপহার দেওয়া।

ধবলগিরি ও অন্নপূর্ণা পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে টুকুচে জনপদের অবস্থান। ঐ উভয় পর্বতেরই অভিযাত্রীদল যাত্রাপথে এখানে কিছুকাল কাটান। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সংযোগও রাখেন—বইখানি তারই সাক্ষ্য দেয়।

বিকালে ঠাকুরপ্রসাদ ফিরে আসেন। চায়ের আসর বসে। গল্পও জমে। আমাদের যাত্রাপথের ব্যবস্থাদি কি করা হয়েছে তাও জানতে চান।

বলি, ব্যবস্থা আগে থেকে কিছুই করা হয়নি। পথ ধরে চলেছি, যেখানে যেমন থাকা-খাওয়ার আয়োজন হয়ে যায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা হিমালয়-যাত্রা পথের নিয়ম।

তিনি খুশি হয়ে বলেন, ঠিক কথাই। তবু, আপনাদের যদি কিছুটা সাহায্য করতে পারি, তাই ভাবছি। কাল আপনারা ঝুম্‌সুম-এ পৌঁছুবেন। সেখানে আমার আত্মীয় ও পার্টনার—ব্যবসায়ের অংশীদার—সাক্‌স্ বাহাদুরের বাড়ি রয়েছে—সেইখানে উঠবেন, চিঠি লিখে দিচ্ছি। ঠাকুরপ্রসাদের কাছে থাকালিদের সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনি। কয়েক বছর পরে Chrisvon Fiirer Haimendorf-এর Himalayan Traders-Life in Highland Nepal (1975) বইখানি পড়েও বহু মূল্যবান তথ্যাদি জানতে পারি।

নেপাল-হিমালয়ের উত্তর সীমান্তে কয়েকটি অঞ্চলে এক শ্রেণীর বাসিন্দা দেখা যায়, যাদের ভাষা তিব্বতী, ধর্ম বৌদ্ধ। হিমালয়ের পরপারে তিব্বতের সঙ্গে তারা ব্যবসা চালায়। নেপালের এই অংশেও তেমনি পোখরা ও বাদলুঙ থেকে, কালীগণ্ডকীর তীর ধরে মুস্‌টাঙ্‌-এর উত্তরে পৌঁছে তিব্বতে ব্যবসা করতে যাওয়ার এক বাণিজ্য-পথ আছে।

অন্নপূর্ণা ও ধবলগিরির মধ্যবর্তী সেই উপত্যকা-পথ দিয়ে আমরা এখন চলেছি। এ-অঞ্চলকে বলা হয়, থাকখোলা। অধিবাসীরা থাকালি নামে পরিচিত। এখানকার গড়পরতা উচ্চতা ৭,৫০০ ফুট। বহুকাল থেকে এই থাকালি সম্প্রদায় তিব্বতীয় লবণ ব্যবসার একচেটিয়া ব্যবসায়ী ছিল। এরা কিন্তু হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলে তিব্বত সীমান্তবাসীদের মতন "ভোটিয়া" সম্প্রদায়ের নয়। তিব্বতীয় সভ্যতার প্রভাবে এলেও থাকালিরা জাতিগতসূত্রে তামাং, গুরুং, মগর প্রভৃতি নেপালী সম্প্রদায়ভুক্ত বলেই অনুমান করা হয়। থাকালিরা তাদের আপন ভাষায় নিজেদের তামাং বলেই অভিহিত করে। যদিও, নেপালের মধ্য ও পূর্ব অঞ্চলের তামাংদের সঙ্গে তাদের এখন আর কোন যোগসূত্রই নেই। এদের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু দুই ধর্মেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

থাকালি অঞ্চলও প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণ অঞ্চলের নাম থাক্‌সাৎসে—Thaksatsae। সাতশত ঘর নিয়ে থাক্। যার প্রধান গ্রাম টুকচে বা টুকুচে।

এখান থেকে আরও উত্তরে—অর্থাৎ পাহাড়ের আরও উপর অংশে "পাঁচগাঁও"—পঞ্চগ্রাম। আগামীকাল আমরা তারই পাশ দিয়ে যাব,—মার্ফা, সিয়াঙ, চিওঙ, ডেরোক ও ঝুম্‌সুম্-থিনি।

থাক্‌সাৎসের থাকালিরা নিজেদের উচ্চশ্রেণীর মনে করে। হয়ত, তার একটা কারণ,—অর্থবল টুকুচেতে অবস্থাপন্ন ধনী ব্যবসায়ীদের বাস। পাঁচগাঁও-এর লোকেরা ছোটখাট ব্যবসা নিয়ে থাকে। তারা গোঁড়া বৌদ্ধধর্মী। অনেকেই তিব্বতীয় বন্ Bon ধর্মের—আদিম জড়োপাসনায় বিশ্বাসী। কাঠমাণ্ডু ও নেপালের নিম্নপ্রদেশের হিন্দুদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগও কম। টুকুচের ব্যবসায়ীদের কাছে পাঁচগাঁও-এর লোকেরা কাজকর্ম করতে আসে। তবুও, তারা নিজেদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে,—বিবাহাদিও নিজেদের মধ্যেই হয়।

পাঁচগাঁও-এর উত্তরে থাকখোলা। তার নাম—'বারোগাঁও'—দ্বাদশগ্রাম, যদিও সেদিকে গ্রামসংখ্যা বারোটার বেশি। বারোগাঁও বিস্তীর্ণ হয়েছে—Lo (লো) মুসটাঙ্ ভোট সীমানা পর্যন্ত। পশ্চিমে Dolpo। পুবে—মানাঙ্ ভোট। এ-অঞ্চলের বাসিন্দারা ভোটিয়া-তিব্বতী সম্প্রদায়ের। থাকালিরা এদের বলে বারোগাঁঅলী। বারোগাঁও—দশ হাজার ফুট উঁচুতে। উষর মরুভূমিপ্রায় সে অঞ্চল। চাষবাস অতি সামান্য। জমির যে-অংশটুকুতে লাঙল চালানো সম্ভব, তাইতেই যেটুকু ফসল ফলে।

মুক্তিনাথের পথে ঝুম্‌সুম্ ছাড়িয়ে আমরা বারোগাঁও-এর কয়েকটি গ্রাম দেখতে পাব। তার মধ্যে কালীগণ্ডকীর তীরে কাগবেণী প্রধান ও প্রসিদ্ধ। ঐ সকল অঞ্চলে তিব্বতীয় প্রভাব অত্যধিক হওয়ার কারণ,—Lo বা মুসটাঙ্ এক সময়ে তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আঠারো শতকের শেষভাগে নেপালের আধিপত্যে আসে। এই কারণেই, সম্ভবত মুসটাঙ্ অঞ্চলের অধিবাসীরা মাঝে মাঝে নেপাল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

অপরপক্ষে, থাকালিরা কিন্তু নিজেদের নেপালী বলে প্রচারে গৌরবই বোধ করে থাকে। তার কারণও পাওয়া যায়। থাকখোলার আরও পশ্চিমে—জুমলা। থাকখোলা এক সময়ে এই জুমলার রাজাদের অধীনে ছিল। তারপর, তেরো শতকে মল্লা রাজাদের রাজ্যভুক্ত হয় এবং ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে গোরখাদের বিজয়ে পৃথ্বীনারায়ণ শাহ্-র রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কোন কোন বিশেষজ্ঞের অভিমতে, থাকখোলার আধুনিক অধিবাসীরা পশ্চিমে Dolpo অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে এসে এখানে বসবাস শুরু করে।

টুকুচের প্রাধান্যের কারণ, তিব্বতী ও নেপালী পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচার ব্যবসার এইখানেই মূল কেন্দ্র গড়ে ওঠে। Tuk-che কথাটার নাকি অর্থ Tuk = শস্য, Che = সমতলস্থান।

সেই দীর্ঘকালব্যাপী ব্যবসার এখন অবনতি ঘটেছে। ঠাকুরপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুঃখপ্রকাশ করেন, পাহাড়ের এই সুদূর অঞ্চলে এই বিরাট ব্যবসাক্ষেত্র এখন প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছে! একসময়ে তিব্বতের লবণ ইত্যাদি আমদানির ও নেপালের ফসলাদির চালানের অবাধ বাণিজ্য আমাদের একচেটিয়া ছিল। ১৯২৮ সালে নেপাল সরকার সেটা একরকম বন্ধ করে দিলেন। বহিঃশুল্ক কাস্টম্‌স্ আদায়ের আইন চালু হল, নীচে দানাতে দপ্তর বসল, কারবার করার অধিকার প্রতি তিন বছরের জন্য নীলাম করে বিলি করার প্রথা প্রচলিত হল। দানাতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতও বসল। আমাদের স্বাধীন ব্যবসাও গুটাতে হল। এর পর আবার চীন তিব্বত অধিকার করার ফলে, তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যের পথ একরকম বন্ধই হয়ে গেছে। এখন আমরা নীচে চলে যাই ব্যবসা করতে; কাঠমাণ্ডু, বাদলুঙ্— এ-সব জায়গাতে তো বটেই, এমন কি বম্বে, কলকাতা, দিল্লীতেও। আমাকে তো কয়েকবারই কলকাতায় যেতে হয়েছে। তবে, এ ধরনের ব্যবসা চালানো সহজ তো নয়ই, ভবিষ্যতে উন্নতিরও আশা দেখি না। তাই এক ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছি জার্মানীতে—সেখান থেকে এঞ্জিনিয়ারিং শিখে আসবে।

ভাবি, আসবে ঠিকই, তার ব্যক্তিগত জীবনে হয়ত সাফল্যও লাভ করবে, কিন্তু তার জন্মস্থান টুকুচের কি হৃত-গৌরব ফেরাতে পারবে?

আবার তখনই মনে হয়, এ হল মানুষের গড়া শহরের উত্থান-পতনের ও জনজীবনের সুখ-দুঃখের ইতিহাস। বিশ্বপ্রকৃতি কিন্তু নিরাসক্ত, নির্বিকার। তাই, পরদিন যখন আবার পথে নামি, তাকিয়ে দেখি, হিমালয়ের সেই চিরন্তন মহিমান্বিত রূপরাশি, টুকুচে স্থানটির পরম রমণীয় পরিবেশ। তিব্বতের মতন শুষ্ক বাতাবরণ হলেও আশেপাশে তরুলতার স্নিগ্ধ শ্যামল শোভা; পাইন, সাইপ্রেস, জুনিপার জাতীয় কিছু গাছপালা। অদূরে কল্লোলিনী কালীগণ্ডকী। তার এককূলে নীলগিরি পর্বত। অপর দিকে টুকুচে পর্বত। তারই চূড়ার দিকে তাকাতেই দৃষ্টি আবদ্ধ হয়। শুচিশুভ্র তুষার ক্ষেত্রে এক কৃষ্ণবিন্দু,—যেন

দুগ্ধফেননিভ শয্যা, পরে কৃষ্ণকায় পিপীলিকা। দূরবীন দিয়ে দেখি,—শিলাস্তূপ নয়,—সচল প্রাণী। হয়ত আমাদের যাত্রারম্ভে সেই পথে-দেখা আমেরিকান অভিযাত্রীটি। টুকুচে শিখর বিজয়ের তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে!

টুকুচের লোকালয় ছাড়িয়ে এসে সম্পূর্ণ তরুলতাশূন্য নগ্ন পাহাড়। তবুও তারও এক অভিনব রমণীয়তা থাকে। রুক্ষ, শুষ্ক গিরিশ্রেণী,—পিছনে দূরে তুষারচূড়া,—পাহাড়ের অঙ্গ কপিশ বর্ণ। তারই মাঝে মাঝে কালো কালো শিলাস্তূপ, পাদদেশে কালীগণ্ডকীর স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছধারা—ওপারে পাহাড়ের গায়ে গ্রাম,—নদীর উপর পারাপারের সেতু,—মানুষ যেন প্রকৃতির কোলে একাঙ্গ হয়ে বাস করে। নদীর উপর পুল থাকলেও আমাদের পথ এ-পার দিয়ে। এগিয়ে চলি,—মাঝে মাঝে পাহাড়ি নদী পার হতে হয়। কয়েকটি গ্রামও আসে। ঘণ্টাচারেক চলার পর বেশ বড় গ্রাম দেখা দেয়। সেই পাঁচগাঁও-এর প্রথম গ্রাম মার্ফা। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ের দেওয়ালে সারি সারি সাজানো বৌদ্ধ ধর্মচক্র,—নানান রঙে রঙিন। চক্রগুলি একের পর এক হাত দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে চলি,—টুং টাং মিষ্ট শব্দ ওঠে,—যেন মন্ত্রের মধুর ধ্বনি ফোটে! গ্রামের প্রবেশ মুখে ও গ্রামের শেষ প্রান্তে পথের উপর তোরণ,—ভিতরে প্রাচীরচিত্র। গ্রামের মধ্যে পথের দুধারে দোতলা, তিনতলা বাড়ি, দোকানপাট, বাজার মতনও। বাড়ির জানলায় কাঠের সুন্দর কারুকার্য। পথের ধারে নালা আকারের ঝরনার জল কলকল করে বয়ে চলেছে। কিন্তু, চারিপাশে আবর্জনা। লোকেদের বেশভূষাও অপরিচ্ছন্ন। আবহাওয়াও কেমন যেন অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ।

গ্রাম ছাড়িয়ে এসে নির্মল মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে স্বস্তি বোধ করি। চারদিকে তুষারশিখরগুলি রৌদ্রে ঝিক্‌মিক্ করে,—যেন হাসতে থাকে আমাদের অভিজ্ঞতা দেখে!

আবার এগিয়ে চলা। মার্ফা ছাড়িয়ে Pongkyu Khola পার হতে হয়। আর ঘণ্টাখানেক গেলে সিয়াঙ্ গ্রাম,—পশ্চিমে পাহাড়ের উপর দেখা যায়। বাঁদিকে গ্রামে যাবার পথ পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠে। ডাইনের পথ পাহাড়ের গা এড়িয়ে ঘুরে চলে। নিকটে পুলে কালীগণ্ডকী নদী পার হয়ে অপর পারে গেলে থিনিগাঁও। দূর থেকে দেখা যায়।

বেলা বেড়ে যাওয়ায় সেই ঝড়ের মতন জোর বাতাস দেখা যায়। তবে গতকালের মতন তেমন প্রচণ্ড বেগ মনে হয় না।

পাহাড়ের কোলে একটা বিস্তীর্ণ ময়দানে পৌঁছাই। বালি ও কাঁকরে ভরা। 'এয়ার স্ট্রীপ্'—ছোট এরোপ্লেন নামবার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। সেটা পেরিয়ে এলেই ঝুম্‌সুম্ বা জম্‌সম্ গ্রাম শুরু। ৮,৯০০ ফুট উঁচু। নামের অর্থ শুনি,—নূতন দুর্গ। তার প্রমাণও তখনই পাই। গ্রামে ঢোকবার মুখে নেপালী ও ভারতীয় চেক্‌পোস্ট। Wireless—বেতার দপ্তরও। নিকটে সরাইখানা, দু-একটা দোকান। চেকপোস্টে আমাদের নাম-ধাম, কি উদ্দেশ্যে আসা, কতদূর যাব ইত্যাদি প্রশ্ন করে খাতায় লিখে রাখল। ভারতীয় পুলিস-দপ্তর-প্রদত্ত সনাক্তপত্র—Identity বা Permit পত্র দেখলেই (সে-সময়ে নেপালে যেতে হলে এই প্রথার প্রচলন ছিল)।

একটা ডাকবাক্স দেখে ভাবি, এখান থেকে বাড়িতে একটা চিঠি লিখে পাঠাই। কিন্তু, খাম, পোস্টকার্ড? খোঁজ নিয়ে জানি, পাওয়া যাবে না। যাক্ নিশ্চিন্ত।—এখানে কেন, সারাপথে কোথাও কিনতে পাই নি।

অল্প এগিয়ে যেতেই রাস্তা নেমে যায় নদীর ধারে। কাঠের পুল পার হয়ে ওপারে চলি। অপরপারেই প্রকৃত গ্রাম। টাকুরপ্রসাদের আত্মীয় সাক্‌স্ বাহাদুরের বাড়িতে গিয়ে ওঠা হয়। পাথরের গাঁথনি একতলা বড় বাড়ি। বাইরে একটা লম্বা ঘর। সামনে ঢাকা বারান্দা। এখানেও সাদর অতিথিসেবার সৌভাগ্য লাভ হয়। মেয়েরা গরম-ভাজা ভুট্টোর খই এনে খেতে দেন। ভুর্‌ভুর্ করে গব্যঘৃতের সুগন্ধ। সুস্বাদুও তেমনি।

আজ ও-বেলা আর পথ চলা নেই। বাইরে রোদের তেজও যেমন প্রখর, কনকনে বাতাসের বেগও তেমনি প্রচণ্ড। এ-অঞ্চলে দুপুরে না হাঁটাই প্রশস্ত। তাই এখানে রাত্রিবাস করে কাল সকালে সোজা মুক্তিনাথ পৌঁছানো। দূরত্ব তেমন বেশি নয়,—তবে, চড়াই পথ। ৮,৯০০ ফুট থেকে ১২,৪৫০ ফুট-এ ওঠা।

রোদের মধ্যে হেঁটে এসে শরীরে গরম বোধ হচ্ছিল। ভাবলাম, নদীতে গিয়ে গা-হাত-পা ভাল করে

ধুয়ে আসি। কাপড়-চোপড় নিয়ে গেলামও তাই। কিন্তু, নদীর ধারে নেমে জলে হাত দিতেই সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে,—কী দুঃসহ তুষারশীতল জলধারা।—হাতের আঙুল যেন অবশ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, হিমস্পর্শ বাতাসের বেগ—হাতে মুখে যেন তীক্ষ্ণ হুল ফোটায়। স্নানের ইচ্ছা মনে উঠে মনেই মিলায়। কোন মতে মুখ-হাত ধুয়ে ঘরে ফিরি।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে বাইরের বারান্দায় বসি। কিন্তু, নিরিবিলি বিশ্রামের বিঘ্ন দেখা দেয়। একপাল তিব্বতী ছেলেমেয়ে বারান্দার ধারে জড় হয়, কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখে, পরস্পরে কী সব কথা বলে, হাসাহাসি করে,—আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকে ভিনদেশী এই যাত্রীদের!

অথচ, এ-গ্রামে এসেও শুনি, স্থানীয় কয়েকজনই কলকাতায় গিয়েছিলেন ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে। সাক্স্ বাহাদুর তো বার কয়েকই ঘুরে এসেছেন। জানালেন, তাঁরও এক ছেলেকে জার্মানীতে কাজ শিখতে পাঠিয়েছেন।

বিকালে ভারতীয় চেকপোস্টের অফিসার—ইন্দ্রদেও সিং এলেন। সঙ্গে এক অনুচর। ও-বেলা যখন আমরা গ্রামে ঢুকি, তিনি সেসময়ে তাঁর দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন না। তিনিও তাঁর খাতায় এখন আমাদের নামধাম ইত্যাদি লিখিয়ে নিলেন। এটা নেপাল-তিব্বত সীমান্তে যাবার একটা পথ, নেপাল ও ভারত দুই রাজ্যেরই পক্ষ থেকে যুক্তভাবে পাহারা দেওয়া হচ্ছে। কর্তব্য শেষ করেও ইন্দ্রদেও অনেকক্ষণ বসে আলাপ করেন। বিহারে শোনপুরে বাড়ি। কয় বছর হল এখানে এসেছেন। বলেন, দেশ ছেড়ে কোথায় পড়ে রয়েছি! এ-যেন নির্বাসনে থাকা। ভারতীয় যাত্রী কমই এ-পথে আসেন।—তাঁর অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় বেশ বোঝা যায়, আমাদের পেয়ে তিনি নিজের দেশওয়ালির সঙ্গলাভের আনন্দ অনুভব করেন। প্রাদেশিকতার বিন্দুমাত্র ভেদাভেদ প্রকাশ পায় না।

ভাবি, দেশে থাকতে ভারতীয়দের মধ্যে এই একাত্মবোধের অভাব হয় কেন?

পথে কোথাও আমরা খাম-পোস্টকার্ড কিনতে পাইনি শুনে ইন্দ্রদেও তখনই তাঁর বাড়িতে লোক পাঠিয়ে আনিয়ে দেন, বলেন, চিঠি লিখে রাখবেন, কাল সকালে রওনা হবার সময় আমার দপ্তরে দিয়ে যাবেন, ঠিকমত যাতে পৌঁছোয় তার ব্যবস্থা করে দেব। তা ছাড়া, Wireless-এ কাঠমাণ্ডুতে ভারতীয় এম্ব্যাসি—পররাষ্ট্র দপ্তরে বলে দিচ্ছি কলকাতায় আপনাদের বাড়িতে যেন সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয় —আপনাদের যাত্রা ভালভাবেই চলেছে।

মাসখানেক পরে কলকাতায় ফিরে জানতে পাই, ইন্দ্র সিং তাঁর প্রতিশ্রুতি যথাযথই রেখেছিলেন।

মুক্তিনাথ ছাড়িয়ে আরও উত্তরে তিব্বত সীমান্তের দিকে—তুষার রাজ্যে দামোদরকুণ্ড। সেই হ্রদ থেকে কালীগণ্ডকীর এক মূলধারার উৎপত্তি। সে ধারার নাম নারায়ণী। শালগ্রাম শিলাও সেখানে প্রচুর পাওয়া যায়। মুক্তিনাথ থেকে দিন তিন-চার সময় লাগে সেখানে পৌঁছুতে। পথ অবশ্য দুর্গম হওয়ারই কথা। আমাদের ইচ্ছা, যদি পথ-প্রদর্শকের ব্যবস্থা হয়ে যায়, দামোদরকুণ্ডও দেখে আসব।

ইন্দ্রদেও-র নিকট সেইমত প্রস্তাব করি। তিনি শুনে উৎসাহ তো দেনই না। বরং নিষেধই করেন। পথের দুর্গমতার কারণে নয়। এই অঞ্চলের উপদ্রবের আশঙ্কায়। বলেন, জায়গাটা মুস্টাঙ্ প্রদেশে। সেখানে এই ক'দিন আগেই খুব গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল—এ ধরনের বিদ্রোহ এখন মাঝে মাঝেই হচ্ছে,—তারপর ভক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনাদের সঙ্গে উনিও রয়েছেন, জানানা সঙ্গে নিয়ে এখন ও-পথে এগুনো কখনোই চলবে না।

অগত্যা দামোদরকুণ্ড যাত্রার সঙ্কল্প ত্যাগই করতে হয়।

ইন্দ্রদেওজিও দুঃখ প্রকাশ করেন, বলেন, আপনারা অন্যদিকে আর একটা হ্রদ দেখে আসতে পারতেন। আপনারা যে থিনিগাঁও পার হয়ে এলেন, সেখান থেকে দিন দুয়েকের পথ—টিলিচো পাস্-এর কাছে—টিলিচো হ্রদ—১৬,১৪০ ফুট উঁচুতে। Herzog-এর Annapurna বইখানিতেও ঐ টিলিচোর উল্লেখ আছে বটে, তাঁর দুই সহযাত্রী ঐ গিরিপথ পাস্ অতিক্রম করে মানাঙ্ভোটে পৌঁছান।

কিন্তু আমাদের পক্ষে এখন ওদিকে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

ইন্দ্রদেওর সঙ্গে কথাবার্তা চলছে এমন সময় দুজন বিদেশী যাত্রী এসে হাজির। একজন সুইস। অপরজন ইতালীয়। তাদের একজন ক'দিন থেকে অসুস্থ। মণি পরীক্ষা করে দেখে, বলে, এ যে পাণ্ডুরোগের—Jaundice-এর সুস্পষ্ট লক্ষণ,—এখুনি কাঠমাণ্ডু ফিরে গিয়ে সেখানে চিকিৎসা করাক।

ইন্দ্রদেও জানান, আজ দুদিন বেচারীরা এখানে পড়ে রয়েছে। কাল কাঠমাণ্ডুতে বেতার-বার্তা পাঠানো হয়েছে। সুইস্ রেড্‌ক্রশ্ থেকে অবিলম্বে ছোট প্লেন পাঠিয়ে এঁকে যেন নিয়ে যায়।

কদিন পরে মুক্তিনাথ থেকে ফেরবার পথে সেই নীচে হুন্‌জাতে এঁদের সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হয়। প্লেনের ব্যবস্থা তাঁদের জন্য হয় নি। তাঁরা হেঁটেই চলেছেন। ভাগ্যক্রমে রোগীর অবস্থা অনেকটা ভাল,—তবে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ইন্দ্রদেও তাঁর নিজেরও অস্বাস্থ্যের কয়েকটি লক্ষণ ও উপসর্গের বিষয় মণিকে বলেন। মণি ঔষধ বার করে দেয়; নতুন ঔষধও দু-একটা লিখে দিয়ে বলে কাঠমাণ্ডু থেকে আনিয়ে এগুলোও খাবেন।— তারপর, আমাদের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে মন্তব্য করে,—যা মদ খেয়ে এসেছে।—এ-স্বভাব না ছাড়লে এসব ওষুধে আর কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না।

সুরাপান এখানে অতি সাধারণ নেশা। তবে ইন্দ্রদেও যেন মদের পিপে হয়ে গেছেন,—দেহের আকারেও দেখতে তেমনি।

এঁরা বিদায় নিয়ে চলে যেতেই ভীমবাহাদুর এসে টাকা চায়। তাদের প্রাপ্য টাকারই কিছু। মণি প্রশ্ন করে, অতগুলো টাকা নিয়ে এখানে সবাই করবি কি?

অকুণ্ঠ কণ্ঠে জানায়, মদ কিনে সবাই খাবে।

মণি আপত্তি জানায়, মদের জন্য টাকা পাবে না।

সে বলে, এই শীতে না খেয়ে আমরা এখানে থাকব কী করে?

অবশেষে, টাকা তাদের দিতেই হয়। বলি, নিচ্ছ নাও। তোমাদের টাকা যেমন খুশি খরচও করতে পার। শুধু হুঁস থাকে যেন, কাল মুক্তিনাথ পৌঁছতে হবে,—যাত্রায় যেন বিভ্রাট ঘটিয়ো না, সকালেই রওনা হতে হবে।

কিন্তু, সকালের আগে রাতও থাকে। রাত্রে স্লিপিং ব্যাগের আচ্ছাদনে থেকেও আমরাও অনুভব করি, কী দুর্দান্ত শীত। ভীমবাহাদুরদের একটা কম্বলে এ-শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া প্রকৃতই সম্ভব নয়।

সাক্‌স বাহাদুর আজ পরামর্শ দিয়েছেন, মুক্তিনাথের যাত্রার সময়ে যাত্রীদের জন্য সেবাসমিতির যাত্রীনিবাসে রসদের কিছু ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এখন এ-বছরের যাত্রা শেষ হয়েছে তাই যদি সেখানে আমরা রসদ না পাই, এখান থেকে দিন তিনেকের মত আমাদের আটা, চাল, ডাল, আলু, ঘি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভাল। সেইমত তিনি সব সংগ্রহও করে দেন।

পরদিন। পদযাত্রার নবম দিন। ১২ই অক্টোবর, তারিখটা দেখেই মনে পড়ে, আজই তো আমার জন্ম-তারিখ। আর এই দিনেই চলেছি মুক্তিনাথ দর্শনে! মন আনন্দে ভরে ওঠে। সকালটাও কী স্নিগ্ধ! মেঘশূন্য সুনীল আকাশ। কার যেন আশীর্বাদ ঝরে পড়ে সেই অসীম নীলিমা থেকে! একদিকে ধবলগিরির অমলধবল তুষার শোভা। অপর দিকে নীলগিরির নীলাভ প্রভা।

গ্রাম ছাড়িয়ে অল্প এগিয়ে যাবার পর পথ নদীবক্ষে নেমে যায়। নদীর 'বেড' চর দিয়ে চলা। জলের নির্মল ধারা এঁকেবেঁকে যেন নীলাঞ্চল উড়িয়ে নেমে আসে। আমরা চলি তারই উজান পথে—বালুচরের উপর দিয়ে। শুধু কি স্বর্ণ বর্ণ ধূসরতা? বুকে তার চারিপাশে ছড়ানো ছোট ছোট নুড়ি পাথর। কত বিভিন্ন আকার, কত বিচিত্র বর্ণ। অধিকাংশের গায়ে চক্ররেখা। যেন সুবর্ণ ও রত্নরাজির অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে নৃত্যভঙ্গে নেমে চলেন গিরিনন্দিনী কালীগণ্ডকী।

নদীর এখানে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। দুইপাড়ের পাহাড়গুলি প্রায় গাছপালা শূন্য। ধূসর বর্ণ। সর্পিল ভঙ্গে প্রবাহিনী জলধারা সুমুখে এসে আমাদের পথ রোধ করে। পথও তখনই নদীর চর ছেড়ে ডানদিকে তীরের খানিক উপরে উঠে পাহাড়ের গা বেয়ে চলে। অল্প চড়াই উৎরাই করে আবার নদীর বুকে নামে। চরের একপাশে একটা চালাঘর।

বন্ধু এগিয়ে গিয়ে দেখে। ডাক দেয়,—ছ্যাং—অর্থাৎ মদের দোকান,—চা-ও রয়েছে! চলে আসুন।

অল্প বিশ্রাম নিয়ে চা পান করে আবার পথ ধরা। ভীমবাহাদুর প্রশ্ন করে, কোন্ পথ দিয়ে যাবেন?

তাকিয়ে দেখি, সামনের পথ দু-ভাগ হয়েছে। একটা পথ সোজা নদীর চরের বালির উপর আঁকাবাঁকা সরু রেখা টেনে এগিয়ে গেছে—দূরে কাগবেণীতে। সেখানকার ঘরবাড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। ঐখানে

দামোদরকুণ্ড থেকে নেমে-আসা নারায়ণী নদী এবং মুক্তিনাথ-থেকে-আসা গণ্ডকীর আর এক ধারা—জঙ্ খোলা—Jhong Khola-র সঙ্গম।

ভীমবাহাদুর জানায়, কাগবেণী এখন দেখে যেতে হলে নদীর চরের ওপর সেই সোজা রাস্তা ধরে যেতে হবে। তারপর কাগবেণী থেকে ডাইনের এই পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে মুক্তিনাথ যাওয়া। আর এখন যদি সরাসরি মুক্তিনাথ যেতে চান, এখান থেকেই ডাইনে পাহাড়ের গা দিয়ে যে-পথ উঠে গেছে দেখছেন—তাই ধরতে হবে। এ-পথ দিয়ে গেলে মুক্তিনাথের দূরত্ব মাইল দুয়েক কম হবে। কাগবেণী ঘুরে গেলে চড়াইও বেশি পড়বে। কি করবেন, বলুন।

হিমালয়ের উচ্চ স্তরে চড়াইপথ মাইল দুই-এর পার্থক্য কম কথা নয়। অথচ, কাগবেণীও দ্রষ্টব্য স্থান দেখতেও হবে। অতএব, ঠিক নয়, আমরা আজ এখন সোজা মুক্তিনাথ দর্শনেই যাব। দুদিন পরে ফেরবার পথে কাগবেণী দেখে নদী ধরে ফিরব।

কাগবেণী সেইমত ফেরার পথে দেখেও এসেছিলাম। সে অভিজ্ঞতার কাহিনী এখানেই বলি।

কাগবেণী এ-পথে প্রসিদ্ধ স্থান, বারোগাঁও-এর প্রধান গ্রাম। দুই নদীর সঙ্গমে পুণ্যতীর্থ ক্ষেত্র। এর অপর নাম হংসতীর্থ (৯,২০০ ফুট উঁচুতে)। বরাহ পুরাণে এই নামকরণের এক কাহিনীর উল্লেখ আছে। একবার শিবরাত্রি উপলক্ষে ভক্তগণ মহোৎসব করছেন। নানাবিধ নৈবেদ্যের আয়োজন আছে। খাদ্যলোলুপ কাকের ঝাঁক আকাশে উড়ছে। এমন সময় একটা কাক হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে নেমে এসে নৈবেদ্যের অংশ ঠোঁটে নিয়ে আবার আকাশে উড়ে গেল। অমনি অপর একটি কাক খাবারের ভাগ পাবার লোভে তাকে তাড়া করে। আকাশে কিছুক্ষণ দুজনের ঝটাপটি চলে। লড়তে লড়তে দুজনেই নীচে জলকুণ্ডে এসে পড়ে, চকিতে দুজনেরই দেহ কান্তিমান্ হংসরূপে রূপান্তরিত হয়ে গেল। হাঁস দুটি আনন্দে উড়ে কোথায় অদৃশ্য হল। বিমুগ্ধ নয়নে লোকেরা এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে। স্থানেরও নামকরণ হয় হংসতীর্থ। সাধারণ লোকমুখে হয়—কাকবেণী বা কাগবেণী।

আবার সামনের একটা পাহাড়কে দেখিয়ে বলা হয়—কাকভূশণ্ডি,—পুরাণোক্ত ত্রিকালদর্শী কাকের বাস ঐখানে। সেই ভূশণ্ডিকাকের অবশ্য দর্শন পাইনি, তবে কাগবেণী পৌঁছানোর আগে দূর থেকে দেখেছি আকাশে উড়ছে শকুনের দল—যেন ক্ষুদ্রাকার হাওয়াই জাহাজের ঝাঁকের মতন। তার কারণটা তখন বুঝতে পারি নি। একটু পরে জানলাম বন্ধুর কাছে। মুক্তিনাথ থেকে ফেরবার পথে বন্ধু আমাদের আগেই কাগবণী পৌঁছয়। গ্রামের নিকটে পৌঁছে দেখে, সঙ্গমের দিকে অনেক লোকজন। ভিড়টা আমরাও পাহাড় থেকে নামার সময় দূর থেকে দেখতে পাই। বন্ধু স্বভাবতই কৌতূহলী হয়ে সেই দিকে এগিয়ে যায়,—ব্যাপার কী, দেখতে গিয়ে কিন্তু, আর দাঁড়িয়ে দেখার তার উৎসাহ তো থাকেই না, তৎক্ষণাৎ পালিয়েই আসে। আমরা পৌঁছুলে চোখমুখ বিকৃত করে বলে, ওদিকে সঙ্গমের কাছে যাবেন না যেন,—সোজা গ্রামের দিকে চলুন। অতি বীভৎস দৃশ্য দেখে এলাম। এখনও শরীরে কী রকম করছে! সঙ্গমের কাছে পাথরের ওপর একটা ছোট ছেলের মৃতদেহ—শকুনদের দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে! মৃতদেহের গলায় লম্বা দড়ি বাঁধা,—দূরে দুটো লোক সেই দড়ির অপরপ্রান্তে ধরে বসে আছে, মাঝে মাঝে নাড়ছে,—সম্ভবত শকুনগুলো যাতে দেহটা নিয়ে উড়ে না যায়। পরে ভীমবাহাদুরের নিকট শুনি, এখানকার মৃতদেহের সৎকার হয় এইভাবেই। এই সঙ্গমের তীর্থক্ষেত্রে পিণ্ডদানেও মৃত আত্মার মুক্তি হয় বলেও প্রসিদ্ধি।

মনে পড়ে, অনেক বছর আগে বম্বেতে পার্শিদের Tower of silence দেখেছিলাম, তাঁদেরও পাখিদের দিয়ে মৃতদেহ খাওয়ানোর সৎকার-প্রথা। কিন্তু, এমন সর্বজনসমক্ষে নয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

আমরা আর সঙ্গমের দিকে পা বাড়াই না। গ্রামের পানে চলি।

তাকিয়ে দেখি, কাগবেণীর বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ। দুই নদীর সঙ্গম, তাই সংযুক্ত নদীর উপত্যকার বিশাল বিস্তার। মরুভূমির ন্যায় ধু-ধু করে বালুকাকীর্ণ নদীবক্ষ। তারই মাঝে শোভা দেয় মণিময় কণ্ঠহার নীল জলধারা।

নদীর দুই তীরের পাহাড়গুলি তেমন উঁচু নয়। যেন, ঢেউখেলানো অনুচ্চ বালিয়াড়ি। বালি ও কাঁকরে ভরা। কোথাও গাছপালার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। যেন, শুষ্ককণ্ঠ তৃষার্ত ধরিত্রী গণ্ডকীর বারিধারার প্রতি নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে।

নদীর অপর পাড়ের পাহাড়ের গায়ে বহু বড় বড় গুহা মতন—যেন বৃহদাকার পায়রার খোপ। মানস সরোবর যাবার পথে তিব্বতে তাকলাকোটের নিকটে নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে এই রকম গুহা দেখেছিলাম—সেখানে বলা হয় গুকুং। তার মধ্যে লোকজনও বসবাস করে। এখানে কেউ করে বলে মনে হয় না।

কিন্তু, এই মরুভূমিসম নীরস শুষ্ক পাহাড়গুলির নিরাবরণতারও সৌন্দর্য আছে। দূর থেকে দেখা যায়, সূর্যকিরণে যখন পাহাড়গুলির নগ্নদেহ ঝিকমিক করে, নানা রঙের আভা তাতে বিকীর্ণ হতে থাকে—বেগুনি, নীলাভ, ধূসর, রুপালী, কমলা, পিঙ্গল,—কত রঙবেরঙের সংমিশ্রণ। অতি অপরূপ দেখায়। তিব্বতেও পাহাড়ের গায়ে এই বিচিত্র রঙের খেলা পথিকের মন মুগ্ধ করে।

বিশেষজ্ঞের অভিমত, পাহাড়গুলির এইরূপ রুক্ষ শুষ্ক বালুকাময় রূপ—বালি, নুড়ি, মাটি, কাঁকর প্রভৃতি সংমিশ্রণে সৃষ্ট নদীতটভূমি—conglomerated earth—একটা প্রমাণ, যে বহু প্রাচীনকালে এক সময়ে এই সব অঞ্চল সাগরগর্ভ ছিল। কালীগণ্ডকীর উৎপত্তি স্থানগুলিতে শালগ্রামশিলার অস্তিত্ব তারই আরও এক সাক্ষ্য।

ভীমবাহাদুররা আমাদের সঙ্গে কাগবেণী গ্রামে আসতে চায় না, বলে, তিব্বতীদের গাঁও, ওখানে আমরা ঢুকব না—আপনারা দেখতে চান, দেখে আসুন, আমরা নদীর চরে অপেক্ষা করব।

মুক্তিনাথ থেকে নেমে-আসা জঙ্‌-খোলা নদীর উপর পুল পার হয়ে গ্রামে ঢোকার মুখে প্রকাণ্ড দরজা। যেন দুর্গ দ্বার। কালীগণ্ডকীর বিস্তীর্ণ উপত্যকার দ্বারদেশে কাগবেণী প্রকৃতই দুর্গবিশেষ। গ্রামখানিও বিচিত্র। সদর দরজা পার হয়ে আসতেই মনে হয় যেন গোলকধাঁধায় বন্দীদশা। পাথর-বাঁধানো সরু রাস্তা। দু-পাশে তিনচার তলা উঁচু পাথরের বাড়ি—সারি সারি গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে। মাঝে কোথাও একফোঁটা খালি জমি নেই,—গাছপালা বাগান তো দূরের কথা। শুধু বাড়ির পর বাড়ি,—তারই মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে ঘুরে ঘুরে চলে সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ পথ। কোথাও বা রাস্তার মাথার উপর পাথরের ছাদ সেতু মতন,—বোধ হয় দু-পাশের বাড়িতে যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা। তাই হয়ত রাস্তায় বিশেষ লোক চলাচল দেখি না। সেই সরু পাথর-বাঁধানো পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে মনে হয় যেন মধ্যযুগের আরব্য উপন্যাসের জগতে চলে এসেছি; ছবিতে দেখা বাগদাদ বা ইরান-ইরাকেরই কোন্‌ শহরের গলিপথ ধরে চলেছি। গা ছমছম করে চলতে। অবশেষে, গ্রামের অপর প্রান্তে নদীর নিকটে পৌঁছে হাঁফ ছাড়ি। সেখানে উন্মুক্ত প্রান্তর। শস্যখেতও। দু-চার জন লোক ঘোরাঘুরি করে দেখে অনুসন্ধান করি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কোথাও হতে পারে কিনা। সবারই তিব্বতীয় বেশভূষা, আকৃতিও। নিকটে একটা দোতলা বাড়ি দেখিয়ে জানায়—হোটেল বলে। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখি, সাজানো ঘর, মাটিতে কার্পেট বিছানো, সামনে সারি সারি জলচৌকি পাতা। তিব্বতী এক মহিলা হোটেলকর্ত্রী। ভাত ও তরকারির ব্যবস্থা করে দিতে রাজী হন। দু-চার জন তিব্বতী খদ্দেরও আসে দেখি। জলচৌকির সামনে বসে পড়ে, তাদের ফরমাশ মত মালও আসে। তখন বেশ বোঝ যায়, আমরা ঢুকেছি শুঁড়িখানায়। তবে, আমাদের আহার ঠিকমতই জুটে যায়। কিন্তু, পানার্থীদের ভিড় ও হইহল্লা এমনই বেড়ে যায় যে খাওয়াদাওয়া সেরে সেখানে শান্তিতে কিছুক্ষণ বিশ্রামলাভের প্রয়োজন থাকলেও, ঐ পরিবেশে থাকার প্রবৃত্তি বা সাহস থাকে না। তাড়াতাড়ি মাতালদের আড্ডা ছেড়ে যাত্রা করি ঝুম্‌সুম্‌ অভিমুখে।

কিন্তু সে-ঘটনা মুক্তিনাথ থেকে ফেরবার পথে।

এখন চলেছি ঝুম্‌সুম্‌ থেকে যাত্রা করে মুক্তিনাথ দর্শনে।

কালীগণ্ডকী নদীর চরে সেই চায়ের দোকানে চা পান করে, নদী ছেড়ে পাহাড়ের গায়ের রাস্তা ধরে উপরে উঠতে থাকি। সুমুখে দূরে পড়ে থাকে তখনও-অচেনা কাগবেণী, অজানালোকের কুহক মেখে।

নগ্ন পাহাড়ের কোলে পথ। ধীরে ধীরে গা বেয়ে উপর দিকে ওঠে। খানিকদূর যাবার পর মুক্তিনাথ থেকে নেমে আসা জঙখোলা নদীর উপত্যকা নিকটে আসে। পথ চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে নদী থেকে অনেকখানি উপর দিয়ে। পথ ডাইনে পূর্বমুখী যায় নদীর গতিপথ ধরে। নদীর খদ বাঁ দিকে নীচে দেখা যায়। এখন পিছনপানে দূরে পড়ে থাকে কাগবেণী। বেলা বেড়েছে। সেই প্রচণ্ড বাতাসও আবার উঠেছে। রোদের তেজও প্রখর, তারই মাঝে চড়াইপথে ওঠা। তবুও, দেহে আজ ক্লান্তি নেই। অনাবিল আনন্দ, বিপুল উৎসাহ সব কিছু বাধা তুচ্ছ করে চলার প্রেরণা জাগায়। কতদিনের অভীপ্সিত মুক্তিনাথের আজই

দর্শন পাব। ধীরে ধীরে চড়াই পথে এগিয়ে চলি।

পাহাড়ের এই দিকটাও রুক্ষ শুষ্ক হলেও মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপঝাড়—গোলাপ ও জুনিপার—দেখা যায়। কিন্তু, পথে কোথাও জলের সন্ধান মেলে না।

মাইল দুই তিন চলার পর একটা ছোট গাছের ছায়াতলে সকলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। সঙ্গে-আনা গতরাত্রে-করে-রাখা রুটি আচার-সহযোগে আহার করি, ফ্লাস্কে আনা চা তৃষ্ণা মেটায়। তারপর,—আবার চলা। কিছুদূর যাওয়ার পর দূরে পাহাড়ের কোলে কয়েকটি গ্রাম দেখা দেয়। আরও দূরে পাহাড়ের উপরে—দু-একটা বাড়িঘর। বিন্দুপ্রায় ফুটে থাকে—আকাশের তারার মতন। ঐ, শুনি মুক্তিনাথ! ঐখানেই যেতে হবে। দেহমনও সোৎসাহে প্রস্তুত হয় যাওয়ার আগ্রহে। ঐ অত দূর চড়াই ওঠা? তাতে কী! ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। জানি, না থেমে এইভাবে এগিয়ে গেলে এক সময়ে নিশ্চয় পৌঁছাবই।

আরও ঘণ্টা দুই চলার পর নীচের গ্রামগুলির নিকটে পৌঁছুই। এ-সবই বারোগাঁও-এর এলাকাভুক্ত। ছড়ানো কয়েকটি গ্রাম। গ্রামের মধ্যে প্রাসাদোপম অট্টালিকাও রয়েছে। কিন্তু সবই কেমন-যেন নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রভ। অধিকাংশ গৃহগুলি সংস্কার-অভাবে ভগ্ন জীর্ণ অবস্থা। যেন, পরিত্যক্ত নগর। অবশ্য, লোকজন কিছু কিছু ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তিব্বতী বেশভূষা, চেহারাও। আশেপাশে সারা অঞ্চলে খেতের জমি, চাষ আবাদ কিছু হয়। সম্ভবত নীচের নদী বা পাহাড়ের ঝরনা থেকে জল আনার ব্যবস্থা আছে। গ্রামগুলির মাঝে মাঝে বড় গাছও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। একটা বাড়ির সুমুখের উঠানে প্রকাণ্ড পাথরের উদ্‌খলে এক মহিলা কি যেন পিষছেন, তিন চারটি ছোট ছেলেমেয়ে পাশে মাটিতে বসে ধূলা নিয়ে খেলা করছে—সবাই একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা গ্রাম ঠিক দুর্গের মতন। প্রকাণ্ড পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে castle-এর মত মাথা তুলে মিনার—কিন্তু সবই ভগ্নাবস্থা,—ওপরের ছাদ নেই, ভেঙে পরা বড় বড় দেওয়াল,—যেন বাজ-পড়া প্রকাণ্ড গাছ, ভাঙা পোড়া শুকনা কয়টা ডাল-ছড়িয়ে কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে। স্থানটির নাম শুনি ঝারকোট। এককালে বারোগাঁও-এর অধিপতি বা বড় বড় সর্দারদের নিজ নিজ এ-সব প্রাসাদ ছিল,—এখন হয়ত আর্থিক দুরবস্থার কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

গ্রামগুলি ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। পথ এঁকেবেঁকে পাহাড়ের আরও উপরে উঠতে থাকে। আমিও সমভাবে ধীরপদে উঠে চলি। হঠাৎ নজরে পড়ে, পথের পাশে কে যেন শুয়ে ছটফট করে! নিকটে পৌঁছে চিনতে পারি। একী আমাদের ভীমবাহাদুর! কী ব্যাপার? গোঙাতে গোঙাতে সে জানায়—ভীষণ অসুস্থ—পেটে অসহ্য যন্ত্রণা; আর হাঁটতে না পারায় শুয়ে পড়েছে। প্রথমে সন্দেহ জাগে, গতকাল রাত্রের নেশার প্রতিক্রিয়া নয়ত? কিন্তু, এখন বেচারীর অবস্থা দেখে দুঃখ হয়, ভাবনাও হয়, ভীমের পতনে আমাদের অবস্থা কী হবে?

মণি এসে যায়। পরীক্ষা করে দেখে। বলে, বিশেষ কিছু নয়। ওষুধ দিচ্ছি।

ঔষধপত্রের ঝোলা যে ভারবাহকের কাছে তার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। সে এসে গেলে মণি ভীমবাহাদুরকে ঔষধ দেয়, সাহস দিয়ে বলে, এখুনি সেরে যাবে।

ডাক্তার বিশ্বাসের ঔষুধের গুণেই হোক অথবা রোগীর বিশ্বাসের প্রভাবেই হোক, অল্পকালের মধ্যেই সুফল দেখা দেয়। রোগী আরাম বোধ করে, ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। আমরাও নিশ্চিন্তমনে আবার চড়াই পথ ধরে এগিয়ে চলি—ঐ তো মুক্তিনাথের ঘরবাড়ি, আর খানিকক্ষণ চললেই পৌঁছে যাব, যাত্রাপথও শেষ হবে!

পাহাড়ের উপর দিক থেকে হন্‌হন্ করে এক ব্যক্তি নেমে আসেন দেখি। স্থানীয় তিব্বতী বাসিন্দা নয়, যাত্রী বলেও মনে হয় না। নেপালী। কাছে এলে জিজ্ঞাসা করি, মুক্তিনাথ থেকে আসছেন?

তখন তাঁর পরিচয় পাই—মন্দিরের সহকারী পূজারী!

আমরা চলেছি দর্শনে, আর তিনি চললেন নীচে! ফিরবেন কখন?

তিনি নির্বিকার ভাবে জানান, সম্ভবত কাল। চলে যান ওপরে—সবই খোলা পড়ে আছে, ধর্মশালা রয়েছে, সেখানে থাকবেন, মন্দির দর্শন করবেন। দেবতার ভোগের গুড় ফুরিয়ে গেছে, তারই সন্ধানে গ্রামে চলেছি,—বলে পা বাড়িয়ে চলে যেতে উদ্যত হন।

পথ রোধ করে দাঁড়াই। বলি, দাঁড়ান, দাঁড়ান একটু। কতদূর থেকে আসছি আমরা,—দর্শনের ও

থাকবার ব্যবস্থাদি না করেই নেমে চললেন? নৈবেদ্যর গুড় ফুরিয়ে থাকে, সঙ্গে আমাদের যা রয়েছে তাই দেব। চলুন ফিরে। কেন জানি না, তিনি তবুও সম্মত হন না।

তখন মনে পড়ে, পথে দেখা সেই পঞ্চায়েত অফিসারের ও প্রধান পূজারীর দেওয়া সেই চিঠির কথা। ভাগ্যক্রমে জামার পকেটেই ছিল। বার করে তাঁর হাতে দিই। কাজও হয়। অগত্যা আমাদের সঙ্গে মুক্তিনাথে ফিরে চলেন,—তবে খুশি মনে নয়, কথাবার্তায়, বেশ বিরক্তিভাব প্রকাশ পায়।

অবশেষে, উপনীত মুক্তিনাথ এলাকায়।

পথের বাঁ দিকে একটা লম্বা দোতলা বাড়ি। মুক্তিনাথের স্কুল গৃহ। নীচের গ্রামগুলি থেকে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। যাত্রী দেখে ছাত্রদল রাস্তায় এসে জড় হয়। মণি তাদের দাঁড় করিয়ে ছবি তোলে।

পথের দু-পাশে ভেলা, বন্য গোলাপগাছ। অজস্র পাঁচ-পাপড়ি গোলাপ ফুটে রয়েছে। লালটুকটুকে ফলও। তারপরই কয়েকটি বৌদ্ধ চোরটেন ও মণিপ্রাচীর,—দেওয়ালের মত গাঁথনি,—তাতে সারি সারি ধর্মচক্র। অল্প এগুতেই ডানদিকে কাঠের তৈরি লম্বা ঘর,—সেইটেই ধর্মশালা। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকি। মনে হল, হঠাৎ যেন হিমঘরে ঢুকলাম—গা তেমনি শিরশির করে ওঠে! কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। প্রকাণ্ড লম্বা ঘর,—মাঝখানে কাঠের পার্টিশন—একদিকে মেয়েদের, অপর অংশে পুরুষদের থাকবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। প্রায় ঘর জুড়ে উঁচু চৌকির মত, কাঠের তক্তা সাজিয়ে বিশাল তক্তাপোশ। অল্প পুরু গদি পাতা, ময়লা হওয়া স্বাভাবিকই। তারই উপর সারি সারি আপন শয্যা পাততে হবে। সেদিক থেকে ব্যবস্থা মোটামুটি চলনসই বলে মনে হয়। মাথার উপর টিনের ছাদ, কিন্তু সেখানে ঘরের ধোঁয়া বার হওয়ার জন্য মস্ত ফাঁক,—আকাশ দেখা যায়। ঘরের চারপাশে দেওয়াল,—দু-তিনটে খুপরির মত জানলাও আছে অবশ্য। তার একটার পাল্লা ভেঙে যেন ফোগলা দাঁতে হাঁ করে রয়েছে! তাহলেও দুরন্ত শীতের রাজ্যে এই সুদূর দুর্গম তীর্থক্ষেত্রে এ-ব্যবস্থাটুকুই যথেষ্ট বলেই গ্রহণ করি। মালপত্র আপাতত চৌকির উপর জড় করে রাখা হয়। পূজারীর লোকটিকে বলি, এখনই একবার মন্দির দর্শন করতে যাব, তারপর ফিরে এসে গুছিয়ে বসা যাবে, চলুন যাওয়া যাক। তিনি বলেন, আগে আমাকে নৈবেদ্যর গুড় যা দেবেন, বার করে দিন, আমি সেটা রেখে দিয়ে মন্দিরে যাচ্ছি। আপনারাও মন্দিরের পানে এগিয়ে যান।

ঝোলা খুলে অনেকখানি চিনি বার করে তাঁকে দেওয়া হয়। গুড়ের বদলে অপ্রত্যাশিত চিনি পাওয়া, —তিনি মহাখুশি! এক মুখ হাসি নিয়ে জানান, দেবতা খুব তৃপ্তি পাবেন। আপনারা তৈরি হয়ে মন্দিরে চলুন, আমি এগুচ্ছি—বলে তখনই চলে যান।

জিনিসপত্র ঘরের দেওয়ালের পাশে সাজিয়ে রাখতে গিয়ে দেখা যায়, ঘরের মেঝেতে মাটি ও পাথর, জলে ভেজা-ভেজা ভাব, তলা থেকে স্যাঁতসেঁতে damp উঠছে, ঘরটাও সেই কারণেই অমন ঠাণ্ডা! ভীমবাহাদুর দুটা তক্তা জোগাড় করে আনে, তাই বিছিয়ে তার উপর মাল সাজিয়ে রাখা হয়।

অল্প দূরেই মন্দির। গিয়ে দেখা যায়, দরজা বন্ধ। প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করি। লোকটার তবুও দেখা নেই। গেল কোথায়? মন্দিরে দর্শন সেরে ধর্মশালায় ফিরে জামাকাপড় বদলাব,—কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়! মন্দির এলাকার বাইরে বেরিয়ে নিকটে আর একটা ছোট ঘরের কাছে এগিয়ে যেতেই তাকে দেখতে পাই। ঘরের দাওয়ায় বসে বেশ মৌজ করে চা পান করছেন, নারায়ণের ভোগের জন্য দেওয়া সেই চিনি সামনে রাখা,—তারই সহযোগে।

অবাক হয়ে দেখি। কিছু বলে আর লাভ কী! দাঁত বার করে হাসতে থাকেন।

চা পান শেষ করে আমাদের অপেক্ষা করতে বলে আবার কোথায় চলে যান। তবে এবার আর দেরি নয়, একটু পরেই তিব্বতী এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসেন। তাঁরই কাছে মন্দিরেব চাবি ছিল। এতক্ষণে মন্দিরের দরজা খোলা হল।

নেপালে ও হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চলে জাপানী প্যাগোডার আকারে যেমন কাঠের মন্দির হয়, —এখানেও তেমনি। মন্দির ঘিরে প্রাঙ্গণ—পাথর দিয়ে বাঁধানো। মন্দিরের পিছনে পাহাড়ের ঢালু গা, —তাই বেয়ে এক ঝরনা ধারা নেমে আসে। প্রাঙ্গণের প্রাচীরের গায়ে সারি সারি নানাবিধ জীবজন্তুর —মকর, গরু, ঘোড়া, হাতি সিংহ, হরিণ প্রভৃতির মুখের আকারে গড়া পাথরের নল বসানো। ঝরনার

জল বিভিন্ন ধারায় নেমে এসে সেই সব নলের মুখ দিয়ে উঠানে পড়ছে,—এঁরই নাম ১০৮ ধারা। এই মিলিত জলধারা প্রাঙ্গণ থেকে নেমে গিয়ে জলপ্রণালির মধ্যে দিয়ে বয়ে এসে, পানচাক্কীর মত, একটা মণিচক্রকে সারাক্ষণই ঘুরিয়ে পাহাড়ে আরও নীচে নেমে যায়। চক্রের গায়ে মন্ত্র লেখা—ওঁ মণিপদ্মে হুঁ,—অর্থাৎ জলপ্রবাহের বেগে অখণ্ড মন্ত্রোচ্চারণের ফল হচ্ছে!—এই জলধারাও কালীগণ্ডকীর উপনদী। কাগবেণীতে নারায়ণীর সঙ্গে এর সঙ্গম।

মন্দিরের ভিতর বেদির উপর মুক্তিনাথের নারায়ণ বিগ্রহ। জীবন্ত মানুষপ্রমাণ তাম্র অথবা পিতলের মূর্তি। পদ্মাসনে ধ্যানাসীন। চতুর্ভুজ। উপরের দুই হাতে সম্ভবত শঙ্খ ও চক্র। নীচের দুই হাতে অভয় মুদ্রা। সর্বাঙ্গে পীত বস্ত্রাবরণ। মাথায় মুকুট। বিগ্রহের মাথার উপর শেষনাগের সপ্তফণার বিস্তার। বিগ্রহের মুখবিবর অল্প খোলা—দন্তপঙ্ক্তি যেন প্রকাশ পায়। নারায়ণের দুইপাশে অপর দুইটি দাঁড়ানো মূর্তি,—শ্রীদেবী ও ভূদেবী। সামনে গরুড়ের বিগ্রহ।

আজ এখন মন্দিরে দর্শন ও প্রণাম করে চলে আসি। আগামী কালও এখানে থাকব। পূজারীর লোকটাকে বলে রাখা হয়, কাল স্নানাদি-করে পূজা দেওয়া হবে।

মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়াই। এখন যথেষ্ট বেলা রয়েছে। চারিদিকের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। অন্নপূর্ণা গিরিশ্রেণীর উত্তর ঢালে মুক্তিনাথের অবস্থান। ১২,৪৫০ ফুট উঁচুতে। মনে পড়ে, Tilman-এর Nepal Himalaya বই-এ পড়েছি, মুক্তিনাথের এই পর্বত অন্নপূর্ণা-১ (২৬,৪৯২ ফুট)-এর সঙ্গে লাদাক পর্বতমালার Ladakh Range-এর সংযোগকারী একদিকে কালীগণ্ডকী ও অপর দিকে মার্মিয়াণ্ডী নদীর জলবিভাজিকা—Watershed—এই মুক্তিনাথ পর্বত। এখান থেকে অন্নপূর্ণার তুষার শিখরগুলিও যেমন দেখায়, ধবলগিরিও তেমনি পরিদৃশ্যমান। আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি তুষার চূড়াগুলিও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। শুধু তাই নয়। এ কয়দিন যে রুক্ষশুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চল দিয়ে এলাম, মুক্তিনাথে পৌঁছে দেখি ধরিত্রীর সেই নগ্নতার লজ্জা যেন ঘোচে। মন্দির ঘিরে পিপলগাছের বনভূমি। স্নিগ্ধ শ্যামল, শান্ত কোমল প্রকৃতির পরিবেশ। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। লোকজনের কলকোলাহল নেই। কিছুদূরে আরও একটা মন্দির। বেশিদিনের পুরানো নয়। ভিতরে এক সাধু রয়েছেন। ভারতীয় শরীর। শুনি, অনেক বছর হল মুক্তিনাথে আসন নিয়েছেন। এ-মন্দিরের কাছেও এক ধর্মশালা।

আজ আর বেশি ঘোরাঘুরি করি না। আমাদের ধর্মশালায় ফিরে আসি। ভীমবাহাদুর এসে জানায়, পুরোহিতের জিম্মায় যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য প্রচুর জ্বালানী কাঠ রয়েছে, কিন্তু পুরোহিতের লোকটি কোনমতেই দিতে রাজী নয়। মণির ভর্ৎসনায় শেষ পর্যন্ত কাঠ আদায় হয়। ভীমবাহাদুর আমাদের রান্নারও ব্যবস্থা করে। সেই স্যাঁৎসেঁতে মেঝে কাঠের ঘরে রাত্রে খুবই শীত বোধ হয়।

পরদিন। ১৩ই অক্টোবর। এখানেই আজ সারাদিন কাটানো। একটু বেলা বাড়লে রোদের তেজ ফোটে। দূরের তুষারকিরীট গিরিশিখরগুলি সূর্যকিরণে ঝলমল করে। আমরাও চলি মুক্তিনারায়ণের পূজা দিতে। মন্দিরপ্রাঙ্গণে জলের ধারায় স্নান করি। নলের নীচে পাথরগুলি যেমন পিছল, জলধারাও তেমনি শীতল।

এ-তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডা নেই। পুরোহিতও অনুপস্থিত। সন্দেহ হয়, নিয়মিত নিত্যপূজার কোন বিধি ব্যবস্থাও আছে কিনা। যাত্রীরা যে-যেমন আপন মনে পার, পূজা পাঠ করো, সঙ্গে যদি নৈবেদ্যর উপচার কিছু থাকে দেবতার চরণে উৎসর্গ করো।

মন্দিরে বিগ্রহ প্রকৃতই নারায়ণ মূর্তি, অথবা, বোধিসত্ত্বের মূর্তি—এ বিষয়েও মতভেদ আছে। হিন্দু পূজারী বলে একজন থাকেন, যাঁর সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল। আবার বৌদ্ধ ভিক্ষুণীও একজন রয়েছেন, যাঁর কাছ থেকে চাবি নিয়ে পূজারীর লোকটি কাল মন্দির খুলে দিল। অর্থাৎ, যাত্রীদের যাঁর যেমন ধর্মমত ও বিশ্বাস—বৌদ্ধ অথবা হিন্দু যে মতাবলম্বী হোন না কেন,—সেই ভাবেই তিনি আরাধনা করেন।

মন্দিরের এই দ্বৈত-রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার প্রচলন কিভাবে হয়, শ্রীপ্রভু দত্ত ব্রহ্মচারী (ঝুঁশি, প্রয়াগ) তাঁর শ্রীমুক্তিনাথ-দর্শন হিন্দীগ্রন্থে (সংবৎ ২০২২) তার এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি শুনেছিলেন, এককালে মন্দিরে নারায়ণের ক্ষুদ্র পাষাণপ্রতিমা ছিল। প্রায় দেড়শ' বছর আগে নেপালের কোন রাণা এই তাম্রময়ী মূর্তি স্থাপনা করেন। এখনকার মন্দিরও তাঁরই করানো। নিয়মিত দেব সেবার জন্য তিনি স্থানীয় খেতী জমিরও বন্দোবস্ত করে দেন এবং তা থেকে বছরে এক হাজার মণ ধান উৎপন্ন হত। কিন্তু,

এসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও হিমালয়ের এই উচ্চপ্রদেশের অস্বাভাবিক শীতের ভয়ে নিম্নাঞ্চলবাসী কোন হিন্দু এখানে এসে থাকতে রাজী হন না। অগত্যা, অদূরবর্তী বারোগাঁও-এর ধর্মাধিকারী বৌদ্ধলামা যিনি ছিলেন, তাঁরই উপর রাণা মন্দির দেখাশুনার ভার অর্পণ করেন। তাঁর প্রতি নির্দেশ থাকে, তিনি যেন একজন ব্রাহ্মণ পূজারী রেখে পূজা করান। কিন্তু মন্দিরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকবে তাঁর। সেই থেকে বাদলুঙ্-এর কোন ব্রাহ্মণ পূজারীর কাজ নিয়ে এখানে এসে থাকেন এবং লামার মনোনীত এক বৌদ্ধ ভিক্ষুণী মন্দিরের তত্ত্বাবধান করেন।

এ-সকল ব্যবস্থা আধুনিককালের। এ মন্দিরও সাম্প্রতিক। কিন্তু এই তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্যের প্রচার বহু প্রাচীন কাল থেকে। পুরাণাদিতে মুক্তিনাথ তীর্থের শুধু উল্লেখই নয়, হিমালয়ের এই তীর্থভূমির কয়েকটি ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যেরও নির্ভুল নিখুঁত বর্ণনাও পাওয়া যায়। অথচ, এই মন্দির ও বিগ্রহের সেখানে কোন বিবরণ দেখি না।

বিকালে এখানকার সেই দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে যাওয়া হয়। ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের কিছু উপরে উঠলে একজায়গায় কয়েকটি ছোট বড় চোরটেন। তিব্বতী-প্রধান স্থান, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীকগুলির উপস্থিতি—অস্বাভাবিক কিছুই নয়। আসার পথেও তো কত দেখেছি। কিন্তু, ভীমবাহাদুর যখন জানায়, এখানে পাতাল গঙ্গা, তখন আশ্চর্য হই—গঙ্গা? কিন্তু জল কই?—ভীমবাহাদুর হেসে বলে, চোখে দেখছেন না, কিন্তু মাটিতে কান পেতে শুনুন, জমির তলায় জল বয়ে যাচ্ছে, শব্দ শুনবেন। প্রকৃতই তাই। মাটির তলায় জল বয়ে যাওয়ার কলকলধ্বনি স্পষ্ট শোনা যায়।

কেউ শুনতে না পেলেও "শুনতে পাচ্ছি" স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, কেন না, প্রচলিত প্রবাদ। পাপীরাই শুধু শুনতে পান না।

স্কন্দপুরাণে মুক্তিনাথের এই গুপ্তধারার বর্ণনা আছে,—স্বর্গ থেকে নেমে মন্দাকিনী গুপ্তধারায় পাতাল পথে এই পুণ্যক্ষেত্রে অলক্ষ্যে বয়ে চলেন, শুধু তার শব্দ শোনা যায়,—"শব্দায়তে নির্জলাহপি গঙ্গা পাতালগামিনী।" কয়েক পা এগিয়ে গেলে পথের ধারে একটা ছোট কুণ্ডও দেখতে পাওয়া যায়,—বোধ হয়, সেই অন্তঃসলিলা ধারারই এখানে ক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ।

আরও খানিক দূরে অল্প নীচে জওলা দেবী ও জ্বওলা মায়ির মন্দির। হিন্দু-মন্দির বলে পরিচয় দেবার কোন চিহ্ন দেখি না। একটা তিব্বতী বৌদ্ধ গোম্ফা। পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড গুহা। পাথর দিয়ে গেঁথে কক্ষাকারে পরিণত। ভিতরে বুদ্ধদেবের বড় মূর্তি। তিব্বতী টঙ্কা বা পটও টাঙানো। প্রাচীর চিত্র—ফ্রেস্কো পেনটিং, প্রদীপের সারি—এ সব তো আছেই, যেমন বৌদ্ধ গোম্ফায় সর্বত্রই থাকে। দু-তিন জন লামাও উপস্থিত। কিন্তু এখানকার বিস্ময়জনক বৈশিষ্ট্য হল, গুহার ভিতরে পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে, চিত্রিত বুদ্ধদেবের মূর্তির নীচেই, তিন জায়গায় তিনটে বড় ফাটল—পাহাড় যেন মুখবাদ্যান করে রয়েছে এবং সেই বিবরণগুলির ভিতর দেখা যায়, কলকল করে জলধারা একটানা বয়ে চলেছে। উপরে যে অন্তঃসলিলা প্রবাহিনীর জলধ্বনি শুনে এসেছি এখানেও পাহাড়ের গর্ভদেশে সম্ভবত সেই ধরনের জলস্রোত বয়ে চলে, এতে আর নূতনত্বের কিছু নেই। কিন্তু, নববিস্ময়ের চমক জাগায়—পাহাড়ের বিবরের মধ্যে বহমান জলধারার উপর লেলিহান অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হয়,—স্পষ্টই দেখায়, যেন প্রজ্বলিত জলপ্রবাহ! অতিবিচিত্র অভিনব দৃশ্য। নির্মল জলধারা নীলোজ্জ্বল অগ্নিশিখার দ্যুতি ছড়িয়ে বহে চলেছে। প্রকৃতির অপূর্ব খেলা। বিরুদ্ধভাবাপন্ন দুই পদার্থের অদ্ভুত মিলন।

জানি বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসম্মত কারণ দেখিয়ে হয়ত বললেন, ওটা জলে আগুন জ্বলছে না, পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে দিয়ে একটা ঝরনাধারা বইছে, আর ঐ ফাটলের মধ্যেই ওখানকার প্রাকৃতিক গ্যাস-এর উৎপত্তি হওয়ায় উচ্ছ্বসিত জ্বলন্ত শিখা লিকলিক করে বেরিয়ে আসছে, তাই দেখাচ্ছেও যেন জলেই আগুন জ্বলছে। ওটা চোখের ভুল। ভাবি, হোক, দৃষ্টিভ্রম। তবুও বিপরীতধর্মী প্রকৃতি-পদার্থের এই বিচিত্র সমন্বয় বিস্ময়করই!

পুরাণেও এই তীর্থস্থানের বর্ণনায় পাওয়া যায়—যেখানে জলে আগুন জ্বলে, এবং এই অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে দেবতাদের লীলা কাহিনীও রচিত হয়।

স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে কৃষ্ণপ্রভা মাহাত্ম্যে মুক্তিক্ষেত্রাদী উৎপত্তি বর্ণন রয়েছে মুক্তিপর্বতের মধ্যভাগে ব্রহ্মা জলের উপর অগ্নির আবাহন করে ঘোর তপশ্চর্যা করেন এবং সেই অগ্নিতে চরু সিদ্ধ

করে হোম করলেন। যদিও জল ও অগ্নির উভয়ের মধ্যে পরস্পর বৈরীভাব, তবুও সেই থেকে সেখানে উভয়ে একদেহ ধারণ করে রয়েছে

> মুক্তিভূভৃম্মধ্যভাগে ধাত্রা তপ্তং পুরা মুনে।
> সমাবাহ্য জলে বহ্নিং হুতবাংস্তত্র হ্যবকম্॥
> তয়োর্বৈবোঽপি চাত্যন্তং কৃশাণুজলয়োর্মিথঃ।
> তদাদিশ্চৈক দেহং তৌ তত্রাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠিতঃ॥
> *　　*　　*　　*
> বিষ্ণোর্মূর্তিং জলং বিদ্যাদ্রুদ্রমূর্তিং তথানলম্।
> আবাহ্য তৌ তয়োর্ব্রহ্মা হুতবান্ ঘৃত পায়সম্॥

বিষ্ণুর স্বরূপ জল, আর রুদ্রের মূর্তি অনল—একই স্থানে দুজনকে ব্রহ্মা আবাহন করে ঘৃতমিশ্রিত ক্ষীর হবন করেন। এর নিহিতার্থ,—ব্রহ্মার এই যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড, কর্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড—তিন প্রকার অনুষ্ঠানেরই স্বীকৃতি প্রকাশ পায় এবং জগতের সর্বজনের মুক্তির উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার এই যজ্ঞ সম্পাদন, তাই এই পুণ্যভূমিরও নামকরণ হয়,—মুক্তিক্ষেত্র। এই তীর্থক্ষেত্রে শঙ্কর রয়েছেন অগ্নিরূপে, বিষ্ণু জলাত্মক অমৃত রূপে এবং ব্রহ্মা স্বয়ং অবস্থান করেন হোতারূপে।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই উপাখ্যান ও ব্যাখ্যানের মূল্য যাই হোক না কেন, সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই প্রাচীন কালেও পুরাণ রচয়িতারাও হিমালয়ের এই দুর্গমস্থানে মুক্তিনাথ ক্ষেত্রের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের নির্ভুল সংবাদ রাখতেন।

এইবার এই তীর্থক্ষেত্রের আরও এক আকর্ষণীয় বিশিষ্টতার উল্লেখ করি।

মুক্তিনাথ অঞ্চলে—বিশেষত দামোদরকুণ্ডের নিকটে এবং কালীগণ্ডকীর নদীবক্ষে বা বালুচরে শালগ্রাম শিলার অস্তিত্ব। এখন অবশ্য মুক্তিনাথের নিকটে ও যাত্রাপথে যেতে শালগ্রামশিলা কমই চোখে পড়ে। কারণ, চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এগুলি এখন পণ্যসামগ্রীরূপে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় তিব্বতীরা সংগ্রহ করে এনে যাত্রীদের কাছে বিক্রী করে। আমাদের কাছেও সেই উদ্দেশ্যে এনেও ছিল। কিন্তু সাচ্চা শালগ্রামশিলা চেনা তো সহজ নয়ই, এ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে কেউ চিনতে পারেনও না। হিমালয়ে রাশি রাশি শিলাখণ্ড। অথচ, শিলাখণ্ড মাত্রেই শালগ্রাম নয়। আবার শালগ্রামশিলাও যে সবই একই ধরনের বা আকারের, তাও নয়। এগুলি চেনবার বা নির্ণয়ের পদ্ধতি শাস্ত্রে লেখা আছে।

চক্র-আঁকা শিলাগুলির নারায়ণের বিভিন্ন নামে নাম-করণ। যেগুলিতে চক্রচিহ্ন নেই, সেগুলির মধ্যে কতক শিবের, কতক বা অন্যান্য দেবতার নামে পরিচয়।

শালগ্রাম শিলার বহিরঙ্গে যেমন চক্রচিহ্নের ভেদাভেদ আছে, তেমনি শিলার আকার, গঠন, বর্ণ চক্ররেখার দিকভেদ, গভীরতা ইত্যাদি নানান লক্ষণেরও প্রভেদ ও বৈচিত্র্য থাকে। মুদ্রা, ক্ষেত্র, পরিমাপ, আসন, মূর্তি ইত্যাদিরও পার্থক্য হয়। সেই সকল লক্ষণাদি দেখে শালগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচয়।

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ গভীর যত্নসহকারে শিলাগুলির বিভিন্ন লক্ষণাদি বিচার করে কতপ্রকার নামকরণ করেন, তারই কয়েকটি উদাহরই দিই : মৎস, কূর্ম, লক্ষ্মীনারায়ণ, জনার্দন, বাসুদেব, দামোদর, অনন্ত, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, বরাহ, নৃসিংহ, লক্ষ্মীনৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলভদ্ররাম, সুদর্শন, পরমেষ্ঠী, বিষ্ণুদেব, শ্রীধর, ত্রিবিক্রম, হয়গ্রীব, গদাধর, কৃষ্ণদেব, চতুর্মুখী (ব্রহ্মসজ্ঞক), পুরুষোত্তম, সঙ্কর্ষণ,—আবার শিব, হরিহর গণেশ সূর্য প্রভৃতিও।

রূপভেদে শুধু নামের বিভিন্নতাই নয়, প্রত্যেক শালগ্রামের সেবা-পূজা-বন্দনা বিধিও স্বতন্ত্র। পূজারীর অধিকার-ভেদও থাকে। সবাই যে-কোন শালগ্রাম রাখার বা পূজা করার যোগ্য নয়। বিধিমত পূজায় যেমন অশেষ পুণ্যের সঞ্চয়, তেমনি ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ দেব-সেবায় বা নিষিদ্ধ-পূজা করায় অথবা পূজার অবহেলায়, পুঞ্জীভূত পাপ ও সমূহ বিপদের আশঙ্কা।

শালগ্রাম শিলার এমনই প্রবল প্রভাব, শাস্ত্রে প্রচারিত হয়। অসংখ্য প্রকারের শিলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাও পাওয়া যায়। এইসূত্রে সেকালের শাস্ত্রবিদ্‌গণের শিলা-বিজ্ঞান চর্চা, বিশ্লেষণ ও বিচারশক্তি বিস্ময়জনক বোধ হয়।

কিন্তু শাস্ত্রীয় এসব ব্যাখ্যান ও অভিমতের ভিত্তি ধর্ম ও বিশ্বাসের উপর। অতএব, এই বিশেষ-

প্রকারের শিলাগুলির প্রকৃত স্বরূপ সাধারণ জ্ঞানে উপলব্ধি করা সহজ বা সম্ভব নয়। তবে, আধুনিক বিজ্ঞান-মতে এদের জন্মের ইতিহাস বোঝা মোটেই কঠিন নয়।

ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হিমালয় পর্বত অর্বাচীন। এখন যেখানে হিমালয়, এককালে সেখানে সমুদ্র ছিল। টেথিস্ সাগর—Tethys sea। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পৃথিবীর ভূগর্ভের আলোড়নের ফলে হিমালয় সমুদ্রতল থেকে মাথা তোলেন। হিমালয়ের ও তিব্বতের কোন কোন অংশে পাওয়া সামুদ্রিক প্রাণীর প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ এর এক প্রমাণ। এ-ঘটনা ঘটে আমাদের সাধারণ ধারণার হিসাবে কল্পনাতীত অতীত কালে। যেমন, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মুহূর্ত দিন বছর আমরা কল্পনা করেও কূল পাই না, ব্রহ্মাও নিজেও, তাই বোধ হয়, অনাদি অনন্ত। কিন্তু, আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। ভূতাত্ত্বিকগণ প্রমাণ করেন, হিমালয়ের সৃষ্টি হয় বৈজ্ঞানিক টারসিয়ারি (Tertiary)-কল্পে এক থেকে তিন কোটি বছর আগে। সমুদ্র থেকে ওঠা জল-জীবগুলি স্থলে উঠে স্বভাবতই প্রাণ হারায়। তাদের মরদেহ এই সুদীর্ঘকাল থাকার কথা নয়। থাকেও না। দেহের যা কিছু নষ্ট হওয়ায় পচে গলে যায়, উপরের কোন শক্ত বা কঠিন আবরণ থাকলে পাথরে পরিণত হয়। শালগ্রাম এই শ্রেণীর এক প্রকার জীবাশ্ম—Fossil। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয়—Fossilized Ammonites। বেশির ভাগ ঘোর কালো পাথর, কখনও বা দেখতে কালো মার্বেলের মতন। Carbonate of lime থেকে উৎপন্ন। তাই, সেই জাতীয় পাহাড়ে থাকে। সাধারণত গোলাকার। Ammonites-এর দেহের আকৃতি অনুযায়ী রূপান্তরিত পাথরেরও আকার হয়। অনেকটা সমুদ্রের গুগলি বা শামুকের মত—Cephalopod বা mollusc,—সংস্কৃতে বলা হয়, বজ্রকীট। শক্ত খোলস বা আবরণেই রেখাগুলিও প্রায় পাথরের গায়ে চিহ্নিত হয়ে থাকে। কোন কোন শিলার মধ্যখানে ছিদ্র—ভিতরে প্রাণিদেহের কোমল পচনশীল অংশ বহুকাল আগে নষ্ট হয়ে লোপ পেয়েছে, এখন পূর্বশরীরের রেখাগুলি সেই ছিদ্রের মধ্যে পাথরের গায়ে যেন ছেনি দিয়ে খোদাই করা বা আঁকা মনে হয়। যেন, ছাঁচ গড়া। এমনও হয়, বাইরে থেকে রন্ধ্রের বা চক্রের প্রকাশ নেই, পাথরের গা অল্প ঘষলেই ছিদ্র বা চক্র বার হয়ে পড়ে। ভিতরে এক এক সময়ে সোনার মত কি যেন দেখাও যায়।

ভূতত্ত্ববিদ্ Toni Hagen এ-সম্পর্কে, 'Mount Everest Formation, Population & Exploration of the Everest Region' বইখানিতে এই মর্মে লেখেন :—সাধারণের বিশ্বাস ও ধারণা, হিমালয় দেবতাদের বাসভূমি, অতএব সেখানে স্বর্ণ ও রত্নাদি থাকবেই। বিশেষত, শালগ্রামশিলা দৈবশক্তি সম্পন্ন প্রচার থাকায় সেগুলি অতি মূল্যবান। লোকেরা মনে করে, এসব কালো 'মার্বেল',—দেবতারা এর ভিতর সোনা ভরে দেন। ফলে, শালগ্রাম কিনতে গেলে অসম্ভব দাম চায়, ভারতে এর ব্যবসাও চলে। আমার বিশেষ কৌতূহল থাকায় এই শালগ্রাম সংগ্রহ করতে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার ও অর্থব্যয়ও করতে হয়। অবশ্য, এরই দৈবশক্তির বা ভিতরে সোনা থাকার কিংবদন্তী আমাকে আকর্ষণ করেনি, এদের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করাই আমার আগ্রহ।...তারপর মন্তব্য লেখেন :

"These salgrams are concretions which have formed around fossilized ammonites in globular form. Often the core of these ammonites contained pyrites (the gold). No salgrams are to be found on the Nepal side of the Everest group, as the appropriate rocks (trias to chalk) are not present. They are, however, found north of the chain and are brought south by trading caravans."

নিছক ধর্মীয় মতবাদ নয়, ভিত্তিহীন বিশ্বাসও নয়, বৈজ্ঞানিক প্রমাণেই দেখা যায়, এই শিলাখণ্ডগুলির বৈশিষ্ট্য,—কোটি কোটি বছর প্রাচীন প্রাণীবিশেষের দেহের এগুলি অবশিষ্ট অংশ। কালের ধর্মে, মেদ-মাংস গলিত হয়েছে, দেহের শক্ত বহিরাবরণ পাথরে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, মহাকালের বিরামহীন গতির এরাই যেন চরণচিহ্ন।

কালের অতিপ্রাচীনতার প্রতীক এই নিদর্শন, এবং হয়ত সেই কারণেই, হিন্দু ধর্মের চোখে পূজা—মহাকালেরই যেন আরাধনা। শ্রীরামচন্দ্র নয়, তাঁর চরণপাদুকার সেবাপূজা। তারই মধ্যে ভক্ত তাঁকে রূপ দেয়, হৃদয় ভরে পেতে চায়। অনাদি, অনন্ত, অসীমকে সীমার মধ্যে কল্পনা করে সীমিতশক্তি মানুষের ধ্যানস্থ হওয়ার প্রয়াস।

মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ" ও "গোরা"র কয়েকটি ছত্র। "যোগাযোগে" কবি লেখেন :

"শালগ্রাম শিলা তো কিছুই দেখায় না, ভক্তি সেই রূপহীনতার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথের রূপকে প্রকাশ করে কেবল আপন জোরে। যেখানে দেখা যাচ্ছে না সেইখানেই দেখব এই হোক আমার সাধনা, যেখানে ঠাকুর লুকিয়ে থাকেন সেইখানে গিয়েই তাঁর চরণে দান করব, তিনি আমাকে এড়াতে পারবেন না।"—ভক্তির পরীক্ষা চলে কুমুদিনীর মনে মনে এইভাবে।

আবার "গোরা" উপন্যাসেও পড়া যায় : "অন্ত না থাকলে যে প্রকাশই হয় না। অনন্ত আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় করেছেন—নইলে তাঁর প্রকাশ কোথায়? যার প্রকাশ নেই তার সম্পূর্ণতা নেই। বাক্যের মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ।"...অন্যত্র, আবার : "মনে করো, ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন একটি শাস্ত্রের বাক্য স্মরণ করলে তোমার খুব ভক্তি হয়; সেই বাক্যটি যে পাতায় লেখা আছে সেই পাতাটা মেপে, তার অক্ষর কয়টা শুনেই কি তুমি সেই বাক্যের মহত্ত্ব স্থির করবে? ভাবের অসীমতা বিস্তৃতির অসীমতার চেয়ে যে ঢের বড় জিনিস।...হৃদয়ের অসীমকে চোখ মেলে এতটুকু পদার্থের মধ্যেও পাওয়া যায়।...তুমি যাকে ঠাকুর বলে নিন্দা করছ সেই ঠাকুরটি যে কী তার শুধু চোখে দেখে জানাই যায় না; তাতে যার মন স্থির হয়েছে, হৃদয় তৃপ্ত হয়েছে, যার চরিত্র আশ্রয় পেয়েছে, সেই জানে সে ঠাকুর মৃন্ময়, সসীম কি অসীম।

আমাদের দেশে কোন ভক্তই সসীমের পূজা করে না—সীমার মধ্যে সীমাকে হারিয়ে ফেলা ওই তো তাদের ভক্তির আনন্দ।"

শালগ্রাম শিলা বা মূর্তি পুজায়—সেই জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে কল্পনার সম্মিলনের প্রচেষ্টা হয়েছে।

সেকালের জ্ঞানীরাও জানতেন, শালগ্রাম মৃতজীব ও কীটে (বজ্রকীট, কৃমী—বজ্রদংষ্ট্রা) দেহাবশেষ—ফসিল। তারপর ভক্তি ও কল্পনার তুলিতে রঙ মিশিয়ে চিত্র আঁকলেন, প্রচার করলেন, নারায়ণ কীটের জীব-রূপ ধারণ করে (কারও কারও মতে,—শাপগ্রস্ত হয়ে) নিজেকে পাষাণে পরিণত করেছেন, এবং শিলাছিদ্রে চক্ররেখা বিশ্বকর্মার কারুকীর্তি। শুধু তাই নয়। কোথায় সেই নারায়ণ-স্বরূপ শালগ্রাম অবস্থান করতে থাকেন, সে-স্থানেরও সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় পুরাণে। এখানে আবার দেখি, নির্ভুল ভৌগোলিক তথ্য!—উত্তরে পরম আনন্দদায়ক হিমগিরি। হিমালয়ের সেই গিরিরাজের দক্ষিণে গণ্ডকী নদীর বা তীরের নিকটে—

> অহঞ্চ শৈলরূপী চ গণ্ডকীতীর সন্নিধৌ।
> অধিষ্ঠানং করিষ্যামি ভারতে তব শাপতঃ॥
> বজ্রকীটাশ্চ কৃময়ো বজ্রদংষ্ট্রাশ্চ তত্র বৈ।
> মচ্ছিলাকুহরে চক্রং করিষ্যন্তি মদীয়কম্॥
> ...গণ্ডকাশ্চোত্তরে তীরে গিরিরাজস্য দক্ষিণে...

সেই গিরিরাজের দক্ষিণে গণ্ডকীর উত্তর তীরে শালগ্রাম শিলার অধিষ্ঠানক্ষেত্রে আজ উপনীত হয়েছি। এই কালীগণ্ডকী নেপালের সপ্তগণ্ডকীর প্রধান নদী। পুরাণে এই সপ্তগণ্ডকীর পরিচয় ও উৎসস্থানগুলিরও বর্ণনা আছে।

১। কৃষ্ণাভা বা কৃষ্ণাগণ্ডকী বা কালীগণ্ডকী—"দ্বিকূট" পর্বতে উৎপত্তি।

২। ধর্মধারা বা ত্রিশূলীধারা—নীলকণ্ঠ হ্রদে বা গোসাঁইকুণ্ড থেকে নির্গত।

৩। যশোধারা বা শ্বেতগণ্ডকী—আধুনিক নাম বুড়িগণ্ডকী—"রৌপ্যশৃঙ্গ"—বৌধশিখর থেকে নেমে আসে। ত্রিশূলীতে মেশে।

৪। বিশ্বধারা—পীতাভা—এখনকার নাম—চেপেখোলা—"মহাকূট"—বৌধশিখরের নিকটে উৎস। মার্সিয়ানডিতে পড়ে।

৫। সিতপ্রভা বা শ্বেতবাহিনী—মার্সিয়ানডি নামে পরিচিত—"মণিকূট"—অন্নপূর্ণার উত্তরাঞ্চলে মুক্তিনাথের দক্ষিণপূর্বে উৎপত্তি। মানাঙ্ ভোটের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পরে ত্রিশূলীর সঙ্গে মিলন।

৬। রত্নধারা বা বিশ্বপাবনী বা মাদ্রী—এখন, লোকমুখে, মাদিখোলা—"রত্নশৃঙ্গ"—অন্নপূর্ণার দক্ষিণাঞ্চলে জন্ম। বীরথোটেতে ভুরুণ্ডিখোলার সঙ্গে সংযোগ, কুসুমাতে কালীগণ্ডকীতে মিশ্রিত হয়।

৭। সুবর্ণাভা বা শুক্লাগণ্ডকী বা দুগ্ধপ্রভা—অধুনা, সেতী গণ্ডকী—"একশৃঙ্গ"—অন্নপূর্ণার দক্ষিণাঞ্চল থেকে প্রবাহিত হয়ে পোখরার পাশ দিয়ে এসে ত্রিশূলীতে মেশে।

এই নদীগুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবীদেরও নাম পুরাণে পাওয়া যায়। দেখা যায় গণ্ডকীর তিনটি ধারা ত্রিশূলী ও কালীগণ্ডকীর সঙ্গম দেবঘাট,—যার আর এক নাম আদিপ্রয়াগ।

সপ্তগণ্ডকীর সম্মিলিত ধারা—বিশালকায়া গণ্ডকী ভারতে নেমে শোনপুরের নিকট গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্তা হন! ভূগোল-বিজ্ঞানে গণ্ডকীর এই পরিচয়।

কিন্তু, স্কন্দপুরাণে কবি-কল্পনায় রচিত গণ্ডকীর জন্ম বিবরণ এক সুরম্য কাহিনী।

স্কন্দদেব অগস্ত্যমুনির নিকট তাঁর মায়ের তীর্থযাত্রার বর্ণনা দিচ্ছেন, ভগবতী গৌরী সখীদের সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ে তীর্থভ্রমণ ও সাধু দর্শন উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নীলকণ্ঠ হ্রদে তীর্থস্নান সেরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলেন।

এই নীলকণ্ঠ হ্রদ এখন গোসাঁইকুণ্ড নামে পরিচিত। কাঠমাণ্ডুর উত্তরে চারপাঁচ দিনের হাঁটাপথ। বরফের পাহাড় ঘেরা একটি সুন্দর হ্রদ। আধুনিক কালেও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

গৌরীদেবী পশ্চিমে নীলকূট পর্বতে আসেন। নীলকূট—আধুনিক নীলগিরি মুক্তিনাথের পথে ডানদিকে কালীগণ্ডকীর বাম তীরে চিরতুষারময় এক শৈলশিখর—অন্নপূর্ণা গিরিশ্রেণীরই এক অংশ। আমরাও দেখে এসেছি। এই অন্নপূর্ণারই উত্তর ঢালে মুক্তিনাথ।

স্বন্দপুরাণে পার্বতীর এই পথে আসার যেমন বিবরণ পাওয়া যায়, তেমনি প্রসিদ্ধ পর্বতারোহী, টিল্‌ম্যানও আসেন ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে গোসাঁইকুণ্ডে ও সমীপবর্তী অঞ্চলে এবং অন্নপূর্ণার পিছন দিয়ে দুর্গম পথে মুক্তিনাথ। যাত্রাপথে তাঁকে পার হতে হয় ত্রিশূলীগণ্ডকী, বুড়ি গণ্ডকী, চেপেখোলা। তারপর মার্সিয়ান্‌ডির উপত্যকা ধরে এসে মুক্তিনাথে যেতে দর্শন পান কালীগণ্ডকীর।

হয়ত, পুরাণে বর্ণিত ঐ একই পথের অংশ দিয়ে তাঁর আসা। Tilman-এর Nepal Himalaya বইখানিতে তার এই যাত্রাপথের বিবরণ আছে।

এখন, গৌরীর তীর্থযাত্রার কাহিনী বলি। নীলকূট পর্বতের নিকটে পৌঁছে তিনি দেখেন, অত্রিমুনি সেখানে তপস্যায় মগ্ন। তিনি বিধিমত অত্রি ঋষির পূজা আরাধনা করেন।

হিমালয়-দুহিতা পার্বতী। কিন্তু, পাহাড়ী কন্যা হলেও দুর্গম পার্বত্য পথে চলতে স্বভাবতই ক্লান্তি আসে। অপরূপা সুন্দরী সুকোমলা নারী। দেহ বয়ে স্বেদ বিন্দু ঝরতে থাকে। তাঁর বামচরণ থেকে যে সুনির্মল ও দিব্য স্বেদ-ধারা নামে, তাতে অত্রিমুনির ব্রতকুণ্ডের পাশে এক জলকুণ্ডের সৃষ্টি হয়। এদিকে গণ্ডঋষি নামে আর এক অতিবৃদ্ধ মহামুনি রৌদ্রতাপে ক্লান্ত দেহে ধীরে ধীরে সেখানে এসে উপস্থিত হন। নির্মল সেই জলাশয় দেখে ভক্তিভরে অবগাহন করেন। উঠে দেখেন, পরম আশ্চর্য ব্যাপার! কোথায় তাঁর বৃদ্ধ দেহ! পঁচিশ বছরের তিনি সুশ্রী যুবা পুরুষ। বহু জন্মার্জিত পাপরাশি থেকে ভার-মুক্ত। এমন কি, নিজের প্রাক্তন কর্ম ও পূর্বজন্মের সব কিছু ঘটনা স্মরণে আসে। দেহে তাঁর রোমাঞ্চ ওঠে। প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে সেই সুপবিত্র জলদেবীর পূজা ও পরিক্রমা করে স্তুতি করেন।

দেবী স্তবে তুষ্ট হন। ঋষির প্রার্থনামত বরদান করে বলেন, আমার দেহ থেকে নির্গত আমারই মূর্তিস্বরূপ এই জলে স্নান করে তুমি আমার পরম ভক্ত হয়েছ। অন্তিমকালে আমার চরণে তোমার আশ্রয় লাভ ত আছেই তুমি না চাইলেও আরও বর দিই, যে-যে স্থানে আমার স্বেদধারা ঝরে পড়বে সেইখানে আমার মূর্তিস্বরূপ বেগবতী নদী বইতে থাকবে। এইভাবে সপ্ত ঋষির আশ্রম সমীপে সাতটি নদী জন্ম নেবে,—সে সবই আমারই মূর্তি বলে জানবে। সেই অতি-পবিত্র সপ্ত নদীর নামে তোমারই নাম চিরকাল যুক্ত থাকবে,—জগতে প্রচারিত হবে গণ্ডকী নামে—গণ্ডঋষিই এই ধারায় প্রথম স্নান করেন।

এর পরে মহাদেবী গৌরী সখীসহ তীর্থপথে এগিয়ে চলেন। গণ্ডঋষিও অনুগমন করেন। যেখানে-যেখানে গৌরী ঋষিদের দর্শন পান, পূজা-দান, সেবা করেন। দেবীর স্বেদবিন্দুও ঝরে। নদীর আকারও নেয়। গণ্ডমুনিও তাতে প্রথম স্নান করেন। নদীরও নামকরণ হয় তাঁরই নামানুসারে।

হিমালয়ের বিভিন্ন শিখরের নীচে সপ্তঋষির আশ্রমগুলি ঘুরে দেবী ফিরে আসেন আবার নীলকণ্ঠ হ্রদে,—গোসাঁই কুণ্ডে। পাঁচ বছরে পঞ্চাগ্নিনামক ব্রত তিনি এইভাবে পালন করেন। সপ্তগণ্ডকীরও জন্ম হয়, কোথায় কোন্ কোন্ শিখর তলে, কোন্ হ্রদের উৎস থেকে কোন্ ধারার উৎপত্তি,—জলধারাগুলির বর্ণবৈশিষ্ট্যই বা কি,—পুরাণে তারও বর্ণনা মেলে।

আবার, বরাহ পুরাণে গণ্ডকীর উৎপত্তি ও নামকরণের কারণ নিরূপণে ভিন্ন আর এক রূপকথা রচিত হয়। বরাহদেব পৃথ্বীদেবীকে বলেন, পুরাকালে শ্রীবিষ্ণু ত্রিলোকের কল্যাণ কামনায় হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করেন। তপের উষ্ণতায় তাঁর কপোল ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে, গণ্ডদেশ বেয়ে স্বেদবিন্দু ঝরতে থাকে। তাই থেকে উৎপন্ন হয় পাপহারিণী পুণ্যতোয়া নদী। ভগবানের গণ্ড-নিঃসৃত, নামও তাই হয় গণ্ডকী। হিমালয়ের হিমাঞ্চলেও এখনও দেখি, উত্তুঙ্গ শৈলশিখর,—যেন ধ্যানমগ্ন যোগী। রৌদ্রতাপে সেই গিরিখণ্ডে তুষার গলে, জলবিন্দু ঝরে, নদীআকারে বহে নেমে আসে। যেন দেবতারই গণ্ড বেয়ে স্বেদবিন্দু নামে, নদীর জন্ম হয়,—অতি মধুর কবিকল্পনা।

পরবর্তী কাহিনী। শালগ্রাম শিলা প্রসঙ্গে।

দেব-দেহ-সম্ভূতা। গণ্ডকীও দেবীস্বরূপা। তিনিও উগ্র তপস্যা শুরু করেন। দীর্ঘ দশ হাজার বর্ষকাল ধরে। ভগবান বিষ্ণু তুষ্ট হয়ে দর্শন দেন, বর দিতে চান। গণ্ডকী বলেন, কৃপাভিক্ষাই যদি দেন, জানাই আমার একমাত্র কামনা, সন্তানরূপে যেন আপনাকে পাই। প্রার্থনা শুনে ভগবান হাসেন। বলেন, তথাস্তু। তাই হবে। শালগ্রামশিলার রূপ গ্রহণ করে তোমারই প্রবাহে আমি নিবাস করব। তোমার নদীগর্ভে আমাকে ধারণ করে তুমি আমার মাতা হলে,—জগতের সুপবিত্র নদীরূপে তোমার সুযশ ও প্রতিষ্ঠা হবে। শিলালিঙ্গরূপ ধরে শিবও নারায়ণের সঙ্গে এসে বাস করেন। গণ্ডকী ও শালগ্রামশিলার বৃত্তান্ত কেন্দ্র করে নানান পুরাণে বিবিধ বিচিত্র কাহিনী আছে। তাঁর মধ্যে জলন্ধর ও বৃন্দার এবং শঙ্খচূড় ও তুলসীর উপাখ্যান অনেকেরই হয়ত জানা। এখানে অপর আর একটি রসোত্তীর্ণ কাহিনী উল্লেখ করে মুক্তিনাথ যাত্রা প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি।

(শ্রীপ্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীর "শ্রীমুক্তিনাথ দর্শন" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

অন্যান্য পুরাণের আখ্যানের মতন গণ্ডকী এই কাহিনীতে দেবতনু সম্ভূতা ও গোকুলের গোপিকাও নয়, সম্ভ্রান্ত রাজকুলেও তাঁর জন্ম নয়। সে এক বারাঙ্গনা কন্যা। অপূর্ব সুন্দরী। সারা দেহ থেকে রূপের ছটা ঠিকরে পড়ে। মা নাম রাখেন—গণ্ডকী। যৌবন প্রাপ্ত হলে কুলকর্ম নিতে মা তাকে আদেশ করেন। গণ্ডকী ধর্মপ্রাণা, পরম নিষ্ঠাবতী। পবিত্র মন নিয়েই সে কুলগত ধর্মপালনে আত্মনিয়োগ করেন। প্রতি কুলধর্মেরই স্বতন্ত্র বিধিনিয়ম থাকে। এমন কি, চোর-ডাকাতের মধ্যে কর্তব্য-অকর্তব্য বিচার বোধ আছে।

গণ্ডকীও নিজ ধর্ম পালনে তাদের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেন। তাদের প্রথানুযায়ী পণ্যরূপে দেহ নিবেদন করার বিধি। নামও তাই পণ্য-স্ত্রী। একজনের চিরজন্মের পত্নী নয়, একরাত্রির স্ত্রী। অর্থের বিনিময়ে শুধু রাত্রের জন্যই নিজেকে স্ত্রীরূপে বিকিয়ে দেওয়ার স্বীকৃতি। সেই এক রাত্রের জন্য অর্থদাতা প্রণয়ী তার সাক্ষাৎ স্বামী। গণ্ডকীও সেইভাবেই গ্রহণ করেন। যে আসে তাকে আপন স্বামী-জ্ঞানে পরমগুরু ও দেবতা বলে স্বীকার করে নেন। যোড়শ উপচারে তার পূজা করেন, ভক্তিভাবে স্তুতি করেন। এই বিশুদ্ধ নিষ্কাম শ্রদ্ধা-ভাবনার অনলে আগন্তুকের কাম-বাসনা পুড়ে ছাই হয়, তারও অন্তঃকরণ নির্মল স্বর্ণময় হয়ে ওঠে। শুদ্ধ পবিত্র চিত্তে সে ফিরে যায়।

গণ্ডকীর এইপ্রকার স্বধর্ম-পালনের খ্যাতি ত্রিলোক ছড়িয়ে পড়ে। দেবতারাও শোনেন। একদিন এক অতি সুশ্রী তরুণ এসে হাজির। অগ্রিম অর্থ দিয়ে কোথায় চলে যায়, সন্ধ্যাকালে আসবে জানিয়ে। অন্যান্য নাগর আসে, প্রচুর অর্থের লোভ দেখায়, গণ্ডকী বলেন, আজ রাতের স্বামী আমার সেই তরুণ যুবক, তাঁর প্রতীক্ষায় আছি। অর্থলোভের বশে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা অধর্ম হবে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে সেই অপরূপ সুন্দর তরুণ আসেন। শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে গণ্ডকী যথারীতি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, কোমল আসন পাতেন, চরণে প্রণাম করেন, পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় জল সাজিয়ে তাঁর স্নানের ব্যবস্থা করেন। ধীরে ধীরে আগন্তুকের অঙ্গ আবরণ সরাতে থাকেন। চমকে ওঠেন দেখে,—একী—একী! অমন সুশ্রী মনোহর মুখের শোভা,—কিন্তু অঙ্গভরা গলিত কুষ্ঠ! পুঁজ রক্ত গড়িয়ে পড়ে। উৎকট দুর্গন্ধ! সারাদেহ রোগে পচে খসে আসে! গণ্ডকী ধীর শান্ত মনে তুলা, কাপড়, জল আনেন। গভীর সহানুভূতি নিয়ে পরম যত্নে ও সস্নেহে পূতিগন্ধময় সেই ক্ষতগুলি পরিষ্কার করেন, দিব্য ঔষধের প্রলেপ লাগান।

হঠাৎ আবার একী! বিসূচিকা রোগ দেখা দেয় যুবকের। বারংবার মলত্যাগ ও বমন শুরু হয়। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গণ্ডকী পরিষ্কার করেন। নতুন শয্যা পাতেন। আবার নষ্ট হয়, আবার আর এক শয্যা

বিছান। শব্দ শুনে মা আসেন। পরিচারিকারাও আসে। মা দেখে বলেন, লোকটাকে বাইরে বার করে দেওয়া হোক,—ছুঁসনে, ফেলে দে এখনি। চমকে ওঠে গণ্ডকী। বলেন, সে কী মা! ইনি যে আমার স্বামী, আমার দেবতা! আমি যে এঁর সেবিকা দাসী আজ রাত্রের। আমার কর্তব্য করব না?

অগত্যা সকলে মিলে রোগীর অক্লান্ত সেবাশুশ্রূষা করেন। কিন্তু, রাত্রি প্রভাত হবার আগেই রোগীর দেহ প্রাণশূন্য হয়।

এতক্ষণে মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন, জানান, যাক এবার দুর্গন্ধ শবদেহটাকে এখনই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হোক।

শান্ত কণ্ঠে গণ্ডকী বলেন, তাই হবে। এখনই চিতা সাজাতে বলো। সহমরণে যাব আমিও। এখনও রাতের শেষ হয়নি—উনি যে আমার স্বামী।

যুক্তি-নিষেধ কিছুই শোনেন না গণ্ডকী। মায়ের চোখের জলও মানেন না।

চন্দন-চিতা সাজানো হয়। অপরূপা সুন্দরী গণ্ডকী নিজদেহ অলঙ্কারে সাজান, রঙিন বসন পরেন। বধূবেশে ধীরপদে চিতায় উঠে আসন নেন। সেই গলিত দুর্গন্ধময় বিকৃত শবদেহ কোলের উপর তুলে নিয়ে বসান। শাস্ত্রানুযায়ী সকল অনুষ্ঠান সাঙ্গ হয়। এবার চিতায় অগ্নি সংযোগ হবে,—এমনি সময়ে—একী! মৃত যুবকের মুখে মৃদু মধুর হাসির ভঙ্গিমা! দেহময় অপূর্ব জ্যোতি! স্নিগ্ধ নয়নের কৃপাঘন দৃষ্টি! চোখ মেলে তিনি গণ্ডকীর প্রতি তাকান। গণ্ডকীও অবাক হয়ে দেখেন,—কোথায় সেই গলিত কুষ্ঠদেহ! কোলে তাঁর চতুর্ভুজ জ্যোতির্ময় স্বয়ং নারায়ণ।

স্মিত হাস্য বদনে শ্রীবিষ্ণু বলেন, গণ্ডকী, এসেছিলাম তোমায় পরীক্ষা করতে। তোমার ধর্মজ্ঞান, নিষ্ঠা ও সেবা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। বর নাও তুমি।

গণ্ডকী বলেন, দেব! এইভাবে কোলেই যখন নিতে দিলেন, এমনি করে ক্রোড়েই যেন রাখতে পারি। নারায়ণ বলেন, তথাস্তু। তুমি হও পুণ্যসলিলা তরঙ্গিণী গণ্ডকী, আমি থাকি শিলারূপে তোমারই নির্মল ক্রোড়ে।

এমনি করেই বারবনিতা-কন্যা গণ্ডকী সর্বজনপূজ্যা মুক্তিদায়িনী নদীতে রূপান্তরিত হন, নারায়ণও শালগ্রাম রূপ পরিগ্রহ করেন, সেই পুণ্যতোয়া নদীরও নারায়ণী বা শালগ্রামী নামেও খ্যাতি রটে।
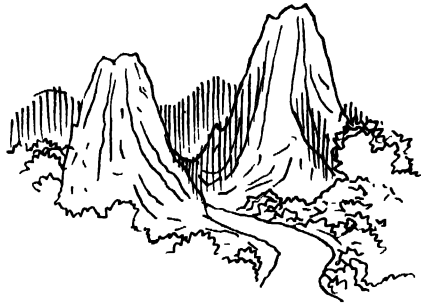
নানা ভ্রমণ : স্বদেশে-বিদেশে
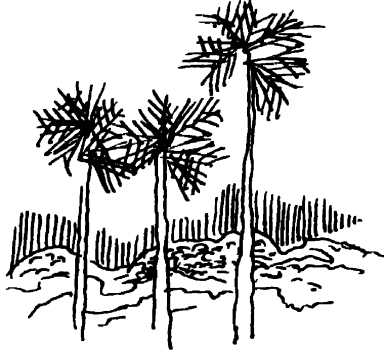
পালামৌর জঙ্গলে ❑ কাবেরী-কাহিনী ❑

আফ্রিদি মুল্লুকে ❑ বর্মা মুলুকে ❑ শ্রীপাদ

পালামৌর জঙ্গলে

প্রথম অধ্যায়

॥ ১ ॥

বাল্যকাল থেকেই পালামৌ নামটির সঙ্গে আমার পরিচয়। সে-পরিচিতি ভূগোলের নীরস পাঠ্যপুস্তকের পাতা থেকে নয়। সঞ্জীবচন্দ্রের অপূর্ব রসঘন মধুর কাব্য পালামৌ গ্রন্থ সেই পরিচয়ের অচ্ছেদ্য সূত্র। সেই থেকে পালামৌর অরণ্যভূমির ও আরণ্যক জীবনের বিচিত্র রূপমাধুরী মানসপটে নানাবর্ণে চিত্রিত হয়ে থাকে। কল্পনার রথে চড়ে ঘুরে বেড়াই সেই গহনবনের রোমাঞ্চকর বিজন পথে পথে। মনের গোপন কোণে পালামৌ চিরতরে আপন আসন পাতে।

সেই মানসী পালামৌর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ হয় বহু বছর পরে। তখন আর সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণিত একশ' বছরেরও আগেকার সেই পালামৌ নেই। সভ্যতার বিস্তারের ফলে নবীন সাজসজ্জায় রূপান্তরিত হয়েছে পালামৌর কয়েকটি অঞ্চল। সঞ্জীবচন্দ্র গিয়েছিলেন, রাণীগঞ্জ থেকে ডাকবাহী ঘোড়ার গাড়িতে হাজারিবাগ, তারপর সেখান থেকে পালকিতে তাঁর ছোটনাগপুর যাত্রা,—রাঁচি হয়ে পালামৌ। পালামৌ নামে কোন শহর, নগর বা গ্রাম এখনও নেই, তখনও ছিল না। পালামৌ সে-সময়ে বঙ্গদেশের অন্তর্গত "একটি প্রকাণ্ড পরগণা" (প্রকৃতপক্ষে জেলা) "ব্যাঘ্রভল্লুকের আবাসভূমি; বন্যপ্রদেশ মাত্র"। "পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ এই লইয়াই পালামৌ"। কালের পরিবর্তনে এখন সেই পালামৌ জেলা বিহার প্রদেশের অংশ। সেই গভীর বনভূমি ভেদ করে এখন রাজপথ অনুপ্রবেশ করেছে—আদিম অরণ্যদেহে বিদ্ধ বর্শাফলকের মতন। সভ্যজগতের যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। পর্যটকদের চিত্ত আকর্ষণ করার বহুবিধ আয়োজনও চলেছে। পালামৌর অরণ্য-অঞ্চল জাতীয় অভয়-অরণ্যরূপে চিহ্নিত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। 'অভয়' শব্দটির সার্থকতা সম্ভবত দুই দৃষ্টিকোণ থেকে। বন্যপশুপক্ষীদের অভয়দান,—মানুষের হাতে প্রাণ হারানোর আর তোমাদের আশঙ্কা নেই, নির্ভয়ে নিজ রাজ্যে বাস করো। অপরপক্ষে পর্যটকদের সাহস দেওয়া,—কৌতূহল থাকে, চলে এস, দেখ, বন্যজীবজন্তুর স্বাধীন বিচরণ, মুক্ত জীবনযাপন, অরণ্যভূমির প্রকৃতিদত্ত প্রকৃত রূপসম্ভার!

১৯৬৯ সাল। অক্টোবর মাস। আমার সেই প্রথম পালামৌর বেতলাতে যাওয়া। হিমালয় থেকে ফিরে এসে সাঁওতাল পরগনার শান্ত নিভৃতিতে দিন কাটছে। ভাইপোর চিঠি এল, পূজার ছুটিতে এবার মোটর নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছি, তোমার কাছেও অবশ্যই যাব। হাজারিবাগ বা পালামৌর জঙ্গল অঞ্চলের খোঁজ-খবর আনিয়ে রাখতে পার? বেতলা হলে তো কথাই নেই। তাহলে তোমাকে নিয়ে সেদিকে যাওয়ার প্রোগ্রাম করা যেতে পারে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে তোমার কাছে পৌঁছচ্ছি।

চিঠি পেতেই হিমালয়-প্রত্যাগত বিশ্রামরত অলস মন আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখনই চিঠি লিখি বন্ধুবর চট্টরাজকে। বিহার সরকারের পদস্থ অফিসার তিনি। সে-সময়ে উত্তর বিহারে বদলী হয়ে রয়েছেন। বিহারের বনজঙ্গল সম্বন্ধে হাল খবরাখবর রাখেন। সরকারী কাজেকর্মে নিজেও ঘুরেছেন অনেক। জানাশোনা লোকজনও সর্বত্র।

পত্র পেয়েই চট্টরাজ সবিস্তারে সংবাদগুলি পাঠান। কোথায় তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন আছেন, তাঁদের নাম ঠিকানা জানান। লেখেন, কবে কোথায় যাবেন জানতে পারলে তাঁদের সরাসরি চিঠি লিখে আগে থেকে খবর দেব এবং মোটরে জায়গা যদি থাকে, কবে রওনা হচ্ছেন সময়মত জানতে পারলে ছুটি নিয়ে আমিও সশরীরে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি।

যেদিন চট্টরাজের চিঠি পাই সেইদিনই ভাইপোও পৌঁছে যায়। মজঃফরপুর থেকে তাঁর শ্বশুরমশায়ও সঙ্গে এসেছেন। দলে আমরা তিনজন মাত্র। তাই মোটরে স্থানাভাব নেই। কিন্তু, সময়াভাব হয়। কালবিলম্ব না করে পরদিনই আমরা যাত্রা করা স্থির করি। চট্টরাজের এসে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়

না। দুঃখপ্রকাশ করে সেইমত তাঁকে জানিয়েও দিই।

মধুপুর থেকে সকালে যাত্রা করে গিরিডি হয়ে হাজারিবাগ পৌঁছুই। শহর ছাড়িয়ে চাতরায় যাই। সেখানে লাবালঙ্ জঙ্গলে দুরাত্রি কাটিয়ে পালামৌ অভিমুখে রওনা হই। টোরি, চান্দোয়া ও লাতেহারের মধ্যে দিয়ে মোটরপথ। লাতেহারে পৌঁছে মনে পড়ে, সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ বর্ণনার মধ্যে একমাত্র এই লাতেহার নামটিরই উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্য কোন স্থানবিশেষের নাম দেখা যায় না। লাতেহার তখন নগণ্য গ্রাম মাত্র। গ্রামের পাশে লাতেহার-পাহাড়। প্রতিদিন বিকালে তিনি সেদিকে যেতেন। একান্তে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। সেইখানেই পথে একদিন এক স্থানীয় ব্রাহ্মণ সন্তানের সঙ্গে দেখা। তার গোরুকে বাঘে মারায় সে তখন বীরদর্পে টাঙ্গীহাতে সেই বাঘটাকে খুঁজে বার করে মারতে চলেছে। সঞ্জীবচন্দ্র তখন সাহেববেশী, বন্দুকধারী। তিনিও তার সঙ্গ নেন। পাহাড়ে কিছুদূর উঠে যুবকটি তাঁকে দাঁড়াতে বলে বাঘের সন্ধানে যায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে জানায়, দেখতে পেয়েছি, শীঘ্র আসুন। বাঘ নিদ্রা যাচ্ছে। তিনি তার সঙ্গে গিয়ে দেখেন, এক গুহার মাঝখানে প্রাঙ্গণের মত। সেইখানে বাঘ নিরীহ ভাল মানুষের মত চোখ বুজে রয়েছে, মুখের নিকট "সুন্দর নখরসংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধহয়, নিদ্রার পূর্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল।" তারপর একটা প্রকাণ্ড পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে ফেলে যুবকটি বাঘকে মারে!

সেই লাতেহার পাহাড় রাজপথের অদূরে এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। বনজঙ্গলও দূরে দেখা যায়। কিন্তু লাতেহার এখন আর ক্ষুদ্র গ্রাম নয়। আরও কয়েকটি গ্রাম নিয়ে লাতেহার এখন পালামৌ জেলার এক মহকুমা—সাব্‌ডিভিসন। ১৯২৪ সাল থেকে লাতেহার জনপদ সেই মহকুমার প্রধান কেন্দ্র। ১৯৫১ সালের আদমসুমারির গণনায় দেখা গেছে, এখানে দু-হাজারের উপর লোকবসতি। কোর্ট, সরকারী দপ্তর, জেলখানা, হাসপাতাল। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, জেলা পরিষদের ও পি. ডব্‌লিউ. ডি.-র দুটি নিরীক্ষণ ভবন, পোস্ট টেলিগ্রাফ দপ্তর ত বটেই, টেলিফোনও হয়েছে। পথের পাশে দোকানপাটের সারি। এই সব সত্ত্বেও লাতেহার জঙ্গলের এখনও প্রসিদ্ধি আছে। দূরে বনময় ছায়াঘন পাহাড়ের শ্রেণী তারই ইঙ্গিত দেয়।

পালামৌ জেলার সদর শহর ডালটনগঞ্জ। গোমো-বরকাখানা-ডেহরি-অন্-শোন শাখা-রেলপথে ডালটনগঞ্জ স্টেশন। আমরা পৌঁছুই মোটরে। বেলা তখন দশটা।

শহরে পৌঁছুবার প্রায় দশ কিলোমিটার আগে চোখে পড়েছে, পথের বাঁ দিকে আর এক শাখাপথ বার হয়ে যায়, মোড়ের নিকটে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে লেখা—ঐদিকে বেতলা। উৎসুক নয়নে সেদিক পানে তাকিয়ে দেখি,—অদূরে ছোট ছোট পাহাড়, বনভূমি। কিন্তু বনে থাকবার অনুমতিপত্রের জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হয় ডালটনগঞ্জে।

চট্টরাজ জানিয়েছিলেন, তাঁর মাসতুতো ভাই, গাঙ্গুলী, ডালটনগঞ্জে সরকারী বড় অফিসার—এ. ডি. এম.—অতিরিক্ত জেলা শাসক।

শহরের মধ্যে গাড়ি প্রবেশ করলে আমি বলি, চল, সোজা কোর্ট এলাকায়। সেখানে গাঙ্গুলীর সন্ধান করা যাবে।

সেখানে গিয়ে খবর পাই, তখনও কোর্ট বসার সময় হয় নি, তিনিও পৌঁছন নি।

তাঁর বাড়ির খোঁজ নিই। পিয়ন জানায়, এই তো নিকটেই। মোটর রয়েছে, চলে যান এখনই। গেট থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে বাঁ দিকে অল্প গিয়েই ডান হাতি একটা রাস্তা পাবেন, তাতে ঢুকে ডাইনে গিয়ে তারপরে বাঁয়ে মোড় নিয়ে আবার ডাইনে—এইভাবে "ডাইনে-বাঁয়ের" ধাঁধার জাল বুনে পথের সন্ধান বলে যায়,—যেন Merchant of Venice-এ Launcelot Gobbo-র তার প্রায়ান্ধ পিতাকে শাইলকের বাড়ির হদিস দেওয়া।

শুনে সঠিক কোন ধারণাই হয় না। তবে একটা নির্দেশ মনে থাকে, বাড়ির সামনে পান-বিড়ির ছোট দোকান। সেখানে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে।

ভাইপো বলে, অত ঘোরাঘুরি করে লাভ কী? তাঁর কোর্টের সময় হয়ে আসছে, তাঁকে অযথা বিরক্ত করা কেন। আমি এর মধ্যে খবর নিলাম, বনবিভাগের দপ্তরও এই কোর্ট এলাকায়। সেখান থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে, শহরে খাওয়াদাওয়া সেরে সোজা বেতলায় চলে যাব। গাঙ্গুলীর সাহায্যের দরকার আছে কী?

আমি রাজি হই না। বলি, গাঙ্গুলী ডি. এফ্. ও-কে বলে দিলে পারমিটের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তা ছাড়া, চট্টরাজের মাসতুতো ভাই,—এতদুর এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না করেই চলে যাব?

অতএব, সেই ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে পথের পাশে একটা পান-বিড়ির দোকান দেখতে পাই, —কলোম্বাসের আবিষ্কারের মত। গাড়ি থামিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করি, এ. ডি. এম. সাহাবকো কোঠি কিসি তরফ?

সে তখনই সামনে আঙুল দেখায়। রাস্তার অপর পারে পাঁচিল-ঘেরা গেট-দেওয়া বিরাট এলাকা। বাগানের মধ্যে সেকালের বাংলো প্যাটার্নের প্রকাণ্ড একতলা বাড়ি।

গেট দিয়ে মোটর ঢুকতে দেখে চাপরাশী এগিয়ে আসে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে মুখ বার করে জিজ্ঞাসা করি, সাহাব হ্যায়?

সে সেলাম ঠুকে সবিনয়ে উত্তর দেয়, নেহি হুজুর! সাহাব কাল পাটনা গ্যয়া।

ভাইপো স্বস্তিবোধ করে বলে, "যাক, ভালই হয়েছে,—চল এবার, ফিরে গিয়ে পারমিটের ব্যবস্থা করি।" আমার আরও জেদ চাপে। আরদালিকে জিজ্ঞাসা করি, "মেমসাহাব হ্যায়?"

"জি হুজুর।"

ভাইপো আশ্চর্য হয়ে বলে, কী ব্যাপার? তাঁর সঙ্গে দেখা করে কি হবে?

বলি, হাজার হোক। চট্টরাজের মাসতুতো ভাই-এর স্ত্রী, অন্তত তাঁরই সঙ্গে দু-মিনিটের জন্যে দেখা করে বলে আসি, গাঙ্গুলী ফিরে এলে জানিয়ে দেবেন.—আর প্রবাসে বাঙালীরা হঠাৎ আগন্তুক বাঙালী পেলে কত খুশি হন!—এখুনি দুটো কথা বলে ঘুরে আসছি,— তোমরাও নামো না? বলে—গাড়ি থেকে নেমে পড়ি।

ভাইপো বলে, তোমার যেমন কাণ্ড! কী দরকার এভাবে দেখা করার—তোমার নিজের চেনা-পরিচিতও নন! তুমি যাবে, যাও। আমরা গাড়িতেই বসে রইলাম। দেরি কোর না যেন।

আমি কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করি, চট্টরাজের আত্মীয়া! বাড়িতে এসে দেখা না করে গেলে চট্টরাজই বা কি মনে করবেন?—আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি, একটু বোস তোমরা।

বেয়াইমশাই মুখ টিপে মুচকে মুচকে হাসেন। কবি মানুষ, ছবিও আঁকেন। মজঃফরপুরে থাকেন। শান্তভাবে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন-যাপনের চেষ্টা করেন। প্রবাসী বাঙালীর মর্মকথা আমার মুখে শুনে কৌতুকবোধ করলেন বলেই হাসলেন ভাবলাম।

বাড়ির সুমুখ দিকে টানা লম্বা বারান্দা। দ্রুতপদে এগিয়ে সেখানে উঠলাম। সারি সারি ফুলগাছের টব পাতা। একধারে বেতের চেয়ার টেবিল সাজানো। ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি, পরিপাটি হবার কথাই। আরদালিকে বলি, মেমসাহাব কো জলদি যাকে কহো. চট্টরাজ-সাহাবকো এক দোস্ত আয়া হ্যায়।

সে তখনই দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে। অল্প পরেই এক মহিলা বেরিয়ে আসেন। দেখে নিশ্চিন্ত হই, ম্যাজিস্ট্রেট-জায়া,—মেমসাহেবী চালচলন নয়। বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের গৃহকর্ত্রীর মতনই সাধারণ বেশভূষা, মুখের হাবভাব।

হাত তুলে নমস্কার জানাতে তিনিও সেইভাবে প্রতিনমস্কার করেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান। হাসিমুখে বলি, আপনার কর্তা বুঝি পাটনায় গেছেন? চট্টরাজ আমার বিশেষ বন্ধু। আমরা চলেছি বেতলার জঙ্গল দেখতে। চট্টরাজ জানিয়েছিলেন, আপনার কর্তা তাঁর মাসতুতো ভাই; তাঁর সঙ্গে এখানে যোগাযোগ করতে। তাই এসেছিলাম, কিন্তু তিনি তো নেই দেখছি, ফিরে এলে তাঁকে বলবেন—

ভদ্রমহিলা বলেন, হ্যাঁ, উনি কালই পাটনা গেছেন, ফিরতে দিন তিন চার দেরি হবে।—

তারপর ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেন, চট্টরাজ কে বলুন তো? আমি তো চিনতে পারছি না।

বলি, অশ্বিনীকুমার চট্টরাজ। এখন সাহারসাতে রয়েছেন,—অমুক দপ্তরে। তাঁর সঙ্গে আমার খুবই জানা শোনা, তিনিই জানিয়েছিলেন ডালটনগঞ্জে আমার মাসতুতো ভাই এ. ডি. এম. মিস্টার গাঙ্গুলী—

মহিলা তৎক্ষণাৎ অবাক হয়ে বলে ওঠেন,—গাং-গু-লী! আমরা তো রায়!

আমি তো হতভম্ব! ভাবছি, ধরণি! দ্বিধা হও!

মহিলা মৃদু হেসে তখনই জানান, মিঃ গাঙ্গুলী এখানকার এক এ. ডি. এম. আছেন ঠিকই। আমার

স্বামী আর এক এ. ডি. এম.। আপনি বাড়ি ভুল করেছেন বুঝতে পারছি। তাঁর বাড়িও নিকটেই।

আমি লজ্জিত হয়ে বলি, কী কাণ্ড! দেখুন তো আপনাকে অযথা বিরক্ত করলাম!

তিনি বলেন, তাতে আর কি হয়েছে? তবে মিঃ গাঙ্গুলীরও পাটনা যাবার কথা ছিল, গেছেন কিনা জানি না। দাঁড়ান, এখনই টেলিফোন করে জেনে নিই।

আমি তখন পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচি।

তিনি ততক্ষণে পাশের টেবিলে টেলিফোন যন্ত্র তুলে কথা বলতে সুরু করেছেন। গাঙ্গুলীই অপরপ্রান্ত থেকে উত্তর দেন। ভদ্রমহিলা রিসিভারটা আমার হাতে এগিয়ে দিলেন।

যাক, চট্টরাজের নাম করতেই গাঙ্গুলী চিনতে পারেন। বলেন, আমি তো এখনই কোর্টে যাচ্ছি, গাড়িতে উঠতে গিয়ে টেলিফোন বাজার শব্দ শুনে ঘরে ফিরে এলাম। আপনারা এখুনি চলে আসুন। মোটর রয়েছে তো? দেরি করবেন না।

মিসেস রায় বলেন, বাড়িটা কাছে হলেও পথটা আঁকা-বাঁকা, চাপরাশী সঙ্গে যাক, দেখিয়ে দেবে।

আমি বলি, আর লজ্জা দেবেন না,—তবে সময়ের যখন টানাটানি,—আবার ভুল করে আর কারও বাড়িতে ঢুকতে চাই না।

চাপরাশী সঙ্গে চলে। ভাইপো ব্যাপার শুনে শুধু মন্তব্য করে, তখন থেকে বারণ করছি, কী দরকার এঁদের বিরক্ত করে? তবু শুনবে না,—চট্টরাজের মাসতুতো ভাই-এর সঙ্গে দেখা না করে যেন বেতলা যাওয়া চলবেই না।

বেয়াই-মশাই ঠোঁট চেপে তেমনি মুচকে মুচকে হাসেন।

গাঙ্গুলীর বাড়ির সামনেও পান-বিড়ির আর এক দোকান। দেখে ভাবি, নিশানদারী দোকান তো নয়! এ-যেন আলিবাবার কাহিনীর সেই মর্জিয়ানার চিকে-কাটা চিহ্ন দেওয়া বাড়ির দরজায় দরজায়। পান-বিড়ির দোকান এদেশে পথে-ঘাটে।

গাঙ্গুলীর বাড়ির এলাকায় ঢুকে দেখা যায় 'দুয়ারে দাঁড়ায়ে গাড়ি',—গাঙ্গুলী কোর্টের বেশভূষা পরে তারই কাছে পায়চারি করেন ব্যস্ত হয়ে।

বেয়াইমশাই তাঁকে দেখতে পেয়েই বলে ওঠেন, একি! নীলেন্দু গাঙ্গুলী! এখন এখানে? ওঁর সঙ্গে ত আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। মজঃফরপুরে অনেকদিন পোস্টেড ছিলেন।

গাঙ্গুলীও তাঁকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হন,—আরে! মিস্টার চক্রবর্তী! আপনি এখানে?

এবার বেয়াইমশাই আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। গাঙ্গুলী মহাখুশি। কিন্তু বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে জানান, আমি তো ফাঁপরে পড়লাম! আপনারা এলেন, আমার বাড়িতে,—ও-দিকে কোর্টে আমার এক জরুরী কনফারেন্স রয়েছে বেলা এগারোটায়! বাইরে থেকে অফিসাররা এসেছেন। আমাকে তো এখনই বেরুতেই হয়। বাড়িতেও এখন কেউ নেই—মেয়েরা সব ভাগলপুরে গেছেন,—রাঁধবার লোকটাও আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে একটু আগে বেরিয়ে গেল। আচ্ছা—দাঁড়ান,—আসছি এখনই একটা টেলিফোন করে।

দু মিনিট পরেই ফিরে আসেন। বলেন, চলুন, তাড়াতাড়ি আমার গাড়িতেই উঠুন সবাই,—আপনাদের গাড়িটা পিছন পিছন আসুক—গাড়িতে বসেই কথা হবে।

গাড়িতে বসে জানান, সার্কিট হাউসের চৌকিদারকে তিনি টেলিফোনে বলে দিয়েছেন, সেইখানেই আমরা এখন গিয়ে উঠব, আহারের ব্যবস্থাদিও সে করে দেবে। দুপুরে কোর্টের 'লাঞ্চে'র অবসরে তিনি আমাদের সঙ্গে আবার দেখা করবেন। বেতলার পারমিট ইত্যাদিরও ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করে সঙ্গে আনবেন। বিকেলে আমরা বেতলা পৌঁছে যাব—তবে, সেখানে যে দুরাত্রি থাকব তার জন্যে রেশনআদি এখান থেকেই কিনে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে,—এখানে বাজারে কেনাকাটি করবার সময় তাঁর চাপরাশী আমাদের সঙ্গে থাকবে।

সেইমতই সব ব্যবস্থা নিখুঁত ভাবেই হয়ে যায়। গাঙ্গুলী জানান, পরের দিনও তাঁর কনফারেন্স চলবার কথা। যদি কোন কারণে না বসে, তবে তিনিও বেতলায় গিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন,—আমরা এলাম অথচ একসঙ্গে কিছুক্ষণ কাটানো সম্ভব হল না বলে দুঃখ প্রকাশ করেন।

কোন্ চিত্রকরের আঁকা সে-ছবি আজ নাম ঠিক মনে নেই। সম্ভবত রবি বর্মার। সেকালে অনেকের ঘরে—এমন কি, দোকানে দোকানেও টাঙানো থাকত। ভারতমাতার রঙিন চিত্র। ভারতবর্ষের মানচিত্রের আকৃতি ধারণ করে দাঁড়িয়ে—ভারতমাতা। মায়ের পরনে লালরঙের শাড়ি। শিরে শোভা পায় স্বর্ণ-মুকুট—তুষারধবল হিমালয়-শিখরে যেন সূর্যোদয়ের কনককান্তি। আর, গিরিরাজের শৈলশ্রেণী?—মায়ের মাথা থেকে আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকে আলুলায়িত কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ। কন্যাকুমারিকার অন্তরীপ,—মায়ের মুক্তচরণযুগল। পদাঙ্গুলি স্পর্শ করে মহাসাগর,—যেন, "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।" আর, লঙ্কাদ্বীপ? মায়ের পদপ্রান্তে যেন সাগর-জাত পদ্মকোরক। ওদিকে, পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্মদেশের আকার? মায়ের অঙ্গচ্যুত বসনাঞ্চলের যেন এক প্রান্ত,—পূর্বদিগন্ত ব্যেপে থাকে। আজ স্মরণে নেই, সেই চিত্রে জননীর অঙ্গভূষণে চিত্রকর দেবীর কটিদেশে মেখলার অলঙ্কার অঙ্কিত করেছিলেন কিনা। কিন্তু, প্রকৃতই ভারতমাতার কটিদেশ বেষ্টন করে রয়েছে অরণ্যমালার শ্যামশোভা।

মধ্যভারতের পশ্চিম থেকে পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ পার্বত্যপ্রদেশ—বিজন গহন বনভূমি। এরই অংশবিশেষ প্রাচীন দণ্ডকারণ্য। বিহার প্রদেশে অপর এক অংশ—পালামৌ। ছোটনাগপুর মালভূমির পশ্চিমভাগে এর অবস্থান।

এই সকল আদিম অরণ্যানী ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপ।

জীবনধারণে জীবজন্তুর, এমন কি, মানবদেহেরও, যেমন জলের একান্ত প্রয়োজন, তেমনি দেশভূমিরও একতৃতীয়াংশ ভাগ অরণ্যময় থাকার অত্যাবশ্যকতা। আকাশের মেঘপুঞ্জ বনের সবুজ তরুলতার আহ্বানে সাড়া দেয়। দেশের যে অঞ্চলে যত গাছপালার সমাবেশ বৃষ্টি ঝরে সেখানে তত বেশি। পর্বতে অরণ্যে নদীর জন্মভূমি। নদীমাতৃক দেশ শস্যশ্যামল, 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা'। বসুন্ধরার এক অঙ্কে মাটি, জল ও তরুলতা। অপর অঙ্কে জীবজন্তু, মানবজাতি। উভয়ের লালনপালনে ও পরস্পরের জীবনযাত্রায় প্রাকৃতিক একটা সমতা আছে। তার হেরফের ঘটলেই প্রকৃতি তার দণ্ডবিধান করেন। মানুষের অপরিণামদর্শিতার ফলে কোথাও শস্যশ্যামলক্ষেত্র বালুকাভূমিতে রূপান্তরিত হয়, কোথাও বা সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ বনজঙ্গলে পরিণত হয়। কোথাও জলের অভাব ঘটে, কোথাও আবার অকস্মাৎ বন্যার প্রকোপ নামে।

বিশ্বসৃষ্টির মাঝে অরণ্যের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে বন্যজীব-জন্তুদেরও প্রাণধারণের অধিকার আছে। জীব-জগতে বিভিন্ন প্রাণীরা আপন আপন স্বভাবগুণে পরস্পরের সংখ্যার সমানুপাত বজায় রাখে। বিশেষজ্ঞরা প্রাণিজগতের এই বিচিত্র রীতি বিচার করে প্রমাণ করেন, পৃথিবীর অর্ধেক জীব অপর অর্ধেকের ভক্ষ্য! হরিণের ও শূকরের পাল ক্ষেতের ফসল ধ্বংস করে, বাঘে হরিণ ও বরাহ মারে। চিতা বাঘ বানরের সংখ্যা কমিয়ে রাখে। সাপ, পেঁচা, ইঁদুরের যম। আবার নেউল, ময়ূর ও চিলের খাদ্য হল সাপ ও অসংখ্য পোকামাকড়।

এইভাবেই সৃষ্টির লীলাকাণ্ড চলে।

কিন্তু স্বার্থপরায়ণ, নির্বোধ মানুষের অবিবেচনায় বহু মূল্যবান বৃক্ষাদি নির্মূল হয়েছে, অরণ্যভূমি বিলোপ পেয়েছে, বন্য পশুপক্ষী নির্বিচারে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। ভাগ্যক্রমে এখন মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। দেশহিতৈষীরা উপলব্ধি করছেন, অরণ্যভূমি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মানুষেরই নিজ প্রয়োজন। দেশে দেশে এই উদ্দেশে আইনেরও প্রবর্তন হয়েছে।

পালামৌর অরণ্যও সেইমতই সংরক্ষিত বনভূমি। তারই এক অংশে বেতলা। সেইখানেই আমরা চলেছি।

যে-পথ দিয়ে মোটরে ডালটনগঞ্জ গিয়েছি সেই পথ ধরেই আবার ফিরে চলি। প্রায় দশ কিলোমিটার যাবার পর এখন ডান দিকে বেতলার রাস্তা। সেই পথ দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই ছোট ছোট পাহাড় ও বনের গাছপালা সুরু হয়। এ-পথও প্রশস্ত ও বাঁধানো—পি. ডবলিউ. ডি.-র পাকা সড়ক। পালামৌ জঙ্গলের এই উত্তর প্রান্ত থেকে প্রবেশ করে বনভূমি ভেদ করে চলে গেছে দক্ষিণে।—পথে পড়ে

বেতলা। তারপর আরও এগিয়ে মাঝপথে উত্তর-কোয়েল নদী নর্থ কোয়েল—পার হয়ে গারু ছাড়িয়ে এগিয়ে যায় বড়েষাঁড়ের দিকে। শেষ হয় মহুয়াডাঁরের সমভূমিতে নেমে। সেখানে প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আর এক শৈলশ্রেণী। তারই অপর দিকে মধ্যপ্রদেশের সারগুজা জেলা।

উত্তরে আমাদের বনে ঢোকার মুখে আর এক নদী ঔরঙ্গা। বেতলার জঙ্গলের পুব সীমানার খানিক ঘিরে উত্তরে ঘুরে এসেছে। নদীর উপর পাকা পুল। পুলের উপর থেকে দু-দিকের নদীর দৃশ্য সুন্দর। অপর পারে অল্প যাবার পর ডান দিকে মোটরের আর একটা রাস্তা চলে যায় কেচকির বনবিশ্রাম ভবনে,—বড় রাস্তা থেকে মাইলখানেকও দূর নয়।

কেচকির বাংলো তৈরি হয়েছে ১৯৫২ সালে। অতিশান্ত মনোরম পরিবেশ। তিনদিকে বনভূমির বড় বড় গাছপালা। সামনে খোলা। অবাধ উন্মুক্ত দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে সেদিকপানে। বাংলোর বাঁ দিক থেকে এসেছে কোয়েল নদী, ডাইনে থেকে আসে ঔরঙ্গা। সুমুখে বাংলোর এলাকার নীচেই সবুজ ক্ষেত। আরও অল্প নামলেই বিস্তীর্ণ বালুচর—ত্রিভুজ আকৃতি। অদূরে দুই নদীর সঙ্গম। মিলিত জলধারা দিগন্ত অভিমুখে এগিয়ে চলে। সেদিকে দূরে আকাশে হেলান দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের সারি যেন নদীর গতিপথ রুদ্ধ করে।

এমন মনোহর পরিবেষ্টন হলেও বাংলোটি বনের দ্বারদেশে। আমাদের উদ্দেশ্য গভীর বনে রাত কাটানো। সেইমত আরও কয়েক মাইল এগিয়ে যাই বেতলাতে।

সেখানে বনের মধ্যেও লোকালয়। বনবিভাগের কর্মী, বনরক্ষী প্রভৃতির থাকবার কয়েকটি ঘরবাড়ি, সরকারী দপ্তর। পথের ডানদিকে একটা টিলার উপর বেশ বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে। পরে জানতে পারি, ঐখানে পরিকল্পিত টুরিস্ট লজ, ক্যানটিন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে।

আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে সামান্য এগিয়ে যাই। সেইখানে বেতলার পুরানো বনবিশ্রাম ভবন। ঐ বাড়িতে থাকবার আমাদের অনুমতিপত্র।

ছিমছাম ছোট বাংলো। বন ঘেরা উঁচু নীচু পাহাড়ী জায়গা। তাকিয়ে দেখে বোঝা যায় না, এখানকার উচ্চতা সাগরবক্ষ থেকে ৯৫০ ফুট উপরে।

ফরেস্টার দেখা করতে আসেন।

তাঁর সঙ্গে গল্প করি। অরণ্য সংরক্ষণ বিষয়ে কিছু তথ্যও জানতে পারি। তিনি বলেন, শিকারে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগ চালু হওয়ার পর থেকে শিকারীদের—বিশেষত সাহেবদের ও দেশীয় রাজারাজড়া—জমিদারদের শিকার করার শখ ও লোভ এমনি প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছিল যে আমাদের দেশে বন্য প্রাণী লোপ পাবার সামিল হয়ে পড়ে। এক শিকারী, নাম করেই বলি,—বই-এতেই আছে, উদয়পুরের মহারাজা নাকি সারাজীবনে এক হাজার বাঘ মেরেছিলেন। আর, এই পালামৌর পাশেই ছিল সুরগুজারাজ্য, সেখানকার মহারাজার গর্ব ছিল, তিনি এক হাজার একশ' পঞ্চাশটা বাঘ মারেন! এছাড়া, তিন চারশ বাঘ মারার কৃতিত্বের অহঙ্কার তো কয়েকজনই করতেন। এর ওপর আবার বনের জীবজন্তু মেরে তাদের চামড়া বিক্রির ব্যবসাও বেশ ফেঁপে ওঠে। স্বাধীনতার আগে ভারতের বহু স্থানে অনেক বনভূমি রাজারাজড়াদের ব্যক্তিগত রাজ্যের বা জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাধীনতার পর সেগুলি ক্রমশ রাষ্ট্রায়ত্তে আনা হয়। বিহার সরকারও Private Forests Act প্রবর্তন করে প্রায় ২৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী বেসরকারী বনসম্পত্তি রাষ্ট্রীয় অধীনে আনেন। কিন্তু, তাতেও অবাধে বনের গাছপালা ধ্বংস, প্রাণিহত্যা, মাংসাহারের লোভে পশুপক্ষী শিকার বন্ধ হল না। এখন আরও সব আইনকানুন হয়ে সংরক্ষণের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

কথাগুলি শুনে ভাবি, অরণ্যের পশুর প্রকৃতই প্রধান শত্রু হল মানুষ। খাদ্যের সন্ধানে সেই আদিম গুহাবাসী বর্বর মানুষ থেকে সুরু করে আধুনিক জগতের সুসভ্য মানুষ সমানে পশুপক্ষী নিধন করে চলেছে। কা কথা অন্যেষাম্? বাল্মীকির রামায়ণেই পড়ি, স্বয়ং রামচন্দ্র ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ বনবাসে গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে কত পশুই না শিকার করলেন! বনযাত্রার প্রথম দিকেই দেখা যায়, নিষাদরাজ গুহর কাছে বিদায় নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে বৎসদেশে পৌঁছে "রাম লক্ষ্মণ বরাহ ঋষ্য পৃষত ও মহারুরু এই চারপ্রকার পশু বধ করে তাদের পবিত্র মাংস নিয়ে ক্ষুধিত হয়ে সায়ংকালে বাসের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করলেন।"

"তৌ তত্র হত্বা চতুরো মহামৃগান্ বরাহমৃষ্যং পৃষতং মহারুরুম্।
আদায় মেধ্যং ত্বরিতং বুভুক্ষিতৌ বাসায় কল্যে যযতুর্বনস্পতিম্॥"

(রাজশেখর বসুর ব্যাখানে পাই "ঋষ্য ও পৃষত—বিভিন্ন জাতীয় কৃষ্ণসার। মহারুরু বোধ হয় শম্বর।")

এখন যদি আইনবলে বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ সম্ভব হয় দেশেরই মঙ্গল!

জিজ্ঞাসা করি, কোন কোন বন শুনি Sanctuary, কোথাও আবার দেখি Reserved forest লেখা,—পালামৌ ত শুনে এসেছি National Park;—এ সব শ্রেণীবিভাগ কী ভাবে হয়?

তিনি বলেন, মোটামুটি তিনটে শ্রেণী করা হয়েছে, এক হল Reserved forest সংরক্ষিত অরণ্য। সে-জঙ্গলে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র ছাড়া কোন জীবজন্তু মারা চলবে না। জঙ্গলের গাছ ইত্যাদি জমা দেওয়া হয়, কাঠ কেটে বাইরে নিয়ে যেতে শুল্কাদি ধার্য আছে। জঙ্গলের মধ্যে যারা আগে থেকে বসবাস করছিল তাদের পুরুষানুক্রমে জমিতে স্বত্বস্বামিত্ব থাকলেও গভর্নমেন্টের সম্মতি বিনা অপর কেউ কোন নতুন স্বত্ব অর্জন করতে পারে না। জঙ্গলের কাঠ সংগ্রহ ব্যাপারে সেই সব আদিবাসীদের অধিকার থাকে, তবে তারও কিছু নিয়মকানুন বেঁধে দেওয়া হয়। এইসব কারণে রিজার্ভড্ ফরেস্টের মধ্যে কিছু কিছু গ্রাম ও আদিবাসীর বাস দেখতে পাবেন।

আর এক শ্রেণীর বন হল Sanctuary—অভয়ারণ্য। এ ধরনের বনের নির্ধারিত এলাকায় বসবাস করা, এমন কি প্রবেশ করাও, গভর্নমেন্টের অনুমতিসাপেক্ষ। প্রাণীশিকার করাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ—যদি না বন ও প্রাণীসংরক্ষণের বৃহত্তর কারণে কোন বিশেষ পশুকে হত্যা করার নেহাত প্রয়োজন বোধ হয়। অভয়ারণ্যের মধ্যে থেকে কোন মৃত জীবজন্তুর দেহাংশ—ট্রফি, এমন কি মাংসও বাইরে নিয়ে যেতে হলে অনুমতির প্রয়োজন।

আর সবচেয়ে বিশিষ্ট হল National Park-জাতীয় অরণ্যোদ্যান। অভয়ারণ্যের বা সংরক্ষিত বনের কোন অংশ অথবা নতুন কোন অরণ্যভূমি জাতীয় অরণ্যোদ্যান আখ্যায় ঘোষিত হতে পারে। এর সীমানার মধ্যে সাধারণ বিধিনিষেধগুলি তো বলবৎ থাকেই, তা ছাড়া আরও বিশেষ বিধান হল, এই অঞ্চলভুক্ত সব জমির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার গভর্নমেন্টের খাসদখলে থাকে, সাধারণ কারও সেই বনে কোনরকম স্বত্ব বা দখল আগে থেকে থাকলে গভর্ণমেন্ট তা নিজ অধিকারে নিয়ে আসে,—অর্থাৎ এই জাতীয় অরণ্যোদ্যানে ব্যক্তিগত স্বত্বে কেউ বসবাস বা প্রবেশও করতে পারে না। কোনপ্রকার জীবহত্যা তো নয়ই, গাছপালা কাটা বা বনের কোন অংশ কোনও মতে ধ্বংস বা নষ্ট করাও চলবে না। এ ধরনের কোন কিছু করতে গভর্নমেন্টও অনুমতি দিতে পারবে না, যদি না অরণ্য সংরক্ষণের বিশেষ কারণেই হঠাৎ ক্বচিৎ কখনও তার প্রয়োজন হয়। জাতীয় অরণ্যোদ্যানে সাধারণ মানুষের বসবাসও যেমন নেই, পশুচারণও তেমনি নিষিদ্ধ। যানবাহনের কাজে ছাড়া গৃহপালিত পশুরও বনে প্রবেশ নিষেধ।

আইনের এত সব কড়াকড়ি করার উদ্দেশ্য হল,—দেশের এক অমূল্য সম্পত্তি এইসব অরণ্য। তার স্বাভাবিক আদিম রূপ, পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থা, বন্যপশুপক্ষীদের স্বাধীন, স্বাভাবিক জীবনধারণের প্রথাপদ্ধতি,—এক কথায়, জঙ্গলটি ঠিক যেমন ছিল সেই অবিকল অবস্থাতেই সংরক্ষণ করা,—উৎসাহী, কৌতূহলী মানুষ এখানে এসে যাতে আদিম প্রকৃতির স্বরূপ দেখতে পায়, প্রকৃত বন ও বন্যপশুদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

ভাইপো প্রশ্ন করে, পালামৌর জঙ্গল কোন্ পর্যায়ে পড়ে?

ফরেস্টার উত্তর দেন, পালামৌর জঙ্গলের একসময়ে যে বিস্তার ছিল এখন তা নেই,— বন কেটে কত জায়গায় বসতি হয়েছে, ছোটখাট শহরও হয়ে গেছে, তবুও এদিকটায় এখনও যে সব অংশে গভীর বনজঙ্গল রয়েছে তার মধ্যে Reserved ফরেস্ট আছে। পালামৌ জেলার পুবদিকে হাজারিবাগ জেলা। সেখানকার জঙ্গলও প্রসিদ্ধ এবং তার এক অংশ National Park বলে ঘোষিত হয়েছে। ১৯৬০ সাল থেকে সেই ন্যাশানাল পার্কের অনুসারে পালামৌর এইধারের বনাঞ্চলও ন্যাশানাল পার্ক বলে জনসাধারণে প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু আইনত সেই অভিধা ঘোষিত না হওয়ায় এ বন প্রকৃতপক্ষে এখনও Reserved forest-ই বলতে হবে। এই বনের বিস্তার ৯৬.২০ বর্গমাইল (প্রায় ২৫০ বর্গ কিলোমিটার) —বেতলার জঙ্গল তারই অংশ। আজ রাত্রে চলুন ঘুরে দেখবেন।

জিজ্ঞাসা করি, কখন যেতে হবে বলুন, আমরা সব সময়েই যেতে তৈরি।

তিনি জানান, বন দেখতে হয় রাতের বেলায়। আমাদের যখন রাত্রি,—নিদ্রার সময়, বনের জীবজন্তুর তখনই ঘোরাফেরার অবসর, আহারের সন্ধানে বিচরণ। জানোয়ার দেখতে পাওয়ার তখনই হয় সুযোগ। খাওয়াদাওয়া সেরে আপনারা তৈরি থাকবেন। বনের মধ্যে ঘোরবার জন্যে আমাদের জীপ-এর ব্যবস্থা আছে, ভাড়া পাওয়া যায়,—গাইড আসবে ঠিক ন'টার সময় সেই জীপ নিয়ে। বনের ভিতরে ত আর পি. ডব্‌লিউ. ডি.-র ভাল সড়ক নেই,—ফরেস্ট-রোড,—বনবিভাগের সরু পথ,—কোথাও কোথাও এবড়ো-খেবড়ো। উঁচু-নীচু আঁকাবাঁকা,—বাড়ির গাড়ি সে পথে সব জায়গায় যেতে পারে না—জীপ-এ যাওয়া চলে।

ভাইপো জিজ্ঞাসা করে, আসামে জলদাপাড়া, কাজিরাঙ্গা প্রভৃতি বনের মধ্যে ঘোরবার জন্যে হাতির ব্যবস্থা আছে,—মধ্যপ্রদেশে কান্‌হাতেও তাই দেখেছি,—এখানে সে-ব্যবস্থা নেই?

তিনি বলেন, হাতি চড়ে ঘোরার ব্যবস্থা এখনও এখানে হয় নি। যদিও বুনো হাতি এখানেও দেখতে পাবেন। কিন্তু, সে-সব হাতি বারোমাস এ-বনে থাকে না, বছরের কয়েকমাস এখানে এসে কাটিয়ে যায়, আশপাশের পাহাড় ও জঙ্গল থেকে দল বেঁধে আসে। আপনাদের ভাগ্য ভাল—দু একটা দল এখন এসেছে। সাধারণত এরা সেপ্টেম্বরে আসে, মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত এদিকে ঘোরে। তারপর এপ্রিলের প্রথম দিকে আবার অন্য বনে, সচরাচর—বড়েষাঁড়ের জঙ্গলে চলে যায়,—হয়ত, গরমের সময় তাদের প্রয়োজনমত জলের এখানে অভাব বোধ করে।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করি, বাঘ দেখতে পাব তো?

ফরেস্টার হেসে বলেন, সেও ভাগ্যের কথা। বড় বাঘ সারা পালামৌ জঙ্গলে এ বছর গণনায় এখনও পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেছে—১৮টি, লেপার্ড তো তিনটি মাত্র। তার মধ্যে বেতলা এলাকায় বড় বাঘ এখন আছে একটি মাত্র। লেপার্ডও একটি। তারা কখন আবার অন্য বনে চলে যায় তার ঠিক নেই। লম্বা পাড়ি দেওয়া তাদের কাছে কিছুই নয়। এ-সময়ে ঘাপটি মেরে কে কোথায় পড়ে আছেন, তার কোন ঠিক নেই। তবে, রাতের প্রথম ও শেষ প্রহরে বাঘদের দেখা পাওয়ার খানিক আশা থাকে। দেখুন, আপনাদের দর্শন দেন কিনা। এখানকার সবচেয়ে সেরা গাইড যে—সে-ই আপনাদের সঙ্গে থাকবে। এদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ত আছেই, তার ওপর অদ্ভুত একটা বোধশক্তি আছে বনের কোথায় কোন্ জানোয়ার কখন দেখতে পাওয়া যাবে ঠিক বুঝতে পারে।—তৈরি থাকবেন ন'টার সময়,—এখন অক্টোবর মাস, বনের মধ্যে একটু ঠাণ্ডা পাবেন, সেইমত ঢাকাঢুকি দিয়ে বেরুবেন যেন।

ঠিক রাত ন'টায় জীপ আসে। আমরাও তৈরি।

জীপ-এর মাথায় আচ্ছাদন নেই। গাড়ির পিছনদিকের বেঞ্চে বসা হয়। মাথার উপর খোলা আকাশ। সামান্য মেঘের সঞ্চার হয়েছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি তারা যেন উঁকি মেরে দেখছে,—কোথায় চলল রাতের বেলা এই লোকগুলো বনের মধ্যে? আমাদের মনেও গভীর কৌতূহল,—এখনই বাঘ, হাতি কত কী বুঝি দেখতে পাব!

জীপ-এর ওপর আমাদের নিকটে দাঁড়িয়ে রয়েছে—গাইড। ড্রাইভারের পিছনে গাড়ির লোহার ফ্রেমের রড্-এর ওপর হাত রেখে সে 'স্পট্ লাইট'—সন্ধানী আলো ধরে আছে। প্রয়োজন বোধে জ্বালাবে, নেবাবে। আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে, কেউ কোন কথা বলবেন না বা শব্দ করবেন না, মানুষের গলার একটুও আওয়াজ পেলেই জানোয়ার তখনই লুকোবে বা পালাবে।

ভাবি, জীপ-এর শব্দ? তাতে তারা ভয় পায় না? সজীব মানুষের সাড়াশব্দ ও নিষ্প্রাণ যন্ত্রের আওয়াজের প্রভেদ কি ওরা বোঝে? অথবা, জীপের শব্দে অভ্যস্ত হয়ে গেছে? কিংবা, ভাবে কোন অরণ্যচারী জন্তুর কর্কশ বেসুরো কণ্ঠস্বর!

নির্মীয়মাণ পান্থনিবাস—টুরিস্ট লজ-এর সামনের রাস্তা দিয়ে অল্প এগোতেই পথের ওপর লম্বা কাঠ দিয়ে 'লক্-গেট'। গাইড নেমে গিয়ে চাবি খোলে। গাড়ি পার হয়ে গেলে আবার বন্ধ করে গাড়িতে উঠে দাঁড়ায়। বলে, এইবার শুরু হল আসল জঙ্গল—দু-পাশে। চুপ করে বসে শুধু দেখে যাবেন,—আমার আলো-ফেলার দিকে দৃষ্টি রেখে।

শব্দ করার নিষেধ শুনেই গলার মধ্যে খুসখুস করে ওঠে। মনে হয়, এই বুঝি বা কখন কাশি আসে!

ঢোক গিলে চাপবার চেষ্টা করি।

ধীরে ধীরে গাড়ি এগোয়। চোখ একাগ্র হয়ে তাকিয়ে থাকে পথের সামনে—কখনও বা দুপাশের বনের পানে। মন ভুলে যায়, কাশির উপক্রম। হঠাৎ পথের উপর হেড-লাইটের আলোর মাঝে সাদা রঙের ঝিলিক মেরে রাস্তার একপাশ থেকে অপর পারে তড়িৎবেগে লাফাতে লাফাতে চলে গেল একটা খরগোশ। একটু পরে আবার একটা। আবার, ঐ আরও একটা!

পথের দুধারের বন কত গভীর বোঝা যায় না। গাছগুলো যেন অন্ধকারে লেপটে একাকার হয়ে জমাট বেঁধে গেছে। গাছের যেন কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই,—দেখায় যেন কালো পাথরের পাহাড়। তারই মাঝে ঝিকমিক করে জোনাকির আলো। দুপাশের বনে কী গাঢ় অন্ধকার! সেই অন্ধকার ভেদ করে পথ গিয়েছে, গাড়িও ছুটছে। নিঝুম নিস্তব্ধ বনভূমি। ঝিঁঝি পোকার একটানা শব্দ ও ক্বচিৎ হাওয়ায় নড়া গাছের পাতার মর্মরধ্বনি সেই নিস্তব্ধতাকে ঘনীভূত করে তোলে। একমাত্র জীপ-এর গর্জনই সেই নৈঃশব্দ চূর্ণবিচূর্ণ করে।

হঠাৎ দেখি সেই নিকষকালো বনভূমির বুকে যেন অনেকগুলি জোনাকির আলো চিকমিক করে ওঠে। আকাশের তারাগুলি কি বনের গায়ে নেমে এল? দেখায় যেন বনদেবীর অঙ্গে জড়ানো চুমকি-বসানো নীলাম্বরী! সঙ্গে সঙ্গে গাইড-এর হাতের আলোর মুখ সেইদিকে ঘুরে যায়। গাড়িও দাঁড়িয়ে গেছে। সেই আলোর বিন্দুগুলি জ্বলজ্বলে হয়ে ফুটে ওঠে। আরও বহু অনুজ্জ্বল তারাও যেন ঝিকমিক করে। আলো পড়ায় বনের গাছগুলিও এবার স্পষ্ট আকার ধরে। গাছের তলায় এক পাল চিতল হরিণ—Spotted deer! গায়ের হলদে রঙ, গা ভরা ফুটকি ফুটকি সাদা ছোপ,—স্পট লাইটের তীক্ষ্ণ আলোকে সেগুলি চিকমিক করে। আর ছোট, অথচ তীব্র টর্চ-এর মত জ্বলে—হরিণগুলির জোড়া জোড়া চোখ, পান্নার মত সবুজ আভা। ধনুকের প্রাণঘাতী শর নয়, আলোকবাণে বিদ্ধ হয়ে তারা চমকে উঠে জ্বলন্ত নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে। কানগুলি খাড়া। মাথা তুলে আলোর দিকে ঘাড় বেঁকানো। লেজগুলি পিছনের পায়ের ফাঁকে গুটানো। স্পন্দনহীন দেহ। একটার বড় বড় শিঙ। যেন বনের গাঢ় সবুজ পটভূমিতে আঁকা চিক্কণ চিতল মৃগদলের রঙিন চিত্র। আমরাও নীরব হয়ে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি। অল্প পরেই শিঙঅলা হরিণটির চেতনা ফেরে। মুখ ঘুরিয়ে নেয়। নড়ে চলতে থাকে। অপরগুলিও সজাগ হয়, তার দেখাদেখি পিছন নেয়। চলে যেন পায়ে ভর দিয়ে নয়, বায়ুভরে যেন ভেসে চলে—গতির তালে দেহে ছন্দোময় তরঙ্গ তুলে। কয় পা গিয়ে আবার ফিরে দেখে। এইবার বোধ করি ভয় জাগে। হঠাৎ সবেগে লাফ দিয়ে বনের মধ্যে গাছের আড়ালে আত্মগোপনে সচেষ্ট হয়।

তারা চলে গেলে ভাবি, এদের স্বচ্ছন্দ বিহারে বিঘ্ন ঘটল নিশ্চয়? আর, ওই স্পট লাইটের তীব্র আলো? ওদের চমকে-ওঠা চোখের ওপর ঐভাবে হঠাৎ পড়ে তাদের দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট করে না কী?

এবার আলো ঘুরে রাস্তার উপর পড়ে। পথ দেখায়। পথের সুমুখপানে জীপ-এর সামনে, নিকটে ও দূরে—দু-তিনবার যেন মাথা নাড়ে। ড্রাইভার আলোর নিশানা বোঝে,—গাড়ি আবার এগিয়ে নিয়ে চলে।

দেখি, আলোকপাতের সঙ্কেতে গাইড নির্বাক ভাষায় কেমন আদেশ দেয়, এবার ডাইনের পথ ধর। এইবার বাঁয়ে ঘোর। এখন সোজা যেতে হবে।—আস্তে! আস্তে চল! ঐ বুঝি বনের মধ্যে জানোয়ার!—চুপ! দাঁড়িয়ে যাও!—এগিয়ে এসেছ খানিকটা। গাড়ি পিছনে 'ব্যাক' করে নিয়ে চল। ফেলে-আসা বাঁদিকের ঐ সরু পথটা ধর। চুপ! পাশে ঘুরিয়ে রাখ,—

এ-সব নির্দেশই গাইড দিয়ে চলে শুধু আলোর ছটা এদিকে ওদিকে ফেলে,—নানাভাবে কাঁপিয়ে, নাচিয়ে। ড্রাইভারও বোঝে, আমরাও ক্রমে বুঝতে পারি,—নিঃশব্দ আলোকের সুস্পষ্ট আদেশ।

বনের গায়েও আলো ছড়িয়ে পড়ছে,—কখনও বাঁ পাশে, কখনও ডান পাশে। যেন, অন্ধকার ভেদ করে দানবের জ্বলন্ত দৃষ্টি এদিকে ওদিকে শিকারের সন্ধানে ঘোরে।

আলোর ইসারা,—চুপ!—গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। বাঁদিকের বনের উপর আলোক রশ্মি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও নজর সেইদিকে। কী জ্বলজ্বলে সবুজ আলোর তীক্ষ্ণ শর ঠিকরে আসে বনাঞ্চল থেকে! বাঘ নাকি? না,—বিশালকায় এক জোড়া গউড়! এদেশে এদেরই আমরা 'বাইসন' বলে থাকি। কিন্তু প্রকৃত বাইসন এখন শুধু আমেরিকাতেই দেখা যায়। ভারতের জঙ্গলে একালে এই গউড়ই মেলে। এরা গবাদি

গোষ্ঠীর প্রাণী। গরুর জংলী আত্মীয়! কিন্তু, পোষ মানে না। শুনেছি, আসাম প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে গৃহপালিত গাভীর সংমিশ্রণে এদের যে বর্ণসঙ্কর হয়, তাদের মিথন বা গয়াল বলে এবং সে-সব পশু পোষও মানে।

গোজাতির মধ্যে গউড় আকারে সব চেয়ে বড়। দেখি, তাই বটে। বই-এর বর্ণনায় পড়েছি, কাঁধের কাছে ছ'ফুটেরও উপর উঁচু দেখা গেছে। পরিণত বয়সে এদের গায়ের রঙ কালো হয়। তাই হঠাৎ দেখলে মহিষ বলে মনে হতে পারে। আজ এই প্রথম দেখে তাই ভেবেওছিলাম। কিন্তু একটু নজর করলেই যথেষ্ট পার্থক্য বোঝা যায়। গউড়ের কপাল উঁচু এবং ময়লাটে সাদা রঙের। হাঁ মুখটার কাছেও সাদা রঙ: শিঙ দুটা বিশাল ও অর্ধবলয়াকারে বাঁকানো। শিঙ নাকি চল্লিশ ইঞ্চিরও উপর লম্বা হয়। এদের ককুদ—অর্থাৎ কাঁধের ঝুঁটি মোটেই গরু বা মহিষের মতন নয়,—পিঠের প্রায় মাঝ অবধি এদের ধনুকের আকারে স্থূল মাংসল শিরদাঁড়া। দেহের অনুপাতে পিছন ভাগটা অপেক্ষাকৃত সরু। আর, বিশেষ লক্ষণীয়, গায়ের রঙ কালো হলেও চার পায়ের হাঁটুর নীচের অংশ সাদা,—যেন ঘোর কৃষ্ণকায় পুরুষের পায়ে ধবধবে সাদা মোজা! ইংরেজিতে বলা হয়,—Socks of a bison। গভীর বনের মধ্যে এরা থাকতে ভালবাসে। তৃণভোজী প্রাণী, ঝোপঝাড়ের পাতাও খায়। স্বভাবত ভীরু ও লাজুক প্রকৃতির। তবে ভয় পেলে বা রেগে গেলে আক্রমণ করে। অমন বিরাট দেহ ও শিঙ থাকায়, করাই স্বাভাবিক। এরা বাঘের খাদ্য। কিন্তু, সাধারণত দল বেঁধে থাকে এবং ভয়ের কারণ ঘটলেই চক্রব্যূহ রচনা করে। ধারালো শিঙ বেঁকিয়ে আত্মরক্ষা করে। তখন বাঘেরও সাহস বা সাধ্য থাকে না কাছে আসে বা সেই ব্যূহ ভেদ করে। অতএব খাদ্য হলেও বাঘ এদের সমীহ করে চলে। একা বা দলছাড়া দেখতে পেলে তখন অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ খোঁজে। সেই সুবিধাও এসে যায় এক কারণে। গউড়দলের যূথপতি থাকে, কিন্তু বৃদ্ধ হলে তার পদচ্যুতি ঘটতে পারে। তখন বলবান অপর কেউ এসে তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে দলপতি হয়। বৃদ্ধ গউড় অগত্যা একা একা ঘুরে বেড়ায় বা অন্য বৃদ্ধের সঙ্গ নেয়। গউড় মানুষের কোন ক্ষতি না করলেও এক শ্রেণীর মানুষই হল এদের পরম শত্রু। গউড়ের মাংস ভক্ষণ মানুষও করে থাকে। এবং এদের প্রকাণ্ড মাথা ও শিঙ-এর শোভায় প্রলুব্ধ হয়ে শিকারীরা এদের হত্যা করে। সেই মাথা ও শিঙ নিজেদের ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে—শিকারলব্ধ পারিতোষিক-ট্রফি হিসাবে! জগতে এমন মানুষও তো আছে যারা মানুষেরও মুণ্ডু কেটে ঘরে ঝুলিয়ে রাখে নিজেদের শক্তিমত্ততার পরিচয় দিতে!

বাইসনের সঙ্গে মানুষের সংযোগ আজকের নয়। মানবজাতির চিত্রাঙ্কনের চারুকলার প্রাচীনতম নিদর্শন রয়েছে,—স্পেনদেশে আলতামিরা গুহাগাত্রে আঁকা বাইসনের প্রতিকৃতি।

আজ এই গউড় দুটিকে দেখে সেই রেখাচিত্রের কথা মনে পড়ে। আলোর জালে বন্দী হয়ে স্পট-লাইটের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে চিত্রার্পিতের মতন। অল্পক্ষণের জন্যই সেই আচ্ছন্ন ভাব। তারপরই মুখ ফিরিয়ে নেয়, শান্ত ধীর পদে গাছের আড়ালে এগিয়ে যায়। যেতে যেতে আবার ক্ষণিক দাঁড়ায়। মাথা ঘুরিয়ে আলোর দিকে তাকায়। চোখগুলি আবার প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আবার মাথা ফিরিয়ে চলতে থাকে। গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়। এদের চলে-যাওয়া, হরিণদলের মত ভীত চকিত উল্লম্ফনে নয়, ধীর মন্থর পদক্ষেপে, সাবলীল ভঙ্গিতে।

আবার গাড়ি চলে। বনের গায়ে আলোও পড়ে। এ-পথে ও-পথে গাড়ি ঘোরাঘুরি করে—গাইড-এর আলোকসঙ্কেত মত। উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি মেলে আমরাও এদিক-ওদিক তাকাই।

ঐ ওখানে অন্ধকারে আবার কী দেখা যায়? বনের মাঝে পর্ণকুটিরে কেউ যেন দীপ দেখাল। চুপ! চুপ। গাড়ি পথের পাশে বেঁকিয়ে দাঁড় করাও,—আরও একটু এগিয়ে,—হাঁ, ঠিক আছে,—

সবই বলা হয় আলোর ইসারায়।

এইবার সেই অরণ্যচারীর প্রতি উজ্জ্বল আলোকছটা বিকীর্ণ হয়। শিঙ-অলা, বিশাল দেহ উনি কে?

সম্বর হরিণ। একাকী ঘুরছে। সাধারণ হরিণের চেয়ে বৃহৎ আকার। গায়ের রঙ গাঢ় বাদামী হলেও রাত্রে কৃষ্ণাভ মনে হয়। দেহের অনুপাতেই যেমন প্রকাণ্ড মাথাটির সুঠাম গড়ন, তেমনি পল্লবিত শিঙ দুটির অপরূপ সৌন্দর্য। গ্রীবা ও গলদেশে দীর্ঘলোমের গুচ্ছ। দাঁড়াবার ভাবভঙ্গি রাজকীয়। ঘাড় বেঁকিয়ে, মাথা উঁচু করে ঘণ্টাকার কান দুটি খাড়া করে আলোর দিকে দীর্ঘ আয়ত চক্ষু তুলে তাকাতেই,—আর চলা নয়, নড়া নয়, স্থির প্রস্তর মূর্তি!

এমন সৌম্যদর্শন প্রাণী, অথচ বাঘেদের সহজলভ্য প্রিয়খাদ্য। সাধারণ হরিণের মত এরা দ্রুতগতি

নয়। হয়ত দেহের ভার ও অমন সুশোভন শৃঙ্গ বিপৎকালে পলায়নে বিঘ্ন ঘটায়!

মানুষও শিকার করে এদের মাংস খায়। মাথা ও শিঙ শিকারীদের অতি-লোভনীয় ট্রফি।

আবার জীপ চলতে থাকে। বনের ভিতর বিভিন্ন পথে। চিতল হরিণের আরও পাল দেখতে পাই। আরও তিনটে সম্বর ও একটা গউড়ও দেখি। কিন্তু হাতি বা বাঘের দর্শন মেলে না। বহু ঘোরাঘুরির পর একটা নীল গাই দেখা গেল। নামকরণে "গাই" হলেও আসলে গরু নয়,—হরিণের স্বজাতি। দেখতে কিছুটা গাধা বা ঘোড়ার আকার। মুখটা লম্বাটে ধরনের,— কিন্তু মাথার দুপাশে ছোট শিঙ। সম্বরের মতন এদের আকৃতির সৌন্দর্য নেই। নীলাভ গায়ের রঙ, গলার কাছে সাদা,—রাত্রে তেমন বোঝা গেল না।

গাইড জানাল, রাত গভীর হয়েছে, বড় বাঘের ঘোরাফেরার সময় চলে গেছে, ভোরের দিকে আবার দেখা দিতে পারে। হাতির দলও তো এখন দেখা গেল না। বনের কোন্ দিকে রয়েছে—কাল খবর নেব। দিনের বেলাতেও তাদের দেখতে পাওয়া যাবে। কাল দিনমানে বনের মধ্যে ঘুরিয়ে আরও যা দেখবার সব দেখিয়ে দেব।

অতএব, বাংলোয় ফিরে আসা হয়। মাইল চল্লিশ বনের মধ্যে ঘোরা হয়েছে। রাত তখন সাড়ে এগারোটা।

॥ ৩ ॥

পরের দিন। বাংলোয় বসে থাকা নয়। বনের আশে পাশে ও ভিতরে ঘুরে বেড়ানো,—কোথাও বা পায়ে হেঁটে, কখনও বা মোটরে চড়ে।

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে, রাতে-দেখা বন দিনের বেলায় ভিন্ন রূপ ধরে। রাত্রের সেই ঘনকালো অন্ধকারের অন্তরালে রহস্যময় নিবিড় অরণ্যের ভয়াবহ অশরীরী রূপ নয়। দিবালোকে দেখা যায়, ছড়ানো ছড়ানো গাছপালা, ছোট বড় বিভিন্ন আকার। নানান জাতিরও। আসাম ও পূর্বাঞ্চল হিমালয়ের অরণ্যের মত স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ নয়, শুষ্ক খটখটে বনভূমি। শুকনো জমির উপর গাছ থেকে ঝরে-পড়া শুকনো পাতা, ডালপালা, কোথাও বা কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়, আবার কোথাও খানিকটা তৃণভূমি। পরিচিত গাছের মধ্যে দেখা যায়,—বেল, খয়ের, বাঁশ, আসান ইত্যাদি। বনের এ-অংশে শাল গাছ বেশি নেই।

সকালে ঘুরতে বেরিয়ে চোখে পড়ে, ট্যুরিস্ট লজ-এর বাড়ি যেখানে তৈরি হচ্ছে, তারই পাশের উন্মুক্ত ময়দানে অগুনতি চিতল হরিণ। নির্ভয়ে চরে বেড়ায় দলে দলে—আপন মনে। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে বনের ধারে তাদের চরতে দেখে মনে হয় যেন প্রাচীনকালের শান্ত তপোবন। হয়ত ঐ গাছগুলির আড়ালে রয়েছে কোন ঋষির আশ্রম! কয়েকটি ময়ূরও ঘুরে বেড়ায় সেইদিকে গাছের তলায়। সঞ্জীবচন্দ্র বন্যজাতি কোলেদের বর্ণনা দিতে লেখেন, "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।" এখন ময়ূর ও হরিণগুলিকে দেখে মনে হয়, শুধু অরণ্যবাসী মানুষ কেন, বন্যপশুপক্ষীও বনে প্রকৃতই মনোহর। হরিণগুলির হলুদবরণ গায়ের উপর সেই সাদা সাদা ফুটকিগুলির বিচিত্র বাহার বনভূমির শোভা বাড়ায়। অল্প দূরে দাঁড়িয়ে তাদের গতিবিধি দেখতে থাকি। তাদের মধ্যেও কয়েকটি মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাথা খাড়া করে দেখে। শিঙ পিঠের পানে হেলানো। গলার সাদা রঙ দেখা যায়। লেজ উঁচু হয়ে রয়েছে। দেহ-ভরা যেন পুঞ্জীভূত বেগ—চেপে-রাখা স্প্রিং-এর মতন,—এখনই বুঝি লাফিয়ে পলায়! হঠাৎ দেখি শিঙ-অলা দুটা বড় হরিণ মাথা বেঁকিয়ে শিঙ দিয়ে পরস্পরকে গুঁতাতে সুরু করে। এক যূথপতি কি অপর দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করায় বিবাদ বাধল? অথবা, নিছক পরস্পরে শক্তিমত্তার প্রীতিপূর্ণ পারদর্শিতার প্রদর্শন? দেখে বোঝা যায় না।

গাইড বলে, ঐ হরিণদের যে শিঙ দেখছেন—এই সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যেই সব খসে পড়ে যায়। ভাইপো আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, তার মানে? শিঙ ওদের আজীবন থাকে না?

গাইড জানায়, এরা হল হরিণ—ইংরেজিতে যাদের deer বলে। প্রতি বছর—অর্থাৎ ঋতু-অনুযায়ী এদের শিঙ খসে পড়ে এবং আবার ক'মাসের মধ্যে নতুন গজিয়ে ওঠে।

ভাইপো জিজ্ঞাসা করে, সব হরিণদেরই এই রকম হয়?

তখন জানতে পাবি, বাঙলাভাষায় 'হরিণ' যাদের বলি, তাদের মধ্যে সবাই সমগোষ্ঠীর বা একই প্রকারের নয়। প্রাণিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাদের দুটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ইংরেজিতে এক শ্রেণীর অভিধা,—deer, অপরটিকে বলা হয়—antelope। চিতল, সম্বর হল deer,—cervidac ফ্যামিলির। এদের শিঙ-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ antlers—শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট শৃঙ্গ। কৃষ্ণসার মৃগ, নীলগাই, চৌশিঙ্গা—deer নয়, তারা antelope, যদিও তারাও হরিণের মতনই তৃণভোজী শৃঙ্গী। কিন্তু তাদের শিঙ খসে পড়ে না, শিঙও হয় শূন্যগর্ভ-ফাঁপা। আর, deer হরিণদের শিঙ হচ্ছে নিরেট,—পূর্ণগর্ভ।

ভাইপো প্রশ্ন করে, কিন্তু যে হরিণদের ডালপালা-অলা শিঙ নয়,—যেমন কৃষ্ণসার মৃগ, তাদেরও কি শিঙ খসে পড়ে? তারা কি deer নয়? মৃগ মানেই তো হরিণ?

গাইড বলে, না,—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কৃষ্ণসার deer নয়, antelope শ্রেণীর। তাদের শিঙ খসেও পড়ে না, নিরেটও নয়। আমাদের দেশে antelope-এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কৃষ্ণসার, নীলগাই, চৌশিঙ্গা, চিনকারা। এরা হল Bovidac ফ্যামিলি—ভেড়া, ছাগল, গোরু এদেরই পর্যায়ে।

আমি বলি, মৃগ শব্দটির অর্থ—পশুও হয়। যেমন, মৃগরাজ—সিংহ; শাখামৃগ—বানর। তবে, সাধারণত হরিণ অর্থেই ওটার প্রয়োগ। এখন বোঝা যাচ্ছে, বাঙলাভাষায় হরিণ ও মৃগ একার্থবোধক হলেও deer ও antelope-এর মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট।

গাইড বলে, পৃথিবীর সর্বত্র হরিণ অর্থাৎ পুং-deer-দের মাথায় শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট শিং থাকে, দুটি মাত্র ব্যতিক্রম হল,—কস্তুরী মৃগ ও চীনের 'ওয়াটার ডিয়ার'—তাদের মাথায় শিং থাকে না। আর, বলগা হরিণ—reindeer—আমেরিকায় বলে caribou—তাদের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষেই শিং গজায়।

মনে মনে হাসি। ভাবি, হরিণীদেরও শিং! যেমন হয়ত, কখনও-সখনও দেখা যায় মেয়েদের গোঁফ! গাইড বলে, antelope-দের মধ্যেও চিন্‌কারা একমাত্র Gazelle—গজলা হরিণ—যাদের স্ত্রী-পুরুষ দুই-এর শিঙ গজায়। আমাদের দেশে একসময়ে কৃষ্ণসার, চৌশিঙা, চিন্‌কারা—antelope—প্রচুর দেখা যেত, এখন এদের সংখ্যা এত কমে গেছে যে প্রায় লোপ পাওয়ার সামিল। নীলগাই-ই শুধু তার নামের মাহাত্ম্যে আমাদের দেশের লোকের হাতে বেশি মারা পড়েনি। নামের মধ্যে "গাই" থাকায় অনেকেই একে গরু বলেই মনে করে এবং গো-হত্যার পাপের ভয়ে এদের মাংসের ওপর লোলুপ দৃষ্টি দেয় নি। Deer-দের শিঙ খসে পড়ার কথা বলছিলাম—আমাদের এখানে দেখেছি, এই সব চিতল, সম্বর—যাদের এখন বিরাট বিরাট ডালপালা-অলা শিঙ দেখছেন,—এদের সেপ্টেম্বর থেকেই কারও কারও শিঙ খসতে সুরু করেছে—এই অক্টোবরের মধ্যেই সবারই খসে পড়ে যাবে। তারপর, তিনচার মাসের মধ্যে—অর্থাৎ ডিসেম্বর-জানুয়ারির ভেতর, আবার নতুন শিঙ সম্পূর্ণ গজিয়ে উঠবে। কিন্তু, তখন সেই শিঙ-এর শক্ত হাড়ের ওপর পাতলা, রোমশ চামড়ার খোলসের মত আবরণ থাকে—ইংরেজিতে ঐ অবস্থাকে বলা হয়—"in velvet"। সেই পাতলা চামড়ার তলায় রক্তচলাচল থাকায় শিংগুলিতে সে-সময়ে সামান্য আঘাতেই ব্যথা জাগায়। তাই ঐ কয়মাস হরিণগুলিও বনে জঙ্গলে নিজেদের মধ্যে অতি সাবধানে ঘোরে, হরিণীদের কাছাকাছিও ঘেঁষে না। অবশ্য, হরিণীদেরও বছরের সেই সময়ই সাধারণত সন্তান-প্রসবকাল,—তারাও স্বতন্ত্র থাকে। ডিসেম্বর জানুয়ারিতে পুংহরিণদের শিঙ সম্পূর্ণ গজিয়ে উঠলে সেই অংশে রক্ত চলাচল ক্রমশ বন্ধ হয়, উপরের আস্তরণও ক্রমে শুকিয়ে আসে। হরিণরা তখন গাছের গুঁড়িতে বা ডালে শিঙ ঘষতে থাকে, শুকনো খোলসও ছিঁড়ে খসে পড়ে। এই ঘর্ষণের ফলে গাছের ডালের ছালও ছিঁড়ে যায় এবং হরিণের মাথার কোন গ্রন্থি (gland) নিঃসৃত এক ধরনের গন্ধ গাছের সেই ক্ষতস্থান সুবাসিত করে রাখে,—হরিণীরা তাতে আকৃষ্ট হয়ে হরিণদের কাছে চলে আসে। সেই সময় থেকে ভেলভেট-মুক্ত হরিণদেরও কামোত্তেজনা জাগতে সুরু হয়—এবং মৈথুনের পূর্ণ পরিণতি ঘটে এপ্রিল-মে মাসে।

ভাইপো মন্তব্য করে, হরিণদের ঐ বিরাট শিঙগুলা দেখায় খুব সুঁচাল—মাথায় ধরে-রাখা যেন অস্ত্র!

গাইড বলে, যে-সময়ে ভেলভেট খসে বার হয়,—তখন দেখতে লাগে যেন খাপ-থেকে-বার-করা শাণিত তরোয়াল! কিন্তু হিংস্র প্রাণীর—যেমন বাঘ, লেপার্ড প্রভৃতির আক্রমণ থেকে শিঙগুলা আত্মরক্ষায় বিশেষ সাহায্য করে যে তা নয়।

বেয়াই মশাই বলেন, ওগুলা অনেকটা আমাদের সেই প্রাচীনকালের সেনাদের জবরজঙ্গ সাজসজ্জার মতন।

গাইড বলে, কিন্তু ঐ শিঙ-এর ব্যবহার বেশি হয় কখন, জানেন? নিজেদের মধ্যে যখন ওদের ঝগড়া বাধে,—যেমন এখন ঐ চোখের সামনে দেখছেন। বেশির ভাগ ঝগড়া হয় কি নিয়ে, তাও বলছি। এক একটা বলশালী হরিণের জানানা মহল গড়ে ওঠে একসঙ্গে অনেকগুলি হরিণীকে নিয়ে।

বেয়াই মশাই মুচকে হেসে মন্তব্য করেন, সেকালের সেই সম্রাট বা নবাবদের 'হারেম'-এর বহুমহিষীর মত!

গাইড হাসে। বলে, সেই জানানা মহলের কোন হরিণীর কাছে অপর কোন হরিণ এগিয়ে গেলেই তখন দুজনের মধ্যে যুদ্ধ বাধে—শিঙে শিঙে জড়িয়ে গুঁতাগুঁতি চলে। কিন্তু আশ্চর্য! শিঙগুলা এমনিভাবে জড়িয়ে য়ায়,—আক্রমণের ফলে কেউ বড় একটা প্রাণে মারা যায় না,—অনেকটা কুস্তির লড়াই-এর মত। অনেকক্ষণ ঠেলাঠেলির ফলে যে হেরে যায়,—প্রায়ই আঘাত পাবার আগেই সে বেগতিক দেখে সরে পড়ে! বিজেতা হরিণ তখন একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে সেই হরিণীকামিনীকুল সম্ভোগ করতে থাকে!

মাঠের একপাশে কয়েকটা গাছ। সেখানে ডালের মধ্যে নড়াচড়া দেখে তাকিয়ে দেখি। একদল বানর। ডালে ডালে ঘোরাফেরা করে। কী যেন ফল ছেঁড়ে, মুখে পোরে। দু-তিনটে হরিণ চরতে চরতে গাছের তলায় এগিয়ে যায়। আরে! দুটা বানর ডাল নেড়ে গাছের নীচে ফল ফেলে, হরিণও খায়। খেয়ে মুখ তুলে তাকায়। আবার বানররা ফল ফেলে হরিণকে খাওয়ায়। এখানেই নাটকের শেষ নয়। একটা বানর গাছ থেকে তড়াং করে লাফিয়ে নেমে একটা হরিণের পিঠে চেপে বসে। হরিণ তাকে নিয়ে ছুটতে থাকে। ভয় পেয়ে,—না খাওয়ানোর প্রতিদানে আনন্দ-বিহার—'জয়রাইড' দিতে? দেখে ভাবি, বন্যপ্রাণীদের মধ্যেও পরস্পরে এমন সদ্ভাব, আদান-প্রতিদান, আনন্দ-বিনিময়। অথচ, সভ্য মানুষদের মধ্যে—এমন কি, সুসভ্য জাতিতে জাতিতেও—অত হিংসা-বিদ্বেষ! জগতে মনুষ্য সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এত অভাব হয় কেন?

গাইডও দেখছিল। তার ঠোঁটের কোণে তৃপ্তিসূচক ঈষৎ হাসির রেখা,—যেন, আপন সন্তানের কৃতিত্বের গর্বে উৎফুল্ল পিতা। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, সাধারণ মানুষদের ধারণা, বন্যপশু মাত্রই হয় হিংস্র এবং সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। দেখতেই পাচ্ছেন, এদের মধ্যেও কেমন সদ্ভাবও থাকে। শুধু এই নয়। বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পরস্পরের মধ্যে কিরকম সহযোগিতা করে তারও উদাহরণ অনেক দেখা যায়। জন্তুদের সবার শক্তি তো সমতুল নয়। কারও দৃষ্টিশক্তি হয়ত তীক্ষ্ণ, কিন্তু কানে শোনে কম। যেমন গউড়। আবার কারও চোখের দৃষ্টি হয়ত প্রখর নয়, অথচ সামান্য মাত্র শব্দ হলেই শুনতে পায়,—যেমন হাতিরা। আবার, কেউ হয়ত চোখে ভাল না দেখলেও, বা কানে তেমন না শুনলেও ঘ্রাণশক্তি প্রবল,—যেমন ভালুক।—এই সব বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন প্রাণীরা বিপৎকালে পরস্পরকে সময়মত কেমন সাবধান করিয়ে দেয়, দেখেও আনন্দ হয়।

হাতি ও গউড় নির্বিবাদে একসঙ্গে ঘোরে, বাঘ নিকটে এলে পরস্পরকে সতর্ক করে।

বনে হয়ত খাদ্যের সন্ধানে বাঘ ঘুরতে বেরোল, অমনি গাছের ডালে ডালে বানররা শব্দ করে বনের অন্য প্রাণীদের সতর্ক করিয়ে দিতে লাগল, ময়ূর ও অন্যান্য পাখিরাও ডাক সুরু করে দিল।

শ্রীশাহী—কনসারভেটর অব ফরেস্টের এই বেতলাতেই তোলা একটা ফটো কয়বছর পরে দেখেছি,—চিতল হরিণ এসেছে জল খেতে,—বানর একপাশে বসে নজর রাখছে বাঘ এসে হরিণটাকে না ধরে!

গাইড বলে, বেতলাতে প্রচুর চিতল হরিণ,—প্রায় সাড়ে তিন হাজার হবে। এরা খোলা মাঠে গাছের ছায়ায় ঘুরতে ভালবাসে—তাই এত দেখতেও পাচ্ছেন। সম্বর দিনের বেলায় ক্বচিৎ দেখা যায়। এখন বেতলাতে মাত্র গোটা পঁচিশ আছে। তারা থাকে পাহাড়ী জঙ্গল অঞ্চলে, সন্ধ্যা নামলে খোলা জায়গায় চলে আসে, আবার ভোর হলেই গভীর জঙ্গলে ঢুকে যায়। চলুন, এইবার আপনাদের চেরো রাজাদের দুর্গ দেখিয়ে আনি।

বড় রাস্তা ছেড়ে পূর্বদিকে ফরেস্ট রোড ধরে মাইল তিনেক যাবার পর বাঁদিকে একটা পাহাড়ের ওপরে দুর্গপ্রাকার দেখা যায়। গাইড বলে, ঐ পাহাড়ের মাথায় হল নয়া কেল্লা,—এখন আমরা দেখতে চলেছি পুরানো কেল্লা,—আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে,—ঐ বড় বড় গাছের জঙ্গলের মধ্যে।

জিজ্ঞাসা করি, পাহাড়ের ওপরের কেল্লাতে নিয়ে যাবে না?

সে বলে, আগে নীচে বনের মধ্যে ও-কেল্লাটা দেখবেন চলুন—তারপর পাহাড়ের ওপর ওটাও দেখবেন কিনা ভেবে দেখবেন। দুর্গের ঘর দুয়ার দেওয়াল ছাদ ভেঙেচুরে ধ্বংসস্তূপ হয়ে আছে,—গাছপালা জন্মে রীতিমত জঙ্গল হয়েছে, সাপখোপের রাজত্ব তো বটেই, শোনা যায়, পাহাড়ের ওপরের ঐ দুর্গটার মধ্যে কখনও-কখনও দুটা বাঘ এসে থাকে। পুরানো কেল্লায় যেখানে চলেছি, তারও ভেতরে ও আশেপাশে বাঘের পায়ের ছাপ প্রায় দেখা যায়। মোটর এগিয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে। মাইলখানেক যাবার পর পথ শেষ হয়,—সামনেই নীচের দুর্গের প্রাকার, সিংহদ্বার। এত উঁচু যে হাতিও অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে,—এককালে তাই করতও নিশ্চয়।

এই গভীর অরণ্যের মধ্যে চেরোরাজাদের দুর্গ,—ভেবেছিলাম, এসে দেখব কোন্ কালের বন্য আদিবাসীদের কোন এক রাজার আমলে পাথর সাজিয়ে গড়া ছোটখাট একটা কেল্লা,— সেই নকল বুঁদির গড়ের মতন! কিন্তু এখন দেখে বিস্ময় জাগে—প্রকৃতই এ যে বিরাট এক দুর্গ। সামনে দু পাশ ঘিরে বিস্তীর্ণ হয়ে গেছে প্রকাণ্ড প্রাকার। বড় বড় পাথর ও ইঁট দিয়ে গাঁথা। যেন, পাথরে তৈরি বিশালাকার অজগর সাপ বনভূমি বেষ্টন করে নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছে! কোথাও কোথাও পাঁচিলের অংশ ভেঙে পড়লেও অধিকাংশ ভাগই এখনও অক্ষতদেহ,—এমনি পাকা মজবুত গাঁথনি। আশপাশে তাকিয়ে মনে হয়, একাধিক প্রাচীর কয়েকদিক ঘিরে তোলা হয়েছিল। প্রধান প্রাকারের বাইরেও বনের মধ্যে ভেঙে-পরা ঘর-বাড়ির স্তূপ। সিংহদ্বারটির হয়ত সম্প্রতি কিছু সংস্কার হয়েছে। তারই ভিতর দিয়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করি। পাঁচিল প্রায় আট ফুট চওড়া হবে।

প্রাকারের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠি। দুর্গ-প্রাচীরের ছাদ—বেশ প্রশস্ত—পাঁচ ফুটের বেশি, মনে হয়। বড় রাস্তার মতন পাঁচিলের মাথা ঘিরে চলে গেছে। এরই উপর ঘুরে ঘুরে সৈন্যরা পাহারা দিত। ছাদের আলিসার গায়ে সারি সারি ছিদ্র,—তারই মধ্যে নল চালিয়ে সিপাইরা বন্দুক বা ছোট কামান ছুঁড়ত—প্রয়োজনকালে। বাইরে পাঁচিলের গায়ে অনেক ছোট বড় গর্ত দেখেছিলাম,—গাইড-এর কাছে শুনি যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের গোলাগুলির চিহ্ন ঐ সব। দুর্গের ভিতরের এলাকায় এখন চারিপাশ গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়েছে,—তারই মধ্যে বাড়িঘরের ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে রয়েছে। গাইড দেখায়—এরই মধ্যে রাজপরিবারের বাসস্থান ছিল, ওদিকটায় ঐ জানানামহল, এধারে হয়ত রাজার দরবার। নীচে নেমে আসার পর দুটা প্রকাণ্ড গভীর ইঁদারাও দেখায়,—শুকনো পাতা ডালও পাঁকে মজে রয়েছে। পাতকুয়ার ভিতরে নীচে নেমে যাওয়ার একটা সুড়ঙ্গ পথও রয়েছে।

দুর্গের 'র‍্যাম্পার্ট'-এর প্রাচীরের মাথায় দাঁড়িয়ে চারিপাশের দৃশ্য দেখে এখন বোঝাই যায় না,—এই দুর্গকে ঘিরে হয়ত এককালে এখানে রাজার রাজধানী-নগর ছিল, হাট-বাজার বসত, জনকলরোলে দিগন্ত মুখরিত থাকত। এখন যেদিকে তাকাই, গাঢ় সবুজ ঘন জঙ্গল, কোথাও ভগ্নগৃহের পাষাণস্তূপ, দিগন্তবিস্তৃত অরণ্যসঙ্কুল গিরিশ্রেণী,—আর অদূরে ঔরঙ্গানদী,—যেন "পাষাণে পরাণ বেঁধে" গৈরিক-বসনা দীপ্তচক্ষু শীর্ণা সন্ন্যাসিনী। এককালে এই নদী-ই দেখেছে এখানকার জাঁকজমক, প্রবল প্রতাপ, ধনগৌরব। এখন নির্বিকারচিত্তে দেখে তারই ভস্মীভূত দেহাবশেষ,—এই জনমানবশূন্য শ্মশানদৃশ্য!

কিন্তু, এই গভীর অরণ্য অঞ্চলে এক সময়ে এমন করে রাজ্য পেতেছিল,—এই চেরোরা কারা? চারিদিকে তাকিয়ে সেই প্রশ্নই মনে জাগে।

কারূষ,—তারই বিকৃত উচ্চারণ থেকেই নাকি খারওয়ার শব্দটার উৎপত্তি। এঁরা রোটাসগড় অঞ্চলে এসে রাজ্য পাতেন। মুণ্ডারা করূষদেরই শাখা বলে নিজেদের মনে করে। মহাভারতে ভীষ্মপর্বে সঞ্জয় সেনাবাহিনীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে করূষদের সঙ্গে মুণ্ডাদের উল্লেখ আছে। কৌরবদের দলে তাদের যোগ দেবার কারণ,—জরাসন্ধের সঙ্গে এদের মিত্রতা ছিল।

ভাইপো বলে, আর এই চেরোরা?

বেয়াইমশায় মৃদু হেসে বলেন, নামটা ঐরকম বলে এদের অবজ্ঞা করলে চলবে না— বিশেষ করে বাঙালীদের। ঐতরেয় আরণ্যকে এদের শুধু উল্লেখই নয়,—প্রশংসা রয়েছে— বঙ্গ ও মগধবাসীদের সঙ্গে। এরা বৈদিক ক্রিয়াকর্ম না মেনে চললেও শ্রদ্ধাভরে এদের বলা হয়েছে চেরোপদ। কারও কারও মতে চেরোরা হিমালয়ের কুমায়ুন থেকে নেমে আসে,—কিন্তু তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। চেরোরা দাবি করে তারা চ্যবন ঋষির বংশধর। আবার কেউ কেউ বলেন, চেরোরা প্রাচীনযুগের অনার্য নাগবংশীয়, কেননা চেরো কথাটার বুঝি একটা অর্থ হল সর্প।

আমার হঠাৎ মনে পড়ে, মধ্যযুগে কেরালা অঞ্চলে একসময়ে চেরোরাজারা রাজত্ব করতেন, তাঁদের সঙ্গে এখানকার চেরোদের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা কি জানি। "পালামৌ" নামটাও দ্রাবিড় শব্দের অপভ্রংশ বলেও একটা মতবাদ রয়েছে। চেরোরা পালামৌ অঞ্চলে এল কতকাল আগে?

প্রশ্নটা করতে হয় না। বেয়াইমশায় নিজে থেকেই বলতে থাকেন,—চেরো ও খারওয়াররা এই প্রদেশে ঠিক কবে এসে বসবাস সুরু করে এবং তাদের মধ্যে প্রথম কারা আসে, অথবা একই সঙ্গে এসেছিল কিনা—এসব নিয়ে গবেষণা চলছে। তবে দেখা যায়, তাদের মধ্যে পরস্পরে বিবাদ-বিসংবাদ থাকলেও পৃথকভাবে স্বতন্ত্র স্থানে নিজ নিজ রাজ্যস্থাপনায় বাধা জাগে নি। কিংবদন্তী বা মহাভারত আদি প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ ছাড়া চেরোদের নাম ইতিহাসেও পাওয়া যায়—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে! শেরশাহ্‌র আমলে চেরোরা এই অঞ্চলের প্রতাপশালী রাজা। পালামৌর কিছুদূর দিয়ে সেকালে বাঙলাদেশে যাতায়াতের বাদশাহী পথ খোলেন শেরশাহ্—যেটার পরে নাম হয়ে যায় গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড। শেরঘাটি ছিল সেই পথে একটা তখনকার বড় ব্যবসাকেন্দ্র এবং পালামৌর অন্তর্দেশ থেকে সেখানে যাওয়া কঠিন ছিল না। চেরোরাজারা ঐ পথে গিয়ে মাঝে মাঝে উপদ্রব করত,—তাই শেরশাহ্ তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে দমন করে রাখেন। যুদ্ধযাত্রার অন্য একটা কারণও ঘটে যায় বলে জনশ্রুতি আছে। এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে সে-গল্প শোনাতে বেশ জমবে,—রাত্রের অন্ধকারে যেমন ভূতের গল্প জমে। —বলে বেয়াইমশায় একটু মুচকে হেসে আবার সুরু করেন,—গল্পটা সত্য হওয়াও আশ্চর্য নয়, কেননা যুদ্ধ ঘোষণার কারণ হয়েছিল একটা হাতিকে নিয়ে। আর পালামৌ তো হাতিরই জঙ্গল। শেরশাহ্ খবর পান, চেরোরাজের একটা শ্বেত হস্তী আছে,—তার নাম রামচন্দ্র, আর হাতিটা নাকি খুব পয়মন্ত। তিনি হাতিটা চেয়ে পাঠালেন। চেরোরাজা তাকে কোনমতেই দিতে চান না। অবশেষে যুদ্ধ বাধল। ১৫৩৮ সনে শেরশাহ্ সেনাপতি খাওয়াশ খাঁ চেরোদের হারিয়ে সেই হাতি হস্তগত করে।

ভাইপো বলে, তা হলে তো সেই শ্বেতহস্তীর পয়েই বোধ হয় শেরশাহ্ পরের বছরেই ১৫৩৯ সালে হুমায়ুনকে হটিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন!

আমরা হেসে উঠি। বেয়াইমশাই বলেন, কিন্তু শেরশাহ্‌র মৃত্যুর পর চেরোরা তাদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করে নেয়, তখন সেই সুলক্ষণ হাতিটিও ফিরে পেয়েছিল কিনা জানা নেই। এরপর মানসিংহ ১৫৭৪ সালে পালামৌ আক্রমণ করে আকবরের রাজ্যভুক্ত করেন। আকবরের মৃত্যুর পর চেরোরা আবার স্বাধীনভাবে রাজ্য চালাতে থাকে। শোনা যায়, এদের রাজা সহবল রায় চম্পারণ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ফলে, সম্রাট জাহাঙ্গীরকে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। সহবল পরাজিত হয়ে বন্দী হন। একটু আগে হাতির গল্প বললাম, এবার বাঘের কথা শোনাই। এই রাজা সহবল মারা যান বাঘের হাতে। পালামৌর জঙ্গলে নয়। সেখানে তিনি বাঘেদের মধ্যে বাস করেও নির্ভয়ে রাজত্ব করেছিলেন। বন্দিদশায় তাঁকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সম্রাটের চিত্তবিনোদনের জন্যে তাঁকে খাঁচার মধ্যে এক বাঘের সঙ্গে লড়তে বাধ্য করা হয়, তাতেই তিনি প্রাণ হারান! মোগল আমলে চেরোদের দিল্লীসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছে কয়েকবারই। তবে এই গভীর জঙ্গলের আশ্রয়ে থাকার সুবিধায় সুযোগ পেলেই, তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন। নিজেদের রাজত্ব-সীমাও বিস্তৃতি লাভ করত। আলমগীরনামা থেকে দেখা যায়,

পাটনা থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে তাদের রাজ্যসীমা পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু, এই বনের মধ্যে ঢুকে এসব দুর্গ দখল করা মোগলসেনাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। শায়েস্তা খাঁ পাটনা থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে চেরোদের এই রাজ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু গহন বন ও পাহাড়ের মধ্যে কিছুদূর মাত্র পথ কাটতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরে বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও এই দুটো কেল্লা ও চেরোদের রাজ্যের অনেক অংশ দখল করে নেন— দাউদ খাঁ,—আওরঙ্গজেবের সেনাপতি। শোনা যায়, তাঁর সৈন্যদের এই বনজঙ্গলের মধ্যে চোদ্দ মাইল পথ করতে সময় লেগেছিল—এক মাস। এই দুর্গ দখল করবার পর তারা যে সংস্কার ও পরিবর্তনাদি করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে ওধারে ঐ একটা বোধ হয় মসজিদ,—নয় কি? বলে গাইডের দিকে তাকান।

গাইড এতক্ষণ শুনছিল একমনে, সব বুঝছিল কিনা জানি না। এইবার সে বলে, ঠিক বলেছেন আপনি। এখানকার দুটো দুর্গ কবে কোন্‌টি তৈরি হয় জানা না থাকলেও এই পুরানোটা কিছুকাল আগেকার হতে পারে। 'আরকিওলজিক্যাল সার্ভের' অনুমান কেল্লা দুটো প্রায় সমসাময়িক। মোগল রাজত্বকালের প্রথম দিকে তৈরি মনে করেন। তার প্রমাণস্বরূপ দেখান, শেরগড় ও রোটাসগড়ের দুর্গের মতনই নাকি অনেকটা এদের গড়ন। মোগলরা দখল করে কিছু অদল-বদল তো করেছিলই। ঐ মসজিদ হয়ত সেই সময়ে তৈরি। তারপর, আবার চেরোদের সঙ্গে বৃটিশদেরও যুদ্ধবিগ্রহ হয়,—বিশেষত সিপাহী আন্দোলনের সময়। বৃটিশরাও এ-দুর্গ দখল করে। দুর্গটা চতুষ্কোণ। চারদিকে চারটা গেট্। পরিধিতে মাইলখানেক হবে।

বেয়াইমশায় বলেন, মোগল আমলেও যেমন, ইংরেজদের এ-দেশে রাজ্যবিস্তারের সময়েও তেমনি চেরোরা যুদ্ধে হেরে বশ্যতা স্বীকার করে জায়গিরদার বা জমিদারভাবে থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেও বহুবার তারা বিদ্রোহ করেছে, রাজসরকারে দেয় রাজস্ব দিতেও অস্বীকার করেছে। আবার নিজেদের মধ্যে আত্মকলহেও স্বাধীনতা হারিয়েছে। তবুও, এই স্বাধীনতা রাখবার জন্যেই তারা বার বার মোগলদের ও ইংরেজদের সঙ্গে লড়েছে। এ-ব্যাপারে তাদের এক মস্ত সহায়ক ছিল—এই পার্বত্য অঞ্চল ও বনভূমি। বনের মধ্যে থেকে গেরিলা যুদ্ধে তারা ছিল পটু। এই কারণে রাজ্যলোলুপ বিদেশী শাসকদের চোখে তারা ছিল দুর্ধর্ষ দস্যু। অথচ, চেরোরা মোটেই হিংস্রপ্রকৃতি বন্য বর্বর জাতি ছিল না, মাঝে মাঝে লুঠতরাজ করলেও সেটা তাদের স্বভাব ছিল না। তারা চাষবাস করে শান্ত সভ্য জীবনযাপন করত, তাদের সামাজিক বিধিব্যবস্থা ছিল, রাজ্যশাসনের পদ্ধতিও ছিল,—এ সব সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকরা গবেষণা করে নানান তথ্য প্রকাশ করছেন।

গাইড বলে, ওদিকের পাহাড়ের মাথায় নয়া কেল্লায় সুন্দর নক্‌শাকাটা বড় একটা ফটক আছে। কিন্তু সেখানে এখন যা বনজঙ্গল,—বলছিলাম না, সাপখোপের বাস, এমন কি দুটো বাঘেরও বাসা, যাবেন কিনা ভেবে দেখুন।

মেরামত হয়েছে। গেটের গায়ে শিলালিপি রয়েছে। শুনলাম রাজা মেদিনীরায়ের প্রশস্তি। মেদিনীরায় ছিলেন চেরোদের সর্বাপেক্ষা কৃতী ও যশস্বী রাজা (১৬৬২-১৬৭৪)। তিনি সে সময়ের ছোটনাগপুরের মহারাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। শোনা যায় তাঁর প্রাসাদ থেকে এই নাগপুরিয়া গেট প্রচুর অর্থব্যয়ে এইখানে অপসারণ করে নিয়ে আসেন এবং এই দুর্গে লাগান। কিন্তু পাহাড়ের এই অংশ পরে অশুভকর প্রচার হওয়ায় ইট গেঁথে তোরণমুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন সেই অবরোধ সরিয়ে আবার উন্মুক্ত করা হয়েছে।

দুর্গপ্রাকারের অন্যত্রও যে আরও স্থাপত্য শিল্পকার্য ছিল তারও নিদর্শন দেখি। সিংহদ্বারের নিকটে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের—আরকিওলজি বিভাগের তত্ত্বাবধানে ভগ্নস্তূপ থেকে অনেকগুলি কারুকার্যময় শিলাখণ্ড সেইখানে সংগ্রহ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, এখন যে এখানে বাঘের বাস নেই তারও প্রমাণ পেলাম,—কয়েকটি গরু পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে নিশ্চিন্ত মনে চড়ে বেড়াচ্ছে। দুর্গপ্রাকারের সর্বোচ্চ অংশ থেকে নীচে সমতল ক্ষেত্রের দৃশ্য অতীব মনোহর। দিগন্তবিস্তৃত ঘন বনভূমি। সেই গাঢ় সবুজের বুকে যেন তরঙ্গ তুলে পাহাড়ের শ্রেণী। অদূরে ঐ বোধ হয় ঔরঙ্গানদীরই সর্পিল স্বর্ণাভ বালুরেখা,—ওদিকে দূরে কোন্ এক ''তরু-ঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূমলেখা'',—সবই যেন পটে-আঁকা ছবি। মুগ্ধ নয়নে দেখি।

॥ ৪ ॥

সেই পুরানো দুর্গ দেখে ফেরবার পথে গাইড জানায়, এদিকে যখন আসাই হল কমলদ'টাও দেখে যাবেন চলুন। এই পথ ছেড়ে নদীর দিকে খানিকটা এগোলেই পাওয়া যাবে।

তাই যাওয়া হয়। ঔরঙ্গানদীর নিকটে। চেরোরাজাদের আমলের এক সুবিশাল জলাশয়—প্রাকৃতিক হ্রদের মতন। কমলদ'—কমলদহ নিশ্চয়। অমন সুন্দর নামকরণ করল কে, কবে? প্রকৃতই কমল ফুলে ছেয়ে যায় হয়ত। চারিপাশ বনঘেরা সরোবর। বন্য জীবজন্তু জল খেতে আসে তো বটেই, নানান জাতীয় পাখিরও বসবাস আশেপাশে। গাইড বলে, স্থায়ী বাসিন্দা পাখি নানা রকম তো আছেই, পরিযায়ী (migratory) অনেক পাখিও আসে।

পশুপক্ষীদের বিরক্ত না করে, তাদের অজানিতে লুকিয়ে তাদের স্বভাব, আচরণ ও গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে একটি নিরীক্ষণ গৃহ দৃশ্য মিনার watch tower নির্মিত হয়েছে। জলাশয়ের তটে এক প্রকাণ্ড গাছ। তার ডালের ওপর কাঠের ঘর। সবুজ রঙ। গাছের ডালপালায় ঢাকা। গুঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় না। কাঠের সিঁড়ি আছে। উপরে উঠে ঘরের মধ্যে দেখি হ্রদের দিকে খোলা জানলা মতন। এখন দিনের বেলা, পশুদের বাইরে বেরিয়ে জলপানের সময় এ নয়। নানা রকম পাখি ঘোরাফেরা করছে। জলের এখানে ওখানে মাছও লাফাচ্ছে, বৃত্তাকার ছোট ছোট ঢেউ তুলে।

গাইড জানায়, ঘরটির নাম ট্রি-টপ্, গাছের চূড়ায়।

শুনে তখনই মনে পড়ে জিম্ করবেটের কথা। তাঁর শেষ বইখানির নাম—Tree Tops। মরণোত্তর প্রকাশিত ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থখানি। তাঁর রচিত হিমালয়ের মানুষখেকো বাঘ শিকারের লোমহর্ষক কাহিনীগুলি বিশ্ববিশ্রুত। জাতিতে ইংরেজ হয়েও ভারতকে তিনি স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন—My India নামে প্রসিদ্ধ বইও লেখেন। তবুও, কি কারণে জানি না, ভারত স্বাধীন হবার পর তিনি এদেশ ছেড়ে চলে যান—অপর কোন সভ্যদেশে বসবাসের জন্য নয়,—অরণ্যময় আফ্রিকায়। সে-সময়ে ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ। তাঁর কন্যা যুবরাণী এলিজাবেথ ডিউক-অফ্-এডিনবরার সঙ্গে আফ্রিকার অরণ্য দেখতে কেনিয়ায় উপস্থিত হন। গভর্নমেণ্ট থেকে করবেটকে অনুরোধ জানান হয়, তিনি যেন রাজকুমারীর সঙ্গে থেকে বনের জীবজন্তু দেখানোর সহায়তা করেন। দেখাবার স্থান নির্বাচন হয় নিয়েরির Nyeri-র কিছুদূরে প্রসিদ্ধ Tree Tops-এ। সেখানেও বনের মধ্যে বিশাল পুষ্করিণীর ধারে প্রকাণ্ড গাছের ডালের উপর তৈরি নিরীক্ষণ গৃহ। সেইখানে সারারাত জেগে বসে থেকে এলিজাবেথ সেই হ্রদের তীরে নানাবিধ বন্যপশুদের আসা-যাওয়া, জলকেলি, মারামারি ইত্যাদি দেখেন। করবেট তাঁর সঙ্গে থাকেন এবং সেই

রাতে দেখা জীবজন্তুদের দৃশ্যাবলী ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা তাঁর ঐ Tree Tops বইখানিতে অপূর্ব ভঙ্গিমায় বর্ণনা করেন। এলিজাবেথের অসীম আগ্রহ, কৌতূহল ও সাহসিকতারও প্রশংসা করেন। বই-এর শেষভাগে জানান, পরদিন সকালবেলায় সেই আফ্রিকার বনাঞ্চলে ঐ Tree Tops থেকে এলিজাবেথ যখন নামেন, তখনও তিনি জানতেন না, ঐ নিরীক্ষণ ভবনে তাঁর আরোহণ রাজকুমারীরূপে হলেও, সেখান থেকে তিনি যখন অবরোহণ করলেন তখন তিনি ইংলন্ডের সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ! সেই রাত্রেই ইংলন্ডে তাঁর পিতা সম্রাট জর্জের মৃত্যু ঘটে।

ঐ প্রসিদ্ধ Tree Tops কিন্তু এরই কিছুকাল পরে আফ্রিকার বিদ্রোহী আদিবাসীদের আক্রমণে ভস্মীভূত হয়।

বেতলার Tree Top-এরও সুন্দর পরিবেশ।

গাইড বলে, চলুন এবার বনের মধ্যে আরও কয়েকটা 'ওয়াচ-টাওয়ার' ও 'হাইড-আউট'—লুকিয়ে জানোয়ার দেখার জায়গা দেখাই।

জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে এগুলি তৈরি করে রাখা হয়। নিকটেই সাধারণত জল ও Salt lick লবণাক্ত জমির ব্যবস্থা থাকে। জীবজন্তুর লবণ আস্বাদনে স্বভাবসুলভ প্রবণতা। লবণ ছড়িয়ে রাখলেই তারা সেখানে আকৃষ্ট হয়। এসে চেটে খায়। আর জলের প্রয়োজনবোধ তো থাকেই। সেই কারণে গ্রীষ্মকালে যে-সময়ে জলাভাব ঘটে, কয়েকটিমাত্র নির্দিষ্টস্থানে জলের সঞ্চয় অবশিষ্ট থাকে, সেইসব জায়গায় বন্যজন্তুর দেখা পাওয়াও সহজ হয়।

বনের মধ্যে এক জায়গায় ছোট একটা ডোবা মতন। গাইড বলে, গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে চলুন,—জলের ওদিকপানে ঐ যে ঝোপঝাড় দেখছেন, ঐখানটায় যেতে হবে।

ঘুরে গিয়ে দেখি, ঝোপ তো বটেই, তারই মধ্যে আবার রয়েছে কাঠের তৈরি খাঁচার মতন, মেজেতেও কাঠের পাটাতন। চারপাশ লতাপাতা দিয়ে এমনি ঘেরা,—এটা যে লুকিয়ে বসে দেখবার ও ফটো তোলার চোরাকুঠরি 'হাইড-আউট' বোঝবার উপায় নেই। ভেতরে ঢোকবার ছোট একটা দরজা।

গাইড জানায়, এইখানে বসে বাঘ দেখা যায়,—মাত্র ক'হাত দূর থেকে। ঐ যে ওখানে গাছটা দেখছেন ঐটের সঙ্গে মোষের বাচ্চা বেঁধে রাখা হয়, বাঘ এসে খাবে বলে। প্রতি সপ্তাহে একটা করে খেতে দেওয়া হয়,—বাঘ খেয়ে-দেয়ে তারপর ক'দিন একনাগাড়ে ঘুমায়। ভাল কথা, আমি খবর নিয়েছি, এই তিন দিন আগে বাঘটাকে খাওয়ানো হয়েছে,—ঐ দেখুন, ওখানে দেখা যাচ্ছে—দেখতে পাচ্ছেন? খাওয়ার পর ফেলে রেখে যাওয়া পায়ের ও মাথার খানিকটা অংশ! খাওয়া-দাওয়া সেরে বাঘ এখন কোথায় পড়ে ঘুমুচ্ছে, তাই দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। এ-কথা জানেন বোধ হয়, বাঘ অকারণে প্রাণি হত্যা করে না,—খিদে পেলে তখন খাওয়ার জন্যেই করে। অবশ্য রেগে গেলে বা ভয় পেলে আক্রমণ করা তো জীবমাত্রেরই স্বভাব। আপনারা দুদিন মাত্র ঘুরে চলে যাবেন,—এম্ কৃষ্ণানের নাম জানেন নিশ্চয়? তিনি এখানে এলে দিনের পর দিন থাকেন। এ-জায়গাটায় এই ছোট্ট ঝোপটুকুর মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেন। খাবার, চা—আমি কতবার এনে তাঁকে এখানে খাইয়েছি। জন্তু জানোয়ার দেখা, তাদের নানানভাবে ছবি নেওয়া,—এ-সব ব্যাপারে সাহেব একেবারে এমনি মেতে থাকেন,—পাগল বলে মনে হয়! কী প্রচণ্ড কষ্টই না সইতে পারেন! নাওয়া-খাওয়া-ঘুম সব কিছু ভুলে যান। কথাগুলি শুনে মনে মনে ভাবি, একেই বলে প্রকৃত সাধনা। এই দুর্লভ গুণাবলী ও অকুণ্ঠ নিষ্ঠার জন্যই জীবজন্তু ও অরণ্যভূমি সম্বন্ধে অমন তথ্যপূর্ণ অথচ সরল জীবন্ত বর্ণনা তো দিতে পারেন সুলেখক অরণ্যপ্রেমী জীববিজ্ঞানী এম্ কৃষ্ণান!

গুপ্ত কুঠরিতে বসে বা বাঘের সন্ধানে বনে বনে ঘুরে ও bait বেঁধে—টোপ ফেলে—বাঘদের ভুরিভোজের অপরূপ দৃশ্য দেখার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয় নি। তবুও. বিহারের প্রখ্যাত কনসারভেটর অব ফরেস্ট শ্রীএস. পি. শাহীর সৌজন্যে তাঁর গৃহীত সেই লোমহর্ষক দৃশ্যের জলজিয়ন্ত আলোকচিত্র ('পালামৌর জঙ্গলে') গ্রন্থের প্রচ্ছদে ও ভিতরে মুদ্রিত আছে ।

॥ ৫ ॥

গাইড আশ্বাস দেয়, বাঘ এখনও আপনাদের দেখাতে পারলাম না, কিন্তু হাতি আজ দেখাবই। লোক লাগিয়ে দিয়েছি,—জঙ্গলের কোন্ অঞ্চলে এখন হাতির দল ঘুরছে তার সন্ধান নিতে। দুপুরে খবর এসে যাবে। আপনারা খেয়েদেয়ে তৈরি থাকবেন, তখন নিয়ে যাব সেইখানে।

সেইমত বেলা দুটা নাগাদ সে আসেও। নিজেদের গাড়ি চড়েই রওনা হই। গাইড জানায়, যেদিকে যেতে হবে, এ গাড়ি সে-রাস্তায় বেশ চলে যাবে।

তখন কি আর জানি, গাড়ি নিয়ে যাওয়ায় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে কতখানি!

পথ দিয়ে যেতে আদিবাসী কাউকে দেখলেই গাইড গাড়ি থামায়, মুখ বার করে জিজ্ঞাসা করে, হাতির দল দেখেছিস্? কোন্ দিকে?

যেন, কিছুই নয়,—একদল মানুষের সন্ধান করা হচ্ছে!

কিন্তু, খোঁজ বেশি নিতে হয় না। বনের পথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কানে শব্দ আসে, যেন দূরে কোথায় শঙ্খনিনাদ হল। গাইড গাড়ি থামাতে বলে। চুপ করে কান পেতে আবার শোনবার অপেক্ষায় থাকে। অল্প পরেই আবার গর্জন। এবার যেন একটু নিকটে। উৎফুল্ল হয়ে গাইড জানায়, ঠিক দিকেই এসেছি,— ওরা আসছে ঐ দিকের 'ওয়াচ টাওয়ারের'—হাতি ভজোয়ার জলে চান করতে। গাড়ি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলুন—বেশি শব্দ যেন না হয়—যে-পথ দেখাব ঠিক সেই দিক দিয়ে ঘুরে যেতে হবে।

গাড়ি সেইভাবেই এগিয়ে চলে। ওদিকে বনের মধ্যে হাতির দলও এগিয়ে আসছে,—চোখে না দেখা গেলেও কানে মাঝে মাঝে তাদের ডাক শুনে স্পষ্ট বোঝা যায়। নিস্তব্ধ বনের মধ্যে শব্দ যেন গড়িয়ে আসে—দূর থেকে নিকটে, নিকট থেকে নিকটতর হয়ে। শব্দের প্রচণ্ডতা বাড়তে থাকে। গাড়ির মধ্যে বসে আমরাও এগিয়ে চলি অসীম কৌতূহল নিয়ে,—হস্তিযূথের বৃংহণ বুকের মধ্যে গুরু গুরু প্রতিধ্বনি তোলে।

বনের মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। যেন, গাঁড়ি রাখারই 'পার্কিং' স্থান। গাড়ি চলাচলের পথেরও শেষ। গাইডের নির্দেশে গাড়ি থামে। গাইড জানায়, গাড়ি আর যাবে না। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ুন,—হেঁটে অল্প একটু এগিয়ে যেতে হবে 'টাওয়ারে'—হাতির দল এসে গেছে ওদিকে ঐ গাছগুলোর মধ্যে— নিকটেই।

আর 'নিকটেই' বলার প্রয়োজন ছিল না। কী বিরাট ডাক! যেন, কানের কাছেই বেজে উঠল। তবু মনে ভয় জাগল না। আচমকা চমকে দিল। মনে পড়ে, সেই ছেলেবেলাকার কথা। চুপচাপ একমনে বসে রয়েছি। হঠাৎ পিছন থেকে কে এসে কানের কাছে উচ্চৈঃস্বরে 'টু-উ' করে শব্দ তুলল,—এ-যেন তারই কোটি কোটি গুণ বেশি চমক! চমকে ওঠা,—কিন্তু ভয়ে-জাগা চমক নয়। এখনই কী দেখব,—মনভরা তারই কুতূহল।

গাইড বলে, দেরি নয়,—তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসুন।

তার পিছু পিছু আমরা ক'জন চলি—বনের মধ্যে সরু রাস্তা ধরে। ড্রাইভারও সঙ্গে আসে। সামান্যই পথ, মিনিট তিন-চার যেতেই দেখি, সুন্দর একটি কাঠের 'টাওয়ার'। সবুজ রঙ-করা। চারটে কাঠের খুঁটির উপর প্রায় দেড়তলা সমান উপরে একটা বড় ঘর। উপরে উঠবার কাঠের সিঁড়ি। ঘরের চারপাশে খোলা জানলা। খোলা বটে, কিন্তু জানলাগুলিতে যেন পর্দা ঝুলছে,—কাপড়ের নয়,—লতাপাতার। ঘরের বাইরের চতুর্দিকের দেওয়াল ঘিরে সবুজ লতাপুঞ্জের আবরণ। ঘরের কাঠের সবুজ রঙ-ও এমনিভাবে তারই সঙ্গে মিশে রয়েছে,—বাইরে থেকে দেখে এখানে ঘর আছে বলে অবোধ বন্যজন্তুরা কেন, বুদ্ধিমান মানুষেরও মনে সন্দেহ জাগার অবকাশ নেই।

উপরে উঠে জানলার লতাপাতার ফাঁক দিয়ে দেখি, 'টাওয়ার'-এর অপর পাশে ঠিক নীচেই একটা পাহাড়ী নদী। তারই জলধারার মুখে বাঁধ দিয়ে জলাধারের সৃষ্টি হয়েছে, যেন একটা পুষ্করিণী। নদীর অপরপারে বড় বড় গাছের জঙ্গল। কিন্তু হাতি কই? গাইডকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করি। গাইড বলে, দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ তো ওপারে বনের ওদিকে যেখানে বড় বড় গাছগুলার মাথা নড়ছে,—ভাল করে দেখুন—ওরই মধ্যে দিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে—ধীরে ধীরে। এখনও ওদের দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু

গাছের ডালপালা ভাঙার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। গাছের মাথাগুলাও নড়ছে কীরকম—

আর বলতে হয় না, দেখতেও হয় না। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল জলের ধারে খোলা জায়গায়—হাতির দল।

ওকী! কটা ছোট হাতিও রয়েছে। একটা খুব ছোট্ট, তিনটে তার চেয়ে কিছু বড়। দুটা মাঝারি আকারেরও। আর রয়েছে ওদের চেয়েও আরও অনেক বড় স্থূলকায়া এক হস্তিনী। দেখে মনে হয়, বাচ্চাগুলি স্নান করতে এল তাদের বাপ-মার সঙ্গে, আর তাদের ঠাকুমা বললেন চল্, তাহলে আমিও একটা ডুব দিয়ে আসি।

জলের ধারে পৌঁছে সবাই একটু অপেক্ষা করল। ঠাকুমা শুঁড় দিয়ে গাছের একটা ডাল ভেঙে শুঁড় ঘুরিয়ে তাই দিয়ে পিঠের পিছনদিকে যেন রগড়ালেন। বোধ হয়, শুঁড়ের বাইরে দেহের ঐ অংশটা চুলকাচ্ছিল, তাই চুলকিয়ে নিলেন! তারপর ডালটা ফেলে জলে নামলেন সবার আগে। একা নয়,—সব চেয়ে ছোট বাচ্চাটা—বোধ হয় ঠাকুমার বেশি আদরের— তাকে শুঁড়ে ধরে উঁচু করে তুলে জলে পা বাড়ালেন। অপর ছোট হাতিরা তাদের বাপ-মার সঙ্গে জলে নামল। জল ওখানটায় গভীর নয়। ঠাকুমা জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে পার হয়ে এলেন—এপারে, একেবারে আমাদের ঘরটার ঠিক নীচেই, নদীর ধারে খানিকটা বালুভূমি,—এবং লবণচাটা—Saltlick,—সেইখানটায়। এসেই বাচ্চাটাকে শুঁড় থেকে নামিয়ে ছেড়ে দিলেন এমনভাবে যেন বললেন, এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, ঐ তোর বাপ-মা আসছে, আমি ঝপ্ করে একটু চান করে আসি—দেহ ঘুরিয়ে নিজে আবার জলে নামলেন হেলেদুলে। একটু যেন বিরক্তি ভাব,—ডুব দেবার মত জলও রাখেনি এরা! বলে বলে আর পারা যায় না!

জলের মধ্যে দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতে বুক পর্যন্ত জল পান। 'যাক,—এইখানেই চান সেরে নিই'—বলে যেন পা দুমড়ে ধপাস করে বিশালবপু নিয়ে জলের মধ্যে বসে পড়েন। শুঁড় দিয়ে জল তুলে নিজের গায়ে ছড়াতে থাকেন—'শওয়ার বাথ্'—ধারা স্নানের মতন।

ইতোমধ্যে মধ্য-আকারের হাতি দুটি,—মনে হয়, বাচ্চাগুলির মা-বাবা,—অপর তিনটি সন্তানকে নিয়ে জল পার হয়ে আমাদের পাড়ে চলে এসেছে। বাপ কিন্তু এসে দাঁড়াল না। মাকে যেন বললে, তোমার বাচ্চাদের তুমি এখন দেখ, আমি চললাম জলের মধ্যে।—বলে ফিরে গিয়ে তিনিও ধপাস করে বসলেন জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে।

অপর তিনটি সন্তান ছোট্ট বাচ্চাটাকে শুঁড় দিয়ে খানিক বোধ হয় আদর করে জলে নেমে গেল—ঠাকুমার কাছে। গিয়েই শুঁড়ে করে জল তুলে, ঠাকুমার জল-থেকে-বেরিয়ে-থাকা পিঠে জল ছিটিয়ে শুঁড় দিয়ে যেন গা রগড়াতে থাকল। ঠাকুমার বোধ হয় আরাম বোধ হচ্ছে। মুখ দিয়ে কেমন যেন আওয়াজ করছেন, হুঙ্কার নয়—সুমিষ্ট অস্ফুট শব্দ।

আমরা হতবাক হয়ে লতাপাতার ফাঁক দিয়ে এইসব দৃশ্য দেখছি। গাইড ড্রাইভারকে একপাশে ডেকে নিয়ে যায়। ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে, গাড়ির সব কাঁচগুলো বন্ধ করে রেখে এসেছেন তো?

ড্রাইভার জানায়, সামনে আমার সীট-এর ধারের কাঁচটা তোলা হয়নি,—অন্যগুলো তোলা আছে। এখানে চুরির ভয় তো নেই।

গাইড বলে, চুরি নয়। কোন হাতি হঠাৎ ওদিকে গিয়ে পড়লে গাড়ি দেখে শুঁড় দিয়ে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করবে। পুরো গাড়িটা তো ধরতে পারবে না,—জানলা খোলা থাকলে তারই ভিতর দিয়ে শুঁড় ঢুকিয়ে ধরবার কিছু খুঁজবে। এখনই খুব আস্তে আস্তে চলে যান, কাঁচটা তুলে দিয়ে ফিরে আসুন।

ড্রাইভার একা যেতে ভয় পায়। সাহস দিয়ে তাকে পাঠানো হয়। নেমে গিয়ে বন্ধ করে তখনই ফিরেও আসে।

ভাইপো আমার গায়ে হাত দিয়ে ইসারা করে ডাকে,—তার জানলা দিয়ে দেখতে। পনেরো-ষোল হাত নীচে সেই মা ও বাচ্চা। মায়ের সামনের দু পায়ের ফাঁকে ঢুকে পেটের তলায় বাচ্চাটা করে কী? নিশ্চয় স্তন্যপান করছে। মা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

বাচ্চার বোধ হয় দুধ খাওয়া শেষ হল। মায়ের পেটের তলা থেকে সরে এসে দাঁড়াল। মা এবার পাড়েব দিকে আরও এগিয়ে গিয়ে পট্‌পট্ করে একগোছা ঘাস টেনে তুলল। শুঁড়ে করে ধরে মাথার উপর তুলে পায়ের কাছে সপাৎ করে যেন চাবুক মারল—নিশ্চয় ঘাসের শিকড়ে লেগে-থাকা মাটিগুলি

ঝরাবার উদ্দেশে। কিন্তু এভাবে ঝরিয়েও তার মনস্তুষ্টি হল না। ফিরে এসে জলের ধারে গিয়ে সেগুলি ধুয়েও নিল। তারপর শুঁড় বেঁকিয়ে পরম পরিতোষ সহকারে মুখে পুরল।

এ-সবই ঘটছে কয়েক মিনিটের মধ্যে—সিনেমার ছবির মতন।

এমন সময় গাইড ইসারা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর একদিকের জানলায়। সত্যিই তো, নজর করিনি এতক্ষণ। কখন ওপারে এসে দাঁড়িয়েছেন মহাকায় হস্তিদলপতি। ঠাকুরদাই হবে। প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতি। কান দুটা প্রকৃতই কুলার মতন। কেবলই নড়ছে। যেন দুটা বড় তালপাতার পাখা দিয়ে মাথার দুপাশে বাতাস খাচ্ছে। বড় বড় গাছের ডাল শুঁড় দিয়ে ভেঙে কচমচ করে চিবোচ্ছে, যেন কিছুই নয়, সজিনার ডাঁটা! একটা প্রকাণ্ড মোটা ডাল, গাছ থেকে মড়মড় করে ভেঙে ফেলে দিল। ওটাও খাবে নাকি? কিংবা কি জানি, পালোয়ানের পেশী ফুলিয়ে দেখার মত নিজের অসীম শক্তি প্রকাশ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করল? শুনেছি, বড় বড় হাতির দৈনিক খাদ্যের ওজন হয় ছয়শ' পাউন্ড!

দলপতির জলে নামবার কোন তাগাদা দেখা যায় না,—একমনে শুধু খেয়েই চলেছে,— ঘুমন্ত বনের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে। একে দেখলেই বোঝা যায়, দলের মধ্যে সবচেয়ে যে বলশালী সেই হয় দলপতি। অপর সকলে তাকে মেনে চলে। কালক্রমে তার শক্তি কমে গেলে এবং দলের অপর কেউ তার চেয়ে বলবান হয়ে উঠলে, নতুন সর্দার হবে তখন সেই হাতি, একে দেবে তাড়িয়ে। এর তখন সুরু হয় নিঃসঙ্গ বনে বনে বিচরণ। অনেক সময় মেজাজও হয়ে যায় রুক্ষ। হাতিদের আয়ুষ্কাল হয় মানুষেরই সমান। সত্তর-আশি বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচে। বৃদ্ধ মানুষের মতন এদেরও বার্ধক্য জীবনযাপনের সমস্যা থাকে।

আবার ফিরে আসি মা-হাতি ও বাচ্চাকে দেখতে। এরই মধ্যে কখন অপর ছোট হাতি তিনটা তাদের ঠাকুমাকে ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। দাদা-দিদিরা সেই ছোট্ট হাতি-ভাইটিকে শুঁড় দিয়ে জল তুলে এনে স্নান করাচ্ছে। ঐখানেই মাটিতে লবণ ছড়ানো। মা-হাতি শুঁড় দিয়ে তাই তুলে নিজের মুখে পুরছে। এক একবার বাচ্চাটাকেও খাওয়াচ্ছে।

গাইডকে হাতের ইসারায় জিজ্ঞাসা করি, ছোট বাচ্চাটার বয়স কত হবে?

সে ইসারায় জানায়, মাত্র মাসখানেকের!

মনে পড়ে, Lt.-col. J. H. Williams-এর লেখা Elephant Bill বইখানির কথা। তাঁর স্ত্রী—Susan Williams-এরও একখানা বই আছে, The Foot-prints of Elephant Bill।

উইলিয়ামস্ ১৯২০ সালে বর্মায় আসেন। সেগুনকাঠের ব্যবসায়ী বন-ইজারাদার এক ব্রিটিশ কোম্পানির অধীনে চাকুরি নিয়ে। কোম্পানির প্রায় দু হাজার হাতি ছিল। তাদেরই তত্ত্বাবধানের কাজে উইলিয়ামস্ নিযুক্ত হন। পঁচিশ বছর তিনি বর্মার জঙ্গলে হাতির সংসর্গে কাটান। এমন কি, জাপানীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বর্মা অধিকার করলে কয়েকটি হাতির দল নিয়ে তিনি স্থলপথে আসামে চলে আসেন, যুদ্ধের কাজে হাতিদের ব্যবহার করার ভার নেন এবং জাপানীরা পরাভূত হলে সেই হাতিদল নিয়ে আবার বর্মায় ফিরে যান। হাতিদের সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা বহুমুখী, জ্ঞানও প্রগাঢ়।

সেই বই দুখানিতে পড়েছি, হস্তিনীর সন্তান প্রসবের পূর্বে কিভাবে সূতিকাগৃহ রচনার ব্যবস্থা হয়। প্রসবকাল এগিয়ে এলে দলের হাতিরা নদী বা ঝরনার নিকটে নিরাপদ সমতল স্থান নির্বাচন করে। কাছাকাছি যেন দু একটা বড় গাছ ও ঘাসের জমিও খানিক থাকে, সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখে। মনোনীত জমিতে আগাছা-জঙ্গল, ছড়ানো পাথর ও এবড়ো-খেবড়ো জায়গাগুলি পায়ের চাপে বসিয়ে দেয়, চমৎকার যেন সান-বাঁধানো গোলাকার একটা ঘরের মেঝেতে স্থানটি পরিণত হয়। এইখানেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। ওদিকে অপর দলের এক হস্তিনী কদিন থেকে এসে গর্ভিনীর সাথী হয়ে সারাক্ষণ কাছে কাছে থাকে। প্রসবকাল উপস্থিত হলে অন্য আরও হস্তিনীরা এসে যোগ দেয়। সন্তান-প্রসবের পর প্রসূতি ও নবজাতককে সবাই মিলে গোল করে ঘিরে রাখে এবং উচ্চ নিনাদে বিকট বৃংহণ করতে থাকে—বনভূমি কাঁপিয়ে সারারাত ধরে। এসবেরই উদ্দেশ হল,—কোন হিংস্র জন্তু—বিশেষত বাঘ—যেন কোনমতে কাছে আসার সুযোগ না পায়। হস্তিশিশু নাকি ব্যাঘ্রজাতির অতি প্রিয় খাদ্য! বাচ্চা বটে, কিন্তু নেহাত ছোটখাট তো নয়। হাতির বাচ্চা,—সদ্যোজাত হলেও দেহের ওজন তার হয় ২৫০ পাউন্ড, উঁচুতে প্রায় তিন ফুট! মাংসলোলুপ বাঘও ওত পেতে সুযোগ খোঁজে। অতএব, চব্বিশঘণ্টা পাহারা চলে। কয়েকদিনের মধ্যেই বাচ্চা কিছুটা সবল হয়। মায়ের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে। তবুও, হাতির দল দিনের

বেলা তাদের কাছাকাছি থাকে, রাত্রিবেলা আবার ঘিরে রাখে।

আজ এই বাচ্চাটাকে দেখে ভাবি, ঐ মহাবল হাতি বোধ হয় সেই কারণেই তীরে এসে দাঁড়িয়েছে। অথবা, কী জানি, এই অভয়ারণ্যে বাঘের আক্রমণের ভয় থাকে না, পরিবারবর্গ নিয়ে নিশ্চিন্ত মনেই এদের স্নান করতে আসা।

মাতা ও সন্তানের মধ্যে হৃদয়ের বাঁধন হাতিদের মধ্যেও যে থাকে তার উদাহরণও পড়েছি। হাতির বাচ্চা চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত মাতৃস্তন পান করে। তারপর, বালকদের যেমন স্কুলে ভর্তি করানোর প্রথা, পোষা হাতির বাচ্চাকেও তেমনি কাজকর্ম শেখানোর জন্য তার মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো হোত। একবার কয়েক বছর পরে সেইরকম এক বাচ্চা যখন বেশ বড় হয়ে উঠে তার নিজ দলে থেকে কাজকর্ম করছে, এমন সময়ে তার দল ও তার মায়ের দল একই জায়গায় মিলিত হয়। তখন দেখা যায়, মা ও সন্তান পরস্পরে তো চিনলই, এমন কি, যে ক'দিন সেই দুইদল একসঙ্গে ছিল, তারা দুজনে সারাক্ষণই কেউ কারও সঙ্গ ছাড়ত না, পাশাপাশি ঘুরত-ফিরত, বেড়াত, খেত!

হাতিদের স্মৃতিশক্তির দৃষ্টান্তও ঐ বই দুটিতে আছে। একবার বাঘের আক্রমণের ফলে একটা পোষা হাতির পিঠে ঘা হয়। উইলিয়ামস্ তার চিকিৎসা করেন। ক্ষতস্থানটা প্রায় শুকিয়ে এলে হাতিটাকে তার কাজের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, নির্দেশ থাকে, আরও কিছুদিন যেন ঘা-টায় মলমাদি লাগানো হয়। মাস দুই পরে উইলিয়ামস্ তাঁবুর সামনে বসে চা পান করছেন, দেখেন, সাতটা হাতিকে নদীতে স্নান করিয়ে মাহুতরা নিয়ে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ পরে তাদের পরিদর্শনে আনবে বলে। সেই হাতিটাকে তিনি দলের পিছনে আসতে দেখে চেঁচিয়ে তার মাহুতকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাতিটা আছে কেমন?—মাহুত আসছিল হাতির পাশে পাশে পায়ে হেঁটে। সাহেবের কথা সে শুনতে পায় নি। কিন্তু হাতিটা তাঁর গলার স্বর শুনেই পথ ছেড়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে চলে এল। তিনি টেবিল থেকে একটা কলা তুলে তাকে খেতে দিলেন। হাতিটা তখনই বসে পড়ে একটু কাত হল যেন পিঠ দেখানোর জন্যে। উইলিয়ামস্ ভাবলেন, হাতিটা তাঁর চিকিৎসার কথা মনে রেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। তিনি তার পিঠ না দেখে তাকে আদর করে যেতে বললেন। সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে হাতিগুলির পরিদর্শনের সময় ভাল করে দেখতে গিয়ে নজর করলেন, ক্ষতস্থানের ছোট্ট একটা জায়গায় স-পুঁজ নালি-ঘা হয়ে রয়েছে! তখনই অস্ত্রোপচার করে তিনি তার চিকিৎসা করলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল, হাতিটা কিছু পূর্বে তাঁর কাছে গিয়ে পিঠ বেঁকিয়ে বসেছিল সেই নালি-ঘাটা দেখানোর জন্যেই!

হাতিদের বুদ্ধিমত্তার উদাহরণও আছে।

একদিন মাহুত তার হাতিকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে কাজে যাবে, তার কাঁধের উপর চেপে বসেছে। হাতির পিঠে ঝোলানো ঝুড়িতে মালপত্র তোলা হচ্ছে। হাতির সামনে মাটিতে একটা বর্শা গাঁথা ছিল। মাহুত হাতিকে বললে সেটা তার হাতে তুলে দিতে। হাতি বর্শার হাতলের মাঝামাঝি অংশ শুঁড় দিয়ে ধরে উঁচু করে মাহুতের দিকে এমনিভাবে এগিয়ে দিল যে বর্শার ছুঁচাল ফলকটা তার প্রায় গায়ে বিঁধে আসে। মাহুত গালাগাল দিয়ে হাতিকে ধমকাল, বর্শাটা ঘুরিয়ে ঠিকভাবে দিতে হুকুম করল। আশ্চর্য ব্যাপার! হাতি তখনই সেটা সরিয়ে এনে বর্শাটা আকাশপানে ছুঁড়ে ঘুরিয়ে ধরল এবং ঠিকমতই এবার বর্শার অপরমুখটি মাহুতের দিকে এগিয়ে দিল!

হাতিদের দুষ্টবুদ্ধিও কম নয়। পোষা হাতির গলায় ঘণ্টা বাঁধা থাকত। ঘণ্টা-ফোকরের মধ্যে কাদা মাটি পুরে চালাক হাতি ঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ করে দিয়ে কলাবাগানে ঢুকে কলা, পাতা, গাছ সব কিছু ভক্ষণ করে উজাড় করত। অমন প্রকাণ্ড দেহ, তবু তারা নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করতে পারে। গভীর বনে গাছপালার আড়ালে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে পাঁচহাত দূরেও মানুষ জানতে পারে না—অত নিকটে অমন বিরাট দেহধারী এক প্রাণীর অবস্থান।

আজ, কিন্তু, তাদেরই অজ্ঞাতে আমরা নিকটে দাঁড়িয়ে তাদের আচরণ লক্ষ্য করছি,— মায়ের কেমন সন্তান-স্নেহ, ভাই-বোনদের ছোট্ট ভাইটিকে কত আদর-যত্ন। কে বলবে, "বুনো" হাতি? শিশুকে ঘিরে স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা উপচে পড়ছে।

মুহূর্তের জন্য ভুলে যাই গাইড-এর সতর্ক বাণী,—কোনও রকম শব্দ করবেন না যেন,—কথা বলা তো নয়ই। ফিসফিস করে ভাইপোকে কী যেন বলে ফেলি উৎসাহবশে। সঙ্গে সঙ্গে জানলার নীচের

হাতির দল একেবারে পাথরের মূর্তি ধারণ করল। কিছুমাত্র নড়াচড়া নেই, যে যেমন তার পূর্ব মুহূর্তে ছিল সেই অবস্থায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে,—সবাই যেন উৎকর্ণ। শুনেছি, মাথায় বাজ পড়লে মৃত মানুষ ঠিক সমভাবে দাঁড়িয়ে থাকে—নিশ্চল হয়ে। মানুষের কণ্ঠের এই অতি-সামান্য শব্দে হাতিদের মাথায়ও যেন বাজ পড়ে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র এই নিস্পন্দতা। তারপরই সকলে সজাগ হয়ে হুড়মুড় করে জলে পড়ে,—মা হাতি বাচ্চাকে শুঁড়ে তুলে নেয়,—সবাই চলে যায় ঠাকুমার কাছে। সেখানে তাকে কিভাবে কী জানায় জানি না, কিন্তু তখনই দেখি, ঠাকুমা হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, আমাদের 'টাওয়ারে'র দিকে মুখ ফিরিয়ে বিকট হুঙ্কার ছাড়ে। ওদিকে ঠাকুরদাও ডালপালা ভক্ষণ থামিয়ে, মাথার কাছে শুঁড় গুটিয়ে তুলে—বনভূমি কাঁপিয়ে আর এক হুঙ্কার ছাড়েন। শুঁড়ে তার তখনও এক ভাঙা ডাল। তারপরই জলের মধ্যে নেমে জল তোলপাড় করে আর সকলের কাছে তখনই চলে আসেন। সবাই দলবদ্ধ হয়ে—ওকী। এইপারেই চলে এল যে! অবশ্য আমাদের ঘরের ঠিক নীচে নয়,—হাত চল্লিশ-পঞ্চাশ দূরে গাছগুলির পাশে! বাচ্চাটাকে মাঝখানে ঘিরে রেখে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাদের সমবেত সে কী বিরাট বৃংহণ। সারা বন কাঁপছে, আমাদের বুকের ভিতরও দুরু-দুরু করছে।

গাইডের পানে সকলে তাকাই। সে আস্তে আস্তে বলে, ভীষণ রেগে গেছে হাতির দল— শিগ্‌গির নেমে চলুন—ওরা যেখানে এপারে এসে দাঁড়িয়েছে—ঐদিক দিয়ে এগোলেই মোটরের কাছে সেই খোলা জায়গাটায় পৌঁছে যাবে। তখন আর আমাদের ফেরবার উপায় থাকবে না—মোটরও ভেঙে চুরমার করবে—শিগ্‌গির চলুন—পায়ের জুতা খুলে হাতে নিন—আর কোন রকম শব্দ নয়—যেদিক দিয়ে এসেছি সে পথে এখন আর যাওয়া চলবে না,—দেখতে পাবে,—বাঁদিকের ঐ গাছগুলার আড়াল দিয়ে পা চালিয়ে এক্ষুনি চলুন—

সেইমতই একরকম ছুটতে ছুটতে গাড়িতে এসে উঠি। ওদিক থেকে শব্দ আসছে হাতিদেরও এগিয়ে আসার—হুঙ্কারধ্বনিও প্রচণ্ডভাবে বেড়ে উঠেছে।

সবেগে মোটর হাঁকিয়ে বাংলোয় ফিরে সবাই হাঁফ ছাড়ি।

পরদিন সকালে বেতলার বনভ্রমণ শেষ করে আমাদের ফেরবার কথা। রওনা হবার আগে ভোরবেলা আর একবার গাইডকে নিয়ে বনের পথে পথে ঘোরা হয় যদি বাঘের দেখা পাওয়া যায়। বহু ঘোরাঘুরি করেও হরিণ ও ময়ূর ছাড়া আর কারও সাক্ষাৎ মেলে না। ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে গতকালের সেই মোটর-রাখা 'পার্কিং-প্লেসে' এসে পড়ি। দেখে চমকে উঠি,—স্থানটির একী চেহারা! কাল আমরা যাবার পর এখানে যেন যুদ্ধ হয়ে গেছে। চারপাশের গাছ উপড়ান, ডালপালা ছত্রাকার,—মাটির উপর হাতি চক্রাকার খেয়েছে তারও প্রমাণ সুস্পষ্ট,—মাটির উপর কোথাও কোথাও যেন রোলার চালানো হয়েছে।

গাইড জানায়, খুব বেঁচে যাওয়া গেছে,—ভীষণ চটেছিল ওরা,—সময়মত আমরা পালাতে না পারলে নির্ঘাত মোটরটা চুরমার করে দিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ ১ ॥
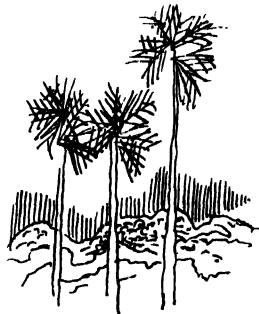
শিশু যেমন মায়ের কোল পেলেই হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমাকেও তেমনি কেমন যেন বিজন অরণ্যরাজ্য ও নিভৃত পাহাড়-পর্বত প্রবলভাবে আকর্ষণ করে।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস। আবার হাজারিবাগ হয়ে চাতরা যাই। হিন্দিয়ার জঙ্গলে ক'দিন একাকী নির্জনবাস করি। সে অরণ্যবাসের কাহিনী 'যেখানে বাঘের ভয়' শিরোনামায় এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার পরের কাহিনী তখন লেখা হয় নি। সেই সময়েই আমার দ্বিতীয়বার পালামৌ ভ্রমণ।

হিন্দিয়া থেকে চাতরায় ফিরে এসে আবার ডালটনগঞ্জ যাত্রা। যাত্রার সব আয়োজনের ভার নেন চট্টরাজ। তাঁর তখন কর্মস্থল হাজারিবাগে। পূর্ব-ব্যবস্থামত তিনি চাতরায় এসে মিলিত হন। বলেন, ক'বছর আগে পালামৌর জঙ্গলে গারু ও লাটে গিয়েছিলাম, কিন্তু ভাল করে দেখার সুযোগ হয় নি, তারপর সেবার আপনার সঙ্গেও যাওয়া হল না,—এবার চলুন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে আসি পালামৌ জঙ্গলের মধ্যে যত দূর যাওয়া যায়—সেই শেষ সীমানা পর্যন্ত। 'বড়েষাঁড়' 'বড়েষাঁড়'—খুব নাম শোনা যায়—এবার রাত কাটাতে হবে,— সেইখানে। কী বলেন?

বলি, চলুন তো, আগে ডালটনগঞ্জ পৌঁছুই—আপনার মাসতুতো ভাই-এর কাছে। সেবারে তাঁর বাড়ি খুঁজতে গিয়ে comedy of errors-এ যা অপ্রস্তুত হতে হল! এখনও ভাবলে হাসি পায়।

চাতরায় দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হতে বেলা পৌনে তিনটে বাজল। এ যাত্রাতে ডালটনগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত চট্টরাজের সদা-উৎসাহী বন্ধু চক্রবর্তী। বলেন, এমন সুযোগ পেয়েও আপনাদের সঙ্গে পালামৌ জঙ্গলে ঘুরতে যেতে পারছি না—অফিসের জরুরী কাজের এমনি চাপ চলেছে,—তবুও আপনাদের যাত্রাপথে অন্তত খানিকটা এগিয়ে দিয়েও যতখানি আনন্দ লাভ হয়!

আবার, সেই চান্দোয়া, লাতেহার হয়ে ডালটনগঞ্জ পৌঁছুই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়।

সোজা গাঙ্গুলীর বাড়িতে গিয়ে ওঠা হয়। এবার আর ভুলভ্রান্তির অবকাশ নেই।

দুই মাসতুতো ভাই-এর মিলনের আনন্দ দেখি। এ যেন 'ভরতমিলাপ'! অনেকদিন পরে উভয়ের দেখা। গল্প আর শেষ হতে চায় না। ওদিকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হয়ে আসে। অগত্যা চট্টরাজকে স্মরণ করিয়ে দিই, আপনাদের গল্পের চাপে আমাদের উদ্দেশ্য যেন মারা না যায় দেখবেন। সন্ধ্যার মুখেই এখান থেকে রওনা হয়ে বনের মধ্যে আমাদের ঢোকবার কথা,—যাতে রাত্রে মোটর করে যেতে সহজেই বন্যজন্তুর দেখা পাওয়া যায়,—আর রাত কাটানো হবে সেই বড়েষাঁড়ে পৌঁছে। এখান থেকে যাবার গাড়ির ব্যবস্থা কী হবে ঠিক করুন।

গাঙ্গুলী ও চক্রবর্তী দুজনেই আশ্বাস দেন, গাড়ির ব্যবস্থা এখনই সব হয়ে যাবে,—খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা দেবেন। তাঁরা পরামর্শ করে টেলিফোনে কাকে খবর দেন। কিছু পরেই এক ভদ্রলোক এসে হাজির। বনের ইজারাদার এক বড় কোম্পানির ফরেস্ট অফিসার। শ্রীদুর্গাকুমার সান্ন্যাল। স্পোর্টস্‌ম্যানের মত চেহারা। বড় শিকারী। প্রচণ্ড উৎসাহী। কিন্তু আমাদের নিশীথ-অভিযানের সব উৎসাহ নিবিয়ে দেন এক ফুৎকারে। বলেন, গাড়ির ব্যবস্থার কোনই অসুবিধে নেই। আমাদের খালি জীপ জঙ্গলের কাজে ফিরে যাচ্ছে। তাতেই আপনাদের নিয়ে যাবে,—বনের মধ্যে যেখানে যতদূর ঘুরতে চান, তাইতে ঘুরতে পারবেন। কিন্তু, রাত্রে রওনা হওয়া চলবে না, কাল ভোরে যাত্রা করবেন।

উৎসুক হয়ে চট্টরাজ জানান, গাড়ি যখন রয়েছে, তবে আর কী? আজ রাত্রেই রওনা করিয়ে দিন। রাত্তির বেলা—পালামৌর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া,—এমন সুযোগ ছাড়া চলে?

সান্ন্যাল গম্ভীর হয়ে উত্তর দেন, জানি, এর 'থ্রিল্' অনেকখানি। নিজেও কি কম ঘুরেছি বনে-জঙ্গলে ঐভাবে! কিন্তু, সম্প্রতি ক'দিন ও-পথে রাত্তিরবেলা গাড়ি যাতায়াত বন্ধ করতে হয়েছে। জঙ্গলের অবস্থা ক'দিন থেকে খারাপ চলেছে।

চট্টরাজ প্রশ্ন করেন, জঙ্গল খারাপ? মানে রাস্তা খারাপের কথা বলছেন?

সান্ন্যাল হেসে জানান, না, মশাই, পথ ভালই আছে,—জীপে যাবেন, তার জন্যে ভাবনা নেই। বেতলায় হাতির উপদ্রব চলেছে।

খবরটা শুনে আমরা উৎসুক হয়ে উঠে বসি। যাবার আগ্রহ দ্বিগুণ হয়। সোৎসাহে বলি, রাত্রে গিয়ে তাহলে একবার দেখাই যাক না—উপদ্রবটা কী রকম চলেছে?

সান্ন্যাল বলেন, ব্যাপারটা অমন হালকাভাবে নেবেন না। ঘটনাটি গুরুতর আকারই নিয়েছে। রাত্রে এখন বেতলার বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। শুধু মানুষেরই নয়, গাড়িরও ক্ষতি হতে পারে। একটা হাতি ক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

তারপর সেই ক্ষিপ্ত হস্তীর কাহিনী শোনান।

কয়দিন আগে দিনদুপুরে এক বিশালবপু হস্তী বেতলার বড় রাস্তায় বেরিয়ে আসে। কি উদ্দেশ্যে তার এই মধ্যাহ্নভ্রমণ, জানা নেই। পথ দিয়ে হেলেদুলে গজেন্দ্রগমনে তিনি চলতে থাকেন। পথ প্রশস্ত হলেও পাহাড় ও বনের মাঝে সব জায়গায় সোজা নয়, মাঝে মাঝে এঁকেবেঁকে ঘুরে যায়। একটা খালি মোটর ট্রাক সেই পথ ধরে পেছন থেকে সবেগে আসছিল। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই ড্রাইভার দেখে হাতি চলেছে সামনেই। গাড়ির গতিবেগ রোধ করতে সে চেষ্টা করে, পারে না। ট্রাক এসে সজোরে ধাক্কা মারে হাতির পিছন দিকে। হাতিও অকস্মাৎ পশ্চাদভাগে আঘাত পেয়ে যেমন চমকে ওঠে, তেমনি ক্রুদ্ধও হয়। হুঙ্কার দিয়ে যেই সে দেহ ঘুরিয়ে, মুখ ফিরিয়ে প্রতিশোধ নিতে যাবে, ট্রাক ড্রাইভার সজোরে গাড়ি চালিয়ে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যায়। হাতিও ক্ষেপে বন কাঁপিয়ে চিৎকার করে গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে। কিন্তু গাড়ির বেগের অনুরূপ দৌড়াতে পারে না। গাড়ি অদৃশ্য হয়। হাতি তবু থামে না। প্রচণ্ড চিৎকার করে ছুটতে ছুটতে এসে সেই ট্যুরিস্ট লজ-এর নিকটে পৌঁছয়।

ওদিকে ট্যুরিস্ট লজ-এ তখন কয়েকজন পর্যটক রয়েছেন। তাঁরা দিনমানে অত নিকটে হাতির ডাক শুনে কৌতূহলী হয়ে তখনই ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। টিলার উপর থেকে আশ্চর্য হয়ে দেখেন, —নীচে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড হাতি—রাগে ফুলে হুঙ্কার ছাড়ছে,—মাথার কাছে শুঁড় পাকিয়ে, লেজ খাড়া করে! একজন ট্যুরিস্টের 'সিনেক্যামেরা' ছিল। তিনি ছুটে তাঁর ঘরে ফিরে যান। তাড়াতাড়ি সেটি নিয়ে বাইরে আসেন। অপরূপ দৃশ্যের চলচ্চিত্র তোলবার এক অতি রোমাঞ্চকর বিষয়বস্তুও তখনই পেয়ে যান। কুপিত ক্ষুব্ধ হস্তী তার লক্ষ্য ট্রাকটিকে না পেয়ে টিলার নীচে 'কার-পার্ক'-এ রাখা দুখানা মোটর গাড়ি দেখে তাই আক্রমণ করে। শুঁড় দিয়ে ধরে, মাথা পা দিয়ে ঠেলে গাড়ি দুখানা বলের মত গড়িয়ে দেয়, ভাঙচুর করে। যেন, রেগে যাওয়া দুরন্ত ছেলের হাতে টিনের তৈরি খেলনা গাড়ি।

এর মধ্যে দুটো কুকুর এই সব দেখে ছুটে আসে, একটু তফাতে দাঁড়িয়ে 'ঘেউ ঘেউ' রবে চেঁচাতে সুরু করে। হাতিটা, বোধ হয় বিরক্ত হয়ে, গাড়ি ছেড়ে তাদের তাড়া করে। কুকুর দুটো ভয়ে বনের দিকে ছুটে পালায়। হাতিও তাদের পিছু পিছু বনে ঢোকে।

সেই থেকে হাতিটা ক্ষেপে বনের মধ্যে ঘুরছে, রাস্তার উপরও প্রায়ই আসে। গাড়ি বিশেষত ট্রাক দেখলেই আক্রমণ করতে যায়, মানুষ দেখলেও তাড়া করে।

সান্ন্যাল ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে জানান, তাকে নিয়ে বনরক্ষীদের মহাসমস্যা জেগেছে। আপাতত রাত্রের বেলা ও-পথে যান-চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

অগত্যা আমাদেরও যাত্রা স্থগিত রাখতেই হয়।

গম্ভীর মুখে চট্টরাজ মন্তব্য করেন, দেখছি, জগতে লাভ-লোকসান তুল্যমূল্য ভাবেই থাকে। রাত্রে জঙ্গলে ঘোরার আকাঙ্ক্ষাটা ভাঙল বটে, তবে ওদিকে গাঙ্গুলীভায়ার ভূরিভোজের আয়োজনটার ধীরেসুস্থে সদ্‌বিচার করা যাবে। এখন আপাতত ফরাশটার উপর লম্বা হয়ে সান্ন্যালের শিকারের গল্প শোনা যাক, চোখ বুজে জঙ্গলে বাঘের ঘোরাঘুরি দেখি।

আমি বলি, বাঘ নয়, হাতির গল্পই যখন উঠেছে, তাই চলুক।—সান্ন্যালকে প্রশ্ন করি, এখানে মাঝে মাঝে হাতির উপদ্রব হয়, তা হলে?

সান্ন্যাল বলেন, দু-একটা দুর্ঘটনা যে না ঘটে, এমন নয়। হাতির আক্রমণে মানুষও কখনও-সখনও মারা গেছে। গ্রামের ক্ষেতের ফসলও ধ্বংস হয়েছে হাতির অত্যাচারে। তবে, এর জন্যে হাতিকে কতখানি দোষী বলা যেতে পারে, সেটা বিবেচ্য। দেখুন, হাতিরা—শুধু হাতি কেন? বন্য পশুরা, যাদের

হিংস্র বলে দুর্নাম—তারা বিনা কারণে বড় একটা মানুষের ক্ষতিসাধন করে না। হাতিদের কথাই ধরা যাক,—তারা নির্বিবাদে থাকতে চায় গভীর বনে। বাস করে,—যেখানে বড় বড় গাছপালা আছে, স্নিগ্ধ ছায়া আছে, পর্যাপ্ত জল আছে। তাদের জলের বিশেষ প্রয়োজন, কেননা ধুলোবালি মেখে জলে নেমে ভাল করে স্নান করতে তারা ভালবাসে। প্রতিদিন ডালপালাদি আহারের বহর তাদের বিরাট। হবার কথাও। যেমন বিশাল কলেবর, খাদ্যের পরিমাণও তো তেমনি রাক্ষসের মতনই হবে। আর পানীয় জলেরও দৈনন্দিন প্রয়োজন হয় অপর্যাপ্ত। এক একটা হাতি দিনে প্রায় পাঁচশ লিটার জল খায়।

আমি বলি, তাহলে তো যে বনে হাতির বাস, সেখানকার গাছপালা ও জল উজাড় হয়ে যাবার কথা!

সান্ন্যাল হেসে জানান, ঠিকই অনুমান করেছেন। কিন্তু, তা হয় না। কারণ, প্রকৃতির কি বিচিত্র নিয়ম! হাতিরা যাযাবর শ্রেণীর না হলেও একই বনের মধ্যে সারা বছর কাটায় না। একাধিক বনের মধ্যে তারা নিয়মিত বছরের এক-একটা অংশ কাটায়। কোন্ বনে, কোন্ সময়ে তাদের প্রয়োজনমত খাদ্য ও জল পাওয়া যায়, তারা তা জানে এবং সেইমত বন থেকে বনান্তরে চলে যায়।

আমি বলি, এখন মনে পড়ছে, সে-বছর যখন এখানে আসি, তখনই শুনেছিলাম, এ-অঞ্চলের হাতিরা সেপ্টেম্বরে বেতলার জঙ্গলে আসে এবং মার্চ পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে এপ্রিলে অন্য বনে—সাধারণত বড়েষাঁড়ের জঙ্গলে চলে যায়।

সান্ন্যাল জানান, ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু, এই যে হাতিরা এভাবে বন থেকে বনান্তরে ঘোরে,—তাদের নির্দিষ্ট বনও যেমন থাকে, সেখানে যাওয়ার সময়ও তেমনি ঠিক থাকে, এমন কি যাতায়াতের পথেরও সাধারণত অদল-বদল হয় না। ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, পঞ্জিকা, বা ঘড়ি না রেখেও, এবং রুট ম্যাপ না থাকলেও, এরা বছরের পর বছর কী করে ঠিক একই সময়ে, একই পথ দিয়ে এক বন থেকে অপর নির্দিষ্ট বনে হাজির হয়,—আশ্চর্য ব্যাপার। তাদের এই যে স্বাভাবিক নিরুপদ্রব জীবন-যাপনের ধারা, মানুষই এখন তার বিঘ্ন ঘটাতে সুরু করেছে। নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ নির্বিচারে বহু জায়গায় বন-জঙ্গল কেটে বসতি করছে, চাষের জমি বাড়াচ্ছে, তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় পাহাড়ী নদীতে বাঁধ দিয়ে 'ড্যাম' তৈরি হচ্ছে—বড় বড় hydel projects চালু হয়েছে, ফলে, বনজঙ্গল লোপ পাওয়ার দরুন হাতিদেরও থাকবার ঘোরাঘুরি করবার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও স্বাধীনতা চলে যাচ্ছে, তাদের খাদ্যের অভাব ঘটছে, বিচরণক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে,—এতে তাদের মেজাজও বিগড়াবে, আশ্চর্য কী। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'—মানুষেরও যেমনি, অন্য প্রাণীদেরও তেমনি হয়। বনের মধ্যে বড় বড় গাছ কেটে ফেলার ফলে হাতিরা খাদ্যের সন্ধানে বনের নিকটে ক্ষেতের জমিতে ঢুকছে, ফসল নষ্ট করছে। মানুষে তাড়া করলে তারাও উলটে আক্রমণ করছে। মাঝে মাঝে দু-একটা মানুষও মারা যাচ্ছে। আর, নরহন্তারক হস্তী—যাদের বলা হয় Rogue elephant—তাদের সম্পর্কে M. Krishnan-এর একটা প্রবন্ধে পড়েছি (The problem of wild Elephants)—, তাদের গুলি করে মারবার পর দেখা গেছে, শতকরা নব্বুইটা সেই দুর্ধর্ষ-প্রকৃতির হাতির গায়ে পায়ে বা কোথাও-না-কোথাও গুলি, বর্শা বা তীর-বিদ্ধ পুরানো দুরারোগ্য ক্ষত নিয়ে সে বেচারী প্রাণধারণ করছিল,—কোন সময়ে কোন মানুষ তাকে সেই ভাবে আহত করেছিল,—যার ফলে সেও ঘায়ের যন্ত্রণায় ক্ষেপে যায়, হিংস্র হয়ে ওঠে। তবে, বেতলার এবারকার ঘটনাটা নিছক আকস্মিক দুর্ঘটনা।

একটু আগে চট্টরাজের নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ বোধ হয় কখন তিনি সজাগ হন। শেষের কথাগুলি তাঁর কানে যায়। তিনি মন্তব্য করেন, বেতলার জঙ্গল আর হাতি বলেই ট্রাকটা বেঁচে গেল। হোত অমন দুর্ঘটনা কলকাতার রাস্তায় একটা লোকের ওপর,—লোকটাও চাপা পড়ে মরত, ট্রাকও তখনই পুড়ত, ড্রাইভারকে ধরতে পারলে তারও হয়ত প্রাণ যেত।—কিন্তু, রাত হল কত ? গাঙ্গুলীভায়ার খাবার বোধ হয় 'রেডি' হয়ে এল—গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া যাক। খাদ্যের অভাবে মেজাজ বিগড়োবার অধিকার আমারও আছে।

পরের দিন সকালের জলযোগও গুরু ভোজনে পরিণত হয়। চট্টরাজ বলেন, ভালই হল, দুপুরে আর না খেলেও চলবে। বেরুতে সওয়া ন'টা বেজে গেল যখন, জীপ-এ সোজা চলে যাওয়া যাবে সেই বড়েষাঁড়ে। মাইল পঞ্চাশ যাওয়া,—বিকেলের মধ্যেই পৌঁছে যাব। সেখানে ফরেস্ট বাংলোতে গিয়ে রাত কাটানো। গাঙ্গুলী বলেছেন, ওখানে অনুমতিপত্রের দরকার হবে না। বাংলো খালিই পড়ে থাকে।

ডালটনগঞ্জ থেকে দুজনে যাত্রা করি। দুবছর আগে দেখা সেই পরিচিত পথ ধরে বেতলার জঙ্গলে আবার ঢুকি। বেতলার দিকে চট্টরাজের এই প্রথম আসা। তাই কেচকির বনবিশ্রাম-ভবনটিও আবার আমার দেখা হয়। তারপর এগিয়ে গিয়ে বেতলায় পৌঁছানো। মনে মনে খুব আশা, দিনের বেলা হলেও যদি সেই রুদ্রমূর্তি হস্তীর হঠাৎ সাক্ষাৎ মেলে!

আগেরবার বেতলার ট্যুরিস্ট লজটি তৈরি হচ্ছিল দেখেছিলাম। এখন সে-বাড়ি সম্পূর্ণ তো হয়েছেই, এই গহন বনের মধ্যে এসেও সভ্যতাপ্রাপ্ত মানুষ যাতে তার দৈহিক সুখ ও আরামলাভে বঞ্চিত না হয়, তারও যথাবিহিত ব্যবস্থাদি হয়েছে। আসবাবপত্রে সুসজ্জিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করলে মনেই হয় না,—অরণ্যরাজ্যে রয়েছি। কিন্তু বাড়ি দেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সাগ্রহে খবর নিই, সেই হাতিটিকে শেষ কোথায় দেখা গেছে?

মনের ভাবটা যেন, এই বনরাজ্যে আমরা সেই মহারাজেরই দর্শনঅভিলাষী!

খবর শুনি, ক'দিন হল হাতির দল এ-বন ছেড়ে বড়েষাঁড়ের দিকে চলে গেছে, সেই হাতিও হয়ত সেই সঙ্গেই রয়েছে,—এখানে ক'দিন তাকে দেখা যায় নি, হাঁক ডাকও শোনা যায় নি।

চট্টরাজ উৎফুল্ল হয়ে মন্তব্য করেন, আমাদের আজ বড়েষাঁড়ে রাতকাটানোর প্রোগ্রামটা তাহলে ঠিকই করা হয়েছে। চলুন বেরিয়ে পড়া যাক আর এখানে দেরি না করে।

জীপ আবার ছুটে চলে, আমাদের মনও আশায় ভরে থাকে।

বেতলার লোকালয় ছাড়বার মুখে এদিক দিয়ে বনে প্রবেশ করার পথের উপর গেট। চেক-পোস্ট।

পার হয়ে এসে শুরু হয় গভীর জঙ্গল। তারই মধ্যে দিয়ে পিচবাঁধানো পথ। মাঝে মাঝে আশেপাশে ঝোপ-ঝাড়ে-ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়। কোথাও বা হঠাৎ খানিকটা তরুশূন্য সমতলভূমি। নিকটে বেড়া-দেওয়া কয়েকটা চালাঘর। পাশে নাবাল ভূমিতে এক টুকরা চাষের জমি। মাইল চোদ্দ পথ অতিক্রম করে পৌঁছুই ছিপাদোহরে।

লোকালয় সুরু হবার আগেই পাহাড়ের একটা কাটিং—ছেদের উপর পুলের মতন,—তাই পার হয়ে গাড়ি চলে আসে,—সেখানটায় উপরে মোটর চলে, নীচে চলে ট্রেন। নীচে দুদিকের পাহাড় কেটে রেলপথ।

জিজ্ঞাসা করি, এখানে রেলের লাইন?

চট্টরাজ বলেন, ছিপাডোর যে একটা রেল-স্টেশনও। এরই মধ্যে দিয়ে গেছে গোমো-ডেহেরি-অন-শোনের রেল-লাইন। লাতেহারের দিক থেকে এসে এখান থেকে বারোয়াড়ি হয়ে ডালটনগঞ্জ চলে গেছে। পালামৌ জঙ্গলের একটা অংশ ভেদ করে এই লাইনটা পাতা।

আমি ভাবি, একই জায়গা, রাতে দেখা, আর দিনের বেলায় দেখা,—দুটোয় কত প্রভেদ! এখন মনে পড়ছে, সেবার যখন বেতলায় এসে রাত্রে বাঘের সন্ধানে জীপ-এ ঘোরা হচ্ছিল, তখন এক সময় গাইড নিয়ে এসেছিল এই ছিপাদোহরের কাছাকাছি। এই পথেই কোথায় এক জায়গায় ছোট পাহাড়ের মাথায় স্তূপীকৃত পাথর দেখিয়ে গাইড বলেছিল,—ওরই মাঝে গুহা আছে, বাঘ অনেক সময়ে সেইখানে এসে থাকে;—রাত্রের অন্ধকারে কালো বীভৎস দৈত্যের মত সে-পাহাড়টা সেদিন দেখাচ্ছিল, মনেও হয়েছিল, বাঘের বাসার উপযুক্ত স্থানই বটে! অথচ, আজ সে-জায়গাটা কখন যে পেরিয়ে এলাম বুঝতেই পারলাম না! ছিপাদোহরে তো আজ দেখছি অনেক লোকবসতি,—পাকা ঘরবাড়ি। কারণও তখনই জানতে পারি। চট্টরাজ জানান, জঙ্গল থেকে কেটে-আনা ঘাস, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি এখানে জড়ো করে, চালান দেবার এটা এখন বড় কেন্দ্র। জানেন হয়ত, এ-জঙ্গলে বাঁশ হয় প্রচুর। ডালমিয়ানগরে কাগজ তৈরির যে কারখানা রয়েছে, এইখান থেকে তার বাঁশ সরবরাহ হয়। ঐ ওধারে দেখুন স্তূপাকার করে কত বাঁশ

রাখা। ওদিকে ফরেস্ট রেস্ট হাউসও আছে—শিকারে এলে ওইটেই ছিল থাকবার ভাল জায়গা। তা ছাড়া ওধারের ঐ বাড়িটা—ওটা হল কর্নেল পালিতের। সিভিল সার্জেন ছিলেন তিনি। জানেন না নিশ্চয়,—ও-সব বিষয়ে এখন তো খবরই রাখেন না—, সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিন রাত্রি' ছায়াচিত্র এইখান থেকে তোলা হয়। ঐটে ছিল পাহাড়ী সান্যালের বাড়ি!—আর ওধারে আছে এম. এল. বিশ্বাসের বাড়ি,—এখানকার নাম-করা ব্যবসায়ী। এখানে বড় বড় গাছ কেটে এনে চালানের জন্যে তক্তার আকারে কাটা হয়। তার সব যন্ত্রপাতি বসেছে। চলুন না, নেমে ঘুরে দেখবেন?

হেসে বলি, মন্দিরে ঢুকে বলিদান দেখবার কোনই আগ্রহ নেই, বরং বনের মধ্যে এসে অরণ্য-নিধন-যজ্ঞের এই বিরাট আয়োজন দেখতে মন ভার হয়ে ওঠে,—চলুন এগিয়ে যাই।

চট্টরাজ বলেন, এখন তবুও তো জঙ্গলের গাছ, কাঠ ইত্যাদি জমা দেওয়া, কাটা—এসব অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বনের অনেক অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়—যুদ্ধের কতরকম কাজে কাঠের চাহিদা মেটাতে। যেখানে এককালে ছিল গভীর গহন বন,—সেই কয় বছরে হয়ে গেল গাছপালাশূন্য শুষ্ক বিজন প্রান্তর!

কথাগুলি শুনে মনে পড়ে যায়। কোথায় যেন পড়েছিলাম, আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ ত্যাগ করার সময় সিন্ধুনদের তীরবর্তী অরণ্যভূমির সমগ্র গাছপালা নির্মূল করে বিরাট নৌবহর তৈরি করান এবং তাঁর সেনাবাহিনীকে জলপথে ফেরত পাঠান। তারই ফলে নাকি সিন্ধুপ্রদেশের মরুভূমিতে পরিণতির সূত্রপাত হয়!

ভাবি, আজ আমাদের দেশ স্বাধীন। আমাদের অমূল্য অরণ্যসম্পদের সম্যক মূল্যবোধ যেন সমগ্র দেশবাসীর থাকে।

জীপ লোকালয় ছেড়ে আবার ছুটে চলে। লৌহশিকলের বন্ধন কেটে বেরিয়ে এসে প্রাণ হাঁফ ছাড়ে।

এখন বুঝতে পারি, বাঘের দর্শন আজকাল কেন আর সহজে মেলে না এই জঙ্গলে!

চট্টরাজ বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝতে পারেন। বলেন, ছিপাদোহর কথাটার মানে জানেন? 'ছিপা'—মানে লুকানো, আর 'দোহর' হল—পথ,—অর্থাৎ গুপ্ত পথ। সে-নামের সার্থকতা এখন আর নেই!

মোটর এগিয়ে যায়। কখনও বনতলের ছায়াচ্ছন্ন পথে, কখনও ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে, কোথাও বা আসে বন কেটে ধু-ধু-করা খোলা মাঠ। সেই রকমই একটা প্রান্তরের পাশে ফেলে এলাম মাণ্ডুর ইনস্‌পেকশন বাঙলো এবং তারই নিকটে কয়েকটি চালাঘর। আবার সুরু হয় বনপথ ও পাহাড়। ছোট ছোট পাহাড়ী নদীও পথে পড়ে। একটা ছোট নদী যেন বনের গাছপালার ও পথের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে,—এঁকেবেঁকে ঘুরে ফিরে পালিয়ে বেড়ায়, আবার দেখা দেয়, তখনই বনের আড়ালে লুকায়, আবার একটু পরেই পথের উপর আসে। সেই একই ধারা ঘুরে ঘুরে পার হতে হল বোধ হয় বার দশেক,—কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

পথ এবার নেমে আসে বড় নদীর ধারে। নর্থ কোয়েল। নদীর দুই তীরে ছোট বড় পাহাড়ের শ্রেণী। কিছুদুরেই গভীর বন। তারই মধ্যে পথ করে কোয়েল পালামৌ জঙ্গলের মাঝবরাবর ভেদ করে বয়ে চলেছে। নদীর বুকে বড় বড় শিলাখণ্ড। কোথাও বালির চড়া। তার মাঝে ছুটে চলে স্বচ্ছ জলধারা—কল্লোলিত ধ্বনি তুলে। নদী পারাপারের সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা দীর্ঘ সুন্দর সেতু। পুলে উঠবার আগে এক শাখাপথ (ফরেস্ট রোড), বাঁ দিকে বনের মধ্যে চলে যায়,—পথের মোড়ে স্তম্ভের উপর পথনির্দেশ লেখা—ঐদিকে সরযূ হয়ে লাতেহার—৩৮ কিলোমিটার। চট্টরাজ বলেন, আগে এখানে নদীর বুকের ওপর দিয়ে 'ফেয়ার ওয়েদার' পুল ছিল,—বর্ষাকালে তখন পার হওয়া যেত না, এখন এই নতুন পাকা বড় পুল হওয়ায় মহুয়াডাঁর পর্যন্ত যাতায়াতের সারা বছরের রাস্তা খুলে গেছে। ডালটনগঞ্জ থেকে মহুয়াডাঁরে—বারোমাস যাত্রী-বাসও যাচ্ছে। নদীর ওপারেই হল গারু। গাড়ি থেকে নেমে পুলের ওপর থেকে দেখবেন চলুন—নদীর দুদিকের দৃশ্য,—চমৎকার দেখতে।

প্রকৃতই পালামৌর অরণ্যময় পার্বত্যরাজ্যে কোয়েলের অপরূপ সৌন্দর্য।

নদীর অপর পারে টিলার উপর পথের ধারে নূতন তৈরি একটি বাংলো। পি. ডবলিউ. ডি.-র বিশ্রাম ভবন।

চট্টরাজ উৎফুল্ল হয়ে বলেন, কোয়েলের ওপর এমন পরিবেশে বাংলো! কাল ফেরবার পথে এইখানেই রাত কাটাতে হবে,—কী বলেন?

তখনই সানন্দে সম্মতি জানাই। পরের দিন সেই মত ঐ বাংলোতেই রাত্রিবাসও হয়েছিল। চন্দ্রালোকিত রাত্রে সেই নিসর্গশোভা অপূর্ব আনন্দ দান করেছিল। সন্ধ্যায় নদীতীরে শিলাসনে আপনমনে বসে থাকা,—চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ,—শুধু কোয়েলের জলস্রোতের কলকল ধ্বনির মৃদু মধুর সঙ্গীত,—স্তব্ধ মৌন পাহাড়গুলি যেন মোহিত হয়ে শোনে।

আজ এখন যাবার সময় রাত্রিযাপনের কল্পনাটুকু মনে জাগিয়ে এগিয়ে চলি বড়েষাঁড়ের অভিমুখে।

বাংলো ছাড়িয়ে অল্প যেতেই গারুর লোকালয়,—কয়েকটা বাড়িঘর, দোকান, কোতোয়ালি। আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর আবার একটা ফরেস্ট রোড বাঁদিকে বেরিয়ে গেছে—রুদ্-এ। সেখান থেকে নেতার হাট যাওয়া যায়, শুনি।

পিচ-বাঁধানো রাজপথ গারুতে শেষ হয়। তাহলেও, এখনও যে পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি—মোটর যাতায়াতের অনুপযুক্ত নয়,—মোরাম বিছানো। আবার সুরু হয় বন ও পাহাড়। কয়েক মাইল গিয়ে পথের অল্প দূরে বনবিভাগের বিশ্রাম ভবন। চট্টরাজ বলেন,—জায়গাটার নাম মারোমার,—এইবার আবার ঢুকব আমরা গভীর বনে—এদিকের রিসার্ভড্ ফরেস্ট। তার মধ্যে হল বড়েষাঁড়।

কথা শেষ করেই আপন মনে গুনগুন করে কী যেন কবিতা আবৃত্তি করেন।

উৎসাহ দিয়ে বলি, অস্ফুটে কেন? ভাল করেই শোনা যাক না?

তিনি হেসে বলেন, কবির রচিত কবিতা নয়। জঙলীনামের ছন্দ—এমন মিল করে জায়গাগুলোর নাম রেখেছে কবে, কারা জানি না—চেরোরাজাদের সভাকবি কেউ ছিল নাকি?—গভীর জঙ্গলের মধ্যে পরপর কেমন জায়গার নামগুলি—

মান্‌ডু—গারু / মারোমার্—বড়েষাঁড়্!
মান্‌ডু—গারু / মারোমার্—বড়েষাঁড়্—

ছন্দ মিলিয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গে চট্টরাজ তাঁর নধর দেহ দুলিয়ে মাথা নাড়েন। ওদিকে জীপও যেন তাই শুনে পাহাড়ের গা বেয়ে হেলেদুলে শব্দ তুলে উঠতে থাকে। হঠাৎ গাড়ির মেজাজ যায় বিগড়ে। জীপ বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ড্রাইভার নেমে এঞ্জিনের দোষ সারাবার চেষ্টায় তৎপর হয়। আমরাও গাড়ি ছেড়ে পথের উপর পায়চারি করি।

দু পাশে জঙ্গল। বাঁদিকে তারই মধ্যে বিশাল দেহ বিস্তার করে যেন শুয়ে রয়েছে একটা পাহাড়,—ঘুমন্ত দানবের মতন। গা ভরতি তার কালো চাপ চাপ পাথর, ঝোপ-ঝাড়, মাঝে মাঝে বড় গাছ। দিনের বেলা, মনে তাই ভয় জাগে না। তবুও, হঠাৎ ডাইনে বনের গাছপালার অন্তরালে খসখস শব্দ শুনে দুজনেই চমকে উঠি,—সেই হাতিটাই নয় তো?—না, মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে।

টাঙ্গী কাঁধে ক'জন আদিবাসী বন থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর ওঠে। চট্টরাজ ডেকে কথা বলেন। বনের ভিতর কি কাজ চলেছে, তারই মজুর দল। সেই পাগলা হাতি? হাঁ হাঁ,—এই ক'দিন আগে এ-জঙ্গলে তাকে দেখেছে—এখন বোধ হয় আরও এগিয়ে বড়েষাঁড়ের জঙ্গলে ঘুরছে!

আবার আমাদের সাহস ফিরে আসে,—মনে আশা রাখি, সেখানে সেই মূর্তিমানের সঙ্গে হয়ত দেখা হবে!

জীপ আবার চালু হয়। পাহাড়ের গা বেয়ে গভীর জঙ্গল ভেদ করে সশব্দে উপরপানে উঠতে থাকে। চট্টরাজ বলেন, পালামৌর জঙ্গলের মধ্যে যেতে পথ এইখানটাতেই সব চেয়ে উঁচু দিয়ে গেছে।

দুদিকে তাকিয়ে বলি, হাঁ, দেখাচ্ছে ঠিক 'হিল-সেকশন'—পাহাড়ে উঠতে ঘাটের মতন। বাঁদিকে পাহাড়ের উঁচু গা, ডানদিকে খাদ নেমে গেছে—এদিকটায় বনও খুব গভীর,—বাঁশ প্রচুর, শালের জঙ্গলও বেশ রয়েছে। এধারের জঙ্গল যেন কিছুটা স্যাঁতসেঁতে মনে হচ্ছে,—বেতলার মতন খটখটে শুকনো নয়।

পাহাড়ী নদীনালাও মাঝে মাঝে পার হতে হয়। ঝিরঝির করে নদীতে জল বয়ে চলেছে। দুই তীরের গাছপালা ঝোপঝাড় নদীর বুকে যেন ঝুঁকে পড়েছে।

চট্টরাজ বলেন, নজর করতে করতে চলুন, হয়ত কোন জানোয়ার জল খাচ্ছে দেখবেন,—জলের

নিকটে খোলা মাঠ থাকলে হাতির দলও দাঁড়িয়ে আছে দেখা যেতে পারে।

কিন্তু, জন্তু-জানোয়ার কিছুই দেখা যায় না।

ঘুরতে ঘুরতে পথ এসে যায়, হঠাৎ অনেকখানি খোলা ময়দানের মধ্যে। তারই মাঝে ছড়ানো কয়েকটা বাড়ি। আশেপাশে খেতের জমিও। চট্টরাজ বলেন, যাক, পৌঁছে গেলাম বড়েষাঁড়ে,—গারু থেকে মাইল বারো হবে।

জিজ্ঞাসা করি, ডালটনগঞ্জ থেকে মোট কত মাইল আজ আসা হল?

চট্টরাজ জানান, মাইল পঞ্চাশ হবে।—বাঁদিকে ঐ ফরেস্ট বাংলো। বাজল ক'টা? সওয়া দুটো? তা ভালই আসা গেল।

গাড়ি এগিয়ে যায় বাংলোর গেট-এর সামনে। চৌকিদার গাড়ি দেখে বেরিয়ে আসে। খবর দেয়, বাংলো খালি নেই। সরকারী অফিসাররা রয়েছেন।

ড্রাইভার বলে, চলুন, আমাদের কারবারের দপ্তর এখানে রয়েছে—ঐ ওখানে—তার সামনে দিয়েই তো এলাম,—সেখানে থাকবেন।

গাড়ি ঘুরিয়ে তারই সামনে নামা হয়। এও একটা পাকা বাড়ি। যিনি এখানকার অফিসার—তাঁরই থাকবার কোয়ার্টার্স। মিস্টার সিং ভদ্র, অমায়িক ব্যক্তি। বিহারী। সাদরে আমাদের আমন্ত্রণ জানান, আমি এখন একাই এ-বাড়িতে রয়েছি। দুখানা ঘর—একটাতে স্বচ্ছন্দে আপনারা রাত কাটাতে পারেন।

সেইমত ব্যবস্থা তখনই হয়।

বিশ্রাম নিয়ে বিকালে ঘুরতে বার হই। চারিদিক ঘিরে ছোট ও বড় পাহাড় এবং গহন বন,—মাঝখানে উপত্যকা। উঁচু-নীচু অনেকখানি খোলা জমি। জঙ্গলের ইজারাদারদের দপ্তর, বনবিভাগের কর্মীদেরও দু-একটা থাকবার বাড়ি, ছোট অফিসও। সেই কারণে দু-তিনটে চায়ের ও খাবারের দোকান। রাস্তার উপর গেট—চেকপোস্ট। বন থেকে কাঠ কেটে লরি ভরতি হয়ে চলেছে, তাদের গতিরোধ করে তদারক করা হয়।

বেড়াতে বেড়াতে ফরেস্ট বাংলোতেও হাজির হই। জিওলজিক্যাল সার্ভের দুই ভূবিজ্ঞানী—দুজনেই বাঙালী—এখানে কিছুদিন হল এসে রয়েছেন,—জঙ্গলের মধ্যে তাঁদের কাজকর্ম চলেছে। একজন তাঁর স্ত্রী ও ছোট একটি মেয়েকেও সঙ্গে এনেছেন।

আলাপ হতেই মিঃ দাসগুপ্ত সাগ্রহে অনুরোধ জানান, বাংলোতে দুটো বেশ বড় স্বতন্ত্র ঘর রয়েছে,—আপনারা চলে আসুন, একটাতে আপনারা থাকবেন, আমাদেরও একটাতেই চলে যাবে,—একসঙ্গে একটা দিন বেশ আনন্দে গল্প করে কাটানো হবে,—ওখানে থাকবেন কেন?

আমরা রাজি হই না, বলি, এক রাতের তো ব্যাপার। ওখানেও ভালভাবেই গুছিয়ে বসা গেছে। তা ছাড়া, সন্ধ্যে হলেই জীপ-এ করে বনের মধ্যে ঘুরতে বেরুব। আপনারা এসেছেন এখানে কতদিন? জঙ্গলে এখানে কি কাজ চলেছে?

তাঁরা জানান, দেখতে দেখতে ক'টা মাসই তো কেটে গেল। বনে বনে ঘুরছি এখানকার জমিতে ও পাহাড়-পর্বতে মূল্যবান খনিজ পদার্থ কোথায় কি পাওয়া যেতে পারে তারই সন্ধানে।

জিজ্ঞাসা করি, জন্তু-জানোয়ারও দেখতে পান নিশ্চয়?

তাঁরা হেসে বলেন, তাদের সঙ্গেই তো এখন দিন কাটাচ্ছি। বাঘ দেখেছি একবার মাত্র। হাতি দেখতে পাওয়া যায় প্রায়ই। ভালুকও কয়েকবার দেখা গেছে। আর গউর? সাধারণ লোকে যাকে বলে বাইসন? সে তো প্রায়ই চোখে পড়ে। এ-জঙ্গল যেন তাদেরই নিজস্ব বাসভূমি। সেই জন্যেই বোধ হয় জায়গাটার নাম হয়েছিল বড়েষাঁড়—বড় বড় ষাঁড়ের মত খানিকটা দেখতে তো। আগে শুনেছি, এই বাংলোর ঐ মাঠেতেও নেমে এসে ওরা নির্ভয়ে চরে বেড়াত,—এইখানে বারান্দায় বসে তাদের দেখা যেত। এখন মোটর-লরি প্রভৃতি নিত্য যাতায়াত করে,—ওরাও এদিকটায় বড় একটা আসে না। এখানকার চারপাশের পাহাড়জঙ্গল ওদের থাকবার মনোমত পরিবেশ।

বলি, এখানকার জঙ্গল খুব গভীর বটে, কিন্তু পাহাড়গুলোও বেশ উঁচু,—অত উঁচুতে ঐ শরীর নিয়ে ওঠা-নামা করতে ওরা পারে?

দাসগুপ্ত বলেন, খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওরা অক্লেশে ওঠে নামে। তবে বেশির ভাগ থাকে নীচের

জঙ্গলে এবং ওদের স্বভাব হল যে জঙ্গলে বাস করে তা ছেড়ে অন্যত্র যায় না। পালামৌর জঙ্গলে প্রায় দেড়শত গউর আছে,—তার অধিকাংশই হল এই বড়েষাঁড়ের বনে।

চট্টরাজ বলেন, হাঁ, সে কথা আমিও শুনেছি। কিন্তু সেই পাগলা হাতিটার কথা শুনেছেন নিশ্চয়? তার সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে?

তাঁরা বলেন, শুনেছি তার বিষয়ে—এদিকেই নাকি ক'দিন হল এসে ঘুরছে। সামনাসামনি এখনও চোখে পড়েনি। না পড়াই মঙ্গল। সন্ধ্যার পর ঘুরতে বার হলে সাবধানে যাবেন যেন। আপনারা এলেন প্রায় সারাপথ লাতেহার ডিভিসনের Protected forest-এর মধ্যে দিয়ে— আর এখানে বড়েষাঁড়ে হল তারই মধ্যে রিসার্ভড্ ফরেস্ট,—এখানকার টেনুর জঙ্গল, হারের জঙ্গল—সব নামকরা গভীর বন।

চট্টরাজ জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা তো, মশাই, রয়েছেন বনবাসে, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা চলছে কি রকম? অবশ্য ডালটনগঞ্জ থেকে জিনিসপত্র আনানো চলে—কিন্তু মাছ-মাংস পান নাকি?

তাঁরা উত্তর দেন, মাছ বলতে পাহাড়ী নদীর ছোট ছোট মাছ পাওয়া যায়। আর মাংস ইচ্ছে করলেই ব্যবস্থা হতে পারে,—তা করার লোভ কখনও হয় নি। তবে আদিবাসীরা মুরগী পোষে,—তার যোগাড় সহজেই হয়, ডিমও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সস্তাও খুব।

চট্টরাজ একমনে শোনেন, কি যেন ভাবেন, অস্ফুটে বলেন, আচ্ছা!

এদিকে বেয়ারা এসে টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম, বিস্কুট, পকৌড়া, পাঁপড়ভাজা রেখে যায়।

দাসগুপ্ত বলেন, চলুন, সামান্য কিছু জলযোগ করে নিন,—এখানে তো আর সন্দেশ-রসগোল্লা পাওয়া যায় না।

চট্টরাজ মন্তব্য করেন, যা ব্যবস্থা করেছেন, এ জঙ্গলে এই বা মেলে কোথায়?

জলযোগ সেরে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিই। সন্ধ্যার ছায়া নামলেই জীপ-এ চড়ে বনের মধ্যে ঘুরতে বেরোনো হবে। এখানে বেতলার মত গাড়িতে 'স্পটলাইট' সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। মোটরের হেড-লাইটে যা কাজ চলে। বনে ঘুরতে সে আলোর প্রধান অসুবিধা,—গাড়ির শুধু সুমুখদিকেই আলো ছড়িয়ে পড়ে, তাতে পথটুকুই আলোকিত হয়, আঁকাবাঁকা পথ হলে সামনের বনের মধ্যেও কিছুটা দেখা যায়, কিন্তু চলন্ত গাড়ির দুপাশের বনে আলো পড়ে না,—বরং সামনের তীব্র আলোক আশপাশের বনের অন্ধকার আরও ঘনীভূত করে তোলে। চট্টরাজ সঙ্গে পাঁচ সেল-এর টর্চ এনেছেন—স্পট-লাইটের অভাব কিছুটা যদি পূরণ করে। কিন্তু, নিবিড় বনের ঘনান্ধকারে সে যেন দেশলাই-এর একটা কাঠি জ্বালানো। তবুও, সেই আলোটুকু সম্বল করে বনে ঘুরতে বেরুনো। আলোর অভাব কিন্তু মনের উৎসাহ ও কৌতূহলের আবেগ কমায় নি। কেননা, রওনা হবার আগেই একজন ব্যস্তসমস্ত ভাবে আবির্ভূত হয়ে খবর জানায়, মারোমারের দিকে পথের উপর পুলের মাঝে একটা প্রকাণ্ড বাঘ বসে আছে—একটু আগে একজন সেদিক থেকে আসার সময় দেখতে পেয়েছে।

সন্ধ্যা তখনও নামে নি, তবুও আর দেরি করা নয়। তখনই রওনা হয়ে যাই—মারোমারের রাস্তা ধরে।—মনে আশা, বাঘ আজ দেখা যাবেই। লোকালয় ছাড়িয়ে একটু এগোতেই বনদেবী যেন সাদর অভ্যর্থনা জানান শিখীদলের দূত পাঠিয়ে। একঝাঁক ময়ূর পথের ধারে চরে বেড়ায় তাদের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণ করে। গাড়ির শব্দ শুনে সভয়ে পালাতে থাকে।

চট্টরাজ বলেন, বাঘের খবর এরা এখনও পায় নি,—পেলে ডাক ছেড়ে বন কাঁপিয়ে তুলত।

উদ্‌গ্রীব হয়ে মারোমারের দিকে এগিয়ে চলি। ছোট ছোট পুলও পার হই। গাড়ি দাঁড় করিয়ে নদীনালার দুপাশে বনের আবছায়ায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে খুঁজতে থাকি—ঐ বুঝিবা এবার দেখা যাবে বাঘ! কিন্তু কোথায় কে?

গাইড বলে, পথ ছেড়ে বনের মধ্যে কোথাও চলে গেছে।

অগত্যা বড় রাস্তা ছেড়ে গাড়ি ঘুরিয়ে এবার 'ফরেস্ট রোড' ধরে গভীর বনে ঢোকা হয়। রাস্তার দুধারে ঘন জঙ্গল। কোথাও বা পাহাড়ের গা ঘেঁষে পথ। বনভূমিব নিবিড়তা কতখানি, পাহাড়ই বা মাথা তুলেছে কত উঁচুতে কিছুই বোঝা যায় না,—অন্ধকার যেন মুখ-ব্যাদান করে হেডলাইটের আলো গ্রাস করতে চায়। চারিপাশে এক প্রগাঢ় রহস্যের সৃষ্টি হয়। তবুও তারই মাঝে প্রায় বোঝা যায়, দলে দলে চিতল হরিণ চরে বেড়ায়,—তাদের গায়ের সাদা ফুটকিগুলি জোনাকির মত অন্ধকারে ঝিকমিক করে।

এ অরণ্য যেন তাদেরই রাজ্য।

একটা বাঁক ঘুরতেই পথের উপর দাঁড়িয়ে একজোড়া সম্বর। আচমকা আলো পড়তেই ছুটে পাশের জঙ্গলে প্রবেশ করে।

বনের আর এক অঞ্চলে পথের বাঁপাশে গাছের তলায় টর্চের আলো ফেলতেই যেন আলোক-বার্তার উত্তর দিয়ে চকিতে জ্বলে ওঠে দু-জোড়া টর্চ। ক'হাত মাত্র দূরে।

চট্টরাজ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন,—বাঘ! বাঘ!

অভিজ্ঞ ড্রাইভার গাড়ির গতি মৃদু করে। হেসে বলে, বাঘ নয়, গউর! এই দেখুন—

গাড়ি থামায়। গাইডও টর্চ-এর আলোটা গউরের সামনে পায়ের কাছে মাটিতে ফেলে আবার ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে আলোটা এগিয়ে আনতে থাকে—আলো যেন হাত নেড়ে তাকে কাছে ডাকে।

ও কী! সত্যিই সে গউরটা আলোকপাতের সঙ্গে সঙ্গে ধীরপদে এদিকপানে এগিয়ে আসে! কী বিশাল দেহ! একা নয়, সঙ্গে একটা ছোট গউরও রয়েছে। ওরই বাচ্চা নিশ্চয়। ড্রাইভার তখনই গাড়ি চালিয়ে আবার পথ ধরে। বলে, গউর সাধারণত শান্তপ্রকৃতি, কিন্তু বাচ্চাসমেত বন্য জন্তুকে বিশ্বাস নেই,—বাচ্চার বিপদ আশঙ্কা করে হঠাৎ তেড়ে আসতে পারে।

চট্টরাজ জিজ্ঞাসা করেন, এটা কোন্ জঙ্গল?

গাইড বলে, এখন টেনুর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছি,—এদিকটায় গউরই বেশি। এইবার যাব কোবরওয়ার জঙ্গলে। সেখানে হাতি দেখা যায় প্রায়ই।

সে-অঞ্চলে প্রবেশ করে তারই প্রমাণ পাই।—পথের উপর, পথের আশেপাশেও। গাছপালা ভাঙা,—রাস্তার মাঝে হাতির তাজা নাদ।

চট্টরাজ সোজা হয়ে বসেন, উৎসাহিত হয়ে বলেন,—সামনেই বোধ হয় এবার দেখা যাবে,—হেলেদুলে সব চলেছেন—

গাইড চাপা গলায় বলে, না, এ পথ দিয়ে এগোনো ঠিক হচ্ছে না,—সেই ক্ষ্যাপা হাতি যদি পথে সামনে পড়ে—বিপদ ঘটতে পারে,—এসব জীপ তার কাছে কিছুই নয়।

কিন্তু, গাড়ি ফেরাবার উপায় থাকে না। পথ এমনি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে,—একখানা জীপ কোনক্রমে যেতে পারে। পথের একপাশে—খাড়া পাহাড়ের গা; অপর পাশে ঢালু খাদ। তার উপর, দুদিকের গাছগুলার ডালপালা মাথার উপর পরস্পর স্পর্শ করে এমনই ছাউনি তৈরি করেছে যে গাড়ি ঢুকছে যেন সুড়ঙ্গ গলিপথে! গাড়ি ঘোরানোর স্থান কোথাও নেই। অথচ পথের উপর সদ্য এগিয়ে যাওয়া হাতির চিহ্নগুলি সুস্পষ্ট। সেই ভাঙা ডালপালার উপর দিয়ে মড়মড় শব্দ তুলে জীপ বাধ্য হয়ে এগিয়ে চলে। একেবারে বন ভেদ করে অপরদিকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমন আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে 'ব্যাক' করে পিছু হটে গাড়ি নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়।

ড্রাইভার অতি মন্থর গতিতে সন্তর্পণে গাড়ি চালায়। বলে, তাড়াতাড়ি গেলে হয়ত সামনেই চলেছে দেখতে পাওয়া যাবে। হাতির দল এগিয়ে যাক,—আমরা এইভাবে পিছুপিছু চলি।

ভাবি, কিন্তু সেই পাগলা হাতি যদি উলটা মুখে এসে যায়! কিংবা দেখা যায় যদি পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে —এদিক ফিরে বৃক্ষকাণ্ড ভক্ষণে মগ্ন রয়েছেন!

গাইডকে প্রশ্ন করি, বনের মধ্যে হাতির সামনা-সামনি পড়ে গেলে কি করো?

সে বলে, মনে সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে সাধারণত তাড়া করে না। যদি কোন হাতি ক্ষেপে গিয়ে তাড়া করে আসে, তখনই তার পথ থেকে সরে গিয়ে কাছাকাছি কোন বড় গাছের আড়ালে লুকাতে পারলে রক্ষা পাওয়া যায়, কেননা আক্রমণকারী হাতি প্রায়ই চোখ বুজে ছুটে আসে, আর একবার পেরিয়ে গেলে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না।

শুনে ভাবি, কিন্তু এখন তো আমরা চলেছি জীপ-এ, গাড়ি তো আর গাছের পিছনে লুকানো যাবে না। গাড়ি চলে যেন হামাগুড়ি দিয়ে। উন্মুখ হয়ে আমরা বসে থাকি,—সামনের পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। পাহাড়ের পথে বাঁকের পর বাঁক আসে। প্রতি বাঁক ঘুরলেই মনে হয়,—এইবার বুঝি দেখা দিল।

চট্টরাজ গম্ভীর গলায় বলেন, জঙ্গলের এদিকটায় এভাবে আসা ঠিক হয় নি।

বলি, এখন তো সে-কথা ভেবে লাভ নেই,—যা হবার হবে।

আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় পথের দীর্ঘতাও যেমন বাড়ে, সময়ও যেন পাষাণ হয়ে বুকে চেপে বসে। সেই মত্ত মাতঙ্গের দর্শন-আকাঙ্ক্ষাও মৃগতৃষ্ণার মত মিলিয়ে যায়।

নাঃ, মিথ্যা ভাবনা। অবশেষে হাতির দল দেখা গেল না। বড় রাস্তায় গাড়ি পৌঁছে গেল।

গাইড স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করে, নিশ্চয় পাশের আর কোন জঙ্গলে গিয়ে তারা ঢুকেছে।

আবার ঘুরতে ঘুরতে চলে আসি মারোমারের কাছে। বাঘটা যদি ঘুরে ফিরে পুনরায় পুলের উপর এসে বসে! কিন্তু বিফলমনোরথ হয়ে বড়েষাঁড়ের ফিরতি পথ ধরতে হয়। বড় রাস্তা। গাড়ি জোরে ছোটে। হঠাৎ পাশ থেকে পথের উপর উঠে এল এক বড় চিতল হরিণ। আচমকা গাড়ি ও হেডলাইটের সামনে পড়তেই ভয় পেয়ে সুমুখপানে রাস্তা ধরে বায়ুবেগে ছুটতে সুরু করে। জীপ পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। হরিণ পথ দেয় না,—মাঝপথ ধরে ছুটতেই থাকে। অগত্যা জীপও চলে তার পিছু পিছু,—যেন তাড়া করে। প্রায় ফার্লঙ খানেক এইভাবে ভয়ার্ত হয়ে দৌড় দিয়ে বেচারীর বোধ হয় বুদ্ধি ফিরে আসে, পথ ছেড়ে পাশে নেমে বনের মধ্যে পালায়।

ঘণ্টাতিনেক এইভাবে বনের বিভিন্ন অংশে ঘুরপাক দিয়ে আরও হরিণের দল ও কয়েকটি গউরের দর্শন পেয়ে বাংলোতে ফেরা হয়। হাতির দেখা পাওয়া গেল না, যদিও আরও দু-একটা জঙ্গলে হাতিদলের চলাফেরার বহু চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে।

সেই পাগলা হাতিটির কথা কিন্তু মনে গাঁথা হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার কি পরিণতি ঘটল জানবার জন্য অসীম কৌতূহলও হয়। পালামৌ থেকে ফিরে আসার কিছুকাল পরে বনদপ্তরে অনুসন্ধান নিয়ে জানি, তার সেই একদিনের কীর্তিকলাপ ও পরবর্তী সাময়িক ক্ষিপ্ততার কাহিনী দপ্তরের নথিপত্রে লিপিবদ্ধ হয় নি। কারণ, কয়েকদিন পরে তার দ্বারা আর কোন উপদ্রব হয়েছে বলে কোন খবর আসে নি। সম্ভবত তার মাথা ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং সে যূথভুক্ত হয়ে পুনরায় স্বাভাবিক আরণ্যজীবন যাপন করে। বোধ করি, বুদ্ধিমান বুঝেছিলেন, অরণ্যরাজ্যে বাস করেও মানুষের অমন অন্যায় আচরণ ও অত্যাচার বন্যপ্রাণীকেও সইতে হবে!

রাত্রে শয্যাগ্রহণের আগে চট্টরাজ জানান, আমাদের শুধু লাটের জঙ্গলের দিকে আজ আর যাওয়া হল না। সেদিকটায় গিয়েছিলাম সেই প্রথমবার যেবার পালামৌ আসি সেইবার! তবে সেবারও সেখানে চিতল ও সম্বর ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই নি,—এমন কি, গউরও নয়। ওঃ, সেবার এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার ঘটে যায়,—একেবারে বে-আইনী ঘটনা! তারপর বেশ কিছুদিন আমাকে দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাতে হয়েছিল,—সরকারী চাকুরে,—আমাকে তার ঠেলা সামলাতে না হয়!

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, ব্যাপারটা কী,—শোনাই যাক না।

চট্টরাজ বলেন, শুনবেন? প্রকৃতপক্ষে, আমার কিন্তু দোষ নয়, তবুও ঘটনায় জালে জড়িয়ে পড়লাম! সে বছর আমাকে আসতে হয়েছিল এক ভি. আই. পি.-র সঙ্গে। পালামৌর বন দেখবার শখ হয়েছে তাঁর, —অন্য বনে শিকার-টিকার করে বেড়ান, শুনেছি,—কিন্তু এ-বনে তো শিকার করা চলবে না,— শুধু ঘুরে দেখা। লটবহর নিয়ে এলেন,—জীপ-এ চেপে। পিছনে তার আবার 'ট্রেলর'—অনুগামিক যান। সঙ্গে মালপত্র এসেছে,—বনে এসেও যাতে খাওয়াদাওয়া, থাকা,—কোন কিছুর অসুবিধে না হয় মহাপ্রভুর। ঐ যে লাটের জঙ্গলের কথা বলছিলাম,—তারই মধ্যে ঘোরা হচ্ছে। এ-অঞ্চলে দেখলেনই তো,—অগুনতি হরিণ, সম্বরও অনেক। আজকের মতন সেদিন জীপ-এর সামনে হঠাৎ রাস্তার ওপর উঠে এল এক বিরাট সম্বর। চোখে তার আলো পড়তেই বেচারী হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল স্থির হয়ে। ফট করে ভি. আই. পি. মশাই বন্দুক তুলে তার দিকে গুলি ছুঁড়লেন। সম্বরের প্রাণ তো গেলই, আমারও তখন বুকের মধ্যে ভয়ে টিপটিপ করতে সুরু হয়েছে। সঙ্গে রয়েছি,—জবাবদিহি তো করতে হবে আমাকেই,—তিনি তো ভি. আই. পি! এখন আপাতত করাই বা যায় কী! ভি. আই. পি আশ্বাস দিলেন, কোন চিন্তা নেই। তোল সম্বরটাকে আমার ট্রেলারে,—ডালপালা এনে ভাল করে ঢাকা দাও—তার ওপর ত্রিপল বিছিয়ে, চল ফিরে।

তাই করা হয়েছিল। যেন, গুমখুন করে লাশ পাচার করা!—তবে নিজে যে একেবারে নির্দোষী তা বলতে পারি না। বন থেকে ফিরে এসে তার মাংসের ভাগ সানন্দেই আমি গ্রহণ করেছিলাম!—যাক

সে-সব পুরানো কথা। এবারের মত এদিকের বনটা তো ঘোরা গেল। কাল কিন্তু আমাদের সকাল ছ'টার মধ্যেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। এরপর মহুয়াডাঁর হয়ে পালামৌর শেষ সীমানার পাহাড়ে গিয়ে লোধ-ফল্‌সটা দেখতেই হবে। জায়গাটা নাকি অদ্ভুত সুন্দর। জলপ্রপাতটাও বেশ বড়—বেহারের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ফল্‌স,—খুব অল্পলোকই সেখানে যায়।

জিজ্ঞাসা করি, এখান থেকে কত মাইল যেতে হবে?

চট্টরাজ হিসাব দেন, এখান থেকে অক্‌সি হল মাইল সাত-আট, তারপর মহুয়াডাঁর আরও দশ মাইল। সেখান থেকে পালামৌর সেই শেষ পাহাড়ের দূরত্ব হবে শুনেছি আরও মাইল দশ-বারো। অর্থাৎ মাইল ত্রিশেকের ধাক্কা। তারপর তো আমরা কালই ফিরব গারুতে—সেখানকার সেই কোয়েলের ধারে বাংলোতে রাত কাটাতে। যেতে-আসতে সত্তর মাইলের ওপর হয়ে যাবে,—ভোরেই বেরোনো দরকার।

বলি, বেশ তাই করা যাবে। এখন আপাতত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমানো যাক।

কিন্তু রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। গভীর রাত্রে মানুষের কান্নার শব্দ আসে দূরে কোথা থেকে। ঘুম ভেঙে যায়। ক্ষণে ক্ষণে সেই করুণ আর্তনাদ কানে বাজতে থাকে। ঘুম আর আসে না। ভাবি, নিশ্চয় কোথাও কারও মৃত্যু ঘটেছে!

॥ ৩ ॥

ভোরে উঠে খবর করি, কোথায় কে মারা গেল?

তখন শুনে অবাক হই, মানুষের মৃত্যুশোক নয়। দুই বুনো ভালুকের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি, তাদেরই চিৎকার। এ-রকম নাকি মাঝে মাঝে শোনা যায়!

এদিকে সময়মত আমাদের সব প্রস্তুতি সত্ত্বেও চট্টরাজ দেখি, নিজেই গড়িমসি করেন। তিনি যে তৈরি হননি তা নয়। পরনে যাত্রার বেশভূষা। নাস্তাও শেষ। তবুও, কি জানি কেন,— 'এই যে এবার রওনা হওয়া যাচ্ছে'—বলে ধীরেসুস্থে একবার ঘরের ভিতর যান, আবার বাইরে আসেন, অথচ গাড়ির দিকে পা বাড়ান না। আমি বাইরে বাগানে তাঁর অপেক্ষায় থাকি, পায়চারি করি, তাগাদা দিই, তবুও তাঁর তাড়া নেই।

বেলা বেড়ে যায়। সাতটা বাজে। তখনও তাঁর 'এই যাচ্ছি' ভাব, অথচ আসেন না।

অবশেষে একটু বিরক্তির ভাব দেখিয়ে তাড়া দিই, ব্যাপারটা কী বলুন দিকি—কখনও এমন তো করেন না,—তিনি তখন প্রকাশ করেন, কাল রাত্রে এখানকার একজনকে ক'টা টাকা দিয়েছি,—দুটো মুরগী আর কয়েকটা ডিম আনবে বলে—এখানে ভীষণ সস্তা কিনা! লোকটা বলেছিল, সকাল ছ'টার আগেই এনে দেবে, কিন্তু এখনও দেখা নেই!—কথাগুলি বলে এমনভাবে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন, যেন ছোট ছেলে দোষ করে ধরা পড়েছে!

হেসে বলি, লোধ ফল্‌স দেখতে যাবেন,—না মুরগী আর ডিমের 'ফল্‌স হোপ'-এ এইখানেই সময় কাটাবেন? এখন মনে হচ্ছে, আপনার মুরগী ও ডিম আনতে গিয়েই লোকটা বোধ হয় ঐ ভালুকদের কবলে পড়েছিল!

চট্টরাজ অনুনয় করেন, দেরি তো হয়েই গেছে, এইবার নিশ্চয় এসে যাবে—আর একটু—বলে করুণ বদনে তাকান। আমি জানাই, বেশ,—ঠিক সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব,—তার মধ্যে আসে ভাল,—না এলে তারপর আর এক মিনিটও দাঁড়ানো নয়!

সাড়ে সাতটার মধ্যে লোকটা আসে না। জীপ-এ উঠে আমরা যাত্রা করি। চলন্ত জীপ-এর ভিতরে বসে চট্টরাজ উদ্‌গ্রীব নয়নে পিছনে তাকিয়ে থাকেন,—যদি তখনও তাকে দেখা যায়। কিন্তু কোথায় কে?

গাড়ি বড়েষাঁড়ের বসতি পার হয়ে যায়। চট্টরাজ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, যাক্ মুরগী-ডিম তো এলই না, টাকা ক'টাও জলে গেল!

বলি, মুরগীও বনে বসে ডিমে তা দিতে থাকল! তবে সেবার চোরাশিকারের মাংস ভক্ষণের প্রতিফল স্বরূপ এতদিন পরে যা হোক আপনার খানিক গুনগার দিতে হল!

বড়েষাঁড় ছাড়বার পর আরও কিছুদূর—সেই বনজঙ্গল পাহাড়। পথও চলে ঘুরে ঘুরে। তার পরেই বন পাতলা হয়ে আসে, পাহাড়ের আবেষ্টনও শিথিল হয়। সামনেই দেখা যায় সুদূরপ্রসারী সমতলভূমি।

আরণ্য ও পার্বত্য রাজ্য থেকে মুক্তি লাভ করে পথ যেন হাঁফ ছেড়ে নেমে আসে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে। পথের অদূরে দেখা যায় অক্সির বনবিশ্রাম ভবন। খোলা ময়দানের মধ্যে।

চট্টরাজ বলেন, এ-বাংলোটাও ভাল। লোধ ফল্স দেখে ফিরতে বেশি দেরি হলে এখানেও রাত কাটানো যেতে পারে। তবে, গারুতে ফেরবারই চেষ্টা করতে হবে,—সেখানে সেই কোয়েলের ধারে,—চমৎকার! নয় কি?

একমত হয়ে বলি, ঠিকই,—কিন্তু ফেরবার কথা তখন ভাবা যাবে,—এখন গন্তব্যে পৌঁছনো যাক তো!

চারিদিকে তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের শ্রেণী দূরে সরে গিয়েছে, ফেলে-আসা পিছনের পাহাড়ও। এখন আর তাদের রুক্ষ রুদ্র রূপ নেই। দেখায় যেন আকাশের নীল চোখের নীচে কাজলটানা স্নিগ্ধ রেখা। এগিয়ে চলেছি সমতলভূমির উপব দিয়ে। পালামৌর এও আর এক লাবণ্যময় রূপ। পাহাড় নয়, বনজঙ্গল নয়—দীর্ঘ বিস্তীর্ণ প্রান্তর। পাহাড়ে-ঘেরা বিশাল উপত্যকা। বিশ্বকর্মার কারুশালায় গড়া যেন কাঁধা-উঁচু প্রকাণ্ড একটা জামবাটি!

চট্টরাজ বলেন, এর নাম ছেছারি ভ্যালি। বৃত্তাকারে এই যে বিরাট ভ্যালি দেখছেন, এর 'রেডিয়াস'—ব্যাসার্ধ হল সাত মাইল—অর্থাৎ এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের ব্যাস—চোদ্দ মাইল। চারদিকে ঘিরে খাড়া পাহাড়। ঐ দিকটা হল দক্ষিণ,—ও-ধারের পাহাড়ের অপর দিকে হল রাঁচী জেলা। পুবেও তাই। তবে ওপাশের পাহাড়ের সারির মধ্যে—ঐ ওখানে চ্যাপটা মাথা লম্বা পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন?—ঐটে হল নেতারহাটের পাহাড়,—তার এদিকের অংশ হল পালামৌ,—অপর পিঠে রাঁচী জেলা। নেতারহাটের ওপর থেকেও এই ছেছারি ভ্যালি—এমন কি মহুয়াডাঁরও দেখতে পাওয়া যায়। মহুয়াডাঁর থেকেও আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে রাত্রে নেতারহাটের মাথায় ঘরবাড়ির আলো দেখা যায়। নেতারহাট গেছেন নিশ্চয়?

বলি, একবার গিয়েছিলাম সেই ১৯৩৯ সালে, তখন ভাল করে সব দেখা হয় নি। আবার একবার যেতে হবে, নইলে পালামৌ দেখা অসমাপ্ত থেকে যাবে।

চট্টরাজ বলেন, এখন আর সে-নেতারহাট নেই—অনেক বদলে গেছে, বেহার সরকার একটা ভাল পাবলিক স্কুল খুলেছে।—গিয়ে সব দেখে আসবেন। ঐ নেতারহাটের পাহাড়—এ-অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু—প্রায় তিন হাজার আটশ ফুট হবে।—এইবার দেখুন ভ্যালির ঐ পশ্চিম দিকটার পাহাড়,—ঐ অঞ্চলেই আমরা যাব লোধ ফল্স্ দেখতে,—ওই রেঞ্জের মাথায় হল ওর্সাপাট;—ভাল কথা, 'পাট' কথাটার মানে জানেন? পাহাড়ের মাথার উপর বিস্তীর্ণ সমতলভূমি—অর্থাৎ প্লেটো—মালভূমি। নেতারহাটের দিকেও আছে পক্রিপাট। এখানে হল ওর্সাপাট—পালামৌর দিকে, আর পাহাড়ের অপর অংশ মধ্যপ্রদেশের সুরগুজা জেলা, সেখানে রয়েছে জমিরপাট। ছেছারি ভ্যালির তিন দিকটা দেখলেন,—বাকি রইল আর একটা,—উত্তর দিক,—যে ধার দিয়ে আমরা নেমে এলাম। এইবার শুনুন এ অঞ্চলের বহুপ্রচলিত এবং কিংবদন্তী। প্রাকৃতিক সৃষ্টি এবং মানুষের কল্পনা মিলে কেমন গল্প গাঁথা হয়! এই জায়গাটা পাহাড়ে ঘেরা, দেখাই যাচ্ছে। প্রবাদ—হয়ত, এটা সত্যিও হতে পারে, এখানে এককালে বিরাট হ্রদ ছিল। জায়গাটা দেখেও তাই মনে হয়। তারপর, এক বছর অবিশ্রান্ত প্রচণ্ড বর্ষার ফলে হ্রদের জল চারদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে বাড়তে থাকে। পাহাড়ে জঙ্গলে অসংখ্য টিয়া বা তোতা পাখি থাকে দেখেছেনই তো। তারা সেই প্লাবনে বাসাহারা হয়ে পাহাড়ের মাথার কাছে পাথরে গর্ত করে আশ্রয় নিল। জলের ধারাও ক্রমশ বাড়তে বাড়তে তার মধ্যে ঢুকে, পাথর ভেদ করে, বেরিয়ে যাবার পথ পেল। হ্রদও কালক্রমে শুকিয়ে গেল। মানুষও এখানে এসে বসবাস সুরু করল। পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে টিয়াপাখিদের বাসা করা এবং তাই ভেদ করে হ্রদের জল বার হয়ে যাওয়া নিছক কল্পনা হলেও, এটা বাস্তবিক ঠিকই যে এই ভ্যালির চারপাশ ঘিরে পাহাড়ের দুর্ভেদ্য পাঁচিল রয়েছে, আর এখান থেকে জল-নিকাশের ঐ এক জায়গাতেই মাত্র পাহাড়ের মধ্যে ফাঁক বা ছিদ্রপথ আছে। ফলে, চারিদিকের পাহাড় থেকে যতগুলি নদী, নালা, জলধারা এই ছেছারি উপত্যকার সমতলক্ষেত্রে নেমে এসেছে,— সবই ঐদিকে বহে গিয়ে ওধার দিয়ে বেরিয়ে গেছে নদীর আকার ধরে। এখানকার প্রধান নদী হল বুড়হা, তার আবার প্রধান উৎস হল লোধ ফলস্, সেই কারণে তার আর একটা নাম বুড়হা ফলস্। যেটা আমরা আজ

দেখতে চলেছি। আর উত্তর দিকে যে ধার দিয়ে আমরা পাহাড় থেকে নামলাম,—তারই কিছুদূরে পাহাড়ের মাঝে সেই ফাঁক বা George—যেখান দিয়ে ঐ বুড়হা নদী বার হয়ে যাবার পথ পেয়েছে,—জায়গাটার নাম হল সুগ্‌গা বাঁধ,—'সুগ্‌গা' মানে টিয়াপাখি, জানেন নিশ্চয়! তাদেরই স্মৃতি ধারণ করে রয়েছে ঐখানে নদীর সঙ্কীর্ণ গিরিপথ।

বলি, পাহাড়ে-ঘেরা বিস্তীর্ণ উপত্যকা সম্পর্কে এ ধরনের কাহিনী হিমালয়েও শোনা যায়,—যেমন, কাঠমাণ্ডু ভ্যালিও এককালে হ্রদের জলে ভরা ছিল, সেই জলরাশি পাহাড়ের প্রাচীর ভেদ করে মুক্তি পায় এক মহর্ষির প্রভাবে। হিমালয়ের কাহিনীতে স্বভাবতই মুনি-ঋষি, আর এই আদিবাসীদের অঞ্চলে গল্পে আসে টিয়াপাখি। কিন্তু ঐরকমের নামকরণের নিশ্চয় কিছু কারণ এবং হয়ত, নিদর্শনও ওখানে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে। এ যাত্রায় জায়গাটা দেখা হল না, সুগ্‌গা বাঁধ দেখার জন্যে আবার পালামৌ আসতেই হবে দেখছি।

এখন আমাদের জীপ সোজা সমতল পথে ছুটে চলে। কয়েকটি ছোট ছোট নদী ও জলধারা পার হই। অনেকগুলি পাকা ঘরবাড়ি দেখা দেয়। মহুয়াডাঁর পৌঁছে যাই। ডালটনগঞ্জ থেকে ৬৪ মাইল দূরত্ব। এ অঞ্চলের বেশ জমজমাট লোকালয়। পুলিশ বিভাগের সদর দপ্তর। সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাকা বাড়ি অনেকগুলি—জেলা পরিষদের ডাকবাংলো, ডাকঘর, ছাত্রাবাস-সংযুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়, ভেষজশালা, পশুচিকিৎসাগার, গ্রন্থাগার প্রভৃতি তো আছেই, তা ছাড়া, সারা বিহার প্রদেশে যে আটটি নানার্থক কেন্দ্র multipurpose block স্থাপিত হয়েছে, এখানে তারই একটি রয়েছে। একটি বড় হাসপাতাল তৈরি করারও আয়োজন চলছে। অদূরে লালরঙের এক অট্টালিকার চূড়া দেখে জিজ্ঞাসা করি, গির্জার মত ও-বাড়িটা দেখতে, ওটা কার?

চট্টরাজ বলেন, ঠিকই ধরেছেন, ওটা গির্জাই।

আশ্চর্য হই,—'এই সুদূর বনজঙ্গলের রাজ্যে—অত বড় গির্জা!'

চট্টরাজ জানান, শুধু আকারেই বড় নয়, চূড়াটা প্রায় নব্বুই ফুট উঁচু। তৈরিও হয়েছে গত শতাব্দীতে। রোমান ক্যাথলিক মিশনের উদ্যোগে। ডিহন নামে এক পাদ্রী সেই সময়ে এখানে আসেন। আদিবাসীদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার সুরু করেন। সেই সঙ্গে জনহিতকর বহু কাজও করে গেছেন তিনি। স্থানীয় অধিবাসীরা যারা ধর্মান্তরগ্রহণ করেছিল,—তাদেরই সাহায্যে তিনি ঐ গির্জা তৈরি করেন,—এ-জেলায় ঐ একটি মাত্র গির্জা। তা ছাড়া দুটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছেছারি ভ্যালির অন্যত্রও আরও স্কুল চালাচ্ছেন পাদ্রীরা। মহুয়াডাঁরের মিশনারি স্কুল তো শুনেছি এখন অতি সুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়,—ছাত্রদের বসবাসেরও তেমনি সুব্যবস্থাও। এই সব কারণে ও প্রচারের ফলে অনেক ওরাওঁ আদিবাসী ক্রিশ্চান হয়ে গেছে;—কয়েক হাজার! স্বাধীনতার পর এখানে আদিমজাতি সেবামণ্ডল প্রতিষ্ঠানটিও ভাল কাজ করছে। আদিবাসী ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস তো খুলেছে, তা ছাড়া এখানকার বাসিন্দারা যাতে আত্মনির্ভর জীবনযাপন করতে পারে সেই উদ্দেশে বহু চরকা তাদের বিতরণ করেছে। তার সুফলও সুস্পষ্ট। এখানে তারা নিজের জমিতে তুলার চাষ করছে, সেই চরকায় সুতা কাটছে, নিজেদের কাপড় জামা নিজেরাই তৈরি করে ব্যবহার করছে।

আমি বলি, হিমালয়ের গ্রামবাসীদেরও দেখেছি, নিজেদের ভেড়ার লোম থেকে উল তৈরি করে সবাই যে-যার পোশাক-আদি নিজেরাই তৈরি করে।

চট্টরাজ জানান, আরও একটা ভাল কাজ এখানে হচ্ছে,—একটা শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে, সেখানে জামা কাপড় সেলাই, বেত ও বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরি করা, কাঠের কারিগরি, লোহার ও টিনের জিনিসপত্র তৈরি, মৌমাছি পালন, মধুসংগ্রহ প্রভৃতি কাজকর্ম আদিবাসীদের শেখানো হয়,—এরা উৎসাহ সহকারে সে-সব কাজ শিখছেও,—সরকারী রিপোর্টে পড়েছি।

আমি মন্তব্য করি, পাহাড়ে-ঘেরা এই জায়গাটা দেখলেই মনে হয়, এখানে এই সুদূর অরণ্যরাজ্যেও বনদেবী যেন সযত্নে বুকের কাছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

চট্টরাজ বলেন, জায়গাটা আগে বাইরের জগৎ থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন ছিল, বর্ষাকালে এখানে

আসা সম্ভব হোত না। এখন কোয়েলের ওপর পুলটা হয়েছে, পাকা রাস্তাও চলে এসেছে,—ডালটনগঞ্জের সঙ্গে সারা বছর যোগাযোগ থাকছে।

আমি বলি, একদিক থেকে সে-যোগাযোগ ভাল হতে পারে ঠিকই, কিন্তু যেমন এই ভ্যালির নদীগুলো পাহাড়ের ছিদ্রপথ দিয়ে বাইরে বেরোবার সুযোগ পেল, তেমনি ঐ রাজপথ দিয়ে আবার এখানকার উৎপন্ন ফসল ইত্যাদি চতুর ব্যবসাদারদের হাতে উজাড় করে বেরিয়ে না যায়,—আধুনিক জগতের জটিল সমস্যাদিও ঐ পথ দিয়ে এখানে ঢুকে এখানকার শান্তিময় জীবন দুর্বহ না করে তোলে।

চট্টরাজ বলেন, মহুয়াডাঁরের আর এক আকর্ষণ,—দুটি রমণীয় স্থানে এখান থেকে যাওয়া যায়,—এক, নেতারহাট হাঁটাপথে ১৪ মাইল; অপরটি যেখানে আজ এখন আমরা চলেছি—সেই লোধ ফল্‌স। অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল জায়গাটা দেখবার। গাড়িটা কোথাও দাঁড় করিয়ে পথের সন্ধানটা নেওয়া যাক,—একজন গাইডও পেয়ে গেলে ভালই।

লোকালয়ে প্রবেশ করে সেইমতই খোঁজ-খবর করা হয়।

এখান থেকে লোধ ফল্‌স-এর দূরত্ব ঠিকই শোনা গিয়েছিল—মাইল বারো। জীপ যেতে পারে—তবে পথের শেষ অংশ কাঁচা রাস্তা—বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ী পথ। এক আদিবাসী বেশ উৎসাহ দেখাচ্ছিল, তাকেই গাইড করে সঙ্গে নেওয়ার প্রস্তাব করতেই সে রাজী হয়,—মোটর চড়ে যাবে, সে-আকর্ষণও তার কাছে কম নয়!

সে বলে, ঐ চায়ের দোকান রয়েছে। আপনারা চা-টা কিছু খাবেন তো? খেয়ে নিন। আমি এখুনি তৈরি হয়ে আসছি।

আমাদের চা-পান শেষ হবার আগেই সে ফিরে আসে। তার তৈরি হয়ে আসা মানে,— কাঁধে একটা টাঙ্গী নিয়ে ফিরে এল দেখি!

শহর ছাড়িয়ে গাড়ি আবার চলে। পথের উপর ছোট নদী। পুল নেই। পথ থেকে নেমে জীপ সহজেই পার হয়ে যায়। গাইড সগর্বে জানায়, এর ওপর পুল তৈরি করার কথা হচ্ছে।

গাড়ি হু হু করে এগিয়ে চলে সমতল পথ দিয়ে। মনে আমাদের নিশ্চিন্ত আনন্দবোধ। বারো মাইল এইভাবে যাওয়া, কতটুকুই বা সময় নেবে? দূরের নীলাভ গিরিশ্রেণী নিকটবর্তী হতে থাকে। পাহাড়ের গায়ে গাছপালার শুষ্ক বিবর্ণ বর্ণ, পাথরগুলির বিচিত্র আকার, তাদের অঙ্গভরা আঁকাবাঁকা নানান রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে,—কোথাও রোদের উজ্জ্বলতা, কোথাও বা গভীর কালো ছায়া। গাইড জানায়, ঐ পাহাড়ের মাথায় ওর্‌সাপাট—একেবারে ময়দান। ওখানে গ্রাম আছে। পাহাড়ের অপর দিকে মধ্যপ্রদেশ—সুরগুজা জেলা।

চট্টরাজ বলেন, ওপরে ওখানে bauxite বকসাইট পাওয়া গেছে শুনেছি!

গাইড গম্ভীর হয়ে শুনে মন্তব্য করে, ওপরে সরকারী অফিসারদের তাঁবু পড়েছে,—কী সব কাজ হচ্ছে। পাহাড়ের কাছাকাছি এসে একটা গ্রামের ভিতর দিয়ে পথ। মোটরের শব্দ শুনে ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে পথের পাশে। কৌতূহলী নয়নে তাকিয়ে থাকে। গাইড মুখ বার করে তাদের হুকুম করে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে।—সে এখন মোটর সওয়ারী।

কিন্তু, গাড়ি চড়ে আসার গর্ব ভেঙে যায় তার পরই। গ্রাম ছাড়িয়ে আসতেই জীপ-এর এঞ্জিনের আবার যন্ত্রবিভ্রাট হয়। ড্রাইভার চেষ্টা করেও সারাতে পারে না,—কয়েক হাত গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। ·

চট্টরাজ দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন, তাই তো! এতদূর এসে এইখানে বিভ্রাট ঘটল!

বলি, আর গাড়ির ভরসায় না থেকে বাকি পথটুকু হেঁটেই চলা যাক,—এখানে পথের ওপর অযথা দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট হবে,—কতদূর আর এখান থেকে?

গাইড বলে, কোশখানেক হবে—ঐ ওদিকে গিয়ে ঘুরে পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে ঢুকতে হবে,—চলুন না, পৌঁছে যাবেন এখনই।

চট্টরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এখনও দু মাইল! হেঁটেই তা হলে যেতে হবে?—খাসা আসা যাচ্ছিল মোটরে! চলুন তা হলে—পদযুগল-যানেই স্টার্ট দেওয়া যাক,—গাইড! তুমি, বাবা, টিফিন কেরিয়ারটা বার করে হাতে ঝুলিয়ে নাও;—আমাদের বড়েখাঁড়ের মিস্টার সিং কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সুদূরদর্শী

ব্যক্তি,—জোর করে তাঁর টিফিন কেরিয়ারে পরোটা, সব্জি বানিয়ে দিয়ে দিলেন,—বললেন, কোথায় কখন পৌঁছুবেন তার ঠিক নেই,—খিচুড়ি করে খাওয়ার সময় পান কিনা কে জানে? সঙ্গে নিয়ে যান এগুলো।

এখন অগত্যা গাড়ি ছেড়ে রেখে, টিফিন কেরিয়ার সঙ্গে নিয়ে, আমরা হাঁটা সুরু করি।

প্রথম দিকে কিছুদূর খোলা মাঠ। বাঁদিকে পাহাড়ও সমান্তরালে যেন সঙ্গে সঙ্গে এগুতে থাকে। ক্রমে জঙ্গল সুরু হয়। পথ বেঁকে গিয়ে পাহাড়ের কাছাকাছি আসে। এই পর্যন্তই হয়ত মোটর আসতে পারে। এখান থেকে বনের মধ্যে দিয়ে পায়েহাঁটা সরু পথ। শুধু বনই নয়, পাহাড়ও যেন হাত পা মেলিয়ে ছড়িয়ে বসে, তারই ভুজপাশে আবদ্ধ হই। দুই পাশেই পাহাড়। ডানদিকে কিছু নীচে গাছপালার ফাঁকে দেখা যায় পাহাড়ী নদীর খাত,—শিলাকীর্ণ পথে কলস্বনা জলধারা বহে চলে। আমরাও এগিয়ে যাই নদীর গতির উল্‌টা মুখে,—পাহাড়ের গা দিয়ে,—উঁচু নীচু অসম পথ ধরে। দুপাশের গাছগুলি ডালপালা মেলে যেন পথরোধ করতে চায়। সঙ্কীর্ণ পথ, একে একে এগিয়ে যাওয়া। পাহাড় ও বনের চিরবাঞ্ছিত সঙ্গ মনে অসীম আনন্দ দেয়।

হঠাৎ পিছনে চট্টরাজের ক্লিষ্ট কণ্ঠ শুনি, ও বাবা গাইড। অত পা চালিয়ে চলিস না— সঙ্গে সঙ্গে থাক,—পাথরে পা হড়কাবে যে, বাবা!

চেঁচিয়ে বলি, কোন ভয় নেই, শুকনো পাথর,—ধীরে ধীরে পা ফেলে চলে আসুন। ঐ দেখুন, সামনে আকাশে মাথা তুলে প্রকাণ্ড পাহাড়,—ওরই ওপর ওর্‌সাপাট। জলের শব্দও এবার শোনা যাচ্ছে,—ফল্‌স-এর নিকটে এসে পড়েছি নিশ্চয়। সাবধানে এই পথটুকু পার হয়ে আসুন।

জলের শব্দ ক্রমশ বাড়তে থাকে। উচ্ছ্বসিত স্বরে যেন কাছে ডাকে।

পথের শেষ অংশ শিলাস্তূপের মধ্যে দিয়ে। পাথর থেকে পাথরে পা রেখে খানিকটা নেমে যাওয়া। সতর্ক হয়ে পায়ের দিকে নজর রেখে নামা,—এ-বয়সে পা ভাঙলে সহজে জোড়া লাগবে না! কিন্তু, সামান্যই কয়েক ফুট নীচু। নেমে দাঁড়াতেই সম্মুখে অপূর্ব দৃশ্য! মনে হল, কে যেন চোখ বেঁধে নিয়ে এসে হঠাৎ ছেড়ে দিল—চোখের বাঁধন খুলে—হিমালয়ে!

সুমুখেই পথরোধ করে দাঁড়িয়ে প্রসারিত বাহু আকাশচুম্বী গিরিরাজ। তবে, এখানে তাঁর শিরোশোভা তুষারকিরীট নেই, সেই রাজমুকুট ধারণে তাঁর অধিকারও নেই। প্রায় চার হাজার ফুট মাত্র উচ্চতা। কিন্তু, পালামৌর অরণ্যরাজ্যে দেখায় উত্তুঙ্গ, বিশাল। শুধু পাহাড়ের গুরুগম্ভীর শোভা নয়,—সামনে ঈষৎ বাঁদিকে তাকিয়ে দেখি, সেই পর্বতশীর্ষ থেকে প্রচণ্ড বেগে, উচ্ছলিত কলনাদে, ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপুল জলরাশি—বহুনীচে পাহাড়ের পাদদেশে!

এই লোধ ফল্‌স বা বুড়হা ফল্‌স! ৪৬৮ ফুট উঁচু জলপ্রপাত। বিহার প্রদেশের সম্ভবত সর্বোচ্চ প্রপাত। পাহাড়ের উপর থেকে পড়ার মুখে প্রকাণ্ড একটা কালো পাথর বাধা সৃষ্টি করায় জলপ্রবাহ দ্বিধারায় বিভক্ত হয়,—একটি প্রধান,—স্ফীতকায়, অপরটি অপেক্ষাকৃত মাঝারি আকৃতি।

গাইড বলে, বর্ষাকালে ঐ দুই ধারা এক হয়ে যায়।

হয় কিনা জানি না, তবে নীচে নেমে উভয় ধারা মিলিত হয়, এখনই দেখা যায়।

চট্টরাজ প্রশ্ন করে, গ্রীষ্মকালে জল এমন থাকে?

গাইড উত্তর দেয়, বারো মাসই এখানে প্রচুর জল থাকে,—তবে, হাঁ, গরমকালে ও বর্ষায় কিছুটা জল কমবেশি তো হবেই। এই তো এখন গ্রীষ্মকালেই জলের কত তোড়,—দেখছেন!

শুনে ভাবি, এই বিপুল জলরাশি—এমন অনিরুদ্ধ জলপ্রপাত,—একি কেবলমাত্র ওর্‌সাপাটে বৃষ্টিপাতের সঞ্চিত জলভারেই পরিপুষ্ট? অথবা, হয়ত এই নদীর উৎসমুখে perpetual springs অবিরাম নির্ঝরের অবস্থিতিও সম্ভব,—কেউ কি তার সন্ধান নিয়েছে?

গাইড সঠিক উত্তর দিতে পারে না, শুধু বলে, পাহাড়ের মাথা থেকে সব জল এই পথে নেমে আসছে। উপরে গ্রাম আছে, প্রকাণ্ড ময়দানও।

এখানে দাঁড়িয়ে এখন সেই জলপ্রপাতের অপরূপ সৌন্দর্যই দেখি। মনে হয়, কোন্ পর্বত দুহিতা যেন, প্রাসাদ মিনারের অলিন্দ থেকে তাঁর শুচিশুভ্র উত্তরীয়খানি ঝুলিয়ে দিয়েছেন, দোলায়মান বস্ত্রখানি প্রচণ্ড বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। কিন্তু ঐ মূল প্রপাতের প্রলম্বিত দীর্ঘ ধারা দুইটির প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের

মাঝেই প্রকৃতির এই রম্যস্থানের বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ নয়। ঝরনার ধারা পাহাড়ের কোলে, নীচে শিলাস্তূপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে নেমে এসে বঙ্কিমগতিতে আরও এগিয়ে আসে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তারই সামনে—মাত্র কয়েক হাত দূরে—আবার সবেগে আরও নীচে লাফিয়ে পড়ে—পাহাড়ের গা বেয়ে। সৃষ্টি হয়, অপর আর এক মনোহর ক্ষুদ্র প্রপাতের,—cascade-এর! উচ্চতা নিতান্ত নগণ্য নয়,—প্রায় ত্রিশ ফুট। এখানেও জলরাশি ত্রিধারায় বিভক্ত। নীচে যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সেখানে স্ফটিকস্বচ্ছ এক জলকুণ্ড। শিলাখণ্ডে ঘেরা, পাহাড়ের কোলে, ডিম্বাকৃতি হ্রদের মতন। আনুমানিক বিস্তৃতি—একদিকে চল্লিশ ফুট, অপরদিকে ষাট ফুট। এতক্ষণ 'যৌবনমদমত্তা' তরঙ্গিনী যেন শূন্যে বুক ভাসিয়ে,—সেই কোথায় উপর থেকে এই নীচে লাফিয়ে পড়ে, শ্রান্তদেহে স্নিগ্ধ কোমল কুণ্ডের শান্ত কোলে, ক্ষণিক স্থির হয়ে বিশ্রাম নেয়,—তার পর আবার অপর প্রান্তের শিলারাশির বাহুবাঁধন এড়িয়ে,—বহতা নদীরূপে ধীরে ধীরে আরও নেমে যায়—অস্ফুট মধুর কলতান তুলে,—অদূরে তরুচ্ছায়াঘন বনান্তরালে। সেই সুনির্মল জলকুণ্ডের ধারে, গাছের ছায়ায়, শীকরসিক্ত শিলাসনে স্থির হয়ে বসি। প্রপাতের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। বিশ্বস্রষ্টার বিরাট রূপসৃষ্টির মহিমা উপলব্ধি করি।

ভাবি, এই একই জলপ্রবাহ,—নীচে নেমে গিয়ে যখন সমতলে বহে চলে,—কী শান্ত, উদার তার মূর্তি—শুভদা, অন্নদা, প্রাণদায়িনী। আর, পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে-পড়া সেই জলধারারই এখন ঐ সম্মুখে দেখি,—কী প্রচণ্ড উদ্দাম উচ্ছ্বাস,—সংহারিণী ভৈরবীমূর্তি। প্রশস্ত শ্যামল প্রান্তরের বুকে যে স্রোতস্বিনী বৈষ্ণবী, সেই নদীই দুস্তর বন্ধুর গিরিপথে শক্তিধারিণী রুদ্রাণী!

হঠাৎ চট্টরাজের কণ্ঠস্বর সজাগ করে তোলে। অদূরে আর একটা পাথরের উপর তিনি বসে,—জলে পা ডুবিয়ে। বলেন, জল তেমন ঠাণ্ডা নয়, এ তো আর আপনার হিমালয়ের বরফ-গলা নদী নয়,—খাসা আরামে স্নান করা চলত,—খুব ভুল হয়ে গেছে,—গামছা, কাপড় সব সেই জীপ-এ রয়ে গেল। বেহারে আজন্ম রয়েছি,—অথচ, এমন সুন্দর জায়গা,—এতকাল নাম শুনলেও, কল্পনা করতে পারি নি,—এতখানি ভাল হবে! এখানে আসারও তেমন কিছু অসুবিধে নেই। ডালটনগঞ্জ থেকে বাস-এ একদিনেই মহুয়াডাঁর পৌঁছানো যায়।

আমি সানন্দে সায় দিয়ে বলি, সেই ভুল শোধরাতে আমাকেও আবার আসতেই হবে। শুধু এখানেই নয়,—সেই সুগ্গা বাঁধও দেখতে,—কেমন করে এই নদী মুক্তিপথ পেল,—টিয়াপাখির কোটরগুলির সুযোগ পেয়ে!

আজ এখন আহার সেরে ফিরে চলি মনের সেই অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে। স্মরণে আসে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতার পঙ্ক্তি :

"The sounding cataract
Haunted me like a passion : the tall rock,
The mountain, and the deep and gloomy wood,
Their colours and their forms, were then to me
An appetite."

গিয়েছিলামও তাই পুনরায় পালামৌর জঙ্গলে,—সুরম্য সেই লোধ ফল্স-এ এবং অতি বিচিত্র সেই সুগ্গা বাঁধ-এ।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ ১ ॥

ভিন্ন ভিন্ন স্বরসংযোগে সঙ্গীতের রাগিণীর রূপান্তর ঘটে। ভ্রমণ-সঙ্গীভেদেও যাত্রার সুরলহরীর প্রভেদ হয়। আমার তৃতীয়বার পালামৌ বেড়ানোর সাথী পাই শেষকিরণকে। অনেকদিন পরে ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ তার সঙ্গে যোগাযোগ। কী ভাবে,—তাও বলি।

১৯৭৯ সাল। জানুয়ারির শেষ। কলকাতায় গিয়েছি। মার্চের শুরুতে আবার যাত্রা করার কথা। এবার গন্তব্য দাক্ষিণাত্যে। হঠাৎ মনে পড়ে, প্রায় আট বছর হতে চলল, সেই যে আবার পালামৌ যাওয়ার বাসনা ছিল,—এখনও তো সে-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল না। সেই লোধ্-ফল্স্। অদেখা সেই সুগ্গা বাঁধ,—যেখান দিয়ে বুড়্হা নদী টিয়াপাখির কোটরগুলির সুযোগ পেয়ে গিরি-প্রাচীর ভেদ করে মুক্তিলাভ করে! এখনও তো মাঝে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস,—এতদিন কলকাতা শহরে বাস! অসম্ভব। এই ফাঁকে পালামৌ ঘুরে এলেই হয়। শেষকিরণ এখনও রয়েছে পালামৌতে,—শোণনদের ধারে জাপলায়, যেখান থেকে তারই সঙ্গে গিয়েছিলাম সেই গুপ্তায়—গুপ্তেশ্বর গুহায়! কিন্তু কয়েকমাসই হয়ে গেল, তার খোঁজখবর নেই। চিঠিপত্রও লেখে না। মনে রেখে, সব কাজকর্ম সময়মত করা, যেন তার কাছে, পায়ে বেড়ি-পরার অস্বস্তি! পালামৌ যাচ্ছি। জানিয়ে আজই লিখব নাকি একটা চিঠি?

সহজা দরজার নিকটে পায়ের শব্দ। চমকে ফিরে তাকাই। আশ্চর্য হই। একী। মূর্তিমান। সশরীরে সামনে হাজির।

এ যে আলাদীনের প্রদীপ ঘষা! আচার-আচরণে নয়, আকারে দৈত্যের মত চেহারা নিয়ে দেখা দিল। সেই দীর্ঘ সবল দেহ,—অনেকদিন পরে দেখা, মনে হল যেন শরীরের মধ্যভাগে ঈষৎ স্থূলভাবের প্রকাশ, স্পোর্টস্ম্যান, মাউনটেনিয়ার যেন আবরিত হতে চলেছে!

প্রণাম করে বলে, বাড়ি গিয়েছিলাম,—কয়েকমাসই বোলপুরেও আসতে পারি নি। আজ কলকাতায় এসেই শুনি, আপনি এসেছেন এখানে,—কতদিন দেখা হয় নি আপনার সঙ্গে। বকবেন না যেন, চিঠিপত্র লেখা হয় নি বলে। জানেনই তো আমার স্বভাব। তার ওপর ছুটিছাটা পাই না,—ফ্যাক্টরিতে নানা গোলযোগ, হাঙ্গামা—হরদম লেগেই আছে—।—যেন, সেই সব অশান্তির স্মৃতি তার চোখে মুখে ঘন ছায়া ফেলে। বলি, বোসো, স্থির হয়ে। তোমার আজ আসবার কারণটা আমার কাছেই শোনো। (চোখ কুঁচকে সে আমার দিকে তাকায়) এইমাত্র তোমাকেই যে স্মরণ করছিলাম! (মুখে তার মৃদু হাসি ফোটে) আবার একবার পালামৌ যেতে চাই। সব ব্যবস্থা করতে পারবে?

সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সোজা হয়ে বসে। বলে, নিশ্চয়ই। চলুন,—কবে যেতে চান চলুন। কতকাল একসঙ্গে কোথাও যেতে পারি নি। পালামৌর জঙ্গলের আনাচকানাচও এখন আমার নখদর্পণে। যখনই দু-চারদিন কাজের ফাঁক পাই, তখনই চলে যাই সেখানে। জঙ্গলে জঙ্গলে একা একা ঘুরি, পাহাড়ে চড়ি। কী করব বলুন? হিমালয়ে তো যাওয়া হচ্ছে না ক'বছরই—

হেসে বলি, সেই কারণে এই সুযোগে দেহও কিছু ভার সংগ্রহ করছে,—পালামৌর পাহাড়ে ঘুরে কি আর তোমার শরীর ফিট থাকে?

কথাবার্তা তৎক্ষণাৎ পাকা হয়ে যায়। দুদিন পরে সে জাপলায় ফিরে গিয়েই সব ব্যবস্থা করে জানাবে,—আমিও যেন তখনই রওনা হই।

সেইমত তার কাছ থেকে খবরও চলে আসে। আমিও ট্রেনে যাত্রা করি। ডেহেরি-অন-শোণ-এ তার সঙ্গে মিলিত হই।

সেখান থেকে সে মোটরে জাপলায় নিয়ে যায়। দুদিন সেইখানেই বসিয়ে রাখে। তার আদর-যত্নে ও সুব্যবস্থায় আরামে থাকলেও তাকে জানাই, মার্চের প্রথমেই আমার দাক্ষিণাত্যের প্রোগ্রাম, রেলের টিকিট কেটে এসেছি,—এখানে এমন আরামে থাকলেও মন বনে যেতে উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

সে আশ্বাস দেয়, কোন চিন্তা করবেন না,—দুদিন লাগছে আমার এখানকার কাজকর্ম গুছিয়ে দিয়ে যেতে। তারপর, এক সপ্তাহ ঘুরব আপনাকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে। সেখানকার বাংলোর পারমিট সব

আনিয়ে রেখেছি। ঐ অঞ্চলের ডি. এফ্. ও., কনসারভেটর—সবারই সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় রয়েছে। তা ছাড়া, ঘুরতে যাব এখান থেকেই মোটরে করে—তার ব্যবস্থাও করছি।

হঠাৎ তার শোবার ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলেই গম্ভীর স্বরে নিজের পরিচয় দেয়,—সুরানা বলছি। কে? ও! আচ্ছা! আচ্ছা! না, না,—ওর জন্যে ব্যস্ত হবার কারণ নেই। আমি যাচ্ছি এখনই!

রিসিভার রেখে বলে, একজন লুকিয়ে ফ্যাক্টরি থেকে মাল সরাচ্ছিল। লোকটা ধরা পড়েছে। এখনই ঘুরে আসছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে আসব। ততক্ষণ বরং নতুন এই পাহাড়ের বইগুলো আনিয়েছি দেখুন। পড়েছেন কিনা জানি না,—হিলারীর এই আত্মচরিতটাও রয়েছে।

বলেই, তখনই জামা পরে বেরিয়ে যায়। পাশের বারান্দায় মোটরবাইক রাখা। নামিয়ে নিয়ে স্টার্ট দেয়। ভট্ ভট্ শব্দ তুলে গাছের আড়ালে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়।

তাকিয়ে থাকি। ভাবি, এই সেই শেষকিরণ। কুয়ারি গিরিপথের আমার সহযাত্রী। চটপটে, ছটফটে,—যৌবন-উচ্ছল! স্থির হয়ে কিছুক্ষণও বসতে পারে না। গুছিয়ে পরিপাটি সব কাজকর্ম করতে পারলেও হঠাৎ কখন কোন্ কাজের কথা ভুলে বসে তারা ঠিক থাকে না,—সেই শেষকিরণই এখন হয়ে উঠেছে এক দায়িত্বশীল অফিসার। এখানে আসা অবধি লোকমুখে শুনছি, তারই নিখুঁতভাবে সকল কাজ করার সুখ্যাতি। সবারই সঙ্গে মেলামেশা, মিষ্ট ব্যবহার। যখন-তখন লোক আসে তার খোঁজে,—'সুরানা সাহাব হ্যায়?'—ঠিক জমিতে বুনলে মানুষের গুণেরও কেমন ফসল ফলে, দেখি।

খাসা কেটে যায় কোথা দিয়ে দুটো দিন। সকালে দুপরে ফুলভরা বাগানের ধারে, বড় বড় ছায়াতলে, সবুজ লন-এর ওপর, আরাম-চেয়ার বসে; বিকালে সুবিস্তীর্ণ বালুচরের বুকে বয়ে-যাওয়া শোণনদের নীলজলে নৌকা করে ঘুরে!

॥ ২ ॥

২০শে ফেব্রুয়ারি। সকাল সাড়ে সাতটায় যাত্রা শুরু হয়। বড় মোটর। অথচ, যাত্রী আমরা দুজন। খালি গাড়ি খাঁ খাঁ করবে ভেবে শেষকিরণ তার এক স্থানীয় তরুণ বন্ধুকেও আমন্ত্রণ করে সঙ্গে নিয়েছে, দু-তিনদিন ঘুরে তিনি বাস্-এ ফিরে আসবেন, বেশিদিন বাইরে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া, সঙ্গে চলেছে শেষকিরণের বিশ্বস্ত এক 'কমবাইন্ড হ্যান্ড',—ভাল রাঁধতে জানে, মালপত্র দেখেশুনে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেও জানে, হিসেব করে গাড়িতে তুলতেও ভুল হয় না। সেই কারণে, মালের বোঝাও বেড়েছে অনেক। খাবার-দাবার, ফল সব্জি ভরতি দু-তিনটে ঝুড়ি, প্যাকিং কেস, কিছু বাসনপত্র, স্টোভ, শীতকাল তাই দুটো কম্বল, স্লিপিং ব্যাগও, দুজনের সুটকেস,—গাড়ির পিছনের ক্যারিয়ার ভরপুর, মাথার উপরেও মাল বাঁধা হয়েছে। দেখে বলি, এই বিরাট আয়োজন মাত্র ক'দিনের বনযাত্রায়? মনে পড়ে? হিমালয়ে তুমি ঘুরতে কেমন ঝাড়া হাত-পা, পিঠে শুধু রুকস্যাক, তারই মধ্যে প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিস, পথে যেখানে যা পাওয়া যেত, তাই তৃপ্তিভরে খাওয়া! আর এখানে একি ইলাহী কাণ্ড!

শেষকিরণ কৈফিয়ৎ দেয়, এখানে চলেছি এত বড় গাড়ি করে, মালপত্র নেবার জায়গাও রয়েছে,—কোথায় কি পাই না পাই,—অভাব হবে না কোন কিছুর।

হেসে বলি, কিন্তু স্বভাবটি যে এইভাবেই হারিয়ে যায়!—এত বড় গাড়ি না নিয়ে জীপ একটা যোগাড় হলে ভাল ছিল না? পাহাড়ে ও জঙ্গলের পথে ঘোরা এ-গাড়িতে সুবিধে হবে?

শেষকিরণ স্বীকার করে, ঠিকই বলেছেন, এ-গাড়িতে ঘুরতে—বিশেষত পাহাড়ের চড়াইপথে উঠতে হয়ত অসুবিধে হতে পারে। সেই ভাবেই অপর একটা গাড়িরই ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ অন্য কাজে সেটা চলে গেল। যাক,—চলুন তো, দেখা যাক, এ-গাড়ির মেজাজ কোথায় কেমন থাকে! আজ একেবারে চলে যাব—মহুয়াডাঁরে। সেখানে ডাকবাংলোতে রাত কাটানো যাবে।

কিন্তু, গাড়ির স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ ঘুচে যায়, যাত্রা শুরু করার মিনিট পনেরোর মধ্যেই। সেখানটায় পথ গিয়েছে আশপাশে কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝ দিয়ে। শেষকিরণ উৎসাহ সহকারে দেখায়, ঐ যে ওদিকে পাহাড়গুলো দেখছেন,—বেশি দূর নয় এখান থেকে, মাত্র মাইল চার-পাঁচ হবে,

তারই মধ্যে একটি মনোরম জায়গা আছে, চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা ভ্যালি, পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে একটা জলধারা—চমৎকার ছোট জলপ্রপাতের রূপ ধরে,—একেবারে নির্জন শান্ত জায়গা,—নিকটে কোন গ্রাম পর্যন্ত নেই,—এমন কি এখানকার লোকজন এর অস্তিত্বই জানত না। আমিই একবার একা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আবিষ্কার করি—তারপর থেকে কত লোককে ওখানে নিয়ে গেছি—বনভোজন করার এখন ওটা প্রসিদ্ধ স্থান হয়েছে,—পালামৌর জঙ্গল থেকে ফিরে এসে আপনাকেও নিয়ে যাব,—যাবেন নিশ্চয়?—

তার এই উচ্ছ্বসিত আমন্ত্রণের মাঝেই—পথের সামান্য একটু চড়াই উঠতে গিয়ে গাড়ির এঞ্জিন গেল থেমে। শেষকিরণের গলার সুর বদলে যায়,—এই রে! যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল! এখনই এইটুকু উঠতেই এই অবস্থা!

বলি, এখন আর ভাবা মিছে, চল, নেমে একটু পায়চারি করা যাক, দূর থেকে দাঁড়িয়েই পালামৌর লিভিংস্টোনের আবিষ্কৃত দৃশ্য দেখি।

ভাগ্যক্রমে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। মিনিট পনেরো পরেই এঞ্জিন আবার সজাগ হয়। ছত্তরপুর হয়ে পৌঁছে যাই নটার মধ্যেই ডালটনগঞ্জে। জাপলা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল।

শেষকিরণও বলে, এখানে মোটরের ট্যাঙ্ক ভরতি করে পেট্রোল নিতে হবে। আলাদা টিনও এনেছি, তাতেও ভরে রাখব,—জঙ্গলে ঢুকে তো আর তেল পাব না। তেল নিয়েই এখনই আবার রওনা হওয়া। পেট্রোল পাম্প স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায়। অফিস ঘর থেকে দুজন দেখতে পেয়ে বেরিয়ে আসেন। হাসিমুখে সাদর অভ্যর্থনা জানায়, আরে! সুরানা সাহাব! আইয়ে, আইয়ে। ক্যেয়া হালচাল?

শেষকিরণও ভারিক্কিচালে গাড়ি থেকে নামে, মুখে হাসি ফুটিয়ে, হাত বাড়িয়ে তাদের সঙ্গে করমর্দন করে, কুশল খবর নেয়। মুখ ঘুরিয়ে ড্রাইভারকে আদেশ দেয়, পাম্প-এর কাছে গাড়ি লাগাও,—এঁদের বলে, ট্যাঙ্কটা জল্‌দি ফুল করে দিতে বলুন,—এখনই রওনা হব, কদিনের জন্যে জঙ্গলে ঘুরতে চলেছি।

কিন্তু সুরানা সাহাবের মর্যাদা যতই থাকুক, এঁরা তাঁকে তেল দিতে পারেন না। তাঁদের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। শুষ্ক মুখে তখনই জানান, আরে সাহাব!—বলব কী? কাল বিকেল থেকে সারা শহরে বিজলী নেই! সব পাম্প বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে,—দেখছেন না? কত গাড়ি দাঁড়িয়ে!

"ওঃ! তাই দেখছি এত গাড়ির ভিড়! হাত-পাম্প নেই? ড্রামে আলাদা রাখা তেল নেই?"

কোথাও কিছু নেই। এত বড় শহরে দীর্ঘ সময় ধরে ইলেকট্রিক থাকবে না,—একি কেউ ভাবতে পেরেছিল?

আজ সারাদিনেও ইলেকট্রিক পাওয়া যাবে কিনা বিজলীদপ্তরের কর্তৃপক্ষরা সন্দেহ রাখেন।

শেষকিরণ হন্তদন্ত হয়ে আরও কয়েক জায়গায় চেষ্টা করে,—সর্বত্রই সমান দুরবস্থা। সারি সারি মোটর, ট্রাক—সব দীর্ঘ প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে,—তীর্থক্ষেত্রে কাকের ঝাঁকের মতন।

এদিকে ঘড়ির কাঁটা দাঁড়িয়ে থাকে না। এই সুযোগে তার গতি যেন দ্রুততর হয়। ঘণ্টাদুই ঘোরাঘুরি করে অতি সামান্য তেল এক জায়গায় সংগ্রহ হয়।

শেষকিরণ বলে, বেলা এগারোটা বেজে গেছে। আর দেরি করা চলে না। চলুন যাওয়া যাক—ছিপাদোহর পর্যন্ত। সেখানে আমাদের একটা দপ্তর রয়েছে, হয়ত তেলও কিছু মজুদ থাকতে পারে।

ভবিষ্য-প্রাপ্তির আশায় আমাদের মনের আকাশে ভাবনার মেঘ কেটে যায়। বনযাত্রার আনন্দ ও উৎসাহ আবার উদ্দীপিত হয়। শেষকিরণ মৃদু হাসিমুখে গুঞ্জন করে ঃ "Hope Springs eternal in the human breast;/Man never is, but always to be blessed."

মোটর এগিয়ে চলে বেতলা অভিমুখে। শেষকিরণকে গল্প করি, গতবারও পালামৌ যাত্রায় এই ডালটনগঞ্জে পৌঁছে সারারাত্রি এখানেই কাটাতে হয়;—তবে, এবারকার মত পেট্রোলের সন্ধানে নয়,—বেতলায় এক পাগলা হাতির উপদ্রব হওয়ায়! আমরা আসার ক'দিন আগেই ঐ জঙ্গলে পথের ওপর এক বুনো হাতি দিনের বেলায় বেরিয়ে পড়ে, অজানিতে হঠাৎ এক ট্রাক এসে তার পেছনে ধাক্কা মারে,—স্বভাবতই সে ক্ষেপে যায়—

শেষকিরণ বলে, ও! সেই ঘটনাটা? আমিও শুনেছিলাম। তারপরই বুঝি আপনি এসেছিলেন? এর পরেও ওখানকার আর একটা হাতির ঘটনা জানেন না?

কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকাই। সে বলে, বেতলার জঙ্গলের আশেপাশে কয়েকটা গ্রাম আছে, নজর করেছেন নিশ্চয়? সে-অঞ্চলে চাষের জমিও আছে, দেখে থাকবেন। সেবার এক হাতির পাল ফসল খেতে সেইখানে চলে আসে। গ্রামবাসীরা টাঙ্গী, সড়কি লাঠি নিয়ে, মাদল, টিন ইত্যাদি বাজিয়ে হৈ হৈ করে তাড়া করল। হাতিগুলোও হুড়মুড় করে ছুটে পালাতে থাকল। সেই দলে একটা ছোট্ট বাচ্চাও ছিল। সে-বেচারী বড়দের সঙ্গে ছুটতে পারবে কেন? পেছিয়ে পড়ে দল থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। গ্রামবাসীরাও তখনই তাকে ধরে ফেলে। দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। ডি. এফ্. ও.-র নিকট খবর চলে যায়। শ্রীজগদীশ মিশ্রজি ডি. এফ্. ও. জীপ-এ সেই গ্রামে চলে এলেন। সেই জীপ-এই হাতির বাচ্চাটাকে কোনমতে চাপিয়ে ডালটনগঞ্জে নিয়ে গেলেন, নিজের বাংলোর এলাকায় সযত্নে তাকে রেখে লালনপালন করতে লাগলেন। তার নামকরণও হল,—গৌরী! কী সুন্দর বাচ্চাটাকে দেখতে ছিল! দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করত। কাজেকর্মে ডালটনগঞ্জে এলেই আমি তাকে দেখতে যেতাম। নাম ধরে ডাকলেই সে তখনই তার নাদুস-নুদুস কচি দেহ দুলিয়ে কাছে চলে আসত। মাথার ওপর ছোট্ট শুঁড়টি তুলে কেমন নমস্কার জানাত,—ছোট শিশুর কচি হাত তুলে নমস্কারের মতন! বাড়ির ছেলেমেয়েদের সে ছিল খেলার সাথী।—চমৎকার পোষ মেনেছিল। মিশ্র পরিবারেই যেন একজন,—এইভাবেই বেড়ে উঠছিল। বছরখানেকেরও ওপর তাকে নিয়ে বেশ আমোদ-আহ্লাদেই কেটে যায়। তারপর হঠাৎ তার কী এক রোগ দেখা দিল। স্থানীয় ডাক্তাররা দেখে ঔষধ দিলেন, কিছুই উপকার হল না। পাটনা থেকেও ডাক্তার এলেন। কত রকম চিকিৎসা হল,—কিন্তু রোগ ধরা পড়ল না। গৌরী মারা গেল। হাতির বাচ্চা তো নয়, যেন পরিবারেরই এক আদরের শিশুর মৃত্যু ঘটল। বাড়ির ছেলেমেয়েদের সে কী কান্না!—বাইরের লোকজনেরও চোখে জল। মিশ্রজিও গভীর শোকের কাতরতায় কিছুকাল অসুস্থ হয়ে পড়েন। গৌরীর দেহ কবর দেওয়া হয় সেই বাংলোরই এলাকায়। এখনও ওদিকে গেলে মনটা আমার কেমন হয়ে যায়।

স্বরাক্রান্ত কণ্ঠে কথা শেষ করে শেষকিরণ চুপ করে। আমারও চোখের ওপর ছবি ফুটে ওঠে,—দশ বছর আগে যেবার প্রথম বেতলায় আসি, বুনো হাতিদের সেই স্নানের দৃশ্য! সে-দলেও এক বাচ্চা হাতি ছিল। তাকে নিয়ে অন্য হাতিদের কী আন্তরিক আদর আহ্লাদ! শুধু মানবশিশু নয় জীব-জন্তুদেরও বাচ্চামাত্রেই অন্তরের ভালবাসা জাগিয়ে তোলে। এমন কি, উদ্ভিদ জগতেও তরুলতার নবীন কচি পাতারও কী অপূর্ব বাহার, সুস্নিগ্ধ কমনীয়তা! কাউকে টেনে ছিঁড়তে দেখলে মনে লাগে।

শেষকিরণ অস্ফুটে মন্তব্য করে, কী জানি, বাচ্চাটাকে বন থেকে ধরে না নিয়ে এলে হয়ত তার অকাল-মৃত্যু ঘটত না।

আমি বলি, তা কি কেউ বলতে পারে কোথায় কিভাবে কার মৃত্যু ঘটবে? বনের মধ্যেও বাচ্চাদের কত দুর্ঘটনা ঘটে। তোমাদের এই পালামৌ জঙ্গলের এক অফিসারের লেখা বিবরণীতে পড়েছি—তুমিও দেখেছ হয়ত— জানো নিশ্চয়, হাতির দলে বাচ্চা হাতি থাকলে বাঘ সেটিকে মেরে খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টায় থাকে? সেই দলকে লুকিয়ে অনুসরণ করে, সুযোগ খোঁজে, কী করে বাচ্চাটাকে মারতে পারবে। নাদুসনুদুস হাতির একটা বাচ্চা,—কোনমতে মারতে পারলে ব্যাঘ্রমহাশয়ের ক'দিনের খোরাক হয়ে যায়। সেই বছর মার্চ মাসে বড়েষাঁড়ের এক জায়গায় এক হাতির বাচ্চা দল থেকে খানিক পিছিয়ে পড়ায় একটা বাঘ তাকে আক্রমণ করে। বেচারী চিৎকার করে ওঠে। অন্য হাতিরাও তখনই ফিরে আসে। বাঘকে তাড়া করে। বাঘ বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় বটে, কিন্তু তারই মধ্যে বাচ্চার শুঁড় অঙ্গচ্যুত করে দিয়েছে। হাতির শুঁড় যাওয়া—মানুষের হাত হারানোর সমান। সে-বেচারী তারপর না পারে খাদ্য তুলে খেতে, না পারে জলপান করতে। অন্য হাতিরা তাকে কাছে কাছে রেখে খাওয়ানো-দাওয়ানো করালেও তিনদিন পরে বড়েষাঁড়ের আর-এক অঞ্চলে বেচারী মারা গেল। বাঘও তক্কেতক্কে ছিল, তিনদিন ধরে তার মাংসভক্ষণ করল! বনের মধ্যেও জীবজগতে কত সুখ দুঃখ বিপদ থাকে!

গাড়ির বাইরের দিকে তাকাই,—আরে! এ যে বেতলায় এসে গেলাম! ঐ তো ডাইনে ওদিকে ট্যুরিস্ট লজ! আরও কয়েকটা বাড়ি-ঘর তৈরি হয়েছে দেখছি। রাস্তার বাঁদিকেও নতুন কয়েকটা ঘর উঠেছে। শেষকিরণকে প্রশ্ন করি, বাঁদিকের ঐ নতুন লম্বা ঘর—'হল্'-এর মতন—ওখানে কি আছে?

শেষকিরণ কিসের যেন খোঁজে বাইরের দিকে তাকায়, বলে, বলছি,—গাড়িটা দাঁড় করাতে বলি আগে।

গাড়ি দাঁড়ায়। লম্বা বাড়ির নিকটে অন্য একটা বাড়ির সামনের রাস্তায় একজন ফরেস্ট গার্ড—বনরক্ষীকে দেখে শেষকিরণ হাত নেড়ে ডাকে। খোঁজ নেয়, মিস্টার সিং আছেন?

"না,—তিনি বনের মধ্যে গেছেন, ফিরতে বিকেল হবে।"

পকেট থেকে ডট পেন ও কাগজের টুকরো বার করে খসখস করে কি লিখে তার হাতে দেয়, বলে, সিংজি ফিরলেই তাঁকে এটা দিয়ো।

সে হাতে নিয়ে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলে, আপ্‌কো হাম পছান্তে হ্যায়,—আপ সুরানাজি! শেষকিরণের মুখে আত্মতৃপ্তির মৃদু হাসি ফোটে। বলে, ঠিক চিনেছ,—সিংজি এলেই এটা দিয়ো—জরুরী আছে।

অল্প এগিয়েই রাস্তার ওপর লক গেট। সেখানেও গাড়ি দাঁড়াতে চৌকিদার গুমটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, শেষকিরণকে দেখে চিনতে পারে। তাকেও শেষকিরণ বলে দেয়, সিংজিকে যেন জানায়, আমরা এসে গেছি ও গার্ডের কাছে একটা চিঠি রেখে যাওয়া হয়েছে।

চৌকিদার গেট খোলে। গাড়ি ছিপাদোহরের দিকে এগিয়ে চলে।

এতক্ষণে শেষকিরণ সীট-এ ঠেসান দিয়ে বসে আমার দিকে তাকায়। বলে, সিং হলেন এই বনের মধ্যে সর্বময় কর্তা। বনের শুধু যত্ন নেওয়া নয়, বনকে প্রকৃতই ভালোবাসেন এবং বন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা গভীর। মানুষটিও অতি ভদ্র। তাঁকে জানিয়ে দিলাম, আমাদের বেতলাতে 'বুকিং' আছে পরশু দিনের। কিন্তু বনে পৌঁছুতে আমাদের ক'ঘণ্টা আজ দেরি হয়ে গেল। পেট্রোল পাওয়া সম্পর্কেও কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে। ওদিকে সব ঘুরে যদি বেতলায় ফিরতে একদিন দেরি হয়ে যায়,—তাই, পরের দিনও আমাদের এখানে থাকবার একটা ব্যবস্থা যেন করে রাখেন। বেতলাকে লোকের ভিড় ক্রমশ খুব বেড়ে চলেছে। কী দ্রুতহারে বাড়ছে শুনবেন?—

বলেই সীটের পিছনে রাখা তার 'ব্রীফ-কেস' ব্যাগটি টেনে নেয়, খুলে কয়েকটা ছাপা পুস্তিকা বার করে, তাই থেকে পড়ে শোনায়,—

তো এত সব সরকারী ব্যবস্থা। কিন্তু, আমি শুনেছি, কিছুকাল থেকে কয়েকজন গভর্নমেন্ট অফিসাররাও তাদের মিটিং ও কনফারেন্স করতেও এখানে সদলবলে মিলিত হচ্ছেন। বন সম্বন্ধে কোন আলাপ-আলোচনা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, বন সম্পর্কে তাঁদের কোন আগ্রহ বা কৌতূহলও নেই। এমন রমণীয় নির্জন পরিবেশে, অমন আরামপ্রদ পরিপাটি ব্যবস্থাদির সুযোগ সুবিধাই তাঁদের আকর্ষণ। ফলে, সত্যকার পর্যটকদের অসুবিধা হয়, স্থানাভাবও ঘটে। এই সব ভেবেই সিংকে আগে থেকে জানিয়ে দিলাম।—ওঃ, ভাল কথা! আপনাকে এতক্ষণ বলাই হয় নি,—এবার বেতলায় রাত কাটানোর জন্যে 'বুকিং' করেছি কোথায়, শুনবেন? ট্রি-হাউস-এ—বৃক্ষনীড়ে!

শুনে বলি, সেই কমলদহের ধারে ট্রি-টপ্‌স-এ? সেখানে তো রাত কাটানোর ব্যবস্থা সেবার দেখি নি। আচ্ছাদন-দেওয়া প্ল্যাটফর্ম মত। তা হলেও গায়ে কম্বল জড়িয়ে সারারাত জেগে বসে দেখা যাবে,—জন্তুরা কে কখন কীভাবে আসে সরোবরে জল খেতে। জিম করবেটের সেই Tree Tops-এর মতন! শেষকিরণ ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে আড়চোখে আমার দিকে তাকায়, মুচকি হাসিমুখে বলে, না, না, সেখানে নয়। ওখানে জন্তুজানোয়ার দেখার সুবিধা থাকলেও রাত কাটানোর আয়োজন নেই। আপনি শোনেন নি তাহলে?—ট্যুরিস্ট লজ-এরই বিরাট এলাকার মধ্যে—ঐ বাড়ির কিছু দূরে—প্রকাণ্ড মাঠটার একপাশে, মস্ত এক গাছের ওপর, সুন্দর নতুন একটা ঘর তৈরি হয়েছে—তারই মধ্যে আমরা থাকব। এখন আর কিছু বলব না, নিজে গিয়ে দেখবেন, কী চমৎকার সব ব্যবস্থা!

আমিও আর কৌতূহল প্রকাশ না করে বলি, ঠিক আছে। নিজের চোখেই তখন দেখা যাবে,—বৃক্ষনীড়ে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতাও লাভ হবে। কিন্তু ঐ নতুন হল্ মতন বেতলায় পথের পাশে দেখলাম, সেটা কী, তা তো এখনও শুনলাম না।

—ও-ঘরটাও বেতলায় ফিরে এসে দেখতে যাবেন,—ওটা একটা মিউজিয়াম—যাদুঘর। নতুন করা হয়েছে। এই জঙ্গলের জন্তুদের মতদেহ যা সংগ্রহ করতে পেরেছে, সেই সব 'স্টাফ্' করে, তাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য লিখে, সাজিয়ে রাখা হয়েছে, একটা বিরাট অজগর সাপও আছে, ভাইপার, রাসেল, করেত

ইত্যাদি তো আছেই। দারুণ বিষাক্ত সব সাপ, একবার কামড়ালে আর রক্ষে নেই।

আমি বলি, সাপে কামড়ানোর একটা গল্প শুনবে? নিছক গল্প নয়, প্রকৃত ঘটনা। মধুপুরে ঘটেছিল। বাবা সেখানে বাড়ি তৈরি করেন ১৯১২ সালে। সেই সময়ের ঘটনা। তখনও বাড়ির সুমুখে, বাগানে ঢোকবার মুখে লোহার গেট লাগানো হয় নি। গেটের থামের জন্যে পাঁচিলের দুপাশে ইঁট জড় করে রাখা, —তাতে একটা সাময়িকভাবে কাঠের বেড়া লাগানো। সে-সময়ে সাঁওতাল পরগণায়,—এবং মধুপুরেও, সাপ দেখা যেত প্রায়ই। তাই বাবার কড়া হুকুম ছিল,—যে যেখানেই যাক, সন্ধ্যের আগে সকলকে বাড়ি ফিরতেই হবে—এমন কি চাকরবাকরদেরও। সেদিন ঠিক সন্ধ্যের মুখে,—সবে অন্ধকার হচ্ছে,—বাবার এক চাপরাশী কোথায় বাইরে কাজে গিয়েছিল, দেখা গেল সেই কাঠের বেড়া সরিয়ে বাড়ির দিকে আসতে গিয়ে হঠাৎ ছুটে এসে ধাপ বেয়ে রোয়াকে উঠে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। সবাই অবাক। রোয়াকে দু'পাশে পাথরের সীটে বাবা ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা বসে,—তাঁদেরই সামনে দিয়ে, কাউকে সমীহ না করে, তার এইভাবে ছুটে যাওয়া,—ব্যাপার কী? তার পরেই সে মালীদের সঙ্গে নিয়ে লণ্ঠন ও লাঠি হাতে (সেকালে তখন ইলেকট্রিক ছিল না)—বাগানের সেই বেড়ার দিকে তাড়াহুড়ো করে নেমে গেল।

জিজ্ঞাসা করায় শুধু জানাল,—সাপ! সাপ!

বেড়ার নিকটে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি চলল, কিন্তু সাপ কি আর ততক্ষণ অপেক্ষা করে? ইটের স্তূপের ফাঁকে কোথায় লুকিয়েছে!

কিন্তু, ব্যাপার হল কি, ইতিমধ্যে সেই চাপরাশী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

ধরাধরি করে তাকে বাড়ির ভেতর এনে শোয়ানো হল। তখন শুনলাম, চাপরাশী এসেই মালীদের জানিয়েছিল, তার পায়ে সাপে কামড়েছে। তবুও, সেই সাপের সন্ধানেই সে ছুটেছিল মালীদের নিয়ে। তার সংজ্ঞাহীন অবস্থা দেখে সকলেরই তখন ঘোর দুশ্চিন্তা। ডাক্তারকে খবর পাঠানো, পায়ের ওপরদিকে শক্ত বাঁধন দেওয়া,—এ সব তো হলই,—ওদিকে মালীও ছুটল সাঁওতাল ওঝাকে ডেকে আনতে।

অল্প পরেই লোকটি এলও। ভাল করে পায়ের ক্ষতস্থান কোথায়, পরীক্ষা করলে। আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখছি। তারপর, সে তার ঝোলা থেকে বার করলে একটা ছোট্ট পাথর,—সাদা রঙ বলেই মনে হল। বললে, যদি বিষধর সাপ হয়, পাথরটা ক্ষতস্থানে লাগালেই আটকে থাকবে এবং কিছু পরে রঙ বদলে পড়ে যাবে। চোখের সুমুখে দেখলাম, হলও তাই। কিছুক্ষণ পরে পাথরটা নীল রঙ হয়ে খসে পড়ে গেল। ধীরে ধীরে চাপরাশীরও জ্ঞান ফিরে এল। সকলের মুখে আবার হাসিও ফুটল। কলকাতা থেকে এসে বেঘোরে লোকটা মরতে বসেছিল। পাথরটা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করা সত্ত্বেও ওঝা কোনমতেই প্রকাশ করলে না, ওটা কি পাথর ও কোথায় পাওয়া যেতে পারে।

শেষকিরণ মন্তব্য করে, অদ্ভুত ব্যাপার বলতে হবে!

আমিও স্বীকার করি, সত্যিই আশ্চর্য চিকিৎসা দেখেছিলাম সেই।—তারপর হেসে বলি, অবশ্য চাপরাশীর সেরে ওঠার হয়ত আরও গূঢ় কারণ ছিল,—চাপরাশীর নামই যে ছিল—নাগেশ্বর!

শেষকিরণ হেসে তাকায়। বলে, ফিরে এসে মিউজিয়াম-এ দেখবেন ঐ সব বিষাক্ত সাপদের চেহারা, —তাদের অবশ্য মৃত অবস্থায়, এই ভরসা।

ফিরে এসে দেখেওছিলাম মিউজিয়ামের বিভিন্ন নিদর্শনগুলি। সংগ্রহশালাটি ভালই গড়ে উঠেছে। ক্ষুদ্রাকার হলেও বেতলার অরণ্যরাজ্যের প্রাণিকুলের কিছুটা প্রত্যক্ষ পরিচায়ক। জীবিত দেখতে না পেলেও এই বনের জীবজন্তু পক্ষী সম্বন্ধে ধারণা হয়।

এখন মোটরে বসে বেতলা ছাড়িয়ে ছিপাদোহর যেতে শেষকিরণ যেন সেই সব অরণ্যচারী জীবজন্তুর কথা স্মরণ করেই বলে, পালামৌর জঙ্গলে নানা জাতির বন্য পশুপক্ষী বাস করার কারণ কী, জানেন? কনসারভেটরের কাছে শুনেছি, জন্তুরা আপন আপন প্রাণধারণের ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনবোধ ও রুচিভেদে বসবাসের উপযোগী স্থান ও পরিবেশ নির্বাচন করে থাকে। পালামৌর বনাঞ্চলে সেই রকম চার ধরনের বাসভূমি habitat রয়েছে। এই বনের একটা অংশ dry deciduous গাছপালার শুষ্ক পর্ণমোচী পরিবেশ,—সে সব জায়গায় শীতকালে গাছের সব পাতা ঝরে পড়ে। দ্বিতীয় হল,—moist miscellaneous, সে অঞ্চলে পাঁচমিশালী হরেকরকম গাছ আগাছা, তাই কিছুটা ভিজে স্যাঁৎসেঁতে ভাব।

তৃতীয় শ্রেণীর হল,—স্যাঁৎসেঁতে শালের জঙ্গল। চতুর্থ রকম যা, তাকে বন বলা চলে না, কিন্তু বনেরই অঙ্গবিশেষ—savannah। কথাটা আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে প্রয়োগ হয়,—ঘাসে ছাওয়া তরুবিরল উন্মুক্ত প্রান্তর,—মাঠের মধ্যে ক্বচিৎ এখানে-ওখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ দু-একটা বড় গাছ। এ বনে অবশ্য এ ধরনের ফাঁকা মাঠ খুব বেশি নেই। যেখানে আছে,—সেই সব খোলা জায়গাতেই দেখেছেন দলে দলে হরিণ চরছে, ময়ূর ঘুরছে। এ ছাড়া, এখানে চারপাশে ছোট বড় পাহাড়ও রয়েছে এবং অনেক পাহাড়ের মাথায় শিলাস্তূপ থাকায় জন্তু জানোয়ারের আশ্রয় উপযোগী বহু গুহাও আছে। বাঘ ভালুকের সেখানে থাকবার ভারি সুবিধে। ওঃ এই দেখুন, একটা আদত কথাই আপনাকে এখনও জানানো হয় নি। পালামৌতে যে Operation Project Tiger—ব্যাঘ্র যোজনার কাজ শুরু হয়েছে, এই জঙ্গলেই তার যে একটা কেন্দ্র খোলা হয়েছে, তা জানেন?

আমি তখনই স্বীকার করি, জানি না। ব্যাঘ্র যোজনা পরিকল্পনার কথা শুনি বটে, তবে ভারতের কোথায় কীভাবে এর কাজ হচ্ছে তার খবরাখবর রাখি না।

শেষকিরণ বিজ্ঞের মত বলে, তাহলে আমি যেটুকু জানি, বলি শুনুন। এই আমার ফাইলে তারই কিছু বিবরণ এনেছি।

তারপর কাগজপত্র বার করে কি যেন তার মনে ওঠে, মৃদু হেসে মন্তব্য করে, এটা একটা মজার ব্যাপার,—দেশে মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে, তাই নিয়ে কত সমস্যা, কত দুশ্চিন্তা,—আবার অন্য দিকে বাঘের বংশ ধ্বংস হতে বসেছে তাই নিয়েও মানুষের এখন দুর্ভাবনা। ১৯২০ সাল নাগাদ ভারতে—ভারত অবশ্য তখন খণ্ড-বিখণ্ড হয় নি, বর্মাও ছিল তারই মধ্যে—বাঘের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার।

পাচ্ছে বুঝুন। তাই তাদের সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই Project Tiger Operation। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যেখানে বাঘের বাস,—এই ব্যাঘ্র যোজনার সুরু হয়েছে। ব্যাঘ্র প্রকল্প জঙ্গলের নামগুলিও শোনাচ্ছি :

আসামে—মানস ব্যাঘ্র প্রকল্প ক্ষেত্র
বিহারে—এই পালামৌ
উড়িষ্যায়—সিমলাপাল
উত্তর প্রদেশে—করবেট পার্ক
রাজস্থানে—রণথম্ভোর (বা সোয়াই মাধোপুর)
মধ্যপ্রদেশ—কান্‌হা
মহারাষ্ট্রে—মেলঘাট
কর্ণাটক—বান্দিপুর
পশ্চিম বাঙলায়—সুন্দরবন

বিহারে এই পালামৌ জঙ্গল মনোনয়ন করার কারণ, এই প্রদেশের মধ্যে এখানেই সব চেয়ে বেশি বাঘের বাস,—সারা বিহারের ৮৫টার মধ্যে ৪১টা পালামৌ জেলাতে। সেইজন্যেই এই জেলার দক্ষিণাংশে ৯২৮ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে যে Reserved Forest, সেইটেই ১৯৭৪ সালের জুন মাস থেকে পালামৌ Tiger Reserve—পালামৌ ব্যাঘ্র প্রকল্প ক্ষেত্ররূপে নির্ণীত হয়েছে। এই নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ সম্পর্কে দৃষ্টি রাখা হয় বিশেষ করে তিনটি বিষয়ে,—প্রথম, ঐ অঞ্চলের বাঘের সংখ্যা এমন যে তাদের বংশের প্রসার হতে পারে। দ্বিতীয়, সেখানে বাঘের খাদ্য অপর যে-সব বন্য প্রাণী, তাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত। তৃতীয়, নিকটে কোন গ্রাম বা জনবসতি থাকবে না, গৃহপালিত কোন পশু, গরু, মহিষ এবং আশেপাশে কোথাও চরবে না। বাঘের হাতে তাদের প্রাণনাশেরও যেমন ভয় আছে, তেমনি গৃহপালিত পশুদের মধ্যে যে সব ছোঁয়াচে রোগ হয় তা বাঘেদের বা অন্যান্য বন্য প্রাণীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও থাকে। এই সব বিচার বিবেচনা করে ব্যাঘ্র ক্ষেত্রকে দুভাগে ভাগ করা হয়—একটা buffer area, আর একটা core area। Core area-তেই ঐসব নিয়মকানুনের কড়াক্কড়ি বেশি—কেননা সেইখানে বাঘ বেশি থাকার কথা,—ঐ জায়গাতেই হল ব্যাঘ্র প্রকল্পের মজ্জা। পালামৌর এই জঙ্গলে ১৯৭৪ সালে এখানকার বাঘগুলি যে দু'শ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে সাধারণত ঘুরে বেড়াত,

Tiger Project-এর সেইটে core বা মজ্জা বলে ঘোষিত হয়েছে। বড়েষাঁড় থেকে সে-অঞ্চলে পাওয়া যায়। বিশেষ অনুমতি ছাড়া সেখানে কারও ঢোকা নিষেধ। আমি সেখানে যাবার অনুমতিপত্র সঙ্গে এনেছি,—গিয়ে দেখা যাবে।

পুলকিত হয়ে বলি, চমৎকার হবে। তুমি দেখছি সব দিক ভেবেচিন্তে মনে রেখে কাজকর্ম করতে বেশ শিখে গেছ। এখন গাড়ির পেট্রোলের ব্যবস্থাটা হলেই যে হয়। ১৯৭৪ সালে এখানে যোজনা ক্ষেত্র হবার পর বাঘের সংখ্যা কিছু বাড়ল?

শেষকিরণ উৎসাহিত হয়ে উত্তর দেয়, অবশ্যই এবং যথেষ্ট। সে-সময়ে ঐ অঞ্চলে বাঘের সংখ্যা ছিল বাইশ,—চারটে বাচ্চা সমেত।

—বনের মধ্যে বাঘের সংখ্যা গোনা সম্ভব হয় কি ভাবে জানো নাকি?

—একটা পদ্ধতি শুনেছি—আপনিও জিম করবেটের বই-এ পড়েছেন নিশ্চয়—তাদের পায়ের ছাপ দেখে। জগতে দুটো মানুষের বুড়ো আঙুলের রেখার ছাপ যেমন সম্পূর্ণ একরকম হয় না, বাঘদেরও পায়ের ছাপ তেমনই প্রত্যেকেরই বিভিন্ন। শুধু তাই নয়, সেই ছাপ দেখে বাঘ বা বাঘিনী তাও জানা যায়, বয়সও অনুমান করেন বিশেষজ্ঞরা। এই পালামৌ জঙ্গলে বাঘের সংখ্যা কত কমে আসছিল জানেন? ১৯৩৪ সালে নিকলসন সাহেব যখন এখানকার বনের অধিকর্তা, সে সময়ে প্রতি ৯ বর্গ কিলোমিটারে

প্রশ্ন করি, এত হ্রাস পাওয়ার কারণ কি?

—প্রধান কারণ,—অবৈধ শিকার—। তা ছাড়া গ্রীষ্মকালে বনে আগুন লাগত প্রায়ই। জঙ্গলের গাছ কাটার ফলে বনও লোপ পাচ্ছিল, জীবজন্তুর পানীয় জলেরও অভাব হয়ে আসছিল।—এখন, এ সকলের প্রতিরোধের যথোচিত ব্যবস্থাদি হয়েছে,—কড়া পাহারাও বসেছে।

আমি বলি, যাক, এ বছর তাহলে বাঘ তুমি আমাকে দেখাচ্ছই, কেননা, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ও-জঙ্গলে বাঘ এখন কিলবিল করছে। কিন্তু, এইভাবে বাঘের সংখ্যা বেড়ে চললে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার মতন বনের পশুরাজ্যেও যে কঠিন সমস্যাবলীর উদ্ভব হতে পারে,—অর্থাৎ সেই স্থানাভাব, খাদ্যাভাব,—বাঘের খাদ্য তো বনের নিরীহ জীবজন্তু! তাদের প্রাণনাশ হয়ে বংশ বিলোপ পাবে।

শেষকিরণের মুখে বিজ্ঞের মৃদু হাসি ফোটে। বলে, ঠিক এই প্রশ্নটাই কনসারভেটরকে আমিও করেছিলাম। তিনি কি বলেন, জানেন? এ-বিষয়ে তাঁরা খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। প্রথমত সাধারণ মানুষের একটা ভুল ধারণা আছে। প্রাণহারক হিংস্র জন্তুর মধ্যে প্রধান হল—বাঘ,—সন্দেহ নেই। কিন্তু, তারাও অযথা প্রাণিহত্যা করে না। তাদের শিকারের মুখ্য কারণ হয়—ক্ষুন্নিবৃত্তি। গৌণ কারণ— রাগ, বিরক্তি, ভয়, আত্মরক্ষা,—তার অবকাশ ঘটে এখানে কমই। বনের মধ্যে বাঘের খাদ্য হল,— মৃগ ও গোজাতীয় পশু এবং শূকর। শূকরের সংখ্যা বনে প্রচুর। বছরে বছরে বাড়ছেও তেমনই। তাই বাঘ পেটভরে খেয়ে গেলেও নিঃশেষ হবার সম্ভাবনা নেই। তবে, দাঁতালো বুনো শূকর বাঘকেও কাবু করে দেয়। তাই, তৃণভোজী অহিংস প্রাণীর প্রতিও বাঘের ক্ষুধিত দৃষ্টি থাকে। কিন্তু, তাদের সংখ্যা অরণ্য সংরক্ষণের ফলে প্রতি বছরেই বাড়ছে। এখানে তো মানুষের শিকার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হিসাব করে দেখা গেছে, বাঘের সংখ্যার অনুপাতে বরং সেইসব প্রাণীদের সংখ্যা আরও বেশি হারে বেড়েছে,—তাদেরও লোপ পাওয়ার কোনই আশঙ্কা নেই। এ-সম্পর্কে তথ্যগুলি সংগ্রহ করে এনেছি, এই দেখুন না—বলে পুস্তিকাখানি আমার দিকে এগিয়ে দেয়। আমি বলি, আমার আবার চশমা বার করতে হবে। তুমি পড়ে শোনাও।

সে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি পড়ে শোনায় : চিতল-হরিণ সারা বনে আগে ছিল প্রায় দশ হাজার,—১৯৭৭ সালে শুধু ব্যাঘ্র-ক্ষেত্রেই গোনা হয়েছে—প্রায়—২০,৫০০। কী অনুপাতে বাড়ছে দেখুন! সম্বর রয়েছে প্রায় ৯৫০। বুনো শূকর—প্রায় বাইশ হাজার। এরা আশেপাশে গ্রামের খেতের প্রচুর ক্ষতি করে। বাঘ এদের মারলে লোকেদের উপকারই হয়। ভাল কথা, বাঘের খুব প্রিয় খাদ্য শূকর-বাচ্চা,—মনে আছে, হিমালয়ে আমাদের সেই কুয়ারি গিরিপথে যেতে বাঘ ও শূকর দেখার ঘটনা?

বলি, খুব মনে আছে। পাহাড় বেয়ে নামতে, পথের ওপর থেকে বাচ্চাসমেত শূকর দল দেখতে পেয়ে, বাচ্চাগুলোকে মেরে খাবার লোভে আমাদের পোর্টারদের পাথর ছোঁড়া,—আমরা বারণ করে থামিয়ে দিই।—তারপরেই হঠাৎ দেখা যায়, একটা প্রকাণ্ড বাঘও পালাচ্ছে, পোর্টারদের হইচই শুনে,—বোঝা গেল, সেও এসেছিল সেই বাচ্চা খাবার লোভে,—চোখের ওপর সে-দৃশ্য এখনও ভাসছে।

শেষকিরণ চুপ করে যায়। গাড়ির জানালার বাইরে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বলি, কী হল? বাকি অংশ পড়ে শোনাও!

সে গম্ভীরমুখে জানায়, কোথায় গেল সে-সব দিন। আর কি ফিরে আসবে? পড়ে রয়েছি, এই জাপলায়—চাকুরির ঘানিতে জোড়া হয়ে—

উৎসাহ দিয়ে বলি, যাবে,—আবার সেই হিমালয়েও ঘুরবে। এখন এই বনের অন্য জন্তু কত কী আছে তার সংখ্যা শুনি।

সে পড়ে যায় ; ১৯৭৮ সালে বলেছি, বাঘ—৩২টা, তার মধ্যে বাঘ হল ১১টা, বাঘিনী—১৫, বাচ্চা—৬টা।

প্যানথার-চিতা	—	৬০
হাতি	—	৩৭
ভালুক	—	৩০০
গউড়	—	৫৫০
নীলগাই	—	১২০
কোটরা	—	৮০০
হায়না	—	৬০
বন্যকুকুর	—	৮০
বনবেড়াল	—	২০০
শেয়াল	—	২০০

আমার কাছে এই দুটো বই-এর বিবরণীতে কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যার কিছু গরমিল দেখছি,—হয়ত কোনটা সারা পালামৌ জঙ্গলের, কোনটায় হয়ত শুধু ব্যাঘ্রক্ষেত্রের! তা হোক, কত বিভিন্ন প্রকার ও কত সংখ্যক জানোয়ার এই বনে রয়েছে। প্রায় দু'শ রকম পাখিও এ বনে দেখা যায়।

বলি, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, আমরা চলে এলাম—ছিপাদোহরে। এই তো রেলের লাইনের ওপর দিয়েই পার হচ্ছি। তোমাদের দপ্তরটা কোথায়? চল, দেখা যাক, তৈল-ভাগ্য আমাদের প্রসন্ন হয় কিনা!

লোকালয়ে প্রবেশ করে বাঁদিকে একটা সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা বাড়ির পিছনদিকে শেষকিরণদের কোম্পানির বন-দপ্তর। সেখানে আরও একটা মোটর ও জীপ দাঁড়িয়ে। শেষকিরণ আশ্বস্ত হয়ে বলে, যাক, এখানকার জীপটা রয়েছে দেখছি,—আর একটা মোটর কার?

গাড়ি থেকে নেমে অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে কোম্পানির এখানকার ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা। ব্যস্তসমস্ত হয়ে তিনি অফিসঘরের দিকে চলেছেন। সাহেবী কায়দায় করমর্দন করে নিজের নাম জানান, এস. এস. রমণ।

রহমন, না রমণ—ঠিক বুঝতে পারলাম না। তরুণ অফিসার। ফরসা, সুশ্রী চেহারা। ফিটফাট বেশভূষা। ভদ্র আচরণ। হাসিখুশি ব্যবহার, শেষকিরণকে সাদর আহ্বান জানান, আপনি আসছেন খবর কালই পেয়েছি। আজ একটু আগে সদর থেকে আমার ওপরঅলাও ইন্‌স্‌পেকশনে এসেছেন—তাই একটু ব্যস্ত রয়েছি,—চলুন ঘরের ভেতর।

শেষকিরণ বলে, কে এসেছেন? মিঃ চৌধুরী? আরে, তাঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় আছে যে!

ঘরের মধ্যে সবাই সমবেত হই। চৌধুরীও জানতেন আমাদের আসবার প্রোগ্রাম। জিজ্ঞাসা করেন, ডালটনগঞ্জে তেলের ব্যবস্থা করতে পারলেন? আজ আসবার সময় ওখানকার যা পরিস্থিতি দেখে এলাম,—সব গাড়ি অচল হয়ে পড়ে!

শেষকিরণ বলে, ওখানে তো কোনমতেই যোগাড় হয়নি,—এখন রমণ যদি এখানে কিছু দিতে পারেন!

রমন দুঃখ প্রকাশ করে জানান, আমারও এখানে ড্রাম একেবারে শূন্য। দেখুন না বাইরে গিয়ে!

—তা হলে?

রমণ হেসে বলেন, তাহলেও ব্যবস্থা একটা কিছু করতেই হবে। তেলের না হলেও—যাতায়াতের। এখানে এসে আপনাদের বনে ঘোরা হবে না,—এ তো হয় না।

তারপর, স্থির হয়,—রমণের কয়েকটা কাজ আছে মহুয়াডাঁরে, তাছাড়া কাল গারু থেকে রুদ-এ তাঁকে যেতে হবে—মজুরদের টাকা দেবার জন্যে। অতএব, আজ চৌধুরী সাহেব এখানকার কাজ সেরে ফিরে গেলেই আমরা রমণের সঙ্গে তাঁর জীপ-এ মহুয়াডাঁর রওনা হব। আমাদের মোটর আবার ডালটনগঞ্জ ফিরে যাবে। সেখান থেকে কাল সকালে পেট্রোল ভরে গাড়ি গারুতে চলে আসবে। আমরা ফিরতি পথে গারুতে রমণের জীপ ছেড়ে দিয়ে আমাদের মোটরে উঠব, বেতলায় চলে আসব।

সেইমত যাত্রাও করা হয়। তবে ছিপাদোহরে ঘণ্টা দুই অপেক্ষাও করতে হয়, মিঃ চৌধুরী কাজ সেরে না ফিরে যাওয়া অবধি।

রমণের সঙ্গে তাঁর এক সহকারী এবং এক চাপরাশীও জীপ-এ চলে। সঙ্গে তাঁদের জিনিসপত্রও থাকে। ফলে, বসবার না হলেও, মালপত্র রাখবার স্থানাভাব দেখা দেয়। অগত্যা আমাদের কিছু মাল—বিশেষত তরিতরকারি ও ফুলের ঝুড়ি, বাক্স আমাদের গাড়িতেই ছেড়ে যেতে হয়। শেষকিরণ মহাক্ষুণ্ণ,—এত করে গুছিয়ে এনেও এগুলো ফেলে যেতে হচ্ছে!

আমি কিন্তু মনে মনে মহাখুশী,—অযথা কতকগুলো ভার না বয়ে হালকা হয়ে ঘোরাফেরা করার সুবিধাও যেমন, মনের একটা স্বস্তিবোধও থাকে তেমনই।

তবুও, শেষকিরণ কিছু সবজি, ফল ও মিষ্টি বার করে নেয়। ছোট একটা ঝোলায় ভরে। বলে, আমি গাড়িতে যেখানে বসব, তারই পাশে এটুকুর জায়গা হয়ে যাবে। আপনার জন্যেই এ-সব নিয়ে যাওয়া।

উত্তর দিই, আমার এত সব কোথাও সঙ্গে রাখার প্রয়োজন হয় না, নিয়েও যাই না! না-থাকার অভাব বোধও করি না। তবে, গাড়িতে তুমি নিজের কাছে রেখে নিয়ে চলেছ, ভাবনা নেই, পথেই থলি হালকা হয়ে যাবে।

জীপ-এ যাত্রা সুরু হয়।

রমণ তাঁর আরণ্যজীবনের নানান অভিজ্ঞতার গল্প শোনান। পরিচয়ে প্রকাশ পায়, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক। সচ্ছল অবস্থা। তবুও, এই বনের মধ্যে পড়ে রয়েছেন কেন, জানবার কৌতূহল হয়। তার আগে তাঁকে প্রশ্ন করি, আপনার নামটা ঠিক কী, বলুন তো? রহমন, না রমণ—বুঝতে পারি নি। দেশ কোথায়?

তিনি হেসে উত্তর দেন, আমার নামের তা হলে গূঢ় রহস্য ফাঁস করতে হয়। ওটা রহমন নয়,—রমণ। তবে, কোথাও কোথাও রহমন ভেবে কেউ কেউ আমাকে মুসলিম মনে করেছেন। যেখানে দেখেছি তাতে আমার সুবিধে হচ্ছে,—আমি তাতে আপত্তি জানাই-নি, তাদের ভুলও ভাঙাই নি!

আরও কুতূহলী হয়ে আবার প্রশ্ন করি, রমণ তো দক্ষিণ ভারতীয়ের নামে খুব দেখা যায়। আপনি ঐ দিকেরই বাসিন্দা নাকি? এত দূরে এসে চাকরি নিয়েছেন?

রমণ হেসে ফেলেন,—নামের ফাঁদ যেটা পেতেছি, অনেকেই এতে ধরা পড়েন, আপনিও পড়লেন। না,—নামে রমণ হলেও দেশ আমার দাক্ষিণাত্যে নয়! কোথায় বলুন দিকি?

ভাবতে থাকি। শেষকিরণও বলতে পারে না,—তার সঙ্গে তারও এই প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। তাঁর মুখের দিকে তাকায়,—তাঁর জন্মভূমির লক্ষ্মণের সন্ধান করে।

তিনি হেসে বলেন, চেহারা দেখেও ধরা শক্ত। আমি বিহারী। পুরো নামের শেষের পদবিটা নাম থেকে বাদ দিয়েছি। আজকাল তো এই রীতিই চালু হচ্ছে,—সিনেমা-স্টার চিত্রতারকাদের নাম দেখুন না। উপাধি চলে যাওয়ায় আমার নামের শেষ যে অংশ রইল সেটা ঐ রমণ। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই নামের ব্যবহার শুরু করি নি, কিন্তু—আপনাদের বলতে কী?—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশটাস করে চাকরি পেতে এবং চাকুরিক্ষেত্রেও নামের এই বহুরূপীর মুখোশ কয়েক জায়গাতেই সুযোগ সুবিধা করিয়ে দিয়েছে!

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি, কী ভাবে?

তিনি বলেন, এটুকু ধরতে পারলেন না? আমাদের দেশে ব্যক্তিবিশেষের মনোভাবের জন্যে,—তাঁদের উৎকট প্রাদেশিক প্রীতি! ইনটারভ্যিউ-এ ও চাকরির অফিস মহলে—এমন কি লোকসমাজেও মেলামেশার সময়—যাঁরা আমার প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার সুযোগ পান নি,—মুসলমান ভেবেছেন, আমি তাঁদের সজাতি; আবার, মাদ্রাজীরা ধরে নিয়েছেন—আমি দাক্ষিণাত্যের, আর বিহারী তো আমি বটেই। ভগবান অবশ্য বাইরের চেহারাটাও এমন দিয়েছেন,—দেখে, ধরবার উপায় নেই, আমি ভারতের কোন্ প্রদেশের! নয় কি?

স্বীকার করি, আমিও বুঝতে পারিনি। কিন্তু, বনে এসে পড়লেন কেন?

—ওঃ! তার মধ্যে মারপ্যাঁচ নেই। শহরের অফিসেও ভাল চাকরি পেয়েছিলাম, মাইনেও এখানকার চেয়ে বেশি পেতাম,—কিন্তু, বনজঙ্গল আমার খুব ভাল লাগে, শহরের সেই হৈহল্লা, ভিড়, কত বিচিত্র সব মানুষ, কত রকম সমস্যা ঘরে-বাইরে-অফিসে,—সর্বক্ষেত্রেই কত পলিটিক্স্—নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজটি করবারও উপায় থাকে না, মনের শান্তি তো দূরের কথা, গলায় যেন সব সময়ে ফাঁসের দড়ি—প্রাণ হাঁসফাঁস করে। এখানে রয়েছি মনের শান্তিতে। নিজের কাজকর্ম সব সময়ে সাধ্যমত ঠিকভাবে করবার চেষ্টা করি। কাজের মধ্যে এখানেও সমস্যা যে থাকে না, তা নয়। কিন্তু সে-সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া, মীমাংসা করা, নিজের বিচার বুদ্ধিমত করি, করে মনে আনন্দও হয়,—ঠিক, যেমন ছাত্রাবস্থায় দুরূহ অঙ্কের নির্ভুল উত্তর নিজে কষে বার করে তৃপ্তি পেতাম। তা ছাড়া, জঙ্গলের ব্যাপার নিয়েই আমার কাজ, তাই বনে-জঙ্গলে ঘুরতে হয় প্রায়ই,—তারও আনন্দ—সে কী ভাষায় প্রকাশ করা যায়?

শেষকিরণ তন্ময় হয়ে শোনে। এতক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকায়, গম্ভীর মুখে বলে, ঠিক বলেছেন। আমাকেও যদি কর্তৃপক্ষ ফ্যাক্টরিতে না রেখে এই বনের মধ্যে এখানকার কাজে পাঠিয়ে দেয়, —দেখলে হয় একবার চেষ্টা করে!

রমণ বলেন, চলে আসুন—চলে আসুন—দুজনে মিলে এইসব পাহাড় বন চষে বেড়ানো যাবে।

জিজ্ঞাসা করি, সুগ্গা বাঁধে গিয়েছেন?

রমণ বলেন, কয়েক বারই। এই তো প্রায় পথের উপরই পড়বে—বড়েষাঁড় পার হয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে সামান্য একটু বনের মধ্যে ঢোকা। যাবেন নাকি দেখতে? চমৎকার জায়গা।

বলি, আমার এবার পালামৌ আসার একটা আকর্ষণ তো ঐ সুগ্গা বাঁধ।

চলন্ত গাড়িতে বসে বনের দিকে তাকিয়ে বনের গল্প শুনে সময় কেটে যায়। চলে আসি, কোয়েলের উপর সেই সেতুর নিকটে। গাড়ি থেকে নেমে পুলের উপর দাঁড়িয়ে পার্বত্য পরিবেশে গিরিনদীর অপার সৌন্দর্য এবারও উপভোগ করি।

অপর পারে গারুতে লোকালয়ে পৌঁছে গাড়ি দাঁড়ায়। রমণকে দেখে দুজন এগিয়ে আসে। দপ্তরের কি কাজের কথা তিনি তাদের বলে দেন। আগামীকাল আমাদের মোটর এখানে আসবে, বাংলো এলাকায় সে-গাড়ি যেন অপেক্ষা করে তারও নির্দেশ দেন।

গারু ছাড়িয়ে সামান্য দূর যাবার পর রাস্তা দু-ভাগ হয়। ডাইনে বড়েষাঁড়ের রাস্তা ধরে আমাদের জীপ এগিয়ে চলে। বাঁদিকের পথ দেখিয়ে রমণ জানান, ঐ গেল রুদ-র রাস্তা। কাল এখানে ফিরে আপনাদের গারুতে নামিয়ে দিয়ে ঐ পথ ধরে আমাদের রুদ্-এ যেতে হবে এখান থেকে মাইল বারো।

শেষকিরণ জানায়, ও-পথ আমার জানা। ঐদিক দিয়ে যাতায়াত করেছি—নেতারহাটে। সেবার আমাদের ম্যানেজারের পরিবারবর্গের সঙ্গে মোটরে এলাম নেতারহাট যাবার জন্যে। রুদ্ থেকে যেতে হয় আরও প্রায় ২৮ মাইল। রুদ্-এ নর্থ কোয়েলের বাঁ তীরে ফরেস্ট রেস্ট হাউসে রাত কাটানো হয়েছিল। তার পর, রুদ্ থেকে বেনারী—

জিজ্ঞাসা করি, বেনারী নামটা শোনা-শোনা লাগছে—

শেষকিরণ বলে, আপনার জানা নামই তো। রাঁচী থেকে নেতারহাট যাবার বড় রাস্তার ওপরেই তো হল বেনারী,—রুদ্ হয়ে এদিকের ঐ পথ সেইখানে মিলেছে। এদিকটায় হল ফরেস্ট রোড—তা হলেও মোটর যেতে পারে, কিন্তু রুদ্ থেকে বেনারীর পথে একটা ছোট নদী পড়ে—পন্‌রা নালা। পুল নেই—নদীর বুকে বালির চড়ায় বাঁশের টাট্টার—চাটাই-এর মতন—পেতে রাখা—বর্ষা না থাকলে

তারই উপর দিয়ে গাড়ি পার হয়,—'ফেয়ার ওয়েদার রোড'। সেবার সেইভাবে পার হতে গিয়ে, কী কাণ্ড! ম্যানেজারের বড় গাড়ি—ভারীও তেমনই,—সেই চড়ায় গেল আটকে,—বালির ভেতর চাকা বসে। কোনমতেই আর এঞ্জিন চালিয়ে গাড়ি ওঠে না। অবশেষে গ্রাম থেকে লোকজন ডেকে আনতে হয়। বাঁশ, লগি ইত্যাদির সাহায্যে ঠেলাঠেলি করে পার করানো গেল! ওঃ! সেও এক অ্যাডভেনচার!—এবারও আমার প্রোগ্রাম ছিল আপনাকে ঐ রাস্তা দিয়ে নেতারহাটও ঘুরিয়ে আনব,—

বলি, তোমাদের ঐ প্রকাণ্ড গাড়িটা আবার বালির মধ্যে আটকালে আমাকে দিয়ে ঠেলিয়ে—

শেষকিরণ হেসে বলে, না,—ও-প্রোগ্রাম বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল,—নেতারহাটের পাহাড়ের পথেও ও গাড়ি হয়ত উঠবে না,—তা ছাড়া তেলের সমস্যা তো রয়েছেই।

এদিকে কখন পার হয়ে আসি মারোমারের জঙ্গল ও পাহাড়। বড়েষাঁড়ের নিকটে এসে পৌঁছুই। বাঁদিকে একটা বন-পথ গাছপালার জটলা ভেদ করে কোথায় চলে যায়।

শেষকিরণ বলে ওঠে, ঐ রাস্তাটা—ঐ ওদিকে—দেখে রাখুন,—কারণটা বলছি। রমণজি! ও-পথ দিয়ে কখনও গেছেন?

রমণ স্বীকার করেন, না—ওটা জঙ্গলের মধ্যে কোথায় গেছে?

শেষকিরণের মুখে গর্বের হাসি ফোটে, জানায়, এইবার আপনাকে হারিয়েছি। ঐ পথ দিয়ে আমি একবার হেঁটে গিয়েছি,—এই বড়েষাঁড় থেকে নেতারহাটে! এখান থেকে আধে—১৩ মাইল—এ পথে জীপও যেতে পারে। আধে গ্রামের উপরেই বনবিভাগের বিশ্রামভবন। নিকটেই একটা ছোট নালা,—নদী হয়ে বেরিয়ে গেছে।

রমণ জানান, আধে আমি গিয়েছি, এদিক দিয়ে নয়। গারু থেকে। সেখান থেকেও হাঁটাপথ আছে। শেষকিরণ বলে, আমার যাওয়া এ পথ ধরে,—বড়েষাঁড়ে দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একাই রওনা হই। আধে পৌঁছুই বিকেলে। ঐ ফরেস্ট রেস্ট হাউসে রাত কাটালাম মনের আনন্দে। পরদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে গ্রাম থেকে একটা গাইড যোগাড় করে আবার রওনা হলাম। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাটে হাঁটা পথ ধরে ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর নেতারহাট পাহাড়ের চড়াই শুরু হল। ঘণ্টাখানেকও লাগে না, সে-চড়াই পথ শেষ হতে। পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে দেখি,—উঠে এসেছি নেতারহাটের সেই প্রসিদ্ধ ম্যাগনোলিয়া বা sunset view point-এ! নেতারহাটে গেলে সবাই যায় ওখান থেকে সূর্যাস্ত দেখতে। আমিও পৌঁছে দেখি, সূর্যদেব যেন বিদায় নেবার জন্যে আমারই অপেক্ষায় রয়েছেন। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলাম,—দিগন্তবিস্তৃত সারি সারি পাঁচ ছ'টা পাহাড়ের শ্রেণী,—একের পর এক মাথা তুলে, যেন ঢেউ-এর পর ঢেউ উঠে শৈলশিরা—তারই পিছনে আকাশে রঙ ছড়িয়ে সূর্যাস্ত হচ্ছে। আর পাহাড়ের মাথায় মাথায় নীলরঙের ওপর রক্তিম আভা। সে কী অপরূপ দৃশ্য! আমার চারিপাশের গাছপালা, বন পাহাড় সব যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দেখছে,—আমিও যেন তাদের সঙ্গে মিশে গেছি!

কথা শেষ করে শেষকিরণ আপন মনে কী যেন ভাবতে থাকে।

আমি ভাবি, দেখি, এ বছর নেতারহাট আর একবার ঘুরে আসতে হবে। চট্টরাজ এখন রিটায়ার করে রাঁচীতেই রয়েছেন। বার বার লিখছেনও যাবার জন্যে।

গিয়েছিলামও তাই মাস ছয়েক পরে,—দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে। সে-যাত্রাকাহিনীও অতি সংক্ষেপে এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হয়ত হবে না। কেননা, নেতারহাটের বনময় পর্বতশ্রেণীও পালামৌ জেলারই অন্তর্গত। যদিও রাঁচী হয়ে যাওয়াই সুবিধা। সাধারণ যাত্রীরা যায়ও তাই। ভাল মোটর পথ। নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। ৯৬ মাইল দূরত্ব। যেতে ঘণ্টাছয়েকও লাগে না। রাঁচী থেকে বেনারী ৮২ মাইল,—শেষকিরণ রুদ্ থেকে সেখানে এসেছিল। শেষের বাকি মাইল চোদ্দ,—পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে পথ ওঠে।

১৯৭৯ সালে গত আগস্ট মাসে ঘুরে আসি রাঁচী থেকে নেতারহাট, চট্টরাজের সঙ্গে। তবে চল্লিশ বছর পূর্বের নেতারহাটের স্মৃতির সঙ্গে কিছুই মেলাতে পারি না। স্মৃতির বিচিত্র ধর্ম। মানসপটে কত চিত্রের উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যায়, আবার অংশবিশেষ মনোভাবের ও কল্পনার স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হয়ে বিরাজ করতে থাকে। সেবারে নেতারহাটের পাহাড়ের পথে বনভূমি যেন গহনতর মনে হয়েছিল, ছোট এক মোটর গাড়িতে আসতে—এই বুঝিবা পথের বাঁকে বাঘ ভালুক দেখা দেবে,—এমনই এক আশা

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি, কী ভাবে?

তিনি বলেন, এটুকু ধরতে পারলেন না? আমাদের দেশে ব্যক্তিবিশেষের মনোভাবের জন্যে,—তাঁদের উৎকট প্রাদেশিক প্রীতি! ইনটারভ্যিউ-এ ও চাকরির অফিস মহলে—এমন কি লোকসমাজেও মেলামেশার সময়—যাঁরা আমার প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার সুযোগ পান নি,—মুসলমান ভেবেছেন, আমি তাঁদের সজাতি; আবার, মাদ্রাজীরা ধরে নিয়েছেন—আমি দাক্ষিণাত্যের, আর বিহারী তো আমি বটেই। ভগবান অবশ্য বাইরের চেহারাটাও এমন নিয়েছেন,—দেখে, ধরবার উপায় নেই, আমি ভারতের কোন্ প্রদেশের! নয় কি?

স্বীকার করি, আমিও বুঝতে পারিনি। কিন্তু, বনে এসে পড়লেন কেন?

—ওঃ! তার মধ্যে মারপ্যাঁচ নেই। শহরের অফিসেও ভাল চাকরি পেয়েছিলাম, মাইনেও এখানকার চেয়ে বেশি পেতাম,—কিন্তু, বনজঙ্গল আমার খুব ভাল লাগে, শহরের সেই হইহল্লা, ভিড়, কত বিচিত্র সব মানুষ, কত রকম সমস্যা ঘরে-বাইরে-অফিসে,—সর্বক্ষেত্রেই কত পলিটিক্স্—নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজটি করবারও উপায় থাকে না, মনের শান্তি তো দূরের কথা, গলায় যেন সব সময়ে ফাঁসের দড়ি—প্রাণ হাঁসফাঁস করে। এখানে রয়েছি মনের শান্তিতে। নিজের কাজকর্ম সব সময়ে সাধ্যমত ঠিকভাবে করবার চেষ্টা করি। কাজের মধ্যে এখানেও সমস্যা যে থাকে না, তা নয়। কিন্তু সে-সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া, মীমাংসা করা, নিজের বিচার বুদ্ধিমত করি, করে মনে আনন্দও হয়,—ঠিক, যেমন ছাত্রাবস্থায় দুরূহ অঙ্কের নির্ভুল উত্তর নিজে কষে বার করে তৃপ্তি পেতাম। তা ছাড়া, জঙ্গলের ব্যাপার নিয়েই আমার কাজ, তাই বনে-জঙ্গলে ঘুরতে হয় প্রায়ই,—তারও আনন্দ—সে কী ভাষায় প্রকাশ করা যায়?

শেষকিরণ তন্ময় হয়ে শোনে। এতক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকায়, গম্ভীর মুখে বলে, ঠিক বলেছেন। আমাকেও যদি কর্তৃপক্ষ ফ্যাক্টরিতে না রেখে এই বনের মধ্যে এখানকার কাজে পাঠিয়ে দেয়,—দেখলে হয় একবার চেষ্টা করে!

রমণ বলেন, চলে আসুন—চলে আসুন—দুজনে মিলে এইসব পাহাড় বন চষে বেড়ানো যাবে।

জিজ্ঞাসা করি, সুগ্গা বাঁধে গিয়েছেন?

রমণ বলেন, কয়েক বারই। এই তো প্রায় পথের উপরই পড়বে—বড়েষাঁড় পার হয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে সামান্য একটু বনের মধ্যে ঢোকা। যাবেন নাকি দেখতে? চমৎকার জায়গা।

বলি, আমার এবার পালামৌ আসার একটা আকর্ষণ তো ঐ সুগ্গা বাঁধ।

চলন্ত গাড়িতে বসে বনের দিকে তাকিয়ে বনের গল্প শুনে সময় কেটে যায়। চলে আসি, কোয়েলের উপর সেই সেতুর নিকটে। গাড়ি থেকে নেমে পুলের উপর দাঁড়িয়ে পার্বত্য পরিবেশে গিরিনদীর অপার সৌন্দর্য এবারও উপভোগ করি।

অপর পারে গারুতে লোকালয়ে পৌঁছে গাড়ি দাঁড়ায়। রমণকে দেখে দুজন এগিয়ে আসে। দপ্তরের কি কাজের কথা তিনি তাদের বলে দেন। আগামীকাল আমাদের মোটর এখানে আসবে, বাংলো এলাকায় সে-গাড়ি যেন অপেক্ষা করে তারও নির্দেশ দেন।

গারু ছাড়িয়ে সামান্য দূর যাবার পর রাস্তা দু-ভাগ হয়। ডাইনে বড়েষাঁড়ের রাস্তা ধরে আমাদের জীপ এগিয়ে চলে। বাঁদিকের পথ দেখিয়ে রমণ জানান, ঐ গেল রুদ-র রাস্তা। কাল এখানে ফিরে আপনাদের গারুতে নামিয়ে দিয়ে ঐ পথ ধরে আমাদের রুদ্-এ যেতে হবে এখান থেকে মাইল বারো।

শেষকিরণ জানায়, ও-পথ আমার জানা। ঐদিক দিয়ে যাতায়াত করেছি—নেতারহাটে। সেবার আমাদের ম্যানেজারের পরিবারবর্গের সঙ্গে মোটরে এলাম নেতারহাট যাবার জন্যে। রুদ্ থেকে যেতে হয় আরও প্রায় ২৮ মাইল। রুদ্-এ নর্থ কোয়েলের বাঁ তীরে ফরেস্ট রেস্ট হাউসে রাত কাটানো হয়েছিল। তার পর, রুদ্ থেকে বেনারী—

জিজ্ঞাসা করি, বেনারী নামটা শোনা-শোনা লাগছে—

শেষকিরণ বলে, আপনার জানা নামই তো। রাঁচী থেকে নেতারহাট যাবার বড় রাস্তার ওপরেই তো হল বেনারী,—রুদ্ হয়ে এদিকের ঐ পথ সেইখানে মিলেছে। এদিকটায় হল ফরেস্ট রোড—তা হলেও মোটর যেতে পারে, কিন্তু রুদ্ থেকে বেনারীর পথে একটা ছোট নদী পড়ে—পন্রা নালা। পুল নেই—নদীর বুকে বালির চড়ায় বাঁশের টাট্টার—চাটাই-এর মতন—পেতে রাখা—বর্ষা না থাকলে

তারই উপর দিয়ে গাড়ি পার হয়,—'ফেয়ার ওয়েদার রোড'। সেবার সেইভাবে পার হতে গিয়ে, কী কাণ্ড! ম্যানেজারের বড় গাড়ি—ভারীও তেমনই,—সেই চড়ায় গেল আটকে,—বালির ভেতর চাকা বসে। কোনমতেই আর এঞ্জিন চালিয়ে গাড়ি ওঠে না। অবশেষে গ্রাম থেকে লোকজন ডেকে আনতে হয়। বাঁশ, লগি ইত্যাদির সাহায্যে ঠেলাঠেলি করে পার করানো গেল! ওঃ! সেও এক অ্যাডভেনচার!—এবারও আমার প্রোগ্রাম ছিল আপনাকে ঐ রাস্তা দিয়ে নেতারহাটও ঘুরিয়ে আনব,—

বলি, তোমাদের ঐ প্রকাণ্ড গাড়িটা আবার বালির মধ্যে আটকালে আমাকে দিয়ে ঠেলিয়ে—

শেষকিরণ হেসে বলে, না,—ও-প্রোগ্রাম বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল,—নেতারহাটের পাহাড়ের পথেও ও গাড়ি হয়ত উঠবে না,—তা ছাড়া তেলের সমস্যা তো রয়েছেই।

এদিকে কখন পার হয়ে আসি মারোমারের জঙ্গল ও পাহাড়। বড়েষাঁড়ের নিকটে এসে পৌঁছুই। বাঁদিকে একটা বন-পথ গাছপালার জটলা ভেদ করে কোথায় চলে যায়।

শেষকিরণ বলে ওঠে, ঐ রাস্তাটা—ঐ ওদিকে—দেখে রাখুন,—কারণটা বলছি। রমণজি! ও-পথ দিয়ে কখনও গেছেন?

রমণ স্বীকার করেন, না—ওটা জঙ্গলের মধ্যে কোথায় গেছে?

শেষকিরণের মুখে গর্বের হাসি ফোটে, জানায়, এইবার আপনাকে হারিয়েছি। ঐ পথ দিয়ে আমি একবার হেঁটে গিয়েছি,—এই বড়েষাঁড় থেকে নেতারহাটে! এখান থেকে আধে—১৩ মাইল—এ পথে জীপও যেতে পারে। আধে গ্রামের উপরেই বনবিভাগের বিশ্রামভবন। নিকটেই একটা ছোট নালা,—নদী হয়ে বেরিয়ে গেছে।

রমণ জানান, আধে আমি গিয়েছি, এদিক দিয়ে নয়। গারু থেকে। সেখান থেকেও হাঁটাপথ আছে। শেষকিরণ বলে, আমার যাওয়া এ পথ ধরে,—বড়েষাঁড়ে দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একাই রওনা হই। আধে পৌঁছুই বিকেলে। ঐ ফরেস্ট রেস্ট হাউসে রাত কাটালাম মনের আনন্দে। পরদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে গ্রাম থেকে একটা গাইড যোগাড় করে আবার রওনা হলাম। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাটে হাঁটা পথ ধরে ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর নেতারহাট পাহাড়ের চড়াই শুরু হল। ঘণ্টাখানেকও লাগে না, সে-চড়াই পথ শেষ হতে। পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে দেখি,—উঠে এসেছি নেতারহাটের সেই প্রসিদ্ধ ম্যাগনোলিয়া বা sunset view point-এ! নেতারহাটে গেলে সবাই যায় ওখান থেকে সূর্যাস্ত দেখতে। আমিও পৌঁছে দেখি, সূর্যদেব যেন বিদায় নেবার জন্যে আমারই অপেক্ষায় রয়েছেন। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলাম,—দিগন্তবিস্তৃত সারি সারি পাঁচ ছ'টা পাহাড়ের শ্রেণী,—একের পর এক মাথা তুলে, যেন ঢেউ-এর পর ঢেউ উঠে শৈলশিরা—তারই পিছনে আকাশে রঙ ছড়িয়ে সূর্যাস্ত হচ্ছে। আর পাহাড়ের মাথায় মাথায় নীলরঙের ওপর রক্তিম আভা। সে কী অপরূপ দৃশ্য! আমার চারিপাশের গাছপালা, বন পাহাড় সব যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দেখছে,—আমিও যেন তাদের সঙ্গে মিশে গেছি!

কথা শেষ করে শেষকিরণ আপন মনে কী যেন ভাবতে থাকে।

আমি ভাবি, দেখি, এ বছর নেতারহাট আর একবার ঘুরে আসতে হবে। চট্টরাজ এখন রিটায়ার করে রাঁচীতেই রয়েছেন। বার বার লিখছেনও যাবার জন্যে।

গিয়েছিলামও তাই মাস ছয়েক পরে,—দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে। সে-যাত্রাকাহিনীও অতি সংক্ষেপে এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হয়ত হবে না। কেননা, নেতারহাটের বনময় পর্বতশ্রেণীও পালামৌ জেলারই অন্তর্গত। যদিও রাঁচী হয়ে যাওয়াই সুবিধা। সাধারণ যাত্রীরা যায়ও তাই। ভাল মোটর পথ। নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। ৯৬ মাইল দূরত্ব। যেতে ঘণ্টাছয়েকও লাগে না। রাঁচী থেকে বেনারী ৮২ মাইল,—শেষকিরণ রুদ্ থেকে সেখানে এসেছিল। শেষের বাকি মাইল চোদ্দ,—পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে পথ ওঠে।

বছর পূর্বের নেতারহাটের স্মৃতির সঙ্গে কিছুই মেলাতে পারি না। স্মৃতির বিচিত্র ধর্ম। মানসপটে কত চিত্রের উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যায়, আবার অংশবিশেষ মনোভাবের ও কল্পনার স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হয়ে বিরাজ করতে থাকে। সেবারে নেতারহাটের পাহাড়ের পথে বনভূমি যেন গহনতর মনে হয়েছিল, ছোট এক মোটর গাড়িতে আসতে—এই বুঝিবা পথের বাঁকে বাঘ ভালুক দেখা দেবে,—এমনই এক আশা

ও উত্তেজনা মন ছেয়ে ছিল। এবার এখন চলেছি যাত্রীভরা 'লাকসারি বাস্'-এ। পাহাড়ী পথের শোভা আছে, আরণ্যক পরিবেশও আছে, কিন্তু যান চলাচল ও লোক যাতায়াতের ফলে বন্য জীবজন্তু আর সচরাচর দেখা যায় না। পাহাড়ের মাথায় সেই সুবিস্তীর্ণ মালভূমিও এখন সভ্যতার সাজ পরছে। সরকারী দপ্তরের ও যাত্রীনিবাসের জন্য কয়েকটি বাড়ি উঠেছে। তা ছাড়া, ১৯৫৪ সাল থেকে এখানে একটি উচ্চমানের পাবলিক স্কুলের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এই নিভৃত পার্বত্যভূমি এখন প্রাণবন্ত, জনমুখর। পাহাড়ের মাথায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তার বিশাল অট্টালিকা; শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মীদের আবাসগৃহ। সুপরিচ্ছন্ন, মনোরম ক্যামপাস। ফুলের বাগান, ফল ও সবজির সরকারী ফার্ম। তবে, আমরা যখন যাই, সে সময়ে স্কুল বন্ধ, সেপ্টেম্বরের প্রথমে নতুন সেসন আরম্ভ হবে। ছুটির মধ্যেই কি একটা পরীক্ষা চলেছে, তারই কয়েকজন মাত্র ছাত্র তখন রয়েছে। বর্ষা তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি, যাত্রীসংখ্যাও তাই অতি অল্প। লোকজন না থাকায় জিনিসপত্র, শাকসবজির আমদানিও নেই।

নেতারহাটে পালামৌ ডাকবাংলো থেকে সূর্যোদয় দর্শনের উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু সেখানে স্থানাভাব হওয়ায় আমরা উঠি পি. ডবলিউ. ডি. ইন্‌স্পেকসন বাংলোয়।

চট্টরাজ জানান আমার এক আত্মীয়—কালীপদ ব্যানার্জি এখানে স্কুলের শিক্ষক। তাঁকে আমাদের আসার কথা জানিয়েছিলাম। চৌকিদার খবর দিল, তিনি বলে গেছেন, তাঁকে আজ একটু বাইরে যেতে হচ্ছে—ওবেলা ফিরবেন। বিকেলে তাঁর বাড়িতে বেড়াতে বেড়াতে যাওয়া যাবে,—কি বলেন?

সেইমত বিকেলে তাঁর কোয়ার্টার্স অভিমুখে আমরা রওনাও হই।

সুন্দর চওড়া রাস্তা। পাহাড়ের মাথার উপর, তাই চড়াই উৎরাই নেই। সহজ সরল পথ। বাঁদিকে একটা বড় বাড়ি দেখিয়ে চট্টরাজ বলেন, ঐটে ছিল বেহার গভর্নরের Chalet-গ্রীষ্মাবাস—১৯১৯ সালে তৈরি, ব্রিটিশ-আমলে বিহারের সাহেব গভর্নররা এখানে গ্রীষ্মকাল কাটাতে আসতেন দলবল নিয়ে। বন্যজন্তু শিকারও চলত। সে সময়ে নেতারহাটের চেহারাই ভিন্ন ছিল। তারই কয়েক বছর আগে ১৯১৬ সালে এখানকার সরকারী কৃষিকেন্দ্র খোলা হয়। এখানকার জমিটা ভাল, শীতকালীন ফলমূলাদি ও শাকসবজি জন্মানোর পক্ষে উপযোগী। পিয়ার, পীচ প্রভৃতির ফলন ভাল হয়। অবশ্য এখানকার প্রধান ফসল হল ভুট্টা। ভুট্টা পাকলে এ-অঞ্চলে এখনও ভালুকের আনাগোনা শুরু হয়।

জিজ্ঞাসা করি, পাহাড়ের ওপর সাধারণত জলাভাব থাকে,—এখানে জল সরবরাহের ব্যবস্থা কি রকম?

চট্টরাজ বলেন, ছোট একটা হ্রদের মতন আছে,—একটা নদীর মুখ আটকে বোধ হয় তৈরি করেছে। নিকটেই। কাল বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে দেখে আসব। পাহাড়ের মাথাটা এদিকটায় কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সমতল ময়দান, সাজানো সারি সারি গাছপালা। বনজঙ্গল নেই। কিন্তু, এর চারপাশে মাথা ঘিরে এখনও গভীর জঙ্গল রয়েছে,—তারপর হেসে বলেন,—অনেকটা মানুষের মাথার মাঝখানে টাক, আর চারপাশ ঘিরে চুলের বেড়ের মতন।

আমি বলি, আমার এক ঐতিহাসিক বন্ধুর নিকট শুনেছি, স্থানীয় ওরাওঁ ভাষায় 'নেতা' শব্দের অর্থ —বাঁশ। আগে নাকি এখানে প্রচুর বাঁশবন ছিল—তাই নেতারহাট নাম।

চট্টরাজ বলেন, নামকরণের এই ব্যাখ্যা আগে শুনি নি। কিন্তু অপর এক ব্যাখ্যার প্রচলন আছে। 'নেত্র' শব্দের অপভ্রংশ 'নেতা'। চোখ যেমন মানবদেহের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়, তেমনই নেতারহাট পালামৌর সৌন্দর্যের হাট।

গল্প করতে করতে এগিয়ে চলি। সোজা পথ। দুপাশে বড় বড় গাছের সারি। হঠাৎ চমকে উঠি গায়ের দিকে নজর করতেই। এ কী, গা বেয়ে উঠছে শুঁয়ো পোকা। কোথা থেকে এল? একটা কাঠি তুলে পোকাটা ফেলতে গিঁয়ে দেখি—জামার হাতের ওপর আর একটা! চট্টরাজেরও একই অবস্থা। তখন তাকিয়ে দেখা যায়, গাছের ওপর থেকে যেন সুতোয় ঝুলছে মাকড়সার মত—সারি সারি এখানে-ওখানে অজস্র শুঁয়োপোকা! চট্টরাজকে বলি, হিমালয়ে বর্ষাকালে—নেপাল ও সিকিমে বিশেষ করে—দেখেছি জোঁকের উপদ্রব, মাটি থেকে পা বেয়ে উঠছে, গাছ থেকে মাথায়, গায়ে পড়ছে। এখানে দেখছি তেমনই শুঁয়োপোকার উৎপাত!

চট্টরাজ হেসে বলেন, কিন্তু এখানে এইসব থেকেই তো বেরোবে প্রজাপতি। এখন উত্ত্যক্ত হয়ে ফেলে

দিচ্ছেন, তখন উৎফুল্ল হয়ে তাকিয়ে দেখবেন—এদেরই কত বিচিত্র সৌন্দর্য! জানেন? একবার সর্ব-ভারতীয় সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় আমাদের বেহার-জঙ্গলের একটা প্রজাপতি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল? তার নাম ছিল—Common Banded Peacock (Papillio crino)—ময়ূরের মতনই ছিল তার রূপচ্ছটা!

বাংলোগুলি এসে যায়। বিরাট এলাকা, তারই মাঝে একতলা লম্বা বাড়ি।

এত বড় বাড়ি এক একজন শিক্ষকের? আশ্চর্য বোধ করি।

চট্টরাজ ভুল ভাঙান; এ সবই ছাত্রাবাস ও শিক্ষকের বাসা—একই সঙ্গে। একজন শিক্ষক সুপারইনটেনডেন্ট—অধীক্ষক হয়ে কয়েকজন ছাত্রদের নিয়ে থাকেন। প্রাচীনকালের গুরুর আশ্রমের ভাব যেন। কালীর বাড়ির পথটা কোন্‌দিকে বুঝতে পারছি না,—সেই কবে একবার এসেছিলাম, তাও মোটরে। বড় রাস্তা ছেড়ে একটু ভেতরদিকে যেতে হয়।

একটা ছাত্রাবাসের সামনে গেটের ওপর নাম দেখে বলি, বাঃ। বাড়িগুলির নামকরণ তো চমৎকার হয়েছে—নালন্দা!

চট্টরাজ বলেন, সবই প্রায় ঐ ধরনের নাম দেখবেন—নালন্দা, তক্ষশিলা—দাঁড়ান, ঐ একজন শিক্ষক বাগানে ঘুরছেন—কালীর বাড়ির সন্ধানটা নিই।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলে দেন, এগিয়ে গিয়ে ঐ চৌমাথা, সেটা ছাড়িয়ে আর একটা মোড় পাবেন—সেইখানে বাঁয়ে ঘুরে ইত্যাদি।

সেইমত আমরা চলি। খানিক গিয়ে মোড়ের মাথায় পৌছে দিগ্‌ভ্রম হয়। পথের পাশে কয়েকজন মজুর কাজ করে দেখে চট্টরাজ তাদের জিজ্ঞাসা করেন,—কালীবাবু—মাস্টারজি—কালীপদ ব্যানার্জিকো কোঠি?

তারা নাম শুনে বুঝতে পারে না। পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, বিড়বিড় করে বলে, বনারজি? বনারজি? কৌন হ্যায়?—চিনতে পারে না।

এমন সময় তাদের সর্দার এসে হাজির হয়। সে চিনতে পারে। হেসে উঠে সবাইকে বোঝায়, আরে! দেওঘরিয়াজির বাংলো তল্লাশ করছেন,—চলে যান ঐ ওদিক দিয়ে।

আর সকলে তখন মৃদু হেসে একবাক্যে মন্তব্য করে, ওঃ! দেওঘরিয়াজি? তব্ বনারজি-বনারজি ক্যা বাতলাতে থে?

চট্টরাজও তখন হেসে বলেন আমাকে, ঠিকই তো? কালীর নাম বা ব্যানার্জি উপাধি বললে এরা চিনবে কি করে? ওদের বংশে 'ব্যানার্জি' তো আর চালু নেই—দেওঘরিয়া উপাধিতেই স্থানীয় লোকজনের কাছে সে পরিচিত। তিনচার পুরুষ এই পাহাড়ের নীচে লোহারডাঙা অঞ্চলে নিগনীগ্রামে এরা বাস করছে। সেইখানেই বাড়িঘর—আত্মীয়স্বজন, নামও হয়ে গেছে কোন্‌কালে দেওঘরিয়া!

কালীবাবুর বাড়ি খুঁজে পেতে আর দেরি হয় না। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হতে দেখি, তিনি বাঙালীই আছেন, কথাবার্তাও বাংলাতেই বলেন, তবে কথার টান ও দু-একটা শব্দের উচ্চারণ হয়ে গেছে অবাঙালীর মতন। স্ত্রী কিন্তু সম্পূর্ণ বাঙালী মহিলা। অথচ, ছেলেগুলির কথাবার্তা—এমন কি পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপেও—বেহারী হিন্দির ব্যবহারই বেশি। ভাষা শুনে বাঙালী বলে বোঝাই যায় না।

কালীবাবু ভূগোলের শিক্ষক। নেতারহাটের নাড়িনক্ষত্র কণ্ঠস্থ।

এখানকার তথ্য সম্বন্ধে কিছু জানার কৌতূহল প্রকাশ করতেই তিনি জানান, নেতারহাটের পূর্ব দ্রাঘিমা—longitude ৮৪°৩০, উত্তর অক্ষাংশ latitude ২৩°৩০'। পাহাড়টার উচ্চতা গড় সমুদ্রবক্ষ থেকে ৩,৫০০ ফুট। সর্বোচ্চে স্থানটি ৩৭৯১ ফুট। বার্ষিক বৃষ্টিপাত—৭৫"। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ওঠে ৯০°। শীতকালে নামে ৩৭°-তে। এখানকার আদিবাসী—বিরহোর ও কিষাণ। এ পাহাড়ের জঙ্গলে শালগাছই বেশি,—deciduous পর্ণমোচী বন—শীতকালে পাতা ঝরে যায়। পাইন গাছও লাগানো হয়েছে—কয়েক জায়গায় নজর করেছেন নিশ্চয়।

বলি, দেখেছি, দেখামাত্রই মনে হল, হিমালয়েই বুঝিবা চলে এলাম।

তিনি বলেন, পাহাড়ের মাথার উপর এই মালভূমি—Plateau-র বিস্তৃতি,—লম্বায় প্রায় চার মাইল, প্রস্থে প্রায় আড়াই মাইল। পাহাড়ের ওপর থেকে কয়েকটি view point রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান দুটি

হল,—পালামৌ বাংলোর সামনে থেকে পুব দিকে দেখা যায়, বহু নীচে উপত্যকা দিয়ে কোয়েল নদীর সর্পিল গতিপথ—দূরে পাহাড়ের শ্রেণী—অপূর্ব দৃশ্য! সূর্যোদয় দেখতে হয় সেখান থেকে।

শুনে বলি, কাল ভোরে যাব সেখানে।

তিনি বলেন, যে কদিন রয়েছেন, রোজই যাবেন সেখানে, আপনাদের বাংলো থেকে দূরও নয়। আর অপর view point-টি হল এই মালভূমির সম্পূর্ণ আর এক অংশে—Magnolia point—সেখান থেকে দেখতে হয় সূর্যাস্তের দৃশ্য। নীচে মহুয়াডারের বিস্তীর্ণ ছেছারি উপত্যকা, আর আকাশের গায়ে সারি সারি নীল পাহাড়। নিয়ে যাব মোটর করে কাল,—এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরত্ব হবে।

আমি তখনই জানাই, আমার এক তরুণ বন্ধু বড়েযাঁড় থেকে ওখানে একবার হেঁটেও এসেছিলেন,—আধে ফরেস্ট বাংলোতে রাত কাটিয়ে।

কালীবাবু বলেন, হাঁ, তা আসা যায়।

নেতারহাটে সেবার অন্যান্য স্থানগুলি দেখি বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে Magnolia point থেকে সূর্যাস্ত দেখার আশা অপূর্ণই থাকে। বর্ষাকাল। পরদিন বৃষ্টি নামে। মেঘাবৃত আকাশে সূর্যদেব সেদিন অকরুণভাবে আত্মগোপন করে অদৃশ্য থাকেন।

কিন্তু, এখন এখানে আর নেতারহাটের কথা নয়। পালামৌর অংশ হলেও আমার তৃতীয়বার পালামৌ জঙ্গল ভ্রমণের প্রায় ছয় মাস পরবর্তী সে-সব ঘটনা।

ফিরে আসি আমার তৃতীয়বারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে।

পৌঁছেছি বড়েষাঁড়ে। শেষকিরণ, রমণজি ও তাঁর দলবলের সঙ্গে।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে রমণ বলেন, চলুন, আমাদের এখানকার কোয়ার্টার্স-এ একটু বসবেন। আমি ততক্ষণে আমার এখানকার কাজগুলি সেরে আসি,—মিনিট পনেরো লাগবে।—চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

যে বাড়িতে গতবার চট্টরাজের সঙ্গে এসে রাত কাটিয়েছিলাম, সেইটে এঁদেরই কোয়ার্টার্স। তাই তাঁকে জানাই, এ বাড়ি আমার চেনা। সেই সিং এখনও আছেন এখানে?

রমণ বলেন, না, তাঁকে আমি দেখি নি। আমি কাজে যোগ দেওয়ার আগে তিনি অন্যত্র চলে গেছেন। এখন এখানে নতুন লোক এসেছেন।

রমণকে মনে করিয়ে দিই, আমাদের কিন্তু সুগ্গা বাঁধটা দেখিয়ে দেবেন, মনে থাকে যেন।

রমণ জানান, মহুয়াডাঁর যেতে রাস্তার নিকটেই পড়বে,—দেখতে যাবেন নিশ্চয়।—বলে তাড়াতাড়ি তাঁদের দপ্তরের উদ্দেশ্যে চলে যান।

শেষকিরণও বসে থাকে না। গাড়ি থেকে নেমেই কোথায় চলে যায়!

আমি একা বারান্দায় বসে গতবারের এখানে রাত্রিবাসের কথা ভাবতে থাকি।

শেষকিরণ অল্প পরেই ফিরে আসে। চেয়ার টেনে নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বসে। বলে, যাক, দুজনেরই দেখা পাওয়া গেল। বাংলোর চৌকিদারকে বলে এলাম, আগামী কাল এখানে রাত কাটাব। আর, ফরেস্ট দপ্তরেও গিয়ে পেয়ে গেলাম,—'টাইগার প্রোজেক্ট'-এর এখানকার কর্মচারীকে। কাল রাত্রে এখান থেকেই তো দেখতে যাব ব্যাঘ্র-যোজনার core ক্ষেত্র।

বলি, এইবার বসো একটু স্থির হয়ে—ঐ চা আসছে—রমণ পাঠিয়ে দিয়েছেন। দেখবার, থাকবার ব্যবস্থা তো সবে করে এলে, কিন্তু পেট্রোলের ব্যবস্থা কিছু হল? রমণের জীপ-এ তো বেশি তেল নেই—তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অন্যত্র বেশি ঘোরাঘুরি করার জন্যে।

শেষকিরণ নিরাশ হবার পাত্র নয়। বলে, কাল এখানে ফিরে আসি তো—ব্যবস্থা কিছু একটা করতেই হবে—এত সব ট্রাক, লরি যাতায়াত করছে।—যোগাড় নিশ্চয় হয়ে যাবে।

রমণও কিছুক্ষণ পরে চলে আসেন। আবার যাত্রাও শুরু হয়।

বড়েষাঁড় ছাড়িয়ে মহুয়াডাঁরের পথ ধরে মাইল পাঁচেক যাওয়ার পর ডানদিকে বনের মধ্যে প্রবেশ করার পর এক সরু পথ,—জীপ যেতে অসুবিধা হয় না। বনের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে ঘুরে মাইল দুই এগিয়ে গিয়ে একফালি উন্মুক্ত ময়দানে পৌঁছুই। অদূরে একপাশে খানকয়েক চালাঘর—সুগ্গা বাঁধ গ্রাম। জীপ থেকে নেমে হাত কয়েক এগোলে পাহাড়ী খাড়া ঢালু গা,—নদীর পাড়। পঁচিশ ত্রিশ ফুট নীচে বুড়্হা নদী। আমাদের বাঁ দিক থেকে ডাইনের নেমে চলেছে। দুই তীরে বনজঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের শ্রেণী।

মাঝখানে প্রায় এক ফার্লঙ্ ব্যবধান,—সেইটেই নদীর বিস্তৃতি। পার্বত্য নদী যেন গিরিশ্রেণীর বাঁধ ভেঙে সবেগে নেমে চলে,—মুক্তিপ্রাপ্তির আবেগ উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে। মনে পড়ে সেই প্রচলিত কাহিনী; —মহুয়াডাঁরের বর্তমান বিস্তীর্ণ উপত্যকা জুড়ে এককালে এক বিশাল হ্রদের অস্তিত্ব ছিল। তার চতুর্দিক ঘিরে গিরিমালার আবেষ্টন। তারপর, এক বছর প্রবল বর্ষার প্লাবনে সেই বিপুল জলভার তীর বেয়ে পাহাড়ের অনেকখানি উপর পর্যন্ত উঠতে থাকে। নীড়হারা টিয়াপাখির ঝাঁক পাহাড়ের গায়ে আশ্রয় নেয়, পাথরে গর্ত খুঁড়ে বাসাও করে। জলরাশিও সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করে পাহাড়ের বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়। প্রকৃতই, এখনও মহুয়াডাঁর ছেছারি উপত্যকার নদীনালাগুলির সমবেত জলস্রোতের এই একটিমাত্র নির্গমপথ। এই কারণেই স্থানের নামকরণ সুগ্গা বাঁধ—'সুগ্গা' অর্থাৎ টিয়া। এখানে দাঁড়িয়ে নদীর গিরিপ্রাকার ভেদের দৃশ্য চোখে পড়ে বটে, কিন্তু টিয়ার পাথর ফুঁড়ে বাসা তৈরির অদ্ভুত কাহিনীর উদ্ভব হল কি কারণে? তারও উত্তর মেলে নদীর বুকের দিকে তাকাতেই।

নদীর সম্পূর্ণ বেড—তলদেশ—পাথরের বাঁধানো ও শিলাকীর্ণ। হওয়াও বিচিত্র নয়। গিরিমধ্যপথে পাষাণ-ক্রোড়ে, প্রচণ্ড বেগে ধাপে ধাপে নীচে নেমে-আসা নদীর প্রবাহ। শৈলসোপানের আকৃতি পাওয়াই স্বাভাবিক। পার্বত্য রাজ্যে অরণ্যময় পরিবেশে এর সৌন্দর্য্যের বৈশিষ্ট্য থাকে। জলস্রোত নীচের দিকে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি ধারা জলপ্রপাতের রূপ ধরে, অনেকখানি নীচে নেমে অপর ধারার সঙ্গে আবার মিলিত হয়,—যেন রঙ্গমঞ্চে দুই নর্তকী দুই দিকে বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গে ঘুরে এসে আবার হাতে হাত মিলায়। কিন্তু, ঐ সুগ্গা বাঁধ নামকরণের কারণ দেখা যায়,—নদীর পাথরে-বাঁধানো ঐ বুকের—rock bed-এর দীর্ঘতা প্রায় ১/৪ মাইল হবে)—সারা অঙ্গ জুড়ে—জলস্রোতের দুই পাশে—এবড়ো খেবড়ো বড় বাড়ি বাটির আকারের অসংখ্য গর্ত, অনেকগুলিই জলভরা। যেন ধরাশায়ী কৃষ্ণাভ এক অতিকায় সরীসৃপ সহস্র চক্ষু মেলে জুলজুল করে তাকিয়ে রয়েছেন! নদীর বুকে পাথরের সারা গায়ে এই অদ্ভুত গর্তগুলি থেকেই তোতা-কাহিনীর উৎপত্তি। অবিরল প্রবল জলপ্রবাহের আঘাতে আঘাতে ক্ষয়িষ্ণু চুনাপাথরে এমন অজস্র ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিচিত্র না হলেও এক অত্যদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রকটন হয়। আদিম অরণ্যানীবেষ্টিত নিস্তব্ধ পার্বত্য পরিবেশ। গিরিনদীর অঙ্গে যেন বসন্ত ব্যাধির ক্ষতচিহ্ন। পড়ন্ত বেলার স্তিমিত আলোকে আমার চোখে দেখায় যেন আদিম প্রকৃতির "বলিষ্ঠ হিংস্র বর্বরতা"! স্তব্ধ হয়ে একটা পাথরে বসে দেখি।

শেষকিরণ ও রমণের কিন্তু ভিন্ন মনোভাব। নদীর ধারা ধরে তারা অনেক দূরে নেমে যায়—পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে, ছোট ছোট ধারাগুলি ডিঙিয়ে,—যৌবনসুলভ উদ্বেল আনন্দ উচ্ছ্বাসে!

সন্ধ্যার ছায়া নামতে তারা ফিরে আসে। শেষকিরণ বলে, এবার যখন এখানে আবার আসব, সারাদিন কাটাতে হবে, নদীর এই সমস্ত বেডটা ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে,—কয়েক জায়গায় প্রচণ্ড স্রোত থাকায় আজ সে জায়গাগুলো পার হওয়া গেল না। জানেন তো, এই বুড়হা নদী নেমে গিয়ে মিশেছে সেই নর্থ কোয়েলে—সেই দিকেই কোথায় টাইগার প্রোজেক্ট core-area।

রমণও উৎসাহিত হয়ে বলেন, আপনি আসার আগে জানাবেন, আমিও আসব। শুনেছি, এই দিকেই কাছাকাছি কোন এক পাহাড়ের মাথায় তামোলগড়ের পুরানো দুর্গ আছে—সেটা নাকি রাকসেল রাজপুতদের তৈরি। চেরোরাজাদের আগে তাদেরই তো আধিপত্য ছিল এইসব অঞ্চলে।

আমি বলি, আমার ভাগ্যে সে-সব দেখার সম্ভাবনা নেই, তোমাদের মুখে গল্প শোনা যাবে। এখন চল, যেতে হবে তো সেই মহুয়াডাঁর। রাত হয়ে যাবে পৌঁছুতে।

রমণ আশ্বাস দেন, অন্ধকার হলেও ক্ষতি নেই। বনের পথ আর সামান্যই বাকি। তারপর সমতল রাস্তা, আর সেখানে শেষকিরণ তো বাংলোতে রিসার্ভেশন করেই রেখেছেন।

জীপ পাহাড় ছেড়ে মহুয়াডাঁরের বিস্তীর্ণ ছেছারি-ভ্যালিতে নেমে আসে। মনে পড়ে, শ্রী এস্. পি. শহীর Backs to the wall বইখানিতে পড়েছি, এই উপত্যকার এক প্রান্তে একটা টিলার নিকটে গুহার মধ্যে একপাল নেকড়ে বাঘ বাসা করে থাকে। ইদানীং বনে জঙ্গলে নেকড়ে বড় একটা দেখা যায় না। তারা ঘন বনে বাস করতে চায় না। এই ভ্যালির আশপাশের বন পাতলা হওয়ায় ওরা এখানে এসে রয়েছে। কিন্তু, এ-পরিবেশে চিতল বা বন্য হরিণ নাম থাকায় তারা খরগোশ, বেজি—এইসব ছোট জানোয়ার ধরে মেরে খায়, তাতে তাদের ক্ষুধা মেটে না। অতএব, নেকড়েগুলো সন্ধ্যা নামলেই বেরিয়ে পড়ে

লোকালয়ের দিকে। সেখানে গৃহস্থের পোষা ছাগল, শুয়োর ইত্যাদি মেরে খেতে শুরু করে। এইভাবে বছরে গড়ে প্রায় দু'শ ছাগল, শ'তিনেক শুয়োর গ্রামবাসীরা হারায়। অগত্যা, গ্রামের লোকেরা উত্যক্ত হয়ে নেকড়েদের সন্তান প্রসবের সময় গুহার মুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করে ভেতরে জ্বালানীকাঠ পুরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে, কয়েকটা নেকড়ে মারা যায়, বাকিগুলো পালায়, উৎপাতও বন্ধ হয়। কিন্তু, আবার কিছুকাল হল, কয়েকটা নেকড়ে ফিরে এসেছে। এখন মাত্র এগারোটা নেকড়ে এ-অঞ্চলে রয়েছে। শাহীসাহেব তাদের ছবি তোলার উদ্দেশ্যে ছাগল বেঁধে টোপ ফেলে রাত্রে লুকিয়ে থেকে দুটো নেকড়ের ছবি তুলে বই-এ ছাপিয়েছেনও। •

ভাবি, এই সন্ধ্যার আঁধারে তাদের কারও সাক্ষাৎ পাব নাকি? এই তো তাদের খাদ্য সন্ধানে সান্ধ্য বিচরণের সময়। উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকি।

নাঃ, জীপের তীক্ষ্ণ আলোয় মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা খরগোশকে রাস্তার এদিক থেকে ওদিকে লাফিয়ে যেতে দেখি!

দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই মহুয়াডাঁরের বাংলোয় সাতটার মধ্যেই। ফেব্রুয়ারি মাস। শীতকাল। পাহাড়ী অঞ্চল। তাই রাত মনে হয়।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে লোধ ফল্‌স-এ যাত্রা। আবার সেই রমণীয় স্থানে ঘণ্টাপাঁচেক কাটানো। শেষকিরণ ও সঙ্গীদের পাহাড়ের উপর অংশে উঠে জঙ্গলে ও জলপ্রপাতের আশেপাশে পরিভ্রমণ, নীচের নির্মল কুণ্ডের জলে শেষকিরণের সাঁতার কাটা, ভেসে থাকা, জলকেলি এবং অবশেষে ঝরনার ধারে, তরু ছায়াতলে শিলাসনে বসে সবাই মিলে বনভোজন। পরম আনন্দে সময় কাটে। বেলা দুটোয় আবার ফেরবার পথ ধরা। মহুয়াডাঁরে অল্পক্ষণের জন্য থেমে বড়েষাঁড়ে পৌঁছে যাই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। বাংলোতে উঠে জিনিসপত্র রেখেই শেষকিরণ বেরিয়ে যায় পেট্রোলের সন্ধানে। এখান থেকে ভিন্নপথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ব্যাঘ্রক্ষেত্রের কেন্দ্রে যাওয়াই এখন আমাদের উদ্দেশ্য। অনুমতি পত্রও রয়েছে, গাইডও প্রস্তুত, পর্যাপ্ত তেলের অভাব। এখান থেকে কুজরুম্ নয় মাইল। বাঘে-চম্পা এগারো মাইল। সেইখানেই 'কোর এরিয়া'। গেলেই নাকি বাঘ দেখা যাবে,—শার্দুলরাজের দরবারগৃহ। তারই অদূরে বুড়্হা নদী ও কোয়েলের সঙ্গম!—দেখতে যাওয়ার আগ্রহের অভাব নেই, শুধু অতদূর যাওয়া-আসার তেলের ব্যবস্থা হলেই হয়। শেষকিরণ খোঁজও নিয়ে আসে। উৎফুল্ল হয়ে জানায়, যোগাড় করা সম্ভব, এক বন-ইজারাদার দিতে রাজি আছেন। কিন্তু রমণের ন্যায়সঙ্গত আপত্তি থাকে। বলেন, আমি সঙ্গে থাকতে এ-সব লোকেদের কাছ থেকে এ-রকম কোন সাহায্য নেওয়া উচিত হবে না, ভাববে, আমাকেই যেন কৃতার্থ ও উপকৃত করল। বিনিময়ে ভবিষ্যতে কোন কাজ আদায়ের চেষ্টা করবে।

অতএব, ব্যাঘ্র-কেন্দ্রে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হয়। বড়েষাঁড়ের আশেপাশের জঙ্গলে কিছুক্ষণ জীপ-এ ঘুরি। কয়েকটা সম্বর ছাড়া আর কোন অরণ্যচারীর সাক্ষাৎ মেলে না। তবে কাছাকাছি যে হাতির দল রয়েছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়,—ভাঙা ডালপালা তো বটেই, এমন কি দু-তিন জায়গায় বনের মধ্যে পথের উপর বড় গাছ ফেলে পথ অবরোধও করেছে। গাইড বলে, এগুলো ওদের ইচ্ছাকৃত আচরণ,—গাড়ি যাতায়াত ব্যাহত করার মতলবেই পথের ওপর এমন করে ফেলে রেখেছে!

শেষকিরণ বলে, হাতিদের এত জঙ্গলের ডালপালা ভাঙা—এমন কি বড় গাছও উপড়ে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে কনসারভেটরদের অভিমত কি, শুনবেন? এতে বনের ক্ষতি হয় না, বরং উপকারই হয়। বনের অন্যান্য জন্তুজানোয়ারের থাকবার ও ঘোরাফেরা করবার সুবিধে হয়ে যায়। লম্বা উঁচু গাছের পাতা, ফুল ফল ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়ায় তৃণভোজী প্রাণীদের—যেমন, গউড়, সম্বর, চিতল প্রভৃতির, খাদ্য লাভের সুবিধা হয়। তা ছাড়া, বনের মধ্যে খানিক খালি জমি হয়ে যাওয়ায় নানারকম ঘাস জন্মানোরও অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে।

আমি হেসে বলি, তা বলে হাতিরা যত বুদ্ধিমানই হোক, অপর জন্তুর হিতকামনায় এইসব ভাঙচুর করছে, তা বলতে পার না।

শেষকিরণ বলে, তা বলব কেন? হাতিরা করে, তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ও স্বভাববশীভূত হয়ে। কিন্তু, পরোক্ষভাবে তাতে জঙ্গল খানিকটা সাফ হয়ে যাচ্ছে, অন্য প্রাণীরাও উপকৃত হচ্ছে। আরও একটা আচরণ তাদের দেখুন। নর্থ কোয়েল নদী বনের প্রায় মাঝ বরাবর দিয়ে বয়ে গেছে—গারুতে

সে নদী পার হয়ে এসেছেন। নদীটি দেখতে অত বড়, কিন্তু মে মাসের শেষ দিকে এরও জল প্রায় শুকিয়ে আসে,—নদীর বুকে শুধু কয়েকটা জায়গায় জল জমে থাকে। সে সময় বনের জন্তু-জানোয়ারের জলকষ্ট ঘোচে কি করে, জানেন? প্রথমত, বনের মধ্যে কয়েকটা ছোট ডোবা আছে, যাতে কোথাও কোথাও কিছু জল থাকে, গরমের সময়ও শুকোয় না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকেও ব্যবস্থা হয়েছে, এক এক জায়গায় নালার মুখে বাঁধ দিয়ে জল জমিয়ে রাখার—

আমি বলি, বোধ হয় সেই রকমই একটা জায়গায় বেতলাতে সেই প্রথমবার হাতিদের স্নান দেখেছিলাম—শেষকিরণ বলে, সে-জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা মানুষের করে দেওয়া;—আর হাতিরা করে কি, ঐ নর্থ কোয়েলের জল শুকিয়ে এলে নদীর বুকে শুকনো বালির মধ্যে ওরা বড় বড় গর্ত খুঁড়ে জল বার করে,—নিজেদের প্রয়োজন মেটায়, অন্য জন্তুরাও সেই জল পান করার সুযোগ পেয়ে যায়। গরমকালে নদী ধরে গেলে কোয়েলের বুকে এ ধরনের গর্ত মাঝে মাঝে দেখা যায়, আমিও দেখেছি। সেইসব জলে পাখিদেরও কেমন ডানা ঝাপটে চান করতেও দেখেছি।

আমি বলি, ক'বার পালামৌ জঙ্গলে এসে হাতিদেরই কীর্তিকলাপ বেশ শোনা গেল, বুনো হাতিও দেখা গেল। কিন্তু বাঘেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না।

শেষকিরণ উৎসাহ দেয়, চলুন কাল বেতলায়,—বাঘ দেখতে না পান, বাঘের বাচ্চা দেখিয়ে দেব। এবং আর একবার আসুন এই বড়েষাঁড়ে, তখন 'টাইগার রিসার্ভ'-এর 'কোর এরিয়া'-তেও নিশ্চয় ঘুরিয়ে আনব।

পরের দিন সবাই গারুতে ফিরে আসি। রমণকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয়। তিনি তাঁর জীপ-এ নিজের কাজে ভিন্ন মুখে রওনা হন। আমরাও আমাদের মোটরে চেপে ফিরে চলি বেতলায়। পৌঁছেও যাই দুপুরের মধ্যেই। মোটরের ট্যাঙ্কে এখন তেল ভরতি। কিন্তু এই বড় গাড়ি নিয়ে বনের পথে ঘোরাঘুরির অসুবিধা, এঞ্জিনের অক্ষমতার কারণে পাহাড়-পথে ওঠাও উচিত নয়।

শেষকিরণ বলে, এখানে তো আজ 'ট্রি-হাউস'-এ রাত কাটাব—রিসার্ভ করা আছে। কিন্তু, এখনও সারা দিন রয়েছে পড়ে। চলুন, কুট্‌কু বেড়িয়ে আসি।

কুট্‌কু? সেটা আবার কী ব্যাপার?

সে বলে, সে জায়গায় কোয়েল নদী বয়ে চলেছে দুদিকে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে—উপলবহুল সঙ্কীর্ণ পথে। জলস্রোতেরও তাই উদ্দাম বেগ। তারই সুযোগ নিয়ে গভর্নমেন্ট সেখানে বাঁধ—ড্যাম তৈরি করছে—মণ্ডল-কুট্‌কু ড্যাম। জায়গাটা সুন্দর। চলুন সেইখানে যাওয়া যাক, দেখে আসবেন। যাবার পথে —এক জায়গায়—বড় রাস্তা ছেড়ে বনের মধ্যে কিছুদূর ঢুকলে একটা 'হট স্প্রীং'—উষ্ণ প্রস্রবণ আছে—সেটাও দেখে আসা যাবে।

অতএব, বেতলায় তখন আর 'না নেমে সেই উদ্দেশ্যেই তখনই যাত্রা করা হয়।

বড় রাস্তা ধরে কেচ্‌কি ছাড়িয়ে আসি। বেতলা থেকে ১৫ কিলোমিটার এসে রাঁচির পথ যেখানে ডাইনে বেঁকে গেছে এবং ডালটনগঞ্জের পথ আর একদিকে চলে যায়, তারই নিকটে বাঁদিকে অপর আর এক পথ,—অন্য রাস্তাগুলির তুলনায় কিছুটা সঙ্কীর্ণ। সেই নতুন পথ ধরে গাড়ি চলে। এই রাস্তায় আরও ৮ কি. মি. গিয়ে বারওয়াড়ি, তারপর আবার ১৩ কি. মি. দূরে হুটার কয়লাখনি। মণ্ডল-কুট্‌কু ড্যাম হুটার ছাড়িয়ে আরও ১৮ কি. মি.। ভাল রাস্তা,—মোটরে যেতে সময়ও বেশি লাগে না। কিন্তু সেই উষ্ণ প্রস্রবণ কুট্‌কু পৌঁছানোর অল্প আগে বড় রাস্তার অদূরে হলেও দেখার সুযোগ হয় না। সেদিকে বনে ঢোকবার মুখেই একটি ছোট পাহাড়ী নদী পড়ে। নিকটে গিয়ে দেখা যায়, ক'দিন আগে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে নদীতে তখনও বেশ জল। পুল নেই। জলের মধ্যে দিয়ে বড় ভারী মোটর পার করানো সম্ভব হল না।

নির্মীয়মাণ কুট্‌কু ড্যাম-এ অবশ্য যাওয়া যায়।

চারিপাশে পাহাড়। তারই মধ্যে দিয়ে কোয়েল নদী বয়ে চলেছে। নদীর বুক শিলাময়। পাথরের বাধা কাটিয়ে উন্মত্ত জলের প্রবল প্রবাহ। অদূরে একটা পাহাড়ের মাথায় রমণীয় পরিবেশে কুট্‌কু বনবিশ্রাম ভবন। পাহাড় ও বনে ঘেরা প্রকৃতির অপরূপ শোভা। কিন্তু, বিরাট 'ড্যাম' পার্বত্যনদীর স্বচ্ছন্দ স্বাধীন ক্ষিপ্রগতি শৃঙ্খলিত করতে বদ্ধপরিকর। শান্তিময় জনহীন অরণ্যরাজ্য যেন আজ রণক্ষেত্রে পরিণত। অতিকায় ক্রেন বুলডোজার, দৈত্যাকার যন্ত্রপাতির চতুর্দিকে সমাবেশ। বহু লোকজন, কর্মীদল। দিকে

দিকে কর্মব্যস্ততা। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটানোর বিকট শব্দ। শিহরিত পর্বত ও অরণ্য বুকে যেন ভয়চকিত গুরুগুরু প্রতিধ্বনি। নদীর ধারে বন কেটে মস্ত শহরেরও স্থাপনা চলেছে—বহু ঘরবাড়ি, কলকারখানা। এখন আর এই নিভৃত পার্বত্য প্রদেশে গিরি নদীর চিরন্তন সহজ সুন্দর নিসর্গ শোভা নয়, ধ্যানমগ্না মৌন প্রকৃতির প্রশান্তিও নেই,—কলকোলাহলমুখর জনবহুল লোকালয়ের কর্মব্যস্ত জীবনের চঞ্চলতা, যন্ত্রদানবের কর্ণবিদারী বিকট ঘর্ঘর হুঙ্কার!

শেষকিরণ বলে, বেতলা থেকে মোটর-পথে আমরা ৬০ কিলোমিটারেরও ওপর দূরে চলে এসেছি বটে, কিন্তু এও পালামৌ জঙ্গলেরই আর এক দিকে এখন রয়েছি। ঐ পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেলে বড়েষাঁড় এখান থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূর!

বলি, চল ফিরে যাই সেই বেতলাতেই। তোমার বৃক্ষনীড়ে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা কেমন হয় দেখা যাক।

সে এক অভিনব অভিজ্ঞতাই বটে।

বেতলার ট্যুরিস্ট-লজ্-এর পিছনের মাঠে বিশাল এক মহুয়া গাছ। তার গুঁড়িটি যেমন প্রকাণ্ড মোটা, গাছটিও তেমনই উঁচু,—বনস্পতি পদমর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত। গাছের উপরিভাগে চারিপাশে ছড়ানো বড় বড় ডালপালা। কাঠের তৈরি রেলিঙ-দেওয়া একটা চওড়া সিঁড়ি, দুবার এঁকে-বেঁকে, গুড়ি ছাড়িয়ে উপরে সেই ছড়ানো ডালগুলি পর্যন্ত উঠেছে। প্রায় দুতলা-বাড়ির সামনে উঁচুতে। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠতে মাঝপথে এদিকপানে মোটা একটা ডাল যেন হাত ছড়িয়ে পথ রোধ করে, মাথা বাঁচিয়ে হেঁট হয়ে সেই অবরোধ পেরিয়ে এসে সোপানের বাকি ধাপগুলি শেষ করি। সেখানে উঠে দেখি, ঠিক শেষ নয়। সে জায়গায় কাঠের তক্তা পাতা চতুষ্কোণ প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ। তারই ডানদিকে ডালের উপর কাঠের চারকোণা একটা ছোট ঘর,—দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়,—স্নানাগার। সাজানো-গোছানো। জলের কল-লাগানো 'ওয়াশ-বেসিন'—মুখ হাত ধোওয়ার জায়গা। আরশি, আলনা। এক পাশে 'ফ্লাশ কমোড'। বালতি করে গরম জল আনিয়ে স্নানেরও ব্যবস্থা করা চলে। সেই প্ল্যাটফর্মের বাঁদিকে আরও চার-পাঁচটা ধাপ বেয়ে উঠে থাকবার ঘরে ঢোকবার দরজা। সেখানে প্রবেশ করে অবাক হয়ে যাই। এ কী একটা গাছের উপরে রয়েছি। বিশ্বাসই হয় না। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন, আসবাবপত্রে সুসজ্জিত কাঠের ঘর,—শহরবাসী শৌখিন ব্যক্তির আরামপ্রদ আবাসগৃহ। ইলেকট্রিক আলো। ঝকঝকে পালিশ-করা কাঠের দেওয়াল। দরজা, জানলায় ফুলকাটা রঙিন পর্দা ঝোলানো, মেঝেতে কার্পেট বিছানো। একপাশে দেওয়ালে সংলগ্ন টেবিল,—সেখানে 'টাম্বলারে' পানীয় জল রাখা। লাল টুকটুকে একটি টেলিফোন যন্ত্র পর্যন্ত রয়েছে। খান দুই চেয়ার। ঘরের আর এক ধারে জোড়া পালঙ্ক। ডানলোপিলোর গদি, বালিস। রঙিন বিছানার চাদর। ভালো কম্বল। 'মশারির দরকার হবে না, তবু বলেন তো লাগিয়ে দিতে পারি',—পরিচারক বিনীতভাবে জানায়। খাটের দু হাত দূরে আর একটা দরজা। সেদিক দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দু ধাপ নামলে লম্বা ঝোলা কাঠের বারান্দা। রেলিঙ ঘেরা। সেখানে বেতের চেয়ার পাতা। গাছের গুঁড়ি ও ডালের উপর বাড়ি—মাথার উপর ঘন ডালপালার যেন টোপর পরা,—চারিপাশে ঝিলমিল করে পাতার ঝালর ঝোলে। সারা বাড়ি, সিঁড়ি,—সবুজ রঙ করা। গাছের সবুজ রঙে রঙ মিলিয়ে একাঙ্গ হতে চায়। ঘরের ভিতর চলাফেরা করলে ঘর একটু কাঁপে, দোলে। কাশীতে একবার গঙ্গাবক্ষে দিনকুড়ি নৌকাবাস করার সুযোগ হয়েছিল। ছোট ডিঙি নয়,—বজরা। তারই ঘরের উপর ছাদে পায়চারি করতাম। সারাক্ষণই নৌকা কেমন দুলত! কখনও মৃদু, কখনও জোরে। মা গঙ্গা যেন কোলে শুইয়ে তরঙ্গদোলে দোল দিতেন। আজ মনে পড়ে সেই কথা।

পর্বতের উচ্চপ্রদেশে শীতের প্রাবল্য থাকে, জানি। কিন্তু এখানেও গাছের উপর, সবুজ পত্রাবলীর আচ্ছাদনে, রাত্রে যে এমন প্রচণ্ড হিমস্পর্শ অনুভূত হবে, জানা ছিল না। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি। গহন অরণ্যরাজ্য। গাছের উপর পাতায় ঘেরা কাঠের ঘর। দিনেও হয়ত ভালভাবে রোদ ঢোকে না। সেইখানে রাত কাটানো। শীতের আধিক্য অস্বাভাবিক নয়। রাতে ঘুম ভেঙে যায়। হঠাৎ স্মরণে আসে, মাউন্ট এভারেস্টের অদূরে থিয়াংবোচির পান্থশালার কাঠের ঘরে নিদারুণ শীতের মধ্যে সেই প্রথমবারের বিনিদ্র রজনীর অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। আশ্চর্য! সে কথা ভাবতেই এখন এখানকার শীতের যেন মাত্রা কমে।

বিছানা ছেড়ে ঘরের বাইরে আসি। সিঁড়ির উপর সেই মঞ্চে এসে দাঁড়াই। তারাভরা আকাশ। কিন্তু, নীচে বনভূমির গাছগুলির মাথায় কুয়াশার রেশমী কাপড়ের সূক্ষ্ম আবরণ। নিঝুম নিস্তব্ধ অরণ্য রাজ্য। সুপ্তিমগ্না রজনী। আচম্বিতে ক'হাত নীচে এই গাছের তলায় হুড়মুড় শব্দ। চমকে উঠি। সম্বরের দল নিশ্চিন্তমনে নির্ভয়ে তৃণভোজনে ব্যাপৃত ছিল বোধ হয়, গাছের শাখায় অবাঞ্ছিত মানুষের উপস্থিতি কি করে বুঝতে পারে। তারাও চমকে ওঠে।—সভয়ে হুড়োহুড়ি করে ছুটে পালায়। আমিও কেমন-যেন অপ্রস্তুত হয়ে যাই,—অনধিকার প্রবেশের অস্বস্তি বোধ করি।

ঘরে ফিরে ওদিকপানে বারান্দায় চলি। চেয়ার টেনে নিয়ে, গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে স্থির হয়ে বসি। আদিম অরণ্যের নিবিড় শান্তির মাঝে মন মিশে থাকে। রজনীর শেষ প্রহরগুলি অজানিতে কখন কেটেও যায়।

সকালে আবার বনমধ্যে ঘোরা। ক্রমে বন ও পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্যদেব উঁকি মারেন। বনের ধারে উন্মুক্ত ময়দানে সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দলে দলে চিতল হরিণ চরে দেখি। বড়শিঙা হরিণও দেখা যায়। মাঠের এক নিরালা কোণে দুটি হরিণ বসে। প্রভাতের "করুণ কোমল আভা গভীর সুন্দর",—মৃগযুগলেরও মনোহর মূর্তি। সুদৃশ্য বাঁকানো শিঙ দিয়ে হরিণ তার সঙ্গিনীর দেহ কণ্ডূয়ণে রত। স্পর্শমুখে হরিণীর অর্ধ-নিমীলিত আঁখি, হেলায়ে রয়েছে তার বঙ্কিমগ্রীবা। মুগ্ধ হয়ে দেখি, কুমারসম্ভব কাব্যে বসন্তের আবির্ভাব বর্ণনার সেই মধুর দৃশ্য আজ জীবন্ত হয়ে ওঠে; "শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং/মৃগমীকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ।"

শেষকিরণ আমার মনের ভাব ধরতে পারে না। বলে, চিতল হরিণ তো এ বনে বহু দেখেছেন,—চলুন এবারে বাঘের বাচ্চাদুটো দেখতে। তারপর যাব চেরো রাজাদের সেই দুর্গে।

এগিয়ে চলি মাঠের আর এক দিকে।

কিন্তু, এ কী! এ যে দেখি শহরের পশুপক্ষিশালার মতন লৌহ আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দী দুটি লেপার্ডশাবক! বেচারী! বনে থেকেও বন্দী! চারপাশে তারের জাল দিয়ে ও পরিখা কেটে ঘেরা।

শেষকিরণ জানায়, ও-ভাবে না রেখে উপায় নেই। আত্মরক্ষা করার মত এরা বড় হলে এদের বনে ছেড়ে দেওয়া হবে।

জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু ধরে এনে রাখা হল কেন?

শুনি, আদিবাসীরা বনের মধ্যে মধু সংগ্রহের জন্য ঘোরে। কখনও-সখনও জন্তু-জানোয়ারের অসহায় বাচ্চা দেখতে পেলে ধরে আনে। বন-বিভাগের কর্তৃপক্ষের কানে খবরটা পৌঁছে গেলে তাঁরা সেগুলি তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেন। সযত্নে প্রতিপালন করতে চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য থাকে, বড় হলে আবার বনে ছেড়ে দেওয়া। Joy Adamson-এর সেই Born Free ও Living Free সিংহের মতন।

বলি, উড়িষ্যায় সিমলিপালে খইরি নামে একটা বাঘকেও পোষ মানিয়ে রাখা হয়েছিল, শুনেছি।

শেষকিরণ বলে, কিন্তু মুশকিল হয়, বাচ্চাগুলোকে সব সময়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। মিস্টার এ. কে. চ্যাটার্জিকে আপনার মনে আছে নিশ্চয়?

বলি, অলোক চ্যাটার্জিকে? অবশ্যই। চাতরায় তিনি যখন ডি. এফ্. ও., তাঁর সঙ্গে তখন পরিচয় হয়। তাঁর কথা 'কাবেরী কাহিনী' বইখানিতে আছে। তিনিই তো সেবার সঙ্গে করে নিয়ে যান খয়-বনারু ও লীলাজনের উৎস দেখাতে। হিন্দিয়াতে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ক'দিন নির্জনবাসের ব্যবস্থাও করিয়ে দেন। তাঁর কথা কি ভুলতে পারি?

শেষকিরণ বলে, ঐ চাতরায় থাকতেই তিনি একবার এক আদিবাসীর কাছ থেকে তিনটি বাঘের বাচ্চা উদ্ধার করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা ও প্রচুর যত্ন সত্ত্বেও তার একটিকেও বাঁচাতে পারেন নি।

আমি বলি, এস. পি. শাহীর একখানি অতি সুন্দর বই আছে—Backs to the Wall—Saga of Wild Like in Bihar। চমৎকার সব ছবিও আছে তাতে। সেই বই-এ ঐ ঘটনাটি তিনি উল্লেখ করেছেন। আরও এক ঘটনা লিখেছেন—একটা প্যান্থারের চিতার বাচ্চা সম্পর্কে। সে বাচ্চাটিকেও হাজারিবাগ জেলার জঙ্গলে পাওয়া যায়। শাহীজি বছরখানেক বয়স পর্যন্ত তাকে কাছে রেখে লালন-পালন করেন। নামকরণ করেন—জলী! তারপর পালামৌর এই বেতলার জঙ্গলে এনে রাখেন—হয়ত এই জায়গাতেই। বেতলার বনে হাতির দলের খুব ঘোরাঘুরি, পাছে তাদের পায়ের চাপে বাচ্চাটা প্রাণ

হারায়, তাই তার থাকবার জায়গাটার চারদিকে পরিখা কেটে, জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হল। নিকটে হাতির যাবার আর আশঙ্কা রইল না। জলীর থাকবার জায়গায় পাথরের গুহাও ছিল। বেশ ভালভাবেই সে থাকত,—কখনও গুহার মধ্যে ঢুকে কখনও বা মাঠের মাঝে পলাশ গাছটার ওপর উঠে ডালের মধ্যে বসে। যে লোকটি তার দেখাশোনা করত, সে কাছে গেলে দু পা তুলে দাঁড়িয়ে জলী তার হাত চাটত। তার ঘেরা এলাকায় বাইরে চিতল হরিণের দল এসে মাঠে যখন চরত, জলী তার গুহার পাথরের মাথায় উঠে যেন ওত পেতে বসে থাকত—লোলুপ দৃষ্টিতে। কিন্তু নিকটে হাতির ডাক শুনলেই বেচারী ভয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ত, কখনও বা ছুটে পলাশ গাছে লাফিয়ে উঠে লুকাত। তারপর হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটল।

—জলীর এলাকার মধ্যে পড়ে রয়েছে তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। আশ্চর্য ব্যাপার! ওখানে ঢুকে তাকে এভাবে মারলে কে? প্রকাশ পেল, ঘেরাজাল কেটে ছিঁড়ে গর্ত করা, মাঠের কাদায় চারপাশে বড় বড় থাবার দাগ। প্রমাণ হল, বেতলা বনচারিণী এক বাঘিনীর কীর্তি! সাধারণত বনের মধ্যে বাঘ লেপার্ডকে আক্রমণ করে না, মারেও না। তবে বাঘের শিকার-করা মৃত পশুর খাদ্যে ভাগ বসাতে এলে বাঘের হাতে লেপার্ডের মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু এখানে এই অঘটন ঘটল কেন? শাহীজি এক বিদেশী বিশেষজ্ঞকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, বাঘ ও লেপার্ড একই বনের মধ্যে বিবাদ না করে পরিচিত প্রতিবেশীর মত ঘোরাঘুরি করে ঠিকই। কিন্তু বাঘের স্বভাব হল, নিজস্ব এলাকার মধ্যে, বহিরাগত বলবান পশুর উপস্থিতি পছন্দ করে না। জলী এসেছিল হাজারিবাগের বন থেকে; তাই বাঘের চোখে এটা তার অনধিকার প্রবেশ, এবং তারই শাস্তিভোগ করতে হল!

শেষকিরণ এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এখন বললে, ও-ঘটনা আমার জানা। জলীকে আমিও দেখে গিয়েছি। তবে শাহীসাহেবের বইটা দেখি নি। এইবার যোগাড় করে পড়তে হবে। এখন অবশ্য লেপার্ডের এই বাচ্চা দুটোকে খুব সতর্কতার সঙ্গে রাখা হয়েছে। আর একটু বড় হলেই বনে এদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

আমাদের দেখতে পেয়ে বাচ্চা দুটো ছুটে লোহার জালের নিকট আসে। ছটফট করে ঘোরে। কী যেন চায়। খাবার? কিংবা বন্ধন-মুক্তি? অথবা তারাও হয়ত বোঝে, কৌতূহলী মানুষ এই ভাবে আবদ্ধ করে রেখে দেখতে এসেছে তাদের,—এই অভয়ারণ্যেও এমন বন্দীদশায়! মনে পড়ে, Knut Hamsum-এর Hunger-এ পড়েছিলাম :

"It did not interest me in the least to see animals in cages. These animals know that one is standing staring at them; they feel hundreds of inquisitive looks upon them; are conscious of them. No; I would prefer to see animals that didn't know one observed them; shy creatures that nestle in their lair, and lie with sluggish green eyes, and lick their claws, and muse, eh?..."

এবং বন্যপশু দর্শনের আনন্দ ও সার্থকতা থাকে কখন :

"It was only animals in all their native wildness in their fearfulness and peculiar savagery that possessed a charm. The soundless stealthy tread in the dead darkness of night, the hidden monsters of the woods : the shrieks of a bird flying past; the wild, the smell of blood, the rumblings in space; in short, the reigning spirit in the kingdom of savage creatures brooding over savagery...The poetry of the Unknown!"

পিঞ্জরাবদ্ধ জীবজন্তু দেখতে আমার কোনই আগ্রহ নেই। সেই প্রাণীগুলি জানতে পারে, একজন একদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের প্রতি এই শত শত কৌতূহলী দৃষ্টিপাত তারা অনুভব করে,—এ সম্পর্কে তাঁরা সচেতন। না, আমি বরং তাদের অজানিতে এমনভাবে দেখতে চাই, তারা না বোঝে কেউ তাদের প্রতি লক্ষ্য করছে;—ভয়তরাসে নিভৃতিপ্রিয় প্রাণীগুলি নিজ কোটরে আরামে তারা বাস করে, ঢুলু ঢুলু সবুজ জুলজুল চোখে শুয়ে থাকে, আপন থাবা চাটে—আপন ভাবে বিভোর হয়ে।

জন্তুদের জন্মগত বন্য স্বভাব, তাদের ভয়ঙ্কর প্রকৃতি এবং বিচিত্র হিংস্রতার মাঝেই মনোহারিত্ব থাকে। নিশীথের নিঃসাড় অন্ধকারে তাদের নিঃশব্দ গোপন পদক্ষেপ, বনের অন্তরালে গুপ্ত হিংস্র প্রাণিকুল, অকস্মাৎ উড়ে-যাওয়া নিশাচর পাখির তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠধ্বনি, বাতাসের শনশন শব্দ, রক্তের গন্ধ, গুরুগুরু আবহাওয়া,—এই সব মিলে হিংস্রতার আবেশে মগ্ন বর্বর জীবজগতের প্রকৃতির প্রকৃত লীলাভূমি...সে যেন কোন্ অজানা জগতের কাব্য।

আদিম অরণ্যানীর মুক্তাঙ্গনে স্বাধীন জীবজন্তুর অবাধ জীবনযাত্রার সেই অপূর্ব রসাস্বাদনের আশায় আমারও বার বার পালামৌ বিহার।
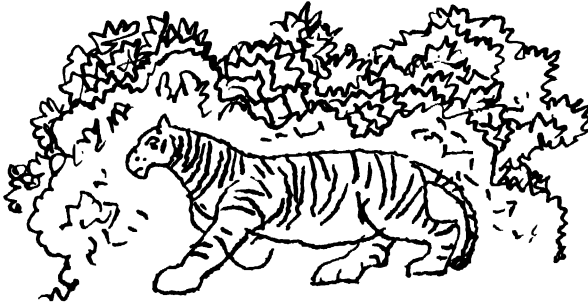
কাবেরী-কাহিনী

সেই কোন্ কালে যৌবনের গণ্ডী পার হয়েছি। প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখা, তাও কবে ডিঙিয়ে এসেছি। এখন চলে বার্ধক্যের ধীর-মন্থর চাঞ্চল্যবিহীন দিনগুলি। এ যেন ছড়িয়ে পড়া নদীর সাগর-কূলে এগিয়ে আসা। তবু, এই বয়সে হঠাৎ যে এমনি ভাবে কাবেরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। এ অঘটন ঘটল কেমন করে, তাই বলি। কেন না, দেখি, কাবেরী আমার একার নয়,—সবারই।

প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভাল,—কাবেরী নদী। আর, আমি? নগণ্য এক পর্যটক। ঘুরে বেড়াই আপন মনে এখানে সেখানে। হিমালয়ের পথে পথে। কীসের সন্ধানে? কে জানে?

বছরেরও আগে মহীশূর, বাঙ্গালোর, উটকামন্ড ইত্যাদি শহর দেখা। মনের মণিকোঠায় সযত্নে তুলে রাখা সে-সব স্বর্ণ-স্মৃতিকণা। এবার চলি মহীশূর দেশের পশ্চিম-দক্ষিণ অঞ্চলে। আমার না-দেখা নতুন দেশে। গুজরাটী এক বন্ধু—কান্তিসেন শ্রফ্—সস্ত্রীক মোটরে ঘোরেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে। এ তাঁদের বহুদিনের অভিলাষ। কেন,—সে কথাও শোনাই।

কান্তির সঙ্গে পরিচয় হয় অদ্ভুতভাবে। আজ নয়। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে।

সে-বছর বেড়াতে যাই রাজপুতানা অঞ্চলে। আবু পাহাড়ে পৌঁছেছি। নক্কিলেকের ধারে নিরালা এক কোণে দেখি একটি ছেলে একমনে স্কেচ আঁকে। পরনে হাফ প্যান্ট। খালি পা। গায়ে হাত-কাটা শার্ট, পুল-ওভার। ফর্সা রঙ। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। নিকটে গিয়ে দাঁড়াই। সুন্দর আঁকার হাত। দেখে খুশি হই। প্রশংসা করে আলাপ করি। বছর ষোল বয়স। বম্বেতে থাকে। সবে ম্যাট্রিক পাস করেছে। বাবা নেই। মা আছেন। বড় দাদা বৈজ্ঞানিক। নানান বিষয়ে গবেষণা নিয়ে মশগুল। তাঁর ইচ্ছা, ভাইও বৈজ্ঞানিক হয়।

ভাইয়ের কিন্তু আর্টিস্ট হওয়ার প্রবল বাসনা। টানা বড় বড় চোখ দুটি তুলে মুখের পানে তাকায়। বলে, বলুন তো, ছবি আঁকায় কত আনন্দ। ছেলেবেলা থেকেই নিজে নিজেই আঁকি।

হেসে প্রশ্ন করি, তাই বুঝি পালিয়ে এসেছ একা, কাউকে না জানিয়ে?

সে আশ্চর্য হয়ে বলে, কই, না তো! মা-দাদার অনুমতি নিয়েই ঘুরতে বেরিয়েছি।

জিজ্ঞাসা করি, পায়ে জুতো নেই কেন?

মুখ হেঁট করে গম্ভীর সুরে বলে, দেশের কত লোকই তো পরতে পায় না।

পায়ের বুড়ো আঙুলে ফেটি বাঁধা। পাথরে পা কেটেছে।

বলি, চল ধর্মশালায়, ওষুধ দিয়ে স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে দেব।

সসঙ্কোচে আসে। বলে, সামান্য আঘাত। কিছুই নয়।

বলি, ছোটকেও তুচ্ছ করতে নেই। ছোট থেকেই বড় হয়।

ধর্মশালায় পৌঁছে বলে, এইখানে তো আমিও উঠেছি।

এইভাবেই পরিচয় শুরু। তারপর আমাদেরই দলের সঙ্গে ঘুরতে থাকে। নিজের কোন পরিচয় দিই না। দেবার কোন কারণও থাকে না। বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না দেখি। শুধু জানে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। গুজরাটী ভাষায় তাঁদের বই কয়েকটা পড়েছে। আর নাম শুনেছে, আঁকা-ছবি দেখেছে,—অবনীন্দ্রনাথের, নন্দলালের। একদিন বলে, জানেন শান্তিনিকেতনে ভর্তি হওয়াই আমার জীবনের স্বপ্ন। কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়।

উৎসাহ দিয়ে বলি, বম্বে ফিরে তোমার মা ও দাদার অনুমতি যদি পাও, শান্তিনিকেতনে তোমার ভর্তির ব্যবস্থা হয়ত হয়ে যাবে। জানিয়ো আমাকে।

শুনে হাতে যেন স্বর্গ পায়।

বম্বেতে ফিরেই সুসংবাদ জানায়। শান্তিনিকেতনে চলেও আসে। কলাভবনে নন্দলাল, বিনোদবাবু,

রামকিঙ্করের ছাত্র,—সে কী তার আনন্দ!

পরের বছরই ১৯৪২ সালের আন্দোলন শুরু। চারিদিকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। বিদ্যায়তনও সব বন্ধ। তাকেও ফিরে যেতে হয় বম্বে। ১৯৪২-এর আন্দোলনে যোগও দেয়। কারাবাসও ঘটে। একা তারই নয়—তার দাদারও। জেল থেকে বেরিয়ে এল সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব নিয়ে। চিঠি লিখে জানায়, দাদার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, কর্মক্ষমতা দেখে মুগ্ধ। দেশে এখন বিজ্ঞানেরই দাবি বেশি। দাদার কাজেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করছি।

আমাদের উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্রের নিয়মিত আদানপ্রদান থাকে। দু'বছর পরে আবার বম্বে যাই। তাদেরই কাছে উঠি। দেখে আসি, ছোট একটা টিনের সেড, ছোট্ট ফ্যাক্টরি। দাদার সঙ্গে একমনে কাজ করে চলেছে। সেই হাফ প্যান্ট, হাত-কাটা শার্ট। হাতে তুলি নয়, কিন্তু রঙ মাখা। ছবি আঁকতে নয়। অ্যাসিডে রঙিন। কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি। নিজেদের হাতেই সব গড়া। এমন কি মেসিনারি তৈরি করা পর্যন্ত। দাদার আদর্শ,—ভারতে যে সব রাসায়নিক পদার্থ বা বস্তু তৈরি হয় না, বিদেশ থেকে আমদানি হয়,—সে-সবই স্বদেশে একে একে প্রস্তুত করবেনই। আপন খরচায় বিদেশে যান, প্রস্তুত-প্রণালী নিজে দেখে শিখে আসেন, গবেষণা করেন, এখানে কাজ শুরু করে দেন। ইনিই ভারতে প্রথম প্লাস্টিক তৈরি করেন। ধীর, স্থির, শান্ত মানুষ। কথা বলেন কমই। কাজ নিয়েই সদাব্যস্ত। অথচ, দেখলেই মনে হয় সারাক্ষণই মন তাঁর গভীর চিন্তায় আমগ্ন। কয়েক বছরের মধ্যেই প্রমাণ করে দেন, এ-দেশেও সব কিছুই হওয়া সম্ভব। ভারতবর্ষ সর্ব-রত্নপ্রসূ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ছোট্ট কারখানা বড় হয়ে ওঠে। ভারতে বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন ফ্যাক্টরিরও প্রতিষ্ঠান হয়। যে আসে তাকেই আপন আবিষ্কৃত পদ্ধতি শেখান। ফ্যাক্টরির অধিকাংশ কর্মী যোগাড়ও করেন বিচিত্র পদ্ধতিতে। ভিখারী ছেলে ভিক্ষা করতে এলে সাদরে ডেকে নেন, কাজ শেখান। এখন বম্বে ফ্যাক্টরিতে গেলে দেখা যায়, সেই সব ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশ ঘুরে এসেছে, ফ্যাক্টরির শাখা-বিশেষের দায়িত্বভার নিয়েছে। বিদেশী ব্যবসায়ীরা স্রফ্-ভ্রাতাদের নিকট আসেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে, ভারতে একজোটে কাজ করার প্রস্তাব নিয়ে। দাদার সব কাজের দক্ষিণ হস্ত—কান্তিসেন। সে-ও এখন নাম-করা ফলিত-রসায়ন-বৈজ্ঞানিক।

শুধু কি আর্টিস্ট ভাইয়েরই এই পরিবর্তন? তাঁদের মায়েরও কথা বলি। প্রথম যখন তাঁকে দেখি, কথায়-কথায় বলেন, জগন্নাথ-দর্শনের তাঁর বহুদিনের আকাঙক্ষা। তাঁকে তখনই জানাই, আমাকে লিখলেই পুরীতে থাকবার ব্যবস্থা সহজেই করা যাবে।

তারপর কতবার তাঁর সঙ্গে বম্বেতে দেখা হয়। দেখা হলেই পুরী যাওয়ার কথাও তুলি। কিন্তু দেখি, তাঁর তীর্থযাত্রার দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। তিনি তখন থাকেন ফ্যাক্টরির এলাকার মধ্যে। দুবেলা কর্মীদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর ভার নিয়েছেন নিজের হাতে। তাই, হাসিমাখা মুখে বলেন, আমার শ্রীক্ষেত্র এখন এইখানেই, এই আমার আনন্দবাজার!

কান্তিসেনের সঙ্গেও চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ থাকে। দেখাও হয় মাঝে মাঝে। বম্বেতে গেলে তাদের কাছেই থাকি। দেখা হলেই হেসে বলি, বহু বছর আগে তোমার নামেই এক আর্টিস্ট ছিল, তার খবর রাখ নাকি—সে হাসে। মাত্র দু'বছর আগের কথা। কান্তিসেন তার চিঠিতে নিদারুণ দুঃসংবাদ জানায়, দাদা নেই। পরশু রাতে হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল। এ যেন মাথায় বাজ পড়ল। জল-জ্যান্ত মানুষ, রোজই যেমন কাজ করেন, তেমনি করেছেন। রাত ন'টা পর্যন্ত ফ্যাক্টরির কাজ সম্পর্কে লোকেদের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। কদিন ধরে ফ্যাক্টরির মধ্যে গেস্টহাউসে রাত কাটাচ্ছিল। হঠাৎ রাতদুপুরে ভাইপোর ঘুম ভেঙে যায়। দেখে ঘরের সব জানলা খোলা, পাখা পুরোদমে চলে—এই জানুয়ারি মাসেও—তিনি তারই তলায় অস্বাভাবিক অবস্থায় নিঃশ্বাসের কষ্টে হাঁফান। টেলিফোনে খবর পেয়েই তখনই আমরা ছুটি, ডাক্তারও আসে। কিন্তু তার আগেই সব শেষ! লিখব আর কী? আসতে পারেন না এখনই?

চলে যাইও। তাঁদের মা তখনও বেঁচে। আশির উপর বয়স। দু'মাস পরে তিনিও গেলেন। ভাবি, বিধির এ কী বিচিত্র বিচার!

প্রথম দিকে কান্তিসেন মুষড়ে পড়ে। তারপর নতুন উদ্যম নিয়ে আবার কাজে লাগে। বলে, দাদা নেই, তাঁর অসমাপ্ত কাজ আমাদের শেষ করতেই হবে।

এই কান্তিসেনই বম্বে গেলেই বলত, চলুন গোয়া দেখেননি, ঘুরিয়ে আনি।

কিন্তু কোনবারই তা হয়ে ওঠে না। এই বছর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই মোটরে যাত্রা। গাড়িতে উঠে বলে, ফ্যাক্টরি ছেড়ে বেরুলামই যদি, তবে শুধু গোয়া কেন? চলুন, আপনাকে নিয়ে আরও ঘোরা যাক। দিন কুড়ি বাইরে কাটাব, ব্যবস্থা করে এসেছি।—বলে নিশ্চিন্ত মনে আরামে গাড়িতে গদিতে দেহ এলিয়ে দিয়ে বসে। পাশেই তার স্ত্রীর প্রতি কোমল দৃষ্টিতে তাকায়। মৃদু হেসে বলে, আমাদের প্রোগ্রাম করেছে চন্দা,—অবশ্য, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে। তার এ-সব অঞ্চলই দেখা।

চন্দার হাতে প্রকাণ্ড রুট-ম্যাপ। দুজনে কোলের উপর ছড়িয়ে পাতে। হেঁট হয়ে আঙুল দিয়ে দেখাতে থাকে কোথা থেকে কোথায় যাবে।

চন্দাও আর্টিস্ট। কান্তিসেনেরও সুপ্ত আর্টিস্ট মন জেগে ওঠে। প্রোগ্রামও হয় সেইমত। মোটরে দীর্ঘ যাত্রা শুরু হয়। প্রশস্ত রাজপথ ধরে সবেগে ছুটে চলে।

কান্তি ও চন্দা দুজনেই আপন অগ্রজের মতন আমাকে শ্রদ্ধা করে। আমার সুখ-সুবিধা দেখতে সদাই উদ্‌গ্রীব। শুধু বোঝে না, পায়ে হেঁটে ঘোরাতেই আমার প্রকৃত আনন্দ। উল্কার মত মোটরে দেশ-দেশান্তরে ছুটে চলা, এর রোমাঞ্চ থাকলেও আমার নিকট তার আবেদন নেই। কিন্তু যে-সব জায়গায় নিয়ে চলে, অত অল্প সময়ে এত বিভিন্ন স্থান দেখা সম্ভবই হত না,—যদি না আসতাম মোটরে। অথচ, এ যেন স্থান থেকে স্থানান্তরে 'বুড়ি-ছুঁয়ে ছোটা'। মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করার আগেই বিদায় নেবার ঘণ্টা।

মোটর ছোটে বায়ুবেগে। দিনের পর দিনও কাটে। একে একে দেখা হয়,—

সুপ্রসিদ্ধ সেই বাদামীর গুহা-মন্দিরের ভাস্কর্য-সৌন্দর্য। এককালীন চালুক্য রাজ্যের ভগ্নাবশেষ।

বিমুগ্ধ হই, পট্টাদকল ও আইহোলের মন্দির-স্থাপত্য দেখে।

তুঙ্গভদ্রাতীরে হামপি বা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গৌরবময় বিশাল রাজধানীর এখন বিষাদময় ভগ্নস্তূপের শ্মশানভূমি মনে বৈরাগ্য জাগায়।

আবার, মাইল দশেক মাত্র দূরেই,—হস্‌পেটের (Hospet) নিকটে—আধুনিক কালের মানুষের বিরাট কীর্তি,—তুঙ্গভদ্রার গতিরোধ করে পাহাড়ের মধ্যে সুদীর্ঘ প্রকাণ্ড বাধ—Tungabhadra dam। ৭,৯৪২ ফুট লম্বা, ১৬০ ফুট উঁচু। নবযুগের মানুষের নবীন স্বপ্ন। একদিকে কালের করাল মূর্তি, এখানে আবার আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকদীপ্তি।

মোটর ছোটে অবিশ্রাম গতিতে। নিত্য নূতন দ্রষ্টব্য স্থানেরও শেষ নেই। পৌঁছাই বেলুড়ে।

দশ মাইল দূরে দেখে আসি হালেবিদ-ও। ঘুরে ঘুরে স্তম্ভিত হয়ে দেখি, সেকালের মানুষের সেই আশ্চর্যময় সৌন্দর্যসৃষ্টি। মন্দির-রচনার ও স্থাপত্যশিল্পের বিশ্ব-বিশ্রুত অপূর্ব চারুকলার নিদর্শন। অতি সূক্ষ্ম, সুনিপুণ কারুকার্য। যেন পাষাণে গাঁথা হরশালার অমরকীর্তির কাব্য-কাহিনী।

আবার মোটর ছোটে। অরণ্য প্রান্তর, গ্রাম শহর চোখের উপর ভেসে চলে। হাসান শহর ছাড়িয়ে চলে যাই শ্রবণবেলগোলায়। ছোট এক পাহাড়। সাগরবক্ষ থেকে ৩.০৫২ ফুট উঁচুতে। পাহাড়ের শিখরের উপর গোমতেশ্বরের অতিকায় মূর্তি,—৭০ ফুটের উপর লম্বা। ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তৈরি।—পাহাড়ের মাথা কেটে একখণ্ড পাথরে-গড়া বিশাল বিগ্রহ। জৈনদের এক প্রধান তীর্থস্থান। পথের উপর মোটর ছেড়ে আধ-ঘণ্টাও লাগে না পাহাড়ের বুকে পাথর-কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে। নীচে থেকে মাত্র ৪৭০ ফুট ওঠা। তবু বহুদূর থেকে দেখা যায়, সেই বিরাট মূর্তি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যেন আকাশে মাথা ঠেকান। এও মানুষের হাতে-গড়া বিশ্বের আর এক বিস্ময়।

আবার ছুটে চলা। এবার কুর্‌গ্‌।

টুরিস্ট মহলে প্রচার, হিমালয়ে যেমন ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর, দক্ষিণ ভারতেও স্বর্গ-ভূমি তেমনি কুর্‌গ্‌। কথাটা,—কোডাগু (Kodagu)। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় রূপায়িত হয়—কুর্‌গ্‌। এই দেশই কাবেরীর জন্মভূমি।

কান্তিসেন বলে, আপনি ঘোরেন হিমালয়ে। আমাদের বম্বে থেকে সে দেশ অনেক দূর। আমাদের কাছে এই কুর্‌গ্‌-ই হিমালয়। ঠিক মনে হয় না যেন হিমালয়ে এসেছি?

চারপাশে ঢেউ-খেলানো পাহাড়। বনের মধ্যে আঁকা-বাঁকা ঘুরে চলা পাহাড়ী পথ। পথের একপাশে পাহাড়ের উঁচু গা। অপরদিকে নীচে নেমে যাওয়া ঢালু খাদ। দূরে আরও উঁচু পাহাড়ের নীল চোখের ইঙ্গিত। হিমালয়ের কথা মনে আনে, আশ্চর্য কি?

এও তো দক্ষিণ ভারতের এক সুবিস্তীর্ণ গিরিশ্রেণীরই অংশ। ভারতের পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে খান্ডেস জেলার কুন্ডাইবারি-গিরিপথ থেকে দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত প্রসারিত এই দীর্ঘ গিরিমালা। প্রায় এক হাজার মাইল এর বিস্তৃতি। ইংরেজ আমলে তার নাম হয় Western Ghats। ভারতীয় প্রাচীন নাম—সহ্যাদ্রি বা সহ্যগিরি। সাগরবক্ষ থেকে গড়পড়তা প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু। সুদূর উত্তরে পুষ্পগিরি শিখর,—৫,২৬০ ফুট। দক্ষিণে প্রসিদ্ধ শিখর ব্রহ্মগিরি—৫,২৭৬ ফুট। তারই কোন এক অংশে কোথায় বুঝি কাবেরীর উৎস। ভারতের পশ্চিম অংশে আরব্য উপসাগরের সমগ্র উপকূল ব্যেপে সহ্যাদ্রি যেন সুদীর্ঘ দুর্গপ্রাকার। প্রকৃতই এই পর্বতশ্রেণীর কোন কোন অংশের মাথার উপর শিলাস্তূপ দূর থেকে দুর্গের মতনই দেখায়।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে সহ্যাদ্রির সাধারণত রুক্ষ কঠোর রূপ। অজস্র শিলাবহুল। অথচ কুর্‌গ্‌-এ দেখি, পাহাড়গুলির সুস্নিগ্ধ শ্যামল শোভা। তরুলতা-সমাচ্ছন্ন প্রকৃতির আরণ্যক রূপ। স্বচ্ছ সুনীল পার্বত্য প্রবাহ। মানুষের শ্রম-লব্ধ শস্য-ক্ষেত। ফল-ফুলের বাগিচা। মাঝে মাঝে পরিচ্ছন্ন গ্রাম। ঘন-বিন্যস্ত কুটির রচনা নয়। প্রতি গৃহের স্বতন্ত্র এলাকা। পাহাড়, উপত্যকা, নদী, বন, সবুজ ক্ষেত,—এই নিয়ে গড়া এই দেশ।

কান্তিসেন উচ্ছ্বসিত হয়ে দেখায়,—পথের দু'পাশে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঐ যে প্ল্যানটেশন—ও-সবই কফির গাছ। আবার ঐ ওদিকে দেখুন,—ও-সব ছোট এলাচের চাষ।

মুখ ঘুরিয়ে দেখার আগেই মোটর সবেগে পাহাড়ের বাঁক ঘুরে যায়! গ্রাম আসে।

কান্তিসেন বলে ওঠে, এবারে আশপাশে এ-সব কমলালেবুর বাগান। আসতেন যদি ফলের সময়, গাছ-ভর্তি সব লেবু দেখতেন।

কিন্তু দেখব কী? মোটর তেমনি ছুটে চলে। আবার কফির চাষ, ছোট এলাচের চারা, লবঙ্গ গাছের বন, রবার প্ল্যানটেশন,—এই সবই কুর্‌গ্‌-এর বাণিজ্য সম্পদ। বাঙালীর চোখে যেন বিদেশী ফসল। নতুন রাজ্য।

কান্তিসেন জানায়, শুধু দেশেরই অভিনব রূপ নয়, অধিবাসীদেরও চেহারা নজর করবেন, কাউকে কাউকে দেখলেই মনে হবে যেন হিমালয় থেকে নেমে এসেছে, ভুটিয়াদের মত মুখ-চোখের ভাব। গোল মুখ, চ্যাপটা নাক, একটু ফর্সা রঙ। অথচ সাধারণ কুর্‌গ্‌বাসী লোকেদের আকৃতি,—লম্বাচওড়া, জোয়ান, টানা চোখ, লম্বা নাক, মাথাও আকারে বড়। এও এক বিচিত্র ব্যাপার। দক্ষিণ ভারতের অন্য কোন অধিবাসীদের সঙ্গে এদের আকৃতিগত মিল নেই। কুর্‌গী ভাষাও কিছু আলাদা। কোথা থেকে, কী ভাবে, কোন্ কালে এই কুর্‌গীরা এখানে এসে বসবাস শুরু করে জানি না।

জানতাম না আমিও তখন। পরে বিশেষজ্ঞদের লেখা বই দেখে কিছু কিছু জানতে পারি।

কুর্‌গ্‌ এককালে মহীশূর রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র থাকলেও এখন স্বাধীন ভারতে মহীশূর প্রদেশের এক জেলা মাত্র। ১,৫৯৩ বর্গমাইল জুড়ে এর বিস্তৃতি। তার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যভূমি। তাই এখানকার লোকবসতি বিরল। সারা দেশের লোকসংখ্যা মহীশূর শহরের বাসিন্দাদের সমান হবে না। এখানকার প্রধান অধিবাসীদের নাম কোডাভা বা কোডাগু! তাই থেকেই কুর্‌গ্‌। জগতের আর কোথাও এই কোডাভা জাতি দেখা যায় না। এদের উৎপত্তি নিয়ে নানান অভিমত। আদিম জাতি,—অতএব পৌরাণিক যুগে এর উৎপত্তির কাহিনীর প্রবাদ প্রচারিত হবে, আশ্চর্য নয়। পাণ্ডবরা নাকি এই অরণ্য অঞ্চলেই অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি কাটান। কোডাভারা সেই পাণ্ডবদেরই কার বংশধর। তাই, জাতিতে ক্ষত্রিয়। আকৃতিও আর্য-অনুরূপ।

নৃতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকরাও এদের সম্বন্ধে একমত নন। কেউ বলেন, এদের পূর্বপুরুষ Scythians। কারও মতে, আরব্য দেশ থেকে এরা আসে। আবার অনেকের অভিমত, সিন্ধু সভ্যতার যুগে এরা সেখান থেকে দক্ষিণে নেমে আসে, এখানে বসবাস শুরু করে,—মূলে এরা ইন্দো-এরিয়ান্‌স্। মোট কথা, এদের উৎপত্তি যাই হোক, দাক্ষিণাত্যের এই বিজন অরণ্য পর্বতের নিভৃত আশ্রয়ে এরা বহুকাল ধরে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে থাকে। এদের আকৃতি-প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার, বেশভূষা,—সবই চারিপাশের অপর অধিবাসী থেকে পৃথক। অবশ্য কালের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এদেরও মধ্যে বর্ণসঙ্কর দেখা দেয়। সমীপবর্তী রাজন্যবর্গের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এদেরও স্বাধীনতা মাঝে মাঝে হরণ করে। তার মধ্যে

লিঙ্গায়েত রাজাদের আধিপত্যই সর্বপ্রধান।

রাজনৈতিক এই সকল ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও কোডাভারা জাতিগত আপন বৈশিষ্ট্য অনেকখানি বজায় রাখে। আত্মসংরক্ষণের প্রয়োজনে জাতি হিসাবে এদের রণকুশল ও সাহসী করে তোলে। যোদ্ধারূপে এদের খ্যাতিও বাহিরজগতে ছড়িয়ে পড়ে। অস্ত্রপূজা কোডাভাদের এক প্রধান পর্ব। ঢাল-তরোয়াল হাতে রণনৃত্য উৎসবের এক বিশেষ অঙ্গ। এদের সামরিক দক্ষতার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় প্রধান সেনাধ্যক্ষ কারিয়াপ্পা কুর্‌গ্ সন্তান। জেনারেল থিমায়াও।

কিন্তু থাক এখন কোডাভাদের কথা। আমাদের যাত্রাকাহিনীর সূত্র ধরি।

বন-পাহাড়-গ্রাম অতিক্রম করে পৌঁছুই মার্‌কারাতে। কুর্‌গ্-এর প্রধান শহর।

ছোটখাটো সুন্দর হিল্-স্টেশন। ৩,৯০০ ফুট উঁচুতে, পাহাড়ের মাথায়। মার্‌কারা নাকি মহাদেশপেঠ নামের অপভ্রংশ।

কান্তিসেন বলে, চলুন, সার্কিট হাউসে জায়গা পাওয়া যায় কিনা দেখি। কদিন একটানা ঘোরাঘুরির পর এখানে দিন তিন-চার আরামে সুস্থির হয়ে কাটানো যাক।

চন্দার দিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকে হেসে বলে, পরামর্শটা অবশ্য চন্দারই। ওর দুশ্চিন্তা জেগেছে, আপনি হয়ত ক্লান্ত হয়েছেন।

শহরের বাইরে একান্তে 'সার্কিট হাউস'। অতি শান্ত মনোরম পার্বত্য পরিবেশ। গেটে লেখা 'সুদর্শন গেস্ট-হাউস'। শুধু নামেই নয় দেখতেও নয়নরঞ্জন। যেমন হাল-ফ্যাশানের সুদৃশ্য প্রকাণ্ড বাংলো, তেমনি সুন্দর সাজানো বাগানও।

কিন্তু চেষ্টা করেও জায়গা মেলে না। সর্বভারতীয় সরকারী বড় বড় অফিসারদের কি এক অধিবেশন চলছে ক'দিন ধরে। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও কারা সব এসেছেন। বাইরে কার-পার্কে দাঁড়িয়ে সারি সারি বড় বড় মোটর। তক্‌মা-লাগানো পোশাক-পরা ড্রাইভার-চাপরাশী। চারপাশে তাকিয়েই মনে হয়, যেন উৎসব-প্রাঙ্গণে আমরা অনাহূতের দল। তবুও মনে কৌতূহল জাগে। জিজ্ঞাসা করি, কুর্‌গ্-এর এই মার্‌কারাতে এ কনফারেন্স কেন? মার্‌কারার কি ঐ সভার আলোচ্য বিষয়ে কোন বিশেষ প্রাধান্য আছে?

এ অফিসার হেসে বলেন, ব্যাপারটা তা নয়। কুর্‌গ্-এর সম্পর্কে কোন ইন্টারেস্টই নেই। কুর্‌গ্-এ ভি.আই.পি.-রা অনেকেই আসেননি, অথচ জায়গাটার সুখ্যাতি শোনা যায়, তাই ঠিক হল সভার অধিবেশন এখানেই হোক। এই সুযোগে দেশটা দেখা হয়ে যাবে। এসেছেনও অনেকে কম দূর থেকে? সেই দিল্লী, সিমলা, অমৃতসর, নাগপুর, কলকাতা, মাদ্রাজ, বম্বে,—কোথায় নয়?

দেখি ঠিক তাই বটে। এর ফলভোগ তার পরেও চলে। কান্তিসেন ওখান থেকে নিয়ে যান ইন্‌স্‌পেকশন বাংলোতে। বলে, দেখবেন, সে-ও সুন্দর জায়গা। গতবার এসে সেইখানেই উঠেছিলাম।

শহরের অপর আর এক প্রান্ত। পাহাড়ের একেবারে মাথার উপর। নিকটে গাছপালা নেই। চারিদিক খোলা। দিগন্তব্যাপী অবাধ দৃষ্টি চলে। বাড়িটিও সুন্দর ঠিকই। কিন্তু সেখানেও জায়গা পাই না। সেই মহারথীদেরই দলের ভিড়। অগত্যা শহরের মধ্যে চৌরাস্তার কাছে বিরাট যাত্রী নিবাস—Travellers Bunglow-তে নেমে আসা হয়। কিন্তু এখানেও ঘর ভর্তি। বড়কর্তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ সহকারীরা উঠেছেন। অবশেষে স্থানীয় এক সজ্জন অফিসারের চেষ্টায় ও অনুকম্পায় একখানা ঘর কোনমতে পাওয়া যায়। ভাল লাগে না আমার এই ঘরের সন্ধানে ছোটাছুটি, শহরের হৈচৈ, ভিড়, সাজানো সভ্যতার আবহাওয়া, সরকারী আমীর-উম্‌রাহের উদ্ধত আচরণ।

কান্তি বলে, এবারই হঠাৎ এ-রকম দেখছি, নইলে শহর হলেও মার্‌কারা শান্ত জায়গা, প্রাকৃতিক শোভা আছে।

চুপ করে শুনি।

কোন রকমে রাত কাটে। পরের দিন সকালে চেয়ার টেনে লম্বা বারান্দায় বসি। প্রকাণ্ড বাড়ির দেওয়ালের পাশ দিয়ে পাহাড়ের একটা চূড়া উঁকি মারে। দু-একটা চেনা পাহাড়ী পাখির রবও শুনি, কিন্তু মোটরের হর্ন, পাশের ঘরের লোকজনের কলকোলাহল সে-শব্দ যেন ডুবিয়ে রাখে। তখনই, কেন জানি না, চকিতে কাবেরীর কথা মনে আসে। যেন, মেঘ-বিষণ্ণ আকাশে উষার আলোর হাসি ফোটে। —কাবেরী! ঠিকই তো, কুর্‌গ্-এই না তার জন্ম? গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা—প্রসিদ্ধ সব

নদীর জন্মস্থান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু কাবেরীর উৎস—এখনও তো অদেখা। এবার কি কুর্‌গ্‌-এ আসা তবে কাবেরীরই টানে।

কান্তিসেনকে তখনই মনের কথা জানাই। সে বলে, কুর্‌গ্‌-এই কাবেরীর উৎপত্তি ঠিকই। অথচ, পাহাড়ে কোন্ অঞ্চলে, জানবার চেষ্টা কখনও করিনি। খবর নেব। কিন্তু মার্‌কারা সুন্দর শহর, এখানে কটা দিন কাটালে হয় না?

বলি, খবরটা তো নিয়ে এসো এখনই।

অল্পক্ষণের মধ্যে সে ফিরে আসে। বলে, আমিই জানতাম না দেখছি, কিন্তু এখানে সকলেরই ও জায়গা জানা। থল-কাবেরী নাম। মাত্র ২৫ মাইল এখান থেকে। মোটরের ভাল রাস্তাও। ঘুরে আসবেন নাকি? কতক্ষণ আর লাগবে?

বলি ঘুরে আসা নয়। মালপত্র বাঁধো। এখনই বেরিয়ে পড়ি। পাহাড়ের মধ্যে কাবেরীর উৎস—নিশ্চয় মনোরম স্থান হবে। কি হবে এইখানে থেকে?

অতএব সকালেই যাত্রা করা হয়। শহর ছাড়ার আগে চন্দা বাজার ঘুরে কিছু কিছু সওদা করে। থলে ভরে ছোট এলাচ, লবঙ্গ কেনে। একমুখ হাসি নিয়ে বলে, কী সস্তা এ-সব এখানে! আমাদের শহরে ও জিনিস এখন দুর্মূল্য—ঠিক চারগুণ বেশি দাম এখানকার চেয়ে। এত জন্মায় এখানে, অথচ বিদেশে চালান হয়ে যায়। আমাদের দেশের ফসল আমরাই ভোগ করতে পাই না। থলের মধ্যে বাঁধা, তবু কি ভুরভুরে গন্ধ! তাজা জিনিস তো! চন্দন কাঠও কিছু নিলাম, এখানকারই বনে হয়। আপনার জন্যেও একটা নিয়েছি।

সুরভিত মোটরে বসে কাবেরী-দর্শনে চলি। এ যেন পুষ্প-ধূপ-চন্দন সাজিয়ে মন্দিরের পথে।

. .

মাঙ্গালোরের পথ ধরা হয়। মাঙ্গালোর শহর আরব-সাগরের তীরে! মার্‌কারা থেকে সত্তর মাইলের উপর। সেদিকে আমাদের পরে যাবার কথা। এখন মাত্র দুমাইল এই পথে গিয়ে এ রাস্তা ছাড়তে হয়। মারকারা থেকেই পথ পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকে। দুমাইল এসে রাস্তা ভাগ হয়। ডানদিকে মাঙ্গালোরের পথ। আমরা বাঁদিকের পথ ধরি। পাহাড়ের কোল বেয়ে আরও নেমে চলি। এ পথে গাড়ি চলাচল কম। লোকজনও শুধু গ্রামের কাছে এলে দেখা যায়। দুপাশে ঘন গাছপালা। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য নয়। 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়'। তারই বুকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামগুলি। আশপাশে কফি ও এলাচের চাষ,—plantation।

কফির সাদা সাদা ফুল, কি ফলের গুচ্ছ জানি না—বনভূমি আলো করে রাখে। চারাগাছের মত উঁচু। বড় বড় গাছের ছায়ার আশ্রয়ে লালিত হয়।

এলাচের ক্ষেতের উপরও বড় বড় গাছের ছায়া। এলাচ গাছের লম্বা লম্বা পাতা,—ক্যানাফুলের গাছের পাতার মতন। মাথার উপর বড় গাছের ডাল-পাতার যেন সামিয়ানা। আলো-বাতাস চাই, কিন্তু বেশি নয়। তাই বুঝে, মাঝে মাঝে বড় গাছ কাটা হয়। ঠিক যতটুকু আলো-বাতাসের প্রয়োজন, তাই যেন আসে, এমনি আচ্ছাদন। স্তিমিত আলোকে চির-শ্যামল পরিবেশে ছোট এলাচ গাছের লালন-পালন। যেন, আলালের ঘরের দুলাল। তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে এলাচের সব চেয়ে ভাল ফসল হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে চাষের কাজ শুরু। বড় বড় গাছ যা কাটবার কেটে, জমি সামান্য কুপিয়ে দিলেই নবীন ছোট চারাগুলি মাথা তুলে জেগে ওঠে। তিন মাসেই সতেজ হয়ে গুটি—capsules ধরে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পেকে ওঠে, ফসল তোলার সময় আসে। এক-একটা ক্ষেতে সাত বছর পর্যন্ত ভাল ফসল পাওয়া যায়। তারপর আবার বড় গাছ কেটে ক্ষেত তৈরি করা। তিন বছরের মধ্যেই নতুন চারার ফসল গজায়। দার্জিলিং অঞ্চলে দেখেছি, বড় এলাচের চাষ। সে-এলাচ হয় মাটির নীচে, শিকড়ে,—থোকা থোকা ধরে,—গাঢ় লাল রঙ, যেন জমাট রক্ত। তুলে শুকিয়ে রাখলে কালচে হয়। রূপ নেই, শুধু স্বাদ ও গন্ধ থাকে। ছোট এলাচের capsules ফলে গাছের উপর, ডালে ডালে। থোকা থোকা ঝুলতে থাকে—সাদা রঙ। যেন রূপার ঝুমকা দোলে। চারিদিক গন্ধে ভরে ওঠে। যেমন রূপ, তেমনি সুবাস, তেমনি স্বাদও। কুর্‌গ্‌ বনদেবী যেন অঙ্গসজ্জা করেন। অলঙ্কার দেহে ঝুলিয়ে চিরসবুজ সিংহাসনে বসেন। অদূরে চন্দন বনেও যেন অগুরুর সৌরভ ছড়ায়।

ভাবি, এলাম এ কোন্ দেশে? এ কি স্বপ্ন রাজ্য!

মোটরের পথ নেমেই চলে। পাহাড়ের জালে ঘেরা বিস্তীর্ণ এক উপত্যকায় পৌঁছুই। পথের উপর লোকজন দেখে বোঝা যায়, বড় গ্রাম নিকটেই। গ্রামে প্রবেশ করার আগেই ডানদিকে গাছের আড়ালে বাংলো চোখে পড়ে। যেন লাজুক গ্রাম্য মেয়ে সবুজ ঘোমটার ফাঁকে উঁকি মারে। কান্তিসেন বলে, মার্কারা থেকে একুশ মাইল আসা গেল, নিশ্চয় ঐটে ভাগমণ্ডলের ইন্‌স্‌পেকশন বাংলো। থল-কাবেরী আরও চার মাইল এখান থেকে। মার্কারাতে বলেছিল, দুপুরের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা এইখানেই যেন করা হয়। এর পরে আর গ্রাম নেই। বাংলোর চৌকিদারকে খাবার তৈরি করতে বলে থল-কাবেরী দেখে আসা যাক।

অতএব, বাংলো-এলাকায় গাড়ি ঢোকে। পুরনো বাংলো। তা হলেও পরিষ্কার করে রাখা। পাশেই চৌকিদারের ঘর। কিন্তু চৌকিদার নেই। ডাকাডাকিতে তার স্ত্রী বেরিয়ে আসে। সে আবার হিন্দি, গুজরাটী, মারাঠী বোঝে না। ইশারা করে খাবারের কথা বোঝানো হয়ত চলে, কিন্তু তাকে বলা দরকার, মাছ-মাংস-ডিম আমাদের চলে না, লঙ্কার ঝালও যেন না দেয়। যে-রকম সুপুষ্টু মুরগী চারপাশে ঘোরে, না বলে দিলে তাদেরই হয়ত কারও জীবনলীলা অকারণ সাঙ্গ হবে।

মুরগী দেখিয়ে বলা হয়, মেরো না যেন, খাই না। সে তখনই আঙুল তুলে আর একটার দিকে দেখায়,—তবে ঐটে?

ভাষা-বিভ্রাট যখন কৌতুকময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, এমনি সময়ে বছর পনেরো বয়সের সুশ্রী, সুবেশা এক বালিকা আসে। সমস্যারও সহজ সমাধান হয়। চৌকিদারেরই মেয়ে। স্কুলে পড়ে। হিন্দী জানে। ইংরেজিও কিছু বোঝে। মুখভরা হাসি নিয়ে কান্তিসেনের সঙ্গে কথা বলে। এক নিমেষে সব বুঝে নেয়। তার মাকেও বুঝিয়ে দেয়। মুখ ফিরিয়ে বলে, তোমরা ঘুরে এস। কোন ভাবনা নেই। খাবার তৈরি থাকবে। ঠিক কটায় চাই? বারোটায়? বেশ, তাই হবে।

কথা বলার ধরন দেখে বিশ্বাস জাগে, নিশ্চয় ঠিক থাকবে।

চন্দা কান্তিসেনকে গুজরাটীতে কি যেন বলে। দুজনে হাসে। কান্তি বলে, দাদাকে বলছি দাঁড়াও। চন্দা কি বলে জানেন? এখানে এসেই অগস্ত্যমুনি বুঝি কাবেরীকে দেখে মোহিত হন; চন্দা তাই সাবধান করছে আমাকে।

জিজ্ঞাসা করি, কাহিনীটা কি শুনি?

কান্তিসেন বলে, শুনে এলাম মার্কারাতে। চলুন, থল-কাবেরীতে গিয়ে শুনবেন। কিন্তু তার আগে একটা কথা। থল-কাবেরী দেখে ফিরে এসে দুপুরে এখানে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তো হয়ে গেল। রাত্রিবাসও কি এখানেই হবে। জায়গাটি কিন্তু বেশ ভালই। অতি শান্ত তপোবনের মত। বাংলো থেকে দৃশ্যও সুন্দর। আশপাশে পাহাড়, ভ্যালি। খাতা পেনসিল নিয়ে ঐ ওখানে বসে স্কেচ্ করার মত। এক রাত্রি থাকলে হয়।

চন্দা মুখ টিপে হাসে।

আমি বলি, এখন চল তো থল্-কাবেরী। এখানটায় ২,৮০০ ফুট উঁচুতে। থল-কাবেরী পাহাড়ের মাথায়, আরও অনেকখানি উঁচু হবে।

তখনই আবার মোটরে যাত্রা করা হয়।

অল্প এগিয়েই ভাগমণ্ডলের লোকালয়। পথের দুপাশে নতুন পাকা ঘরবাড়ি। খাদি প্রতিষ্ঠানের একটা বড় কেন্দ্রও। চন্দা বলে, কুর্গ্-এর মধুও বিখ্যাত। নিশ্চয় এখানেও তৈরি হয়। দেখা যাক না নেমে?

গাড়ি দাঁড়ায়। সঙ্গীরা মধুর সন্ধানে খাদিকেন্দ্রে যান। আমি পথের আশপাশে ঘুরি।

গভর্নমেন্টের একটা কিসের ট্রেনিং-সেন্টারও পথের আর এক পাশে। লম্বা, দোতলা বড় বাড়ি। অপর দিকে বিদ্যালয়। গেট-দেওয়া বিরাট কম্পাউন্ড। ছাত্ররা ঘোরাফেরা করে। ডানদিকে বনের মধ্যে একটা পথ চলে যায়। সাইন্‌পোস্টে লেখা—ঐদিকে ফরেস্ট রেস্ট-হাউস। বনের মধ্যে পাহাড়ের কোলে নিশ্চয় মনোরম স্থান হবে। পথের কাছে কয়েকটা দোকানপাটও। বাঁদিকে বাড়িগুলির পিছনে একটা পাহাড়ী নদীরও অংশ দেখা যায়। ছোট হলেও জল আছে। লোকে স্নান করে। স্নান সেরে এক ছাত্র ফেরে।

কাছে এসে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করে, কোথা থেকে আসছি? থল-কাবেরী দর্শনে চলেছি বুঝি?

নদীর ঘাটের নাম শুনি, লক্ষ্মণতীর্থ।

ভাবি, এখানে আবার রাম-লক্ষ্মণ এলেন কোথা থেকে?

সে বলে, ভাগমণ্ডলও প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। ত্রিবেণী সঙ্গম। যাত্রীরা আসে তীর্থস্থানে!

ত্রিবেণী? তাহলে তিনটে নদী মেশে এখানে?

শুনি, ঠিক তাই-ই। কাবেরী, কনক ও সুজ্যোতি। যেমন প্রয়াগে—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী।

এ প্রয়াগের নামই লক্ষ্মণতীর্থ।

লছমনজির নামে হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করি।

ছাত্রটি বলে, জানেন না বুঝি এখানকার প্রবাদ? রামের বনবাসের সময় এই কুর্‌গ্-এ এসেও তাঁরা কিছুকাল ছিলেন যে। সেই সময়ে একদিন বনের মধ্যে একা ঘুরতে ঘুরতে লছমনজি চলে যান কিছু দূরে। আপন মনে চলেছেন, জানতেই পারেননি কখন কুর্‌গ্ ছাড়িয়ে কেরালা দেশে চলে গেছেন। জানেন নিশ্চয়, কুর্‌গ্-এর একদিকের সীমানা হল কেরালা? আর এও জানা কথা, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে সদ্ভাব থাকে না। তাই কুর্‌গ্-এর বা কেরালার লোকেরাও পরস্পরকে ভাল চোখে দেখে না। প্রবাদও সেইমত গড়ে ওঠে। কেরালায় ঢুকতেই লক্ষ্মণের মত অমন আদর্শ ভ্রাতৃভক্ত পুরুষেরও মনের বিকার ঘটে। শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে হঠাৎ মনোভাব জাগে, বিমাতার কুপরামর্শ শুনে বাবা অন্যায় আজ্ঞা দিলেন, অমনি দাদা নির্বোধের মতন রাজ্য ছেড়ে চলে এলেন বনবাসে, আর আমিও বোকার মত ঘুরছি তাঁরই পিছু পিছু!—কথাটা মনে উঠতেই লক্ষ্মণ ভীত ও লজ্জিত হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন. কুর্‌গ্-এও আবার এসে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাবও আবার তখনই সুস্থ, স্বাভাবিক হয়। কিন্তু হলে কি হবে? মনেই এই ক্ষণিক বিকৃতির জন্যে লক্ষ্মণ নিজেকে ধিক্কার দেন, অনুশোচনায় মন ভরে ওঠে। নাই বা জানতে পারল কেউ, মনে তো এই নীচ ভাব জেগেছিল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেন। আগুন জ্বালান। আত্মাহুতি দিতে উদ্যত হন। শ্রীরামচন্দ্র দূর থেকে দেখতে পান। করে কী আমার লক্ষ্মণ ভাই! তখন অদূরে ব্রহ্মগিরিতে বাণ নিক্ষেপ করেন। পাহাড় থেকে জলের ধারা চকিতে নেমে আসে। তারই নাম কনক নদী। আগুন নিবিয়ে দেয় তখনই। রামচন্দ্র এগিয়ে এসে লক্ষ্মণকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। হেসে সান্ত্বনা দেন, তোমার নিজের অপরাধ তো এতে কিছুই নেই, ভাই! না জেনে কেরালা ভূমি স্পর্শ করেছিলে, মনের এমন বিকার তো ঘটবেই!—সেই থেকে ভাগমণ্ডল পবিত্র ভূমি হয়ে গেল, সঙ্গমের নাম হল লক্ষ্মণতীর্থ।

ভাবি মহাকাব্য, পুরাণ, ইতিহাসের নাম নিয়ে সঙ্কীর্ণচেতা মানুষের গুপ্ত মনোভাব কেমন কল্পনার রঙিন সুতোয় গল্পের জাল বোনে!

জিজ্ঞাসা করি, অপর নদীর কাহিনীও শুনি।

সে বলে, সে-নদীর নাম সুজ্যোতি।

কৌতূহলী প্রশ্ন করি, সে নদী কই? কোন্‌খানে মিশেছে?

সে হেসে ফেলে। বলে, ব্যস্ত হবেন না। তাকে দেখতেও পাবেন না। সুজ্যোতির অস্তিত্ব হল ঠিক যেমন প্রয়াগে শুনেছি সরস্বতী। গুপ্তধারা। চোখে দেখা যায় না—কিন্তু আপনার সঙ্গীরা কই, দেখছি না?

বলি, তারাও এখন তোমার ঐ সুজ্যোতির মতন লুপ্তধারা। ঢুকেছেন ঐ দোকানে। মধুর সন্ধানে। আসবেন এখুনি। গল্পটা শোনাও ততক্ষণ!

সে বলে, এসব এখানকার লোকের মুখে শোনা। মেলার সময় তীর্থ-মাহাত্ম্য বই পাওয়া যায়, তাতেও আছে। দেখব, আপনাকে এক কপি যোগাড় করে যদি দিতে পারি। কাহিনীটা বলছি, শুনুন। সুযজ্ঞ নামে এক ব্রাহ্মণ ঐ ব্রহ্মগিরিতে এসে বিষ্ণুর তপস্যা করেন। দেবতা তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণের সন্তান ছিল না। বিষ্ণু তাঁর এক কন্যা সুজ্যোতিকে তাঁকে দিলেন আপন সন্তানের মতন লালনপালন করতে। বললেন, কাবেরীর উৎপত্তিস্থলের নিকটেই ঐ অগ্নিপর্বত। ঐখানে কনক আছে, ইন্দ্রদেবের সে পরিচারিকা। তারই কাছে একে থাকতে দিয়ো।

হঠাৎ থেমে ছাত্রটি বলে, একটা মজার মিল দেখেছেন? আগের কাহিনীতেও রামচন্দ্রের বাণ নিক্ষেপ ঐ ব্রহ্মগিরিতে—কনকের নদীরূপে বেরিয়ে আসা,—আবার এখানেও সেই ব্রহ্মগিরিরই কাছে

অগ্নিপর্বত—কনকের সেখানে বাস।

বলি, সন্ধান নিয়ো অগ্নিপর্বত যখন নাম, পাহাড়ের ও-অঞ্চলে হয়ত তপ্তধারা আছে, যেখান থেকে ঐ কনক নদী বেরিয়েছে!

সে আশ্চর্য হয়, তা তো কখনও শুনিনি। খোঁজ নিলে হয়! তারপর শুনুন গল্পটা। কনক আর সুজ্যোতি একসঙ্গে তপস্যা শুরু করে দেয়। ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের বর দিতে এলেন। এলেন বর দিতে, কিন্তু সুজ্যোতির রূপ দেখে প্রেমে এমন মুগ্ধ হলেন যে নিজেই বর সেজে তাঁকে বিবাহ করেন। দেবতার রাজা,—তাঁর কাণ্ডই আলাদা! কিন্তু ওদিকে সুজ্যোতি বিষ্ণুর কন্যা, তার উপর নিজে সাধিকা। বিবাহিত জীবনে কোন সুখবোধই নেই। প্রিয় সাথী কনককে বলেন, এ কী ঘটে গেল বোন? জন-কল্যাণ করাই আমার জীবনের ব্রত, শেষে এইভাবে বিয়ের বাঁধনে ধরা পড়লাম? চল, আমিও নদীর রূপ নিই, জলধারা হয়ে বইতে শুরু করি, পাহাড়ি দেশ উর্বর হবে, জগতের মঙ্গল আনবে।—দুই সখীতে গোপনে পরামর্শ চলে। ইন্দ্রদেব দেবতা। মনের কথা জানতে পারেন। রাগে জ্বলে ওঠেন। অভিশাপ দেন, স্ত্রী হয়ে স্বামীর অনুমতি না নিয়েই চলে যেতে চাও? মনের বাসনা তোমার ভাঙবে। জল তোমার শুকিয়ে যাবে,—নদী হতে চাও তুমি?

সুজ্যোতি গভীর অনুশোচনায় ও দুঃখে ভেঙে পড়েন। সত্যই তো স্বামীকে না জানানো,—এ কী ভীষণ ভুল!—দু-নয়ন ছাপিয়ে কপোল বেয়ে অশ্রুধারা নামে। অপূর্ব সুন্দরী সুজ্যোতি,—শোকচ্ছায়ায় আরও সুন্দর দেখায়। ইন্দ্রদেবেরও মন টলে। রাগ ভাঙে। অনুকম্পা জাগে। বলেন, দুঃখ কোরো না, প্রিয়ে! চোখের জল মোছ। যাবেই যখন, যাও। তোমারই মনস্কামনা পূর্ণ হোক! কিন্তু, বলে ফেলেছিই যখন, আমার বাক্যও তো মিথ্যা হবার নয়। তাই এখান থেকে ভাগমণ্ডল পর্যন্ত জলহীন হয়েই থাকবে তুমি, তারপর সেখানে অলক্ষে কনক ও কাবেরীর সঙ্গ পেয়ে সাগরে মিলিত হতে যাবে।

হয়ও তাই। এই ত্রিবেণীতে সুজ্যোতিও সরস্বতীর মত গুপ্তধারাই থেকে যান। কিন্তু,—আপনার সঙ্গীরা ঐ এসে গেলেন—কাবেরীর কাহিনীটা শোনানো হল না, থল-কাবেরীতেই গিয়ে শুনবেন।

মোটরে উঠে আবার তখনই চলা। গ্রামের একটি লোকও সঙ্গে চলে। পথে নেমে যাবে। হেঁটেই চলেছিল। মোটর দেখে চড়বার শখ।

চন্দা শিশির মোড়ক খুলে আমাকে দেখায়, কী চমৎকার মধু দেখছেন? যেন গলানো সোনা! আপনার জন্যেও এক বোতল নিয়েছি।

বলি, আলাদা আবার আমার জন্যে কেনা কেন? যত বোঝা কমাতে চাই, তোমরা ততই ভার বাড়াও দেখি।

ভাগমণ্ডলের লোকালয় ছাড়িয়ে এসেই নদী। একটা পথ বাঁদিকে বেঁকে যায়, নদীর ধার দিয়ে। আমরা ধরি সোজা রাস্তা। নদীর উপর পুল। দুপাশে পাহাড়। মাঝে উপত্যকা। পুল পার হয়ে পাহাড়ের চড়াই শুরু। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে মোটর ওঠে। নীচে কাছে-দেখা ঘরবাড়ি-নদী উপর থেকে ছোট দেখায়, নীচে-থেকে-দেখা পাহাড়ের উপর গাছপালা কাছে এসে বড় হয়ে ওঠে। দুপাশে জঙ্গল। পথ ঘুরে যায়, নীচের দৃশ্যও হারায়। পাহাড়ের গায়ে পাক দিয়ে পথ উঠেই চলে—যেন প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে লতা ওঠে! হঠাৎ পথের বাঁকে গাছপালার ফাঁকে নীচের উপত্যকা আবার চোখে পড়ে। বহু নীচের বনভূমি এখন দেখায় ঘন সবুজ আবরণ, তারই বুকে নদীর বিশীর্ণ বালুরেখা, আরও দূরে ঘরবাড়ির বিন্দু-চিহ্ন। পথের এই বাঁক-থেকে সুন্দর দৃশ্য। স্থানটির নামকরণও তাই, 'ভিউ পয়েন্ট'। কাছেই বহু বোলডার্‌স্—রাশীকৃত প্রকাণ্ড শিলা। সঙ্গের লোকটি এইখানেই নামে। পাথরগুলো দেখিয়ে বলে, ঐ হল 'ভীম-কল্লু'।

ভাবি, শুনে এলাম রাম-লক্ষ্মণের কথা। আবার ভীমসেন এলেন?

লোকটি জানায়, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় একদিন ভীমসেন খেতে বসেছেন, দেখেন খাদ্যের সঙ্গে এই পাথরগুলো মিশে আছে, বেছে সেগুলো এখানে ফেলে দেন। তাই লোকে নামও দিয়েছে ভীম-কল্লু, বহুকাল থেকেই।

শুনে হাসি পায়। কী উদ্দাম কল্পনা! সর্বত্রই রাম-লক্ষ্মণ, ভীম-অর্জুন। কিন্তু সেকালেও তাহলে ভাত-

ডালে কাঁকর মেশানোর রেওয়াজ ছিল? এখন নতুন নয়? মোটর আবার উঠতে থাকে। চার মাইল মাত্র পথ ভাগমণ্ডল থেকে। কতক্ষণই বা লাগে? পাহাড়ের কাঁধের উপর উঠে আসি। নেড়া পাহাড়। এখানে-ওখানে কয়েকটা গাছ। পাহাড়ের উপর পথ এবার সোজা চলে। এ পাহাড়ের শিখরদেশ এটা নয়। অল্প এগিয়ে ডানদিকে চূড়া দেখা যায়। আরও দু-তিন শ' ফুট উঁচু হবে। মোটর-পথেই চড়াই শেষে ডান হাতেই একটি সুন্দর নতুন বাড়ি। বিরাট এলাকা। গেট। এখনও বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয় নি। লোকজন খাটে। গেরুয়াধারী এক স্বামীজীও ঘোরেন ফেরেন দেখা যায়। পরে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করি। তিরুভন্নমলাই থেকে এসেছেন। কোন্ মঠের মোহন্তজী। এখানেও একটা মঠ স্থাপনা করছেন। শান্ত জায়গা। একান্তে আসন নিয়ে দিন কাটাবেন। দেখি সদালাপী, মিষ্টভাষী পুরুষ। গরম কফি খাওয়ান। নিজেও পান করেন। গল্প করে আনন্দ পাই। কিন্তু ভাবি, সংসারত্যাগী, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, এখানেও আবার এত বড় বাড়ি করে সংসার সাজানো কেন?

সেই নতুন মঠেরই সামনাসামনি পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা সোজা এগিয়ে চলে। সুমুখে খানিক দূরেই পথের শেষও দেখা যায়। সেইখানে মোটরও থামে। আরও একটা মোটরও দাঁড়িয়ে। সামনেই পাহাড়ের গায়ে বাঁধানো লম্বা ধাপ বেয়ে যেন সরোবরের তটে ওঠা। তাই বটে। উঠেই দেখি থল-কাবেরীর কুণ্ড। হঠাৎ যেন নীল চোখ মেলে চায়। প্রকৃতির কোলে সদ্যফোটা ফুলের মত কোমল কচি শিশু। আলো ঝলমল সরল চোখের চাহনি।

পুলকিত হয়ে ভাবি, এই-ই উৎস কাবেরীর!

৪১৮৭ ফুট উঁচু থল-কাবেরী। তারই কোলে চারকোণা কুণ্ড। এক দিক ত্রিশ ফুট আন্দাজ লম্বা। চারিপাশে সিমেন্ট-বাঁধানো ঘাট। ধাপ নেমে যায় জলের ধারে। পাড়ের তিন দিক রেলিঙ দিয়ে ঘেরা। অপর পারে মন্দির আদি। সেদিকে কয়েকটা বড় বড় গাছও। সেইখান থেকেই শুধু পাখির ডাক শোনা যায়। অস্ফুট, মধুর। মা যেন শিশু-কোলে ঘুমপাড়ানি গান ধরেন। অতি শান্ত মনোরম পরিবেশ। নিস্তরঙ্গ শান্ত জল-ভরা কুণ্ড। জলের নীচে বালি চিকমিক করে। চিকন দেহে আলো যেন ঠিকরে পড়ে।

ধীরপদে বাঁধানো ঘাটের উপর দিয়ে এগিয়ে চলি। কুণ্ডের বাঁ দিকের ঘাটের পাশে লম্বা পাকা ঘর। নতুন তৈরি। পরিষ্কার ঝকঝক করে। যাত্রীদের বিশ্রাম করার, মালপত্র রাখার প্রশস্ত ব্যবস্থা। স্নান সেরে কাপড়-চোপড় ছাড়বারও নিভৃতি। চার-পাঁচজন পুরুষ ও মহিলা যাত্রী। ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। মেয়েরা ভিজা কাপড় রোদে রেলিঙের উপর ছড়িয়ে শুকোতে দেয়। দলপতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক। হাত-মুখে শ্বেতীর মত চিহ্ন। পাকা চুল, আরও যেন সাদা দেখায়। স্নানান্তে শুচিবস্ত্র পরনে। খালি গা। এগিয়ে এসে আলাপ করেন। বাংলা দেশ থেকে আসছি শুনে যেমন আশ্চর্য হন, তেমনি আনন্দও পান। বলেন, ওসব দূর দেশ থেকে এ অঞ্চলে যাত্রী আসতে ক্বচিৎ দেখি। আমি কুর্‌গ্‌-এরই বাসিন্দা। মার্‌কারায় থাকি। সময় পেলেই সপরিবারে চলে আসি এখানে। পুণ্যক্ষেত্র তো বটেই, শান্তিপূর্ণ স্থানও, কুণ্ডের জলে স্নান করে আমার রুগ্‌ণ দেহে উপকারও পাই। মোটরে মার্‌কারা থেকে আসতে কতটুকুই বা সময় লাগে! স্নান করবেন আপনারাও নিশ্চয়?

বলি, করব বইকি! কিন্তু তার আগে আপনার কাছে শুনি, এখানকার দর্শনীয় কি কি এবং মাহাত্ম্য-কাহিনীই বা কি?

বলেন, এই যে বাঁধানো বড় কুণ্ড, এইখানেই তীর্থস্নান হয়। কিন্তু কাবেরীর উৎস হল, ঐ যে কোণে কুণ্ডের পাড়ে ধাপের পাশে ছোট্ট মন্দিরটা দেখছেন—এগিয়ে চলুন ওদিকে—

দুজনে কয়েক পা মাত্র এগুতে সেখানে পৌঁছুইও। পাথরের অতি ছোট মন্দির। হাত-দুই মাত্র উঁচু। মাথার উপর পাথরের ঢালু ছাদ, চালাঘরের মত আকার। ছোট্ট দরজা। সামান্য কারুকার্য। হেঁট হয়ে দেখলে ভিতরে দেখা যায়,—ফুল, আভরণ ও বস্ত্রে ঢাকা মূর্তি,—শুনি, কাবেরীর। তারই সামনে মন্দিরের বাইরে কুণ্ডের দিকে ছোট্ট আর একটা কুণ্ড। চারকোণা বাঁধানো,—ফুট-দেড়েক মাত্র লম্বা-চওড়া। ভিতরে জল। পূজার ফুল ও পাতায় ছাওয়া।

ভদ্রলোক বলেন, এই হল কাবেরীর আসল উৎস। পাশেই এক হাত দূরে—এই বড় কুণ্ডের সঙ্গে নিশ্চয় এর যোগাযোগ আছে! কেন না, দুই কুণ্ডের জল ঠিক সমানভাবে এক লেভেলে থাকে।

আশ্চর্য,—প্রবল বর্ষাতেও জল কোন কুণ্ডেই বাড়ে না। অন্য সময়ে কমেও না। বড় কুণ্ডের একদিকে—যেখানে ঐ যাত্রীঘরটা—তারই কাছে নজর করেছেন কিনা জানি না—মাটির নীচে দিয়ে জল নিকাশের একটা পথ আছে, কিন্তু দেখবেন, শুকনা খটখটে। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনার ধারা নেমে যাওয়ার খদ, দেখলেই বোঝা যায়। অথচ জল নেই। অদৃশ্য হয়ে নদী নেমে গেছে। এ যেন মানুষ হেঁটে চলে গেল,—সে নেই, পায়ের চিহ্নটুকু আছে। কাবেরীর কাহিনীও ঐ কিনা।

উৎসুক হয়ে বলি কাহিনীটা শোনান।

কান্তিসেনরা ফটো তোলায় ওদিকে ব্যস্ত ছিল। তাদেরও ডাকি।—

তিনি বলেন, জানেন নিশ্চয়, পুরাণের কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এক এক রূপ নেয়, কোথাও বা সামঞ্জস্যহীনও হয়। কাবেরীর কাহিনীও তেমনি। স্কন্দপুরাণে কাবেরী-মাহাত্ম্য পাওয়া যায়। মোটমাট কাহিনীটা বলি। কাবেরী নামের উৎপত্তি জানেন তো?

ভদ্রলোকের দলের আর সবাই এসে পড়েন। তাঁদের বলে দেন, ওপরের শিবমন্দিরে পূজা সেরে এস, আমি এখানে আছি।

গল্প শুরু করেন, কবের নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি এই পাহাড়ে ব্রহ্মার উপাসনা করেন। ব্রহ্মার উপাসনা এখানে কেন, তাও বলি। কুর্‌গ্‌ দেশের একটা নাম, ব্রহ্মক্ষেত্র। প্রবাদ, এই পাহাড়ে পিপল বৃক্ষকে বিষ্ণুরূপে দেখে ব্রহ্মা তপস্যায় বসেন। এই যে কুণ্ডের পাশেই ওপরে পাহাড়ের মাথা দেখতে পাচ্ছেন,—ঐ শিখরের নাম ব্রহ্মগিরি। ঐ নামে অন্য পাহাড়ও আছে সহ্যাদ্রিতে।

মাথা উঁচু করে পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাই। এখান থেকে তেমন কিছু উঁচু নয়, আগেই আসার পথে নজর করেছিলাম,—এখানকার চেয়ে দু-তিন শ' ফুট মাত্র উঁচু হবে। উপরে একটা পোস্ট বা থাম দেখা যায়।

ভদ্রলোক হেসে বলেন, এটা একটা ইলেকট্রিক লাইট-পোস্ট। রোজ সন্ধ্যায় এখানে আলো জ্বলে। বহুদূর থেকে দেখা যায়। ওপরে উঠবেন, গিয়ে দেখবেন।

বলি, যাব তো নিশ্চয়। এখন গল্পটা বলুন।

ঐ ব্রহ্মগিরিতে কবের মুনি তপস্যার ফলে ব্রহ্মার দর্শন পান। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। অত বড় ঋষি অমন তপস্যা করে শেষে প্রার্থনা করলেন কি, জানেন? বললেন সন্তানহীন আমি। একটি সন্তান দিন আমাকে! ব্রহ্মা বললেন, তথাস্তু। তাই হবে। কিন্তু তোমার পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে আপন ঔরসে সন্তান লাভ তোমার সম্ভব নয়। তাই আমার পালিতা-কন্যা লোপামুদ্রা, তাকেই তোমার কন্যারূপে দিলাম।

লোপামুদ্রা পার্বতীর অবতার। তাঁরও জীবনের নানান কাহিনী আছে। সেকথা থাক। তিনি এখন হলেন কবের ঋষির কন্যা। নামও তাই হয়ে গেল কাবেরী। কাবেরী রূপে গুণে ঋষিপিতার আশ্রম আলো করে এই ব্রহ্মগিরিতে লালিত হতে থাকলেন। ওদিকে উত্তর-ভারত থেকে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে অগস্ত্যমুনি এসে হাজির হলেন এই অঞ্চলে,—ব্রহ্মগিরিতে শিবের আরাধনা করতে। কবের ও তাঁর স্ত্রীর তখন মৃত্যু হয়েছে। কাবেরী একাই থাকেন। তারপর ঘটে এক বিচিত্র ঘটনা। অমন মহামুনি অগস্ত্য, এলেন তপস্যা করতে,—তিনিও কাবেরীর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন, বিবাহের প্রস্তাব করেন। কাবেরী সম্মতি জানিয়ে বলেন, ঠিক আছে, কিন্তু ক্ষণকালের জন্যেও একা ছেড়ে চলে গেলে আমিও যাব চলে। প্রেম-পাগল ঋষি তাতেও রাজী। ঐ ব্রহ্মগিরি চূড়ার ওপর বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিমণ্ডল সে বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়ের মাথায় এখনও তাঁদের চিহ্ন আছে।

কান্তিসেন হেসে বলে, এখানে অগস্ত্যের বিয়ের হোমের আগুন জ্বলেছিল, এখন ইলেকট্রিক আলো!

ভদ্রলোকও হাসেন। বলেন, যখনকার যা। তারপর শুনুন, বিয়ের পর অগস্ত্য সব সময় স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। এই ব্রহ্মগিরির আর এক অঞ্চলে—মাইলখানেক মাত্র দূর—আর এক নদীর উৎপত্তি। নাম তার কনক।

শুনে বলি, তার কাহিনী জানি। ভাগমণ্ডলে এই কাবেরীর সঙ্গে কনকের সঙ্গম।

তিনি বলেন, ঠিকই। সেই নদীতে অগস্ত্যমুনির স্নানের ইচ্ছা হয় একদিন। ভাবেন, এই তো এইখানে। যাব আর আসব। কাবেরীকে এক কমণ্ডলুতে ভরে শিষ্যের জিম্মায় রেখে চলে যান। তারপর, কেউ

বলে, শিষ্যটি হঠাৎ পড়ে যাওয়ার ফলে, কমণ্ডলুও উলটে যায়। আবার, কারও মতে সে-বছর এদেশে ভীষণ জলাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় নারদ ঋষি কাকের রূপ ধরে এসে ঐই সুযোগে কমণ্ডলু উলটে দেন। মোট কথা, কাবেরী কমণ্ডলু থেকে বেরিয়ে পড়েন, স্বামী তাঁকে ছেড়ে রেখে কোথায় গেছেন দেখে, তখনই নদী হয়ে বইতে শুরু করেন। শিষ্যরা গতিপথ রুদ্ধ করতে যান। কাবেরীও ভূতলে অদৃশ্য হন। মাইল তিনেক নীচে সেই ভাগমণ্ডলে পৌঁছে আবার প্রকট হলেন। কনকের সঙ্গে সেইখানে যোগও। এদিকে অগস্ত্য স্নান সেরে ফিরে এসে খবর শুনে স্তম্ভিত। ভাবেন, দোষ তো আমারই। ছেড়ে গেলাম কেন?—পাগলের মত ছুটে চলেন স্ত্রীর সন্ধানে।

কথাটা শুনে হেসে ফেলি। তখনই মনে পড়ে, G. K. Chesterton-এর On runing after one's hat প্রবন্ধটিতে রসাত্মক সেই মন্তব্য : 'The most comic things of all are exactly the things that are most worthdoing– such as making love. A man runing after a hat is not half so ridiculous as a man running after a wife!'

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকান, আমার মনের ভাব বোঝেন না, গম্ভীর হয়ে বলে চলেন : পাহাড়ের নীচে পৌঁছে অগস্ত্য স্ত্রীর দেখা পান। কাবেরী বলেন, বিয়ের শর্ত ভঙ্গ হয়েছে। আমার আজন্ম স্বপ্ন জগতের কল্যাণ করি। জলদায়িনী রূপে এখন চললাম, এই পার্বত্য ঊষর অনুর্বর দেশ সুজলা সুফলা করতে, জগজ্জনের ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটাতে। কর্তব্যশেষে সাগরে আত্মবিসর্জন দেব।—অগস্ত্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। স্বামীর দুঃখ দেখে কাবেরীর অন্তরে মমতা জাগে, বলেন, বেশ। আমি দ্বিধা হলাম, এক অংশ লোপামুদ্রারূপে আপনার সহধর্মিণী রইলেন, অপর অংশ কাবেরী নামে বইতে থাকব।

অগস্ত্যও সন্তুষ্ট। কোন্ পথ দিয়ে সমুদ্রে যেতে হবে বলেও দেন।

হেসে বলি, অগস্ত্য তো বহু ঘুরেছেন, ভূগোল তাঁর নখদর্পণে।

মনে মনে ভাবি, মহাভারতের বনপর্বে অগস্ত্য-লোপামুদ্রার বিবাহ-কাহিনী সে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তা হোক। কিন্তু সেই মহামুনি অগস্ত্য,—বৃদ্ধ বিন্ধ্যপর্বতের দর্প চূর্ণ করে মাথা নত করান, আর তুলতে দেন না; এক গণ্ডূষে সমুদ্রের জলরাশি পান করে নিঃশেষ করেন,—আশ্রম-পালিতা এক সুন্দরীকে দেখে তাঁরও কম দুর্ভোগ নয়। মুনি-ঋষিরও এই দুর্গতি।

ভদ্রলোক বলেন, কিন্তু কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। কাবেরী তো বয়ে চললেন—এই কুর্‌গ্-এর পার্বত্যদেশ ভেদ করে। এই সঙ্গে আরও একটা কাহিনী শোনাই। আগের গল্পের সঙ্গে কোথাও কোথাও সামান্য মিল থাকলেও প্রভেদও অনেক। তবে, এ গল্পের মধ্যে আবার দেখবেন, এই কুর্‌গ্ দেশ, এখানকার নদী, জনসাধারণ,—এই তিনের মধ্যে একটা যোগসূত্রের ইঙ্গিত আছে। তবে, এ কাহিনী যে প্রাচীন নয়,—শুনলেই বুঝতে পারবেন।

বলি, চলুন, ঐ ধাপটার ওপর সবাই বসি, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? গল্পটা জমছে বেশ।

তিনি বলেন, বসব না, ঐখানে দাঁড়িয়েই বলি। মেয়েরা ওপরের মন্দির থেকে ফিরলেই সকলে কাবেরী মায়ের পূজায় বসব। শুনুন বলি। মৎস্যদেশের রাজা ছিলেন সিদ্ধার্থ। তাঁর চার ছেলে। সর্বকনিষ্ঠ,—চন্দ্রবর্মা। সকল গুণের সে অধিকারী। বড় হয়ে চন্দ্রবর্মা পিতার সান্নিধ্য ত্যাগ করে তীর্থভ্রমণে চলেন। এই ব্রহ্মগিরিতে পৌঁছে এইখানে পার্বতীর ধ্যানে বসেন। দেবীর দর্শনও পা'ন। বর প্রার্থনা করেন, রাজত্ব, ক্ষত্রিয়বংশের পত্নী ও সন্ততি এবং জীবনান্তে স্বর্গপ্রাপ্তি।

কান্তিসেন বলে, এখানে দেখছি তপস্যা করে সবাই সন্তান কামনা করেন,—মুনিঋষিরাও, আবার রাজপুত্রও।

তিনি বলেন, আগের গল্পের সঙ্গে আরও একটু মিল আছে। পার্বতী বরগুলি দিলেন বটে, কিন্তু জানালেন, আগের জন্মের পাপের ফলে চন্দ্রবর্মার ক্ষত্রিয়-পত্নী সন্তানহীনা হবেন, তবে শূদ্র স্ত্রী সন্ততির জন্ম দেবেন। দেবী স্বয়ং এক শূদ্রকন্যাও এনে দেন। বলেন, একে বিবাহ কর। এর এগারোটি পুত্র জন্মাবে, তাদের 'উগ্র' বলে পরিচয় হবে। সবাই তারা হবে সৎ ও সাহসী। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের গুণাবলী তারা পেলেও বেদাচার মানবে না।

একটু থেমে বলেন, জানেন হয়ত, কুর্‌গ্-এর অধিবাসীরা হিন্দু হলেও বেদাচার মানে না। রামায়ণ মহাভারত আমাদেরও মহাকাব্য। হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরও আছে, পূজাপার্বণও হয়। কিন্তু এখানকার

দেশীয় প্রথায়। এমন কি, বিবাহাদি ও শুভকর্মেও বেদাচার অনুযায়ী মন্ত্রাদি পাঠ হয় না,—স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠান মানা হয়। এই কাহিনীর ভিত্তিও তাই।

তারপর, গল্পের বাকিটুকুও বলি। পার্বতী আরও জানিয়ে যান, তিনি স্বয়ং এই দেশে কাবেরী নদীর রূপ নিয়ে অবতীর্ণা হবেন এবং রাজ্যের জনকল্যাণ আনবেন। চন্দ্রবর্মাকে আরও আদেশ করেন, এ দেশ এখন ম্লেচ্ছদের দখলে। তোমাকে দান করলাম এই জয়যুক্ত তরবারি, তেজীয়ান ঐ শ্বেত অশ্ব, আর ঐ দিলাম সৈন্যবাহিনী—ম্লেচ্ছদের পরাজিত করে এদেশের রাজা হও, দেশের উন্নতিসাধন কর।

কান্তিসেন বলে, কুর্‌গ্‌ তো টিপু সুলতানের রাজ্যভুক্ত হল এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আর সে-রাজত্বের অবসান ঘটে বৃটিশদের হাতে সেই মহীশূর যুদ্ধে। ইংরেজেরা বীর রাজাকে ওখানকার সিংহাসনে বসিয়ে দেন, যুদ্ধে ইংরেজদের তিনি সাহায্য করেন বলে। পরে বীর রাজা অপুত্রক মারা গেলে সিংহাসন দখল নিয়ে তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আত্মকলহ শুরু হয়। অবশেষে তাঁর ভাই লিঙ্গরাজ রাজা বলে ঘোষিত হন—সেও তো এই ১৮১১ সালে। কিন্তু তাঁর ছেলে যখন আবার রাজ্যভার পায়, ইংরেজরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেদের সাম্রাজ্য ওখানেও বিস্তার করে—১৮৩৪ সালে। চন্দ্রবর্মা ম্লেচ্ছ উচ্ছেদ করলেন কবে?

ভদ্রলোক হেসে বলেন, আপনি তো সব ঐতিহাসিক তথ্য বলছেন, আমি শোনাচ্ছি প্রচলিত কাহিনী। তবে ম্লেচ্ছ অর্থে মুসলমান না হয়ে অনার্য জাতিও তো হতে পারে? আর্য রাজপুত্র চন্দ্রবর্মা সেই অহিন্দু অনার্যদের জয় করে নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। পিতৃ-রাজ্যের নাম অনুকরণ করে এ-দেশেরও নাম দিলেন—মৎস্যদেশ। যেমন শুনেছি, ইংরেজরাও আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে বিলেতের শহরের নামে নতুন শহর গড়ে তোলে। চন্দ্রবর্মার সন্তানভাগ্য পার্বতী যেমন বলেছিলেন তেমনি ঘটল। স্বজাতি-পত্নী নিঃসন্তান রইলেন, আর সেই শূদ্ররাণী জন্ম দেন—এগারোটি পুত্রের। বড় হয়ে তারা বিদর্ভরাজের একশো কন্যার পাণিগ্রহণ করে। প্রতি সন্তানের একশোর বেশি সন্তান জন্মায়।

মনে মনে ভাবি, হবে না! প্রজাপতি ব্রহ্মার পুণ্যভূমি—ব্রহ্মগিরি যে!

ভদ্রলোক বলেন, সেই সব সন্তানই ছিল বলশালী এবং অতি সদাচারী। অথচ বেদাচার মানে না। তাদের আঙুলের নখরগুলি ছিল বরাহের দন্তের মত তীক্ষ্ণধার। তারই সাহায্যে দেশের ভূমি থেকে বনজঙ্গল তুলে তারা এই পাহাড়ি অঞ্চলও উর্বর, শস্যশ্যামল ও সমতল করার মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করল। তাদের বরাহাবতারের মত আচরণ হওয়ায় দেশের নামও হয়ে যায়—ক্রোধদেশ অর্থাৎ Boar Country। সেই Korda থেকেই Kodagu,—এখন কুর্‌গ্‌। দেখুন, এই এক গল্পের মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল, দেশাচার—কত কী মিশে আছে,—কিন্তু ঐ মেয়েরা নেমে আসছেন—গল্পের শেষটুকু বলি। সেই রাজা চন্দ্রবর্মার পুত্র,—দেবকান্ত। First of libra—তুলা রাশির দুদিন আগে সেই রাজা দেবকান্তকে দেবী পার্বতী স্বপ্নাদেশ দেন, সবাই যেন বালমুরিতে সমবেত হয়, পার্বতী সেদিন সেখানে কাবেরী নদীরূপে নেমে আসবেন।

প্রশ্ন করি, বালমুরি? সে জায়গাটা আবার কোথায়?

তিনি বললেন, ভাগমণ্ডলে দেখে থাকবেন, এখানে আসবার পথে নদীর ধার দিয়ে বাঁ দিকে আর একটা রাস্তা চলে গেছে—সেই দিকে। এখান থেকে মাইল পঁচিশ-ত্রিশ হবে। মোটরের ভাল রাস্তা, গাড়িতে এসেছেন, সেখানেও ঘুরে আসবেন। কাবেরী সেখানে সমতলভূমি দিয়ে বয়ে চলেছেন। রাজা দেবকান্তর পাওয়া স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী সবাই সেই বালমুরিতে গিয়ে হাজির হয়,—কাবেরীও নেমে আসেন। দেশবাসী আবাহনী সঙ্গীত গেয়ে পূজা করে, কাবেরীও বয়ে চলেন। সবাই করজোড়ে প্রার্থনা করে, আমাদের দেশ ছেড়ে কোথায় চলেছেন মা? সন্তান আমরা,—ছাড়ব না। কাবেরী আশ্বাস দেন, ভয় নেই তোমাদের। নিশ্চিন্ত হও। আশীর্বাদ করে যাই, তোমাদের ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি হোক, রাজ্যে সুখ শান্তি থাকুক, আমি চললাম জগতের অন্য দেশেরও কল্যাণ-দানের সঙ্কল্প নিয়ে।

মেয়েরা শোনে না। ভাবে, মায়ের ওপর তাদেরই জোর বেশি। সারি সারি দাঁড়িয়ে মায়ের পথরোধ করে। দেবী কাবেরী জলকল্লোলে হাসির উচ্ছ্বাস তোলেন। যেন আদর করে তাদের ভোলান। চকিতে ডানদিকে বেঁকে ঘুরে বয়ে চলে যান। নদীর আচমকা স্রোতের টানে মেয়েদের পরনের শাড়ির আঁচলও সেইমত পিছনে ঘুরে যায়। সেই দিন থেকে কুর্‌গ্‌বাসী মহিলারা সবাই উলটে পিছন দিকে শাড়ির আঁচল

ডান কাঁধ দিয়ে ঘুরিয়ে পরতে থাকে। নজর করবেন, এখনও সেই প্রথাই চলে আসছে। ভারতের আর কোথাও এইভাবে শাড়ি পরার রীতি আছে বলে জানি না। বালমুরিতে দেখবেন নদীও সেখানে হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে গেছে। স্থানীয় ভাষায় বালমুরি কথাটার অর্থও তাই,—ডানদিকে মোড় নেওয়া। সেখানে একটা শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কাবেরী যাবার আগে কথা দিয়ে যান, তোমাদের ভুলব না,—প্রতি বছর ফিরে আসব এই সময়ে থল-কাবেরীতে তোমাদের দেখা দিতে।

ভদ্রলোক একটু চুপ করে গম্ভীরভাবে বলেন,—এবং আশ্চর্য ঘটনা। প্রতি বছরই কাবেরী আসেন সেইমত এইখানে,—চলুন আরও এগিয়ে ঐ ছোট্ট কুণ্ডিকার পাশে, দেখিয়ে বলছি, সেদিন কি ঘটে। আমার নিজের চোখে দেখা—প্রতি বছরেই। এইখানেই আমরা এখনই পূজাতে বসবও।

বড় কুণ্ডের ধারে সেই ছোট্ট কুণ্ডিকার নিকটে এসে আবার দাঁড়াই। ভদ্রলোক বলেন, কাবেরীর এইটেই প্রধান তীর্থ, আগেই বলেছি। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখ নাগাদ—লগ্ন, রাশি দেখে ঠিক দিনটি স্থির হয়—এই কুণ্ডিকার মধ্যে যে জল দেখছেন তাতেই কাবেরী মাতার পূজা হয়। এরই নাম "তীর্থোৎভব" বা "কাবেরী সংক্রমণ" উৎসব। হাজার হাজার যাত্রী আসে সে সময়ে এখানে—হাজার পনেরোর কম নয়। শুধু কোডাভা জাতিই নয়,—কুর্‌গ্‌-এর বিভিন্ন অধিবাসী। বহু দূর অঞ্চল থেকেও যাত্রী আসে। বড় কুণ্ডে স্নান করে সবাই তীর্থবারি নিয়ে ঘরে ফেরে। এক মাস ব্যাপী এই যাত্রা চলে—সেই "কিরুসংক্রান্তি" পর্যন্ত। সে সময়ে সারা দেশে ঘরে ঘরে উৎসবের সাড়া পড়ে। যাত্রা এক মাস ধরে চললেও "কাবেরী-সংক্রমণ" উৎসব মাত্র দুদিনের। বৎসরান্তে মা আসছেন ঘরে ফিরে,—সবারই মুখে আনন্দের হাসি, পরনে নতুন বেশভূষা; প্রতি গৃহ পরিচ্ছন্ন করে রাখা; দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গলঘট, ফুলের মালা, আলপনা। যেখানে যার যা জমি, সব চাষ করা। মা এসে যেন না দেখেন, তাঁর হাতের দান—জমির উর্বরতা—হেলায় পড়ে আছে! দেশবাসীর মন যেমন আনন্দে ভরা, গৃহ-প্রাঙ্গণ, মাঠ ঘাট, অরণ্য-প্রান্তর দশদিকও তেমনি আনন্দে ঝলমল করে। ঘরে ঘরে কাবেরীর মূর্তিরও পূজা হয়। তিনদিন পরে নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জন।

মনে মনে ভাবি কাবেরী অগস্ত্য-পত্নী। এইখানেই তাঁর স্বামী-গৃহ। শরৎকালে নদীরূপে কাবেরী আসেন এইখানে ফিরে সন্তানদের মায়ার টানে। আবার আকাশে নক্ষত্র-রূপী অগস্ত্য Canopus-এর উদয়ও সেই শরৎ ঋতুরই আগমন সূচনা করে। শুভ্রকান্তি (white-star-type) পরিত্যক্ত বিরহী স্বামী কি সুদূর গগন থেকে প্রিয়া অর্ধাঙ্গিনীকে দেখতে থাকেন?

জিজ্ঞাসা করি, কাবেরী যে এ কুণ্ডিকায় ফিরে আসেন, তার চাক্ষুষ প্রমাণ কিছু পান?

বলেন, সেই কথাই তো শোনাব,—নিজের চোখে কতবার দেখা। ঠিক সেই দিনটিতেই পূজা শেষ হলেই এই কুণ্ডিকার জলে—দেখছেন তো কী রকম স্থির জল—কিন্তু হঠাৎ এতে বুদ্বুদ উঠতে থাকে—জল যেন ফুটে ওঠে। খানিকক্ষণ ঐ রকম ঘটতে থাকে—যাত্রীরাও দর্শন পায়। চারপাশে আনন্দধ্বনি ওঠে—মা এলেন, আবার মা এসে গেলেন। সে কী প্রচণ্ড উন্মাদনা সেই শুভলগ্নে! অথচ আশ্চর্য! বছরের আর কোনদিন কখনও এমন হতে দেখা যায় না,—সেই একদিনই কিছুক্ষণের জন্যে! কেন যে হয়, কারণও মেলে না।

কান্তিসেন রাসায়নিক। অস্ফুটে বলে, হয়ত কোন কেমিক্যাল অ্যাক্‌সন বা গ্যাস জন্মানোর ফলে ঘটে।

ভদ্রলোক বলতে থাকেন, আরও একটা ব্যাপার, জলের রঙ দেখছেন সবুজ ধরনের,—অথচ কোন কিছুতেই এ রঙ বদলায় না, এমন কি সিঁদুর দিলেও নয়। আপনাদের যেমন উত্তরভারতের ভাগীরথী-গঙ্গার মাহাত্ম্য, আমাদেরও তেমনি এখানে কাবেরীর মহিমা,—এঁকে বলা হয় দক্ষিণ গঙ্গা। লোকেদের বিশ্বাস, বৎসরের ঐ পুণ্যলগ্নে গঙ্গা ও আর সব পবিত্র জল কাবেরীর এই উৎসমুখে আসে। তাই এই তীর্থেও পিণ্ডদানের প্রথাও আছে। গুপ্তপথে নাকি কাবেরীর সঙ্গে বারাণসী-গঙ্গার যোগাযোগ আছে।

শেষের কথাগুলি শুনে কান্তিসেন উৎসুক হয়ে বলে, তাই নাকি? এ প্রবাদও আছে? আশ্চর্য!

জিজ্ঞাসা করি, এ-ধরনের জনপ্রবাদ নতুন নয়। অনেক তীর্থক্ষেত্রেই আছে। অবাক হলে কেন?

কান্তি বলে, জানেন না বুঝি? কিছুকাল ধরেই আমাদের গভর্মেন্টের পরিকল্পনা চলেছে—গঙ্গার সঙ্গে কাবেরীর সংযোগ করার। সাময়িক পত্রিকাতে মাঝে মাঝে রিপোর্টও দেখি। সার্ভের কাজও শুরু হয়ে গেছে।

কুর্গ্ থেকে ফিরে আসার কয়েক মাস পরে পত্রিকার দুটো cuttings-ও হাতে আসে। তাতে দেখি, কেন্দ্রীয় সরকারের এক মন্ত্রীর বিবৃতি : The Union Goverment has decided to undertake, with U. N. expert assistance, a survey for linking the Ganga with the Cauvery...

...The survey would involve a study of many land and water aspects, including water links, storages and hilly plateaus along the proposed 1,500 mile grid...This project. If implemented, was estimated to irrigate 20 million acres.

ভাবি, পুরাকালের কল্পনা-কাহিনী প্রকৃতই কি বিরাট বাস্তবে পরিণতি পাবে!

যাত্রী ভদ্রলোক সপরিবারে পূজায় বসেন কুণ্ডিকার পাশে। আমরা ঘাটের সোপান বেয়ে উপরে উঠি। ডান পাশে ছোট গেট মত, রেলিং দিয়ে ঘেরা ছোট বাগান। সিঁড়ির শেষে কয়েক হাত দূরে দুটি মন্দির, একটা ছোট ঘরও। ঘরটি পূজারীর। মন্দির গণপতির, অপরটিতে শিবলিঙ্গ। প্রবাদ, অগ্যস্তমুনির নিজের হাতে স্থাপন করা শিবলিঙ্গ। বালি দিয়ে গড়া। নাম, অগস্ত্যেশ্বর মহাদেব। মন্দিরে পূজারীর ছেলে পূজার আয়োজন করে। দেবতার ভোগ হয়, অন্ন ও পরমান্ন। আবার সেও কাবেরীর কাহিনী শোনায়।

মন্দির ও যাত্রীদের সেই ঘরের মাঝামাঝি পাহাড়ের খাঁজ। পাহাড়ী ঝরনার নেমে যাওয়ার পথ, শুকনো খটখট করে। উপলখণ্ডে ভরা। এই হয়ত কাবেরীর গুপ্ত পথে নেমে যাওয়ার ইঙ্গিত। এরই ধারে কয়েকটা বড় বড় গাছের ছায়াতলে ছোট একটি বাংলো। নতুন বাড়ি। দরজা জানলা বন্ধ। পূজারীর ছেলে বলে, যাত্রীদের থাকবার জন্যে সবে তৈরি হয়েছে।

কান্তিসেনকে বলি, এখানে রাত্রি কাটালে কেমন হয়। তবে ঘরটা দুপাশে পাহাড় ও গাছে চাপা।

পূজারীর ছেলে জানায়, রাত্রিবাস যদি করতে চান, তবে এখানে কেন? ঐ ব্রহ্মগিরির যে চূড়া দেখছেন, তারই অপর পাশে সুন্দর বাংলো তৈরি হয়েছে—বনবিভাগের—সেখানে গিয়ে থাকুন। সেখান থেকে যেমন চমৎকার দৃশ্য, বাংলোটিও তেমনি। মোটরও যাবে, ঐ যে নতুন মঠ তৈরি হচ্ছে, তারই পাশ দিয়ে রাস্তা ঘুরে ওদিকে গেছে। এখান থেকে মাইলখানেক হবে।

কান্তিসেনেরও উৎসাহ জাগে। বলে, আপনি এখানে ততক্ষণ ঘুরে দেখুন, স্নান করতে চান তো তাও করে নিন। আমি চট করে মোটর নিয়ে ঘুরে দেখে আসি জায়গাটা কি রকম।

আমিও সেইমত ব্রহ্মগিরির চূড়ায় উঠে চারিদিক দেখতে চলি। দু'তিনশ ফুট মাত্র ওঠা। মাটি, পাথর-ছাওয়া পাহাড়ের গা। গাছপালা নেই। ন্যাড়া পাহাড়। যেন গায়ে ধূলা-বালি-মাখা উলঙ্গ অধিবাসী শিশু। সামান্য চড়াই হলেও রোদের তাপ দেহে অনুভব করি। ফিরে ফিরে নীচের দিকে তাকাই। কুণ্ডের জল পাহাড়ের কোলে শুয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে যেন হাসতে থাকে। বলি, আসছি এখুনি, এসেই তোমায় কোলে নেব। এই তো এলাম বলে!

মাথার উপর পৌঁছুই। খানিকটা সমতলভূমি। বিক্ষিপ্ত কতকগুলি বোল্‌ডারস্। পাথরগুলির গায়ে নানারকম রেখা। এই সবই বুঝি কাবেরীর বিবাহ-মণ্ডপের স্মৃতিচিহ্ন, সপ্তর্ষি মণ্ডলের চরণরেণুর অবশেষ।

এরই মাঝখানে ইলেক্‌ট্রিক আলোর খুঁটি। যেন দম্ভভরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রসাভাসের সৃষ্টি করে। উঁচু পাহাড়ের মাথায় খোলা জায়গায় দাঁড়ালে মানুষের মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়, আবদ্ধ দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়ের শ্রেণী। ঢেউয়ের পরে ঢেউ তুলে নিশ্চল হয়ে ঘুমিয়ে থাকে। আশেপাশে যতগুলো গিরিচূড়া, এই শিখরই সব চেয়ে উঁচু। প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট। শুনেছি আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে আরব সাগরও এখান থেকে দেখা যায়। আকাশ-পথে হয়ত ৬০-৭০ মাইল দূর হবে। এখন বেলা বাড়ায়, বোধ হয় দীপ্তিও বাড়ে, দিগন্তের বলয়রেখাও অস্পষ্ট দেখায়।

ফিরে আসি চূড়া থেকে। কুণ্ডের জলে স্নানও পরম তৃপ্তি দেয়। এক কোমর মাত্র জল। কখনও কমেও না, বাড়েও না।

কান্তিসেনও ঘুরে আসে। আনন্দ-সংবাদ আনে। উৎফুল্ল হয়ে বলে, ওদিকেও অতি শান্ত জায়গা। পাহাড়ের গায়ে নতুন বাংলো। সাজানো গোছানো। ইলেকট্রিসিটিও আছে। কোন অসুবিধে নেই। ফরেস্ট গার্ড, চৌকিদার—দুজনের সঙ্গেই দেখা। তারা বলে, এখানে কেউ আসে না। যে কদিন খুশি থাকুন। রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। এখুনি লোক চলে যাচ্ছে ভাগমণ্ডলে, শাক্-সবজি, আটা চাল ডাল

আনিয়ে দিচ্ছি। কতজন আপনারা আছেন, বলুন। আমি বললাম, ঠিক আছে। আমরা এখানেই থাকব। কিন্তু ভাগমণ্ডলের বাংলোয় খাবার অর্ডার দেওয়া আছে। খেয়েদেয়ে এখানে ফিরে আসছি। কদিনের রেশন যা দরকার তাও কিনে আনব। চৌকিদার তখন বলে, তাহলে গাড়িতে যে মালপত্র ব্যাগ রয়েছে, নামিয়ে রাখি,—অযথা বইবেন কেন? লোকটার বোধ হয় সন্দেহ হয়, যদি পরে মত বদলে যায়, ফিরে না আসি, যা নির্জন শান্ত জায়গা! বেচারী তো জানে না, ঐটেই আমাদের আকর্ষণ!

ফিরে চলি তখনই ভাগমণ্ডলে। থল-কাবেরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা নয়,—'ফিরে আসছি' বলে আসা, তাই মনও আনন্দে ভরা।

ঠিক বারোটায় বাংলোর খাবার টেবিলে সব খাবার সাজানো। ছিমছাম, পরিপাটি। চৌকিদারও হাজির। তবু দেখি, তার মেয়েটি পরিবেশন করে। রঙিন বেশভূষা। মাথার চুলে ফুল গোঁজা। মুখভরা হাসি। চন্দা তার দিকে তাকিয়ে। কান্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে মুখ টিপে হাসে। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারে এরা খ্রিস্টান। কান্তি শুনে বলে, সেইজন্যেই এত পরিচ্ছন্ন, সময়জ্ঞানও। চন্দা হেসে বলে, তা হোক, এই কাবেরী-ই আবার একদিন কোন্ অগস্ত্যমুনির চোখে পড়ে, কে জানে!

খাওয়া-দাওয়া সেরেই ফিরে আসি আবার চার মাইল দূরে, পাহাড়ের উপর থল-কাবেরীর ফরেস্ট বাংলোতে।

বাংলোতে প্রবেশ করার আগে চারদিকে তাকিয়ে দেখি। বিস্ময়ে মন ভরে ওঠে। এ যেন পথের মাঝে আচম্বিতে দেখা অতি প্রিয়জনের সঙ্গে। এ কি হিমালয়ের আপন-ঘরেই ফিরে এলাম? আকাশে মাথা তুলে পাহাড়ের পর পাহাড়। বহু নিচে পাহাড়ী নদীর উপত্যকা। সেখান থেকে পুঞ্জীভূত মেঘের দল পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠে। যেন, ফুটফুটে-রঙ শিশুর দল হামা দিয়ে মায়ের বুকের পানে ধায়। আবার, ওদিকে আকাশের মাথা জুড়েও মেঘ আসে উড়ে। যেন, সাদা পাখনা মেলে পরীরা আসে নেমে। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় নেমে থমকে দাঁড়ায়, গা এলিয়ে পাহাড় বেয়ে নামতে থাকে নীচে। নীচের ও উপরের মেঘের পুঞ্জ একাকার হয়। পাহাড়ের গা, নীচের উপত্যকা ঘন মেঘে ঢাকা পড়ে। শুধু উঁচু পাহাড়ের মাথাগুলো যেন সেই মেঘ-সমুদ্রে দ্বীপের মত ভেসে থাকে। কিন্তু তাও ক্ষণিক মাত্র। হঠাৎ আবার আকাশ জুড়ে নতুন মেঘের দল আসে। সারা পাহাড়, দূরদিগন্ত—সব কিছুই মেঘের নিশ্ছিদ্র আবরণে বিলুপ্ত হয়। তখন মনে হয়, বিশ্বের সীমানাদেশে একা দাঁড়িয়ে আমি, সুমুখে অরূপ অসীম শূন্য। কিন্তু সেও কয়েক মুহূর্ত মাত্র। মেঘে মেঘে মেশামেশির ছেদ ঘটে। মেঘের জাল কাটে। ছিদ্র পথে আবার দূরের পাহাড় ছবির মত আকাশের গায়ে ফুটে ওঠে। মেঘ উড়ে যায়, দিগন্ত আবার যেন ঘোমটা তুলে হাসিমুখে নীলনয়নে তাকায়। আবার মেঘ জমে, চকিতে আবার সব মুছে যায়। মেঘের এই অপরূপ আলোছায়ায় লুকোচুরি খেলা হিমালয়েরই বৈচিত্র্য। শুধু নেই এখানে দূরদিগন্তে অভ্রভেদী হিমাদ্রির শুভ্র তুষারশ্রেণী। হিমালয়ের মত অমন বিশাল পাহাড়ও নয়। চার, সাড়ে চার হাজার ফুট মাত্র উঁচু। তবুও মনে হয়, হিমালয়েরই স্বজাতি। এখানকার পাহাড়গুলোর মাথা ন্যাড়া, কিন্তু কটিদেশে গাঢ় সবুজ ঘন বনের মেখলা, না অর্ধ-উলঙ্গ আফ্রিকান অরণ্যবাসী। বনরক্ষী জানায়, এ-সব পাহাড়ের অধিকাংশরই উপরদিকে শুধু পাথরের স্তূপ, শুক্‌না মাটি, বালি কাঁকর। কিন্তু নীচের দিকে গভীর বন। বনমুরগী, হরিণ ওদিকে অজস্র। হাতি, বাঘও আছে। বাংলো থেকে মাইল তিন চার হেঁটে নেমে গেলেই দেখতে পাবেন।

বলি, চল, এখন তোমার বাংলোটি তো দেখি।

বাংলোর পিছনে ব্রহ্মগিরির চূড়া। সেই মাথার উপর আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিক পোস্ট। পাহাড়ের কোলে সুন্দর বাংলো। সুমুখে ফুলের বাগান। অল্প দূরে কুয়া। মাত্র পাঁচ-ছ হাত নীচেই জল। কারণ হয়ত, কাছেই ঝরনা। ভাবি কনকই হবেন এ-পাশে। তার আরও খানিক পাহাড়ের নীচে ফরেস্ট গার্ড ও চৌকিদারের থাকবার বাড়ি। কুয়ার কাছেই শাক-সবজির ছোট বাগান। টমাটো ফলেছে প্রচুর।

বাংলোর মধ্যে ঢুকেই ঢাকা লম্বা কাঁচে-ঘেরা বারান্দা। ঘরেরই মতন। তারই কোলে দুপাশে দুটি শোবার ঘর, মাঝখানে ডাইনিং রুম। দুদিকের ঘরের পাশেই স্নানাগার, স্যানিটারি ব্যবস্থাও। ঘরে ঘরে বিজলী বাতি। রাত্রি নটার পর আলো বন্ধ হয়। নিখুঁত সব ব্যবস্থা।

বাংলোর মধ্যে মানুষের হাতে সাজানো দেহ-সুখভোগের উপযোগী আয়োজন। ঘরের বাইরে প্রকৃতির অকুণ্ঠ দান,—মনের শান্তি ও আনন্দের অমূল্য সম্ভার।

সময় কেটে যায় পাহাড়ী ঝরনার স্বচ্ছ সাবলীল গতির ছন্দে।

কান্তিসেন এসে বলে, মার্কারায় এতবার আসি, কাছেই এমন যে মনোরম স্থান, জানতামই না। এবার থেকে সুযোগ পেলেই এইখানে আসব।

পরের দিন। সকালে মোটর নিয়ে সেই বালমুরিতে ঘুরতে যাওয়া। থল-কাবেরী থেকে আবার নীচে ভাগমণ্ডলে নামা। গ্রামে ঢোকার আগেই নদীর ধার দিয়ে নতুন পথ এদিক থেকে ডান দিকে ঘুরে যায়। মোড়ের উপর যাত্রী-ভরা ছোট বাস দাঁড়িয়ে। ওদিকের পথে গ্রামগুলিতে নিয়মিত যাতায়াত করে। রাস্তা কখনও নদীর পাশ দিয়ে ছোটে, কখনও বা নদী আশপাশে গাছপালার আড়ালে লুকায়। ক্রমে ছোট ছোট পাহাড়, টিলা দূরে সরে। সমতলভূমি যেন দু হাত বাড়িয়ে নদীর বুকে ধরে। চারিদিকে চাষ-আবাদ। ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ফলের বাগান। কলা, কমলা লেবুর প্রচুর ফলন কুর্‌গ্‌-এ। পথের ধারে কখনও বা বড় গ্রাম। নাম শুনি, নাপোকলু, মুরনাদ ইত্যাদি।

বালমুরি পৌঁছে যাই। গ্রামের স্কুলের পাশ দিয়ে রাস্তা বেঁকে নদীর ধারে নামে। পুল পার হয়ে অপর পারে আসি। এখানে আর পাহাড়ী নদীর ঝিরঝিরে ধারা নয়। সমতল ক্ষেত্রে নেমে কাবেরী উদার মনের বিস্তৃতির পরিচয় দেয়। এই সেই কাহিনী-ক্ষেত্র, এইখানেই নদীরূপিণী দেবী পার্বতীর পথরোধ করেন কুর্‌গ্‌-রমণীগণ। তাই অবরোধ-এড়িয়ে-যাওয়া নদীর ডান দিকে বাঁকও। এপারে বাঁধানো ঘাট। তটে প্রাচীর-ঘেরা এলাকায় শিব-মন্দির, দেবস্থান। মেয়েদের এক আশ্রমও। মন্দিরে দর্শন করে বাইরে এসে নদীর ধারে প্রাচীন বিশাল এক পিপ্পল বা অশ্বত্থ গাছের তলায় অপেক্ষা করি। চন্দা গেছেন আশ্রমে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে। দেখি, পুলের দিক থেকে হেঁটে এক ভদ্রলোক আসেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর বেশভূষা, চলার বিশেষ ধরন-ধারণ। গ্রামবাসী নন, দেখেই বোঝা যায়। সাহেবী পোশাক, প্যান্ট, বুশ শার্ট। মাথায় "বোলার ক্যাপ"—সবুজ রঙ। হাতে ছড়ি। লম্বা দোহারা শরীর। প্রাণবন্ত, সবল। ফিটফাট চালচলন,—যাকে বলে 'স্মার্ট'। কাছে এলে দেখি প্রৌঢ় বয়স ভদ্র ব্যক্তি। ফর্সা রঙ। দাড়ি-গোঁফ কামানো। রাস্তা ছেড়ে সোজা এগিয়ে আসেন গাছতলায় আমাদের কাছে। এসেই মুখে মৃদু হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দেন—করমর্দন প্রথায়। মুখে বলেন, আমি সোমান্না। প্রত্যুত্তরে আমাদেরও নাম বলতে হয়। তিনি নিজের পরিচয় দেন,—এইখানেই মাইলখানেক দূরে তাঁর গ্রামের বাড়ি। মার্কারাতে এক হোটেলের মালিক। সেখানে 'অনুরাধা প্রিন্টিং প্রেস' নামে এক ছাপাখানাও চালান। না, মিলিটারিতে কখনও যোগ দেননি। যদিও নিকট-আত্মীয় কয়েকজনই আর্মিতে বড় অফিসার। নিজের ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়; তবে, রক্তে মিলিটারি-ধারা—তার টান সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। তাই, ছোটবেলা থেকেই 'স্কাউটমুভমেন্টে' আছেন, এখন এই অঞ্চলের স্কাউটদের 'ইনচার্জ'। শহরে থাকলেও গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই হয়। এখানে প্ল্যানটেশন আছে—কফি, cardamom (ছোট এলাচ) ও Pepper (মরিচ)-এর। সে-সব দেখাশুনার জন্যে মাঝে মাঝে এখানে আসতেই হয়। তবে, সুবিধের মধ্যে—যদিও পরিবারের পুরুষ সবাই বাইরে কাজকর্মে কাটান,—এক বৃদ্ধ কাকীমা গ্রামের বাড়িতেই বসবাস করেন। তিনিই সব দেখেন শোনেন—যদিও তাঁদের সঙ্গে চাষ-আবাদের জমিজমা, বাগান সব এখন ভাগাভাগি হয়ে গেছে। এক নিশ্বাসে নিজের কথা অনেক কিছুই বলে যান, যেন কতকালের জানাশোনা, হঠাৎ অনেকদিন পরে দেখা। আগ্রহের সঙ্গে বলেন, চলুন না, আমাদের বাড়িতে। গাড়ি রয়েছে আপনাদের, কতটুকুই বা সময় লাগবে! তারপর ফিরবেন থল-কাবেরীর ডেরায়। এলেন কত দূর দেশ থেকে—আপনি তো সেই বেঙ্গল থেকে?—ভাল কথা, এই পরশুই আমার হোটেলে এক বাঙালী এসেছিলেন, চকরবর্তী না কি নাম বললেন,—অনেক গল্প শোনালাম আমাদের দেশ সম্বন্ধে। মার্কারাতে বাঙালী কখনও কখনও দেখি বটে,—কিন্তু থল-কাবেরী বা এই বালমুরিতে কাউকে দেখিনি। চলুন গাড়িতে,—আমাদের কফি ও এলাচের বাগান দেখিয়ে আনি।

তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও আমাদের কৌতূহল তাঁর গ্রামের বাড়িতে টেনে নিয়ে যায়।

মোটরে যেতে যেতে সোমান্না আবার কাবেরী-কাহিনী শোনান। কাবেরীই হল কুর্‌গ-এর প্রাণ,—অন্নদাত্রী। এ-দেশের কফি, ছোট এলাচ, মধু, কমলালেবু, ইত্যাদির কথা শুনেছেন, কিন্তু জানেন হয়ত, এখানকার প্রধান ফসল হল—ধান। এই পাহাড়ী দেশের এই নদীর কৃপায় শস্যাশ্যামল, ফল-ফসলে

হাস্যময়; আপনাদের গঙ্গা-মাতৃক দেশও যেমনি। আবার দেখুন, আপনাদের হিমালয়, এখানে আমাদের সমুদ্রের ধারে সহ্যাদ্রি—Western Ghat। তাই হিমালয়ের মত এদেশের এই পাহাড়ে মেঘ আটকে যায়, ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাতও হয়,—জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে সেই অক্টোবরের মাঝ অবধি বর্ষা চলে। মার্‌কারাতে বছরে প্রায় ১২০ ইঞ্চি জল হয়, আর ভাগমণ্ডল বা এই সব অঞ্চলে? তা প্রায় দু'শ ইঞ্চি। এই কারণেই কুর্‌গ্‌-এর লোকেরা প্রধানত কৃষিজীবী। আবার আশ্চর্য! কৃষিজীবীরা নিরীহ বলেই সাধারণ ধারণা, কিন্তু এরাই আবার রণকুশল। অস্ত্রশস্ত্র এদের প্রাণপ্রিয়, গৃহদেবতা। একদিকে মাতৃরূপী কাবেরীমূর্তি, অপরদিকে উন্মত্ত রণনৃত্য। হয়ত, পাহাড়ের রুক্ষতা আর নদীর উদারতা,—এই দুয়ের সমাবেশেই আমাদের প্রকৃতির এই গঠন। মাছ ধরা, শিকার খেলা,—এও আমাদের নেশা। আমিও ফুরসৎ পেলেই বেরিয়ে পড়ি। তাকিয়ে দেখুন, পথের দুপাশে ছোট এলাচের বাগান। নেমে দেখবেন নাকি?

গাড়ি দাঁড়ায়। পথের পাশে বেড়া-ঘেরা বাগান। ডিঙিয়ে ভিতরে নিয়ে চলেন। চারাগাছের কোন্‌খানে কিভাবে এলাচ ফলে, দেখান। বলেন, আসতেন যদি এলাচের সময়,—সেই সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে,—সুগন্ধে সারা দিক ভরে থাকত, এলাচের সাদা রঙ বনও আলো করে রাখত।

আবার গাড়ি চলে। দুদিকে আরম্ভ হয় কফির বাগান। তাঁর নিজের বাগানের সামনে নামেন। ভিতরে গিয়ে বোঝান কি ভাবে কফির চাষ হয়। মোগলরাই নাকি প্রথম এদেশে কফির প্রবর্তন করে। আরব দেশ থেকে আমদানি কফির নাম Robusta,—তার গাছগুলো কেমন ঝাঁকালো সতেজ হয়, অন্য কফির তুলনায় তার উৎপাদন-শক্তিও বেশি।—মেতে ওঠেন, আপন হাতে সযত্নে গড়ে তোলা ফসলের গুণকীর্তনে, যেমন অনাবিল আনন্দ ও গৌরব বোধ করেন স্নেহময় পিতা সুপুত্রের প্রশংসায়।

আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠি ফেরবার জন্যে। তিনি বলেন, অত তাড়া কিসের? চলুন এবার আমাদের বাড়িতে।

রাস্তা ছেড়ে বাগানের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে পৈতৃক বাসগৃহ। বলেন, দেড়শ' বছরের বাড়ি। চারপাশ বড় বড় গাছে ঘেরা। নারিকেল-কুঞ্জ। কলাগাছের ঝাড়। শান্ত নিভৃত গ্রাম্য পরিবেশ। তারই মাঝে খানিকটা খোলা জমি। ছড়ানো তিনখানা বাড়ি। পাকা গাঁথুনি। টালির ছাদ। সুমুখে ঢাকা বারান্দা। সিমেন্ট বাঁধানো রেলিং, সারি সারি কাঠের থাম, কাঠের উপর কারুকার্য। বাড়ির সামনে প্রশস্ত নিকানো উঠান। সেখানে ছড়িয়ে কফির বীজ শুকাতে দেওয়া। সামনের বাড়িখানি দেখিয়ে সোমান্না বলেন, ঐটে আমার ভাগের। এখন বন্ধই পড়ে থাকে। পাশের ঐ বাড়িটা আন্টি-র,—চলুন, ঐখানে যাব। এদেশের গ্রামের ঘরবাড়ি লক্ষ্য করেছেন হয়ত,—বাড়ি-ঘরের জটলা নিয়ে গ্রাম নয়,—ছড়ানো বাড়ি।

বারান্দায় উঠেই তিনি অন্দরে ঢোকেন।

তখনই একটি কিশোরী থালার উপর জলভরা ঝকঝকে কাঁসার গেলাস সাজিয়ে আমাদের সামনে এনে ধরে। এদেশে অতিথি ঘরে এলেই তৃষ্ণা-বারি এনে দেওয়া প্রথা। শুধু জল-দেওয়াই দেখি না, মেয়েটির পরনের শাড়িখানির উপরও দৃষ্টি পড়ে,—সেই আঁচল ঘুরিয়ে পরা। যেন কাবেরীর চলে-যাওয়ার চরণচিহ্ন দেহে ধরা!

বারান্দার দেওয়ালের গায়ে সারি সারি ফটো টাঙানো। সোমান্না এসে আগ্রহ সহকারে দেখান, কোন্‌টি কার। কে জীবিত, কেই বা মৃত। কার কোথায় কি লেখাপড়া শেখা, কার জীবনের কোন্ সময়ই বা ফটো তোলা, কার কী প্রতিষ্ঠা হয়, এখনই বা কোথায় উচ্চপদে আসীন,—সব গল্পই শোনান। সেই দেড়শ' বছরের প্রাচীন,—এখন শূন্যপ্রায় গৃহ,—ছায়াশীতল মৌন গ্রাম্য পরিবেশ—তাঁর স্মৃতিবিজড়িত কাহিনীর মধ্যে সজীব মুখর হয়ে ওঠে।

মূর্তিমতী-স্মৃতি-স্বরূপা এক বৃদ্ধা এসে দ্বারমুখে দাঁড়ান। শুভ্রকেশ, লোলচর্ম, শ্যামবর্ণ। সেই ঘুরিয়ে শাড়ি পরা। বলিচিহ্ন-আঁকা-মুখমণ্ডলে স্নেহ-সিক্ত মধুর হাসির রেখা,—যেন কুর্‌গ্‌-এর বন্ধুর গিরিশিরে অস্তগামী রবির ম্লান দীপ্তি। হাত তুলে স্বাগত সম্ভাষণ জানান, সোমান্নাকে কি যেন বলেন। সোমান্না আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, আন্টি বলছেন চা খাবেন, না কফি? বাড়ির ভেতরটাও দেখবেন তো?

ভিতরে নিয়ে চলেন। এ যেন কাশীতে পুরনো কোন বাড়িতে ঢুকি। তবে অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। আলোয় ভরা। মাঝখানে খোলা উঠান। চারিপাশ ঘিরে ঢাকা-বারান্দা। তারই কোলে সারি সারি ঘর। সুমুখের

ঘরের দরজার উপরে দেওয়ালে টাঙানো কাবেরীর ছবি।

ঘণ্টাখানেক সোমান্নার সঙ্গে গল্প করে আনন্দে কেটে যায়।

সম্পূর্ণ অপরিচিত পরদেশীর সঙ্গে তাঁদের আলাপ করার আগ্রহ, অন্তরঙ্গ মন-খোলা কথাবার্তা, আন্তরিক আতিথেয়তা দেখে মুগ্ধ হই।

আবার ফিরে আসি থল-কাবেরীতে। এ যেন আপন ঘরে মায়ের কাছে ফেরা। পাহাড়ের কোলে কী গভীর শান্তির আবেশ।

কান্তি ও চন্দা বিকেলে থল-কাবেরীর কুণ্ডে যায়। বলে, আমরা চললাম ব্রহ্মগিরির চূড়ায় উঠতে। কাল তো আমাদের ওঠা হয়নি। দুঃখ হয়, স্কেচ বই নেই। তবে, কাগজ-পেনসিল আছে। ছবির মতই দেশ।

আমিও বাংলো ছাড়িয়ে এই দিকের পাহাড়-পথে ঘুরি। আপন মনে। একান্তে। আশপাশের শিলাখণ্ডগুলি কত বিভিন্ন বিচিত্র আকারের। যেন, পাষাণে পরিণত অপরূপ জীবজন্তু। প্রকৃতির যাদুঘরে সাজিয়ে-রাখা আদিম যুগের প্রাণীদেহ।

একটা বড় পাথরের উপর স্থির হয়ে বসি। মনে আসে, কাবেরীর কাহিনী। সেও যেন কোন্ যুগ-যুগান্তের বার্তা নিয়ে আসে। তবে, প্রাণহীন নিশ্চল পাষাণের ভাষাহীন কঙ্কাল নয়। বিগলিত-করুণা প্রবাহিনী। সুমধুর কল-কল্লোলিনী। দেশবাসীর অন্নদায়িনী। শীর্ণতনু একা কুর্‌গ্ দেশেরই নয়। সারা ভারতময় তাঁর খ্যাতি। প্রসিদ্ধ সপ্তনদীরই অন্যতমা :

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে কাবেরীকে দেখি। আবার মহাভারতে ভীষ্মপর্ব ও বনপর্বেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। কালিকাপুরাণেও এঁর নাম। শ্রীমদ্‌ভগবতেও মহানদীর নামগুলির মধ্যে কাবেরীর উল্লেখ। আর এক স্কন্ধে, নারদমুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রহ্লাদ ও অজগরব্রতী এক মুনির যে কাহিনী শোনান তাতে বলেন সহ্যপর্বতের সানুদেশে সেই অজগরব্রতী মুনি শয়ান ছিলেন—এই কাবেরীর তীরে। সেই ভাগবতেরই অন্যত্র আবার এই মহানদীর গরিমা দেখা যায়,—বলদেব ভ্রান্তিবশত নৈমিষারণ্যে মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রিয় শিষ্য সূত রোমহর্ষণকে বধ করেন। সেই হত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তার যে সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রা, তারও মধ্যে 'সরিদ্বরা কাবেরী'! পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও কাবেরীর বর্ণনা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে চারটি নদীর সহ্যাদ্রি থেকে নিঃসৃত হয়ে সুদূর পূর্বাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরে অবসান, তাদের নাম লেখেন, গোদাবরী, কৃষ্ণা, পেন্নার ও কাবেরী। কিন্তু স্কন্দপুরাণেই কাবেরী-কাহিনীর রসঘন বিস্তার।

তবু, এসবই পুরাণের কথা। তাই, পুণ্যতোয়া তরঙ্গিণীর মাহাত্ম্য-কীর্তন।

মহাকবি কালিদাসের কাব্যলোকেই শুধু কাবেরীর তরঙ্গমালার ক্ষণিক নূপুর-কিঙ্কিনী। প্রেয়সী রমণীর অভিসারিকা রূপমাধুরী। রঘুবংশ—চতুর্থ সর্গ। মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয়-কাহিনী। পূর্বাঞ্চলে কলিঙ্গ জয় করে সসৈন্য রঘু নেমে চলেন দক্ষিণে—অগস্ত্যাচরিতামাশাম—যেদিকে অগস্ত্য যান। মহারাজ সমুদ্র বেলাভূমি ধরেন। কাবেরী-সঙ্গমের নিকটে আসেন। সেনা-বাহিনী নদীর জলে নামে। কবির অপূর্ব ভাষায় সেই উদ্বেলিত কাবেরীর রূপবর্ণনা :

স সৈন্য পরিভোগেণ গজদানসুগন্ধিনা।
কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ॥

হস্তিদলের মদগন্ধে সুরভিতা ও সৈনিকদের যথেচ্ছ স্নান-পান-বিলোড়নে উপভুক্তা কাবেরী রূপধারণ করেন এমনই যে কাবেরী-পতি সমুদ্রের মনে তাঁকে দেখেই সন্দেহ জাগারই কথা।

পরে রঘুর বিজয়বাহিনীর সহ্যাদ্রি অতিক্রম করার বর্ণনাও আছে। বিস্ময় জাগে, সেকালেও সেখানে মহাকবি মরিচ, এলাচ, চন্দন-বনের উল্লেখ করেন।

কাবেরী মহানদী। দাক্ষিণাত্য-জাহ্নবী।

ভাবি, কোথায় সেই 'উত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়'! তারই শিখরদেশে চিরতুষারাচ্ছন্ন গোমুখ-বিবর। ভাগীরথীর পুণ্য জন্মভূমি। গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ। মহাদেবের জটাজালে প্রচণ্ড প্রবাহের অন্তর্ধান। আবার আত্মপ্রকাশ।

আর, কোথায় ভারতের সুদূর পশ্চিম। আরবসাগরের উপকণ্ঠ। সহ্যাদ্রির ব্রহ্মগিরি চূড়া। তারই ক্রোড়ে ক্ষুদ্র জলকুণ্ড। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নিভৃত গোপন পথে ব্রহ্মকন্যা কাবেরীর অলক্ষ্য প্রবাহ।

হিমালয়-দুহিতার ভগীরথ-কাহিনী, জহ্নুর উপাখ্যান, শান্তনু-পরিণয়। শুভদা গঙ্গা ভীষ্ম-জননী। হিমগিরি শিবভূমি! সহ্যাদ্রি ব্রহ্মালয়।

উত্তরাপথের আর্য-ঋষি দাক্ষিণাত্যে নেমে এসে শিব-স্থাপনা করেন।

তাই, কাবেরী-জীবনে শুধু অগস্ত্য ঋষিরই বিচিত্র কাহিনী।

কিন্তু, দুই মহানদীরই একই পরিসমাপ্তি। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে অবলুপ্তি।

কাবেরীর জন্মভূমির অদূরেই আরব-সাগরের কল্লোল-আহ্বান। পশ্চিমের সে আসক্তি উপেক্ষা করে নদী বয়ে চলে পূর্বমুখে। এ যে দূরদেশবাসিনী ভগিনীর সঙ্গে মিলনপ্রয়াস।

কুর্‌গ্-এর শৈলপ্রকার ভেদ করে নদীর প্রবাহ মহীশূরের অন্তর্দেশ প্লাবিত করে। পার্বত্য মালভূমি অতিক্রম করে নিম্নভূমিতে অবতীর্ণ হয়। কোথাও বা গিরিখাদ, উন্মত্ত জলপ্রপাত। চুনচানকট্টে জলধারার সত্তর-আশি ফুট উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া। গঙ্গার অলঙ্ঘ্য আহ্বান। বঙ্গোপসাগরে মিলতেই হবে। দুরন্ত বেগে এগিয়ে চলেন কাবেরী। দুর্গম পার্বত্য পথ উত্তীর্ণ হয়ে ক্লান্তকায়ে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে নদী এবার ছড়িয়ে পড়ে? জলরাশির আঁচল বিছিয়ে বিশ্রাম খোঁজে। স্রোতের বিশাল ধারা দুই শাখায় বিভক্ত হয়। যেন, ঘুমন্ত মায়ের কোল ছেড়ে দুরন্ত দুই শিশু দুদিকে যায়। মায়ের চকিতে ঘুম ভাঙে। উঠে গিয়ে আবার দুটিকে কোলে ধরেন। ক্ষণিকের বিচ্ছেদ। মাত্র কয়েক মাইল ঘুরে গিয়ে দুই শাখায় পুনরায় মিলন ঘটে। এ নদীর চলার পথে এ ঘটনা একবারই নয়। মহীশূর প্রদেশে দুবার এমন ঘটে, পঞ্চাশ মাইলের ব্যবধানে। ফলে নদীর ধারার এই দুই বাহুর আবেষ্টনে দুই প্রকাণ্ড দ্বীপের সৃষ্টি হয়। সেরিঙ্গাপট্টম্ ও শিবসমুদ্রম্। শিবসমুদ্রমেরই জলপ্রপাত থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন হয়, আজ প্রায় ৭০ বছর আগে। প্রায় একশ মাইল দূরবর্তী কোলার স্বর্ণখনির কার্যে সে-শক্তির প্রয়োগ হয়। ভারতে সেই সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক কার্যকলাপের বৃহৎ কীর্তি।

মহীশূরে কাবেরীর এই প্রচণ্ড শক্তিমত্তার সহায়ক হয় আরও কয়েকটি উপনদী।

কাবেরীর বাম দিক থেকে নেমে আসে দশটি প্রবাহ। তার মধ্যে শিম্‌সা (Shimsa) প্রধান। দক্ষিণ দিকেও যে আটটি বড় নদী কাবেরীর বুকে জলভার ঢেলে দেয় তাদের মধ্যে কাব্‌বাণী নুগু (Kabbani Nugu), মোয়ার ভবানী (Moyar Bhabani), নোয়িল (Noyil) ও অমরাবতী বা অর্কাবতী বা হেমবতী মুখ্য।

ভবানী নদীর সঙ্গে যোগ হবার পর কাবেরী দক্ষিণ-পূর্বে ঘুরে যায়, আবার দুই ধারায় বিভক্ত হয়। তৃতীয়বার নদীর বুকে দ্বীপের সৃষ্টিও ঘটে,—এরই নাম প্রসিদ্ধ তীর্থ শ্রীরঙ্গম্। কাবেরীর জীবন-ব্রত জনকল্যাণ, চলার পথে তাই দিকে দিকে ছড়িয়ে যেন জলভার। কিন্তু ওদিকে আবার মহাসিন্ধুর মুক্তির আহ্বান। তরঙ্গভঙ্গে ছুটে চলেন কাবেরী। গতির আবেগে শ্রীরঙ্গম্ ছাড়িয়ে এসেই নদীর স্রোত আবার দুভাগ হয়ে দুদিক পানে ধায়। এক ধারা কাবেরী নামই রাখে, অপরটির নাম হয় কোলেরুন।

মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর জেলায় নদীর ধারাগুলি প্রবেশ করে। সাগরের সুগম্ভীর মহান আহ্বান এবার যেন কাবেরীর কানে এসে বাজে। কাবেরীর জীবন-ব্রত উদ্‌যাপিত প্রায়। দশ বাহু বিস্তার করে সাগরবুকে আত্মবিসর্জন দিতে ছুটে চলেন।

দিকে দিকে জলের ধারা। আকাশ-পথ থেকে দেখায়, যেন সাগর-তীরে ধরার বুকে নীল জলের আলপনা। অপরূপ ব-দ্বীপের সৃষ্টি, যেমন গঙ্গার দীর্ঘ যাত্রাশেষে সাগর-সঙ্গমেও।

সমভাবেই হয় কাবেরীরও জীবন-সমাপ্তি, সাগরবক্ষে অবলুপ্তি। একই উপসাগরের উত্তরাঞ্চলে গঙ্গার ও পশ্চিমাংশে কাবেরীর জলস্রোতের যাত্রাশেষ।

কিন্তু, দুই নদীর রূপমাধুরীর যেন পার্থক্য থাকে।

গঙ্গার আজীবন উচ্ছলিত মাতৃমাধুর্য। তবুও, গৈরিক বসনা। বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি। অপার্থিব শান্তিপ্রদায়িনী।

কাবেরী সুন্দরী। মনোরমা। উদ্বেলিতা, প্রাণময়ী। বুকে তার অলঙ্কার, অমূল্য রত্নসম্ভার। এককালে কাবেরীর জলতলে শুক্তিজাত মুক্তার অশেষ খ্যাতি ছিল। প্রাচীন চোল-সাম্রাজ্যের প্রধান নগর উর্গপুর —আধুনিক উরাইউর (Uraiyur)—কাবেরীর দক্ষিণ তটে গড়ে ওঠে। মুক্তা-ব্যবসার বিপুল প্রসারও হয়।

চোল রাজাদের রাজত্বকাল থেকে ব্যাপকভাবে কৃষিকার্যে কাবেরীর বর্ষাস্ফীত জলধারার সুব্যবহারও শুরু হয়।

কাবেরী তাঁর ৪৭৫ মাইলব্যাপী দীর্ঘ যাত্রাপথে দাক্ষিণাত্যের দেশে দেশে শস্যসম্পদের ভাণ্ডার সাজিয়ে রেখে যান। মাদ্রাজের তাঞ্জোর বা আধুনিক তামিলনাড়ুর Thanjavur ব-দ্বীপ জেলাতে প্রায় ১.৪ মিলিয়ন একর ধানজমির মধ্যে ১.২ মিলিয়ন একর জমি কাবেরীর বা তার উপনদীগুলির জল-প্রণালীর উপরই নির্ভর করে। মাদ্রাজের Mettur reservoir এই জলবিভাগের কাজে অশেষ সাহায্যকারী হয়। ওদিকে মহীশূরেও তেমনি নদীর বাঁধের (Dam) সৃষ্টি। কাবেরীর জলধারার এই বিভাগ ও বাঁধ তৈরি নিয়ে দুই প্রতিবেশী প্রদেশের সরকারের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে, বিবাদও জাগে। এ যেন বিবদমান পুত্রদের মধ্যে অভাগা জননীর ভাগাভাগির দুর্বিপাক।

কিন্তু, থাক্ সে-সব জাগতিক ও সাংসারিক ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখের কথা, মানুষের জীবনযাপনের প্রয়োজন মেটাবার প্রচেষ্টা। আজ কাবেরীর জন্মস্থানে বসে, সহ্যগিরির মহান রূপ হৃদয়ে অন্য ভাব আনে। মনে হয়, মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হাসি-কান্না,—এমন কি, জন্মমৃত্যু—জীবনের তুচ্ছ অংশ। প্রকৃতির নিস্তব্ধ নিভৃত কোলে বসে অপর্যাপ্ত শান্তিতে মন ভরে ওঠে। মর্মে মর্মে অনুভব করি, এই বিরাট বিশ্বসৃষ্টির মাঝে অতি ক্ষুদ্র আমারও অন্তরাত্মার কোথায় যেন নিগূঢ় আত্মীয়তার যোগ আছে।

চকিতে যেন সাড়া দিয়ে সান্ধ্যসমীরণ বহে আসে। দেহমনে আনন্দ-হিল্লোল তোলে। মনে গুঞ্জরণ ওঠে Mathew Arnold-এর :

"Blow, ye wind! Lift me with you
    I come to the wild
Fold closely; O Nature!
    Thine arms round thy child.
To thee only God granted
    A heart ever new–
To all always open,
    To all always true."

ধীরে সন্ধ্যা নামে। নীল আকাশ যেন আয়ত নয়নে কোলের শিশুর প্রতি তাকান। ধরণীর বুকে পা ফেলে বাংলোতে ফিরে আসি।

রাত কাটে গভীর আনন্দে শান্তিময়ী নিদ্রার আবেশে।

কিন্তু, কত ভিন্ন রুচিই না বিভিন্ন মানুষের!

কান্তিসেন সকালে উঠে আসে। মুখে তার দুশ্চিন্তার মেঘভার। সসঙ্কোচে বলে, দাদা, দুদিন তো কাটল এখানে, আজ রওনা দেওয়া যাক। পথে আবার জোগ-ফল্‌স্ ও গোয়াতেও তো দুদিন কাটাতে হবে।

আশ্চর্য হই! বলি আরও দুদিন এখানে থাকলে হত না? তোমার বম্বে ফেরবার দিন আসতে এখনও তো দেরি?

গম্ভীর মুখে সে জানায়, তা ঠিকই। জায়গাও ভাল। অদ্ভুত লাগছেও। সেই জন্যেই পালিয়ে যাওয়া। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি,—ঠিক কি, মনে নেই। ফ্যাক্টরির মেশিন—কাজের তাড়া, এই সব কী যেন! কি ঘটছে সেখানে, কি জানি! ফেরাই যাক, কি বলেন?

করুণ চোখে আমার দিকে চায়।

অতএব, কাবেরীর কাছে বিদায় নিয়ে আবার পথে নামতে হয়।

আফ্রিদি মুল্লুকে

॥ ১ ॥

বদ্‌রীনাথ থেকে খাইবার গিরিপথে।

একই যাত্রায় নয়। তবে একই বছরে। তাও সাম্প্রতিক কালে নয়,—সেই ১৯২৮ সালে।

মে-মাসে চলি কেদার-বদরী। হিমালয়ের সেকালের দুর্গম তীর্থ। হৃষীকেশ থেকে পায়েহাঁটা দীর্ঘ পথ। যুগ-যুগান্তর ধরে এরই বুকে চরণচিহ্ন আঁকা লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর। সেই অন্তহীন নিরন্তর যাত্রার ধারা এখনও বয়ে চলে। সারি সারি যাত্রীদল। মুক্তিকামী সাধুসন্ত। পুণ্যলোভী নরনারী। হিমালয়-প্রেমিক পরিব্রাজক। সারা ভারতের সর্ব প্রদেশ থেকে তাঁরা আসেন। এই প্রাচীন তীর্থপথে তাঁদের পদধ্বনি যেন জাগিয়ে রাখে শাশ্বত ভারতের চিরন্তন হৃদ্‌স্পন্দন। বোঝা যায়, অদৃশ্য কোন্ এক স্বর্ণসূত্রে গাঁথা থাকে ভারতবাসীর অন্তরাত্মা।

চারিপাশে হিমালয়ের উত্তরাপথের উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। যেন, জটাজুটধারী ধ্যানরত প্রাচীন ঋষিবৃন্দের সমাবেশ। তাঁদের উন্নত শিরে হংসশুভ্র তুষারস্তবক। করপুটে নদী জপমালা। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী, স্বর্গসুতা অলকানন্দা, নৃত্যপরা মন্দাকিনী। শ্যামল অরণ্যানীর স্নিগ্ধছায়াঘন তটভূমি।

আর, সেকালের গাড়োয়ালবাসী? কপর্দকশূন্য দৈন্যের মাঝেও মুখভরা প্রসন্ন হাসি, বুকভরা সুখ, সুগভীর প্রশান্তি। তীর্থযাত্রীর নিঃস্বার্থ-সেবারত। নিরীহ, নির্লোভ, সরল মানুষের দল। মারামারি, কাটাকাটি, চুরি-ডাকাতি—এ-সব তাদের স্বপ্নেরও অতীত। সেখানে হিমালয়ে সাধুর আশ্রম, তপস্বীর তপোভূমি,—পাহাড়ের চূড়ায়, নদীর তীরে দেবদেবীর দেবায়তন।

নৈসর্গিক শোভায় বিমুগ্ধ হয়ে চলে ভক্ত তীর্থযাত্রী,—ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ, তবু মন-ভরা আনন্দ ও শান্তি।

অপর দিকে,—

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের পার্বত্য প্রদেশ,—পেশোয়ার, খাইবার,—আফ্রিদিদের দেশ। সেখানেও পাহাড়ের বুকে আঁকা ভারতের বহু যুগের ইতিহাসের পদচিহ্ন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন তার রূপরেখা। রুক্ষ রুদ্র তরুলতা-শূন্য পাহাড়। দুর্ধর্ষ সেখানকার মানুষ। যুদ্ধ তাদের খেলা। বীরত্বব্যঞ্জক তাদের জীবনধারা। শান্তি-শৃঙ্খলার ধার ধারে না।

সেখানে গিরিশিরে মন্দিরের শান্ত শোভা নয়,—উগ্রমূর্তি পাথর-গাঁথা দুর্গ। মানুষের হাতে সেখানে জপের মালা নয়,—রাইফেল বন্দুক আগ্নেয়াস্ত্র।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সেখানে রচিত হয় রক্তাক্ষরে, রণাঙ্গনে।—তার কারণও থাকে।

হিন্দুকুশের দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপ্রাচীর ভেদ করে—আরও নেমে এসে—উত্তর-পশ্চিম ভারত ভূমিতে প্রবেশের সেকালে সেই ছিল সিংহদ্বার। অতিকায় অজগরের মতন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে নেমে আসে সর্পিল গিরিবর্ত্ম, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খাইবার পাস্।

এখন আর ভারতের প্রবেশদ্বার নয়। নতুন দেশ পাকিস্তানের।

কিন্তু যে-সময়কার এ কাহিনী, তখন ছিল ভারতেরই অন্তর্গত। তবে ভারত তখন পরাধীন। ব্রিটিশ শাসনে শৃঙ্খলিত। ঐ অঞ্চল তখনকার ভারতের সীমান্ত প্রদেশ। অতএব, বিদেশী সরকারের ছিল কড়া পাহারা। দেশের মধ্যে হলেও যাতায়াতের স্বাধীনতা ছিল না। এখন ভারত স্বাধীন, কিন্তু সে দেশ ভারতের বহির্ভূত।

সেই অধুনা-হারিয়ে-যাওয়া দেশে গিয়েছিলাম সেই সেকালে। তারই এই ক্ষুদ্র কাহিনী।

১৯২৮ সালের নভেম্বর মাস। ক'মাস আগে ঘুরে এসেছি কেদার-বদরী। এখন পূজার ছুটি কাটে শৈল-শহর সিমলাতে। কলকাতায় ফেরার দিন এগিয়ে আসে। হঠাৎ ঠিক করি, হাতে এখনও তো কদিন

সময়,—যাই না কেন পেশোয়ার, খাইবার পাস্ দেখে আসি।

সঙ্গীও পেয়ে যাই। অতি নিকট আত্মীয়-বন্ধু এবং তার বৃদ্ধ পিতা। ঠিক হয়, যাবার পথে অমৃতসর, লাহোর, তক্ষশিলাও দেখে যেতে হবে।

৯ই নভেম্বর যাত্রা শুরু। কাল্‌কায় নেমে রাত্রের ট্রেন ধরা হয়। পরের দিন সকালে অমৃতসরে নামি। একটা পাঞ্জাবী হোটেলে একবেলার জন্যে আশ্রয় নেওয়া হয়।

শিখেদের বিশ্ববিখ্যাত স্বর্ণমন্দির মনে ভক্তি ও আনন্দ জাগায়। জালিয়ানওয়ালাবাগের বুকে মদোন্মত্ত ব্রিটিশরাজের চিরকলঙ্কময় কুকীর্তির লাঞ্ছন ভৃগুপদচিহ্নের মত ভারতমাতা ধারণ করেন, দেখি। পরাধীনতার গ্লানি অন্তরে ব্রিটিশ-বিদ্বেষের ইন্ধন যোগায়। আবার শহরের আর এক প্রান্তে শিখবীর রণজিৎ সিংহের দুর্গ দেশজননীর ভক্ত সন্তানের গৌরবকাহিনী প্রচার করে। শিখেদের খালসা কলেজেও যাই। শহরের জনতাবহুল বাজারেও ঘুরি। বেলা বাড়ে। শহর দেখার বাসনাতৃপ্ত মন ও ঘোরাঘুরিতে-ক্লান্ত-দেহ নিয়ে হোটেলে ফিরি। কিন্তু দ্বিপ্রহরের ভোজনে তৃপ্তি দেয় না। আমিষ-প্রধান মশলাবহুল পাঞ্জাবী খাদ্য। নিরামিষাশী বাঙালী যাত্রী। পিতৃতুল্য বৃদ্ধ সঙ্গী সহাস্যে অনুযোগ করেন, বাপু, হোটেলে কদিন এভাবে খাওয়া চললে হয়েছে আর কি!

বলি, ঠিকই বলেছেন। আর এ ধরনের পাঞ্জাবী হোটেলে খাওয়া নয়। ভিন্ন ব্যবস্থার চেষ্টা করা যাবে।

দুপুরের ট্রেন ধরে লাহোরে চলি। দেড় ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাই। লাহোরে রাত কাটানোর উদ্দেশ্য নেই। শহর দেখে রাত্রে রাওয়ালপিণ্ডির ট্রেন ধরতে হবে। সেইমত স্টেশনে নেমেই রাত্রের ট্রেনে তিনটে বার্থ রিজার্ভ করা হয়। মালপত্রও স্টেশনেই থাকে—'লেফ্‌ট্ লাগেজে'। হালকা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অনেক সুবিধে। কিন্তু ঘোরা-শেষে রাত্রের আহার? মতলব আঁটি মনে মনে। স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিই। বলি, চলো, 'ট্রিবিউন' দপ্তরে।

লাহোরের দৈনিক সংবাদপত্র—ট্রিবিউন। খ্যাতনামা বাঙালী সম্পাদক। শ্রদ্ধেয় কালিনাথ রায়। সাত বছর আগে—১৯২১ সালে—বাবার সঙ্গে যখন প্রথমে লাহোরে আসি, দেখেছি, কালিনাথবাবু প্রায়ই আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

পত্রিকার অফিসের সামনে গাড়ি থামে। সঙ্গীদের বলি, একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি আসছি।

সম্পাদকের ঘরে ঢুকি। দেখে চিনতে পারেন না, পারার কথাও নয়। পরিচয় পেতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে বুকে জড়িয়ে ধরেন। সস্নেহে বসতে বলেন। জানাই, এখন বসা নয়। গাড়িতে দুজন সঙ্গী রয়েছেন। তাঁদের পরিচয় দিই। আমাদের প্রোগ্রামও বলি, এখনই শহর ঘুরতে যাব। ট্যাক্সির ড্রাইভারকে ডেকে আনি, তাকে বলে দিন, এই একবেলার মধ্যে কোথায় কি দেখা যেতে পারে! ঘোরা সেরে আপনার বাড়িতে নিয়ে যাবে। তখন সেখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা। রাত্রে রাওয়ালপিণ্ডির ট্রেন ধরা।

তিনি হাসেন। বলেন, একেবারে ঘোড়ায় চড়ে আসা দেখছি। কিন্তু এইটুকু সময়ে লাহোরের আর দেখবে কি? আজ শুধু সালিমারবাগ, শাহাদারা দেখে শহরের মধ্যে একটা চক্কর দিয়ে চলে এস। পেশোয়ার থেকে ফেরবার পথে এখানে অন্তত একদিন কি দুদিন কাটিয়ে যেয়ো,—তখন ফোর্ট, মিউজিয়াম ইত্যাদি দেখবে,—সব ব্যবস্থা করে রাখব।

সেই মতই তখনই ঘুরতে চলি।

দেখে আসি, শাহাদারার সুরম্য উদ্যানের মধ্যে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কারুকার্যময় শ্বেতপাথরের সুদৃশ্য সমাধি-সৌধ। সদর্পে ও সগৌরবে মাথা তুলে।

আর,—তারই অদূরে—তাঁরই প্রিয়তমা মহিষী, মোগল সাম্রাজের প্রকৃত সর্বময়ী সম্রাজ্ঞী, অশেষ রূপগুণবতী যশস্বিনী নুরজাহানের নগণ্য সমাধিক্ষেত্র। পাথরের অতি সাধারণ সামান্য একটুকরা গাঁথনি। নিরলঙ্কার, নিরাভরণ, প্রভাহীন। সেই মনস্বিনী রমণীর দুঃখময় শেষজীবনের যেন বিষাদ-ছায়ামলিন। সমাধির বুকেও তাই উৎকীর্ণ করা এই শায়েরী :

বর্‌মজার-ই-মা ঘরীবান্ এই চিরাঘী নই ঘুলী,
নই পর-ই-পরওয়ানা সুজদ নই সদা-ই বুলবুলী।
["গরীব গোরে দীপ জ্বেলো না ফুল দিয়ো না কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে।"— (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)]

ভাবি, ভাগ্যবিধাতার কী সকরুণ বিধান।

শহর ঘুরে কালিনাথবাবুর আবাসস্থলে আসি। ভারত-বিলডিংস্-এ পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সান্ধ্য আহার হয়। কালিবাবু সুপরামর্শ দেন, ও-সব পাঞ্জাবী হোটেলে তোমাদের পোষাবে না। রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার—দু-জায়গাতেই কালীবাড়ি রয়েছে,—থাকা, খাওয়ার ভাবনা নেই। বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ি এ সব,—বিদেশে বাঙালীর কত বড় আশ্রয় দেখবে।

॥ ২ ॥

রাত্রে ট্রেনে শুয়ে শুয়ে ভাবি, বাংলার বাইরে বাঙালীদের কথা। সেকালে তাঁদের অনেকেরই বিদেশে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে দেশব্যাপী খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। আগন্তুক অপরিচিত বাঙালীদের সাদরে ডেকে এনে নিজগৃহে আশ্রয় দেন। প্রবাসে কালীবাড়ি স্থাপনা করে বাঙালীদের সাময়িক থাকবার পাকা ব্যবস্থা করেন, আশ্চর্য কি? তা ছাড়া, বাঙালীরা তো অনেকেই মায়ের ভক্ত। আমারও জন্ম কালীমাতার খাস এলাকার মধ্যে,—ভবানীপুরে। ছেলেবেলায় দেখেছি, দোকানে বিক্রি-করা মাংস বাড়িতে ঢুকতে পেত না। কালীঘাটে মায়ের কাছে বলি দেওয়া ছাগমাংসই শুধু আনা চলতো। সে-সব প্রথা কোন্ কালে লোপ পেয়ে গেছে! মায়ের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনও কত বিচিত্র ভাবে রূপ নিত! মনে পড়ে, এক বন্ধুর কাছে শোনা এই লাহোরেরই প্রবাসী এক বাঙালীর অতি-অদ্ভুত জীবন ও কালী-ভক্তির কাহিনী। বন্ধুর ভাষাতেই বলি : "সে বছর কাজে লাহোর যেতে হল। সপ্তাহ তিনেক থাকতে হবে। কর্মস্থলের নিকটে বড় রাস্তার ওপর একটা সস্তা বাঙালী হোটেলের সন্ধান পেয়ে সেইখানেই উঠলাম। নাম শুনি, ডাক্তারবাবুর হোটেল। তিনতলা বাড়ি। একতলায় খানকয়েক দোকানঘর। দোতলায় মালিক ডাক্তারবাবু নিজেই থাকেন,—একা। তিনতলায় কাঠের পার্টিশন দেওয়া ক'টা একানে ঘর,—বোর্ডারদের জন্যে। আমার ঘরের পাশে দুটি মাত্র বোর্ডার। অনেক দিন আছেন শুনলাম। তিনতলাতেই হোটেলের রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা। রান্নার লোক আছে, দুজন চাকরও আছে। দু'বেলা চা-জলখাবার, দুপুরে ও রাতের আহার, ঘরভাড়া, ইলেক্‌ট্রিক খরচা,—সব কিছুর বাবদ মোট দৈনিক চার্জ দেড় টাকা! মালিকের চলে কি করে, অবাক হই। শুনতে পাই, লোকটি নাকি অদ্ভুত। লোকে তাঁর নাম দিয়েছে,—'মা-খাই'। কথাটার মানে বুঝি না, তবে বুঝতে পারি, ব্যবসার গরজে হোটেল চালানো নয়। হয়ত প্রবাসী বাঙালীদের সস্তায় থাকবার একটা ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য, আর তাই থেকে নিজের খরচেরও যতটুকু সাশ্রয় হয়। অথচ লোকটি নাকি অসামাজিক, তাঁর সঙ্গে বিশেষ কেউ মেশেন না, খদ্দের এল-না-এল তারও তোয়াক্কা করেন না। আমাকে কিন্তু প্রথম দিন বেশ সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। প্রতিদিন আসা-যাওয়ার পথে দোতলায় সিঁড়ির পাশে দেখিও, তাঁর আধা-অন্ধকার বড় ঘর, একলাই সেখানে বসে আছেন; চোখাচোখি হলেই একটু মৃদু হাসির বিনিময় হয়,—অসামাজিক বলে মনে হয় না। দিন তিন-চার পরে বিকাল পাঁচটা নাগাদ ফিরছি, তাঁর ঘরে হঠাৎ উঁকি মারতে দেখি, একটা দড়ির খাটিয়াতে একলা চুপচাপ বসে। চোখাচোখি হতেই সাদরে বলে উঠলেন, "আসুন না—আসুন না!"

'জামাকাপড় বদলে আসছি এখনই—' বলে উপরে চলে গেলাম। চা-জলযোগ সেরে তাঁর ঘরে এসে ঢুকলাম।

ডাক্তারবাবু আদর করে কাছে ডেকে তাঁর গায়ে-গা-লাগিয়ে সেই দড়ির খাটিয়াতেই বসালেন। ডাক্তারবাবুর পরনের বেশবাস অত্যন্ত মলিন,—খাটো ধুতি আর গেঞ্জি। ঘরে কোন জানলা নেই। ঘুপসি অন্ধকার। ঘরের আসবাব দীন, অগোছালো। খাটিয়ার পাশেই একটা টিপাই। তার ওপর আধ-খালি বিয়ারের বোতল। প্রথম অভ্যর্থনায় বোতলটা দেখিয়ে বললেন, "আসুন,—একটু—"

করজোড়ে নিবেদন জানালাম, আমি ও-রসে বঞ্চিত।

তিনি বললেন, "খুব ভালো! খুব ভালো!"

ঘরের অন্ধকার ভাবটা ক্রমশ খানিক কেটে আসে। তখন নজর পড়ে, খাটিয়ার পাশে দেওয়ালে একটা কুলুঙ্গী। তার তাকে এটা-সেটা টুকিটাকি জিনিস। তারই মাঝে ন-দশ ইঞ্চি লম্বা একটা মাটির কালীমূর্তি। কালীঘাটে যেমন খেলনা বিক্রি হয়। লক্ষ্য করি, মূর্তিটির আশেপাশে দু-একটা শুকনো জবাফুল ছড়ানো,—যেন বেশ কিছুদিন আগে কেউ নিবেদন করেছে।

ঘরভরা মূর্তিমান তামসিকতা।

কিন্তু তারই মধ্যে যেন একটা আভা ছড়িয়ে বসে আছেন ডাক্তারবাবু। বয়স তখন তাঁর ষাটের ওপর, তবুও অত বয়সের শরীরের বাঁধুনি অটুট। বয়সকালে অসাধারণ স্বাস্থ্যবান ছিলেন, ব্যায়ামপুষ্ট পেশীগুলি স্পষ্ট তার সাক্ষ্য দেয়। অত্যন্ত সুপুরুষ। নাতিদীর্ঘ দেহ। সাহেবদের মত ধবধবে রঙ। মাথাভরা কালো কুচকুচে কোঁকড়া চুল। চোখ দুটা করমচার মত টকটকে লাল,—মনে হয়, অতিরিক্ত বিয়ার পানের ফল। তবে কথায় জড়তা বা মত্ততা কিছু ছিল না। যদিও আমি তাঁর চেয়ে অনেক ছোট, তবু বেশ অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করলেন, বয়সের ব্যবধানটা কোন অন্তরায় হল না।

আমার পরিচয় সম্বন্ধে দু-একটা মামুলী প্রশ্নোত্তরের পর আমি তাঁর পরিচয় নিয়ে জানলাম, তিনি খাস মধ্য-কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। শুনে কৌতূহল বাড়ল। প্রশ্ন করলাম, এইভাবে স্থায়ী লাহোরবাসী হলেন কি করে?

তাঁর রক্তবরণ চোখ দুটি আমার দিকে ঘুরিয়ে বললেন, সে অনেক কথা। আপনার কি বসে শোনবার ধৈর্য হবে?

আমি বললাম, বলুন না—শোনাই যাক। এই তো সবে বিকেল! আর আমার কাজই বা কি আছে এখানে?

হঠাৎ—আমাকে চমকে দিয়ে, বিয়ারের বোতলটা তুলে নিয়ে, সেই কালীমূর্তির দিকে তাকিয়ে "মা-আ খা-ই!" বলে মুখ উঁচু করে সোজা বোতল থেকে গলায় এক ঢোঁক ঢেলে পান করলেন, বোতলটা পূর্বস্থানে রাখলেন, মুখটা কাপড়ে মুছে নিলেন। তারপর আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে প্রতি পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর "মা-খাই" বলে মাকে নিবেদন করে কারণবারি পান চলতে লাগল। শুনলাম, মাকে নিবেদন না করে কখনও তিনি পান করেন না।

আমিও এবার বুঝলাম, তার 'মা-খাই' নাম হওয়ার কারণ।

ডাক্তারবাবুর জীবনে বেশ বৈচিত্র্য আছে।

বললেন, "আজ তিরিশ বছর হল লাহোরে আছি। লেখাপড়া বেশি শিখিনি। কলকাতার একটা ব্রিটিশ ফার্মে সামান্য একটা চাকরি পেয়েছিলাম। চেহারাটা বিশেষ ভাল ছিল, তার ওপর কুস্তি-টুস্তি করে শরীরটাও গড়েছিলাম, এখনও বোধ হয় তার চিহ্ন কিছু রয়েছে,—" বলে নিজের হাতের পেশীগুলির দিকে একবার তাকিয়ে একটু শক্ত করে ফুলোলেন। তারপর একটু মুচকে হেসে বললেন, "কিন্তু এই শরীর আর স্বাস্থ্যই যে আমার কাল হবে, কে জানতো?"

ডাক্তারবাবুর জীবনের পরের অধ্যায় শুনি। তিনি বদলি হলেন ফার্মের লাহোর ব্রাঞ্চে। প্রথম দু-চার বছর ছুটি নিয়ে কলকাতায় গিয়েছেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী ছিলেন? একটি ছেলেও হয়েছিল। কিন্তু স্ত্রী ও ছেলেকে লাহোরে আনতে পারেননি। ঘটনা-বিপর্যয়ে প্রথম যৌবনেই নিজের সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ছেলেটি মামারবাড়িতে মানুষ হয়ে বি. এ. পাস করেছে, তিনি শুনেছেন। কিন্তু আজ দেখা হলে বাপ-ছেলে কেউ কাউকে চিনতে পারবে না। স্ত্রীও গত হয়েছেন।

বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ এই। তিনি লাহোরের এক অভিজাত মুসলমান পরিবারের সুন্দরী বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়ে পড়েন। সেই মহিলাই নাকি এঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে এঁকে আকর্ষণ করেন।

প্রেম-চর্চা গোপনে চললেও, ব্যাপরটা জানাজানি হয়ে যায় একদিকে বাঙালী মহলে, অপরদিকে সেই মহিলাটিরও গৃহে। স্থানীয় অফিসের বর্ষীয়ান বাঙালী ম্যানেজার তাঁকে বলেন, "তোমার সম্বন্ধে যা শুনছি তাতে এখানে বিপদে পড়ে যাবে। তোমাকে এখনই কলকাতায় বদলি করে দিচ্ছি।"

ডাক্তারবাবু তখন অনেক দূর এগিয়েছেন, মহিলাটিও তাঁকে ছাড়তে রাজী নন। এমন কি প্রস্তাব করলেন, স্বামীকে ছেড়ে ডাক্তারকেই বিয়ে করবেন। অগত্যা বড়বাবুর কাছে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে লাহোরেই রয়ে গেলেন। পরে সামাজিক গোলযোগের সম্ভাবনা কাটাবার জন্যে ওখানকার হিতৈষী মুসলমান বন্ধুদের পরামর্শে, কলমা পড়ে মুসলমান হলেন, নাম নিলেন গোলাম হোসেন। সেই মহিলাকে বিয়ে করে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়ে বিলাসে দিন কাটাতে লাগলেন। সেই থেকে সুরাপানেরও নেশা।

কিছুদিন পরে সেই মহিলার মৃত্যু হওয়ায় ডাক্তারবাবু মুশকিলে পড়লেন। মুসলমানদের সঙ্গে বিবাদ

বাধল, সম্পত্তিও হারালেন। নামটাই শুধু পালটে আবার স্বধর্মে ফিরে এলেন এবং "মা-খাই" হয়ে উঠলেন। তারপর জীবিকার জন্যে নানান চেষ্টার মধ্যে হাতুড়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা একটা। সেই কারণে 'ডাক্তারবাবু' নামও। কিন্তু মেয়েদের প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। পর-পর আরও কয়েকটি 'অ্যাফেয়ার্স্' (affairs)-এ জড়িয়ে পড়লেন, কলকাতায় আর ফেরা হল না। একরকম সমাজচ্যুত হয়ে এখানে থেকে গেছেন। বুঝলাম, তাঁর হোটেলে লোকজন কম আসে কেন? সেদিন বিদায় নিলাম। এই confessions শোনবার পরও মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি। প্রতিবারই 'মা-খাই' শুনেছি।

একটি বর্ষীয়সী ভদ্র পাঞ্জাবী মহিলাকে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে দেখেছি। তাঁর কোন গোপনতা ছিল না। ফুটফুটে একটি ছোট ছেলে—তাঁর পৌত্র বলেই শুনতাম—সঙ্গে সঙ্গে থাকত। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সহজ বন্ধুতা ছাড়া অন্য কোন রকম সম্বন্ধের সন্দেহ হোত না। কিন্তু মনে হোত, তিনিই অর্থসাহায্য করে হোটেলটি ও 'মা-খাই'কে বজায় রেখেছিলেন।

এবারের মত আমার লাহোর বাস শেষ হয়। জিনিসপত্র গুছিয়ে টাঙ্গায় ওঠার আগে ডাক্তারবাবুর কাছে বিদায় নিতে যাই। তাঁর পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিই। ডাক্তারবাবু খুব সৌজন্য সহকারে আমার করমর্দন করে বিদায় জানান। হঠাৎ আমার মনে প্রবল বাসনা জাগে,—ডাক্তারবাবুকে কিছু oblige করি। তাঁকে মৃদুস্বরে বলি, ডাক্তারবাবু, আপনার আদর-যত্ন অনেকদিন মনে থাকবে। যদি অনুমতি দেন, আপনাকে এক বোতল বিয়ার-এর দাম উপহার দিই।

ডাক্তারবাবু নিস্পৃহভাবে বলেন, "না,—না,—আমাকে নয়—আমাকে নয়। যা দেবার ঐ মার কাছে রেখে দিন,—মা-ই আমার সব, সবই তাঁর।"

মূর্তির সামনে টাকাটা রেখে নমস্কার করে চলে আসি।

আজ লাহোর-প্রবাসী সেই বিচিত্র-চরিত্র 'মা-খাই'-এর কাহিনী মনে পড়ে যায়।

॥ ৩ ॥

পরের দিন সকালে রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছুই। এখানে নামার কারণ, তক্ষশিলার ট্রেন ধরতে হবে। ঘণ্টা চারেক হাতে সময় আছে। স্টেশনের অল্পদূরে কালীবাড়ি। কালিবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী সেইখানে চলি।

এখানকার পোর্টারদের মাল বইবার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হই। এ কয়দিন আমাদের তিনজনের বেডিং-ব্যাগ ইত্যাদি বইতে দুজন পোর্টার হিমশিম খাচ্ছিল। এখানে একজনই স্বেচ্ছায় ও অনায়াসে সব মাল নিয়ে চলে,—মাথায়, কাঁধে, পিঠে, দুই বগলের তলায়,—আবার হাতে ঝুলিয়েও—কেমন গুছিয়ে নিয়ে। দেখায় যেন চলন্ত মালগাড়ি। রূপকথার দৈত্যের মত বিশাল দেহ। কলকাতার নিউ মার্কেটের সেই সব মেওয়া ও ফলের স্টলের পেশোয়ারী দোকানদারের জাতভাই, দেখেই বোঝা যায়।

স্টেশনের বাইরে আসতেই এক ট্যাক্সিঅলা ধরে। ভাবে, কাশ্মীর-যাত্রী। দূরে দেখা যায়, হিমালয়-শৈলশ্রেণী। মন যেন টানতে থাকে। কৌতূহলী হয়ে শ্রীনগরের ভাড়া জিজ্ঞাসা করি।—মাথাপিছু দশ টাকা। কথা না বলে এগিয়ে যাই। সে সঙ্গ ছাড়ে না। মনে করে, খদ্দের ফসকায়। বলে, পুরো ট্যাক্সি ত্রিশ টাকায় দেব।—শুনে লোভ জাগে আমাদের। মুখ-চাওয়াচাওয়ি করি। সবারই ইচ্ছা, থাকুক পেশোয়ার। ভূস্বর্গ দেখে আসা যাক। এত সস্তায় মোটর!

কিন্তু, সঙ্গীদের লাহোর থেকে কলকাতায় ফেরবার দিন নির্দিষ্ট হয়ে আছে, ট্রেনের বার্থ রিজারভেশনও হয়েছে। তিনদিনে কাশ্মীর—শুধু নামেই ঘুরে আসা হবে। তাই লোভ সংবরণ করতে হয়। কালীবাড়ির দিকে এগিয়ে চলি।

সেই কাশ্মীর ভ্রমণ আমার ভাগ্যে ফলে আরও আট বছর পরে,—এই রাওয়ালপিণ্ডি থেকেই।

কালীবাড়িতে প্রবেশ করি। একতলা বাড়ি। লম্বা দালানের একপাশে মন্দির ঘর। জুতো খুলে সামনে দাঁড়াই। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি। সেকালে তখন চালু ছিল রূপার টাকা,—কাগজের নয়। তাই একটা বার করে প্রণামী দিই। পূজারী এসে দাঁড়ান। টাকাটা তুলে রাখেন। ভাবি, মায়ের সেবক বোধ হয় তুষ্ট হলেন। প্রসাদ পেয়ে যাবার সময় আরও সন্তুষ্ট করা যাবে।

পূজারী দালানের অপর দিকে একটা ঘর খুলে দেন। তাঁকে জানাই, বেলা এগারোটায় ট্যাক্‌শিলার ট্রেন ধরব,—এখনও তিন ঘণ্টার ওপর দেরি—এর মধ্যে কোথায় আহারের কিছু ব্যবস্থা হতে পারে, বলুন তো? এখন তো আটটাও বাজেনি। তিনি শুনে ঘাড় নেড়ে বলেন, আরে মশাই! বাঙ্‌লাদেশ ছেড়ে পশ্চিমের এ কোন্ মুলুকে এসেছেন জানেন? সে-কথা বলবেন না,—এখানে দিনে দুবার আটটা বাজে, মশাই! এ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল নয়,—খাস পশ্চিম প্রান্ত। একেবারে উল্টো দিক। কোথাও কোন ব্যবস্থা পাবেন না। পেশোয়ারী সরাইখানা বলে যা আছে, সেখানে কি আর আপনাদের চলবে? তবে নিজেরাই যদি করে নিতে পারেন, এই দালানের কোণায় রেঁধে নিন। উনুন পাতার ভাবনা কী? বাগানে ঐ কত বড় পাথর পড়ে,—গোটা তিনেক তুলে এনে সাজিয়ে ফেলুন। কত সুবিধে বলুন তো!

বলি, তা ঠিক। রান্নার দুটো পাত্র—

তিনি অমায়িক হাসি হেসে বলেন, পাবেন বইকি, মশাই, পাবেন। বাজারে মাটির হাঁড়ি পাবেন, চাল, ডাল, সব্‌জিও মিলবে, কোন কিছুর অভাব হবে না,—মায়ের বাড়িতে এসেছেন, ভাবনা কিসের?

বলি, তা তো বটেই। তবে বাজারটা কোন্ দিকে। দূরে নাকি?

বছর সাত-আটেকের শ্যামবর্ণ নাদুসনুদুস একটি বালক ইতিমধ্যে পূজারীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একমনে আমাদের কথাগুলা গিলছিল। উৎসুক হয়ে সে-ই বলে, বাবা, সঙ্গে গিয়ে দেখিয়ে দেব—বাজার কোথায়? চলুন না, এই তো এইখানে।

তাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দুই বন্ধু তখনই বেরিয়ে পড়ি। বন্ধুর বাবাকে বলি, আপনি একটু বিশ্রাম করুন, মুখ হাত পা ধুয়ে নিন।

বড় রাস্তা ধরে বাজারের দিকে চলি। ছেলেটি সরল। বালকসুলভ কৌতূহলও আছে। নিজে থেকেই অনর্গল কথা বলে, প্রশ্ন করে। ভাষা,—বাংলা। কিন্তু হিন্দী, উর্দু মেশানো। কথায় অদ্ভুত টানও। কলকাতা কখনও দেখেনি। বলে, দেখব কি করে? এইখানেই তো জন্মেছি! আর কি কোথাও গিয়েছি?

নিজেদের সংসারের খবর দেয়, মা রয়েছেন, দিদি আছে। দিদি সারাক্ষণই শুয়ে শুয়ে বই পড়ে। কোন কাজ করতে চায় না। মা বকেন। ঝগড়া হয়। আর মা খাটছেন দিনরাত। মায়ের সঙ্গে বাবারও কেবলই বকাবকি চলে। কেন জানেন?—বলে বড় বড় চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকায়। একগাল হেসে বলে, দিদির বিয়ের কথা নিয়ে!—সে যদি শোনেন ভারী মজা!—ঐ তো বাজার চলে এলাম। কত নজদিগ্ দেখলেন?

চাল ডাল আলু কপি মটরশুঁটি, হাঁড়ি, কাঠ, মশলাদি কিনে ফেরা হয়। তখনও এসব কাজে তেমন হাত পাকেনি। তবুও নিজেদের হাতে রান্না খিচুড়ি ক্ষুধার্ত মুখে সুস্বাদু লাগে। খাবার সময় পূজারীর ছেলে একটা পাত্রে লঙ্কার আচার এনে সামনে রাখে। বলে, ভেতর থেকে মা পাঠিয়ে দিলেন—খিচুড়ির সঙ্গে খাবেন বলে।

খেতে প্রকৃতই মুখরোচক লাগে। বন্ধু চুপিচুপি বলে, হ্যাঁরে, আড়াল থেকে তাহলে দেখছিলেন নাকি?

যাবার আগে মন্দিরে আবার প্রণাম করে যাই। এবার আর টাকার প্রণামী নয়। নিছক ভক্তিভরে মায়ের কাছে বিদায় নেওয়া।

পূজারী সদর রাস্তা পর্যন্ত এসে এগিয়ে দেন। করুণামিশ্রিত উদ্বেগ দেখিয়ে বলেন, তাই তো মশাই, আপনারা আবার পেশোয়ার চলেছেন! সেখানেও কালীবাড়িতেই উঠবেন নিশ্চয়? থাকবেনও তো দু-তিন দিন? একটু সাবধান করে দিই,—আমার ভাগ্‌নে হল সেখানকার পূজারী। সে আবার কীরকম অসভ্য রকমের! বৌমাও বদরাগী। সে কি আপনাদের তেমন যত্ন নেবে?—এক কাজ করবেন বরং, ওখানে নেত্যবাবু থাকেন, আমার নাম করে তাঁর কাছে যাবেন, তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। এই দূর বিদেশে আপনারা আমাদের আপন দেশের লোক মশাই, এখানে তো এসেই চলে গেলেন, রইলেনই না!

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিই। স্টেশনের পথে যেতে যেতে হাসাহাসি করি। বন্ধুর বাবা বলেন, মামা দেখা গেল, এবার চল ভাগ্‌নে দেখা যাক্!

ট্যাক্শিলা রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মাত্র মাইল কুড়ি দূর। রেলওয়ে টাইম টেবিলে ছোট হরফে ছাপা নাম। ছোট স্টেশন বলেই। দ্রুতগামী ট্রেন ধরে রাখার তার মর্যাদা নেই। সেই কারণেই আমাদের রাওয়ালপিণ্ডিতে নামা। ট্রেন বদল করা। মন্থরগতি ট্রেন ধরা। কুড়ি মাইল পথ যেতে দু'ঘণ্টা নেয়। জানলার ধারে বসে দেখতে থাকি। দুপুরবেলা। বাইরে কার্তিক মাসের নতুন-পড়া শীতের দিনের রূপালি রোদ। দূরে আকাশের গায়ে হিমালয়ের সুদীর্ঘ নীলাভ ছায়া। নিকটে ছোটখাটো পাহাড়, টিলা। জনপ্রাণীহীন প্রান্তর। হঠাৎ দু-একটা গ্রাম। রেলের গতির তালে মনও ছুটে চলে। হারিয়ে যায় চোখের-দেখা দৃশ্য। স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে সুন্দর অতীত।

ভাবি, চলেছি ট্যাক্শিলায়। এ তো বিদেশী গ্রীক ও রোমানদের মুখে উচ্চারিত প্রাচীন ভারতীয় নাম তক্ষশিলার বিকৃতি। আজ নিষ্প্রাণ নগণ্য এক ক্ষুদ্র রেল স্টেশন। চারিদিকে ধু-ধু করে যেন শ্মশানভূমি। মাটি খুঁড়ে বার করা ধ্বংসস্তূপ। অথচ বহুশতাব্দী ধরে এইখানেই ছিল প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিখ্যাত নগর তক্ষশিলা। আড়াই হাজার বছর পূর্বে গান্ধার রাজ্যের রাজধানী। গান্ধার! নামের মধ্যেই কত স্মৃতিভরা সৌরভ। ঋগ্বেদে, অথর্ববেদে—ভারতীয় প্রাচীন বহু গ্রন্থে এই নামের উল্লেখ। রামায়ণের মতে, ভরত এই নগর স্থাপনা করে পুত্র তক্ষকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। সেই তক্ষের নামানুসারে নামকরণ হয় তক্ষশিলা। কালিদাসও রঘুবংশের পঞ্চদশ সর্গে এই ঘটনার বর্ণনা দেন : 'স তক্ষপুষ্কলৌ পুত্রৌ রাজধান্যোস্তদাখ্যয়োঃ। অভিষিচ্যাভিষেকার্হৌ রামান্তিকমগাৎ পুনঃ॥ (৮৯)

আবার কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত, তক্ষণ-শিল্পের এখানে উৎকর্ষ সাধিত হয় বলে তক্ষশিলা নাম।

মহাভারতে দেখা যায়, ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী ছিলেন এই গান্ধারেরই রাজকন্যা। অর্জুনের প্রপৌত্র দিগ্বিজয়ী নরপতি জনমেজয় গান্ধার অন্তর্ভুক্ত তক্ষশিলা জয় করেন। জনমেজয়ের সর্পমেধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান এইখানেই।

আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেই গান্ধারের অন্তর্গত সালাতুরে পাণিনির জন্ম।

বৌদ্ধ জাতকের বহু কাহিনীতেও প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে তক্ষশিলার খ্যাতি। দূরদূরান্ত থেকে রাজন্যবর্গের ও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানগণ এই নগরে আসতেন গুরুগৃহে বা বৌদ্ধমঠে বাস করে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ নিতে।

আর আজ আমি চলি ট্রেনে চেপে সেই নগরের নব-আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষের কঙ্কাল দেখতে!

ভাবি, শুধু কি শিক্ষাকেন্দ্র? ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক বিপর্যয়বহুল অধ্যায়ও রচিত হয় এই প্রদেশে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধে গান্ধার পারস্যের অ্যাকামিনীয় সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হয়। তৃতীয় দরেইওস্ (Darius)-এর (খ্রিঃ পূঃ ৩৩৫-৩৩০ অব্দ) রাজ্যকালে গান্ধার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হলে তক্ষশিলাও একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। খ্রিঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে দেখা যায়, তক্ষশিলার রাজা অম্ভি আলেকসান্দরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কূট রাজনীতিবিশারদ চাণক্য,—এই তক্ষশিলারই অধিবাসী; মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের তিনিই ছিলেন পরামর্শদাতা। তাঁর মন্ত্রণা ও স্বীয় বাহুবলের প্রভাবে চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ থেকে গ্রীক শাসকদের বিদূরিত করেন। তক্ষশিলা তাঁর রাজপ্রতিভূর প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়।

ভারতের মানচিত্রে তক্ষশিলার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের বহুযুগের যোগসূত্র। তারই মুখ্য বাণিজ্য-পথগুলির সংগমস্থলে তক্ষশিলার অধিষ্ঠান। সেই কারণে এর সমৃদ্ধি। সেই কারণেই বিপত্তিও। এই বিখ্যাত নগরকে বহুবার বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরই বহ্লীক দেশ থেকে আসে ইন্দোগ্রীকরা।

তারপর, কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণস্থ ভূভাগ থেকে পহ্লব,—পার্থিয়ানরা।

অবশেষে, মধ্য এশিয়া থেকে প্রথমে শক ও পরে কুষাণগণ।

একের পর আরেক বিদেশী রাজশক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, উত্তর-পশ্চিমে রাজ্য স্থাপনা করে।

সেই সকল ইন্দো-গ্রীক, শক পহ্লব রাজ্যের রাজধানী ছিল এই তক্ষশিলাতে। কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজ্যকালে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় পুরুষপুরে—বর্তমান পেশোয়ারে। তবুও, খ্রিস্টীয় চতুর্থ দশক

পর্যন্ত তক্ষশিলার গৌরব ও সমৃদ্ধি অম্লান থাকে। বিশিষ্ট বৌদ্ধকেন্দ্র রূপে তখনও তার বিপুল খ্যাতি। খ্রিস্টাব্দ পঞ্চম শতকের শেষভাগে বৌদ্ধবিদ্বেষী হুনদের আক্রমণ তক্ষশিলা ধ্বংস করে। সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন্-সাঙ্ এসে দেখেন, এই অঞ্চল তখন কাশ্মীর-রাজ্যভুক্ত, বৌদ্ধমঠ আদি অধিকাংশই ভগ্নস্তূপে পরিণত ও পরিত্যক্তপ্রায়। অধিবাসীদের মধ্যেও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বিরল।

এইভাবেই কালক্রমে প্রাচীন তক্ষশিলার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে,—বিগত যুগের কীর্তিকলাপ ভূগর্ভে বিলীন হয়।

সুদীর্ঘকাল পরে—প্রায় একশ' বছর আগে—ইংরেজ রাজত্বকালে শহ্‌ডেরির নিকটস্থ ঢিবিগুলিকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম সাহেব সেই লুপ্ত তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ বলে প্রথম প্রতিপন্ন করেন। ১৯১৩ সালে এইসব অঞ্চলে খননকার্যও শুরু হয়। আবরণমুক্ত তক্ষশিলার নাম জগতে আবার প্রচার পায়—প্রাণচঞ্চল-সমৃদ্ধ শহর নয়, প্রত্নতত্ত্বের রত্নভাণ্ডার রূপে।

হাজার হাজার বছরের ইতিহাস মানসরথে বসে দেড়ঘণ্টায় অতিক্রম করে চলে আসি আধুনিককালের ট্যাক্‌শিলায়।

স্টেশন ছেড়ে খননকার্যাদির স্থানের দিকে এগিয়ে চলি। ভাবাই যায় না, এইখানেই এককালে ছিল প্রাচীন সেই বিখ্যাত নগর। এখন জনহীন প্রাণশূন্য বিরস পরিবেশ। বালি, কাঁকর, শিলাস্তূপে আচ্ছন্ন চারিপাশ। সেদিনকার ইতিহাসের বহুল ভগ্নাংশ এখনও প্রচ্ছন্ন মরুবালুকার মধ্যে।

প্রথমে যাই মিউজিয়ামে—সংগ্রহালয়ে। বাঙালী কিউরেটর। শ্রীমণীন্দ্র সেনগুপ্ত। উৎসাহ সহকারে দেখান। বলেন, বিরাট ব্যাপার, এই তো সবে কাজ শুরু। এ মিউজিয়ামও হালে খোলা। সেই সম্রাট অশোকের সময় থেকে শুরু করে হূণদের আক্রমণ পর্যন্ত সাতশ' বছরেরও ওপর এই তক্ষশিলা ছিল ভারতের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকেন্দ্র। এখন মাটি খুঁড়তে গিয়ে কত বৌদ্ধস্তূপ, ঘরবাড়ি, মঠ-মন্দির, প্রাসাদ ইত্যাদির ভগ্নাংশ আবিষ্কার হচ্ছে। অসংখ্য ও বহু ধরনের প্রত্নরত্নাদিরও উদ্ধার চলেছে। তারই কিছু কিছু মূর্তি, মুদ্রা ইত্যাদি এখানে এনে সাজিয়ে রাখার কাজ আরম্ভ করা গেছে। এখনও বাইরে বহু জিনিস পড়ে আছে, নিত্য বারও হচ্ছে,—সেখানে দেখতে পাবেন।

ঘুরে ঘুরে দেখান,—গান্ধার ভাস্কর্যের প্রচুর নিদর্শন। প্রথম আমলের মূর্তিগুলিতে হেলেনিস্টিক কলাশৈলীর নিবিড় প্রভাব। বুঝিয়ে বলেন, এখানে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় রাজাদের রাজধানী থাকায় শিল্পকলায় তাদের স্বকীয় অবদানও যেমন দেখা যায়, ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে আমাদের নিজস্ব ভারতীয় প্রভাবও মূর্তিগুলিতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্থাপত্যের মধ্যেও এই প্রভাব লক্ষ্য করবেন।

খননকার্যের কোথায় কি দর্শনীয় স্থান বলতে গিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন, আপনাদের সঙ্গে একজন ভাল গাইড দিচ্ছি, নিজেই সঙ্গে গিয়ে দেখাতে পারলে আনন্দ পেতাম, কিন্তু আজ মহা বিব্রত হয়ে রয়েছি। বাচ্চা ছেলেটির হঠাৎ প্রবল জ্বল—ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা তো এখানে নেই,—এখনই বাংলোয় আমাকে একবার যেতেই হবে,—জ্বর না কমলে কি করব ভেবেই পাচ্ছি না,—মহা মুশকিলে পড়া গেছে।

সহানুভূতি জানিয়ে আমাদের চলে আসা ছাড়া করার কিছু থাকে না। ভাবি, কালের কি বিচিত্র গতি! এই তক্ষশিলাতেই এককালে ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রশিক্ষণেরও শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। রাজগীরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক এই কেন্দ্রেই চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন,—আর এখন?

ভগ্নস্তূপের চারিপাশে ঘুরে ঘুরে দেখি, মাটি খুঁড়ে প্রাচীন শহরের ভাঙা ঘরবাড়ির দেওয়াল, ভিত ইত্যাদি বার হয়েছে। সেকালের পয়ঃপ্রণালী, নগরের পথ, ঘরবাড়ির পরিপাটি নক্‌শা স্থাপনার সুচিন্তিত পরিকল্পনা,—অনেক কিছুই তৎকালীন সভ্যতার উচ্চমানের পরিচয় দেয়। বিভিন্ন সময়ে নির্মাণ-করা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নগরের ধ্বংসাবশেষ আত্মপ্রকাশ করেছে। সবচেয়ে প্রাচীন ভির্-এ, দ্বিতীয় শিরকাপ-এ, তৃতীয় শিরসুখ-এ। এ ছাড়াও ভগ্নস্তূপ ছড়ানো বহু স্থানেই। করিন্থীয় গাত্রস্তম্ভ, গ্রীক আদর্শানুগ মোল্ডিং ও অলংকরণ পাশ্চাত্য কলাশৈলীর বহু উদাহরণ চোখে পড়ে।

তক্ষশিলার মুখ্য স্তূপ ধর্মরাজিকা। তারই চারিদিক ঘিরে ছোট ছোট স্তূপ, সঙ্ঘারাম ইত্যাদি। কোথাও সারি সারি বুদ্ধমূর্তি বা বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী খোদিত।

হঠাৎ নজরে পড়ে, ধ্বংসস্তূপের মাঝে বুদ্ধদেবের ভেঙে-পড়া মূর্তির একটা ছিন্ন মস্তক। স্তব্ধ হয়ে

তাকিয়ে দেখি, সেই কোন্ যুগে শিল্পীর হাতের ছেনির আঘাতে পাথরের বুকে ফুটে উঠেছিল ধ্যানরত বুদ্ধের শান্ত সুন্দর ভাবের অপূর্ব অভিব্যক্তি,—সৌম্যদর্শন, প্রশান্তআনন, আয়ত লোচন। সম্রাট-স্থাপিত নগর ধ্বংস পেয়েছে, মূর্তিও ধরাশায়ী,—কিন্তু দেহচ্যুত মুখমণ্ডলে এখনও সেই প্রশান্ত দিব্যভাব। চারিদিকের ভগ্নস্তূপের শ্মশানে নির্বিকার, নিরাসক্ত, আপন মহিমায় অপূর্ব মনোহর,—শিল্পীর অক্ষয় কীর্তি।

গাইড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে চলে। জৌলিয়া গ্রামের পাহাড়ের উপর বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ভগ্নাংশ, ইন্দোগ্রীকদের প্রতিষ্ঠিত সিরকাপের ধ্বংসাবশেষ। তারই দক্ষিণ অংশে কুণালের স্তূপ।

কুণাল ছিলেন মহারাজ অশোকের পুত্র। রাণী পদ্মাবতীব গর্ভে তাঁর জন্ম। হিউ-এন্-সাঙ্ এই স্তূপ দেখে রাজপুত্র কুণালের অপাপবিদ্ধ করুণ জীবন-কাহিনীর উল্লেখ করেন। বিদ্বান, রূপবান্, সচ্চরিত্র কুণালের বিবাহ হয় সুন্দরী কাঞ্চনমালার সঙ্গে। কিন্তু রাজপুত্রের দুর্ভাগ্য,—তাঁর বিমাতা প্রধান রাজমহিষী তিষ্যরক্ষিতার কামবাসনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হওয়ায় তাঁরই চক্রান্তে রাজাজ্ঞায় কুণালকে এই তক্ষশিলায় পাঠানো হয়—বিদ্রোহদমনের অজুহাতে। বিদ্রোহী প্রজারা তাঁর রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। কুণাল এই তক্ষশিলার রাজ্যপাল হন। ব্যর্থমনোরথ, নিষ্ঠুর তিষ্যরক্ষিতা তখন চতুরতা করে এক সুযোগে সম্রাটের নামাঙ্কিত আদেশ পাঠান, অবিলম্বে যেন কুণালের দুই চক্ষু উৎপাটন করে তক্ষশিলা থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয়। পিতৃ-আজ্ঞা ভেবে কুণাল তখনই চণ্ডালকে ডেকে পাঠান, আপন দুই চক্ষু তুলে ফেলান, দীনহীন বেশে স্ত্রী কাঞ্চনমালার হাত ধরে পথে বার হন। অন্ধ রাজপুত্র বীণা বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে চলেন—দেশ থেকে দেশান্তরে। পাটলীপুত্রে এলে রাজা অশোক তাঁদের দেখতে পান। প্রাসাদে ডেকে পাঠান। সমস্ত ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হন। তিষ্যরক্ষিতার প্রাণবধের আদেশ দেন। কুণাল পিতাকে মৈত্রীভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেন। এক অর্হৎ-এর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তাঁর হৃত-দৃষ্টি ফিরে পান।

সেই ঘটনারই স্মারক তক্ষশিলায় এই কুণাল-স্তূপ।

হিউ-এন্-সাঙ্ খ্রিস্টাব্দ সপ্তম শতকেও লিখে যান, এই স্তূপের সান্নিধ্যে একাগ্রচিত্তে আরাধনার ফলে অনেক অন্ধজনই পুনর্দৃষ্টি প্রাপ্ত হন।

সেই কুণাল-স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকি, কী বিচিত্র কুণালের এই জীবনী!

মনে পড়ে, অংশত অনুরূপ প্রাচীন গ্রীক উপকথার Hippolytus ও phoedra-র কাহিনী। সেখানেও বিমাতা Phoedra-র প্রেমনিবেদন প্রত্যাখ্যান করেন তাঁর সপত্নীপুত্র সংযতচরিত্র হিপোলাইটাস্।

ব্যর্থকাম Phoedra হিপোলাইটাসের নামে মিথ্যা কলঙ্কের দোষারোপ করে আত্মহত্যা করেন। সম্রাট Theseus নির্দোষ আপন সন্তানের প্রাণবধ করেন।

সেই কাহিনীরই ছায়া অবলম্বনে রচিত Euripides-এর প্রসিদ্ধ নাটক Hippolytus,—সেই কোন্ অতীত কালে,—খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে! আর, কুণালের ঘটনা,—খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে!

ভাবি, অত্যাশ্চর্য মানুষের মনের বিকার,—জগতের সর্বত্রই,—স্থান কালের সীমা মানে না।

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি। সিরকাপের অদূরে জণ্ডিয়ালে মাটির ঢিপির উপর অদ্ভুত আকার এক মন্দির। ভারতে এ ধরনের মন্দির আর কোথাও দেখা যায় না। গ্রীসের প্রাচীন মন্দিরের সঙ্গে খানিক সাদৃশ্য আছে। কিউরেটার জানিয়েছিলেন, এ মন্দির জরথুস্ত্রীয় ধর্মের সঙ্গে জড়িত বলে অনুমান করা হয়।

আমাদের এই ভ্রমণের পর ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ও ১৯৪৪-৪৫ সালে সীমিতরূপে—যথাক্রমে জন মার্শাল ও মার্টিমার হুইলারের নেতৃত্বে খননকার্য চলতে থাকে এবং প্রভূত প্রত্নরত্নরাজির উদ্ধার হয়। মার্শালের গ্রন্থে তক্ষশিলার ইতিবৃত্ত বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ হয়।

ঘোরা শেষে স্টেশনে ফেরবার পথে কিউরেটরের ছেলের খবর নিই। জ্বর কমতে শুরু হয়েছে। ভদ্রলোক লজ্জা প্রকাশ করেন, তাঁর বাংলোতে নিয়ে গিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করা তাঁর সম্ভব হল না।

ট্যাক্শিলা স্টেশনের ছোট ওয়েটিং রুম—বিশ্রাম-গৃহ। সেখানেই রাত কাটানোর উদ্দেশ্যে আশ্রয় নেওয়া হয়। সে-সময়ে কলকাতায় শোনা যেত,—পেশোয়ার অতি ভয়াবহ শহর। রাত্রে সেখানে পথে বার হওয়া বিপজ্জনক। যে কোন মুহূর্তে আততায়ীর হাতে প্রাণ যেতে পারে,—লুণ্ঠতরাজ তো আছেই।

তাই এখানে রাত কাটিয়ে সকালের ট্রেন ধরে পেশোয়ার পৌঁছানো যুক্তিযুক্ত।

তখনও প্রচুর বেলা। মাত্র পাঁচটা বেজেছে। এমন সময় প্ল্যাটফর্মে পেশোয়ারগামী এক ট্রেন এসে দাঁড়ায়। শুনি, রাত ন'টায় সেখানে পৌঁছুবে। আমাদের প্রোগ্রামেরও তখনই পরিবর্তন ঘটে। ওয়েটিং রুমে রাত যদি কাটাতেই হয় তবে এখানে কেন? পেশোয়ার নিশ্চয় বড় স্টেশন,—সেখানেই কাটানো যাবে। অমনি মালপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি ট্রেনে চাপা।

॥ ৫ ॥

ট্রেনে ভিড় নেই। কামরায় আর দুজন মাত্র যাত্রী। দেখেই বোঝা যায়, পেশোয়ারী। পরনে সালোয়ার, গায়ে ঝোলা পাঞ্জাবি, ওয়েস্ট কোট, মাথায় বিপুল পাগড়ি।

একপাশের খালি বেঞ্চ আমরা তিনজন অধিকার করি। বেলা এখন সাড়ে পাঁচটা। বলি, কোথা দিয়ে ট্রেন চলেছে, এখনও অনেকক্ষণ দেখা যাবে। ইন্‌ডাস্‌ নদীও তো এইবার পথে পড়বে।

বন্ধুর বাবা হেসে মনে করিয়ে দেন, রাওয়ালপিণ্ডির সেই পুরুতঠাকুরের বাণী,—সে কথা বলবেন না, এখানে দিনে দুবার আটটা বাজে, মশাই!

কিন্তু আটটার আগেই সন্ধ্যার ছায়া নামে। ইন্‌ডাস্‌-এর উপর বিরাট সেতু আসে। ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশদের তৈরি। ইন্‌ডাস্‌-এর ভারতীয় প্রকৃত নাম সিন্ধু। নদীর ধারে আধুনিক রেল স্টেশনের নাম—অ্যাটক ব্রীজ। অ্যাটক সংস্কৃত হাটকের অপভ্রংশ। লৌহসেতু। সশব্দে ট্রেন উঠে চলে। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বিশাল নদী নেমে আসে। আবছা আলোয় বিচিত্র দেখায়। আঁধার ঘেরা পাহাড়গুলি। নদীর স্বচ্ছ চিকণ জলে ক্ষীণ আলোর ঝিকিমিকি। যেন সুদূর অতীত অন্ধকারের অন্তরালে বসে অস্ফুটে নদীর স্রোতে কথা কয়। প্রাচীন আর্য সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধুনদের নাড়ির টান। বহু পণ্ডিতের মতে এককালে এই সিন্ধু নদের তট পর্যন্ত ছিল হিন্দুরাজ্যের বিস্তার,—ভারতের সীমানা। ঋগ্‌বেদ থেকে শুরু করে সব প্রাচীন গ্রন্থে, বৌদ্ধ জৈন ধর্মপুস্তকে সিন্ধু নামের উল্লেখ। সুদূর তিব্বতে কৈলাস পর্বতের উত্তরে এই নদের উৎপত্তি, দীর্ঘ ১৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করে আরব সাগরে বিলুপ্তি।

আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যরাজ প্রথম দরেইওস—Darius-এর কৌতূহল জাগে, এই বিরাট নদ কোথায় গিয়ে সাগরে মেশে? কেমনই বা সে-সব দেশ? তাঁর তখন ধারণা, নীল নদ ছাড়া এই আর একমাত্র নদী যার জলে কুমীরের বাস। Caryanda-বাসী গ্রীক্ Scylax-এর সত্যানুসন্ধানের উপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাই তাঁরই নেতৃত্বে অসমসাহসী এক অভিযাত্রী দল এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। Scylax কাবুল নদের বুকে নৌকা ভাসিয়ে এই অ্যাটক-এ আসেন, তারপর এই সিন্ধু নদীপথে সুদূর সাগর-সঙ্গমে চলে যান। Scylaxই, যতদূর জানা যায়, প্রথম ইউরোপবাসী যিনি ভারতের প্রকৃত অবস্থার পর্যবেক্ষণে এই অঞ্চলে অভিযানে আসেন। অথচ Herodotus-এর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সামান্য এক বাক্যাংশ মাত্র এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একমাত্র ঐতিহাসিক দলিল।

এর প্রায় দুইশত বৎসর পরে আলেকসান্দরও এরই নিকটে কোথায় এই সিন্ধুনদ পার হন,—নৌকার সেতু সাজিয়ে।

আজ দু হাজার দু'শ চুয়ান্ন বছর পরে আমরাও সেই নদী পার হই অনায়াসে আরামে ট্রেনে চেপে!

এই অ্যাটক-এ, নদীর পূর্বতটে, সম্রাট আকবর রচিত দুর্গ। তারই অপরদিকে সিন্ধুনদের সঙ্গে কাবুল নদের সঙ্গম। কাবুলও প্রাচীন নদী,—বৈদিক যুগের কুভা। কোন কোন ঐতিহাসিকদের অভিমত,—এই কুভাই ছিল ভারতের পশ্চিম সীমানা। কুভার জন্ম আফগানিস্তানের উত্তরে। কাবুল শহরের পাশ দিয়ে বয়ে আসে। আফগানিস্তানের সমুচ্চ প্রদেশ থেকে কাবুল ও তার শাখানদীগুলি পূর্বমুখী নেমে আসে, ঐ অঞ্চলে সুলাইমান-সফেদকোহ গিরিশ্রেণী ভেদ করে, ক্রমনিম্নভূমি ভারতে প্রবেশ করে ও এই অ্যাটকের নিকটে সিন্ধুনদের সঙ্গে মিলিত হয়। আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যবর্তী এ সফেদকোহ-র গিরিরাজির পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বিস্তার। কাবুল ও তার শাখানদীগুলিরও তাই সেই পার্বত্য উপত্যকায় গিরিখাত কেটে ভারতবর্ষে নেমে আসা। এবং এ নদীগুলির গতিপথ ধরে খাইবার পাশও সফেদকোহ শৈলশ্রেণী অতিক্রম করে যায়।

সেই খাইবার পাস্‌ দেখার উদ্দেশ্যে আমাদের এই যাত্রা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

দুজন সহযাত্রীর একজন নেমে যান নৌসেরা স্টেশনে। বড় স্টেশন। অপর সহযাত্রীর সঙ্গে এইবার আলাপ করি। এখানে শুনি বড় সেনাবাস আছে। কাবুল নদীর নিকটেই। পেশোয়ার আর মাত্র ২৭ মাইল দূর। পেশোয়ার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিই। বলেন, 'সিটি' স্টেশনে নামবেন না, একেবারে ক্যানটনমেন্ট স্টেশনে গিয়ে নামবেন।

ভদ্রলোকের নাম—মিঃ বিরি। পেশোয়ারে ইলেক্‌ট্রিক মালপত্রের দোকান।

জিজ্ঞাসা করি, স্টেশন থেকে কালীবাড়ি কতদূর? রাত্রিবেলা সেখানে যাওয়া নিরাপদ হবে?

প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক আশ্চর্য হন। বলেন, ভয়টা কীসের? এ-শহর সম্পর্কে যত সব বাজে গল্প বাড়িয়ে প্রচার হয়। দুর্বৃত্ত লোক কোন্ শহরে নেই? এখানেও আছে। আমরা তো পৌঁছচ্ছি রাত নটায়। কোন দুশ্চিন্তা নেই আপনাদের। স্টেশন থেকে কালীবাড়ি দূর নয়। আমিও যাব ঐ পথ দিয়ে। আপনাদের পৌঁছে দিয়ে যাব যাবার পথে।

মন থেকে ভাবনার বোঝা নামে। বন্ধু কিন্তু চাপাগলায় মন্তব্য করে, এই লোকটাই পথ ভুলিয়ে আর কোথাও নিয়ে যাবে না তো? যা অসুরের মত চেহারা!

তার বাবা হেসে ওঠেন। বলেন, তা যায়, যাবে। আজ রাত্তিরেই কালীবাড়ি পৌঁছানো দরকার। চলো গিয়ে দেখি, রাওয়ালপিণ্ডির মামার গুণধর ভাগ্‌নেটি কেমন?

কালীবাড়ি পৌঁছে দেখি, অবাক কাণ্ড! কোথায় পেশোয়ার! কোথায় তার ভয়ঙ্করী নিশীথিনীর রূপকাহিনী! এ যে আলোঝলমল খাঁটি বাঙলাপল্লীর উৎসব-রজনী! বিস্তীর্ণ আঙ্গিনা। একতলা লম্বা বাড়ি। চারিপাশে তীব্র বিজলি বাতির শোভা। ব্যস্তসমস্ত লোকজন। দালানে বড় বড় বঁটি পাতা। স্তূপাকার শাক-সবজি। শাড়িপরা বাঙালী মেয়েরা কুটনা কোটেন। বাইরে সামিয়ানার নীচে বড় বড় উনান। গমগম করে আগুন। প্রকাণ্ড হাঁড়ি কড়া চাপানো। যজ্ঞিবাড়ির ভিয়েনের আয়োজন। মেয়েরাই সব কাজকর্ম করছেন। পুরুষেরা দু-চারজন হন্তদন্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করেন।

সামনে মন্দিরকক্ষে পূজার সাজসরঞ্জাম। নৈবেদ্যাদির ব্যবস্থাতেও ব্যস্ত বাঙালী দুই প্রৌঢ়া। লাল টকটকে-পাড় শাড়ি পরা।

আজ যে কালীপূজা, জানাই ছিল না।

বন্ধুর বাবা হেসে বলেন, তোমাদের হিসেব ছিল না, আমার মনে ছিল।

অপরিচিত অতিথি দেখে একজন এগিয়ে আসেন। সাদর অভ্যর্থনা জানান। কালীবাড়ির পুরুতঠাকুরকে ডাক দেন, অ বিধুবাবু, এদিকে একবার আসুন! কারা সব এসেছেন!

বিধুবাবু হাতের কোন্ কাজ ফেলে ব্যস্ত হয়ে আসেন, আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, আসুন, আসুন,—কোথা থেকে আসা হল? অতি শুভদিনে এলেন—মায়ের পুজো—মা কেমন টেনে আনলেন—এখন বারান্দার ঐ কোণে মালপত্রগুলো রাখান—একটু পরে একটা ঘর খুলে দিচ্ছি—থাকবেন,—কোন কিছু অসুবিধে হবে না—আজ অবশ্য প্রসাদ পেতে একটু রাত হবে—বসুন আপনারা—হাতের কাজটা সেরে এখুনি আসছি—এখনই পেশোয়ারের বাঙালীরা সবাই এসে যাবেন—আলাপ-পরিচয় হবে,—বসুন।

একে একে অনেকেই আসতে থাকেন। কিন্তু সবাই দেখি, কার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করেন।—'কই! ডাক্তারবাবু এলেন না এখনও?'—'আসবেন নিশ্চয়,—কোথায় কাজে আটকে পড়েছেন,'—'ওঁর তো আর দিন-রাত্তির,—সময়-অসময় বলে কিছু নেই,'—'ঐ, ঐ তো এসে গেলেন!'

গলাবন্ধ লম্বা গরম কোট গায়ে। স্বাস্থ্যবান দেহ। প্রৌঢ় বয়স। রাশভারী চেহারা। সম্মান দেখিয়ে কেউ কেউ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ান। 'ব্যবস্থাদি কতদূর'—'পূজা বসবে কখন'—এক ঝলকে আগন্তুক সব খোঁজ নেন। এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে জাঁকিয়ে বসেন। তাঁকে ঘিরে মজলিস জমে ওঠে। নবাগত আমাদের সঙ্গেও আলাপ করেন। তাঁকে এই প্রথম দেখলেও তাঁর পরিচয় আমাদের অজানা নয়।

সেকালের পেশোয়ারের স্বনামধন্য ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ। ডাক্তার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তো আছেই, কিন্তু বাঙলা দেশেও তাঁর নামের প্রচার থাকার কারণ, সেযুগের তিনি এক প্রখ্যাত স্বদেশী নেতা, জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট সভ্য, পেশোয়ার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

বন্ধুর বাবার সঙ্গে ডাক্তার ঘোষের এক ভাই-এর পরিচয় থাকার কথাও প্রকাশ পায়।

খাইবার পাস্ দেখতে আসা আমাদের উদ্দেশ্য শুনে তিনি বলেন, সে তো যাবেনই। এদিকে যাঁরা বেড়াতে আসেন, সবাই যান ওদিকটা দেখতে। দেশের বাইরের রূপটা দেখেন,—এখানকার অধিবাসী—আফ্রিদি—তাদেরও দূর থেকে দেখে যান। কিন্তু খাস আফ্রিদিদের গ্রাম দেখবার সুযোগ পান কজন? চলুন, আপনাদের দেখিয়ে আনি,—ধারণাও করতে পারবেন না, লোকগুলোই বা কেমন, তাদের গ্রামই বা কীরকম! কিন্তু যেতে হলে কালই যেতে হয়। তারপর পরশু সকালের ট্রেনে খাইবার যাবেন,—লাণ্ডিকোটালে তো আর রাত কাটাতে পারবেন না,—ঐ ট্রেনেই আবার পেশোয়ারে ফিরবেন বিকেল পাঁচটায়,—আপনাদের লাহোরের ট্রেন ছাড়ে ছ'টা চল্লিশে।

উৎসাহিত হয়ে বলি, সে যা হবার হবে পরশু,—চলুন কাল আফ্রিদি গ্রাম দেখিয়ে দিন। এ-সুযোগ জীবনে আর আসবে না,—আর আপনি না নিয়ে গেলে আর কারও দেখানোরও সাধ্য নেই।

নিকটের এক চেয়ার ছেড়ে এক তরুণ ভদ্রলোকও প্রবল উৎসাহে এগিয়ে এসে বলেন, ডাক্তারবাবু, তাহলে আমিই বা বাদ পড়ি কেন? এতদিন কাটালাম এখানে, তবু আমার ভাগ্যে এমন সুযোগ আসেনি।

তাঁকে দেখিয়ে ডাক্তারবাবু আমাদের বলেন, এটি সহজ লোক নয়,—বাঙালী ছেলে—কার্নিভ্যাল পার্টি গড়ে দেশবিদেশে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে,—এই পেশোয়ারে কিছুকাল দেখালো,—নাম করেছে খুব—ভিক্টোরিয়া কার্নিভ্যাল।—তা সেন, তুমি তো তাঁবুটাবু গুটিয়ে এখন আবার কোন্ দিকে পাড়ি দিচ্ছ শুনেছি?

সেন বলেন, হাঁ স্যার,—এবার দলবল নিয়ে করাচী চলেছি। তবু যত কাজই আমার থাকুক, আপনাদের কালকের প্রোগ্রামে আমি আছি,—আমার স্পোর্টস্ কার্‌টা নিয়ে আপনার গাড়ির পিছু পিছু চলব,—রিয়ার গার্ড হয়ে।

ডাক্তার বলেন, ঠিক আছে। বেলা একটায় রওনা হওয়া।

তারপর আমাদের বলেন, গ্রাম দেখে ফিরে এসে কাল রাত্রের খাওয়াটা আমার ওখানেই হবে—পেশোয়ারী রোটি!

নানান গল্পে সময় কেটে যায়।

রাত্রে প্রসাদ পেতে দেরি হয়। কালীপূজা,—হবার কথাই। লম্বা দালানে পাতা পেতে পঙ্‌ক্তি ভোজন। মেয়েরাই পরিবেশন করেন। পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজনপর্ব সমাপ্ত হয়।

সুখনিদ্রায় রাতও কাটে।

॥ ৬ ॥

পরদিন। সকালে পূজারীর অন্দরমহল থেকে চা ও প্রাতরাশ আসে। বন্ধুর বাবা বলেন, ভাগ্নে ভাগ্নেবৌ অতি সজ্জনই তো দেখা যাচ্ছে!

একটা টাঙ্গা নিয়ে পেশোয়ার দেখতে বের হই। এই ছিল কণিষ্কের প্রতিষ্ঠিত গান্ধারের রাজধানী—পুরুষপুর। পেশোয়ার—অর্থাৎ 'সীমান্ত শহর' নামকরণ হয় আকবরের আমলে।

পাঁচিল-ঘেরা শহরের বাইরে ক্যান্টনমেন্ট—সেনানিবেশ। ইংরেজ সরকারের স্থাপিত শহরের নতুন অংশ,—সরকারী দপ্তর, ঘরবাড়ি। পরিচ্ছন্ন পথঘাট। পুরানো শহরের বাইরে সাহ্‌জি-কী-ধেরীতে এক বিরাট বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ। পেশোয়ার দুর্গও বাইরে থেকে দেখি।

তারপর ঢুকি খাস পেশোয়ার শহরের ভিতর। সেও এক দুর্গ। বিরাট পাঁচিল দিয়ে চারিপাশ ঘেরা। শুনি, কুড়িটা গেট আছে শহরে ঢোকবার। রাত্রে এ-সব গেট বন্ধ থাকে। তখন আর কারও শহরে ঢোকা বা বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। শহর শুধু পাঁচিল-ঘেরাই নয়,—কাঁটাতার—barbed wire দিয়েও সুরক্ষিত। ঘরবাড়ি ছোট ছোট ইট বা কাদার গাঁথনি ও কাঠের ফ্রেম দিয়ে তৈরি। পথ বেশির ভাগই সঙ্কীর্ণ।

বাঙালীর চোখে পাহাড়ে-ঘেরা এ এক আজব শহর। মনে হয় ছবিতে দেখা মধ্য-এশিয়ার কোন্ এক নগরে ঘুরি। সমতল ছাদ-দেওয়া শ্রীহীন চ্যাপটা বাড়িগুলি। মাঝে মাঝে মসজিদ আদির স্থূল কলেবর, গম্বুজের সুগোল মাথা তুলে যেন উবু হয়ে বসে। পাথরের উঁচু মিনারগুলি তাদের ঊর্ধ্ববাহু,—

আকাশপানে আঙুল তুলে কি যেন দেখায়।

বাজারে লোকজনের ভিড়। বিচিত্র সব পোশাক। সবই প্রায় মুসলমান। বড় বড় পাজামা। ঢলঢলে পাঞ্জাবি। মাথায় সবারই বিপুল পাগড়ি বা পেশোয়ারী জমকালো টুপি। কাবুল-বোখারা-মধ্য এশিয়ার সঙ্গে এদের নিয়মিত বাণিজ্য চলে,—তাই সেসব বিদেশী লোকজনও দেখি।

বাজারে নেমে এখানকার স্মারক স্বরূপ সামান্য সওদা করা হয়,—পেশোয়ারী শুঁড়তোলা লপেটা-জুতা। পেশোয়ারী টুপি। দুটো সালোয়ারের কাপড় কিনে সেলাই করার অর্ডার দেওয়া হয়,—বিকেলে দেবে। পেটের ঘেরের মাপ অদ্ভুত,—প্রায় হাত পাঁচ-ছয় লম্বা। তাই গুটিয়ে পরলে দু-পায়ের ওপর বেলুনের মত ফুলে থাকে। কাবুলীদের মতন। তবু, কত সস্তা ছিল সেকালে,—অতখানি কাপড়—দুটো সালোয়ারের ভাল লঙক্লথ—দাম পড়ল মাত্র পাঁচ টাকা!

শহরের মধ্যে উঁচু ঘন্টিঘর। তারই নিকট ডাঃ ঘোষের আস্তানা। গিয়ে একবার দেখা করে যাই। রোগী দেখতে ব্যস্ত। রাস্তায় বেরিয়ে টাঙ্গায় উঠব,—পুলিস সি.আই.ডি.-র আবির্ভাব। নামধাম, কোথা থেকে আসছি—কোথায় যাব—সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

দুপুরে ভাগ্নে-বৌ ঝোলভাত রেঁধে সযত্নে খাওয়ান। অন্তরাল থেকে খোঁজখবর নেন।

বেলা একটায় ডাক্তারবাবু আসেন তাঁর মোটর নিয়ে। সেনও পিছু পিছু তাঁর নিজের গাড়িতে হাজির। তখনই যাত্রা শুরুও হয়। পেশোয়ার ছেড়ে গাড়ি ছুটে চলে। মনে অসীম কৌতূহল। পরাধীন ভারতের উপান্তে স্বাধীন আফ্রিদিদের গ্রাম দেখতে চলেছি। এমন অপূর্ব সুযোগ এমনি আকস্মিকভাবে আসবে ভাবতেই পারিনি।

প্রশস্ত বাঁধানো রাজপথ। দু পাশে ধু-ধু করে শুষ্ক বালু-কাঁকরময় দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তর। যেন মরুপ্রদেশ। তারই বুকে মাঝে মাঝে পাহাড়।

ডাক্তার ঘোষ বলেন, এটা কোহাটের সড়ক। কোহাট পেশোয়ার থেকে ৩৭ মাইল। বহুদূরে ঐ যে রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে, ওরই মাথায় কোহাট পাশ—২৮০ ফুট উঁচু, তাই পার হয়ে যেতে হয়। আমাদের গন্তব্য গ্রাম পাহাড়ের এদিকে,—পেশোয়ার থেকে মাইল ২৪ দূরে। একটু নজর রাখুন—এখনই পথের দু পাশে দেখবেন শুরু হবে কাঁটাতারের বেড়া—barded wire—

বন্ধু উৎসাহিত হয়ে বলে, ঐ দূরে পথের ধারে একটা নোটিশ বোর্ড যেন দেখা যাচ্ছে—

গাড়ি হু-হু করে এগিয়ে যায়। ডাক্তারবাবু ড্রাইভারকে গাড়ি একটু থামাতে আদেশ করে আমাদের বলেন, এইবার পড়ে দেখুন—বোর্ডে কি লেখা,—আর কোথায় এলেন। ঐ আরম্ভ হল কাঁটাতার।

বোর্ডে বড় বড় করে লেখা বিজ্ঞপ্তি,—এইখানে শুরু হল স্বাধীন উপজাতি অঞ্চল—independent tribal territories—কাঁটাতার অতিক্রম করে গেলে নিজেরই দায়িত্ব।

মোটর আবার চলতে থাকে। ডাক্তার বলেন, যে রাস্তা দিয়ে চলেছি এইটুকুই ইংরেজদের,—আর দুপাশে আফ্রিদি অঞ্চল। ওরা কারও বশ্যতা স্বীকার করে না—বন্য হিংস্র পশুর মতন। আফগানিস্তানের আমীরকেও মানে না, ব্রিটিশদেরও নয়। ঐ দেখুন, মাঝে মাঝে মাঠের মধ্যে বড় বড় পাঁচিল-ঘেরা দুর্গের মত,—ঐ হল আফ্রিদিদের এক একটা গ্রাম। ঐ ধরনের একটাতে আপনাদের নিয়ে চলেছি। প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে থেকে মাথা তুলে চিলেঘর বা টাওয়ার মত দেখছেন, ওগুলা ওয়াচ টাওয়ার বা "সুটিং বকস্"। ঐখানে রাইফেল নিয়ে বসে পাহারা দেয়। দরকার বুঝলেই শত্রুর ওপর গুলি চালায় দেওয়ালের ফোকরের মধ্যে দিয়ে,—নিজে অলক্ষ্যে থেকে। রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে যাওয়া,—মানেই ওদের নিশানার খাদ্য হওয়া। এদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হলে তখন পথ দিয়ে বড় কেউ যায় না, বাধ্য হয়ে যেতে হলে পথের মাঝ দিয়ে তো নয়ই, ঐ টাওয়ারের তলা দিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে চলা। এমন কি এদের গরু-ভেড়াও এ সম্পর্কে সতর্ক থাকে, কেন না ঝগড়া বেধে গেলে তখন শত্রুপক্ষের গরু বাছুর মুরগি কোন কিছুই গুলির হাত থেকে রক্ষা পায় না।

পথের একেবারে ধারেই একটা দুর্গের মতন। ডাক্তার হেসে বলেন, এটা তা বলে গ্রাম ভাববেন না। এটা ইংরেজদের থানা—পুলিশ স্টেশন—সশস্ত্র আরক্ষী নিরীক্ষাকেন্দ্র। মাঝে মাঝে এরকমও দেখতে পাবেন। পথের শান্তিরক্ষার জন্যে এসব পুলিশবাহিনী। এখন পথ দিয়ে যাতায়াত অনেকটা নিরাপদ

হয়েছে। তবুও হঠাৎ এরা কোন কারণে ক্ষেপে গেলেই বিপদ। তখন আর এদের হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এই কোহাটের রাস্তায় এখনও রাত্রে যান-চলাচল বন্ধ থাকে। এই তো কদিন আগে এই পথের কোন্ এক জায়গায় একটা সেনাছাউনিতে রাত্রে আফ্রিদিরা হামলা করে, যতগুলো বন্দুক-রাইফেল ছিল লুঠ করে নিয়ে পালায়। আগে ও-ধরনের ব্যাপার প্রায়ই ঘটত,—এখনও মাঝে মাঝে একটু হয়ত হয়। এর কারণ কি, তা জানেন? টাকাকড়ির লোভ নয়। আগ্নেয়াস্ত্র এদের কাছে প্রাণাধিক প্রিয়। যে করে পারে, সংগ্রহ করে। প্রত্যেকের অন্তত একটা করে থাকা চাই-ই। নইলে যেন আত্মমর্যাদা থাকে না, মনের আনন্দও নয়। নিজেরাও গ্রামে গ্রামে তৈরি করে। কিন্তু অত লোহা পাবে কোথায়?—ঐ দেখুন, পথের ওপর একটা ছোট নদীর পুল আসছে,—নজর রাখুন,—পুলের সবটাই কনক্রিট সিমেন্টের। কোথাও এক কণা লোহার কোনকিছু পাবেন না। একটা পেরেক পর্যন্ত নয়। আগে সে-ধরনের পুল ছিল, ভেঙেচুরে সব লোহা আফ্রিদিরা খুলে নিয়ে যায়। অগত্যা ইংরেজ সরকার এখন এই প্রথা ধরেছে, কাজও হয়েছে। লোহার তৈরি কোথাও কিছুর সন্ধান পেলে আর রক্ষে নেই,—তখনই তার অন্তর্ধান! ওরা মনে করে, এর মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের কথা ওঠে না। অদ্ভুত সব মানুষ, মশাই,—যাকে বলে খাঁটি বীরের জাত, —যেমন এখানকার রুক্ষ পাহাড়পর্বত দেখছেন—মানুষগুলাও তেমনি, কারও বশ্যতা স্বীকার করবে না। পরাধীন দেশের বাসিন্দা হয়ে তাই তো এদের আমার এত ভালো লাগে,—চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে এদের যেটুকু সেবা ও সাহায্য করতে পারি, আনন্দ পাই। ওরাও আমাকে আপন বলে ভাবে।

বন্ধু বলে ওঠে, ওধারে দূরে ঐ গ্রামটা,—আগুন লেগেছিল ওতে নাকি? সারা পাঁচিলের গায়ে কালো কালো দাগ—ভাঙাচোরাও!

ডাক্তার বলেন, অগ্নিকাণ্ডই বটে। তবে যা মনে করছেন, তা নয়। দুই গ্রামবাসীদের মধ্যে হয়ত কোন কারণে ঝগড়া হয়,—এরা কথা-কাটাকাটি গালাগালির ধার ধারে না। বিবাদ হয়েছে,—চলে এস, হয়ে যাক লড়াই। অমনি দু দলে বন্দুক রাইফেল নিয়ে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ হয়। যতক্ষণ না এক পক্ষ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে,—বা হার স্বীকার করে—তা বড় কেউ করতে চায় না,—লড়াই চলবে ততদিন ধরে। এইভাবে এক একটা গ্রাম ছারখার হয়ে যায়। এ-সব ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি ওদের কাছে কিছুই নয়। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি লেগেই আছে। অতি ছোট কারণেই আরম্ভ হয়ে যায়,—এমন কি হয়ত কোন কল্পিত কারণ থেকেই শুরু। ভাবলে হয়ত, আমাকে অপমান করেছে,—প্রতিশোধ নেওয়া চাই-ই। হয়ত তার নিজের সম্বন্ধেও নয়—তার পরিবারের কিংবা তার স্বজাতির কারও ক্ষতি হয়েছে বা মানহানি ঘটেছে, অমনি রাইফেল-কাঁধে চলে তার শোধ নিতে। তখনই সুযোগ-সুবিধে হল না? বেশ, মনে রইল, এক মাস দু মাস—এক বছর দু বছর পরে—যখন হয় সুযোগ পাবই—তখন এর প্রতিশোধও নেব;—এই প্রবৃত্তি হল ওদের রক্তে লেখা। এই জন্যে খুনজখম এদের লেগেই থাকে। প্রাণ নেওয়া বা দেওয়ায় এদের লেশমাত্রও কুণ্ঠা নেই,—'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন'—এরা হল ঠিক সেই জাতের। কিন্তু আশ্চর্য, এর মধ্যেও একটা সীমা আছে।

বন্ধুর বাবা প্রশ্ন করেন, এরা এল এখানে কোথা থেকে? এরাই কি এখানকার আদিবাসী?

ডাক্তার বলেন, ভারতবর্ষ আর আফগানিস্তানের মাঝখানে এই যে পাহাড় অঞ্চল,—সুলাইমান-সফেদকোহ রেঞ্জ—এইটেরই এখন নাম হয়েছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা ট্রাইব্যাল টেরিটারি। চল্লিশ হাজার বর্গমাইল জুড়ে এর বিস্তৃতি। প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস। এরা আফগানদের মত জাতে—পাঠান। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা নিজেদের বলে—পুখ্‌তুন্-অলা,—অর্থাৎ যাদের ভাষা, পুস্তু। এদের মধ্যে আবার বারোটা উপজাতি—আফ্রিদি, ওয়াজির, মাসুদ, মোহমন্দ ইত্যাদি। আমরা এখন চলেছি—আফ্রিদিদের অঞ্চল দিয়ে। খাইবার পাশেও এই আফ্রিদিদের দেখবেন। প্রতিটি উপজাতি আবার কয়েকটা গোষ্ঠীতে ভেঙে ভেঙে থাকে,—তাকে বলে 'খেল্'। এই খেল্‌ই হল এদের একাত্মবোধের দৃঢ় বাঁধন। প্রত্যেককে নিজের খেল্‌কে মেনে চলতেই হবে। বলছিলাম এদের মারামারি, ঝগড়াঝাঁটির সীমানার কথা। সেটা হল ঐ নিজেদের খেল্ পর্যন্ত—অর্থাৎ আপন পরিবারের মধ্যে চলবে, গ্রামের মধ্যেও পরস্পরে হবে, এমন কি একই খেল্-ভুক্ত বিভিন্ন গ্রামের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির মধ্যে বড় একটা মারামারি কাটাকাটি দেখা যায় না। আবার একটা চমৎকার প্রথা আছে,—যদি বাইরের শত্রু এসে পড়ে, তখন যত ঝগড়া-বিবাদ নিজেদের মধ্যে বা গ্রামে

গ্রামে থাক না কেন, আপাতত সে-সব রইল তোলা। গ্রামের সর্দাররা—এদের ভাষায় 'মালিক'—সভা বা জির্‌গা ডাকবেন, মোল্লাদের মধ্যস্থতায় বিবাদ মেটাবেন, প্রত্যেকে এক একটা পাথর তুলে এনে একটার ওপর আর একটা বসিয়ে সাজিয়ে রাখবেন এবং প্রতিজ্ঞা করবেন, যতদিন না বাইরের শত্রুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া বা তার উচ্ছেদ হয়, নিজেদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাঁটি থাকবে না, আর এই পাথরের স্তূপও এমনি থাকবে। এ-চুক্তির কখনও খেলাপও হয় না।

বাইরের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার একবার দেখে নেন,—বলেন, আর বেশি দূর নয়, ঐ পাহাড়টা দেখছেন, ওরই নিকটে আমাদের যেতে হবে। এই উপজাতিদের উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, এর মধ্যে সেটুকু শুনিয়ে রাখি। পাঠানরা মনে করে, তারা ইহুদীদের বংশধর। রাজা সল্‌—Saul—তাদের আদি পূর্বপুরুষ। কিন্তু নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের অভিমত, শুনি এরা তুর্কো-ইরানীয়ান জাতীয় পর্যায়, তবে বহু লোকের মধ্যে ভারতীয় ও অন্য জাতির রক্তেরও সংমিশ্রণ দেখা যায়। হবার কথাও। বহু যুগ থেকেই তো এইসব অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জাতীয় আক্রমণকারীরা ভারতে যাতায়াত করেছে—বিরাট সেনাদল নিয়ে। এরাও লড়েছে তাদের বিরুদ্ধে। হেরোডেটাস্‌ এদের সম্বন্ধে লিখে গেছেন : The most warlike of all the Indians, who live around thc city of Kaspaturos—অর্থাৎ পেশোয়ার!—এইবার দেখবেন তাদের গ্রাম,—কোন গ্রামের কিন্তু নিজস্ব নাম নেই,—সর্দার বা মালিকের নামে গ্রামের পরিচয়,—যে গ্রামে এখনই ঢুকব—এর নাম উলিয়াস্‌ খাঁ কিলি।

ভাবি, কেল্লাই বটে! গ্রাম তো নয়, উলিয়াস্‌ খাঁর কেল্লা!

কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোটর মাঠের মধ্যে ঢোকে। একটু এগিয়ে গ্রামের সুমুখে দাঁড়ায়। প্রকাণ্ড উঁচু পাঁচিল। পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরি। বাইরে থেকে গ্রামের ভিতর কোন কিছু দেখা যায় না। প্রবেশপথও মাত্র একটি। সিংহদরজার মত। ডাক্তারবাবু ড্রাইভারকে তিনবার হর্ন বাজাতে বলেন।

বলি, ঐটে সঙ্কেত নাকি। আলিবাবার চিচিং ফাঁক?

ডাক্তার বলেন, দেখুন না, এখনই দরজা খুলে যাবে। ওরা ওপরের ওয়াচ টাওয়ার থেকে দেখে নিয়েছে আগেই।

দরজা ভেতর থেকে খুলে যায়। জন পাঁচেক আফ্রিদি বেরিয়ে আসেন। সামনেই সর্দার—মালিক। দেখেই বোঝা যায়। সকলেরই লম্বা দোহারা শরীর। অ্যাথলেটের মত সুগঠন। সুপুরুষও। উজ্জ্বল ফর্সা রঙ। লম্বা ধরনের মুখাকৃতি। টানা বড় বড় চোখ—নীলাভ ভাব। তীক্ষ্ণ ফলার মত নাক। মুখে দাড়িগোঁফ। মাথায় পাগড়ি। পরনে ঝলঝলে সালোয়ার। গায়ে ঝোলা পাঞ্জাবি,—আলখাল্লার মত, কারও বা তার ওপর কোট বা ওয়েস্ট কোট। সবারই কাঁধে রাইফেল বা বন্দুক। সর্দার বৃদ্ধ। সৌম্য হাবভাব। বয়সের ভারে দেহ নুয়ে পড়েনি। ধনুকের ছিলার মত টানটান লম্বা। দীর্ঘ পদক্ষেপে হন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে আসেন মোটরের দিকে। আমরাও নেমে দাঁড়াই। ডাক্তার ঘোষ কয়েক পা এগিয়ে যান। তাঁকে দেখে সর্দারের মুখে আনন্দোজ্জ্বল হাসি ফোটে। সরল শিশুর হাসির মত স্বচ্ছ। দুজনেই হাত বাড়ান। পরস্পরের করমর্দন চলে সোৎসাহে ও প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে। আর দুজনেরই মুখে একই কথা খই ফোটার মত ফুটতে থাকে। বাক্যস্রোতের বেগ ক্রমশই দ্রুততর হয়, হাতের ঝাঁকুনিও ঝড়ের মুখে গাছের ডালের মত প্রবল ভাবে নাচতে থাকে।

অবাক হয়ে দেখি, বন্ধুমিলনের ও অভ্যর্থনার এই অদ্ভুত দৃশ্য। কথাগুলি শুনতে এই ধরনের—

স্তড়ে মসে? জোড়ে? খ-জোড়ে? খ-তক্‌ড়ে? খুশিয়াল্‌ দে? খ-খুশিয়াল্‌ দে? ঢের্‌ খুশিয়াল্‌ দে? খ-খ-খ খুশিয়াল্‌ দে?—তারপর যেন কেবলমাত্র *খ-খ-খ*—এইভাবেই কিছুক্ষণ চলে।

বাড়ি ফিরে পরে ডাক্তারবাবুর কাছে কথাগুলির অর্থ জানতে চাই। তিনি জানান, আমাদের যেমন প্রথা, নমস্কার বা প্রণাম, ইংরেজদের যেমন গুড-মর্নিং, গুড-ইভনিং ইত্যাদি, মুসলমানদের যেমন সেলাম আলায়কুম,—আফ্রিদিদের তেমনি এই হল অভিবাদন। এর ভাবার্থ হল : জীবন-যুদ্ধে আপনার যেন ক্লান্তি না নামে। গায়ের জোর ঠিক আছে? সব রকমে কর্মক্ষম? খুব শক্তি আছে? খুব কর্মক্ষম? দিল্‌ খুশি? খুব খুশি? ঢের খুশি? খুব খুব খুব খুশি?—*খ* মানে খুব এবং শেষ পর্যন্ত *খ-খ-খ* এই *খ*-এর

খেলাই চলতে থাকে।

যেমন বীরের জাত, তেমনি ভীম আকৃতি, তেমনি বীরত্বব্যঞ্জক অভিবাদন পদ্ধতি।

সকলকে সমাদরে গ্রামের মধ্যে নিয়ে চলে।

ভিতরে মাঝখানে চতুষ্কোণ বিশাল প্রাঙ্গণ। শুকনা, খটখটে। বালি-কাঁকর ভরা। বাইরে যে দিগন্তজোড়া মরুপ্রান্তর, তারই একটা সামান্য ফালি যেন পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা। সেই খোলা জায়গায় এখানে-ওখানে খাটিয়া পাতা, কোথাও অতি সাধারণ কাঠের দু'-একটা চেয়ার টেবিল। প্রাঙ্গণের চারিদিক ঘিরে পাঁচিলের গায়ে সারি সারি ঘর,—একতলা, দোতলা। কোন বাড়ির নীচের তলায় খোলা দালান। মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরি। কেমন যেন নীরস, কর্কশ, রুক্ষ। যেমন অধিবাসী, তেমনি তাদের বাসস্থানও। যেন, ধারালো তরোয়াল, আর তার খাপ।

ডাক্তার পুস্তু ভাষায় মালিকের সঙ্গে কথা বলেন। কি কথা বলে, কিছুই বুঝি না। সর্দার হেসে একবার কি যেন অনুমোদন করেন, আমাদের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়েন। সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলেন, একটা একতলার খোলা দালানে। দেখে মনে হয়, কামারখানা। ক'জন আফ্রিদি লোহার লম্বা নল নিয়ে একটা যন্ত্রের সাহায্যে 'বোর্'—অর্থাৎ ছেঁদা করছে। পাশে লোহার কুচি জমছে। ডাক্তার দেখিয়ে বলেন, দেখছেন? কী তৈরি হচ্ছে?—রাইফেল!—এই ভাবেই প্রত্যেক গ্রামে নিজেরা তৈরি করে। মান্ধাতা আমলের গ্রাম্য পদ্ধতি—অতি crude method! আধুনিক যন্ত্রপাতি আর পাচ্ছে কোথায়? অসীম পরিশ্রম করে তবু হাতে তৈরি করছে। সময় লাগে বেশি, সংখ্যায় হয়ও কম। কিন্তু জিনিস যা করে, আশ্চর্য রকম ভাল! কিছুদিন আগে এক রাশিয়ান এসেছিলেন, তিনি পরীক্ষা করে বলে গেলেন, তাঁদের দেশের ফ্যাক্টরিতে তৈরি ভাল রাইফেলের চেয়ে এগুলি কোন অংশে খারাপ নয়।

সর্দার কথাগুলির হয়ত মর্ম বোঝেন। সগর্বে ঘাড় নাড়েন। দেওয়ালে টাঙানো পাঁচ-ছটা রাইফেল, তারই একটা টেনে নামান। আমাদের হাতে দেন। স্বাধীন মুলুকে দাঁড়িয়ে রাইফেলের সামান্য স্পর্শও মনে অজানা এক আনন্দ দেয়, দেহে রোমাঞ্চ জাগায়। দুর্লভ রত্নের মত সযত্নে হাতে ধরে দেখতে থাকি। কিন্তু, এ কী! নলের উপর খুঁদে লেখা—ইংরেজি হরফে—ইংলন্ডে তৈরি—manufactured in England! তার আবার বানান ভুল! ডাক্তারকে দেখাই। তিনি হেসে বলেন, জানেন না বুঝি? বিলাতি মাল বলে এরা দু-একটা বিক্রী করে,—দাম বেশি পায়।

মালিককে দেখান। সর্দারও হেসে ঘাড় নেড়ে স্বীকার করেন।

স্মারক স্বরূপ রাইফেল তৈরির লোহার কুচি কতকগুলো পকেটে পুরি। তাতেও খানিক আনন্দ।

আঙিনায় ফিরে, টেবিল ঘিরে, চেয়ারে ও খাটিয়ায় সকলে বসি। সর্দারের কি এক কথায় ডাক্তার সম্মতি জানান। সর্দার উঠে যান। ডাক্তার বলেন, উনি বলছিলেন, গ্রামে আপনারা অতিথি এসেছেন, চায়ের ব্যবস্থা করছেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, এরা সবাই মুসলমান, তাই বলে যেন আপত্তি করবেন না। তাহলে অপমান বোধ করবে।

আমরা বলি, স্বাধীন রাজ্যের অধিবাসীর আতিথেয়তা,—এর মধ্যে ধর্মের কথা উঠবে কেন? আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে খাব। তাছাড়া, অপমান করব, এমন সাহসই বা কোথায়? যা এদের মজ্জাগত প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি শুনলাম, আর বন্দুক রাইফেল দেখলাম!

ডাক্তার বলেন, কিন্তু আর একটা বিষয় এখনও শোনেননি। এদের হিংসাবৃত্তি ও প্রতিশোধ নেবার দুর্দম স্বভাব থাকলেও তার ওপর এরা একটা অতি শান্তশিষ্ট সামাজিক আচরণকে স্থান দেয়, সেটা হল এদের অকুণ্ঠ আতিথেয়তা। অতিথি এলে তার আদর যত্ন আপ্যায়ন তো করবেই, যে কেউ এসে আশ্রয় চাইলেও তাকে আশ্রয় দেবে। এমন কি পরমশত্রু এসেও আশ্রয় ভিক্ষা করলে তাকে সাদরে রাখবে এবং যতক্ষণ আশ্রয়ে থাকবে তার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত না লাগে তা দেখবে।

সর্দার ফিরে আসেন। সঙ্গে আর একজন লোক। হাতে তার থালা-ভরতি আঙুর, বাদাম, আখরোট—শুকনো মেওয়া। টেবিলের উপর রাখে। সর্দার লজ্জিত মুখে সংকোচভরে ডাক্তারবাবুকে ফিসফিস করে কি বলেন। ডাক্তার উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন, জবাবে কি যেন তাঁকে জানান। তারপর

হাসতে হাসতে আমাদের বলেন, ব্যাপারটা কি বুঝতে পারলেন? মালিক ভীষণ লজ্জায় পড়েছেন। এখানে গোরু-মোষ কম,—এঁদের সব ভেড়া-ভেড়ী। দিনের বেলা বাইরে চরতে গেছে। ঘরে দুধ নেই। অতিথিদের বিনা দুধে চা খেতে দেন কী করে,—এই হয়েছে দুর্ভাবনা। এদের অবশ্য দুধ মিশিয়ে চা খাওয়া রীতি নয়,—'গ্রীন্‌ র-টি' খায়। আমি তাই বললাম, আমরাও সেই চা খাব,—এতে লজ্জা কিসের? কিন্তু দেখুন মজা,—বাইরে থেকে দেখতে এমন কাঠখোট্টা নীরস লোক,—দুর্ধর্ষ প্রকৃতি,—দয়ামায়া লজ্জাসরমের বুঝি বালাই নেই—অথচ এই সামান্য ব্যাপারেই কী রকম লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন! পাছে অতিথিসেবায় কোন ত্রুটি ঘটে যায়!

চা খাবার সময় আর একজন আফ্রিদি আসে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে খানিক কথা বলে চলে যায়। ডাক্তারবাবু মুচকে হেসে আমাদের বলেন, লোকটা ইংরেজের মাইনে-খাওয়া পুলিশের লোক। এসেছিল খোঁজখবর নিতে। আমাকে অবশ্য চেনে। দেখছেন তো আফ্রিদিদের মধ্যেও টাকা বিলিয়ে কি রকম গুপ্তচরেরও ব্যবস্থা ইংরেজ করেছে।

কয়েকটি রোগী দেখতে হয় ডাক্তারবাবুকে। এঁর উপর আফ্রিদিদের অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি।

বিকেলে পেশোয়ারে ফেরা হয়। রোমাঞ্চময় তৃপ্ত মনে। মোটরে ডাক্তারবাবু আরও গল্প করেন আফ্রিদিদের সম্পর্কে।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা এতক্ষণ ওদের গ্রামে ছিলাম, কোন মেয়েছেলে দেখলাম না তো?

ডাক্তার বলেন, দেখবেন কি করে? গ্রামের মধ্যে ওরা কড়া পর্দানশিন। এই আফ্রিদিদের নিয়ে কত মিথ্যে কাহিনীর প্রচার হয়, তারই একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। বছর পাঁচেক আগে—১৯২৩ সালে মিস এলিশ নামে সতেরো বছর বয়সের এক ইংরেজ মেয়েকে এক আফ্রিদি অপহরণ করে নিয়ে যায়—

উৎসাহিত হয়ে বলি, খুব মনে আছে ঘটনাটা। মেয়েটির নাম ছিল, মলি এলিশ। সে-সময়ে এ নিয়ে মহা হৈ-চৈ পড়ে, এ দেশের কাগজে তো বটেই, বিলেতের কাগজেও ফলাও করে প্রচার হয়—আফ্রিদিদের কী ভীষণ অত্যাচার আর জঘন্য বর্বরতা! তারপর হেসে বলি, অবশ্য সীতা হরণের মত রাম-রাবণের যুদ্ধ এতে হয়নি, হেলেন হরণের মত ট্রয়ও ধ্বংস হয়নি! তবে কাগজে তখন পড়েছিলাম, বেশ মনে আছে, মেয়েটিকে নিয়ে পালাবার সময় তার মাকে হত্যা করা হয়। তারপর, আর এক ইংরেজ মহিলা অসীম সাহসিকতা দেখান, আফ্রিদিদের বেশ ধরে তাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে মলিকে উদ্ধার করেন—খবরের কাগজে তাদের দুজনের ছবিও ছাপা হয়। আরও একটা কথা তখন কাগজে লেখে, মলি ফিরে এসে বলে, তার বন্দিদশায় তার প্রতি কোন অত্যাচার বা অসদ্ব্যবহার করা হয়নি। আফ্রিদিরা কি রকম অসভ্য, অত্যাচারী ও দুর্ধর্ষ জাত—আর মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণের দাবী পাঠায়—এটা নাকি তারই একটা প্রমাণ। তবে এর আগে কোন ইংরেজ মেয়ে হরণ হয়নি—তাই ব্রিটিশ মহলে অত হৈ চৈ পড়ে।

ডাক্তারবাবু চুপ করে শোনেন, তারপর বলেন, হ্যাঁ আপনি যা বললেন, ঐ হল ইংরেজের দেওয়া বিবরণ। আর আফ্রিদিদের দিক থেকে ঘটনাটা বলি,—যারা এতে জড়িত তাদের মুখেই শোনা। এদের চরিত্রগত যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলছিলাম—এই ঘটনার মধ্যেও তা দেখতে পাবেন। যেমন করে হোক রাইফেল সংগ্রহ করায় আফ্রিদিদের প্রচণ্ড উৎসাহ। মলি-হরণ ঘটনার শুরুও তাই নিয়ে। আজব খাঁ ও শাহজাদা—দুই ভাই। যেমন তাদের সাহস, তেমনি বুদ্ধি, তেমনি দুর্ধর্ষও। এক রাত্রে তারা সুযোগ পেয়ে, সীমান্তরক্ষী পুলিশ বাহিনীর তাঁবু থেকে কতকগুলো রাইফেল দলবল নিয়ে লুঠ করে আনে। পুলিশের রাইফেল লুঠ? ইংরেজ সরকার ক্ষেপে লাল। চারদিকে চর পাঠায়। খবরও এসে যায়। এই কোহাটের পথ থেকে কিছুদূরে ঐ সব পাহাড়ের মাঝখানে আফ্রিদিদের গ্রাম—বস্তি খেল্—সেইখানে আজব খাঁদের ঘর,—রাইফেলও সেখানে লুকানো আছে। আজব খাঁদের উপর আগে থেকে ইংরেজদের বিদ্বেষ ছিল। তাই বড় সেনাদল নিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তখনই সেখানে হানা দেয়। গ্রাম ঘেরাও করে। অস্ত্রগুলিও পাওয়া যায়। দুপুর বেলা। গ্রামে তখন দুজন মাত্র আফ্রিদি পুরুষ,—তাদের গ্রেপ্তার করা হল। আজব খাঁ ও শাহজাদাকে দেখতে পাওয়া গেল না, সাহেব কর্তারা ভাবলেন, নিশ্চয় মেয়ে সেজে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছে। অমনি হুকুম হয়, সব মেয়েদের বাইরে এসে অফিসারদের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে।

শুধু তাই নয়, তাদের প্রত্যেকের মাথার ঘোমটা তুলে দেখা হতে লাগল—সে পুরুষ কিনা!—অবশেষে শুধু সেই দুজনকে গ্রেপ্তার করে, অস্ত্রগুলো নিয়ে পুলিশদের চলে যেতে হয়।

আজব খাঁ-রা বাড়ি ফিরে সব খবর শোনে। লুঠ-করে-আনা অস্ত্র, হানা দিয়ে ইংরেজরাও উদ্ধার করেছে;—এতে লজ্জা নেই, দুঃখ নেই,—শক্তির সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু তাদের মা এসে যখন বলেন, পুরুষদের মধ্যে তোদের লড়ালড়ি কাটাকাটি যা হবার হোক, কিন্তু এ কী! মেয়েদের এমন অপমান! মুখের ঘোমটা তুলে বিদেশী লোক তোদের মায়ের মুখ দেখে;—তোরা বেঁচে থাকতে! এত বড় অপমানের শোধ নিবি না তোরা,—আমার ছেলে হয়ে?—তখন দু ভাই প্রতিজ্ঞা করে, নিশ্চয় এর প্রতিশোধ নেব,—ইংরেজদের একটা মেয়েকে ধরে এনে তোমার কাছে দিচ্ছি এখনই।

তারা চলে আসে একেবারে কোহাট ক্যানটনমেন্টে। কাঁটাতার-ঘেরা এলাকা। সব সময়ে বন্দুকধারী প্রহরী। তারপর একদিন সন্ধ্যার পর,—সুযোগ বুঝে,—কুকুরের প্রকাণ্ড চামড়ায় শরীর ঢেকে, হামা দিয়ে দু ভাই এগিয়ে যায়। টহলদারী গার্ডের পিছন থেকে চাপা দিয়ে শাহজাদা তাকে ফেলে ধরে রাখে। অল্পদূরে বাংলোর বারান্দা। ইংরেজ মেয়ে বই পড়ছে। নিকটে মা বসে সেলাই করছেন। আজব খাঁ বারান্দায় উঠতেই মা চেঁচিয়ে ওঠেন। তখনই তাকে গুলি করে মলিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েই আজব খাঁ উধাও!

তারপর, বস্তি খেল্-এর গ্রামে ফিরে মায়ের কাছে মলিকে এনে দেয়। তিনি খুশি,—অপমানের প্রতিশোধ হল। ছেলেরাও কর্তব্য পালন করল। আফ্রিদি মেয়েদের অপমান,—ইংরেজদের এত বড় আস্পর্ধা!

কিন্তু বস্তি খেল্-এ মলিকে রাখা চলে না, ইংরেজদের সন্দেহ এখানে পড়বেই,—তাই অন্য গ্রামে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। অতিথির মর্যাদা দিয়ে তার আদর-যত্ন চলে।

ওদিকে দেশময় নারীহরণের খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। বিলেতেও ভীষণ চাঞ্চল্য। একে সাহেব, তায় মিলিটারি অফিসার—মেজর, তাঁর স্ত্রী নিহত, আর মেয়ে অপহৃত!—একেবারে ক্যানটনমেন্টের মধ্যে থেকে! পেশোয়ারের চীফ্ কমিশনার—স্যার জন্ ম্যাফে—তখনকার ফ্রন্টিয়ার টেরিটোরির সর্বময় কর্তা,—তিনি নিজে উঠে পড়ে লাগলেন মলির উদ্ধারের জন্যে। মহা ভাবনা,—আফগানিস্তানে চালান না করে দেয়! ইংরেজদের বেতনভোগী ও বশীভূত আফ্রিদি সর্দারদের ডাক পড়ে। এক ইংরেজ মহিলারও সাহায্য পান। তাঁকে আমিও চিনতাম। এ রকম আশ্চর্য প্রকৃতির মেয়ে কখনও দেখিনি! পেশোয়ার হাসপাতালের তিনি নার্স-সিস্টার। সেখানকার এক ডাক্তার,—তাঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল,—ডাঃ ভার্নন্ স্টার (Dr. Vernon Starr)—তাঁকে তিনি বিবাহ করেন। বছর দশেক আগে—১৯১৮ সালে—আফ্রিদি ও ইংরেজদের মধ্যে একটা গোলযোগের সময় একদল আফ্রিদি ডাক্তার স্টার্-এর বাড়ি আক্রমণ করে এবং তাঁর স্ত্রীর সুমুখে তাঁকে হত্যা করে। কিন্তু বলিহারি মিসেস্ স্টার-এর মনোবল ও সেবা-ব্রতে নিষ্ঠা! দু বছর পরেই তিনি আবার যোগ দেন হাসপাতালে নিজের কাজে। রোগীর অক্লান্ত সেবায় ডুবে থাকেন। আর বেশির ভাগ রোগী কারা?—ঐ সব পেশোয়ারী পাঠান-আফ্রিদি, এরাই! যাদের দলের লোক তাঁর স্বামীর হত্যার জন্যে দায়ী। এঁর সেবা-শুশ্রূষা দেখে তারাও অবাক হয়ে থাকে। ট্রাইবাল অঞ্চলে এমন কোন গ্রাম নেই মনে হয়, যেখানে অন্তত একটা লোক না পাওয়া যাবে—যে এঁর কাছে উপকৃত। বোধ করি, এরই ওপর ভরসা করে, দুঃসাহসে বুক বেঁধে, কতকগুলি বিশ্বস্ত আফ্রিদি সঙ্গী নিয়ে মিসেস স্টার অভিযানে বার হলেন মলির সন্ধানে। মাথায় আফ্রিদিদের মত পাগড়ি, পরনে খাঁকি বেশভূষা, ব্যাগ্-এ ভরা রিভলভার, পিস্তল নয়,—ওষুধপত্র! ইতিমধ্যে চরের সাহায্যে খবর আসে—আফ্রিদিদের টিরা অঞ্চলে—যার মধ্যে বস্তি খেল্—তারই কোথাও মলি আছে। কিন্তু সে-সব ভয়ংকর দুর্গ পাহাড়-ঘেরা অঞ্চল—সেখানে অচেনা ভিন্‌গ্রামী ট্রাইবাল্‌দেরই প্রবেশ দুঃসাধ্য—বিদেশীদের তো কথাই নেই, সেখানে যাবেন কি করে? নানান চাঞ্চল্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনি তবুও যান, তাঁর সঙ্গীদের সাহায্য নিয়ে; আজব খাঁ ও শাহজাদার দেখাও পান এবং অবশেষে মলিকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনেন। মলিকে ফেরত দেবার বিনিময়ে ইংরেজ সরকারের গ্রেপ্তার করা বস্তি খেল্-এর সেই দুজন আফ্রিদিকে মুক্তি দিতে হয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই এ-সব ঘটে যায়।

ব্যাপারটার কিন্তু এইখানেই শেষ হয় না। ইংরেজরা তারপর উঠে-পড়ে লেগে যায় আজব খাঁ ও

শাহজাদাকে ধরবার জন্যে। কিন্তু তাদের ধরে, সাধ্য কার? রেগেমেগে ইংরেজরা বস্তি খেল্ ও অন্য যে-সব গ্রামে তারা আশ্রয় পেয়েছিল—সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে। অর্থাৎ রামায়ণের সেই অগ্নিকাণ্ডই! টিরা অঞ্চলের পাহাড়ের ওপর এক ঝাঁক বোমারু বিমান উড়িয়ে দেখিয়ে গেল—ইংরেজদের কত বাহুবল! আফ্রিদি সর্দারদের কয়েকজনকে ডেকে তাদের জির্গা-সভা বসাল, মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হল, আজব খাঁ, শাহজাদা আর তার সঙ্গীদের কেউ আশ্রয় দেবে না, দেখতে পেলে তাদের যেন ইংরেজদের হাতে তখনই ধরিয়ে দেওয়া হয়। একদিকে এই বীরত্ব প্রদর্শন, হুঙ্কার—আর একদিকের মজার ব্যাপার বলি।

একদিন গুজব রটল, ওদের ধরবার জন্যে এত জাল পাতা, এত কাণ্ড,—অথচ পেশোয়ার শহরের বুকের ওপরেই তাদের ঘুরতে দেখা গেছে। অমনি বাড়ি বাড়ি পুলিশের হানা শুরু, শহরের সব গেট বন্ধ, হুলুস্থূল। কিন্তু কোথায় কে? আবার কয়েকদিন পরে সেই একই গুজব,—এবার নাকি তারা চীফ কমিশনারের প্রাণ নেবার সুযোগ খুঁজছে! দেখা গেল, তাঁকে রক্ষা করার জন্যে অতিরিক্ত সশস্ত্র পুলিশ পাহারা বসল। শুধু তাই নয়, বাড়ি ছেড়ে তাঁকে বড় একটা বাইরে আসতে দেখা যায় না। এমন কি তাঁর বাড়ির এলাকায় বা কাছাকাছি যে কয়েকটা বড় বড় গাছ ছিল, ডালপালা কেটে তাদের নেড়া করে দেওয়া হল। কে জানে, গাছের ওপর কখন উঠে পাতার আড়াল থেকে রাইফেল চালিয়ে ঘরের মধ্যেই না গুলি করে! আফ্রিদিদের যা হাতের নিশানা,—বলা যায় না! এইভাবে কর্তৃপক্ষের আতঙ্কে কাটে। তারপর ক্রমে ভয় কমে। রটনা হয়, ওরা নিশ্চয় ভয় পেয়ে নিজেরা আফগানিস্তানে পালিয়েছে। যেন, সেই রকম ভয় পাবারই ছেলে তারা! মজা কি জানেন, যখন চারদিকে এত সব ব্যাপার তাদের ধরবার জন্যে,—তারা দুই ভাই কতবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে, নানান রকম ছদ্মবেশ ধরে, কখনও বা রোগী সেজে! তাদের মুখ থেকেই আমার এই কাহিনী শোনা। পরে অবশ্য তারা সত্যিই আফগানিস্তানে যায়—অন্য মতলব এঁটে। বড় ভাল লাগতো সেই আফ্রিদি ভাই দুটিকে। ডাক্তার গল্প শেষ করে একটু চুপ করেন। তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করেন, এই রকমই অসমসাহসী বীরজাতি এরা। নিজেদের মধ্যে একতা না থাকলেও একা একা গুপ্ত সংগ্রামে এরা অদ্বিতীয়। অমন বিশাল শক্তিশালী ধুরন্ধর ব্রিটিশরাজ, তারাও হিমসিম খেয়ে যায় ঐ দুই ভাই-এর কাছে!

মোটর ছুটে চলে।

হঠাৎ ঘনঘটা করে মেঘ দেখা দেয়। দিগন্ত অন্ধকার হয়। ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে। গাড়িতে বসে যেতে মনে স্ফূর্তি জাগে। এ যেন আফ্রিদি চরিত্রের প্রতিমূর্তি। এই কেমন শান্ত ছিল, হঠাৎ দুর্জয় প্রবল প্রতাপে রূপান্তরিত! আবার, অল্প পরেই ধূলিমুক্ত নির্মল প্রকৃতির শান্ত শোভা! তৃষাতুরা শুষ্ককণ্ঠ ধরিত্রী। সহসা বারিপাত। দেহ পরিতৃপ্ত। কিন্তু তাও ক্ষণিক মাত্র। দেখতে দেখতে বালুময় প্রান্তরের আর্দ্র রূপ আবার শুষ্ক কর্কশ হয়ে ওঠে। গাড়ির মধ্যেও হঠাৎ শীতের প্রাবল্য বোধ করি।

বন্ধুর বাবা বলেন, সিমলা পাহাড় অত উঁচু, সেখানেও যেন এত শীত মনে হয়নি!

ডাক্তারবাবু বলেন, এই হল এদেশের নিয়ম। একে নভেম্বর মাস,—আর বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই, টেমপারেচার তখনই অনেকখানি নেমে যায়।

রাত্রে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আহার। পেশোয়ারী রুটি। দেখতে যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি পাথরের মতন শক্ত। কিন্তু ভেতরে নরম তুলতুলে যেন মাখন। অতি সুস্বাদুও। আমাদেরই অনুরোধে এই রুটির ব্যবস্থা। ডাক্তার বলেন, প্রতি বছর আমার ওপর ফরমাশ থাকে,—ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন যখন যেখানে বসে,—যাই,—সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় এই রুটির বস্তা। এর মস্ত গুণ যতদিনই রাখুন, নষ্ট হবে না। খোলশটা তো শক্তই আছে, এর চেয়ে শক্ত আর কী হবে? আশ্চর্য হল, ভেতরটারও কোন পরিবর্তন হয় না, ঠিক এমনি নরমই থাকে! কংগ্রেসের অধিবেশনে হাজির হলেই বন্ধুদের এক প্রশ্ন,—*রোটি কই, ডাক্তার ঘোষ?*

সেই পেশোয়ারী রুটি খাই আমরা পেশোয়ারে বসে।

রাত হয়ে যায় ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। নিজেই মোটর করে কালীবাড়ি পৌঁছে দিতে চলেন। বলেন, শহরের রাতের চেহারাটাও একবার ঘুরে দেখে চলুন।

ঘুমন্তপুরী বটে। কোথাও কোন জনমানব নেই। শহরের সেই কোলাহল স্তব্ধ। দোকানপাট বন্ধ। কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। বাড়িগুলা ভূতের মত কালো চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। রাস্তার আলোগুলো, যেন অন্ধকারে পেঁচার চোখ জ্বলে।

ঘরে এসে শুয়ে পড়ি ভাবতে ভাবতে,—কাল আবার আফ্রিদিদের খাইবার পাস্!

১৩ই নভেম্বর, ১৯২৮ সাল। জীবনের এক স্মরণীয় দিন হয়ে থাকে। চলেছি খাইবার পাস্ অভিমুখে। সকাল ৭টা-১৫তে পেশোয়ার থেকে ট্রেন ছাড়ে। দার্জিলিঙ পাহাড়ের মত খেলাঘরের ট্রেন নয়। ৫'-৬" গেইজ-এর বড় লাইনের ট্রেন। ৩৪ মাইল দূরে ল্যাণ্ডিকোটাল। সেই অবধি যাবে। তারপরে, আরও পাঁচ মাইল দূরে ল্যাণ্ডিখানা। ভারত সীমান্ত। আফগানিস্তান শুরু। খাইবারের রেল-লাইন পাতা ল্যাণ্ডিখানা পর্যন্ত। কিন্তু শেষের পাঁচ মাইল ট্রেন-চলাচল নেই।

ট্রেন যাতায়াতে আপাতত বাধানিষেধ নেই। কেন না, 'পাস্'-এর ভিতর কোন স্টেশনে নেমে বাইরে যাওয়া চলে না,—কাঁটাতারে ঘেরা স্টেশন। সশস্ত্র প্রহরী। মোটর-পথে যাতায়াতে মিলিটারি অনুমতিপত্রের প্রয়োজন। অতএব, সে-হাঙ্গামা এড়িয়ে এই ট্রেন ধরা।

গাড়িতে বসে ভাবি, এ চললাম কোথায়? এ-যে ভারতের ভূগোল আর ইতিহাসের রোমাঞ্চকর সঙ্গমক্ষেত্র!

ভেসে ওঠে চোখের উপর ভারতবর্ষের মানচিত্র। প্রকৃতি যেন ভুবন-মনোমোহিনীরূপে ভারতমাতাকে বিভূষিত করেন। সুরক্ষিত রাখেন চতুঃসীমানা। প্রাকৃতিক আবেষ্টন,—অতল সমুদ্র অথবা উত্তুঙ্গ গিরিপ্রাকার। উত্তর-দিগন্তব্যাপী দেবতাত্মা হিমালয়। কাশ্মীরের উত্তরে কারাকোরাম রেঞ্জ। আরও পশ্চিমে,—হিন্দুকুশ। তুষার-উষ্ণীষধারী গিরিপ্রহরী। কারাকোরামের শেষভাগে দক্ষিণমুখী নেমে আসে সফেদকোহ্-সুলাইমান শৈলশ্রেণী। এঁকেবেঁকে নেমে যায় সেই আরব সাগরের দিকে। পাশ্চাত্ত্য দেশ ও মধ্য-এশিয়া থেকে যত বৈদেশিক আক্রমণের বন্যা আসে, তাদের প্রথম প্রতিবন্ধক হিন্দুকুশ। হিন্দুকুশ নামকরণের একটা প্রবাদ প্রচলিত। এককালে ভারত থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করে এই পথে চালান যেত। সমতলবাসী হিন্দু ক্রীতদাসের অনেকে এই দুর্গম পথে প্রাণ হারাত। তাই নাকি ঐ পাহাড়ের নাম হিন্দুকুশ,—হিন্দুহন্তারক। সেই হিন্দুকুশ পার হয়ে এগিয়ে এলে ভারতবর্ষের প্রকৃত সীমান্ত প্রহরী,—আজ ঐ অদূরে দেখা যায়,—সফেদকোহ্-সুলাইমান রেঞ্জ। দুর্লঙ্ঘ্য পার্বত্যপ্রদেশ। তবুও, তারই ফাঁকে সর্পিল কয়েকটি গিরিবর্ত্ম। তার মধ্যে প্রধান,—খাইবার পাস্, বোলান পাস্ ও আরও দক্ষিণে মাকরান সমুদ্রতট। কিন্তু খাইবার পাস্-এর নামই সব চেয়ে বিখ্যাত। বহির্জগৎ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যলক্ষ্মীর যুগ যুগ ব্যাপী যাতায়াত এই পথ ধরে। হয়ত সেই কোন্ পুরাকালে এই পথ দিয়েও আসেন আর্যরা। আবার, সেই লক্ষ্মীর দুয়ার ভেদ করে ভারতের রত্নরাজির লোভে কত বহিরাগত অলক্ষ্মীরও অনুপ্রবেশ হয়,—এরই শোণিতচিহ্নিত শনি-রন্ধ্র দিয়ে। সেই কারণেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বার বার খাইবার পাস্-এর নাম উল্লেখ। এই ছিদ্রপথ দিয়ে আসেন পারস্যরাজ দরেইওস্। আলেকসান্দারের সৈন্যবাহিনীও। একের পর এক রাজ্যলোলুপ বিদেশী নরপতিরা। এলেন গজনীর সুলতান মামুদ। চেঙ্গিস খাঁরও প্রবেশ এরই নিকটস্থ আরেক গিরিপথ দিয়ে। মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবরের যাতায়াতও এই খাইবার ধরে। নাদির শাহ্ ও আহমদ শাহ্ দুররাণীর আক্রমণ,—সে সবও এই খাইবার পাস্ ভেদ করে। ব্রিটিশ আমলে প্রথম আফগান যুদ্ধে ১৮৩৯-৪২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সৈন্য খাইবার অধিকার করে, উত্তর ভারতের মধ্যে দিল্লি এগিয়ে এসে। ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল পোলক কাবুল অভিযানে এই গিরিপথই ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধেও ব্রিটিশ সেনা আবার এই পাস্ দখল করেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে গণ্ডামাক সন্ধির ফলে আফ্রিদি ও অন্যান্য উপজাতি ব্রিটিশ আনুগত্য স্বীকার করে। কিন্তু, তবুও এই কয় বছর আগে ১৯১৯ সালের মে মাসে তৃতীয় আফগান যুদ্ধ হয়। আবার এই খাইবারের ল্যাণ্ডিকোটালে রক্তগঙ্গা বয়। সাধে কি আর প্রবাদ রটে, খাইবারের গিরিপথ,—সেখানে প্রতি প্রস্তরখণ্ড মানুষের রক্তরাগে রঞ্জিত!

স্বাধীনচেতা সীমান্তবাসী উপজাতির দল, কারও বশ্যতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা তাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

এদেশে সামান্যমাত্র স্ফুলিঙ্গ কখন চকিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটায় কেউই জানে না। তাই তো লর্ড কার্জন একসময় লেখেন, No man who has read a page of Indian history will ever prophesy about the Frontier.

সেই প্রসিদ্ধ খাইবার পাস্-এ চলেছি আজ ট্রেনে চেপে। যেন, ক্ষণিক স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির গহ্বর দর্শনে। এই সুদুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ইংরেজদের পক্ষে রেল চালানো সম্ভব হয়,—উপজাতিগুলির সঙ্গে বহু চুক্তির পর। তাও এই সাম্প্রতিক কালে। তৃতীয় আফগান যুদ্ধের পর। ১৯২৫ সালে—অর্থাৎ মাত্র তিন বছর আগে পাস্-এর মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলাচল। পাস্-এর দৈর্ঘ্য ২৬½ মাইল। রেলপথ তৈরি করতে আড়াই কোটিরও বেশি টাকা ব্যয় হয়। হবার কারণও থাকে। পাহাড় ফুঁড়ে এইটুকুর মধ্যে ৩৪টা টানেল—গিরিসুড়ঙ্গর সৃষ্টি। সুড়ঙ্গগুলির সমষ্টিগত দৈর্ঘ্য,—তিন মাইল। নদী, ঝরনা বা নালা অতিক্রম করার জন্যে নির্মাণ করতে হয় ৯২টি পুল.বা Viaduet ও 'কালভার্ট'। শুধু তাই নয়, এই বড় ট্রেনকে পাহাড়ের গা বেয়ে তোলা—৩৫০০ ফুটেরও উপরে! ব্রিটিশ এঞ্জিনিয়ারদের এই রেলপথ-সৃষ্টি জগতে এক বিস্ময়কর শিল্প-কীর্তি!

অসীম কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে বসি ট্রেনের জানলার ধারে। যাত্রীর ভিড় নেই! দুটি পেশোয়ারী যুবক,—সাহেবী পোশাক, ও একজন আফ্রিদি—মিলিটারি বেশভূষা, কোমরে রিভলভার। শহরের পশ্চিম দিক ঘুরে ট্রেন চলে। মাঠের মধ্যে আসে। চাষ-আবাদের চিহ্ন দেখি। দূরে দেখা যায় পাহাড়ের শ্রেণী। তিন মাইল সমতলভূমি পার হয়ে ইসলামিয়া কলেজ স্টেশন। যুবক দুটি নেমে যায়। আফ্রিদি সহযাত্রী এবার আলাপ করেন। কোথায় চলেছি, কোথা থেকে আসছি, জানতে চান। বলেন, এখানকার এই কলেজ এ-অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ছাত্রদের জন্যে ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত।

ট্রেন আবার চলতে থাকে। ডান দিকে রেল লাইনের সমান্তরালে বাঁধানো প্রশস্ত মোটরসড়ক। সহযাত্রী জানান, এ রাস্তা চলে গেছে একেবারে কাবুলে,—পেশোয়ার থেকে প্রায় ১৯০ মাইল দূর। খাইবার পাস্-এর মধ্যে যখন ঢুকবেন—এ পথকে প্রায়ই সঙ্গী পাবেন। আরও একটা পথ সেখানে মাঝে মাঝে দেখা দেবে—সেটা হল পুরানো 'ক্যারাভান রুট'। ঐ পথ ধরে নিরাপত্তার জন্যে যাত্রীদল একসঙ্গে আসে সারি সারি—গাধা, বলদ, উটের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে। সেরকম যাত্রীদল—এদের বলা হয় কাফিলা—যদি পেয়ে যান—দেখবেন এক মাইল দু মাইল লম্বা যেন শোভাযাত্রা চলেছে। পাস্-এর মধ্যে এই নতুন মোটরের রাস্তা আর ক্যারাভান রুট—কখনও এক হয়ে যায়, আবার মোটরপথ হয়ত কোথাও আলাদা হয়ে একটু ঘুরে যায়।

মাঠের মধ্যে দু-একটা মাটির তৈরি কেল্লার মত দেখা যায়। একটা নদীর পুল আসে। পার হয়ে স্টেশন—কাচা গর্হি। পাহাড়ের শ্রেণী এগিয়ে এসেছে। যেন ট্রেনের গতিরোধ করতে চায়। ট্রেনও সশব্দে তারই দিকে ছুটে চলে। সমতলভূমি এবার অসম হয়ে ক্রমে মাথা তুলতে থাকে। সুমুখে পাহাড় জেগে ওঠে।

অদূরে একটা পাহাড়ের মাথায় দুর্গ দেখা যায়। বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, ওটা গ্রাম নাকি? প্রকাণ্ড তো! সহযাত্রী জানান, না,—ওটা জামরুদ ফোর্ট। ট্রেনটা ওর তলা দিয়ে যাবে। ঐ নামে ওখানে স্টেশনও। সেইখানে আমি নেমে যাব। ঐ ফোর্টের ইতিহাস জানেন নাকি? প্রায় একশো বছর আগে রণজিৎ সিং-এর আমলে শিখেরা যখন আফগানদের পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত করে সেই সময় সর্দার হরি সিং-এর তৈরি ঐ দুর্গ। ১৮৩৭ সালে হরি সিং এখানে আফগানদের হাতে প্রাণও হারান।

ট্রেন চলে। তাকিয়ে থাকি পাহাড়ের মাথায় দুর্গের দিকে। মনে হয়, আমি যেন স্থির হয়ে বসে। সামনে ওগুলা পাহাড় নয়,—সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, তারই মাথায় দোদুলহিল্লোলে এগিয়ে আসে যেন যুদ্ধসাজে এক রণতরী। আমার স্বপ্নের যেন রেশ টেনে সহযাত্রী বলেন, সামনে ঐ নদীটা আসছে—এইবার শুরু হবে ট্রাইবাল টেরিটারি,—আফ্রিদি এলাকা। এবার থেকে দেখতে পাবেন—রাস্তার দু-পাশে মাঝে মাঝে কাঁটাতার—সীমানা-চিহ্ন স্তম্ভ। জামরুদ ছাড়াবার পর প্রকৃত পাস্ শুরু হয়ে যায়। এই রেলপথ আর মোটরপথের নিরাপত্তার জন্যে ব্রিটিশরাজ আমাদের এক সর্দার—জামান খাঁ—তাঁকে ছ'মাস অন্তর তিন লক্ষ করে টাকা দেয়,—অন্য সব এখানকার সর্দারদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দিতে। তাই তো এই সব পথ ফেলে দিয়ে রেল বা মোটর চলাচল সম্ভব হচ্ছে, রেলের লাইনও ঠিক আছে। তা ছাড়া, এই পথ

সারাক্ষণ পাহারা দেবার দায়িত্ব ইংরেজরা আমাদেরই ওপর দিয়েছে—অবশ্য এর জন্যে টাকা দেয়। আমাদের বলা হয় খাস্‌সাদার। আমাদের অধিকাংশই আগে ব্রিটিশ সেনাবিভাগে ছিলাম। আমাদের সাহায্য না পেলে ইংরেজদের যত বড়ই সেনাদল বা অস্ত্রবল থাক,—এ পথ নিরাপদ রাখার সাধ্যি নেই তাদের। কেন? তা বুঝতে পারবেন—পাস্‌-এর মধ্যে ঢুকলেই,—চারপাশের পাহাড়ের ও পথের চেহারা দেখলেই,—এই নদী এসে গেল, ঐ দেখুন সব কাঁটাতার,—সীমানা-স্তম্ভও শুরু হল—জামরুদ-এ এবার ঢুকছি,—লাইনের ধারে—মোটর-পথের পাশে—ঐ বিরাট একতলা চ্যাপটা-মাথা মাটির বাড়িটা নজর করছেন? ওটা ক্যারাভান সরাই—পান্থশালা—ক্যারাভানের—কাফিলাদের—রাত কাটানোর জায়গা—কত লোকজন ঘুরছে, কত উট বাঁধা রয়েছে—এ সব আপনাদের নতুন লাগছে নিশ্চয়?

স্টেশনে ট্রেন থামে। ভদ্রলোক নামবার আগে বলে যান,—আপনারা বিদেশী,—সাবধান করে দিই, লোকজন এবার থেকে কামরায় উঠবে, নামবে। একটু নজর রাখবেন। ট্রেনটাতে মাঝে মাঝে চুরি হয়।

বন্ধুর বাবা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের আর নেবে কি? সামান্য যা জিনিস সঙ্গে ছিল, —পেশোয়ারেই রেখে আসা হয়েছে!

সহযাত্রীর সতর্কবাণী আমার কিন্তু কানে বাজে।—এই বীরের জাত! তাদের রাজ্যেও চুরির উৎপাত! অথচ এই তো ক'মাস আগে কেদারবদরীর তীর্থপথে কাটিয়ে এলাম। চারশো মাইলের উপর হাঁটাপথ। এক মাস ব্যাপী যাত্রা। দিনের পর দিন দরজাবিহীন চটিতে রাত কাটানো। সারি সারি যাত্রীর কম্বল-শয্যা পাতা। সবাই অচেনা, তবু মনে হয়, কত চেনা। গাড়োয়ালবাসীর কাছে সবাই যাত্রী,—অতিথি। অচেনা মানুষের মধ্যে অজানা জায়গাতেও পরস্পরের মধ্যে কী অগাধ বিশ্বাস! চুরির ভয় কারও মনেও জাগে না, কেউ কোন কিছু ভুলে ফেলে গেলেও অপর কেউ স্পর্শও করে না।

জামরুদ ফোর্ট যেন রুক্ষমূর্তি নিয়ে তাকায়। ভাবি, ঠিকই তো, সেখানে তীর্থপথের শান্তি, এখানে যোদ্ধা জাতির অশান্তি। জামরুদ ফোর্ট প্রায় দেড় হাজার ফুট উঁচু। পেশোয়ার থেকে মাইল আট-দশ দূর।

জামরুদ ছেড়ে ট্রেন চলে। মোটরপথের সঙ্গে কাটাকাটি হয়। লেভেল ক্রসিং। পথের পাশে কয়েকটা উট দাঁড়িয়ে। পিঠে বোঝা। মুখের দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে উট-চালক। যেমন দাড়ি, তেমনি পাগড়ি, তেমনি ঝলমলে পোশাক।

আরম্ভ হয় খাইবার পাস্‌। পাহাড়ি নদী জাম নালার উপত্যকা ধরে ট্রেন চলে। মোটর ও ক্যারাভান পথও। চারপাশ থেকে পাহাড়গুলো যেন এগিয়ে এসে ধরতে চায়। এঁকেবেঁকে ট্রেন পালায়। পাহাড় ঘিরে ফেলে। নদীর ওপর পুল দিয়ে ট্রেন অপরপারে যায়। কোথাও গাছপালা দেখা যায় না। সব ন্যাড়া পাহাড়। রুক্ষ শুষ্ক মরুপ্রায়। রসকষহীন, বিবর্ণ। হিমালয়ের সেই পরিচিত অরণ্যময় শ্যামল শোভার লেশমাত্র নেই,—যা দেখে চোখ জুড়ায়, মনে শান্তি আসে। এ যেন সর্বত্যাগী উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসীর দল। সিন্দূররাঙা ত্রিশূল তুলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। তারই মধ্যে দিয়ে কোনমতে পথ করে ট্রেন চলে। এই কর্কশ নির্দয় রাজ্যে একমাত্র করুণার মূর্তি পাশের ঐ নদীর ধারা। তারই সমরেখায় রেলের লাইন পাতা। মোটর ও হাঁটাপথও।

সুমুখের পাহাড়ের গায়ে দুর্গ। রাগ্‌ইয়ারি স্টেশন। প্ল্যাটফর্মে আফ্রিদিরা ঘোরে। বুক ফুলিয়ে, মাথা তুলে, পিঠে রাইফেল বন্দুক নিয়ে। দুজন আমাদের কামরায় উঠে বসে। বিরাট লম্বাচওড়া চেহারা। বিশাল পাগড়ি। ট্রেন আবার চলতে থাকে। পাহাড়ের মাথায় দেখা যায় আর এক রেল স্টেশন। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে। ঐ ওখানে ট্রেন উঠবে নাকি? ঠিক তাই-ই। রেল লাইন নদীর সঙ্গ ছাড়ে। পাহাড়ের গা বেয়ে—একবার সামনে এগিয়ে, আবার উল্টামুখে পিছন হটে খানিক পাহাড়ে ওঠে,—আবার এগিয়ে, আবার পেছিয়ে ক্রমশ উঠেই চলে পাহাড়ের গায়ে,—দেখতে দেখতে অনেকখানি। দার্জিলিঙ-এর তিনধরিয়া স্টেশনের নিকটে ছোট রেল লাইনের এই ধরনের reverses দেখা যায়। এখানে বড় রেল গাড়িকে ঐভাবেই তুলে নিয়ে চলে মাইলখানেকের ভিতর চার-পাঁচশ' ফুট। এ যেন পাহাড়ে ও রেল লাইনে মল্লযুদ্ধ। হাতি আর অজগর সাপের লড়াই। লোহার পাতের পাক দিয়ে পাহাড়কে বাঁধবার চেষ্টা।

ছোট্ট স্টেশন। চাগাই নাম। সহযাত্রী দুজন নেমে যায়। নতুন জনতিনেক ওঠে। কেউ টিকিট কাটে বলে মনে হয় না। কাটবার কথাও হয় তো নয়। তাদের স্বাধীন মুলুক। ইংরেজদের যেন দয়া করেই রেল নিয়ে যেতে দেওয়া। খুশিমত ট্রেনে ওঠা-নামা,—এ অধিকার তো থাকবেই।

ট্রেন ছাড়ে। বহু নীচে দেখা যায় নদীর শীর্ণ কায়। বালুচরে সুনীল সর্পিল রেখা। পাহাড়ের গায়ে রেলের লাইন যেন স্লেটের বুকে হিজিবিজি লেখা।

খাইবার পাস্-এ ঢোকার কিছু পরেই মাঝে মাঝে টানেল-এর ভিতর দিয়ে ট্রেনকে চলতে হয়। বেশ লাগে দেখতে। এই দেখছি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে,—চারিদিক সূর্যালোকে ঝলমল করে, নীচে ঐ নদীর আঁকা-বাঁকা রেখা,—ওপারে ঐ একটা গিরিচূড়ার ত্রিকোণ আকৃতি,—ঐ দেখা যায় কালো কালো শিলাস্তূপ—যেন কোন্ প্রাচীন যুগের কঙ্কাল,—ঐ ওধার দিয়ে চলে কাবুল সড়ক,—সারি সারি উটের দল—লোমভরা দেহে সোনালি আভা। লম্বা মাথা ও ঘাড় দুলিয়ে কদম কদম চলে। পিঠে কারও বোঝার ভার। কারও বা সওয়ারী। কালো বোরকা-ঢাকা জানানা-যাত্রী। পাশে হাঁটে দীর্ঘদেহী পুরুষ। কাঁধে রাইফেল, বন্দুক। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। যেন যুগ থেকে যুগান্তরে। যেমন নদীর ধারা যায় বয়ে, স্বরূপ থাকে একই। ছবির বই-এ দেখা চিরন্তন মরুযাত্রীর দল। এখন বই-এর পাতা ছেড়ে জীবন্ত হয়ে প্রকৃতই চলতে দেখি চোখের সামনে।

হঠাৎ ঘোর অন্ধকার। কে যেন দু চোখ চেপে ধরে। সব কিছু হারিয়ে যায়। কামরার ভিতর টিমটিমে আলো ওঠে জ্বলে। যেন নিষুতি রাতে প্রদীপ হাতে কে যেন বলে,—এই তো আছি! টানেলে ট্রেন। ঘড়ঘড় গমগম গম্ভীর আওয়াজ। কিছুক্ষণ। তারপর ক্ষীণ আলোর ইঙ্গিত। হঠাৎ আবার দিনের আলোয় ভরে ওঠে কামরা। বাইরেও সূর্যের সেই আলো। চারদিকে পাহাড়ের শ্রেণীও। কিন্তু পটের পরিবর্তন। হয়ত নতুন পাহাড়, কিংবা পুরানো পাহাড়ের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে নবতর রূপ। সে নদীও হয়ত কখনও হারিয়ে যায়। নবীন সাথী আর এক নদী এগিয়ে আসে। কাবুলের পথও হয়ত কোন্ পাহাড়ের পিছনে লুকায়। আবার আসে টানেল। আবার হয়ত দৃশ্যান্তর। এ যেন চোখের সামনে পর্দার উপর নতুন নতুন স্লাইড-এ ছায়াচিত্র দেখা।

এইভাবে আসা হয় সাগাই স্টেশনে। ২,৬৮৮ ফুট উঁচুতে। পাহাড়ের উপর অধিত্যকা। নিকটেই নদী। আবার এক দুর্গ। দু-চারজন যাত্রীদের আবার ওঠা-নামা। জামরুদ্ থেকে দশ মাইল এসে এতক্ষণে রেলপথে, মোটররাস্তার ও ক্যারাভান রুট-এর আবার কাটাকাটি,—'লেভেল ক্রসিং'।

এইবার তিন রাস্তা পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরে একই সমরেখায় নদী ধরে এগিয়ে যায়। কিন্তু কিছু পরেই নির্দয় পাহাড় কঠোর রূপ ধরে আবির্ভূত হয়। একটা বাঁক ঘুরতেই চুনাপাথরের অতি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট—খাইবারের ভয়াবহ প্রসিদ্ধ গর্জ—gorge। আলি মসজিদ স্টেশন। প্রায় আড়াই হাজার ফুট উঁচু। কেল্লার মত কয়েকটা ঘর। বড় একটা দুর্গ তো আছেই, অপর দিকে খাড়া পাহাড়ের পিছনে আরও উঁচু পাহাড়ের মাথা উঁকি মারে—৬,৪০০ ফুট উঁচু টার্‌টারা শিখর। মাথায় তার তুষারপ্রলেপ। দেখেই যেন আরও শীত বোধ হয়।

পাহাড়ের গা কেটে ট্রেন লাইন নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। নীচে নদী,—দুপাশে খাড়া পাহাড়। দুদিক থেকে দুরন্ত পাহাড় কাছাকাছি এগিয়ে এসে মাথা ঠোকাঠুকির চেষ্টা করে। অসহায় পথগুলিকে যেন গলা টিপে ধরতে চায়। এইখানে স্পষ্ট প্রকট হয়ে ওঠে খাইবার পাস্-এর দুর্ধর্ষ, দুর্গম, হিংস্র রূপ। পাহাড়ের গায়ে, মাথায় বিস্ফোটকের মত ট্রাইবালদের গুমটিঘর। কালো কালো ছোট ফোকর। কটমট করে যেন তাকায়। সেই ঘরে বসে বা পাহাড়ের গায়ে কোন পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে কয়েকজন মাত্র অব্যর্থলক্ষ্য অস্ত্রধারী ট্রাইবাল এই সংকীর্ণ পথে যাতায়াত বন্ধ করে দিতে পারে। নিচের পথ দিয়ে তাদের হাতের অস্ত্রের গুলি এড়িয়ে, প্রাণ বাঁচিয়ে, চলে যায় সাধ্য কার, যদি এই ট্রাইবালরা ক্ষেপে ওঠে!

খাড়া পাহাড়ের গলা ধরে ঝুলতে ঝুলতে মোটরপথ কোনক্রমে এগিয়ে চলে। ট্রেনপথের সে-ক্ষমতা থাকে না। কেবলই পাহাড় ফুঁড়ে টানেলের পর টানেল আসে। হঠাৎ এক-একবার 'গর্জ'-এর ভীষণ রূপ দেখা যায়।

অবশেষে ট্রেন হাঁফ ছাড়ে পর্বতের অধিত্যকায় পৌঁছে। দুপাশের পাহাড় কিছু দূরে সরে দাঁড়ায়। জিন্‌তারা গ্রাম আসে। দুর্গের মত বাড়িঘর দেখা দেয়। আবার বন্দুকধারী আফ্রিদিদের ঘোরাঘুরি। ভয়াবহ পথ পেরিয়ে এসে আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

অনেকখানি সমতলে এগিয়ে ল্যাণ্ডিকোটালে ট্রেন হাজির হয় বেলা সাড়ে এগারোটায়। ল্যাণ্ডিকোটাল

সাড়ে তিন হাজার ফুট-এরও বেশি উঁচুতে। ঘাটজাই শৈলশিরার কাঁধের উপর। পাশেই ইংরেজদের সেনানিবাস। বড় দুর্গও। স্টেশনও, মনে হয়, একটা ভাঙা পুরানো দুর্গের মধ্যে। এই ট্রেনই আবার পৌনে দুটোয় ফিরে যাবে। পেশোয়ার পৌঁছুবে বেলা পাঁচটায়। হাতে দু ঘণ্টা এখন সময়। পরামর্শ হয়, আফগান-সীমান্তের দিকে খানিক হেঁটে গেলে কেমন হয়? স্টেশনের বাইরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতেই মিলিটারি পুলিশের আবির্ভাব। হুকুম হয়, স্টেশন-এলাকার বাইরে যেন না যাই। ল্যাণ্ডিখানা যাওয়ার অনুমতি? অসম্ভব। কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। নিষিদ্ধ এলাকা।

অগত্যা প্ল্যাটফর্মেই পায়চারি করি। অল্প পরে পুলিশের চেহারা কোথাও দেখি না। সেই সুযোগে আমরা বেরিয়ে পড়ি বাইরে। উঁচু-নীচু বিবর্ণ প্রান্তর। কয়েকটা বাড়িঘর। কাঁটা তারের বেড়া। ওদিকে সেনাছাউনি। রাস্তা দিয়ে খানিক যেতেই কোট-প্যান্ট-পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। বাঙালী ধরনে ধুতিকাপড় পরা আমরা। তাই দেখে থমকে দাঁড়ান। এগিয়ে এসে কথা শুরু করেন বাঙলা ভাষায়। অপরিচিতের মুখে, এই বিদেশে, বাঙলা কথা—কী মধুরই না শোনায়! কথাও বলেন যেন কত দীর্ঘদিনের পরিচয়, হঠাৎ অনেক কাল পরে দেখা। বলেন, চলুন আগে শশীবাবুর বাড়িতে। ল্যাণ্ডিখানা দেখবার ব্যবস্থা একমাত্র তাঁকে দিয়েই হতে পারে। শশীভূষণ দাস,—এঞ্জিনীয়ার। সরকারী কাজে এখানে আছেন। নিকটেই কোয়ার্টার্স। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, সকালেই কাজে বেরিয়ে গেছেন। ঐদিকেই এখন তাঁর কাজ চলছে। ট্রলি করে অনায়াসে ঘুরিয়ে আনতে পারতেন। আজ রাত্রে যদি থাকি, কাল ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু থাকার উপায় নেই। আজ বিকেলে পেশোয়ারে ফিরে সন্ধ্যার ট্রেনে লাহোর রওনা হবার ব্যবস্থা সব ঠিক আছে। বন্ধুর বাবার কর্মক্ষেত্রের ছুটি শিরে সংক্রান্তি।

বাড়িতে শশীবাবু নেই বটে, কিন্তু অন্দরমহলে মেয়েরা রয়েছেন। এরই মধ্যে সেখানে সাড়া পড়ে যায়। চা-বিস্কুট আসে। ভাত না খেয়ে ফেরা চলবে না, অন্তরাল থেকে তার হুকুমজারিও হয়।

কথা থাকে, খানিক ঘুরে এসে আহারান্তে ট্রেন ধরা হবে।

আরও দুজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে এইখানেই আলাপ। তাঁরাও এখানে কাজ করেন। ওভারসিয়ার।

দল বেঁধে হেঁটেই ল্যাণ্ডিখানার দিকে রওনা হই—যেটুকু যাওয়া যায়। ক্যারাভান রুট ধরে এগোনো। পাশেই এক ক্যারাভান-সরাই। বিচিত্র সাজে কত লোকজন ভেতরে ঘোরে।

পথ নেমে যায় এবার হুড়হুড় করে। পাহাড়ের গা বেয়ে। ট্রেনের লাইন পাতা। কিন্তু ট্রেন চলে না। এখানেও শুনি রেলপথে বহু টানেল। তার কারণ, পাহাড়ের এই কাঁধ থেকে পথ নেমে গেছে একটা পাহাড়ি নদীর যেন জটা ধরে। এখানেও সঙ্কীর্ণ গিরিখাত। তারই ধার দিয়ে পথ। পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে আসে ঝরনার পর ঝরনা। মাইলখানেক যাবার পর মিছনি কাণ্ডা। দুদিকের পাহাড় একটু সরে গিয়ে খানিক খোলা জায়গা দেখা দেয়,—সুমুখে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়,—গিরিখাত আরও নেমে গেছে—বহু নীচে—মাইল তিন-চার দূরে ল্যাণ্ডিখানা। ২,৫০০ ফুট উঁচুতে।

স্থানীয় বাঙালী সঙ্গীরা সেই দিকে একটা পাহাড় দেখিয়ে বলেন, ঐখানে ভারত-সীমান্ত। আফগানিস্তান শুরু। এই উপত্যকা চলে যায় ডাক্কা, জালালাবাদ, কাবুলের দিকে।

আশ্চর্য হয়ে ভাবি, ভারতের এ কোন্ সুদূর প্রান্তে আজ দাঁড়িয়ে আছি!

শশীবাবুর বাড়িতে ফিরে বাঙালীর ভাত-ডাল তৈরি পাই। শুধু ক্ষুধার নিবৃত্তি নয়, এই দূর প্রবাসে আপন ঘরের আদর-যত্ন ঘরছাড়া মনকে বিমুগ্ধ করে।

দেখি, ভ্রাম্যমাণের জীবনেও সংসারের আনন্দ-ভালবাসা দেশ-বিদেশে পথের পাশেও বাসা বাঁধে।
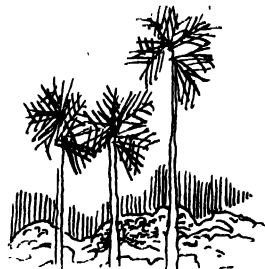
বর্মা মুলুকে

আমার বর্মাভ্রমণ সে কী আজকের কথা! ছাপ্পান্ন বছর আগেকার সে কাহিনী,—১৯২৯ সালের। তার আগের বছর মে মাসে মাকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ের কেদার-বদরী তীর্থপথে ঘুরে আসা, তখনকার হৃষীকেশ থেকে পায়ে-হাঁটা পথে। আবার, সেই বছরেরই নভেম্বরে অপর দুই সঙ্গীর সঙ্গে চলে যাওয়া পেশোয়ার, খাইবার পাশ, আফগান সীমান্তে—আফ্রিদি মুলুকে।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে। তারপর ঐ ১৯২৯ সাল আসে। আমারও ভ্রমণ-ভাগ্যাকাশে আর এক নতুন দিগন্ত খোলে। হঠাৎ-ই সুযোগ পাই সেকালের বৃটিশ শাসিত ভারতের পূর্বপ্রান্ত সুদূর ব্রহ্মদেশ ভ্রমণের। বর্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজ্য হলেও ইংরেজরা সে-দেশ জয় করার পর ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করে একই রাজ্যভাবে তখন শাসন করছে। ভূগোলের মানচিত্রে বর্মামুলুক তখন দেখলে মনে হোত যেন ভারতমাতার কাঁধ থেকে খসে ঝুলে পড়া নীলাম্বরীর আঁচলখানি।

ভারতের পূর্ব উপান্ত হওয়ায় সে-কালের ভারতবাসীর ওদেশে যাতায়াতের দ্বারও ছিল অবারিত। অবাধে ভারতীয়রা শুধু যেতই না, চাকুরিজীবী ও জীবিকাসন্ধানী বাঙালী ও ব্যবসায়ী দক্ষিণ ভারতীয়রা দলে দলে বর্মায় গিয়ে বসবাস করতেন ও আরও কত কী কীর্তিকলাপ করতেন তার অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রের গল্পে, উপন্যাসে।

সত্য বলতে কী, বর্মা সম্বন্ধে আমার তখন যেটুকু জ্ঞান ও যা কিছু ধারণা তা সেই সব বই পড়ে। শরৎচন্দ্রের মুখে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার গল্প শুনেও।

শরৎচন্দ্রের সেখানে যাওয়া চাকরির খোঁজে, জীবিকার সন্ধানে। আর তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন বঙ্গ সাহিত্য-জগৎবিজয়ী বীর বেশে!

কিন্তু, আমার যাওয়া? সেই গল্পই শোনাই। প্রথম বলি, যাওয়ার সুযোগ এল কী ভাবে।

পূর্ণদা ছিলেন আমার আপন দাদাদের মতন। রক্তে নিঃসম্পর্ক। তবুও পরমাত্মীয়। আমাদের অন্তত তিন পুরুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সংযোগের সূত্রপাত কীভাবে, জানি না। তবে জানি, পূর্ণদার ঠাকুরদাদা শীতলচন্দ্র ছিলেন আমার ঠাকুরদাদা গঙ্গাপ্রসাদের বন্ধু। শুনেছি, শীতলচন্দ্র যখন বৃন্দাবনের "সোনার তালগাছ" খ্যাত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শেঠবাবুদের ম্যানেজার, সে-সময়ে দশ বছর বয়সে আমার বাবা অসুস্থ হয়ে তাঁর কাছে মথুরায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য গিয়ে কিছুকাল ছিলেন। পরবর্তীকালে পূর্ণদার বাবা—সত্যচন্দ্র—আমরা কাকাবাবু বলে ডাকতাম—এলাহাবাদে ওকালতি করে প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। আমরা বহুবার তাঁদের কাছে এলাহাবাদে গিয়ে থেকেছি। পূর্ণদারও লেখাপড়া করা ঐ এলাহাবাদেই। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় তাঁদের ভবানীপুরের বাড়িতে চলে আসেন। কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু পূর্ণদার খ্যাতি ছিল খেলার জগতে। ক্রিকেট, হকি, টেনিস খেলায় তিনি যেমন এলাহাবাদে থাকতে বিখ্যাত খেলোয়াড় বলে নাম করেন, কলকাতায় এসেও তাঁর সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকে। চেহারাও ছিল তাঁর তেমনি,—যেমন লম্বা—ছয় ফুটের ওপর তো বটেই, তেমনি সবল দেহ, টকটকে রঙ, সুশ্রী। আর, মজলিসী গল্প করতে পারতেন,—আসর জমিয়ে। জওহরলাল নেহেরু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত,—এঁদের সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলা থেকে জানাশুনা। হবারই কথা, তাঁদের বাবা মতিলাল নেহেরু ছিলেন পূর্ণদার বাবার—আমাদের সত্যকাকাবাবুর—অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সেই পূর্ণদার শ্বশুরবাড়ি ছিল রেঙ্গুনে। তাঁর শ্বশুরমশায় অটলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বর্মার প্রসিদ্ধ উকিল। রেঙ্গুনে তাঁর বাড়িতে প্রতি বছর জাঁকজমক করে দুর্গাপূজা হোত। তাঁর মেয়ে-জামাইরা কলকাতা থেকে যেতেন।

সে-বছর—১৯২৯ সালে—আমিও গেলাম সেই দলে ভিড়ে!

অবশ্য, আমার যাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণদার উৎসাহ থাকে অনেকখানি। দেশভ্রমণে তাঁরও অসীম আগ্রহ। আগের বছর কেদার-বদরী যাত্রায় তিনিও সস্ত্রীক আমাদের দলে যোগ দেন। আমাকে এবার

বর্মায় সঙ্গী করে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর স্বার্থ কী তাও প্রকাশ করে বলেন, এতকাল বর্মায় গেলাম, কিন্তু ঐ শুধু রেঙ্গুনেই আটকে থাকা। ইচ্ছা থাকলেও, বর্মার আর কোথাও ঘোরা হয় না। ঘুরতে বেরুব কী, শ্বশুর-বাড়িতেই সবাই মিলে হইচই করে দিন কেটে যায়, তাদের কারও ঘোরা বাতিক নেই। তা ছাড়া শ্বশুর-শাশুড়িও ছাড়তে চান না, বলেন, থাকবে তো এই কয়টা দিন, আমাদের ছেড়ে কোথায় ঘুরতে যাবে—এবার তুমি সঙ্গে থাকলে ঘোরবার সহজেই সুযোগ পেয়ে যাব। শ্বশুরমশায়ও সাহায্য করবেন, বর্মার বহু জায়গায় তাঁর মক্কেল, তাঁদের চিঠি দেবেন।

পূর্ণদা তাঁদের দলের সঙ্গে আমারও জাহাজের টিকিট কাটার ভার নেন। B. I. S. N. (British India Steam Navigation) কোম্পানির জাহাজ—S. S. Arankola। সেকালের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট। পুজো কনসেশন,—'সিঙ্গল ফেয়ার, ডবল জার্নি'—এক তরফের ভাড়ায় যাতায়াত। কলকাতা থেকে রেঙ্গুন যেতে আসতে—বিরানব্বই টাকা মাত্র ভাড়া। অথচ, এই টাকাতেই "সেলুন প্যাসেঞ্জার" —অর্থাৎ কেবিনে থাকার সুব্যবস্থা।

এইবার যাত্রাপথে সেই সময়ে লিখে-রাখা ডায়েরি অবলম্বনে আমার সে-কালের বর্মা ভ্রমণের কাহিনী শোনাই। সে-বর্মার এখন নিশ্চয় বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে, কিন্তু আমার সেই যাত্রার স্মৃতি এখনও অম্লান অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

১৯২৯ সাল। ৬ই অক্টোবর।

কলকাতার গঙ্গার ধারে সেই সুপরিচিত উটরাম ঘাট। অদূরে ক্যালকাটা ফুটবল গ্রাউন্ড। এদিকে ইডেন উদ্যান! ওদিকে হাইকোর্টের বিরাট সৌধ। সবই কত চেনা। তবুও আজ যেন নতুন চোখে দেখি। তার কারণ, জেটিতে গা-লাগিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ঐ Arankola জাহাজ!

জাহাজের ফানেল দিয়ে হুস হুস করে বার হচ্ছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। চারি দিকে কর্মব্যস্ততা। পোর্টাররা মাল নিয়ে উঠছে। যাত্রীরাও দলে দলে চলেছে। জাহাজের ইঞ্জিন চলার শব্দ আসে। ডেকে উঠতেই টের পাই জাহাজের যেন হৃৎস্পন্দন—আমারও বুকে জাগে আনন্দের শিহরণ। জীবনের প্রথম সমুদ্রযাত্রা।

সকাল নটায় জাহাজ ছাড়ে।

পূর্ণদা ও তাঁর সঙ্গীরা কোথায় কি ব্যবস্থাদি করার সব করেন। আমি ডেকের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকি, তীর ছেড়ে জাহাজ কেমন ধীরে ধীরে গঙ্গার মাঝ পথ ধরতে চলে। আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে, অথচ চলেছি। শহরের বাড়িঘর, লোকজন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, আকারে, ছোট হয়ে আসে।

আকাশ-ভরা কালো মেঘ। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও শুরু হয়। পারের গাছপালা ঘরবাড়ি ঝাপসা হয়ে আসে। তবু, বোঝা যায়, পশ্চিমপারে ঐ বোটানিক্যাল গার্ডেন। পুব দিকে আবছা দেখা যাচ্ছে ফোর্টের পিছনে ঐ ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের গম্বুজ। গঙ্গার বুকে, পাশে পড়ে থাকে কত ছোট ছোট নৌকা, স্টিমার, ফ্ল্যাট, অপর জাহাজও কয়েকটি।

আমাদের জাহাজ এগিয়ে চলে। নদীর দুই কূলের ঘরবাড়ি কয়েক মাইল ধরে যেন জাহাজের সঙ্গ রাখে। তারপর দেখা যায় বজবজের পেট্রোল ডিপোগুলি। যেন টাক-পড়া মাথা তুলে ড্যাব ড্যাব করে তাকায়। গঙ্গার এ অঞ্চলের কত বাঁক। বোঝাই যায় না কোন্ দিকপানে জাহাজ চলেছে। দেখছি, ওদিকে গঙ্গার তীরে মাঠের পিছনে, দূরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ভাবি, হয়ত ওদিকে কোন ফ্যাক্টরি আছে। কিন্তু পরে দেখি, গঙ্গা বাঁক ঘুরে বহে চলে সেইদিকে। ধোঁয়া দেখেছি, কলকাতা অভিমুখী অপর এক জাহাজের চোঙ-এর!

পূর্ণদা এসে পাশে দাঁড়ান। বলেন, কেবিনে সব গুছিয়ে রেখে, তোমার বৌদিদের রান্নার ব্যবস্থাদি করে এলাম। চল, ডেক্-চেয়ার টেনে এনে বসি। ওঃ! ঐ তো ওদিকে ফলতা। মাইল ২৭ তাহলে চলে এলাম। নদীর ডানদিকে তাকিয়ে দেখ, ঐ ওখানে গঙ্গায় এসে মিলেছে দামোদর নদ। আর মাত্র মাইল পাঁচেক পরেই ঐ ডানদিকেই এসে যাবে রূপনারায়ণের মোহানা।

অল্প পরে তাই দেখাও যায়। নদীগুলির মিলিত জলধারার কী বিশাল বিস্তৃতি!

বলি, এ যেন সমুদ্রে এসে পড়লাম।

পূর্ণদা হাসেন। বলেন, দেখতে অমন, ঠিকই। কিন্তু, সঙ্গমের উলটো দিকে গঙ্গার ঐ বাঁ পাড়ের কাছে

এ-নদীর ঘোর দুর্নাম, ভীষণ জায়গা, জাহাজ যাতায়াতের পথে যেন মরণফাঁদ পাতা। সেদিকে তাকিয়ে দেখি। বলি, ঐ ওদিকে? ওখানে জলের মধ্যে মাথা তুলে ওটা কী? ডুবে যাওয়া জাহাজের মাস্তুলের অংশ নাকি?

পূর্ণদা জানান, হাঁ; আজ বছর দশেক আগে—১৯১৯ সালে ঐ জাহাজটা ওখানে ডুবে যায়,—S. S. Sanctoria হুগলী নদীর—আমরা যাকে গঙ্গা বলি—ঐ জায়গাটার নাম James & Mary Danger Point—স্থানীয় নাম মুকরাপট্টি। ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে Royal James & Mary নামে ইংরেজদের একটা জাহাজ ঐখানে চরে আটকে ডুবে যায়, তাই থেকে ঐ নামকরণ। তারপরও আরও কয়েকটা জাহাজের ঐখানে সলিল সমাধি হয়।

আশ্চর্য হয়ে বলি, এত জলে চরে আটকে জাহাজ ডোবে!

পূর্ণদা বলেন, এই হুগলী নদী জাহাজ চলাচলের পক্ষে খুবই বিপদসঙ্কুল আর ভয়াবহ। তার কারণ, সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে এ-নদী দেখতে বিশাল। কিন্তু, নদীগর্ভে জলের অল্প নীচেই কোথাও কোথাও কাদা-মাটি-বালি প্রভৃতির থকথকে চর প্রতি মুহূর্তে জন্মাচ্ছে। কখন কোথায়, ওপর থেকে বোঝাই যায় না। এর মধ্যে সব চেয়ে মারাত্মক স্থান হল কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশ দূরে দামোদরের মোহনা থেকে হুগলী পয়েন্ট এই মাইল ছয়েক পথ, বিশেষত রূপনারায়ণের সঙ্গমের অপর পাড়ের দিকে ঐ james & Mary point-এ।

আমি বলি, ডুবে যাওয়া Sanctoria জাহাজের মাস্তুলটা জলের মধ্যে থেকে যেন আঙুল তুলে আর সবাইকে সাবধান করিয়ে দিচ্ছে! তবে, এ কথাও বলা যায় সেই তিনশ' বছর আগে যখন বণিক সেজে বিদেশীরা আমাদের এই বাংলা দেশে ঢুকতে শুরু করল—এই জলপথে, মা গঙ্গা তখনই তাদের মনের গোপন মতলবটি বুঝতে পেরে তাদের যাবার পথে এইভাবে বাধা সৃষ্টি করে আটকাতে চেষ্টা করেন।

পূর্ণদা হেসে বলেন, তা সাহেবরাও কি রকম ফন্দিবাজ! নদীর প্রবেশ পথের এই ভীষণ রূপ দেখে তারাও সেই ১৬৬৭ সালে Bengal Pilot Service-এর পত্তন করে ফেলল। শুরু হয়, পাইলটের সাহায্যে জাহাজের যাতায়াত। এই সব পাইলটরা জানে ও নিত্য খোঁজখবর রাখে, গঙ্গার জলের নীচে কখন কোন্ দিকে এই ধরনের গুপ্ত চর জাগছে, কখন জোয়ার ভাঁটা খেলবে, কখন ঝড়বৃষ্টি সাইক্লোন হতে পারে, কখন ঠিক্ কোন্ দিক দিয়ে জাহাজকে নিরাপদে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঐ দেখ না, আমাদের সঙ্গেও চলেছে পাইলটের লঞ্চ।

আমি বলি, ওঃ! তাই দেখছি লঞ্চটা সকাল থেকে এই জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

পূর্ণদা আরও জানান, এখন অবশ্য নিয়মিত dredging-এর ফলে নদীপথ অনেকটা নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। তবুও, মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে। পাইলট আমাদের সঙ্গে সাগর পর্যন্ত যাবে। (পূর্ণদার দুর্ঘটনার কথাটা যেন ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে যায়। আমাদের যাত্রার পরের বছর—১৯৩০ সালে ঐ James & Mary Point-এর কাছে লবণভর্তি একটা মালবাহী জাহাজ ডুবে যায়,—আর, আশ্চর্য ব্যাপার, —সেই সময়েই শুরু হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহও!) পরে, স্বামী বিবেকানন্দের "পরিব্রাজক" বইখানিতেও দেখতে পাই, গঙ্গার বুকে দামোদর ও রূপনারায়ণ—দুই নদের মোহানার সন্নিকটে এই বিপদসঙ্কুল স্থান—James & Mary-র চড়ার মহাভয়ঙ্করী প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করে গেছেন স্বামীজি তাঁর অপূর্ব ভাষায় :

"নীচে মহাভয়—জেম্‌স্ আর মেরী চড়া। পূর্বে দামোদর নদ কলকেতার ৩০ মাইল উপরে গঙ্গায় এসে পড়ত, এখন কালের বিচিত্র গতিতে তিনি ৩১ মাইলের উপর দক্ষিণে এসে হাজির। তার প্রায় ৬ মাইল নীচে রূপনারায়ণ জল ঢালচেন, মণিকাঞ্চন যোগে তাঁরা ত হুড়মুড়িয়ে আসুন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাজেই রাশীকৃত বালি। সে স্তূপ কখন এখানে, কখন ওখানে, কখন একটু শক্ত, কখনও নরম হচ্ছেন। সে ভয়ের সীমা কি! দিন রাত্র তার মাপ জোপ হচ্চে, একটু অন্যমনস্ক হলেই, দিন কতক মাপ জোপ ভুললেই, জাহাজের সর্ব্বনাশ। সে চড়ায় ছুঁতে না ছুঁতেই অমনি উলটে ফেলা; না হয়, সোজাসুজিই গ্রাস!! এমনও হয়েছে, মস্ত তিন মাস্তুল জাহাজ লাগবার আধঘণ্টা বাদেই খালি একটু মাস্তুলমাত্র জেগে রইলেন। এ চড়া দামোদর-রূপনারায়ণের মুখই বটেন। দামোদর এখন সাঁওতালি গাঁয়ে তত রাজি নন, জাহাজ স্টিমার প্রভৃতি চাট্‌নি রকমে নিচ্চেন। ১৮৭৭ খ্রিঃ অব্দে কলকেতা থেকে কাউন্টি অফ স্টারলিং

নামক এক জাহাজে ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ বিকট চড়ায় যেমন লাগা আর তার আট মিনিটের মধ্যেই "খোঁজ খবর নহি পাই।" ১৮৭৪ সালে ২৪০০ টন বোঝাই একটি স্টীমারের ২ মিনিটের মধ্যে ঐ দশা হয়। ধন্য মা তোমার মুখ! আমরা যে ভালয় ভালয় পেরিয়ে এসেছি, প্রণাম করি।"

সেই জেম্‌স্‌ ও মেরী পয়েন্টই কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে আমরাও এখন নির্বিঘ্নে পেরিয়ে চলেছি।

পূর্ণদা বলেন, স্নান করবে তো চলে যাও স্নান-ঘরে। তোমার বৌদিদের খিচুড়ি রান্না এতক্ষণে হয়ত হয়ে গেছে। এখুনি খাওয়ার ডাক পড়বে।

স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে আবার ডেক-এ এসে বসি।

মাইল ৪৮ এসে ডায়মন্ডহারবার। বাড়িঘর লোকজন আবার দেখা যায়। অলস নয়নে তাকিয়ে থাকি। জাহাজ এগিয়ে চলে। আরও কিছুদূর যাবার পর নদীর দুই কূল আর দেখা যায় না।

৩টা ৪৫-এ সাগর দ্বীপ এসে যায়। এই দ্বীপেরই এক অংশে গঙ্গাসাগর মেলা বসে। দূরে একটা লাইটহাউস। দিগন্তবিস্তীর্ণ জলরাশি। জলের রক্তিমাভ গৈরিক রঙ। মনে পড়ে দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী কাব্য। গঙ্গার সাগরসঙ্গমের রূপ বর্ণন : "পরি তথা শাঁখা শাড়ি সিন্দূর চন্দন,/হাস্যমুখে সাগরে করিল আলিঙ্গন।"

অত জল, তবু জাহাজ দাঁড়িয়ে গেল নোঙর ফেলে—জলেরই অভাবে। শুনি, জোয়ার এলে তবে আবার চলতে শুরু করবে। পাইলট আরও মাইল চল্লিশ দূরে Sandheads পর্যন্ত এগিয়ে দেবে।

সেকেন্ড ক্লাসের অপর বাঙালী যাত্রীদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলাপ হয়। স্বনামখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্‌ রাঁচীর শরৎকুমার রায় সপুত্র চলেছেন বর্মা বেড়াতে। একদল যাচ্ছেন সিঙ্গাপুরে। তাঁরা সেইখানেই থাকেন। কিছুদিনের জন্যে দেশে এসেছিলেন, এখন ফিরে চলেছেন। তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজবে সময় কেটে যায়।

মেঘের আড়ালে কখন সূর্যাস্ত হয়। ধীরপদে গঙ্গার বুকে সন্ধ্যা নেমে আসে।

চার ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর জোয়ার আসে। সাড়ে সাতটায় জাহাজ আবার চলা শুরু করে। এখন আর দূরে দৃষ্টি যায় না। ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা তারা উঁকি মারে। হঠাৎ দেখা যায়, আবার লুকিয়ে পড়ে। জাহাজের মধ্যে আলোর ছটা, বাইরের অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে তোলে। তবু সেই অন্ধকারের বুকে মাঝে মাঝে ঢেউ-এর মাথায় জ্বলে ওঠে ফসফরাসের দীপ্তি।

জাহাজের চারপাশে জলের একটানা ছল্‌ছল্‌ শব্দ।

ডেক চেয়ারে চুপ করে বসে কত কী ভাবতে থাকি। রাত নয়টার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে কেবিনে চলে আসি।

কেবিনগুলি পরিষ্কার। চারজনের বার্থ। জাহাজের গায়ে পুরু কাঁচের গোলাকৃতি জানলা। শুয়ে শুয়ে বেশ বুঝতে পারি, জাহাজ দুলছে। কখন ঘুমিয়ে পড়ি জানি না।

৭ই অক্টোবর।

ঘুম ভাঙে সকাল ছয়টায়। কেবিনের সেই গোল কাঁচের জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখি বাইরে কী গাঢ় নীল সমুদ্র। প্রকৃতই "নীলিমায় নীল"। তারই জল কেটে জাহাজ চলে। যন্ত্রযানের গতির তালে তালে সমুদ্রের বুকে ঢেউ-এর নাচন চলে।

মুখ হাত ধুয়ে আবার ডেক্‌-এ উঠে আসি। কিন্তু, মাতালের মত টলতে টলতে। জাহাজের এত দোলানি। সেখানে পূর্ণদার সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করেন, কেমন ঘুম হল? আমি তো সারারাত ডেকেই শুয়েছিলাম। রাত্তিরে বেশ ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল। টের পাওনি কিছুই? এখনও তাই জাহাজ এত দুলছে দেখছ না? আমি জানাই, একঘুমেই আমার রাত কেটেছে, কিছুই বুঝতে পারি নি। জাহাজ যে খুব দুলছে এখন দেখছি। আমি ভাবলাম, সমুদ্রের বুকে এসে পড়ায় এমন দোলানি।

মনে মনে ভাবি, শুধু ঝড়বৃষ্টি, তাতেই এত দোলা! সাইক্লোন হলে অবস্থা কি হয়! মনে পড়ে, শ্রীকান্তে সেই 'ছাইক্লোনে'র ভীষণ বর্ণনা!

ডেক্‌-এর রেলিঙ ধরে দাঁড়াই। অসীম নীল সমুদ্র। তারই বুকে এই প্রকাণ্ড জাহাজ যেন মোচার খোলা! এখন আকাশ প্রায় মেঘশূন্য। সেখানেও প্রকৃতির নীল রঙের প্রলেপন, কিন্তু কেমন যেন হালকা,

স্বচ্ছ, মসৃণ। স্থির অচঞ্চল। আর, সমুদ্রের রঙ যেন গাঢ়-নীল কালি ঢালা। সদা চঞ্চল। উচ্ছল, উদ্বেল। দূরে ঢেউগুলির মাথায় সাদা ফেনার যেন ফুলের মালা-পরা। নিকটের ঢেউগুলি জাহাজের গায়ে ধাক্কা দিয়ে ফিরে চলে। অল্প যেতেই এগিয়ে-আসা অপর ঢেউ-এর সংঘর্ষে আকাশপানে লাফিয়ে ওঠে, ফোয়ারা হয়ে ছিটিয়ে পড়ে। চারিপাশে তারই ছলচ্ছল শব্দ।

নাঃ। সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ঢেউগুলির এই জলখেলা দেখা হল না। একে জাহাজ বড় বেশি দুলছে, তার ওপর জলের পাইপ হাতে কয়জন খালাসী এল ডেক্ ধুতে। বিলেতী জাহাজ। সব সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা। কেবিনে ফিরে চলি। সেখানে সঙ্গী পূর্ণদার এক ভায়রাভাই, ললিতবাবু, বিছানা ছেড়ে উঠে আবার শুয়ে পড়েন। তারপরই আবার উঠেই তাড়াতাড়ি বেসিনের কাছে এগিয়ে যান। শুরু হয় বমি করা। সারাদিন তিনি আর বিছানা ছাড়েননি। আমাদের দলের একমাত্র তিনিই সমুদ্র-পীড়ায় অতিরিক্ত কাবু হন। সুমুখের কেবিনে এক মহিলারও ঐ দুর্দশা।

আমারও শরীর কেমন যেন ভাল লাগছে না। আহারের স্পৃহা নেই। সারাদিন ডেক্-এই শুয়ে থাকি। ডেক্-এ আজ লোকজন খুবই কম। কে কোথায় কীভাবে পড়ে রয়েছেন, কী জানি। কেবলই মনে হচ্ছে, লোকে সমুদ্র-যাত্রায় আসে কীসের আকর্ষণে? সারাক্ষণ এত দোলানি কি ভাল লাগে?

ডেক্-এ পায়চারি করি। কখনও বা রেলিঙ-এর ধারে দাঁড়িয়ে অকূল সমুদ্রের শোভা উপভোগ করার চেষ্টা করি। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে, জাহাজের নিকটের ঢেউগুলির উপর। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ুক্কু মাছ—flying fish—একটা ঢেউ-এর মাথা থেকে আর এক ঢেউ-এ বাতাসে উড়ে চলে। যেন বনের মধ্যে এক গাছের ঝোপ থেকে আর এক ঝোপে ফুরুৎ করে উড়ে যায়, অদৃশ্য হয়। তবে এ মাছগুলি খুব ছোট ছোট। মনে হয়, রূপালি রঙ, আলো লেগে চিক্‌মিক্ করে। কখনও কখনও একটা দুটো নিঃসঙ্গ মাছও উড়ে যায়। আমার এই প্রথম সমুদ্র যাত্রা, উড়ুক্কু মাছও দেখা। দেখে আনন্দ পাই। ভাবি, এ-যুগে জাহাজ চলে আকাশ পথে, আর এখন দেখি, মাছ ওড়ে সাগর জলে।

পরে, এই বিচিত্র-স্বভাব মাছ সম্পর্কে এক বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রে কয়েক ধরনেরই উড়ুক্কু মাছ—flying fish দেখা যায়। উষ্ণ ও স্বল্প-উষ্ণ অঞ্চলে এই জাতির মাছকে বলা হয় Exocaetus এক্‌সসিটাস। জলে বাস করেও অতর্কিতে জলের বাইরে এসে এক থেকে ছয় মিটার উপর দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য হাওয়ায় ভেসে গিয়ে আবার জলে ডুব দেয়। এইসব মাছের মধ্যে হাওয়ায় ওড়বার অনুকূল দৈহিক অভিযোজন স্পষ্ট। এদের বক্ষ পাখনাটি উন্নত ও প্রসারিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া পুচ্ছ পাখনাটিও 'গ্লাইডিং'-এর সহায়ক। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, দুই থেকে চার সেকেন্ড পর্যন্ত হাওয়ায় এরা ভাসতে পারে এবং সেই সময় তাদের প্রচণ্ড দৈহিক গতিবেগ লক্ষ্য করা যায়,—প্রায় চল্লিশ থেকে সত্তর কিলোমিটার ঘণ্টায় হতে পারে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে সেই অতি ক্ষুদ্রকায় মাছগুলির বিদ্যুৎদ্বেগে ওড়বার খেলা দেখতে থাকি।

বিকেল চারটেয় পূর্ণদার উপদেশে আবার একবার স্নান করে আসি। সমুদ্রজলে স্নান, কিন্তু জলে না নেমে। পরিচ্ছন্ন সাজানো স্নানঘরে "শাওয়ার"-এর নীচে দাঁড়িয়ে ধারাস্নান। বেশ অনেকক্ষণ ধরে করি। আরাম বোধ হয়। দেহ মন আবার প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

ডেক্-এ ফিরে এসে পায়চারি করি। ওপাশে একটা রেলিং-এর বেড়া। অপর দিকে প্রথমশ্রেণীর ডেক্। কয়জন সাহেব-মেম ডেক্-টেনিস খেলছেন। এক বাঙালী মহিলা যাত্রী ওপাশ থেকে পূর্ণদাকে দেখে এগিয়ে আসেন। দুজনের কথাবার্তা হয়। পূর্ণদা জিজ্ঞাসা করেন, একা দেখছি। কর্তা কোথায়? মহিলা মৃদু হেসে বলেন, আজ আর কেবিন ছেড়ে উঠে আসার ক্ষমতা নেই, শুয়ে পড়েছেন। কাল সারাদিন রঙিন জলে ডুবে ছিলেন, তার ওপর আজ সাগর জলের দোলানি।

কিছুক্ষণ গল্প করে তিনি ফিরে যান। পূর্ণদাকে প্রশ্ন করি, কর্তাটি কে?

পূর্ণদা বলেন, নাম শুনে চিনতে পারবে। কলকাতা পুলিশের সেই ডেপুটি কমিশনার—

আশা করেছিলাম, আজ সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখব। কিন্তু, পশ্চিম আকাশ মেঘে ঢাকা। অরুণদেব তারই আড়ালে কখন অন্তর্ধান করেন, বোঝা যায় না।

আজ রাত্রে আমিও ডেক্-এ পূর্ণদার পাশে শয্যা পাতি। সারারাত ডেক্-এই কাটাই। চমৎকার হাওয়া। ঘুমও হয় গভীর।

রাত তখন তিনটে। পূর্ণদার ডাকে ঘুম ভাঙে। তিনি বলেন, তাকিয়ে দেখ আকাশের ঐ দিকে।

ও কী! এখনই ভোরের আলো ফুটছে। না তো। রজনীর অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের সেই দিগন্তে আলোর দীপ্তি যেন একবার উজ্জ্বল হয়ে আবার ম্লান হয়ে যায়। আবার ফুটে ওঠা, আবার মিলিয়ে যাওয়া। এইভাবে অবিরাম আলো আঁধারের খেলা চলে। দিগন্তে মেঘের বুকে যেমন থেকে-থেকে বিদ্যুৎ চমক দেখা যায়, এ-যেন তেমনি জ্বলা-নেভা। অথচ, এখানে বিদ্যুল্লতা নেই, আলোর উৎসমুখও অদৃশ্য।

পূর্ণদা জানান, বুঝতে পারছ না,—Alguada Light House আসছে, তারই আলোর আভা।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি। ডেক্ চেয়ারে বসে কালো আকাশের নীচে আলো-আঁধারির সেই খেলা দেখতে দেখতে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিই।

৮ই অক্টোবর।

ভোর হয়ে আসে। সাড়ে পাঁচটায় কিছু দূরে আলগুয়াডা লাইট হাউস দেখা যায়। স্তম্ভের মাথায় আলো ঘুরে ঘুরে জ্বলছে, তবে দিনের আলো রাত্রির সেই মায়াময় দৃশ্যের অপরূপ শোভা হরণ করেছে। সমুদ্রের জলের সুনীল বর্ণও এখন আর নেই। সবুজ হয়ে এসেছে। ঢেউও খুব কম। জাহাজের দোলানিও নেই।

পূর্ণদা জানান, আমরা Gulf of Martaban-এ পড়েছি। এখান থেকে রেঙ্গুন পৌঁছুতে বারো ঘণ্টা লাগে।

মার্টাবান উপসাগর দিয়ে জাহাজ এগিয়ে চলে। দূরে বর্মার তীরভূমির ক্ষীণ রেখামাত্র দেখা যায়। ঐ অঞ্চলে ব্রহ্মদেশের গঙ্গাস্বরূপা নদীমাতা ইরাবতীর সাগর সঙ্গম,—বহু ব-দ্বীপ। এরই পূর্বপ্রান্তের এক ধারা রেঙ্গুন নদ। সেই নদীতে প্রবেশ করে জাহাজ রেঙ্গুন পৌঁছুবে।

মাঝে মাঝে আরও কয়েকটি লাইট হাউস মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। কিছু দূর দিয়ে কলকাতা-মুখী মেল জাহাজ চলেছে দেখা যায়। সেখানেও ডেক্-এ লোকজন। বেশ লাগে দেখতে। কেউ আসে, কেউ যায়! দুই জাহাজেই গুরুগম্ভীর ভোঁ-ও-ও বংশীধ্বনি বাজে। যেন, বনের এক প্রান্তের পাখি অপর প্রান্তের সঙ্গীর ডাকে সাড়া দেয়। বাঁশীর শব্দ সাগর তরঙ্গে যেন ভেসে গিয়ে দূরদূরান্তে দিগন্তে বিলীন হয়।

বেলা দশটায় স্নান সেরে আসি। উপসাগরের জল ক্রমশ অপরিষ্কার ও ঘোলাটে হয়ে আসে। এখানের জলের নীচে Shoal—অদৃশ্য চরের অস্তিত্ব থাকার আশঙ্কা। তাই পাইলট এসে নিয়ে যাবে। বেলা আড়াইটার সময় আসেও। রেঙ্গুন পৌঁছতে আরও তিন ঘণ্টা লাগার কথা। ছয়টার মধ্যে না পৌঁছলে যাত্রীদের জাহাজেই রাত কাটাতে হবে। ছয়টার পর নামার হুকুম নেই।

কেবিনে মালপত্র গুছিয়ে রেখে ডেক্-এ এসে অপেক্ষা করি। জলের রঙ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। গাঢ় সবুজ। বেলা চারটেয় তীরের গাছপালা সুস্পষ্ট দেখা গেল,—যেন সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখছে। জল আরও ঘোলা হয়ে আসে। জাহাজ তীরের কাছে চলে আসে, বেঁকে রেঙ্গুন নদে প্রবেশ করে। নদীর অতি অপরিষ্কার জল কলকাতার গঙ্গার জলের চেয়ে ঘোলাটে। এখন দুই পাশে তীর ভূমি। নদীর বিস্তৃতি ক্রমশই কমে আসে। একদিকে বর্মা অয়েল কোম্পানির ডিপো। অপর তীরে সবুজ খেত। তাল নারিকেল কুঞ্জ। ছোট ছোট গ্রাম। মাথা তুলে মাঝে মাঝে প্যাগোডা। বর্মা যে প্যাগোডার দেশ,—তারই প্রমাণ দিতে যেন এগিয়ে আসে।

জাহাজও যেন লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সবেগে চলে। বেলা পাঁচটা। রেঙ্গুন শহরের ঘরবাড়ি দেখা দিল। যাক, সময় মতই পৌঁছে গেছে!

দূরে আকাশপানে মাথা তুলে রেঙ্গুনের সুপ্রসিদ্ধ সোয়েডাগন প্যাগোডার স্বর্ণকান্তি চূড়া।

শহরে পৌঁছানোর আগে ডানদিকে পেগু নদী এসে মেশে। আর খানিক এগুলেই রেঙ্গুন ডক। কিন্তু জাহাজ গেল দাঁড়িয়ে! ব্যাপার কী? কূলে এসে থেমে যাওয়া! অপর দুটো লঞ্চ এসে জাহাজের গায়ে লাগে। লঞ্চ থেকে পুলিশ ও আরও কয়েকজন সরকারী অফিসার সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে ওঠে। পুলিশ দেখেই মনে পড়ে, 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর সন্ধানে রেঙ্গুনের জাহাজঘাটে পুলিশ অফিসার নিমাইবাবুর সঙ্গে অপূর্বর কথাবার্তা! ভাবি এ-জাহাজ থেকেও কী রামধনু রঙের জামা গায়ে গিরীশ মহাপাত্র নামবে?

নাঃ। সে সব কিছু নয়। যাত্রীদের এটা সরকারী মামুলী পরীক্ষার ব্যাপার। সকলের ডাক পড়ে ডাইনিং হলে। ডাক্তার, পুলিশ ও কাসটমস্-এর চেকিং। নাম ধাম. এখানে কোথায় থাকব, কী উদ্দেশ্যে

আসা ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব লিখে নিয়ে নাম সই করিয়ে খালাস।

উপরে এসে দেখি, ইতিমধ্যে জাহাজ ধীরে ধীরে কখন এগিয়ে এসে ডক্-এ লেগেছে। হুড়মুড় করে কলিঙ্গদেশীয় কুলির দল জাহাজে ঢুকছে।

ডক্-এ অপেক্ষা করছেন পূর্ণদার শ্বশুর মহাশয়। জামাই-মেয়েদের সঙ্গে আমিও সাদর অভ্যর্থনা পাই। দেরি না করে সবাইকে তিনি তখনই মোটরে বাড়ি নিয়ে চলেন। বলেন, মালপত্র আমার লোক নিয়ে আসবে।

তখনও সন্ধ্যা নামেনি। নদীর ধারে স্ট্রান্ড রোড। তার পিছনেই মার্চেন্ট স্ট্রীট। সম্ভ্রান্ত পল্লীর মধ্যে ৩৪৬ নং মার্চেন্ট স্ট্রীটে অটলবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি। কয় মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাই। কদিন একটানা জলযাত্রার পর তখনও মনে হয় যেন পা-দুটি টলমল করে!

৯ই অক্টোবর।

সকালে উঠে মনে হয়, একী সত্যিই বর্মায় রয়েছি।

অটলবাবুর বাড়ির ভিতর সম্পূর্ণ বাঙলা দেশের পরিবেশ। প্রকাণ্ড হলঘরে আসর বিছানো। ওদিকে একপ্রান্তে পূজামণ্ডপ। জ্বল্‌জ্বল্ করে দুর্গাপ্রতিমা। কৃষ্ণনগরের কারিগরের হাতে গড়া। তেমনি ডাকের সাজ। দেবীদুর্গাও যেন এলেন বর্মা বেড়াতে! আজ ষষ্ঠীপূজা। বাড়ি ভরতি লোকজন। চারিদিক আনন্দ কলরব মুখর।

পূর্ণদা জানিয়েছেন, পূজার কয়টা দিন কেটে যাক, তারপর বর্মা ঘুরতে বেরোনো যাবে। এ কদিন রেঙ্গুন ও আশেপাশে যতটা পার দেখে নাও। বাড়ির মোটর রয়েছে। আমরা যে যখন পারি সঙ্গে থাকব।

১০-১১ই অক্টোবর।

সেইমত এ কদিন মোটরে দু'বেলা ঘোরা হয়।

রেঙ্গুন ব্রিটিশ শাসকদের গড়া বর্মার প্রধান শহর। শুনি, ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে Shwebo-র গ্রামপ্রধান Alaungpaya ইংরেজদের সহায়তায় তখনকার Talaing বংশীয় বর্মার রাজার রাজ্য জয় করেন। Talaing-দের পক্ষে ছিলেন ফরাসীরা। উত্তর বর্মা থেকে যুদ্ধ করতে করতে Alaungpaya দক্ষিণাঞ্চলে নেমে আসেন। সোয়েডাগন প্যাগোডা দখল করেন। যুদ্ধও শেষ হয়। প্যাগোডার সমীপবর্তী গ্রামের নামকরণ করেন—Yan-gon ("the end of strife"); "যুদ্ধাবসান",—সেই ইয়ানগন থেকে রেঙ্গুন! সেই Alaungpaya বংশের শেষ রাজা Theebaw, যাকে পরাজিত করে ইংরেজরা সম্পূর্ণ বর্মাদেশ দখল করে। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দেও রেঙ্গুন জেলেদের একটা ছোট গ্রাম মাত্র ছিল। আর এখন বম্বে ও কলকাতা বাদে ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবসা বন্দর। ব্রিটিশদের প্ল্যান করে তৈরি শহর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা,—যেন রুল পেতে ছক কেটে তৈরি। সোজা ও সমান্তরাল। বাড়িগুলিও সুন্দর দেখতে। ইট পাথরের বাড়ির চেয়ে কাঠের বাড়িই বেশি। signal pagoda road-এর নাকি খ্যাতি—"best road in the east"! প্রকাণ্ড চওড়া, চারটে ফুটপাত—তিনটে রাস্তা। যানবাহন দেখি ট্রাম, বাস, মোটর, ঘোড়ার গাড়ি ও রিক্‌শ। তবে, আমাদের কলকাতার ট্রামের মত, ট্রামগুলি অত ভাল নয়। বাসও চালু হয়েছে শুনি মাত্র বছর তিনেক, শহরও কলকাতার তুলনায় অনেক ছোট। মাত্র ২৮ বর্গ মাইল জুড়ে ছড়ানো।

বর্মার রাজধানী, অতএব গভর্নমেন্ট হাউস, সরকারী দপ্তরের অট্টালিকা, হাসপাতাল, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, জেল, কাছারি, হাইকোর্ট, ইত্যাদি তো রয়েছেই। শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে অতি রমণীয় পরিবেশে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ও। ছাত্ররা প্রায় সবাই আবাসিক। পাশেই একটা হ্রদ—Kokine lake। সেখানে ইউনিভার্সিটির "বোট হাউস," লেকের ধার দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত রাস্তা চলে যায়। ঐদিকে Mingladon, নতুন সেনাবাস—ক্যান্টনমেন্ট। সেদিকেও ঘরে আসি। একটা ছোট গিরিশ্রেণীর উপর বাড়িঘর। পাহাড়ের মাথায় Wireless টেলিগ্রাফ পোস্ট। নিকটে একটা টিলার উপর প্যাগোডা। সেখান থেকে দূরে Hlawga Lake দেখা গেল। এই অঞ্চলের সব চেয়ে বড় হ্রদ। পাহাড়ী নদীর মুখে বাঁধ দিয়ে সৃষ্টি। রেঙ্গুন শহরের জল সরবরাহ হয় সেই হ্রদ থেকে। Royal Lake-ও একদিন দেখে আসি। সেও প্রাকৃতিক হ্রদ নয়। হ্রদের মাঝে কয়েকটি দ্বীপ। হ্রদের ধারে সাজানো বাগান—ডালহৌসি পার্ক। একপাশে সাহেবদের রেঙ্গুন ক্লাব, "বোট হাউস"। নিকটে বিশাল ময়দান। Phayre Road দিয়ে ফিরে আসতে

ভাবি, এই কি সেই "ফায়ার মদয়ান,"—যেখানে পথের দাবীর সুমিত্রার সভানেত্রীত্বে সেই মিটিং,—অপূর্বর বক্তৃতা দিতে নার্ভাসনেস, পুলিশের হানা।

কিন্তু, ইংরেজদের শহর সাজানোর এত আয়োজন সত্ত্বেও রেঙ্গুন শহরের শিরোশোভা,—সোয়েডাগন প্যাগোডা। প্রকৃতই যেন নগরের মাথায় মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণমুকুট। জাহাজ থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একদিন সকালে সেইখানে চলি। সঙ্গে মন্টুবাবু—পূর্ণদার আর এক ভায়রাভাই। তিনি বর্মাতেই থাকেন। এখানকার অনেক কিছুই জানেন।

সোয়েডাগন প্যাগোডা—বা Golden Pagoda। স্ট্রান্ড থেকে মাইল দুই মাত্র দূরে। একটা ছোট পাহাড়ের উপর। পথ থেকে প্রায় ১৭০ ফুট উঁচুতে তৈরি। আমাদের দেশের মন্দিরের মত দেবালয় নয়। বৌদ্ধ স্তূপের মত ইটের তৈরি চুনাবালি পলেস্তারার উপর সর্বাঙ্গ সোনার পাত দিয়ে মোড়া। বিশাল নিরেট স্তূপ। যেন, আকাশ থেকে ঝুলিয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখা এক অতিকায় স্বর্ণঘণ্টা। এরই ভিতর বুদ্ধদেবের relics আছে। প্রবাদ, শুধু গৌতম বুদ্ধেরই নয়, তাঁর পূর্ববর্তী তিন বোধিসত্ত্বেরও। বর্মাদেশের বাইরেও—বিশেষত থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়া, শ্যাম, কোরিয়া ও সিংহল প্রদেশের হীনযান বৌদ্ধদের এই প্যাগোডা এক পবিত্রতম তীর্থক্ষেত্র। অগণিত যাত্রী আসে বিভিন্ন দেশ থেকে। সুপ্রাচীন তীর্থ বলে খ্যাতি। বৌদ্ধদের ধারণা, খ্রিস্টপূর্ব ৫২৮ সালে গৌতম বোধিলাভ করার পর ব্রহ্মদেশ থেকে Taphussa ও Bhallika নামে দুই Talaing শ্রেষ্ঠী ভারতে যান ও বুদ্ধদেবের দর্শনলাভ করেন। তাঁদের বিশেষ অনুরোধে বুদ্ধদেব তাঁর আটটি কেশ তাঁদের উপহার দেন। বর্মার রাজা ঐ টিলার উপর প্রথমে ৬৬ ফুট উঁচু প্যাগোডা তৈরি করে সেই সুপবিত্র কেশগুচ্ছ সংরক্ষণ করেন। ক্রমশ সেই ক্ষুদ্রকার স্তূপের উপর বর্মার বিভিন্ন নৃপতির ও ভক্তবৃন্দের প্রচেষ্টায় ক্রমান্বয়ে ইটের আস্তরণ পড়ার ফলে প্রায় পাঁচশ বছর আগের প্যাগোডা এখানকার এই বিরাট আকার লাভ করে। এখন এর উচ্চতা ৩৬৮ ফুট। প্যাগোডার গায়ে সোনার পাত লাগানো এই তীর্থক্ষেত্রের যাত্রীদের এক প্রথা। ভাবি, এত সোনা আসে কোথা থেকে। মন্টুবাবু জানান, উত্তর বর্মায় সোনার খনি আছে, চীন থেকেও আমদানী হয়। এই প্যাগোডায় নাকি এখন পঁচিশ টন সোনা ও একশ টন রূপার আবরণ রয়েছে!

পাহাড়ের পাদদেশে গাছপালা। তারই ছায়া ঘেরা নিভৃতিতে তপোবনের মত বৌদ্ধ মঠ।

পাহাড় ঘিরে চারদিকে দুর্গের মত খাল কাটা।

মন্টুবাবু বলেন, ইংরেজরা রেঙ্গুন জয় করে এইখানে প্রথম সেনানিবাস—ক্যানটনমেন্ট করে। এখন Mingladon-এ নতুন হয়েছে সেদিন দেখে এলেন।

প্যাগোডায় যাওয়ার জন্য পাহাড়ের গা বেয়ে চারপাশে চারটি পথ। ইট দিয়ে বাঁধানো ধাপের পর ধাপ। মাথার উপর কাঠের আচ্ছাদন। সিঁড়ি শুরু হবার আগেই তোরণ। দুই পাশে বিরাট দুই দ্বাররক্ষীর ভীষণাকার মূর্তি,—মানব আকার নয়—leogryphs: সিংহাকৃতি। শ্বেতকায়, রক্তচক্ষু, রক্তবরণ মুখ ব্যাদান করে যেন প্রহরারত।

প্রবেশপথে বিজ্ঞপ্তি টাঙানো,—পাদুকা-পায়ে যাওয়া নিষেধ "except govt. officers on duty for public peace and order" এবং "Soldiers in uniform on duty."

মন্টুবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, জুতো রেখে যাব কোথায়?

তিনি জানান, দুশ্চিন্তার কারণ নেই। জুতা পায়ে দিয়ে যাওয়াই বারণ, হাতে করে নিয়ে যেতে পারেন।

দেখি, সবাই তাই যাচ্ছেও। ভাবি, বাঃ! এ তো ভারি মজার সমাধান।

ধাপ বেয়ে উঠতে থাকি। আমরাই, শুধু নয়। যাত্রীর স্রোত চলেছে।

রেঙ্গুনে এসে পর্যন্ত নজর করেছি, পথে-ঘাটে সর্বত্রই বর্মীদের বেশভূষার সুশোভন সাজসজ্জা। মেয়ে পুরুষ সবারই পরনে লুঙ্গি। অধিকাংশেরই দামী ভালো সিল্কের। পুরুষদের লুঙ্গি সাধারণত চেক-কাটা অথবা একরঙা বা সাদা। ঝুলে মেয়েদের চেয়ে ছোট। কোমরে চামড়ার বেল্ট। মেয়েদের লুঙ্গি প্রায় মাটি ছোঁয়। হয়ও নানা রঙের নক্‌শা বা ফুলকাটা। পুরুষদের গায়ে চীনে কোটের মত কলার-বিহীন সাদা খাটো জামা। পুরো হাতা। মেয়েদের গায়ে সাদা জ্যাকেট,—ব্লাউস্-এর মত। পুরুষদের সবারই মাথায় হাত তিন-চার লম্বা সিল্কের কাপড়ের ফের দিয়ে জড়ানো পাগড়ি-মতন। নাম শুনি gaung-baung।

তার এক অংশ কানের কাছে ঝোলে। পাগড়ির নীচে পুরুষদের মাথায় লম্বা চুল। কিন্তু, মুখে দাড়ি গোঁফের বালাই নেই,—প্রায় সবাই মাকুন্দ। মেয়েদের মাথায় আবরণ নেই। চূড়াবাঁধা খোঁপার শোভা। ডান কানের কাছে চুলে গোঁজা অর্কিড বা অন্য ফুল। বর্মী মেয়ে পুরুষ মাত্রেই শৌখিন, সৌন্দর্যপ্রিয়।

সোপান-পথের দুই পাশে সারি সারি দোকান। এ-যেন কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে যেতে গলি-পথ। দু-দিকে কত রকম জিনিসের দোকানপাট। এখানে অবশ্য প্রায় সবই পূজার সামগ্রী। ফুলের দোকানে গুচ্ছ গুচ্ছ পদ্মফুল, রাশি রাশি জুঁই, বেলি প্রভৃতি। ওদিকে বিক্রি হচ্ছে,—মোমবাতি, ধূপ,—সোনার পাত। ফল ও নানারকম খাবার। কাগজের পতাকা, ছোট ছোট ঘণ্টা, ড্রাম আকারের বাজনা, ছোট বড় বুদ্ধমূর্তি। পূজার তৈজস পত্রাদিও আছে। সর্বত্রই বেচাকেনা চলেছে। যাত্রীরা প্রায় সবাই কিছু-না-কিছু কিনছেই। তীর্থক্ষেত্রের ভিখারী। পথের পাশে তারাও রয়েছে দেখি।

ধাপ বেয়ে উঠতে এইসব দোকানপাট যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনি আবার চোখে পড়ে, পথের দুপাশে দেওয়ালে, কাঠের বা ইটের থামগুলিতে এবং মাথার উপর কাঠের ছাদে নানান কারুকার্য ও কতরকম ছবি আঁকা,—অধিকাংশই জাতকের কাহিনী।

পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে যাই। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। তারই উপর লীলায়িত ছন্দে যেন সোনার কুণ্ডলী পাকিয়ে বিরাট প্যাগোডা আকাশ পানে উঠে গেছে। প্যাগোডার পাদদেশের ব্যাস ১৩৫৫ ফুট। সারা অঙ্গ স্বর্ণমণ্ডিত। বহু উপরে সেই চূড়ার মাথায় ছাতার মতন এক আচ্ছাদন,—নাম শুনি "hti",—তার গায়ে ঝোলে অগণিত সোনা-রূপার ঘণ্টা বা অশ্বত্থ পাতার মত শতশত সোনা-রূপার পাত। সারাক্ষণই হাওয়ায় সেগুলি দোলে। মৃদুমধুর টুংটাং শব্দ তোলে। দিগন্ত যেন গুনগুন স্বরে আরাধনা করে।

এই বিশাল প্যাগোডা ঘিরে অঙ্গনের চতুর্দিকে ছোটবড় আরও বহু প্যাগোডা। শুনি, বড় প্যাগোডা ৪টি, ছোট ৬৪টি।

বুদ্ধদেবের নানান মূর্তি। মোজেকের ও রঙ-বেরঙের কাঁচ বসানো অনেক মন্দিরও। কোথাও গরুড় স্তম্ভের মত হংসস্তম্ভ। কোথাও বা অতিকায় হস্তীমূর্তি, সিংহাকৃতি দ্বারপাল। অপরূপ কারুকার্যময় এক কাঠের আচ্ছাদনের নীচে মহাপরি-নির্বাণ বুদ্ধিমূর্তি। একস্থানে দুই থামের মাথায় রাখা cross beam-এ ঝোলে মস্ত ঘণ্টা. নীচে মাটিতে রাখা হরিণের শিঙ, যাত্রীরা সেই শিঙ দিয়ে ঘণ্টাধ্বনি করে প্যাগোডা পরিক্রমায় এগিয়ে চলে। কোথাও বুদ্ধদেবের মূর্তির সামনে করজোড়ে বসে যাত্রীদল—মূর্তির সামনে ফুলের রাশি, বাতির সারি, ধূপের সুরভি। চারিদিকে যাত্রীদের রঙ-বেরঙের সাজসজ্জা ও সহজ স্বচ্ছন্দ ঘোরাফেরা দেখে মনে হয় পূজা-আরাধনাও যেন তাদের প্রাণখুলে আমোদ-আহ্লাদেরই উৎসব।

প্রাঙ্গণের এক অংশে জটলা দেখে এগিয়ে যাই। এখানেও জ্যোতিষী। কয়েকজন হাত দেখাচ্ছেন, কী সব গণনা করাচ্ছেন।

ঘুরতে ঘুরতে উত্তর-পূর্ব কোণে আসি। চিত্রিত কাঠের মণ্ডপে ওটা কী দেখা যায়? মন্টুবাবু বলেন, চলুন, দেখবেন প্রকাণ্ড এক ঘণ্টা ঝুলছে।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, কী বিরাট ঘণ্টা! এতবড় যে ছয়-সাত জন মানুষ তার তলায় গিয়ে অনায়াসে দাঁড়াতে পারে।

মন্টুবাবুর কাছে এ ঘণ্টার এক কাহিনী শুনি। ১৮৫২ সালে দ্বিতীয় বর্মা-যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজরা এই বিশাল ঘণ্টা ট্রফি স্বরূপ কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যাওয়ার পথে নদীগর্ভে এটি ডুবে যায়। ইংরেজ ইঞ্জিনীয়াররা বহু চেষ্টা করেও জল থেকে এটি উদ্ধার করতে পারে না। ঘণ্টা সেই ভাবেই পড়ে থাকে। ক'বছর পরে বর্মীরা ইংরেজদের কাছে আবেদন জানায়, তারা যদি ওটি উদ্ধার করতে পারে তবে সোয়েডাগন প্যাগোডায় আবার যথাস্থানে সেটি রাখতে দিতে ইংরেজরা সম্মত কিনা। অত বড় বিশাল ভারী ঘণ্টা বর্মীদের পক্ষে জল থেকে তোলা অসম্ভব বিবেচনায় ইংরেজরা অনুমতি দেয়। বর্মীরাও বহু বাঁশ ইত্যাদি এনে আশ্চর্য উপায়ে ঘণ্টা জল থেকে উদ্ধার করে। এখানে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাঙ্গণের কয়েকটি অংশে ফুঙ্গীদের—অর্থাৎ বৌদ্ধভিক্ষুদের পরিচালিত পাঠশালাও দেখি। এক জায়গায় ছাত্ররা পড়ছে দেখে কিছুক্ষণ দাঁড়াই।

মন্টুবাবু বলেন, প্রাচীনকাল থেকে বর্মীদের একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হল এই সব বিদ্যায়তন।

এগুলিকে বলা হয় pongyi kyaung ফুঙ্গীচঙ্। বর্মার প্রতিগ্রামে একটি করে থাকবেই। এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৮৪জন হীনযান বৌদ্ধ। তাঁদের প্রথা হল, প্রতি ছেলেকে অন্তত কিছুকাল মঠে বাস করে ফুঙ্গীদের কাছে শিক্ষা লাভ করতেই হবে। একে বলা হয়, shin-pyu। আমাদের সেকালের গুরুগৃহে বাস করার মত ৬-৭ বছর বয়সের ছেলেদেরও পাঠানো হয়। সেখানে সবাইকে ভিক্ষুদের মত গেরুয়া পরে, মাথা কামিয়ে, মঠের কঠোর নিয়মাদি পালন করে থাকতে হয়। কয় বছর পরে সে ইচ্ছা করলে বাড়িতে ফিরে আবার সাধারণ জীবনযাপন করতে পারে, আবার কারও যদি সন্ন্যাস জীবনেই মন বসে যায়,—তার ১৯ বছর বয়স হলে বাবা-মার অনুমতি নিয়ে, মঠে পুরোপুরি ভিক্ষু হয়ে থেকে যেতে পারে। বাবা মা'রও তাতে আপত্তি থাকে না। নিজের ছেলেকে ভিক্ষু হতে দেওয়া বর্মী মাত্রেরই বিশ্বাস, এক মহা পুণ্যকর্ম। প্রত্যেক বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী বর্মীর অন্তত কিছুকালের জন্য ফুঙ্গী হওয়া অবশ্য করণীয়। এই সব কারণে এ দেশে ফুঙ্গীরাই সবচেয়ে শিক্ষিত। দেশের যা কিছু ভাল কাজ তাঁরাই করে থাকেন।

এখানে তাকিয়ে দেখি, সেই রকমই সব গেরুয়া-পরা মাথা-কামানো ক্ষুদে সন্ন্যাসী বালকের দল পড়ছে। দু-একজন এধারে-ওধারে ঘুরছেও। কিন্তু একটা দৃশ্য দেখে খুবই অবাক হই। শিক্ষাগুরুর সামনে বসেই তাদের কেউ কেউ নিঃসঙ্কোচে লম্বা চুরুট টানছে। আমার অন্যভস্ত চোখে অতি কুৎসিত লাগে। মন্টুবাবুকে বলি, এ কী ব্যাপার!

মন্টুবাবু হেসে বলেন, ওঃ। আপনার বুঝি ওটা নজরে পড়েছে? আমার এখন আর ও-সব চোখেই ঠেকে না। ধূমপান এখানে বর্মীদের অতি সাধারণ অভ্যাস। ছেলেমেয়ে সবাই করে যখন তখন, এদেশে এর এতই প্রচলন যে কেউ এটা দূষণীয় মনে করে না। তবে, শুনেছি এতে তামাকের ভাগ খুবই কম থাকে, শুধু অত বড় চুরুট মুখে রেখে চিবানো ও ধোঁয়া ছাড়ার মধ্যে যা নেশা। আমাদের দেশে পান খাওয়া যেমন সাধারণ ব্যাপার, এখানে চুরুট খাওয়া অনেকটা সেই রকম।

আমি বলি, ঐ যে ফুঙ্গী অধ্যাপকটি বসে পড়াচ্ছেন, তাঁরও তো মনে হয় পান খেয়ে ঠোঁট লাল টক্‌টক্ করছে, দাঁতগুলোও পানের ছোপে লাল!

মন্টুবাবু বলেন, বর্মীরা পানও খায় বেশি। বিশেষত ফুঙ্গীরা; আবার চুরুট খাওয়া নিষেধ। এ ছাত্রগুলি এখনও সন্ন্যাসদীক্ষা পায়নি, তাই চুরুট খাচ্ছে।

ভাবি, দেশকাল আচার ভেদে ভালোমন্দের বিচারবোধেরও কতই না পার্থক্য।

বিশাল প্যাগোডা ঘুরে ঘুরে দেখতে বেলা হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে চলি।

এই প্যাগোডাগুলির আর এক রূপ খোলে রাত্রে। প্যাগোডাগুলির গায়ে অসংখ্য ইলেকট্রিক আলো জ্বলে। দূর থেকে দেখে মনে হয়, যেন দেওয়ালির অপরূপ আলোকসজ্জা!

সেই সোয়েডাগন প্যাগোডা দেখে ফেরবার পথে রাস্তা দিয়ে রিকশা করে যেতে দেখি, আরে! নীরজ গাঙ্গুলী,—মোটর দাঁড় করানো হয়। বিদেশে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা,—তার চমকও যেমন, আনন্দও তেমনি। সেও এসেছে বর্মা বেড়াতে, একাই।

নীরজ ছিল মোহনবাগানের 'এ' টিম-এর নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। গোষ্ঠ পাল, কুমার, রবি গাঙ্গুলী, আশু দত্ত,—নীরজ সেই দলেরই একজন। কৃতিত্বের সঙ্গে ল'পাশ করে সে এখন বেহারে ওকালতি করছে। আমার সঙ্গে তার যেমন জানাশোনা, পূর্ণদারও সে তেমনি অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই সুদূর বিদেশে এইভাবে দেখা হতে দুজনেই আমরা উৎফুল্ল।

বিকালে নীরজ চলে আসে অটলবাবুর বাড়িতে পূর্ণদার সঙ্গে দেখা করতে। তারপর আমরা তিনজনে চলি এখানেও একটা ফুটবল ম্যাচ দেখতে। Peake Frean Shield টুর্নামেন্টের খেলা,—Camerons vs Police। রেঙ্গুনের স্টেডিয়াম দেখে মুগ্ধ হই। ভাবি, কলকাতায় এমন করা যায় না! বহুলোক বসার আয়োজন। মাথার উপর আচ্ছাদন। বৃষ্টিতে ভেজবার সম্ভাবনা নেই। প্রবেশ দ্বারও অনেকগুলি। দর্শকদের ঠেলাঠেলি নেই। টিকিট কিনতে 'কিউ' দাঁড়ায় না। গেটে ঢোকবার সময় পয়সা নেয়। খেলা মন্দ হল না। দু-দলই এক গোল দিয়ে "ড্র" করল। কিন্তু অত্যন্ত rough gsme। ক্যামেরন্‌স্—মিলিটারি সাহেবের দল, পুলিশ সবাই বর্মী। দু-দলের খেলোয়াড়রা যখনই পরস্পরের কাছাকাছি আসে, তখনই বর্মী দর্শকরা প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হয়ে "ছা" "ছা" রবে চিৎকার করতে থাকে এবং একজন যদি

'ফাউল' করেও বিপক্ষের কাউকে ধরাশয়ী করতে পারে, হাততালি দিয়ে দর্শকদের সে কী উদ্দাম আনন্দ প্রকাশ! "ছা" "ছা"—শব্দের অর্থ শুনি—"মার" "মার"। মনে হয়, এখানে খেলা দেখার চেয়ে মারামারি দেখতেই দর্শকদের বিপুল উৎসাহ।

রেঙ্গুনের আর এক দ্রষ্টব্য এখানকার বাজার। একটা নয়, কয়েকটিই বড় বড় মার্কেট।

এককালের জেলেদের গ্রাম রেঙ্গুন এখন এক বিশাল ব্যবসাকেন্দ্র। প্রকৃতি বর্মাকে বিবিধ রত্নসম্ভারে সাজিয়েছেন। এ দেশে যেমন খনিজ পদার্থ, তেমনি এখানকার কৃষিজাত শস্যাদি ও অরণ্যসম্পদ। জগতের লোকচক্ষুর লুব্ধদৃষ্টির অন্তরালে বর্মা বহুকাল নিভৃতে একান্তে আত্মগোপন করে ছিল, এখন ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে বর্মার নামডাক। বর্মা থেকে চাল রপ্তানি হয় জগতে সব চেয়ে বেশি। অন্নভোজী এশিয়াবাসীর বহু অঞ্চলেই বর্মার চালের সরবরাহ। আর আছে বর্মার প্রসিদ্ধ 'টিক্'—সেগুন কাঠ। তুলা ও রবারও চালান যায়। এ ছাড়া, বর্মা প্রকৃত অর্থেই বহু রত্ন-প্রসাবিনী। বর্মার খনিতে তেল, সীসা, নীল, দস্তা, টিন, তামা, টাংস্ট্যান, নিকেল, লোহা—এসবও যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি পাওয়া যায় মূল্যবান রত্নাদিও,—সোনা, রূপা, স্ফটিক, চুনি, জেড্ প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশ রকম ধাতু ও রত্ন। বর্মা আমাদের বাঙলা দেশের মতন সবুজ, শস্যশ্যামল। এখানে বৃষ্টিপাত হয় পর্যাপ্ত। ধান, গম, জোয়ার, ভুট্টা, আখ, চিনাবাদাম, তিল, তামাক ইত্যাদি ফসল জন্মায়, শাকসবজি ও নানাবিধ ফলেরও চাষ হয়।

এমন দেশের হাটবাজার ব্যবসাকেন্দ্র বড় হওয়া স্বাভাবিকই।

অধিকাংশ বাজারই মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে। Scott market, Surita market ঘুরে ঘুরে দেখি। কত সিল্কের দোকান, গালার তৈরি কৌটা, ডিবা, বাক্স—গায়ে অতি সুন্দর ছবি আঁকা। রূপার ও হাতির দাঁতের তৈরি জিনিসপত্র। সারি সারি ফুলের দোকান। কাগজের ফুল ও সত্যকার ফুলে তফাৎ বোঝা যায় না। প্রায় সব দোকানেই বিক্রেতা বর্মী মেয়েরা। তাদের এমনই বেশভূষা, সাজসজ্জা, হাসিখুশি ব্যবহার যে দোকানের পসরার মাঝে যেন তারা রাজরাণী রূপে বিরাজ করে। কে বলবে—দোকানী! সবারই পরনে দামী সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে হাতে সোনা-রূপার গহনা। কানে হীরের দুল! দেখতেও সুশ্রী—ডল পুতুলের মতন!

এর কারণ শুনি, বর্মী মেয়েরা অতি পরিশ্রমী, উৎসাহী, বুদ্ধিমতী এবং জাত ব্যবসাদার। দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন বা ব্যবস্থা নেই। তরুণীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা,—যেন ভাল দোকান করে স্টল সাজিয়ে ব্যবসা করতে পারি! অর্থোপার্জনের প্রধান উদ্দেশ্য,—উৎকৃষ্ট সাজসজ্জা, সোনা রূপা হীরা পান্নার গহনা কেনা। হাতে টাকা পেলেই খরচা করা। গহনা কিনে, ভোজ দিয়ে এ জন্মের আনন্দলাভ, আর প্যাগোডা তৈরি করে জন্মান্তরের জন্য পুণ্যসঞ্চয়!

রেঙ্গুনের আর এক বৈশিষ্ট্য, সন্ধ্যায় বড় বাজারগুলি ও দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেলে রাস্তার দু-ধারে ফুটপাতে নৈশ বাজার বসে। আলো জ্বালিয়ে সারি সারি দোকান। সব জিনিসই পাওয়া যায়, দামেও কিছু সস্তা। রাত্রের সে বাজারেরও স্বকীয় শোভা আছে।

এরই মধ্যে একদিন দুর্গাবাড়িও দেখে আসি। বাঙালীদেরই প্রতিষ্ঠিত। গিয়ে দেখি, ছাগবলির প্রস্তুতি চলেছে।

মোগল স্ট্রীট দিয়ে আসতে শুনি, ঐ অঞ্চলে বহু দক্ষিণ ভারতীয় চেট্টিদের বসবাস। আমাদের দেশে মাড়োয়ারীদের মতন এই চেট্টিদের বর্মামুলুকে ব্যবসা ও কারবার। এরা এক একজন বিরাট ধনী। তেজারতির কারবারই প্রধান।

পূজার এ কয়দিন রেঙ্গুনে আমার দিন কাটে যেন দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস করে। বাড়ির বাইরে যখন ঘুরতে বার হই, তখন দেখি নতুন দেশ, অপরিচিত শহরের বিভিন্ন অঞ্চল, বর্মী মেয়ে-পুরুষের সাজসজ্জা, চালচলন, তাদের প্যাগোডা, মন্দির, হাটবাজার।

আর, অটলবাবুর বাড়িতে ফিরে এলেই যেন আপন গৃহের সুপরিচিত পরিবেশ,—বাঙালীর দুর্গাপূজার আনন্দ উৎসব, সেই ঢাক ঢোল, কাঁসর ঘণ্টা, ধূপধুনা, শঙ্খধ্বনি। একরাশ শাকসবজি নিয়ে মেয়েদের কুটনো কোটা। ওদিকে ভোগ রাঁধা। এদিকে পূজার নৈবেদ্য সাজানো যোগাড়-যন্ত্র করা। ঘরের মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি হৈ-হল্লা। বড়দের কেউ বাজার করে ফেরেন—ফর্দ মেলাতে বসেন, আবার ওপাশে ফরাশে একদল গল্পগুজবে মশগুল। বাইরের লোকজনও আসেন দেখা করতে,—

বিশেষত বিজয়ার দিন ত মনেই হয় না বাঙলার বাইরে বিদেশে রয়েছি!

এ দেশে এত বাঙালী। থাকার কারণও শুনি। ইংরেজরা বর্মা জয় করার পর ভারতের মতন এখানেও রাজ্যশাসন করছে উপরে সাহেবদের বসিয়ে, আর অধস্তন কেরানীদের দিয়ে। কিন্তু, বর্মী পুরুষরা এ-সব কাজকর্ম করতে মোটেই উৎসুক বা আগ্রহী নয়, তাই ভারত থেকেই এসেছে যত কর্মী। আর বাঙালী ছাড়া কারাই বা এই মোহে সুদূর বিদেশে আসবে? তাই শুনি, শুধু রেঙ্গুনে কেন? সারা বর্মায় যেখানেই যাব বাঙালীর সাক্ষাৎ পাবই। রেল, পি. ডবলিউ. ডি., ডাকঘর,—সব দপ্তরেই। বাঙালীর আসা শুধু চাকরির টানেই নয়। বাঙালী উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপকও আছেন বহু।

এই সব কথা যখন বাড়িতে বসে আলোচনা হচ্ছে, এক মিস্ত্রী এল বাড়ির জলের পাইপ মেরামত করতে। তার কথাবার্তা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারি,—ওড়িশাবাসী! এখানে এরাও তাহলে! এ যে দেখি পুরাপুরি কলকাতাতেই রয়েছি! রেঙ্গুনে নাকি শতকরা ৭৫ জন ভারতীয়!

শুধু তাই নয়। অটলবাবুর বাড়িতে পূজামণ্ডপে তিনদিন কীর্তনের আসরও বসল। মূল গায়েন মোহিনীবাবু। এখানে চাকরি করেন। সুকণ্ঠ।

বিজয়ার পর দিন পেগু শহর দেখতে চলি। কেন না আমাদের আপার বর্মা ভ্রমণের যাত্রার দিন স্থির হয়েছে তার পরদিন। এই অবসরে পেগু দেখে আসা সুবিধা। নীরজকে সঙ্গী পাই।

সকালে Pozundung স্টেশনে যাই ট্রেন ধরতে। যা ভেবেছি, টিকিট কাটতে গিয়ে দেখি, বাঙালী বুকিং ক্লার্ক।

৭টা ৫০-এ ট্রেন ছাড়ল। ভিড় নেই। আরামে বসে রেললাইনের দু-পাশের শোভা দেখতে দেখতে চলি। দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেত। মাঠে চাষ হচ্ছে।

নীরজ বলে, এ যেন বাঙলা দেশের মধ্যে দিয়ে চলেছি।

আমি বলি, প্রাকৃতিক দৃশ্য সেই রকমই বটে,—ছোট ছোট গ্রাম, গাছপালায় ঘেরা 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়'। কিন্তু, গ্রামের বাড়িঘরের চেহারা আলাদা, মানুষগুলিরও ভিন্ন রূপ, ভিন্ন বেশ।

অধিকাংশ ঘরেই দেখা যায় জমি থেকে ফুট পাঁচেক উঁচুতে কাঠের পোস্তার উপর বাঁশের বা দরমার দেওয়াল। খেজুর পাতার ছাদ। মাঝে মাঝে প্যাগোডা তো রয়েছেই।

নীরজ বলে, এত প্যাগোডা এ দেশে!

আমি বলি, এ দেশে প্যাগোডা তৈরির একটা গল্প শুনবে? H. Fielding Hall-এর লেখা The soul of a people বইখানিতে আছে। ইংরেজদের এখানে রাজ্যস্থাপনের পর Hall ছিলেন সেই প্রথম যুগের I. C. S.। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি বইখানি লেখেন,—বর্মাদেশ ও বর্মীর সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। সেই বই-এ The potter's wheel বলে যে অধ্যায়, তাতে এই কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন। এখানকার এক ছোট গ্রামে সেখানকার ফুঙ্গী একটা প্যাগোডা তৈরি করতে শুরু করেন, সেই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি সেগুন গাছের চারাও রোপণ করেন। কিন্তু, তাঁর দুর্ভাগ্য, প্যাগোডা অসম্পূর্ণ থাকতেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর পুনর্জন্ম হয় আর এক গ্রামে,—"পুনর্জন্ম" কেন, তারই প্রমাণ দিয়েছেন Hall এই গল্পে। সেখানেও তিনি ফুঙ্গী হন এবং কেবলই বলতে থাকেন, তাঁর আগের জন্মে একটা অর্ধসমাপ্ত প্যাগোডা রেখে তিনি মারা যান, এ-জন্মে সেটা তাঁর সম্পূর্ণ করতেই হবে। কিন্তু, জায়গাটা কোথায়? স্থানটির বর্ণনাও তিনি দেন। তবুও, তার সন্ধান কেউ দিতে পারে না। বহু খোঁজাখুঁজি চলতে থাকে। অবশেষে খোঁজ পাওয়া যায়,—প্রকৃতই সেখানে ততদিনে সেই সেগুন চারাগুলি বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে, আর তারই অদূরে এক অসমাপ্ত প্যাগোডা যেন তাঁরই অপেক্ষায় পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে! ফুঙ্গীর তখন আর আনন্দ ধরে না। সেইখানে বাস করে তাঁর পূর্বজন্মের রোপিত সেগুন গাছগুলি কেটে প্যাগোডাটি সম্পূর্ণ করেন।

নীরজ বলে, ঘটনাটা তুমি বিশ্বাস কর?

আমি বলি, সাহেব ত লিখেছেন ঘটনাটি প্রকৃতই ঘটেছিল। আর, বর্মীরাও সকলেই এটা সত্য ঘটনা বলেই মানবে।

•

পেগু রেঙ্গুন থেকে মাত্র ৪৭ মাইল দূরে। সওয়া দশটায় পৌঁছে যাই। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা

টাঙ্গা করা হয়।

পেঙ্গু এককালে বর্মার Talaing রাজাদের রাজধানী ছিল। প্রাচীন শহর। এখানে পরিনির্বাণে শয়ান বুদ্ধদেবের অতি প্রসিদ্ধ এক মূর্তি আছে। তাই দেখতে আমাদের আসা।

টাঙ্গাচালককে সেখানে নিয়ে যেতে বলা হয়। সে উলটাদিকে পেগু প্যাগোডায় নিয়ে গিয়ে হাজির করে। তাকে দোষ দেওয়া যায় না, আমরা হয়ত তাকে ঠিকমত বোঝাতে পারিনি, আর পেগুর এই প্যাগোডাও এখানকার অতি পবিত্র তীর্থস্থান। নাম শুনি, Shwehmawdaw প্যাগোডা। এরও অভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের দুই গাছি কেশ নিহিত আছে বলে প্রবাদ। প্যাগোডাটি ২৮৮ ফুট উঁচু, পরিধি ১,৩৫০ ফুট। যথারীতি সুমুখে দুই প্রকাণ্ড সিংহাকৃতি মূর্তি।

এই প্যাগোডা স্টেশনের পূর্বদিকে, আর সেই শায়িত বুদ্ধমূর্তি পশ্চিমে এক মাইল দূরে। ফলে, সেখানে যাবার পথে শহরটি দেখা হয়ে গেল। নেহাত ছোট শহর নয়। রাস্তার দুপাশে বাড়ি। প্রবেশদ্বারে বোর্ডে গৃহস্বামীদের নাম লেখা। বাঙালী কয়েকজনেরই নাম দেখলাম। বেশির ভাগ উকিল। ডাক্তারও দু-চারজন।

পেগু নদীর ওপর শহর। পুল পার হয়ে আমাদের টাঙ্গা অপরদিকে পৌছুতেই একটা মোটরের সঙ্গে গাড়ির ঘোড়ার ধাক্কা লাগল। চালক দুজনের চেয়ে দোষটা পুলিশেরই বেশি। তিনি তখন তাঁর কর্মস্থান ছেড়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে গল্পে মশগুল। ভাগ্যক্রমে ধাক্কাটা বেশি জোরে লাগেনি, ঘোড়ার আঘাতও সামান্য। তাই, দু-চার কথায় মিটে যায়।

শায়িত বুদ্ধমূর্তিটি (Shwelhalyaung) যে এত প্রকাণ্ড কল্পনা করতে পারিনি। শুনি, জাপানে নাকি বুদ্ধদেবের সর্ববৃহৎ মূর্তি আছে, তার পরেই আকারে এইটি দ্বিতীয়। মাথার কাছে ডান হাত রেখে ডানপাশ ফিরে বুদ্ধদেব তাঁর অন্তিম শয়নে। মূর্তিটি ১৮১ ফুট লম্বা। মাটি থেকে বাঁ কাঁধের উচ্চতা ৪৬ ফুট। মূর্তির ডান হাতের চেটোতে জন তিনেক লোক স্বচ্ছন্দে লম্বা হয়ে শুতে পারে। মাথার নীচে বেদীতে রঙিন কাঁচ বসানো সুন্দর কারুকার্য। প্রকাণ্ড এক টিন শেডের তলায় মূর্তিটি এখন রয়েছে, শুনি কিছুকাল আগেও খোলা আকাশের নীচে অনাবৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। অমনভাবে পড়ে থাকার কারণও শুনি। ৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে Migadeikpa Min-ngc-র রাজত্বকালে এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা। পরবর্তীকালে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে Alaungpaya পেগু জয় করলে এই স্থান পরিত্যক্ত হয়ে গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়। মূর্তিটিও কালক্রমে গাছগাছড়ায় লতাগুল্মে আবৃত বিরাট এক স্তূপের আকার ধারণ করে। ১৮৮১ সালে এ অঞ্চলে যখন রেললাইন তৈরি হয়, এক কন্ট্রাকটার Latcrite-এর সন্ধানে সেই বনজঙ্গলে ঘোরার সময় মূর্তিটি আবিষ্কার করেন। পরে ক্রমশ পেগুতে আরও বহু পুরানো প্যাগোডা ও বুদ্ধমূর্তির সন্ধান মেলে। তার নিদর্শন আমরাও দেখি, এখনকার এই শহরের আশেপাশে।

স্টেশনে ফিরে আসি রেঙ্গুনের ট্রেন ধরব বলে। দেখা যায়, ট্রেন আসতে তখনও কিছু দেরি। নীরজ বলে, চল, ট্রেনে না গিয়ে বাস-এ ফেরা যাক। মোটরের পথটাও দেখা হয়ে যাবে।

আবার তখনই বাজারে যাওয়া। রেঙ্গুনের বাসও যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল, তখনই ছাড়ল। বেলা দুটো বাজে। এ-পথে রেঙ্গুন ৫৪ মাইল দূর। ভাড়া মাথা পিছু এক টাকা মাত্র!

পেগু শহর ছাড়বার আগে বাস সেই শয়ান বুদ্ধমূর্তির কাছে ঘুরে গেল। মাইল দুই আসার পর পথের উপর বুদ্ধদেবের চতুষ্টয় প্রকাণ্ড মূর্তি—পিঠাপিঠি চারদিকে মুখ করে বসে,—প্রতিটি মূর্তি ৯০ ফুট উঁচু।

বাসের সুন্দর রাস্তা। দূরে ছোট ছোট কয়টা পাহাড়। দুপাশে সবুজ ক্ষেত। মাঝে মাঝে গ্রাম, কখনও বা একটু বড় লোকালয়। খানিকটা পথ রবার plantation-এর মধ্যে দিয়ে। গাছের বড় বড় পাতা। কোথাও তার লালচে আভা। সোজা গাছগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে,—যেন সাজানো বন। যতগুলি ছোটখাট শহর পার হলাম তার মধ্যে Hlegu সব চেয়ে বড় মনে হল।

পথে বাস অযথা কোথাও দাঁড়ায়নি। এলও বেশ জোরে। বেলা ৪টা ১৫তে রেঙ্গুন পৌছে দিল। নীরজ বললে, এর মধ্যে বাড়ি ফিরে কি করবে? চল, আজ একটা ভাল ফুটবল ম্যাচ আছে, স্টেডিয়ামে যাওয়া যাক।

সেখানে গিয়ে শোনা যায়, সে ম্যাচ আজ নেই। খেলা হবে ম্যানচেস্টার বনাম মেডিক্যালস্। অগত্যা

বসে তাই দেখা হল। বাজে খেলা।

আগামীকাল রাত্রের ট্রেনে আমাদের আপার বর্মা ভ্রমণে রওনা হওয়ার কথা। নীরজও সঙ্গে যাবে। খেলা শেষ হলে সে তাই বলে, চল, পূর্ণর কাছে জেনে আসি তাঁর শ্বশুরমশায়ের পরামর্শ নিয়ে আমাদের ট্যুর-প্রোগ্রামটা কি ঠিক করল।

বাড়ি এসে দেখা যায়, পূর্ণদা টেবিলে বর্মার ম্যাপ বিছিয়ে একমনে দেখছেন। আমাদের আসতে দেখে বলেন, কী রকম পেগু দেখে এলে? এবার দেখ আমাদের আপার বর্মার প্রোগ্রাম কিরকম করা হল।

আমি বলি, যাই করে থাকুন, ওদিক থেকে শুনেছি চীন সীমান্ত দূরে নয়। যে করে হয়, চীনের মাটিতে অন্তত পা-ছুঁইয়ে আসতে হবে যাতে বলতে পারা যায়,—চীন ঘুরে এলাম। গত বছর আফগান সীমান্ত, এ বছর চীন সীমান্ত!

পূর্ণদা বলেন, আমিও তো তাই মনে রেখে প্রোগ্রাম করেছি, তারপর দেখা যাক কি হয়। শ্বশুরমশায় বলছিলেন, তোমরা এদিকে প্রোম ঘুরে এলে বর্মার পুরানো অনেক কিছু দেখতে পেতে। সেটা তোমাদের এবারকার যাত্রায় হবে না।

তারপর তিনি বলেন, এস, তোমাদের মানচিত্রে দেখিয়ে দিই, বর্মার ভৌগোলিক অবস্থানটা কোথায় এবং কি প্রকৃতির। বর্মার পুবে হচ্ছে, চীনের কিছুটা পাহাড়ী রাজ্য, আর শ্যাম দেশেরও (অধুনা থাইল্যান্ড) পার্বত্য অংশ। দক্ষিণে,—মার্তাবান উপসাগর ও আন্দামান সাগর। পশ্চিমে,—বঙ্গোপসাগর, আর তার ওপরে চট্টগ্রাম, আসাম, মণিপুর অঞ্চল,—তাও পাহাড়ী রাজ্য। আর উত্তরেও তিব্বত এবং চীনের পাহাড়। অর্থাৎ, বর্মা দেশটাকে যেন সমুদ্রে ও পাহাড়ে হাত মিলিয়ে ঘিরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

পূর্ণদা ম্যাপ থেকে মুখে তুলে তারপর মন্তব্য করেন, এই কারণেই বাইরের শত্রুদের আক্রমণ এ দেশে কমই হয়েছে। তবুও, কালক্রমে বিদেশী বণিকদের লুব্ধ দৃষ্টি এই দেশের ওপরও পড়ল, তারা দলে দলে চলে এল এবং সেই ছিদ্র পথেই প্রবেশ করে অবশেষে ইংরেজরাই এখানে রাজ্যবিস্তার করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে নিল। প্রথম দিকে ইংরেজরা অবশ্য বর্মার দক্ষিণাংশই অধিকার করে। আর, উত্তর অংশ তখনও বর্মীদেরই দখলে থাকে। সেই সময় থেকে বর্মাকে দুভাগে ভাগ করে বলা হয়, লোয়ার বর্মা, আপার বর্মা। লোয়ার বর্মা ইংরেজদের, আপার বর্মা বর্মীদের। এখন আপার বর্মাও ইংরেজদের দখলে এলেও, সেই নাম দুটো ভৌগোলিক দৃষ্টিতে বজায় আছে,—আর আমরা যাব সেই আপার বর্মায়।

জিজ্ঞাসা করি, সেই দিকেই তো সব পাহাড়ও?

পূর্ণদা জানান, পাহাড়রাজ্য বর্মার তিন দিকেই, আর এ দেশে সেইসব পাহাড়ের বিস্তার ও নদীগুলি নেমে আসে উত্তরদিক থেকে দক্ষিণে।

নীরজ বলে, তা তো হবার কথাই,—দক্ষিণে হল সমুদ্র, আর দেশটাও উত্তর-দক্ষিণ লম্বা ছড়িয়ে।

ঝুঁকে পড়ে মানচিত্রটা ভালো করে দেখি। সারা ভারতের উত্তরাঞ্চলে মাথার উপর 'পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য'—সেই কাশ্মীরের নাঙ্গা পর্বত (২৬,৬৬০ ফুট) থেকে পুবে লম্বা ছড়িয়ে রয়েছে হিমালয় গিরিশ্রেণী। প্রায় ১,৫৫০ মাইল। তারপর ভারতের পূর্বপ্রান্তে পৌঁছে তিব্বতের নামচাবারোয়ায় (২৫,৪৪৫ ফুট) হিমালয়ের শেষ সীমা; কিন্তু প্রকৃতির পার্বত্যরাজ্যের সেখানে শেষ নয়। বর্মার মাথায় এসেও সেখানে পাহাড়। কিন্তু, এখন আর পূব-পশ্চিম ছড়ানো নয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে আসা শৈলশ্রেণী। এবং তারই উপত্যকা দিয়ে নামতে থাকে বিভিন্ন নদ-নদী। সবই যেন পাহাড়ের ছককাটা পথ বেয়ে—দক্ষিণমুখী। পশ্চিমে চিনডুইন, তার পুবে ইরাবতী। দুই নদীর মিলন হয় আপার বর্মার প্রধান শহর মাণ্ডালের নিকটে। সেই বিশাল ইরাবতী দক্ষিণমুখে নেমে চলে সাগর অভিমুখে! পৌঁছায় লোয়ার বর্মার নিম্নাঞ্চলের সমতলে। নদীর সেই অববাহিকা—'বেসিন'—লোয়ার বর্মাকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করে সাজিয়ে তোলে। রেঙ্গুনের পশ্চিমাঞ্চলে ইরাবতীর সাগর সঙ্গম।

ওদিকে ইরাবতীর উৎসের আরও পুবে চীনের পার্বত্যপ্রদেশ থেকে অপর আর এক দক্ষিণবাহী বিরাট নদও নেমে আসে,—সালউইন। সে নদও সাগরে এসে মেশে লোয়ার বর্মায় মৌলমিনের নিকটে। এ ছাড়াও বর্মায় আর এক বড় নদী সিটাং এবং বহু কাটা-খাল—'ক্যানাল'।

বর্মার আয়তন প্রায় ২,৬১,৬১০ বর্গ মাইল। সাগর উপকূল প্রায় ১,৫০০ মাইল বিস্তৃত। জনবসতি ১৪,৬৬৭,১৪৬। ইরাবতী বর্মাদেশের মাতৃস্বরূপা, আমাদের গঙ্গার মতন। আপার বর্মায় উপজাত পণ্যসামগ্রী এই নদীপথেই রেঙ্গুন প্রভৃতি শহরে এসে পৌঁছয়। ইরাবতী প্রায় ন'শ' মাইল নাব্য,—রীতিমত স্টিমার, নৌকা প্রভৃতি চলে। ইরাবতীর উপনদ চিনডুইনও আরও চারশ' মাইল নৌবাহ্য—navigable। নদীমাতৃক লোয়ার বর্মায় কৃষিযোগ্য জমি অতি উর্বর,—প্রকৃতই 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা'। রেঙ্গুন বন্দর সারা দেশের বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। তাই, লোয়ার বর্মাই যেন আসল বর্মা।

পূর্ণদা বলেন, এই যে বড় বড় নদী ও পাহাড় দেখছ, এগুলি আপার বর্মাকে কয়েক অংশে ভাগ করে রেখেছে, আর সেই সব বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন পার্বত্য উপজাতির বাসভূমি,—কাচীন, শান, কারো প্রভৃতি।

নীরজ বলে, বর্মীরা সবাই দেখতে মোঙ্গলীয়। একটু বেঁটে হলেও বেশ গাঁট্টাগোট্টা।

পূর্ণদা মন্তব্য করেন, মোঙ্গলীয় হওয়াই স্বাভাবিক। নৃতত্ত্ববিদ্‌দের কারও কারও মতে, এদের পূর্বপুরুষরা তিব্বত ও চীন অঞ্চল থেকে পরিযায়ী হয়ে—'মাইগ্রেট' করে—এ দেশে নেমে আসে। তবে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। চেহারায় এরা তিব্বতী বা চীনেদের মত হলেও, ধর্মমতটা কিন্তু গ্রহণ করেছে—ভারত থেকে,—সবাই বৌদ্ধ। .

আমি বলি, শুধু তাই নয়। বর্মীভাষাও, শুনেছি, ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভোট-বর্মী। অথচ, একাদশ শতকের আগে বর্মীয় ভাষায় লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। বর্মী লিপি দক্ষিণ-ভারতীয় লিপির সধর্মী।

তারপর, হঠাৎ একটা বিষয় মনে পড়ে, জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, পূর্ণদা, ছেলেবেলায় বর্মা বললেই মনে হত মগের দেশ,—নয় কি?

নীরজ আমাকে সমর্থন করে এবং বলে, আর পূর্ণ, তোমার শ্বশুরবাড়ি হয়েছে সেই মগের মুলুকে।

পূর্ণদা হেসে বলেন, তোমরা তাহলে বর্মার ইতিহাসটা জান না। বর্মীদের 'মগ' বলে না, যদিও মগদের বসবাস ছিল বর্মারই এক অংশে। বর্মার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আরাকান—সেখানে আরাকান ইয়োমা গিরিশ্রেণী,—ম্যাপের দিকে তাকিয়ে দেখ। এর খানিকটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের ওপরে, আর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সীমানায় হল চট্টগ্রাম, মণিপুর, আসাম। ঐ আরাকানবাসীদেরই বলা হত মগ। মগ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে, হয়ত বর্মীয় 'মোভ' পদবি থেকে হয়েছে। কিন্তু, মগ নামের সঙ্গে যে বিভীষিকা ও অরাজকতার স্মৃতি জড়িয়ে আছে তা নিয়ে মতান্তর নেই। সেকালে এই মগেদের কোন কোন গোষ্ঠী ছিল দুর্ধর্ষ ও দুঃসাহসী জলদস্যু। পর্তুগীজ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের সঙ্গে তারা কখনও এক জোটে, আবার কখনও বা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দস্যুবৃত্তি চালাত। আমাদের বাঙলা দেশের খুলনা, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে সেই সব মগেদের অত্যাচার ও লুঠতরাজের রীতিমত আতঙ্ক ছিল। তারপর, ১৮শ শতাব্দীতে—১৭৮৪ সালে বর্মার এক রাজা Bodawpaya আরাকান জয় করলে সেই দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়। সে-সময়ে আরাকানী উদ্বাস্তু অনেকে চট্টগ্রামে এসে বসবাস শুরু করে।

নীরজ বলে, এই কারণেই কী চট্টগ্রামবাসী আমাদের বন্ধুদের মধ্যে দেখেছি মুখ-চোখের আদল কিছুটা বর্মী ধরনের?

পূর্ণদা বলেন, শুধু আরাকানীদের ঐ অনুপ্রবেশ নয়, এরপরে আরাকানের বর্মী রাজাও সৈন্যসামন্ত নিয়ে মণিপুর, আসাম আক্রমণ করে এবং তারই ফলে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। সেই হল প্রথম বর্মাযুদ্ধ—১৮২৪ সালে। বর্মীদের আসাম, কাছাড়, মণিপুর ছাড়তে হয়। ওদিকে ইংরেজরা রেঙ্গুন ও লোয়ার বর্মার অনেক অংশ অধিকার করে নেয়। বর্মীদের সঙ্গে ইংরেজদের একটা সন্ধিও হয়। কিন্তু কয়েক বছর পরে আবার বিবাদের সূত্রপাত হলে ১৮৫২ সালে ইংরেজরা দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ঘোষণা করে, যার ফলে আরাকান, পেগু, মার্তাবান, টেনাসেরিম প্রদেশগুলি ব্রিটিশ বর্মায় পরিগণিত হয়ে যায়। এর পর আবার তৃতীয় বর্মা-যুদ্ধ বাধে ১৮৮৫ সালে এবং সারা বর্মাদেশ ব্রিটিশ সিংহের শিকারে কবলিত হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করি, এখন বলুন, উত্তর বর্মার কোন্ অঞ্চলে আমাদের যাওয়ার প্রোগ্রাম করলেন? পূর্ণদা ম্যাপ-এ দেখিয়ে বলেন, প্রথম যাব এই ধারে দক্ষিণ শান্ স্টেটে, তারপর মাণ্ডালে অঞ্চল হয়ে উত্তর

শান্ রাজ্যে যাওয়া। এই শান্ স্টেটেরই পুব সীমান্তে চীন। দেখা যাক, সেই পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হবে কিনা।

তারপর তিনি নীরজকে বলে দেন, কাল রাত্রের মেলে আমরা রওনা হব। সকালে স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটতে হবে, যাওয়ার পথে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব, তৈরি থেকো। বর্মীদের এ সময়ে একটা বড় পর্ব শুরু হচ্ছে,—দু সপ্তাহ সব ছুটি। ট্রেনের টিকিটেরও কনসেশন দিচ্ছে,—একদিকের ভাড়ায় যাওয়া-আসা। কিন্তু, তৃতীয় শ্রেণীতে যাব ভেবেছিলাম তা হবে না। শ্বশুরমশায়ের এক পার্টনার ঐ ট্রেনে মান্দালে চলেছেন, আমাকে চেনেন, তাই সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কাটতে হবে।

নীরজ হেসে বলে, জামাই-এর 'প্রেসটিজ্'-এর প্রশ্ন তা হলে!

১৫ই অক্টোবর।

রাত্রে কখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে টের পাইনি। স্বপ্নে তখন হয়ত বর্মায় ঘুরছি!

সকালেও বর্ষাকালের মত ঘনঘটা। অবিশ্রাম বর্ষণ চলেছে। বাড়ির সামনেই একটা ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল। তাই চড়ে ফ্রেজার স্ট্রীটে নীরজের বাসার দিকে আমরা রওনা হলাম। পূর্ণদার ভায়রা-ভাই-ললিতবাবু—জাহাজে যাঁর সমুদ্র-পীড়া হয়েছিল—তিনিও উত্তর বর্মা ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছেন। তাঁকে বলি, ট্রেনে যাতায়াত, নির্ভয়ে যাওয়া যাবে, কি বলেন?—তিনি বলেন, বাবাঃ, সমুদ্রের সে কী দোলানি! অসুখ করবে না!

নীরজের বাসায় পৌঁছে ভাড়াগাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়। স্টেশন ওখান থেকে নিকটে। বৃষ্টিও ধরে এসেছে।

কিন্তু, চারজনে স্টেশন অভিমুখে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই আবার মুষলধারে জল নামে। যেন, মেঘের আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল, হঠাৎ ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। কারুরই হাতে ছাতা নেই। ছুটে গিয়ে একটা বাড়ির বারান্দার নীচে আশ্রয় নেওয়া হয়। মেঘ হালকা হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। নীরজ বলে, মিছে দাঁড়িয়ে থাকা কেন? কতক্ষণ এ বৃষ্টি চলবে, কে জানে? চল, ভিজতে ভিজতেই স্টেশনে যাওয়া যাক। খেলার মাঠে এমন বৃষ্টিতে কতই তো ভেজা গেছে।

আমরাও রাজি। জামা জুতা সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে কাক-ভেজা হয়ে স্টেশনে হাজির হই। সেখানেও ভাগ্য অপ্রসন্ন। আগে সেকেন্ড ক্লাসের বার্থ রিজারভেশন করাতে হবে, তবে টিকিট দেবে। আর, সেদিন মেল ট্রেনে বার্থ খালি নেই। পরের দিনের ট্রেনেও নয়। আমরা জানাই, সেকেন্ড ক্লাস কনসেশন টিকিটটা অন্তত দিন, আমরা থার্ড ক্লাসে বা আর কোথাও দাঁড়িয়ে চলে যাব, ফেরবার সময় আমাদের টিকিট আর কাটতে হবে না।—তাতেও তাঁরা রাজি নন, রিজারভেশন না হলে টিকিটই দেওয়ার নিয়ম নয়।

অগত্যা থার্ড ক্লাসের টিকিট কাটতে চলি। সেখানেও বাধা। রাত্রের মেল ট্রেনের আগে দুপুর বারোটায় একটা এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়বে, সে ট্রেন ছাড়বার আগে মেলের থার্ড ক্লাস টিকিট দেওয়া হবে না। তা হলে, এই এক ঘণ্টা কাটানো যায় কী করে? বৃষ্টি তখনও সমানে চলেছে।

হঠাৎ পূর্ণদা বলে ওঠেন, ঐ প্ল্যাটফর্ম থেকে ইন্সিনের ট্রেন ছাড়ছে, ততক্ষণে তাই ঘুরে আসা যাক।

তখনই টিকিট কেটে সেই ট্রেনে চাপা। কামরায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনও ছাড়ে।

ইন্সিন্! ইন্সিন্!—নামটা শোনা মনে হয়। পূর্ণদা বলেন, রেঙ্গুন থেকে মাত্র মাইল নয় দশ দূরে। ন্যামটা শুনে থাকবে, সুভাষচন্দ্রকে যখন মান্দালে জেলে বন্দী করে এনে রাখে, তখন ঐ ইন্সিন্ জেলেও তাঁকে কিছুদিন রেখেছিল।

আমারও তখনই মনে পড়ে যায়, নামটা আরও কোথায় পেয়েছি। বলি, ঐখানে রামদাসেরও বাড়ি ছিল।

সঙ্গীরা জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকান,—রামদাস?

বলি, "পথের দাবী"র সেই রামদাস তলওয়ারকর! তিনি থাকতেন ঐ পল্লীতে।

ছোট স্টেশন। রেঙ্গুন শহরের উপকণ্ঠ। বৃষ্টির দরুণ স্টেশনেই দাঁড়িয়ে থাকি। আধঘণ্টা পরে আবার ফিরতি ট্রেন ধরে রেঙ্গুনে ফিরি। ইতিমধ্যে এক্সপ্রেস ছেড়েছে। বৃষ্টিও ধরেছে। টিকিট কেটে নিশ্চিন্ত মনে এবার বাড়ি ফেরা।

সন্ধ্যা ছয়টায় ট্রেন। নীরজকে তুলে নিয়ে পাঁচটার সময়ে চারমূর্তি স্টেশনে এসে হাজির হই। কিন্তু, এই একঘণ্টা আগে এসেও দেখা যায়, থার্ড ক্লাসে কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। ইঞ্জিন থেকে গার্ডের গাড়ি আবার সেখান থেকে ইঞ্জিন—বার দুই ছোটাছুটির পর অবশেষে ঠেলাঠেলি করে একটা কামরাতে কোনমতে ঢুকে দাঁড়ানো গেল। পূর্ণদা লম্বা মানুষ। দাঁড়িয়ে থাকা বর্মীদের মাথা ডিঙিয়ে সহজেই তাঁর দৃষ্টি চলে। বলেন, আরে! ওদিকে কয়টা বেঞ্চে বিছানা বিছিয়ে এক একজন বর্মী মহিলা বেশ আরামে পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে, আর আমরা এভাবে দাঁড়িয়ে সারারাত যাব! চল তো ঠেলেঠুলে ঐদিকে।

তাই যাওয়া হয়। বর্মীভাষা জানা নেই, হাত নেড়ে ইশারা করে বিনীতভাবে তাঁদের দু-তিনজনকে পা গুটিয়ে বসতে বলা হয়, আমরা চারজনেই তা হলে একসঙ্গে পাশাপাশি না হলেও, বসবার জায়গা পেয়ে যাব। ইঙ্গিতের উত্তরে কোন মহিলাই পা তো গুটালেনই না, তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর বেলুনের মতন সুগোল মুখখানার ওপর অনেকগুলি টোল খাইয়ে, রক্তাভ মাংসপিণ্ডের মধ্যে লুকানো ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে এমনই কতকগুলি বর্মী বাক্যবাণ ছাড়লেন, যার শব্দার্থ দুর্বোধ্য হলেও পরিষ্কার বোঝা গেল, তাঁরা সূচ্যগ্র স্থান তো ছাড়বেনই না এবং আমরা যে এমন অদ্ভুত আর অন্যায় অনুনয় করতে পারি সেইটেই বিস্ময়কর।

পূর্ণদাকে বলি, দাদা ভুলবেন না, এঁরা দেখতে সাজগোজকরা ডল পুতুলটি, কিন্তু রাগলে রণচণ্ডী! মনে নেই, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' সেই বর্ণনা,—ইক্ষুদণ্ড হাতে সুন্দরী বর্মী মহিলাদের গাড়ির গাড়োয়ানকে পেটানো!—বিদেশে বেড়াতে এসে এঁদের আর না ঘাঁটানোই ভাল।

অগত্যা ঐভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে সারারাত কাটাতে আমরা প্রস্তুত থাকি। সামনে দেবীরা ঐভাবে আরামে পা ছড়িয়েই বিরাজ করুন।

কিন্তু, হঠাৎ ভাগ্যদেবী প্রসন্না হন। একটি বর্মী ছেলে ওদিক থেকে আমাদের কাছে আসে। পরিষ্কার ইংরেজিতে আমাদের জানায়, এ-কম্‌পার্টমেন্টের প্রায় অর্ধেক যাত্রী আমার সাথী। আমরা চলেছি একটা তীর্থ করতে। আমাদের একটা পর্ব উপলক্ষে ছুটি শুরু হয়েছে, তাই ট্রেনে এত ভিড়। আপনারা বর্মায় বেড়াতে এসেছেন বুঝি? দাঁড়ান, আমি আপনাদের বসবার জায়গা করে দিচ্ছি।

সঙ্গিনীদের বলে সেইমত সে তখনই ব্যবস্থাও করে দেয়।

বর্মায় 'মিটার গেজ' ট্রেন। কামরাগুলি আকারে ছোট। একটা বেঞ্চে তিনজন বসতে পারে। ছেলেটি একটা বেঞ্চ সম্পূর্ণ খালি করে দেয়। তাতে তিনজন আমরা বসি। চতুর্থ জনের জন্য মুখোমুখি সামনের বেঞ্চেও জায়গা হয়। পাশে ছেলেটি নিজেই বসে।

এইবারে আমাদের পরিচয়ের পালা। সে এখনও স্কুলের ছাত্র। বেশ হাসি-খুশি। ভদ্র,—তার তো প্রমাণই পেলাম। সে প্রথমেই আমাদের জানায়, এদেশে বর্মীযাত্রীদের প্রচলিত প্রথা, কেউ যদি আগে এসে বিছানা পেতে একটা পুরো বেঞ্চ একবার দখল করে বসে, অপর কোন যাত্রী পরে এসে—গাড়িতে হাজার ভিড়ই হোক না কেন, তার অধিকৃত বেঞ্চে জায়গা চাইবে না।

এই নিয়ম বর্মীরা ট্রেনযাত্রায় যে কীরকম মেনে চলে, তা পরে আমরা দেখেছি এবং নিজেরাও তার সুখসুবিধা ভোগ করেছি।

থার্ড ক্লাস টিকিট কাটতে বাধ্য হওয়ায় মান্দালে পর্যন্ত আমরা টিকিট কাটিনি, কেটেছি দক্ষিণ শান্‌ স্টেটের স্টেশন Kalaw-র। মাঝপথে Thazi জংশন স্টেশনে নেমে ট্রেন বদল করতে হবে। কাল সকালে সেখানে পৌছুব।

কিন্তু, সারারাত একভাবে বসে রাত কাটানো যায় কী করে? ভাবতে হয় না। বর্মী ছেলেটির যেমন আমাদের দেশ সম্বন্ধে জানবার অশেষ কৌতূহল, বর্মীদের সম্পর্কেও আমাদের তেমনি জানার আগ্রহ। পরস্পর তাই নিয়েই আলাপ জমে ওঠে।

রেঙ্গুন ছাড়বার পর অল্পক্ষণই দিনের আলো ছিল। বর্মীযাত্রীরা স্টেশনে কলাপাতায় জড়ানো কী সব খাবার কিনেছে, এখন অনেকেই মোড়ক খুলে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে ব্যস্ত। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, ভাত আর নেপ্পী (nga-pi)। বস্তুটা কী?—উত্তর শুনে গা ঘিনঘিন করে—পচা চিংড়ি-মাছের তরকারি!

নিকটেই যে মহিলারা বসে খাচ্ছেন, আমার কৌতূহলী প্রশ্ন বুঝতে পারেন। ইশারা করে আমন্ত্রণ

জানান, তাঁদের ঐ সুখাদ্যের আস্বাদন নিতে। আমি ঘাড় নেড়ে 'না' জানানোয় সবাই খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে। আমার কিন্তু তখনও ঐ নামটুকু শুনেই নাকে যেন দুর্গন্ধ পেতে থাকি!

ছেলেটিকে তার নাম জিজ্ঞাসা করি। বলে, কো-টিন।

তারপর হেসে জানায়, নামের প্রথমে ঐ 'কো' শব্দটা কিন্তু আমার বয়সের পরিচয়। ওটা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাবে।

তার মানে? তোমার নাম তাহলে শুধু 'টিন্‌'? তোমাদের বংশের উপাধি থাকে না?

আমাদের দেশে শ্রেণীভাগ বলে কিছু নেই,—সব মানুষই সমান। সবাই মানব-বংশ। আমাদের নামকরণ হয় সন্তানের জন্ম-বারের প্রথম অক্ষর দিয়ে। এর প্রয়োজনীয়তা,—একই বারে জন্ম পাত্র-পাত্রীর বিয়ে হতে পারে না। জ্যোতিষশাস্ত্র আমরা খুব মেনে চলি। সপ্তাহের প্রত্যেক দিন এক একটা জীবজন্তুর সঙ্গে সংযুক্ত। সোমবার—বাঘ। মঙ্গল—সিংহ। বুধবার—হাতি। বৃহস্পতি—ইঁদুর। শুক্র—গিনিপিগ। শনি—ড্রাগন। আর রবিবার—অর্ধেক পাখি, আর-অর্ধেক জন্তুর মিশ্রণ।

পূর্ণদা বলেন, আমাদের ঐ ধরনের জন্মলগ্নের রাশি গণনা হয়। কিন্তু, তুমি তোমার নামের প্রথমে 'কো' শব্দটা কিসের পরিচায়ক বলছিলে?

কো-টিন্‌ বলে, ওটা আমার কতকটা বয়সের পরিচায়ক। ইংরেজি প্রথায় যেমন 'মাস্টার', 'মিস্টার' নাম ডাকার সময় যোগ করা হয়, আমাদের সেইরকম ওটা নামের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাকে, বয়স বাড়ার সঙ্গে বদলাতে থাকে। সেইজন্যে বর্মী নামের আগে 'মাস্টার' 'মিস্টার' ইত্যাদি আখ্যা যোগ করা বাহুল্য, —আমাদের নামের মধ্যেই ওটা সব সময়ে থাকে। এই যেমন আমার নামটাই ধরুন,—আমি যখন শিশু ছিলাম, আমাকে ডাকা হত, 'মউংগ'-টিন্‌ বলে। এখন তরুণ বয়সে হয়েছি,—'কো'-টিন্‌। এর পর যখন আরও বড় হব, তখন আমার নাম হয়ে যাবে,—'ইউ'-টিন্‌। U-ইউ শব্দটার অর্থ হল—আঙ্কেল —খুড়ো। আর দেশের সম্মানীয় ব্যক্তি হতে পারলে তখন 'U'-এর বদলে "থাকিন্‌" বা "বো" যোগ হবে। "থাকিন" মানে কর্তা, আর "বো" হল নেতা।

নীরজ উৎসাহ দিয়ে বলে, তুমি নিশ্চয় পরে 'বো-টিন্‌' বা 'থাকিন্‌-টিন্‌' হবে। মেয়েদের নামও এভাবে বদলায় নাকি?

হাঁ। ছেলেবেলায় তাদেরও আদর করে একভাবে ডাকা হয়। কিছু বড় হলে নামের আগে 'মা' বলা হয়, তার মানে ইংরেজিতে যাকে 'মিস্‌' বলে, তবে বিয়ে হলেও 'মা' আখ্যা থাকতে পারে। তারপর, আরও বয়স হলে নামের আগে 'মা'র বদলে বসে Daw-'ড'। আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা কতখানি জানেন? অন্যান্য অনেক দেশের মত এখানে মেয়েদের বিয়ের পর স্বামীর পদবী নেওয়ার রীতি— এদেশে নেই। মেয়ে পুরুষ সবারই এখানে সমান অধিকার। বরং বলতে পারেন, মেয়েরাই বেশি পরিশ্রমী, পুরুষরা অনেকে নিষ্কর্মা,—এমন কি স্ত্রীর রোজগারে প্রতিপালিতও হয়ে থাকে।

কো-টিন্‌ হাত নেড়ে কথা বলছিল। হাতময় তার উল্কি আঁকা। জিজ্ঞাসা করি, অত উল্কি পরেছ কেন?

কো-টিন্‌ হাসে। বলে, ছেলেবয়সেই আমাদের সূচ বিঁধিয়ে উল্কি আঁকানো প্রথা। বর্মীদের বিশ্বাস, শরীরে বিভিন্ন ধরনের উল্কি আঁকা থাকলে তার নানারকম সুফল জীবনে পাওয়া যায়। রোগ হয় না। মনে কোন ভয় থাকে না। সাপে কামড়ায় না। শরীরে আঘাত লাগে না। এমন কি, মনের সব আশা পূর্ণ হয়। প্রত্যেক উল্কির নক্‌শার ভিন্ন ভিন্ন গুণ। আমার তো এই হাতটুকুতে আঁকা, অনেকের দেখবেন, বুক ভর্তি উল্কি নানা রঙের, কত রকম জীবজন্তুর ছবি। কারও কারও হাঁটু থেকে কোমর পর্যত এত উল্কি যে মনে হবে যেন চিত্রবিচিত্র হাফ-প্যান্ট পরনে।

নীরজ প্রশ্ন করে, মেয়েরাও উল্কি আঁকায়?

নাঃ। ওটা ছেলেদের প্রথা। মেয়েদের হচ্ছে, এগারো বছর বয়স হলেই কানবেঁধানোর উৎসব।

আমি বলি, আর তাতে চুনী, হীরের দুল ঝোলানো!

এইভাবে বেশ গল্প জমে, সময়ও কাটে।

কিন্তু, প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে ধোঁয়ায়। যাত্রীরা ইতিমধ্যে কখন খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছে, এখন মেয়েপুরুষ—এমন কি ছোট ছেলেমেয়েরও অনেকেরই মুখে প্রায় বিঘৎখানেক লম্বা এক একটা জ্বলন্ত

চুরুট। সুশ্রী, সুবেশিনী মহিলাদের অমনভাবে চুরুট খাওয়া দৃষ্টিকটু দৃশ্য। তাঁদের হাতে একটা ছোট পাত্র, জ্বলন্ত চুরুটের আগুনের তলায় উঁচু করে ধরে-রাখা, পরনের কাপড়ে ছাই না পড়ে!

অত ভিড়ে বন্ধ কামরার মধ্যে চুরুটের ধোঁয়ায় ও উগ্র গন্ধে দম আটকে আসে। নাকে রুমাল দিয়ে চোখ বন্ধ করে সহ্য করি। তারই মাঝে ঝিমুতেও থাকি। ঢুলতে ঢুলতে কখন খানিকটা ঘুমও হয়ে যায়। জানলা দিয়ে দেখি, বাইরে ভোর হয়ে আসে।

১৬ই অক্টোবর।

ট্রেনের কামরার মধ্যে যেন ভোরের পাখির কলকাকলি। মেয়েদের অনেকেই কেশ ও বেশের প্রসাধনের জন্য আরশি, চিরুনি নিয়ে বসে। রীতিমত কসরত চলেছে। কিন্তু, এ কী! কাল রাত্রে যাদের মাথাভরা চিকন কালো কেশকলাপের সুবিপুল খোঁপা দেখেছি, আজ এখন দেখি, তাদেরই কারও মাথায় পাকা চুল, কারও বা ক'গাছি চুল গুনে বলা যায়! সৌন্দর্যের অত উপাদান এক রাত্রেই কোন্ দৈত্য যাদুবলে হরণ করে নিল? বিস্ময় জাগে। কিন্তু, দেখতে দেখতে, চোখের সামনেই, পরচুলার সাহায্যে আবার পক্ককেশ বৃদ্ধা ঘনকালোকেশিনী যুবতী হয়ে ওঠেন, বিরলকেশাও মাথার উপর খোঁপার স্তূপ সাজিয়ে বসেন। তারপর, চন্দনের মত, 'টনাকা' ঘষে মুখে প্রলেপ লাগান!

ট্রেনের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি। বাইরে সেখানেও প্রকৃতিদেবীর ঘুম ভেঙেছে। তারও প্রভাতকালীন সাজসজ্জা। সুদূরবিস্তীর্ণ হরিৎক্ষেত্র যেন তাঁর আনকোরা পাটভাঙা সবুজ শাড়ি। আঁকাবাঁকা নদীর ধারা তারই জরির পাড়। পুবদিগন্ত জুড়ে পাহাড়ের সারি। যেন, দেবীর আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ। গিরিশ্রেণীর অন্তরালে অদৃশ্য সূর্যের আলোকছটা মেখে স্নিগ্ধনীল আকাশ যেন নিষ্কলঙ্ক আরশি।

ক্রমশ দিনের আলো আরও ফুটে ওঠে। পাহাড়ের মাথায় সুনীল অরণ্যানী সোনার কিরীট পরেন, ক্ষণিক পরে খুলে রেখে যেন শুভ্র যুঁই-এর গোড়ের মালা লাগান।

পাহাড় যেন এগিয়ে আসে ট্রেনের দিকে। পূর্ণদা বলেন, পুবদিকের ঐ পাহাড়ী প্রদেশ হল দক্ষিণ শান্ স্টেট। ওর পরেই শ্যাম রাজ্য। থাজি স্টেশনে নেমে ঐ পাহাড়ের মধ্যে আমরা যাব। শান্ স্টেট বর্মার মধ্যে হলেও কিছুটা স্বতন্ত্র। সমতলবাসী বর্মীদের সঙ্গে পাহাড়ী ঐ শান্ জাতির অনেক কিছুই মেলে না,—এমন কি, চেহারাতেও। শান্‌রা দেখতে অনেকটা শ্যামবাসীদের মত,—দক্ষিণ চীনেদের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

নীরজ বলে, সেটা স্বাভাবিক। ওরা নিশ্চয় ঐ পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী। এবং পাশাপাশি দেশের অধিবাসীদের মতনই আচার ব্যবহার ও চেহারা হবে, আশ্চর্য কি! একটা দেশের মাঝখানে সীমানা টেনে দুইটা ভিন্ন রাজ্য প্রচার করলেই স্থানীয় লোকেদের স্বাভাবিক চেহারা বদলে যাবে না।

ট্রেন পৌঁছে যায় থাজি জংশন স্টেশনে। রেঙ্গুন থেকে ৩০৬ মাইল। বেলা প্রায় আটটা। মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামা হয়। Kalaw কালো যাওয়ার ট্রেন দাঁড়িয়ে ওদিকের প্ল্যাটফর্মে। ওভারব্রীজ পার হয়ে যেতে হবে। পোর্টার এল মাল নিতে। পুরুষ নয়। শান্ মেয়ে। রঙিন বেশ। মুখে হাসি। চীনেদের মতন মুখচোখ। জোয়ান পুরুষদের মতনই অক্লেশে ভারী মাল তুলে নেয়। ব্রীজ পার হয়। ওপারে ট্রেনে মাল রেখে দেয়। কিন্তু, বিব্রত হতে হল কুলিভাড়া নিয়ে। তারা কত চায়, আর হাতমুখ নেড়ে কি যে বলে কিছুই বোঝা যায় না। খিল্‌খিল্ করে হাসে এবং তারপর এমন হট্টগোল ও চিৎকার শুরু করে দিলে লোক জমবার দাখিল। ভাগ্যক্রমে দুজন টিকিট কালেকটর দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসেন। দেখে আশ্বস্ত হই, তাঁরা বাঙালি। তাঁদের সাহায্যে তখনই মেয়েগুলিকে সন্তুষ্ট করে বিদায় করা গেল।

রেলকর্মী দুজন—বসু ও ঘোষ—সম্প্রতি থাজিতে বদলি হয়ে এসেছেন। আমাদের পেয়ে খুব খুশী। বলেন, এ-ট্রেন এখনই ছাড়বে। কাল বিকেলের ট্রেনে এখানে ফিরে রাত্রে মান্দালের ট্রেন ধরবেন তো? কাল তাহলে অবশ্যই আমাদের আবার দেখা হবে। আরও কয়েকজন বাঙালী আছেন এখানে, তাঁদেরও বলে রাখব।

৮-৪০-এ ট্রেন ছাড়ল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পাহাড় শুরু হয়। ট্রেনও ধীরে ধীরে উঠতে থাকে। গভীর অরণ্য ভেদ করে রেলপথ। এসব বনজঙ্গলে বাঘ ভালুক হাতি প্রভৃতি বন্যজন্তুর বাস হওয়া

স্বাভাবিক, তবে বর্মা প্রসিদ্ধ তার অরণ্যের সেগুন কাঠের Teak wood-এর জন্য।

এই সেগুন কাঠের রপ্তানির ব্যবসা ফেঁদেই ব্রিটিশদের বর্মায় প্রবেশ। বর্মার তৎকালীন রাজার কাছে বড় বড় জঙ্গল জমা নিয়ে গাছ কাটার বিরাট পর্ব শুরু হয়। আকাশচুম্বী সেসব বিশাল গাছ কেটে মানুষের সাহায্যে তুলে আনা সম্ভব নয়, তাই বর্মার জঙ্গলের হাজার হাজার হাতিকে পোষ মানিয়ে তাদের যথাযথ শিক্ষা দিয়ে সেই সব কাটা গাছ সেই হাতিদের দিয়ে ঠেলে, টেনে নদীর জলে raift সাজিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া। তারপর নদীর স্রোতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সেগুলি রেঙ্গুন প্রভৃতি কেন্দ্রে পৌঁছয়। সেখানে কাঠ চেরাবার বিরাট কারখানা। এরপর জাহাজ বোঝাই করে চালান দেওয়া। এই সেগুন কাঠের, এবং বর্মা চালেরও, রপ্তানিই হল বর্মার জগতের সঙ্গে প্রধান বাণিজ্য। বর্মার বনে বাঁশও উৎপন্ন হয় প্রচুর। তবে বাইরে চালান হয় কম। বর্মীদের নিজেদেরই ব্যবহারে লাগে।

ট্রেন চলছে পাহাড়ের গা বেয়ে। গত বছর কেদার-বদরী ঘুরে এসেছি, এখানে এ-সব পাহাড় কত ছোট মনে হয়, সেখানকার মত বড় ঝরনাও নেই। মাঝে মাঝে ঝিরঝির করে নেমে আসে ছোট ছোট জলধারা। Ziz-Zag করে পাহাড়ের উপর দিকে ট্রেন অনেকখানি উঠে আসে। ছোট ছোট স্টেশন। ট্রেন দাঁড়ায়। অল্প পরেই ছাড়ে। যাত্রীর ভিড় নেই। শান্‌বাসীদের মাথায় বড় বড় ধুচনি টুপি। বেতের তৈরি। এদের ভাষা বর্মী নয়, আলাদা। শিক্ষার বিশেষ প্রচলন না থাকলেও এরা দুর্ধর্ষ নয়। শান্ত জাতি। বেশির ভাগ ধানচাষী। চাষ আবাদ নিয়ে থাকে।

ট্রেনের পথে সবচেয়ে উঁচু স্টেশনের উচ্চতা ৪,৬০১ ফুট। পাহাড়ের মাথায় বিশাল মালভূমি। সেইখানে কালো (৪,২৯২ ফুট)। থাজি থেকে ৬৩ মাইল। ৩টা ১৫-তে পৌঁছুই। ট্রেনে তেমন শীতবোধ না হলেও গরম জামা পরা হয়েছে।

কালো জায়গাটি রমণীয় পরিবেশে। পাহাড়ে ঘেরা বিস্তীর্ণ উপত্যকা। স্টেশন-মাস্টারের অনুমতি নিয়ে রেলওয়ে রেস্টহাউস-এ থাকার ব্যবস্থা হয়। আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট থাকলেও তিনি আপত্তি তোলেন নি। স্টেশন থেকে কিছু উপরে পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট বাংলো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চৌকিদার আছে। কিন্তু, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা নেই। নীরজ স্টেশনে নেমে গিয়ে সেখানকার ভোজনালয়ে বন্দোবস্ত করে আসে। জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে দল বেঁধে শহর দেখতে বার হই।

নতুন গড়ে ওঠা হিল স্টেশন। আবর্জনাশূন্য রাস্তার দুধারে সাজানো বাড়ি। ছোট ছোট বাগান। কয়েকটি দোকান। পাশে পাহাড়ের গায়েও নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। নিকটে আর একটা পাহাড়ের মাথায় বৌদ্ধ মন্দির। রাস্তা থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপ উঠেছে উপরে। লোকজনের ভিড় নেই, হৈ-হল্লা নেই। শান্ত পরিবেশ। বিকেলের নরম রোদে পাহাড়ী দেশে ঘুরে বেড়াতে ভালই লাগে। শুকনা আবহাওয়া। স্বাস্থ্যকর স্থান বলে অনুমান হয়।

দুইজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা, সঙ্গে এক মহিলাও আছেন। না, এখানে চাকরিসূত্রে তাঁদের আসা নয়। রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙালী। ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছেন। তাঁদের কাছে খবর পাই, Taung-gyi টংজি যেতে হলে মোটরে যেতে হবে, সেখানে ট্রেন যায় না। আর, এই রাস্তা ধরে অল্প এগিয়ে গেলেই কয়েকটি মোটর কোম্পানির অফিসও দেখতে পাব।

টংজি শান্ স্টেটের প্রধান শহর। এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। পাহাড়ের আরও ভিতরদেশে, সেখানকার উচ্চতা ৪,৭১২ ফুট।

তখনই ঠিক হয়, সুবিধামত মোটর পেলে কাল সেখানেও ঘুরে আসা যাবে।

একটা মোটর কোম্পানির দপ্তরে প্রবেশ করতেই দেখা গেল, এখানেও মোটর-ব্যবসায়ী পাঞ্জাবী! নীরজ বলে, ব্যাপার কি হে! এ যে দেখি, সারা বর্মায় সর্বঘটে ভারতীয়রা যে-যার ব্যবসা ফেঁদেছে। ওকালতি, ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং, চাকরি, স্যানিটারি কারবার, মোটর ব্যবসায়ও!

মোটরের ব্যবস্থা সহজেই হয়ে যায়। কাল সকালে টংজি ঘুরিয়ে কালোয় ফিরে এসে আমাদের থাজি স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তাহলে ফেরবার পথে কালো থেকে থাজি মোটরপথটাও আমাদের দেখা হয়ে যাবে। সারাদিনে প্রায় দেড়শ মাইল মোটরে ঘোরা,—ভাড়া চল্লিশ টাকা। অর্থাৎ আমাদের মাথাপিছু দিতে হবে দশ টাকা ভাড়া!

রাত্রে স্টেশনে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরে ফিরতে দেরি হয়। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে বাংলোয় চলি।

নীচে ঘুমন্ত নিঃসাড় শহর। পাহাড়ের বুকে 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো' আর মাথার উপর 'নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা'—যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

পূর্ণদা বলেন, পরশু কোজাগরী পূর্ণিমা,—মনেই ছিল না।

রাত্রে গায়ে কম্বল ব্যবহার করেও শীত বোধ হয়।

১৭ই অক্টোবর।

সকাল সাড়ে ছয়টায় মোটরে টংজি রওনা। কালো থেকে যাত্রার আগে স্টেশনে গিয়ে আমাদের মালপত্রগুলি ট্রেনে থাজিতে পাঠানোর জন্য 'লাগেজ' করিয়ে দেওয়া হয়। ভারহীন হয়ে ঘুরে বেড়ানোয় মনে স্বস্তি বোধ থাকে।

ভাল করে সবাই গরম জামাকাপড় গায়ে চাপিয়েছি। পাহাড়ে মোটর করে ঘোরা, তার উপর সকালের শীত।

কালো শহর ছাড়িয়ে এসেও পথ অনেকখানি সমতল মালভূমির উপর দিয়েই যায়। চার হাজার ফুটেরও উপর উঁচু পাহাড়ে রয়েছি,—বোঝাই যায় না। দূরে দূরে পাহাড়। গাছপালা এ-অঞ্চলে কম। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড় নিকটে এসে যায়, তাদের পাশ কাটিয়ে পথ বেরিয়ে আসে, আবার সমতল মালভূমি দিয়ে মোটর ছুটে চলে। রেললাইনও এই ধার দিয়ে গেছে। এক জায়গায় লাইন পাহাড় ডিঙোতে লুপ আকারে ঘুরে এগিয়ে যায়। রেলে কালো যাবার পথে হিহো স্টেশন, সেখান থেকে এই রেলপথ পাহাড়ের অপর একদিকে নেমে যায় Shwen-Yaung-এ। সেখানে Inle হ্রদ। আমাদের গন্তব্য টংজি ভিন্ন দিকে।

কালো থেকে ঘণ্টাখানেক আসার পর একটা বড় পাহাড়ের তলায় পৌছুই। ছোট্র গ্রাম। একটা চায়ের দোকান দেখে গাড়ি থামিয়ে চা খাওয়া হয়। শীতের মধ্যে ভালই লাগে। এ চা কোথাকার? হিমালয়ের বা আসামের নাকি? নাঃ। এই দক্ষিণ শান্ স্টেটেও কয়েকটা চা-বাগান আছে। জনকয়েক শান্ গ্রামবাসী কৌতূহলী হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে। দেখে মনে হয় লোয়ার বর্মার বর্মীদের চেয়ে এরা লম্বাচওড়া। লুঙ্গি পরবার ধরনও যেন আলাদা। সবারই মাথায় সেই মস্ত ধুচনি টুপি। জল বৃষ্টি রোদ আটকায়, ছাতার কাজ করে।

মোটর এবার পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেলে আসা সেই নীচের সমতল মালভূমি,—গ্রামের ঘরবাড়ি যেন আঁকা ছবিতে পরিণত হয়। মানুষ গরু, মহিষ যেন পুতুল। সুন্দর দেখতে লাগে। আরও খানিক উপরে পৌছুতেই দৃশ্যপট আরও সুদূরে ছড়িয়ে পড়ে। বাঁদিকে দূরে এক হ্রদ। নাম শুনি White crow। আরও দূরে ঐ আরও বিশাল এক জলাশয়, না? হ্যাঁ। তাই-ই। ড্রাইভার জানায়, ওটা Young Hwe লেক্। ওখানে হ্রদের জলে floating islands—ভাসমান দ্বীপ আছে। সেই সব দ্বীপে লোকজনও বসবাস করে। ঐ অঞ্চলে শান্ রাজার প্রাসাদও।

বেলা নয়টায় টংজি পৌছে যাই। চলে এসেছি আবার এই পাহাড়ের মাথায়,—আর এক সুবিস্তীর্ণ সমতল মালভূমিতে। এখানকার উচ্চতা ৪,৭১২ ফুট। ইংরেজদের অধীনে "স্বাধীন" শান্ নৃপতিদের নিয়ে গঠিত Federated Shan State-এর প্রধান শহর—টংজি। অতএব, বড় লোকালয়ও। এখানেও সোজা বড় বড় সড়ক,—পাহাড়ের মাথায় যেন সিঁথিকাটা। রাস্তার দুপাশে কাঠের বাড়ি। ছিমছাম শহর। সেই পথ ধরে গাড়ি মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে। দুজন পথচারীকে দেখে বাঙালী বলে মনে হয়। তাঁরাও দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকান। গাড়ি ছেড়ে সবাই নামি। আমাদের পরনে ধুতি দেখে এগিয়ে এসে আলাপ করেন,—ইউ. সি. বসু ও পি. সি. বসু। P. W. D.-তে চাকরি করেন। কয়েক মাস হল বদলি হয়ে এসেছেন। অতি-পরিচিতের মতন পীড়াপীড়ি করেন, চলুন, চলুন—নিকটেই আমাদের বাসা, একবার সেখানে গিয়ে তারপর শহর দেখতে ঘুরবেন, আমরাও সঙ্গে থাকব।

তাই করা হয়। তাঁদের বাসায় দু মিনিটের জন্যে ঢুকে তখনই দল বেঁধে রওনা হই শহর দেখতে। তাঁরা বলেন, শহরে দেখার কী আর আছে? ঐ তো ঘর-বাড়ি, দোকানপাট যা দেখছেন। দেখবার যা, তা চলুন ঐ পাহাড়টার উপর Crag-point-এ।

অনেকখানি উঠে পাহাড়ের মাথায় সেই ভিউ পয়েন্ট-এ দাঁড়িয়ে প্রকৃতই চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়।

একদিকে নীচে শহরের বাড়িঘর, পথ, লোকজন,—যেন পটে আঁকা, অপর দিকে পাহাড়ের পর পাহাড় ঢেউ খেলে দিগন্তে গিয়ে মেশে। মনে হয়, যেন হিমালয়ের কোলে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বসু বলেন, ঐদিকে মাত্র ১৮০ মাইল দূরে Kwengta চীনদেশের সীমান্ত। এখন বর্ষার পর দুর্গম পথ।

পূর্ণদা বলেন, আমাদের চেষ্টা করা হবে যদি উত্তর শান স্টেট থেকে কোনরকমে একবার চীন সীমান্তে পৌঁছানো যায়।

পাহাড় থেকে নেমে শহর ঘুরে বসু আবার তাঁদের বাসায় নিয়ে চলেন। ইতিমধ্যে গৃহিণীরা লুচি, তরকারি, মিষ্টি ইত্যাদির আয়োজন করেছেন। কিন্তু, নারীস্বাধীনতার এই বর্মামুলুকেও বাঙালী মেয়েদের পর্দার অন্তরালে বাস। শুনতে পাই, শুধু চুড়ির আওয়াজ, শাড়ির খস্‌খস্‌, ফিস্‌ফিস্‌ করে মৃদু কণ্ঠস্বর,—অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের খাওয়ানোর তদারক করা। মনে হয়, ঠিক যেন বাঙলা দেশে গ্রামে কারও বাড়িতে অতিথি। দুটি ছোট ছেলেমেয়ে একবার পর্দার ওদিকে যায়, আবার আমাদের কাছে আসে, জানায়, মা বলছেন, আরও দুটো গরম লুচে এনে দেব? রেকাবের ঐ সন্দেশটাও তুলে নিন। বাড়ির তৈরি।

আহারে কেমন যেন বিশেষ তৃপ্তি পাই। ভাবি, কোথায় সুদূর বর্মার শান্‌ রাজ্য—তাও আবার রেলপথের বাইরে,—সেখানে যেন নির্বাসিত এই বাঙালী গৃহবধূদের নিঃসঙ্গ বন্দী জীবন। আজ হঠাৎ কয়জন স্বদেশবাসীকে ক্ষণিকের অতিথি পেয়ে পরমাত্মীয় সেবার আনন্দ লাভে উন্মুখ।

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেলা ১ টা ৪০-এ কালো অভিমুখে যাত্রা। আবার সেই পাহাড়ের পথ। পুরানো হলেও যেন নতুন লাগে। কালো পৌঁছাই বেলা দেড়টায়। স্টেশনের ভোজনালয়ে দুপুরের খাবারের অর্ডার দেওয়া ছিল। খাওয়া সেরে ঘণ্টা দেড়েক পরে সেই মোটরেই থাজি রওনা হই। ট্রেনের পথের চেয়ে মোটরের পথ যেন আরও সুন্দর মনে হয়। একটা পাহাড়ী নদী কোন্‌দিক থেকে বেরিয়ে এসে মোটর-পথের সঙ্গ ধরে। এঁকে বেঁকে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। জলোচ্ছ্বাসের কলকল ধ্বনি বনতল মুখরিত করে। তারপর একসময়ে মোটর-পথ সেই মধুর সঙ্গ ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে সমতলে নামতে থাকে। সঙ্গী ললিতবাবুর এখানেও মাথা ঘোরে। পূর্ণদা বলেন, তোমার যে দেখি, সমুদ্রেও যেমন, পাহাড়েও তেমনি!

বেলা ৫টা ৪০-এ থাজি স্টেশনে পৌঁছুই। সেখানে বসু ও ঘোষের সঙ্গে দেখা। উৎফুল্ল হয়ে তাঁরা বলেন, আপনারা এলেন কিভাবে? মোটরে? কালোর ট্রেন এলে আমরা আপনাদের খুঁজে পেলাম না, ভাবলাম, আজ বুঝি আপনাদের ফেরা হল না। যাক, রাত্রে আমাদের বাসায় খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। তারপর মান্দালের ট্রেন ধরবেন।

এখান থেকে আমাদের মান্দালে এক্সপ্রেসে যাবার কথা। কিন্তু, এখন খবর নিয়ে জানা গেল, সে ট্রেনে জায়গা নেই, রিজারভেশন ও টিকিট পাওয়া যাবে না। অগত্যা শেষ রাত্রের একটা Mixed train—যাত্রী ও মালবাহক ট্রেনে চারখানা সেকেন্ড ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করা হয়। কিন্তু, মান্দালেতে অটলবাবুর মক্কেল এক চেটিয়ারের দপ্তরে খবর দেওয়া আছে, তাঁদের লোক স্টেশনে আসবে আমাদের নিতে এক্সপ্রেসের সময়, এখন ট্রেন-বদলের খবর তাঁদের দেওয়া যায় কি করে?—বসু বলেন, ভাববেন না, এক্সপ্রেসের গার্ডকে বলে দেব, সে জানিয়ে দেবে।

বসুরা তখনকার মত বিদায় নিয়ে তাঁদের কাছে চলে যান। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আমরা আপাতত ওয়েটিং-রুমে আশ্রয় নিই। সেই সকাল থেকে পাহাড়ী পথে মোটরের ঝাঁকানি খেয়ে শরীর ক্লান্ত। পাহাড় থেকে নেমে এসে এখানে গরমও বোধ হয়। ওয়েটিং-রুমে মালপত্র রেখে ঘরের বাইরে একটু দূরে খোলা প্ল্যাটফর্মে চেয়ার এনে চার মূর্তি বিশ্রাম নিতে থাকি। আরও দুজন মহিলা রেলকর্মী দেখা করতে আসেন। এইভাবে মালপত্র ঘরে ছেড়ে রেখে বাইরে এখানে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকতে দেখে তাঁরা সাবধান করেন, এ-অঞ্চলে—বিশেষত থাজি ও মান্দালের রেলপথে প্রায়ই চুরি হয়; যেন বিশেষ সতর্ক থাকি। কয়েকদিন আগেই এই স্টেশনে এক মিলিটারি অফিসারকে রাত কাটাতে হয়। গরম কাল। তিনি এইভাবে ঘরের বাইরে ইজিচেয়ার আনিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। আশপাশে তাঁর লোকজনও ঘুমুচ্ছিল। ইজিচেয়ারের হাতলের উপর সাহেবের রিভলবার রাখা ছিল। সাহেবের ঘুম ভাঙলে দেখেন, সেটি নেই! বহু অনুসন্ধানেও সেটির উদ্ধার হয়নি। এমন ঘটনা এখানে প্রায়ই ঘটে।—এই সব গল্প শুনতে শুনতে

সময় কাটে। একটু রাত হলে বসুরা আসেন, তাঁদের বাসায় নিয়ে চলেন। ওয়েটিং-রুমে তালাচাবি লাগানোর ব্যবস্থা করেন।

স্টেশনের নিকটে কাঠের দোতলা বাড়ি। নীচের উঠান থেকে কাঠের আধভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা। এক ভদ্রলোক উপর থেকে লণ্ঠনের আলো দেখান। উপরে উঠে দুখানা ঘর। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। এক কোণে একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার। কাঠের পাটাতনের মেঝে, তার উপর মাদুর বিছানো। একপাশে গুটিয়ে জড় করে রাখা বিছানা। সেখানে দেওয়ালের কোণে পেরেক থেকে মশারির দড়ি ঝোলে। বিছানার ওপর পাটকরা মশারির স্তূপ। রাস্তার দিকে কাঠের অপরিসর ঝোলা বারান্দা। এত ছোট যে পা ছড়িয়ে বসা যায় না। সেইখানেই আমরা একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে বসি। এই ছোট দুটি ঘরে এঁরা ছয়জন থাকেন। নিজেরাই রান্না করেন। খেতে বসে দেখি, ভাত, ডাল, আলুভাজা ও মাংস রেঁধেছেন। মাংসটা হয়ত আজ অতিথিদের জন্য বিশেষ পদ। নিরামিষ খাই শুনে অপ্রস্তুত ও লজ্জা বোধ করেন। আমি আশ্বাস দিই, আমি খাই খুবই কম এবং ভাত, ডাল, আলুভাজায় আমার ভালই খাওয়া হয়ে যাবে, কোনই অসুবিধা হবে না। তাঁরা মানতে চান না। তাঁদের কারও জন্যে বোধ করি খানিকটা দুধ রাখা ছিল, তাই দিয়ে ভাত মেখে খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। খেতেও হয়।

এই প্রবাসী চাকুরিজীবী বাঙালী ভদ্রসন্তানগুলির এইভাবে স্বাবলম্বী হয়ে অতি সাধারণ পরিবেশে মিলেমিশে একসঙ্গে থাকা, স্বপাক আহার, সহজ সরল আন্তরিকতা ও আপন-করা ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে। প্রকৃতই এঁরা 'ভাই-ভাই-এক-ঠাঁই'। অথচ, স্বদেশে এই মনোভাবের অত অভাব কেন? তাঁদের সেই অকিঞ্চন আয়োজন বিদুরের খুদের মত অসামান্য ও অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে।

স্টেশনে ফিরে সেখানে প্রায় সারারাতই কাটাতে হয়। 'মিক্সড্ ট্রেন' সেই শেষ রাতে ৩টা ১৫-তে। মান্দালে পৌঁছুবে সকাল ৮-১৫-তে। সবারই শরীর ক্লান্ত। এই পাঁচ ঘণ্টা ঘুমানো চাই-ই। এদিককার ট্রেনে সেকেন্ড ক্লাসে চারটা বার্থ। সবগুলাই আমাদের রিজারভেশন। কিন্তু, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমানো যাবে কী করে? কামরার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করার ছিটকানি নেই! আর এই মন্থরগতি ট্রেন সব স্টেশনেই দাঁড়ায়। যে-রকম চুরির উৎপাত শোনা গেল, মালপত্র নিয়ে কী করা যায়? নীরজের কাছে একটা লম্বা শিকল ছিল, সে সেইটে বার করে। বলে, "খেলার মাঠে টিম-এর প্লেয়ারদের কমবিনেশনের মত কি করি দেখ।" চারজনের চারটে সুটকেসের হাতলের মধ্যে দিয়ে চেনটা চালিয়ে, সব কয়টা একসঙ্গে করে, চেনে তালা লাগায়। অর্থাৎ চুরি করে নিয়ে যেতে হলে চারটে সুটকেসই একসঙ্গে তুলে নামাতে হবে। পূর্ণদা বলেন, এতগুলো ঐভাবে যদি কেউ নিঃশব্দে নামিয়ে নিয়ে পালাতে পারে, আর তবুও আমাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ না হয়, তাহলে ওগুলো অগত্যা যাবেই, যাওয়া উচিতও।—বলে হাসেন।

নীরজ যোগ করে, শুধু তাই নয়। ট্রেন থেকে ওভাবে বার করে নেওয়ার প'রই যদি কেউ ঘুম ভেঙে চোরকে দেখতেও পায়, তাহলেও তাকে তার কাজে বাধা দেওয়া হবে না।

১৮ই অক্টোবর।

সকালে ঘুম ভাঙতে প্রথমেই চোখের দৃষ্টি যায় সুটকেসগুলির দিকে। নাঃ, সব ঠিকই যথাস্থানে রয়েছে। ট্রেনের জানলা দিয়ে তাকাই। বাইরে রোদ উঠেছে। অল্প দূরে পাহাড়ের সারি। ট্রেন সশব্দে একটা নদীর উপর পুল পার হল। স্টেশন আসে। ট্রেন দাঁড়ায়। সান্‌জু মহামুনি,—নাম দেখে পূর্ণদা বলেন, এর পরেই তো মান্দালে। এখানে এক অতি প্রাচীন প্যাগোডা আছে,—মান্দালে থেকে এসে দেখতে হবে।

স্থানটি যে বড় তীর্থক্ষেত্র,—বহু যাত্রীদের এখানে নামতে দেখে তা বোঝাই গেল।

সওয়া আটটায় মান্দালে পৌঁছুলাম। রেঙ্গুন থেকে ৩৮৬ মাইল। আমরা থাজি থেকে এলাম মাত্র ৮০ মাইল। চেট্টির কোন লোকজনের দেখা পাওয়া গেল না। হয়ত গার্ডসাহেব তাদের খবর দিতে পারেন নি। পূর্ণদা বলেন, সেকেন্ড ক্লাসে আসাটাই বৃথা গেল। নীরজ বলে, ও-কথা বলা চলে না। ঘুমিয়ে দাম তুলে নেওয়া গেছে।

চেট্টির ঠিকানা ছিল। দুটো টাঙ্গা নিয়ে সেইখানে চলি। প্রকাণ্ড শহর। রেঙ্গুনের পরেই বড় শহর

হিসাবে মান্দালের স্থান। এখানেও রাস্তায় ট্রাম চলে। তবে ট্রামগাড়িগুলির অবস্থা তেমন ভাল নয়। কলকাতার মত চমৎকার ট্রাম বর্মায় কেন, বম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লীতেও দেখিনি। মান্দালেরও রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন।

বাজারের মধ্যে চেট্টির গদীর সুমুখে গাড়ি দাঁড় করায়। পূর্ণদা নেমে খোঁজ নিতে যান, আমরা গাড়িতে বসে অপেক্ষা করি। গাউন-পরা একটি বর্মী মেয়ে—বেশভূষা দেখে অ্যাংলো-বর্মিজ বোঝা যায়, (আমাদের দেশের অ্যালো-ইন্ডিয়ানদের মত এদেশেও এক জাতির উদ্ভব হয়েছে দেখি)—এগিয়ে এসে নীরজের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানায়—Hospital Charity Football Match, Mandalay vs Maymyo—তার টিকিট কিনতে হবে। অযথা বাক্যব্যয় না করে একটা টাকা দেওয়া হয়। হেসে নীরজকে বলি, ভারতীয় সেরা দলের খেলোয়াড় তুমি,—দেখেই চিনতে পেরেছে বোধহয়।

চেট্টির এক কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ণদা ফিরে আসেন। স্টেশনে এক্সপ্রেসের সময় ইনি গিয়েছিলেন। গার্ডসাহেব কিছু তাঁকে জানাননি। শহর থেকে কিছু দূরে একটা বাগান-বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেইখানে সঙ্গে করে নিয়ে চলেন।

পথে যেতে বর্মার শেষ রাজা থিব-র রাজপ্রাসাদ দেখতে পাওয়া গেল। কিছু দূরে মাথা তুলে মান্দালে পাহাড়।

বাগান-বাড়িটি প্রকাণ্ড। কোণের একটা ঘর—মন্দির, সেখানে বিগ্রহ মূর্তি। মাঝখানে মস্ত বড় হল্-ঘর। সেইখানে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা। হল্-এর একপাশে স্তূপীকৃত বস্তা সাজিয়ে রাখা,—নিশ্চয় চেট্টির ব্যবসার পণ্যসামগ্রী। আমরা এক রাত্রের অতিথি। আজ ও কাল মান্দালের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে কালই বিকেলে মেমিও রওনা হব। চেট্টির কর্মচারী নিকটের দোকান থেকে চা, বিস্কুট, টোস্ট এনে দিলেন। তাই খেয়ে তখনই মান্দালে পাহাড় দেখতে রওনা হই।

রাজপ্রাসাদের উত্তর-পুবে সমতল থেকে পাহাড়টি যেন হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। ৭৭৪ ফুট উঁচু। উপরে যাওয়ার জন্য পাহাড়ের গায়ে ছাউনি-দেওয়া শান-বাঁধানো চওড়া সোপান-শ্রেণী। উঠবার পথের আশেপাশে বহু ছোট ছোট প্যাগোডা। দূরেও কয়েকটি দেখা যায়। বুদ্ধদেবের মূর্তিও সর্বত্র। সোয়েডাগন প্যাগোডার মতন এখানেও দলে দলে বর্মী মেয়ে-পুরুষ উঠে চলেছে। নানা রঙে রঙিন তাদের বেশভূষা। হাতে কানে দামী গহনা ঝিক্‌মিক্ করে। বুদ্ধের মূর্তির সামনে বাতি ধূপ জ্বেলে ফুল সাজিয়ে যুক্তকরে বসে বর্মীরা। মাঝপথে প্রকাণ্ড দাঁড়ানো এক বুদ্ধমূর্তি। এক হাত বাড়িয়ে যেন মান্দালে শহরের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করছেন। বর্মার রাজা মিন্ ডন্-মিন্-এর রাজধানী ছিল এখান থেকে ক'মাইল দূরে অমরাপুরে। প্রবাদ, এখন যেখানে মান্দালে শহর সেই স্থানে নতুন রাজধানী স্থাপনা করতে বুদ্ধদেব রাজাকে স্বপ্নাদেশে আঙুল তুলে নির্দেশ দেন। এই বিরাট বুদ্ধমূর্তি সেই স্বপ্নকাহিনীরই রূপায়ণ। রাজা মিন্-ডন্ সেইমত ১৮৫৭ সালে এই শহরের ভিত্তি-স্থাপন করেন এবং ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত এইখানেই বর্মারাজার শেষ রাজধানী।

আরও খানিক উপরে উঠলে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধদেবের আর একটি মূর্তি। সেখানে বর্মী মেয়ে-পুরুষ পূজারত। পাহাড়ের মাথায়ও প্যাগোডা। অনেকখানি বাঁধানো চত্বর। নিকটে ফুঙ্গীচঙ্—ফুঙ্গীদের বড় বিদ্যালয়। সারা বর্মা জুড়ে এর খ্যাতি।

মান্দালে পাহাড়ের উপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য রমণীয় দেখায়। অদূরে ইরাবতী নদী ও সাগাইন্ পর্বতমালা,—সেই পটভূমিতে এই পাহাড়ের পাদদেশে মান্দালে শহর, বিরাট এলাকা জুড়ে দুর্গ, তারই মাঝখানে ছবির মত রাজপ্রাসাদের গৃহগুলি, দিকে দিকে প্যাগোডা,—বিশেষত Kuthodaw বা Maha Lawkamarazein[1]-এর ৭৩০ প্যাগোডার অপূর্ব সমারোহ!

পাহাড়ের মাথায় ঘুরে ঘুরে দেখতে বেলা হয়ে যায়। বাড়ি ফিরি।

বিকালে আবার ঘুরতে বার হওয়া। প্রথমেই যাওয়া হয় চেট্টির গদীতে। সকালে ম্যানেজার ছিলেন না, আমাদের থাকার ব্যবস্থাদির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানানো কর্তব্য।

মাদ্রাজী ম্যানেজার। ভদ্র ব্যবহার। বললেন, আমাদের কোনও রকম অসুবিধা হলে তাঁকে তখনই জানাতে যেন কুণ্ঠিত না হই। পরদিন মেমিও পৌঁছে দেবার জন্য মোটর দেবেন জানালেন।

তাঁর কাছে আরও জানতে পারি, এই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিক—দাক্ষিণাত্যের খ্যাতনামা ধনী স্যার

আনামালাই চেটিয়ার। চিদাম্বরম-এর নিকটে আনামালাই নগরে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত আনামালাই বিশ্ববিদ্যালয়। বর্মায় চেটিয়াদের প্রধানত মহাজনী ব্যবসা। বর্মীরা খরচে জাত। আয়ব্যয় সামলে চলা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ। এদেশে অতি দরিদ্র লোকও ধার করে সিল্কের লুঙ্গি কিনে পরতে দ্বিধা করে না। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—বর্মীদের যেন মূলমন্ত্র। এই পরিস্থিতিরই সুযোগ নিয়ে চেট্টিরা টাকা ধার দেওয়ার একচেটিয়া কারবার করে। বিপুল অর্থ উপার্জন হয়। সারা বর্মায় এদের অসীম প্রভাব প্রতিপত্তি।

দোকান থেকে বেরিয়ে বাজার দেখতে যাওয়া হয়। প্রকাণ্ড মার্কেট। আপার বর্মার প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র। ব্লক করে ভাগ করা। এক এক অংশে এক এক রকম মালপত্র পাওয়া যায়। শাকসব্জি, ফল, বিবিধ শস্যাদির আড়ত ও বড় বড় দোকান তো আছেই। বর্মীদের তৈরি নানাবিধ খেলনা, পুতুল, রঙবেরঙের ছাতা, লুঙ্গি, বর্মী পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতা, কত রকম সিল্ক, গালার কাজ-করা কৌটা, চুপড়ি, সুন্দর নক্‌শা ও ছবি-আঁকা পানের ডিবা, রূপার ও হাতির দাঁতের জিনিস, কাঠের আসবাবপত্র, মণিমুক্তা অলঙ্কারের দোকান,—কত আর ঘুরে ঘুরে দেখা যায়! ক্রেতাদের ভিড়। সুসজ্জিতা বর্মী মেয়েরাই বেশি, পরনে দামী সিল্কের রঙিন লুঙ্গি, মাথায় সেই বিপুল খোঁপা, তাতে ফুল গোঁজা, আর হাতে বা মুখে লম্বা চুরুট। পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির লোকও এখানে দেখি,—শান, কাচিন, চীনেও যেমন, তেমনি ভারতীয়ও,—মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, নেপালী প্রভৃতি।

বাজার থেকে সেই মান্‌জু মহামুনি প্যাগোডা দেখতে চলি। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে। আজ সকালে এখানেই ট্রেন থেকে বহু যাত্রী নামতে দেখেছি।

এখানেও প্যাগোডার বাইরে বড় বাজার। প্যাগোডার ভিতরে যাওয়ার চার দিকে চারটি প্রবেশ-পথ। বাঁধানো সুড়ঙ্গের মতন। এখানেও সেই ফুল-ধূপ-বাতি, খেলনা, লুঙ্গি ইত্যাদির সারি সারি দোকান। মন্দিরের ভিতরে বিশাল বুদ্ধমূর্তি, ভূমিস্পর্শমুদ্রায় আসীন। এক তরুণ ফুঙ্গী আমাদের দেখে এগিয়ে আসেন। বলেন, ভারতের বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি তিনি ঘুরে এসেছেন। এখানকার এই মূর্তিটির ইতিহাসও তাঁর কাছে শুনি। পিতলের মূর্তি, এখন সোনার পাতে মোড়া। বারো ফুট উঁচু। এই প্যাগোডাকে 'আরাকান প্যাগোডা'ও বলা হয়। তার কারণ পশ্চিম বর্মার সেই সুদূর আরাকানের আকিয়াব-এ এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৭৮৪ সালে বর্মার রাজা Bodawpaya আরাকান জয় করবার পর মূর্তিটি এখানে নিয়ে আসেন। আকিয়াবে সেই পুরানো শূন্য মন্দির এখনও রয়েছে। এই মূর্তির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এক উপাখ্যানের প্রচলন আছে। তাও ফুঙ্গীর কাছে শুনি। মূর্তিটি নাকি তৈরি হয় বুদ্ধদেবের জীবিতকালে। পিতলের এই প্রকাণ্ড বিগ্রহ বিভিন্ন অংশে তৈরি করে শিল্পী যখন সেগুলি সংযুক্ত করার চেষ্টা করেন, অংশগুলি কোনক্রমেই যথাযথ জোড়া লাগানো যায় না। সুদূর ভারতে বসেও বুদ্ধদেবের মনে তাঁর ভক্তের এই ব্যর্থতায় অনুকম্পা জাগে। স্বয়ং আবির্ভূত হন আকিয়াবে। মূর্তিটি বাহুপাশে সাতবার দৃঢ় আলিঙ্গন করেন। মূর্তিটিও জোড়া লেগে এমনই নিখুঁতভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে যে ভক্তেরা দেখে নির্ধারণ করতে পারে না, কে স্বয়ং বুদ্ধদেব আর মূর্তিই বা কোন্‌টি!

সেই প্রাচীন কাহিনীর কারণেই সোয়েডাগন প্যাগোডার সমতুল প্রধান তীর্থক্ষেত্র এই আরাকান প্যাগোডাও। এখানেও তাই প্রতিদিনই দলে দলে যাত্রী আসে।

ফুঙ্গী আরও জানান, পেশোয়ারে শাহাজি-কি-ধেরি (Shahji-Ki-Dheri) স্তূপের মধ্যে কণিষ্কের স্থাপিত বুদ্ধদেবের যে ভস্মাধার ১৯০৯ সালে আবিষ্কৃত হয়, সেটিও এখানে এনে এই প্যাগোডার কোষাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।

প্যাগোডার পাশেই বিশাল সরোবর। কচ্ছপ ভাসে, দেখি।

প্যাগোডা দেখে ফিরতে সন্ধ্যা হয়।

বর্মীদের এখন এক উৎসব চলেছে। Thadingyut। বর্ষা শেষ হওয়ার আনন্দ-উৎসব। চারদিকে ঘরে ঘরে, দোকানে, পথের দুপাশের ফুটপাতেও আলোকসজ্জা। রঙবেরঙের জাপানী ফানুসে ও কাগজের লণ্ঠনে দীপ ও বাতি জ্বলছে। ফানুস উড়ছে। আতশবাজি পুড়ছে। হুস্ শব্দ তুলে হাউই আকাশপানে উঠছে। নতুন পোশাকে সাজগোজ করে বর্মীরা ঘুরছে। খাওয়াদাওয়ারও আয়োজন চলেছে। এ-যেন আমাদের দেওয়ালি উৎসব। মনে হয়, যেন কোন এক মায়ারাজ্যে চলে এসেছি।

ঘরে ফিরেও বহুক্ষণ সেই আলোর মেলা যেন চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

১৯শে অক্টোবর।

সকালে বর্মার রাজার প্রাসাদ দেখতে চলি। দুর্গের মধ্যে স্থাপিত শহর ও প্রাসাদ। ব্রিটিশরা দখল করার পর সেনানিবাসভাবেই এর অংশবিশেষ ব্যবহার করে। নামকরণ হয় ডাফরিন ফোর্ট। ২৬ ফুট উঁচু ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা চতুষ্কোণ বিশাল এলাকা। প্রতি দিকের প্রাচীর সওয়া মাইল লম্বা। দুর্গের চারি পাশ ঘিরে পরিখা। ৭৫ গজ চওড়া। রাজার আমলে এখানে সুসজ্জিত বজরা ভাসত। এখন জল থাকলেও কচুরিপানায় ছেয়ে আছে। গড়খাই পারাপারের জন্যে চার দিকে চারটি পুল। তারপর দুর্গের কয়েকটি গেট। ভিতরে প্রবেশ করে সেনামহল, বাগান, হ্রদ, রাজদপ্তরের বাড়ি-ঘর। দুর্গ-এলাকার ঠিক মধ্যখানে রাজপ্রাসাদ। একতলা,—অথচ প্যাগোডার মত চূড়া,—২৫৬ ফুট উঁচু, স্তরে স্তরে আকাশ-পানে মাথা তুলে। সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি। নানান রঙে রঙিন। অপরূপ কারুকার্যময়। শুনি, এই প্রাসাদই রাজাদের পূর্ব রাজধানী অমরাপুরে ছিল, সেখান থেকে উঠিয়ে এনে এখানে বসানো। ভিতরে প্রবেশ করে ঘুরে ঘুরে দেখি। মহলের পর মহল। চতুর্দিকে কাঠের উপর বর্মার শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শন। কয়েকটি প্রকাণ্ড দরবার-হল। কক্ষে কক্ষে কত বিভিন্ন ডিজাইনের রাজসিংহাসন,—Lion throne, Elephant throne, Goose throne, Deer throne, Bee throne, Conch throne, Lily throne, Peacock throne। প্রায় দোতলা সমান উঁচু। সেগুন কাঠের তৈরি। সর্বাঙ্গ গিল্টি করা। মনে পড়ে, ইংরেজরা মান্দালে জয় করার পর এখান থেকে এই রকমই এক বিরাট-আকার সিংহাসন কলকাতায় নিয়ে যায়। কলকাতার যাদুঘরের আর্ট-গ্যালারিতে সেটি দেখেছি।

এই সিংহাসনগুলি সেকালে শুধু স্বর্ণমণ্ডিতই নয়, বহুমূল্য মণিমুক্তাখচিতও ছিল। এখন সম্পূর্ণ নিরাভরণ। কাঠের গায়ে শূন্য কোটর যেন দৃষ্টিহারা অভাগার চক্ষু। স্বাধীনতা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে এ-সব রত্নাবলীও লুণ্ঠিত হয়েছে।

প্রাসাদের পাশে একটা হল্-এ এখন মিউজিয়াম। রাজার পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, বর্মী সেনাদের অস্ত্রশস্ত্র, সাজপোশাক ইত্যাদি বহু জিনিসপত্র সেখানে সাজিয়ে রাখা।

যে ফুঙ্গীচঙ্-এ রাজা থিব ফুঙ্গী হয়ে কিছুদিন কাটান, সেটিও দেখি। তার নিকটেই রাজা মিন্-ডন্-এর সমাধি। মিন্ডন্ই এই সুদৃশ্য বিরাট রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৫৭ সালে। আর, ১৮৭৮ সালে এখানে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজা হন তাঁর ছোট ছেলে থিব। ইংরেজরা তখন লোয়ার বর্মায় আধিপত্য বিস্তার করেছে। তাদের লুব্ধ দৃষ্টি রয়েছে আপার বর্মার প্রতি। এ-অঞ্চলেও ব্রিটিশদের কাঠের ব্যবসা তখন পূর্ণ উদ্যমে চলেছে। সেই সূত্রে থিব-র সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদের ছলছুতার অভাব হয় না। ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করে। সৈন্যসামন্ত নিয়ে ব্রিটিশ মানোয়ারী জাহাজ চলে আসে ইরাবতী বেয়ে এই মান্দালেতে। মান্দালে পৌঁছায় ১৮৮৫ সালের ২৮শে নভেম্বর সকালে। এই দুর্গদ্বারে যুদ্ধের একটা প্রহসন মাত্র হয়। এমনই যুদ্ধ যে, ব্রিটিশদের দশজনেরও প্রাণহানি ঘটে না! ২৯শে রাত্রের মধ্যেই দুর্বল অক্ষম রাজা থিব General Pendergast ও Col. Sladen-এর হাতে বন্দী হন। রাজার কোষাগারের বিপুল ধনরত্ন দখল করে এই লড়াই-এর খরচ আদায় করে ব্রিটিশ। রাজা থিব-কে নিয়ে যায় ভারতে। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৯১৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সেইখানেই থিব-র মৃত্যু। ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে, একটিমাত্র বাক্যে রচিত সংক্ষিপ্ত এই প্রচারপত্র জারি করে সারা বর্মাদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হয়ে যায় :

"By command of the Queen-Empress it is hereby notified that the territories formerly governed by King Theebaw will no longer be under his rule, but have become part of Her Majesty's dominions, and will, during her Majesty's pleasure, be administered by such officers as the Viceroy and Governor-General of India may from time to time appoint. Dufferin."

সেই Viceroy Dufferin-এর নামেই এই দুর্গ।

রাজপ্রাসাদ দেখে চলি মান্দালে হিল-এর নীচে Kuthadaw-র প্রসিদ্ধ প্যাগোডা দেখতে। থিব-র

পিতা রাজা মিন্‌ডনের এটিও এক মহান্ কীর্তি। ১৮৫৭ সালে এই শহর প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের মন্ত্রগুলি নির্ভুলভাবে চিরস্থায়ী করে রাখার উদ্দেশ্যে ৭২৯টি পাথরে সেগুলি খোদাই করে লেখান এবং সারি সারি মন্দির তুলে প্রত্যেকটির দেওয়ালে এক একটি করে গেঁথে রাখেন। এই কারণেই Kuthadaw প্যাগোডা ঘিরে এতগুলি ছোট ছোট প্যাগোডার সমাবেশ।

মান্দালে দেখা শেষ হয়। ঘরে ফিরি। চেটিয়ার ম্যানেজার বলেছেন, মেমিও যাবার জন্য মোটর পাঠাবেন এগারোটার পরই। তাড়াতাড়ি স্নান আহার সেরে সবাই তৈরি থাকি। মোটরও এসে যায়। মান্দালে ছাড়বার আগে চেটিয়ারের গদীতে যাওয়া হয় বিদায় নিতে এবং মোটরের ভাড়াও জানতে। কিন্তু ভাড়া নিতে তিনি কোনমতেই রাজি হন না। অগত্যা ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেওয়া হয়।

মেমিও বর্মা গভর্নমেন্টের হিল-স্টেশন,—যদিও মাত্র ৩,৫৩৮ ফুট উঁচু। মান্দালে থেকে ৪৩ মাইল দূরে। মান্দালে ছাড়িয়ে মাইল ষোল সমতল পথ। তারপর পাহাড় শুরু। মোটরের রাস্তা অতি যত্ন করে রাখা। পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিশেষত্ব নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে আধাআধি ওঠার পর একটা ভিউ-পয়েন্ট থেকে নীচের সমতল ক্ষেত্রের ও দূরে ইরাবতীর দৃশ্য ওরই মধ্যে যা দেখতে ভাল। মান্দালে থেকে মেমিও আসার রেলপথও আছে। পাহাড়ের গায়ে একটা Zigzag loop করে সে-পথ পাহাড়ের মাথায় উঠে এসেছে।

পাহাড়ের উপরে পৌঁছে সুবিস্তীর্ণ মালভূমি। পাহাড়ে রয়েছি, মনেই হয় না। দূর থেকে মেমিও শহরের বড়-বাড়ি চোখে পড়ে। দূরে দূরে মাথা তুলে গিরিশ্রেণী।

প্রায় দুটার সময় বেঙ্গলী ক্লাবের সুমুখে মোটর গিয়ে দাঁড়ায়। যদি সুবিধা হয়, এইখানেই রাত্রি কাটানো যাবে। না হলে, আর কোথাও ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্ণদা বলেন, আমার আপন এক মেসোমশাই এখানে ওকালতি করেন। কিন্তু জ্ঞান হওয়া অবধি আমি তাঁকে দেখিনি। নামটাও ঠিক জানতাম না। আসার সময় রেঙ্গুনে শ্বশুর মশায়ের কাছে জেনে এসেছি,—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনই যাই তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। মাসীমাও আমাকে দেখেছেন সেই ছেলেবেলায়।

ক্লাব হাউস-এ এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি জানান, এখানে থাকার কোন অসুবিধা হবে না, এত বড় হল্ রয়েছে, বিছানা আপনাদের সঙ্গে আছে, পেতে শুয়ে পড়বেন। কিন্তু, খাওয়ার ব্যবস্থা এখানে নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও কয়েকজন বাঙালী এসে যান। আমাদের পেয়ে সবাই উৎফুল্ল। কয়েকজনই আগ্রহের সঙ্গে নিমন্ত্রণ করেন, তাঁদের বাড়িতে খাওয়ার জন্যে। পূর্ণদাও ইতিমধ্যে ফিরে এসে জানান, তাঁর মাসীমার কাছেই রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বলেন, বাড়িতে ঢুকতেই মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা। দুজনে কেউ কাউকে চিনি না। আমি অবশ্য তাঁকে দেখে ঠিকই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। তারপর পরিচয় দিতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ওদিকে মাসীমাও এসে দাঁড়িয়েছেন,—ওমা! ন্যাড়া তুই! কতকাল পরে দেখা!—দুজনেই খুব খুশি। কোনমতেই ছাড়বেন না, রাত্রে খাওয়ার কথা তো বললেনই, ওঁদের কাছে থাকার জন্য পাড়ীপীড়ি করতে লাগলেন। বললাম, আমরা চারজন রয়েছি, আর একটা রাত কাটানো। ক্লাবে জায়গা পেলে সেখানেই আমাদের থাকার সুবিধা হবে।

নিকটের একটা দোকান থেকে চা বিস্কুট আনিয়ে ক্লাবে সবাই মিলে খাওয়া হয়। তারপর, একটা মোটর ভাড়া করে শহরে চার মূর্তি ঘুরতে বার হই। এদেশের পক্ষে শহর বড়ই। এখানেও রাস্তাগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে কালোর নতুন হিল-স্টেশন এর চেয়ে ভাল লেগেছিল। এখানে পাহাড়ী আবহাওয়ার যেন অভাব। Butler Lake, Botanical Garden ঘুরে জিগন ফয়া মন্দির দেখে ফেরবার পথে দূরে রাগবি খেলা হচ্ছে দেখে নীরজের উৎসাহ জাগে, 'চল, ঐ দেখা যাক।' Manchester Vs Rangoon Gymkhana। দুই দলেই সাহেব খেলোয়াড়। এ-শহরও যেন সাহেবদের জন্যে তৈরি—পথঘাট, বাগান, পার্ক,—সব ছিমছাম করে সযত্নে রাখা।

খেলা দেখে বড় রাস্তা দিয়ে আসতে চ্যাটার্জি ব্রাদার্স নামে দোকান দেখে ভিতরে ঢুকি। মালিক চাটুজ্যে মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। ঐখানে পুটিয়ার জমিদার বংশের এন. রায় চক্রবর্তীর সঙ্গেও আলাপ। অতি বিনয়ী, নম্র আচরণ তাঁর। বলেন, ক্লাবেও আবার দেখা হবে। দোকান থেকে বেরিয়ে অল্প

যেতেই এক বাড়িতে সাইন-বোর্ড দেখি,—ডাক্তার এস. সি. মুখার্জী। সেখানেও যাই। তাঁর সঙ্গেও কিছুক্ষণ গল্প হয়। উত্তরপাড়া অঞ্চলে তাঁর বাড়ি। সেখান থেকে চলে এসেছেন এইখানে ডাক্তারি করতে। তাঁর বাড়িতে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু, কাল সকালে আপার শান্ স্টেটের আরও পূর্বাঞ্চলে ঘুরতে বার হব, তাই তাঁর নিমন্ত্রণ নেওয়া সম্ভব হয় না।

এইভাবে সময় কাটিয়ে সন্ধ্যায় পূর্ণদার মেসোমশায়ের বাড়ি অভিমুখে রওনা হই। পথে পূর্ণদাকে জিজ্ঞাসা করি, মাসীমাকে বলেছেন, দলে একজন নিরামিষাশী?

পূর্ণদা বলেন, ঐ দেখ! সে-কথা মনেই ছিল না।

আমি বলি, আমার যা খাওয়া, না বললেও অসুবিধা হবে না।

কিন্তু, আমার অসুবিধা না হলেও ঘটনাচক্রে মাসীমাকে অপ্রতিভ করে নিজেই লজ্জা পেতে হয়।

মেসোমশায়, মাসীমা দুজনেই চমৎকার লোক। সযত্নে মাসীমা সব আয়োজন করেছেন। নানান পদও রান্না করেছেন। কিন্তু, খেতে বসে আমার চক্ষুস্থির! তাকিয়ে দেখি, প্রত্যেকের থালায় পোলাও-এর মাথার উপর যেন সোনার মুকুট পরা এক-একটা বিরাট গলদা চিংড়ি!

মাসীমা খুশিভরা মুখে বলেন, ন্যাড়া, আজ তোদের ভাগ্য ভাল। বাজারে যেতেই ওগুলো টাটকা পাওয়া গেল, আর আজই তোরা এসে গেলি।

জানি, সঙ্গীরা সেই চিংড়ির রক্তাম্বর-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে কি দেখছিলেন, আমার কিন্তু মনে হল, রক্তচক্ষু ক্রূর দৃষ্টি!

মাসীমাকে বলি, আমি কিন্তু মাছ মাংস খাই না—নিরামিষাশী। পোলাও-এর বদলে সাদা ভাত, রুটি যা আছে আমাকে দিন।

মাসীমা বলেন, ওমা, তুমি মাছ খাও না? ন্যাড়া, তুই তো আমায় বলিসনি! আচ্ছা,—বলে থালাটা তুলে নিয়ে যান। অল্প পরে ফিরে আসেন থালা হাতে। নিশ্চিন্ত হয়ে দেখি, চিংড়ি নেই। তবে, পোলাও-ই এনেছেন।

তখনই ভাবি, বাড়িতে কি দু'রকম পোলাও-ই হয়েছে? হয়ত এঁদেরও কেউ নিরামিষাশী। অথবা শুধু মাছটাই ওপর থেকে তুলে নেওয়া! হয়ত, ভাত-রুটি অন্য কিছু তৈরি নেই।

সন্দিগ্ধ চিত্তে সেই পোলাও অল্প নিয়ে ধীরে মুখে দেবার জন্য তুলি। নাকের কাছে হাত যত এগিয়ে আসে, আঁষটে গন্ধও ভেসে আসে।

মনে মনে ভাবি, দোষ আমারই। বাঙালী পরিবারের বাড়িতে নিমন্ত্রণে আসা, আগে থেকে না জানালে নিরামিষের ব্যবস্থা না থাকাই স্বাভাবিক। আর, এখন ঐ প্রধান পদেই মাছ, অথচ অন্য ব্যবস্থাও নেই, থাকলে নিশ্চয় দিতেন। এখন না খেলে এঁদের আদরযত্নের অপমান করা হয়। অতএব, আমাকে এ খেতেই হবে। দণ্ডদাতার মত, হাত ছোট্ট একগ্রাস তুলে মুখে পুরে দেয়। চোখ বুজে দম বন্ধ করে কোনমতে গলাধঃকরণের চেষ্টা করি। কিন্তু, উঃ! অসম্ভব! একে আঁষটে গন্ধ, তার উপর চিংড়ির অসহ্য উগ্রতা! গা গুলিয়ে ওঠে। বেশ বুঝতে পারি, দ্বিতীয় গ্রাস গিলতে গেলে অন্নপ্রাশনের ভাতই উঠে আসবে। সঙ্গীদের খাওয়াও নষ্ট হবে।

তাই, আর সে-চেষ্টা করি না। আঙুল দিয়ে পোলাও নাড়াচাড়ার ভান করি। শুধু মুখে নিরামিষ পদগুলি খেতে থাকি। উৎসাহ দেখিয়ে নানারকম গল্প জুড়ি—মাসীমার মন ভুলিয়ে রাখতে। কিন্তু তা কি কখনও সম্ভব? মিষ্টি, পায়েস—অনেক কিছুই ছিল। আমার পেট ভরার যথেষ্ট উপকরণ। কিন্তু বেশ বুঝতে পারি মাসীমাকে লজ্জায় ফেলেছি।

যাক, আহার-পর্ব্ব শেষ হয়। বিদায় নিয়ে ক্লাবে ফিরি। সেখানে এসে দেখি, যেন কলকাতায় কোন ক্লাবে এসে পড়েছি। এতজন বাঙালী মেমিও-তে আছেন! আর শুধু থাকাই নয়, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে! ক'দিন পরে 'রঘুবীর' থিয়েটার হবে, পূর্ণ উদ্যমে তারই রিহার্সাল চলেছে।

অনেকের সঙ্গেই আলাপ হল। ক্লাবের সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্থানীয় মিউনিসি-প্যালিটিতে চাকুরি করেন। করিৎকর্মা উৎসহী ব্যক্তি। কয়েকদিন এখানে থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়।

ক্লাবে সুনীল নামে একটি ছেলের সঙ্গেও পরিচয় হয়। চোখ মুখ দিয়ে তার অজস্র কথা ঝরে পড়ছে।

ভাবটা এমন, যেন সে সব কিছুই জানে, করতে পারে না এমন কোন কাজই নেই। নীরজ তাকে বলে, দেখি, তুমি কীরকম কাজের ছেলে। আমার ক্যামেরার ফিল্ম ফুরিয়ে এল। বিকেলে কয়েকটা দোকানে খোঁজ করে পাইনি। জোগাড় করতে পারবে?

সে লাফিয়ে উঠে বলে, এই কাজ! এ আর কী! এখনই এই রাত্তিরেই জোগাড় করে দেব। চলুন সঙ্গে। 'ডি-সউজা' এখানকার সবচেয়ে বড় দোকান, সেখানে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

নীরজ জানায়, সে-দোকানেও গিয়েছিলাম, পাইনি। আর এখন রাত ন'টা,—দোকান নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে।

সুনীল হেসে ওঠে। বলে, দোকান বন্ধ হয়ে থাকে, তাতে কী? মালিকের সঙ্গে আমার বিশেষ জানাশোনা। যেখান থেকে পারে সে আমাকে এনে দেবেই।

"চল তাহলে"—বলে আমরা তিনজনে ডি-সউজার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে সুনীল অনর্গল গল্প করে। ভামোর পথ দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে সে চীন ঘুরে এসেছে, আর সারা বর্মায় পাহাড়-জঙ্গলে এমন জায়গা নেই যেখানে সে যায়নি। ইত্যাদি কত রোমাঞ্চকর তার অভিযান।

ডি-সউজার বাড়ি পৌঁছে যাই। দোতলা বাড়ি। নীচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুনীল হাঁকডাক করতে থাকে। আমরা অল্প দূরে অপেক্ষা করতে থাকি। দোতলার একটা জানলা খুলে যায়। এক ব্যক্তি মুখ বার করেন। তার সঙ্গে সুনীলের যে কথাবার্তা হয় তা মোটেই মধুর নয়। আমরা স্পষ্ট শুনতে পাই লোকটি রুক্ষস্বরে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়, এত রাত্রে অমন চিৎকার করে তাকে যেন বিরক্ত না করা হয়।

অথচ, সুনীল মুখে হাসি নিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে আসে, বলে, ডি-সউজা খুব দুঃখ প্রকাশ করে জানাল, ঐ সাইজের ফিল্ম সত্যিই তার স্টকে এখন নেই, দিন তিনেক পরে এসে যাবে, তখন দেবে।

নীরজ বলে, তা আর কি করা যাবে। চল, এখন ক্লাবে ফিরি। কাল আমাদের গ্যটেক ভায়াডাক্ট দেখতে যেতে হবে,—সকালেই ট্রেন।

সুনীল বলে, গ্যটেক যাবেন? কতবার গিয়েছি ওখানে। আমিও সঙ্গে যাব। সেখানকার জঙ্গলের পথ আমার নখদর্পণে।

আমরা বলি, খুব ভাল কথা।

২০শে অক্টোবর।

সকাল ৭টা ৫০-এ মেমিও স্টেশনে ট্রেনে উঠি। রায়চক্রবর্তী ও পূর্ণদার মাসতুতো ভাই মন্টুও আমাদের সঙ্গে ট্রেনে উঠে পড়ে, বলে, চলুন, পরের স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসব। যতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে কাটানো যায়।

রায়চক্রবর্তী বিশেষ করে অনুরোধ করতে থাকেন, রেঙ্গুন ফেরবার পথে আপনারা মান্দালেতে ইরাবতীর অপর পারে সাগাইন-এ আমার কাছে একরাত্রি কাটাবেন চলুন, সেখানে বর্মার প্রসিদ্ধ পোয়ে —Pwé নাচ দেখাব।

শুনে আমাদের লোভ লাগে। বলি, তা হলে কাল মেমিও থেকে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।—তিনিও তখনই খুশি হয়ে রাজি।

পরের স্টেশনে তাঁরা দুজনে নেমে যান। আমাদের ট্রেন এগিয়ে চলে। এই রেললাইন মান্দালে থেকে মেমিও-র পাহাড়ে উঠে উত্তর শান রাজ্যের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে চীন সীমান্ত অভিমুখে। শেষ স্টেশন ল্যাসিও। উত্তর শান স্টেটের সদর। মান্দালে থেকে ১৮১ মাইল।

ট্রেন সশব্দে এগিয়ে চলে শৈলশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে। বর্মার এই পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চল প্রকৃতির রত্নসম্ভারের ভাণ্ডার। এই শান্ প্রদেশেরই বিভিন্ন দিকে গিরিগহ্বরে যত খনির অস্তিত্ব,—কোথাও সোনা, রূপা, কোথাও বা চুনি, স্ফটিক ইত্যাদি রত্নরাজির, আবার, লোহা, সীসা, দস্তা, তামা ইত্যাদিরও খনি আছে। একটি স্টেশনের নিকটে লোহার খনি দেখতে পাওয়া গেল। এই পর্বত-রাজ্যের গভীর অরণ্যানী জগদ্বিখ্যাত "বর্মা teak"-এরও জন্মভূমি। শান্ রাজ্যে লাক্ষাও উৎপন্ন হয়। বছরে দশ লক্ষ টাকার গালা বাইরে চালান যায়। সবচেয়ে বেশি আসে ভারতে।

আমাদের আপাতত নামতে হবে Gokteik Viaduct-এ। মেমিও থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে।

পাহাড়ের গা দিয়ে বাঁক ঘুরে ট্রেন স্টেশনে পৌঁছানোর কিছু আগে দূর থেকে Viaduct দেখা গেল। রেললাইনের ডানপাশে পাহাড়ের উঁচু অংশ উপর পানে মাথা তুলে, আর বাঁ দিকে পাহাড়ের ঢালু গা নেমে গিয়েছে বহু নীচে উপত্যকায়। সেই খাদের অপর পারেও আর এক গিরিশ্রেণী। এ-পাহাড়ের মাথা থেকে অপর পারের পাহাড়ের মাথায় ট্রেন চলাচলের যে সেতু—তারই নাম Viaduct। নীচের উপত্যকা থেকে গেঁথে তোলা সারি সারি বিশাল লোহার ফ্রেমের স্তম্ভ—Girder-এর উপর তৈরি সেতু—যেন লোহার ভারা বেঁধে পুল।—সেই Viaduct দেখতে আমাদের এখানে নামা।

পৌঁছুলাম ১০টা ৫০-এ। ছোট্ট স্টেশন। এখানকার উচ্চতা ২,২৬০ ফুট। কোন লোকালয় নেই। নিকটেই একটা ডাকবাংলো। Viaduct দর্শনার্থীদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। স্টেশনের নিকটেই একটা পাহাড়ী ঝরনা স্থানটির শোভা বাড়ায়। ডাকবাংলোয় মালপত্র রেখে Viaduct দেখতে চলি। পাহাড়-রাজ্যে মানুষের ইঞ্জিনীয়ারিং-যন্ত্রবিদ্যার বিরাট কীর্তি। শুনেছি, প্রাচ্যদেশে এরকম সেতু আর দ্বিতীয় নেই। বাংলোয় নোটিশ-বোর্ডে সেতু তৈরির যাবতীয় তথ্যাবলী লেখা রয়েছে,—তৈরি করতে সময় লেগেছে—১৯০০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। খরচ হয় ১৬,৯৮,২০০ টাকা। সেতুটি লম্বা ২,২৬০ ফুট। উপত্যকা থেকে ৩২০ ফুট উঁচুতে লোহার পুল। কিন্তু, সেই উপত্যকার ৫৫০ ফুট ৫ ইঞ্চি নীচে তারই গহ্বরে এক বিরাট গুহা। সেটিও দেখার মত। আমরা বলি, তাহলে নেমে সেখানেও যেতে হবে। সুনীল উৎসাহিত হয়ে জানায়, চলুন, পুল পার হয়ে অপর দিক থেকে নামতে হবে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

পূর্ণদার ভায়রাভাই ললিতবাবু আগে একবার এসেছিলেন। তিনি মৃদু প্রতিবাদ করেন, সেবার কিন্তু স্টেশনের দিক থেকে নেমেছিলাম।

সুনীল হেসে বলে, আপনি এসেছেন একবার, আর আমার আসা কয়েকবারই।

যাই হোক, সেতুটা তো দেখতেই হবে, তাই পুলের উপর দিয়ে হেঁটে ওপারে সবাই চলি।

পুলের উপর দ্বিতীয় রেললাইন পাতার ব্যবস্থা রয়েছে। উপর থেকে নীচে তাকাতে মাথা ঘোরে। উপত্যকা দিয়ে বহে চলেছে পার্বত্য নদী। জলস্রোতের হুঙ্কার-ধ্বনি মেঘগর্জনের মত কানে আসে। ওপারে পৌঁছে সুনীলের কথামত পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নামতে শুরু করা হয়। অল্প যেতেই পথের আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ভীষণ জঙ্গল। তাই ভেদ করে চলা। আরও কিছুদূর যেতেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল গতিরোধ করে, চারিপাশে ঝোপঝাড়, কাঁটাগাছ, শিলাস্তূপ। সুনীল বলে, এত জঙ্গল তো আগে ছিল না! ললিতবাবু হাসেন।

আমরাও তখন বুঝতে পারি, অপর পারেই নামার পথ।

আবার ডাকবাংলোয় ফিরে আসি। সঙ্গে নিয়ে-আসা খাবার খাই। এধার দিয়ে নীচে নামার জন্য প্রস্তুত হই। পূর্ণদা আর যেতে চান না, তাঁর হাঁটুর পুরানো ব্যথা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। সুনীলও আর যেতে রাজি হয় না। হয়ত নিজের ভুলে লজ্জা পেয়েছে। নীরজ, ললিতবাবু ও আমি রওনা হই। দেখা যায়, নামবার পথ এদিক দিয়েই। তবে পথ চওড়া নয়, পরিষ্কার করে রাখাও নয়। পরে শুনি, বর্ষার পর এ-বছর এখনও পথের সংস্কার করা হয়নি। আর দিনকয়েক পরেই হবে।

গভীর বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু পথ। বন্য জন্তুজানোয়ারের উপযুক্ত বাসভূমি। কিন্তু কারও সাড়াশব্দ পাই না। যত এগিয়ে যাই শুধু নদীর গর্জনই বাড়তে থাকে। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগে নীচে নদীর ধারে পৌঁছুতে। পথের শেষের খানিকটা অংশ জলকাদায় এমনই পিচ্ছিল, জুতো খুলে হাতে নিয়ে অতি সাবধানে নামা। কেবলই মনে হয়, এই বুঝি পা পিছলে পড়ি! পায়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি। জলের ধারে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুখ তুলে তাকাই, দেখি, সুমুখেই প্রকাণ্ড গুহা। জলস্রোত সগর্জনে সেই গহ্বরে প্রবেশ করে। তৃষ্ণার্ত পর্বত যেন বিশাল মুখব্যাদান করে নদীটিকে গিলতে থাকে। গুহায় প্রবেশ করে এই জলধারা অন্যত্র কোথাও আত্মপ্রকাশ করে কিনা তার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।

চারিপাশে রুদ্রমূর্তি গিরিপ্রহরী। বর্বরশ্রেণী বন-জঙ্গলের জটলা। আর, অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগারে নিক্ষিপ্ত শৈল-শিকলে-বাঁধা রাজকুমারী তরঙ্গিণী। আকাশে বাতাসে অরণ্যে তার মর্মন্তুদ আর্তনাদ!—এ যেন দৈত্যপুরীর বিভীষিকা।

গুহার ভিতর থেকে নদীস্রোতের গর্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রচণ্ড হুংকারের মত কানে এসে বাজতে থাকে। আমাদের পরস্পরের কথা শোনা যায় না।

গুহার মধ্যে কিছুদূর পর্যন্ত যাওয়ার পথ আছে। তারপর সূচিভেদ্য অন্ধকার। সেই প্রবেশ-পথের মুখে স্রোতধারা পার হওয়ার কাঠের পুল ছিল। গত বর্ষার প্রকোপে সেটি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তাই আমাদের গুহার ভিতরে আর প্রবেশ করা সম্ভব হয় না।

এবার মাথা তুলে আকাশ পানে তাকাই। গুহার উপর পাঁচশ' পঞ্চাশ ফুট উঁচু শিলাস্তর। তারই উপর দাঁড়িয়ে বিরাট লোহার স্তম্ভ—girders—আরও ৩২০ ফুট উঁচুতে উঠে গেছে। নীচে থেকে দেখায় যেন উর্ধ্ববাহু নাগা সন্ন্যাসী অস্থিসার অঙ্গুলি তুলে আকাশ স্পর্শ করেন।

পুলের উপর ট্রেন চলেছে দেখা যায়, যেন দম-দিয়ে-চালানো খেলনা গাড়ি। লোহার ফ্রেমের উপর শীর্ণকায় সরীসৃপ!

ভাবি, উপর থেকে নীচে তাকিয়ে দেখতে তখন মাথা ঘোরে, আর এখন? এই নীচে থেকে সেই বহু উপরপানে তাকাতে মনে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব জাগে। মাথা ঘোরা নয়, এক বিরাট সৃষ্টির পদতলে দাঁড়িয়ে নিজেকে মনে হয়, কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য এই আমি!

চড়াই ভেঙে আবার ডাকবাংলোয় ফেরা। এবার ট্রেন ধরে শান্ স্টেটের মধ্যে আরও এগিয়ে যাওয়া। সুনীল আর আমাদের সঙ্গে থাকতে চায় না। মেমিও ফিরে যায়। বলে, আপনারা বড় গম্ভীর! বেচারী বোধহয় ভুল পথে নিয়ে যাওয়ায় লজ্জা পেয়েছে।

আমরা এখন চলেছি এখান থেকে আরও ৪৭ মাইল দূরে সিপ—Hsipaw-তে। উদ্দেশ্য, কোনমতে চীন সীমান্তে পা ছোঁয়ানো! এ-লাইনের সর্বশেষ স্টেশন ল্যাসিও। সিপ থেকে আরও পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে। মিস্টার দাস এ-অঞ্চলের এক বড় অফিসার, থাকেন সিপ-তে। সেখানে মিস্টার দত্তও বাস করেন। তাঁরও ল্যাসিও অঞ্চলে কনট্রাকটরি কারবার। সিপ-তে নেমে তাঁদের কাছে চীন সীমান্তে যাওয়ার পথের খবরাখবর জানা।

ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে চলেছি। Viaduct পার হয়ে একটা টানেল। তারপর আবার পাহাড়ী রাজ্য, ঢেউ খেলানো ছোট বড় পাহাড়। তারই মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে ট্রেন চলে, যেন তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। মাঝে মাঝে ট্রেনের হুইসিল বাজে। পাহাড়ের প্রতিধ্বনি ওঠে। দিগন্ত যেন চমকে ওঠে। দিনের শেষের ম্লান বেলা। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়গুলিকে যেন বিষণ্ণ দেখায়। ট্রেনের যাত্রীর ভিড় নেই। আমাদের ছোট কামরাটিতে আমরা চার মূর্তি ছাড়া মাত্র আর একজন। কাবুলিওয়ালা। সেই ঝলমলে জোব্বা পরা। এখানেও এরা! কৌতূহল হয়। প্রশ্ন করি, কোথায় চলেছ এদিকে? বলে, থিপ।

"সেখানে কী কাজ?"

ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে জানায়, ছোট ভাই সেখানে থাকে। অনেকদিন হল এ-দেশে এসেছে। কোন মতেই বাড়ি ফিরছে না। তাই যে-করে-পারে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চলেছে।

নীরজ বলে ওঠে, আরে! এ যে একেবারে "শ্রীকান্তে"র সেই ঘটনা,—বড়ভাই-এর বর্মায় আসা ছোটভাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এদেশে এ ব্যাপারে তাহলে বাঙালী-কাবুলী ভেদাভেদ নেই, সবাই এসে কুপোকাত!

আমি বলি, তবে এ ক্ষেত্রে, আশা করি, ছোটবাবু তার বর্মী স্ত্রীর কাছে বিদায় চাওয়ার ছলে সেই নিষ্ঠুরতম অঙ্কের অভিনয় করবে না!

চোখের উপর তখনই ভেসে ওঠে শরৎচন্দ্রের বর্ণিত মানব-আত্মাকে অপমান করার ও নির্দয় বিদ্রূপের সেই করুণ চিত্র। কানে যেন শুনি, মহাপাতক প্রতারক ছোট ভাই-এর বিদায়ের সেই নিষ্ঠুর শেষ কথাগুলি, "ওরে দেরে, আংটিটাও বাগিয়ে নিয়ে যাই..."।

ছবিটি মনে হতেই কাবুলী-বড়দাদার প্রতি কেমন যেন সহানুভূতি হয়। কিন্তু, আমরা কী-ই বা সাহায্য করতে পারি! জিজ্ঞাসা করি, থিপ পৌঁছুবে কখন?

সে বেচারী জানে না। টাইমটেবল খুলে সে-স্টেশনের নামও দেখি না। বলি দেখি তোমার টিকিট।

একী! সেও তো চলেছে Hsipaw-তে! কিন্তু নাম উচ্চারণ করছে 'থিপ' বলে!

সন্ধ্যা সওয়া সাতটায় সিপ পৌঁছুই। এখানকার উচ্চতা ১,৩৫৪ ফুট।

এখানেও স্টেশনে এক বাঙালী টিকিট-কালেক্টার। মিঃ দাসের বাড়ির খোঁজ নিই। বলেন, এই তো নিকটেই বাড়ি। চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

স্টেশনে মালবাহকদের চেহারা দেখে মনে হয়, সব চীনদেশীয়।

প্রকাণ্ড এলাকা জুড়ে মিঃ দাসের বাংলো। সাজানো বাগান। ভিতরে প্রবেশ করে মিঃ দাসের খবর করি। আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি এখন সিপ-তে নেই। ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে। সংবাদটি জানান তাঁর ভাগ্নে মণীন্দ্রবাবু। মামা না থাকলেও ভাগ্নের কাছে আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হয় না। ঐখানেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

কিন্তু, চীন সীমান্তে যাওয়া?

তিনি বলেন, কন্ট্রাকটার দত্ত বোধহয় এখানে আছেন। চলুন, আপনাদের নিয়ে যাই তাঁর কাছে। তিনি সব খবর দিতে পারবেন নিশ্চয়।

তখনই সবাই দত্তর বাড়িতে চলি।

রাত হয়েছে।-পাহাড়ী জায়গা। ছোট শহর। চারদিক নিঃঝুম নিস্তব্ধ। অল্প শীত-ভাব। হাঁটতে আনন্দ বোধ হয়।

দত্ত থাকেন কাঠের একটা দোতলা বাড়িতে। রাস্তা থেকেই কাঠের সিঁড়ি। মণীন্দ্রবাবু আমাদের সঙ্গে নিয়ে সটান ওপরে উঠে চলেন। উঠেই কাঠের বারান্দা। তারই কোলে বেশ বড় একটা ঘর। সেখানে দত্ত কিমোনো গায়ে (ড্রেসিং গাউনের মত) চেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। কাঠের মেঝের উপর বসে এক বর্মী মহিলা কলে সেলাই করছেন। আশপাশে ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে। দত্ত আমাদের দেখে বাইরে আসেন। চেহারা দেখে তাঁকে বাঙালী বলে বোঝার উপায় নেই। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা। কালো রঙ। গোলাকার মুখ। থ্যাবড়া মোটা নাক। বাঙলা উচ্চারণও কিছুটা বিকৃত। কিন্তু, ভদ্র ব্যক্তি। সাদরে ঘরের ভিতর নিয়ে যান। একটা বেঞ্চ টেনে বসতে দেন। বহু বছর ঐ অঞ্চলে তিনি কাজকর্ম করছেন। অনেক ঘুরেছেনও। তাই খবর সব তাঁর কাছে পাওয়া যায়।

এখান থেকে ল্যাসিও আরও ৫০ মাইল। ট্রেনে সহজেই সেই পর্যন্ত যাওয়া যাবে। পথে পড়বে Mansam Falls। Namhan-এ Bawdwin mines রূপা সীসা দস্তার খনি। তারপর ল্যাসিও থেকে চীন সীমান্ত নামহান প্রায় ১২৫ মাইল। তার মধ্যে ৭৫ মাইল এখন মোটর যেতে পারে, বাকি ৫০ মাইল বর্ষার পর এ-সময়ে কোন যান চলাচল নেই, ঘোড়ায় চড়ে বা হেঁটে যেতে হবে। শীতকালে এলে ল্যাসিও থেকে একদিনেই সীমান্ত দেখে ফিরে আসা যায়। এ সময়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চলে যেতে আসতে দিন দশেক সময় তো লাগবেই, তা ছাড়া পথের দুর্গমতা ও অসুবিধা রয়েছে, পথও মোটেই এখন নিরাপদ হবে না।

দত্ত উৎসাহ দিয়ে বলেন, চলে আসুন শীতকালে, তখন সহজেই আপনাদের সেখানে ঘুরিয়ে আনতে পারব। দেখবেন, নামহানে কিরকম জমজমাট হাট বসে! এ-অঞ্চলের দূরদূরান্ত থেকে শান্‌রা তো আসেই, চীনা ব্যাপারীরাও জমায়েত হয়। কত রকম জিনিসপত্র কেনাবেচা চলে। সে এক দৃশ্য। তা ছাড়া, ল্যাসিওর প্রাকৃতিক শোভাও খোলে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে। দিকে দিকে তখন চেরিফুল ফুটে আলো করে থাকে।

অগত্যা চীন সীমান্ত যাওয়ার আশা ত্যাগ করতে হয়।

দত্তর সঙ্গে পরিচয় করে আনন্দ বোধ করি। মন-প্রাণ-খোলা দিলদরিয়া মানুষ। আমি মন্তব্য করি, আপনি তো, মশাই, দেখছি যস্মিন দেশে যদাচার। বর্মা মুলুকে বর্মী সংসার। তবুও, বাঙলা ভাষা সম্পূর্ণ ভোলেননি দেখে ভাল লাগল।

তিনি হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, ভুলব কি করে মশাই? আমার দু নৌকায় পা রেখে চলা। এখানে দেখছেন আমার বর্মী সংসার, আবার বর্মার অন্যত্র রয়েছে আমার খাঁটি বাঙালী সংসার,—সেখানেও সাধ্বী স্ত্রী, একগাদা ছেলে-মেয়ে। বছরের কয়েক মাস তাদের সঙ্গেও কাটাই। উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু দুই অভিযানই সমানে চালিয়ে যাচ্ছি!

দত্তর কাছে বিদায় নিয়ে মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আবার ফিরে চলি।

পথে পূর্ণদা বলেন, কাল সকালে তা হলে আমাদের মেমিও ফেরবার ট্রেন ধরা যাক। তার আগে, এখানে শ্বশুরমশায়ের এক মক্কেল থাকেন, তার নামে একটা চিঠি দিয়েছেন, এখনই দেখা করে গেলে হয়। পিলানাপ্পা আইয়ার নাম।

মণীন্দ্রবাবু বলেন, বেশ তো চলুন। বাজারের মধ্যে তাঁর গদী। এখন তাঁকে পাওয়াও যাবে। তাঁকেও এখানে সবাই চেনে। বিরাট ধনী। তেজারতি কারবার, এ-অঞ্চলের শান্‌রাজাও শুনেছি তাঁর দেনদার।

আইয়ার আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করেন। বলেন, কাল তো আপনাদের ট্রেন বেলা এগারোটায়। আমার এখানে খাওয়াদাওয়া করে যাবেন।—আমরাও তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি।

মিস্টার দাসের বাড়িতে আরামেই রাত কাটে। মেমিওতে অনেকেই ভয় দেখিয়েছিলেন, এ অঞ্চলে ভীষণ মশার উপদ্রব ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। এখানকার উৎকৃষ্ট কমলালেবু সারা বর্মায় প্রসিদ্ধ; অথচ স্থানীয় লোকেরা কমলালেবু খায় না, জ্বরের ভয়ে!

আমরা কিন্তু মশার উপদ্রব ভোগ করিনি।

২১শে অক্টোবর।

পিলানাপ্পা আইয়ারের বাড়ি যাওয়া হয়। বাজারে তখন বেচাকেনার ভিড়। বহু চীনেম্যান। শুনি, পাহাড় ডিঙিয়ে সোজাসুজি যেতে পারলে মাত্র মাইল ত্রিশ-চল্লিশ দূরে চীন সীমান্ত।

আইয়ার ভোজন বিলাসী। ভূরি-ভোজের আয়োজন করেছিলেন, এমন কি মাছ-মাংসেরও। এর আগে মাদ্রাজে ও অন্যত্রও মাদ্রাজীদের নিমন্ত্রণ গ্রহণের সুযোগ হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁদের মাছ মাংস খেতে দেখিনি।

আইয়ারে মোটর আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিল। ১১টায় ট্রেনও ছাড়ল। আবার সেই Gokteik পার হলাম। মেমিও পৌঁছুলাম সন্ধ্যা সাতটায়।

ক্লাবে এসে শুনি সুনীল গ্যটেক থেকে ফিরে এসে রটনা করেছে, সে Viaduct-এ ওপর থেকে পড়ে যায়, কোন রকমে প্রাণরক্ষা হয়েছে,—সেই কারণেই আমাদের ছেড়ে তার চলে-আসা। হাতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত নিয়ে ঘুরছে! কিছু পরে তার সঙ্গে দেখা হতেই হেসে জিজ্ঞাসা করি, হাত কেমন আছে?

সে চুপি চুপি বলে, কাউকে বলবেন না যেন। কারণ তো একটা দেখাতে হবে, ব্যান্ডেজ না দেখলে লোকে বিশ্বাস করবে কেন?—বেচারীর ছেলেমানুষি দেখে মনে মায়া হয়।

রাত্রে সেক্রেটারি উপেনবাবুর বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ।

২২শে অক্টোবর।

সকালে পূর্ণদার মাসতুতো ভাই মন্টুর সঙ্গে মেমিও বাজার যাই। কয়টা কাঁধে ঝোলানো Shan ঝুলি ও কাপড়ের কৃত্রিম ফুল কেনা হয়। শান্‌-দের তৈরি এই ঝোলা ব্যাগগুলি যেমন সুন্দর রঙিন নকশা-তোলা, তেমনি মজবুতও। আর ফুলগুলি দেখলেই মনে হয় যেন গাছ থেকে সদ্য তুলে আনা।

পূর্ণদার মাসীমার কাছে আবার আদর-যত্নের মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে ক্লাবে ফিরি। প্রথমে কথা ছিল ট্রেনে মান্দালে ফেরা হবে, এখন কিন্তু মোটরে যাওয়াই ঠিক হয়। আমরা চারমূর্তি এক গাড়িতে, রায়চক্রবর্তী, মন্টু ও আর এক ভদ্রলোক অপর আর এক মোটরে। মোটর ভাড়া দশ টাকা, অর্থাৎ আমাদের এক-একজনের আড়াই টাকা।

মোটর পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে চলে। পথের প্রতি বাঁকে সতর্কচিহ্ন। তবুও মাঝে মাঝে অসাবধানতার ফলে দুর্ঘটনা যে না ঘটে এমন নয়। তারই যেন সাক্ষ্য দিতে এক জায়গায় দেখি পথের পাশে খাদে উলটে পড়ে রয়েছে একটা ভাঙা-চোরা মোটর।

মান্দালে পৌঁছুই বেলা একটায়। মান্দালে স্টেশনে ট্রেনে ওঠা হয়, যেতে হবে মাত্র ছয় মাইল দূরে Amarapur Shore স্টেশনে। ট্রেন চলে যেন প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মাঝ দিয়ে। দুই পাশে ভেঙে

পড়া প্রাসাদ, বৌদ্ধবিহার, মন্দির,—মাঝে মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্যাগোডা। ১৭৮৩ সালে এই অমরাপুরে বর্মী রাজার রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ সালে মান্দালেতে রাজধানী স্থানান্তরিত না হওয়া অবধি, মাঝে বছর পনেরো বাদে, এইখান থেকেই রাজারা রাজ্যশাসন করতেন।

অমরাবতী স্টেশনের নিকটেই ইরাবতী নদী। নদীর ধারে একসময় আর এক শহরও ছিল,—আভা। সেখানেও কিছুকাল রাজধানী ছিল। এখন সবই ভগ্নস্তূপে পরিণত। ঐ আভার অপর পারে সাগাইন্— আমাদের গন্তব্যস্থল।

ইরাবতী বিশাল নদী। কলকাতার গঙ্গার চেয়েও প্রশস্ত। নদীর বুকে বহু সাম্পান নৌকা। শুনি, এখানে অনেকে নৌকাতেও বাস করে। নদীর উপর পুল তৈরির আয়োজন চলেছে। (আমরা যাওয়ার পাঁচ বছর পরে ১৯৩৪ সালে সে-পুল তৈরি শেষ হয়)। ঘাটে স্টিমার দাঁড়িয়ে। তাইতে উঠে নদী পার হই। অপর পারে সাগাইন্-এর শৈলশ্রেণী। ইরাবতী বয়ে চলে তারই পাদদেশ দিয়ে। এই সাগাইন্ও-এ একসময়ে রাজধানী ছিল। এখন ক্ষুদ্র পল্লী। পুলিশদের থাকবার জন্যে যেসব নতুন বাড়ি হচ্ছে, তারই একটাতে রায়চক্রবর্তী আমাদের ওঠবার ব্যবস্থা করেন। কাঠের বাড়ি। এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ঘরের মধ্যে নতুন কাঠের সোঁদা গন্ধ। নীরজ বলে, নতুন বই হাতে নিয়ে যেমন শুঁকতে বেশ লাগে, এ-ও যেন তেমনি লাগছে।

স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ার আশুতোষ ঘোষ এসে আলাপ করেন। আজ রাত্রে ও কাল সকালে তাঁর বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে যান।

নদীর ধারে সুন্দর বাঁধানো রাস্তা। সন্ধ্যায় সেখানে বেড়িয়ে আনন্দ লাভ হয়। রায়চক্রবর্তীকে বলি, আনলেন তো এখানে। থাকবার খাওয়ার ব্যবস্থাও ভালই করেছেন। কিন্তু, পোয়ে নাচ দেখানোর কথা মনে আছে তো?

রায়চক্রবর্তী বলেন, দেখাব বই কি। রাত্রের খাওয়া সারা হলেই নিয়ে যাব।

সেইমত রাত্রে দল বেঁধে যাইও।

রায়চক্রবর্তী বলেন, জানেন হয়ত পোয়ে নাচ হল বর্মার জাতীয় নৃত্য। সর্বত্রই হয়। পোয়ে নাচ তিন শ্রেণীর হতে পারে। আমরা যেটা দেখতে চলেছি, এর নাম Zat pwe'। এইটিই হল সর্বসাধারণের প্রচলিত নাচ। শুধু নাচই নয়—নাচ, গান, অভিনয়, সার্কাস অনেক কিছুই এতে দেখবেন। সারারাত ধরে হবে। সাধারণত জ্যোৎস্না রাতে হয়ে থাকে। কখন কখন পর পর কয়েক রাতই। এসব অনুষ্ঠানে প্রায়ই কোন প্রবেশ মূল্য থাকে না, থাকলেও নামমাত্র।

নীরজ প্রশ্ন করে, আর্টিস্টরা বিনা পারিশ্রমিকেই নাচ গান করে?

রায়চক্রবর্তী জানান, এ-নাচের ব্যবস্থা করতে খরচ তো নিশ্চয় কিছু হবেই, তবে সাধারণত কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বা কয়েকজন মিলে টাকা দিয়ে নাচের ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশে যেমন জমিদাররা বা বড়লোকেরা যাত্রা, থিয়েটার দিতেন। এই Zat-pwe' হয় বর্মার সর্বত্র,—গ্রামে গ্রামেও। এছাড়া রয়েছে, Yein pwe'। সেটা অনেকটা বিদেশী 'ব্যালে' নাচের মত। তরুণ-তরুণীদের বড় দল গড়ে শুধু নাচ-গান-বাজনা। সাধারণত প্যাগোডায় কোন উৎসবে বা কারও সম্বর্ধনা সভা-সমিতিতে এই নাচের বিশেষ অনুষ্ঠান। আর তৃতীয় ধরনের পোয়ে হল Anyein pwe', তাতে অতি অল্পসংখ্যক গায়ক-গায়িকা নাচ-গান করে। এই তিনরকম ছাড়া আরও একপ্রকার আছে—Yokthe pwe', এও সর্বসাধারণের জন্যে যেখানে-সেখানে হয়ে থাকে। এটা কিন্তু পুতুল নাচ। বর্মাদেশের এটি বিশেষ ধরনের চমৎকার শিল্পকলা। খুবই প্রচলিত ও জনপ্রিয়।

আমরা এসে যাই নাচের আসরে।

লোকালয়ের নিকটে একটা খোলা জায়গা। সেইখানে সামিয়ানা টাঙিয়ে একদিকে স্টেজ তৈরি হয়েছে। মাটিতে চাটাই, সতরঞ্চি, বিছানা, বালিশ পেতে বর্মীরা কেউ শুয়ে, কেউ বসে রয়েছে। কচি ছেলেমেয়েও আছে। দু-চারজন লম্বা হয়ে ঘুমুচ্ছেও। সারারাত ধরে নাচগান চলবে। শেষ রাত্রে নাকি খুব জমে ওঠে। স্টেজের সামনে অর্কেস্ট্রা বাজছে। বর্মীদের অদ্ভুত সব বাজনা,—বড় বড় ড্রাম, গং, ঘণ্টা—কাঁসরের মতন, বাঁশি, সানাই, করতাল ইত্যাদি। গমগম ঝনঝন শব্দ উঠছে প্রচণ্ড। আমাদের বসবার জন্য কয়টা চেয়ার এনে দিল।

ঠিক সময়মত পৌঁছেছি। নাচ তখনই শুরু হয়।

স্টেজের ওপর দুইপাশে দুজন নর্তক ও নর্তকী বসে। তাদের নিকটে সাধারণ বেশে দুজন বর্মী, পরে তাদের হাবভাব কথাবার্তায় প্রকাশ পায় তারা বিদূষক,—ভাঁড় বা সঙ। নর্তক-নর্তকীর সাজসজ্জায় জাঁকজমক নেই, ছিমছাম রঙিন সুচারু বেশভূষা। যেন দুটি সাজানো পুতুল। প্রথমে পুরুষটির একক নাচ-গান হয়। অল্প পরে মেয়েটিও একলা নাচে, গান গায়। তারপর দুজনে মিলে গান গেয়ে নাচতে থাকে। গানের ভাষা বুঝি না, কিন্তু তাদের সুরেলা কণ্ঠ, গানের মিষ্ট সুর, নাচের তাল, হাত-পায়ের ও দেহের সঞ্চালনের সুন্দর সাবলীল ভঙ্গিমা অতি চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করে। গানের ও নাচের সঙ্গে যন্ত্রবাদকদের বাজনার সুসমন্বয়ও লক্ষ্য করি। নাচের ও গানের মধ্যে যেমন কোমল ও করুণরসের প্রকাশ, তেমনি বীররসেরও। তবে এদেশের এই নাচের মধ্যে অতি বিচিত্র লাগে, নাচের মধ্যে দুই-দিকের ভাঁড়েদের মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি। তাদের পরস্পরের টিপ্পনীর মর্ম না বুঝলেও স্পষ্টই বোঝা যায়, উভয়ের মন্তব্যই রঙ্গরসে ভরা। তাদের রঙ্গরস প্রতিটি দর্শকদের মধ্যে হাসির তুফান তোলে। তাদের হাসি শুনে আমরাও হাসিতে যোগ দিই। পোয়ে নাচের অনুষ্ঠানের আর এক বৈচিত্র্য,—নাচের প্রতি অঙ্কের পরে হাস্যরসাত্মক ছোট নাটিকা প্রহসনও চলতে থাকে। আবার, মাঝে কিছুক্ষণ সার্কাসের মত ব্যায়াম কৌশল, দড়ি টাঙিয়ে তার উপর হাঁটা ইত্যাদি খেলাও দেখান হয়। অর্থাৎ, Zat-pwe' শুধু নাচগানই নয়, —একাধারে নৃত্যগীতের আসর, নাটক অভিনয়, হাস্যকৌতুক, সার্কাস—সংমিশ্রণে এক অভিনব বিচিত্রানুষ্ঠান।

ঘণ্টা দুই দেখে আনন্দ পেয়ে রাত বারোটায় বাসায় ফেরা হয়। তখনও পূর্ণ উদ্যমে অনুষ্ঠান চলেছে।

২৩শে অক্টোবর।

সকালে উঠে দেখা যায় মুষলধারে বৃষ্টি চলেছে। আকাশ মেঘে অন্ধকার। শীঘ্র জল থামার কোনও আভাস নেই। একটা গাড়ি করে আশুতোষ ঘোষ মশায়ের বাড়িতে যাওয়া হয়। সেখানে খাওয়াদাওয়া সেরে স্টিমার ঘাটে পৌঁছুতেই দেখা গেল স্টিমার ছাড়ছে। ছুটে গিয়ে স্টিমারে যখন উঠি তখন জেটি থেকে হাতখানেক দূরে স্টিমার সরে গেছে।

মান্দালে থেকে আমাদের রেঙ্গুনের ট্রেন ছাড়ল বেলা দুটোয়। এবারও আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট। ট্রেনে যাত্রীর ভিড়ও। কিন্তু, আমরা আগে থাকতে বেঞ্চ দখল করে বিছানা পাতি,—এ-যাত্রায় কোন অসুবিধাই হয় না।

থাজি স্টেশনে ঘোষ ও বসুর সঙ্গে দেখা হতে তাঁরাও খুশি, আমরাও আনন্দলাভ করি। যেন, কত কালের পরিচয়।

ট্রেনে বসে আমাদের এই আপার বর্মা ভ্রমণের খরচার হিসাব-নিকাশ করে পূর্ণদা জানান, প্রত্যেকের মাথাপিছু খরচ হয়েছে,—সাতচল্লিশ টাকা পাঁচ আনা!

২৪শে অক্টোবর।

সকাল আটটায় রেঙ্গুন পৌঁছুই। আপার বর্মা ভ্রমণ সাঙ্গ হল। মনভরা আনন্দ। কিন্তু বাড়িতে ঢুকতেই দুঃসংবাদ শুনি। পূর্ণদার শ্বশুর মহাশয় সস্ত্রীক, জামাই ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে দিনপাঁচেক আগে পেগুর পথে তাঁদের বাগানে বেড়াতে যান। ফেরবার পথে মোটর হঠাৎ উলটে যায়। অটলবাবুর কণ্ঠাস্থি—'কলার বোন'—ভেঙেছে, 'শক'-ও খুব পেয়েছেন। তাঁর স্ত্রীরও পায়ে আঘাত লেগেছে। দু-জনেই এখন শয্যাশায়ী। তবে, যে রকম ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সে তুলনায় আঘাত কিছুটা কমের উপর দিয়েই গিয়েছে। যাক, এখন দুজনেই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। দুশ্চিন্তার আর কোন কারণ নেই, ডাক্তারদের অভিমত।

পরশু নীরজ ও আমি কলকাতা রওনা হব। পূর্ণদা ও আর সবাই এখনও আরও কয়েকদিন এখানে থাকবেন।

২৫শে অক্টোবর।

আগামীকাল বর্মা ছেড়ে যাওয়া। এদেশের আরও কিছু স্মৃতিচিহ্ন কিনে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হয়,—বিশেষত এখানকার বেশভূষা,—সিল্কের লুঙ্গি, বর্মী কোট, মাথার পাগড়ি, বর্মী চটি, ফুলকাটা রঙিন ছাতা,—আর সেই লম্বা একটা চুরুটও!

পূর্ণদা বলেন, খাঁদুবাবুকে বলে দিচ্ছি, ডাক্তার প্রকাশচন্দ্র করের বাড়িতে নিয়ে যাবেন। তিনি এসব ঠিকমত কিনে দিতে পারবেন। তবে, তাঁকে ধরতে পার কিনা দেখ,—সব সময়েই তো রোগী দেখায় ব্যস্ত।

সকালে তখনই বেরিয়ে পড়ি। বড় রাস্তার উপর ডাক্তার করের ডিসপেনসারি। ডাক্তার কর রয়েছেন দেখে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু সিপ-এর সেই মিস্টার দত্তর মতন এঁরও চেহারা দেখে বোঝা দুষ্কর—ইনি বাঙালী। আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করেন। আলাপ করে আনন্দ পাই।

ডাক্তারখানার কম্পাউন্ডার দেখি এক বর্মী মহিলা। প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ তৈরি করে রোগীদের দিচ্ছেন। দাম নিচ্ছেন। হিসাব রাখছেন। ওদিকে এক রোগী এল, পা কেটে দরদর করে রক্ত ঝরছে, তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে আইওডিন, তুলা দিয়ে নিপুণ হস্তে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। মহিলা একটু স্থূলকায়া হলেও বেশ চটপটে, প্রকৃতই করিৎকর্মা।

ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করার ফাঁকে এইসবও চোখে পড়ে। ডাঃ করকে বলি, বর্মী মেয়েরা তো বেশ ভাল কম্পাউন্ডারও হয় দেখছি।

তিনি বলেন, হ্যাঁ, ওরা সব কাজকর্মই নিখুঁতভাবে করতে পারে,—ঘরের গৃহিণীপনাও। তারপর হেসে জানান, যিনি এখন কম্পাউন্ডারি, ক্যাশিয়ারি করছেন উনিই আমার স্ত্রী। দাঁড়ান, ওঁর একটু ফুরসত হোক, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

মহিলা কথাগুলি শুনতে পান। ওদিক থেকে হাসিমুখে বলেন, যাচ্ছি এখনই, এই প্রেসক্রিপশনের ওষুধটা তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছি,—হয়ে গেছে। তুমি ওঁদের সঙ্গে ততক্ষণ কথা বল।

আশ্চর্য হয়ে বলি, বাঃ। চমৎকার বাংলা শিখেছেন দেখছি!

ডাক্তার বলেন, শিখেছেন বই কি। দু'বার কলকাতায় নিয়ে গিয়েছি, কাশীও ঘুরিয়ে এনেছি।

শ্রীমতী কর হাতের কাজ শেষ হলে আসেন। এতক্ষণ তাঁকে কর্মব্যস্ত দেখেছি, এখন আলাপ করে দেখি, হাসিখুশি চমৎকার মহিলা। বিকেলে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। আমি বলি, আসতে রাজি আছি যদি আপনাদের বর্মী পদ দু-একটা রান্না করে খাওয়ান।

কিন্তু, তখনই মনে পড়ে, বর্মীদের সেই উৎকট গন্ধ নেপ্পীর কথা,—পচা মাছ! তাড়াতাড়ি বলি, আমি কিন্তু মাছ মাংস ডিম খাই না।

তিনি বলেন, তবে আমাদের খাদ্য খাওয়াব কী? চায়ের সঙ্গে আপনাদের শুকতো করাতে চান?—বলে খিলখিল করে হেসে ওঠেন।

আমি বলি, বাঁশের মধ্যে কী একরকম ভাত করেন,—তাই খাব।

তিনি বলেন, ঠিক আছে। আসবেন বিকালে। পূর্ণবাবুকেও সঙ্গে আনবেন।

ঔষধপত্র নিতে রোগী এসে যায়। শ্রীমতী করও আবার ওদিকে চলে যান। কাজে ব্যস্ত হন। ডাঃ করও আমাদের সঙ্গে নিয়ে জিনিস কিনতে বাজারে চলেন।

রাস্তায় বেরিয়ে ডাক্তারকে বলি, আপনাকে কনগ্রাচুলেট করতে হয়,—চমৎকার গৃহিণী পেয়েছেন,—প্রকৃতই "আইডিয়েল কমবাইন্ড হ্যান্ড"!

ডাঃ কর বলেন, বহুদিন এদেশে রয়েছি মশাই, এ দেশের মেয়েদের ভাল করে দেখার সুযোগও হয়েছে,—বর্মী মেয়েরা অদ্ভুত জাত। স্ত্রী-স্বাধীনতার রোল উঠেছে বিভিন্ন দেশে, কিন্তু তার পূর্ণ বিকাশ যদি দেখতে হয়, তা পাবেন এই বর্মায়। আর এখানে এটা অভিযান আন্দোলন করে মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে আদায় করেনি। আইন পাশ করেও সমাজে তাদের এই সম্মান লাভ নয়। এদেশে মেয়েদের এই স্বাধীনতা তাদের জন্মগত অধিকার। তাই এখানে মেয়েরা অবলা নয়, সামাজিক নিয়মদোষে পুরুষ জাতির অধীন বা পদানতও নয়। দেখুন না, এদেশে এখনও স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন নেই, তবুও নারীজাতি আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির বলে নিজেরাই সংসারে কি রকম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিশ্রম করে নিজেরাই

রোজগার করে, এমন কি নিষ্কর্মা স্বামী হয়ত তারই অর্থে প্রতিপালিত হয়। তার জন্যে স্বামীরও লজ্জা পাওয়ার রীতি নেই, স্ত্রীরও দম্ভ বা গর্ব করার কথা নয়। স্বামীদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে যায় না। প্রকৃত স্বাধীনতার মর্ম যেন এরা সত্যিই বোঝে। অদ্ভুত এইসব বর্মী মেয়েরা।

ডাঃ কর কথার মাঝে একটু চুপ করেন, কী যেন ভাবেন, তারপর বলেন, তবে কী জানেন, এই স্বাধীনতার আবার আর একটা দিকও আছে, সেটার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। বর্মীদের বিয়ে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, মন্ত্রপাঠ—এসব করেও হয় না, পরস্পরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়া। সেই কারণে বিয়ের পর বনিবনা না হলে বা স্বামী চিররুগ্ণ অথবা নিষ্কর্মা অলস হলে সহজেই বিবাহ-বিচ্ছেদও হয়। এই আমার কথাই বলি, প্রথমদিকে দু-একবার আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে—অস্বাভাবিকও এমন কিছু নয়। কিন্তু, ঐ সহধর্মিণীটি তখনই আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন। আমি ভাবলাম, বুঝি চিরবিচ্ছেদই ঘটল। কিছুকাল পরে দেখি, ফিরে এলেন। এসে আবার কাজকর্মে লেগে গেছেন, ঘরকন্নাও করছেন। কোথায় এতদিন কাটিয়ে এলেন, কী-ই বা করছিলেন, আমিও তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও আমাকে বলেননি। যথারীতি আবার দুজনের সংসার চলতে লাগল,—যেন মাঝের এই অদৃশ্য হওয়াটা কিছুই নয়। গোড়ার দিকেই এই রকম দু-একবার ঘটেছিল। তারপর থেকে এখানকার স্ত্রী-স্বাধীনতার মর্ম বুঝে ফেলেছি। ওভাবে মাঝেসাঝে চলে যাওয়া এখানে কিছুই অস্বাভাবিক নয়। স্বামীকে ওটা মেনে নিতে হবে। তারপর আর আমাদের মধ্যে কোন অঘটন ঘটেনি। খাসা সুখে স্বচ্ছন্দে আছি। দেখছি এরা স্বাধীন হলেও পতিব্রতা নারী।

বাজারে পৌঁছে যাই। জিনিসগুলিও কেনা হয়। দোকানে যথারীতি বিক্রেতা সুসজ্জিতা সুশ্রী বর্মী মেয়েরা। কানে হীরের দুল ঝিকমিক করে। ডাক্তার করকে সবাই চেনে। চেনবার যথেষ্ট কারণও থাকে। শুনি, তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁর স্ত্রীর সহপাঠিনী, বান্ধবী, কেউ বা মাসী, পিসী, ভগিনী ইত্যাদি!

বিকালে পূর্ণদার সঙ্গে ট্রামে চেপে যথাসময়ে ডাক্তার করের ডিসপেনসারিতে যাই। খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকি। দেখি, ডাক্তার নেই। ওদিকের লম্বা বেঞ্চে শ্রীমতী কর পা ছড়িয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন, বেশ জোর নাসিকাধ্বনিও হচ্ছে। অপর একটা বেঞ্চ খালি থাকলেও সেই পরিস্থিতিতে বসা চলে না। তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে আবার রাস্তার ফুটপাতে নেমে পায়চারি করি। ডাঃ করও এসে যান। বলেন,—হঠাৎ একটা 'আর্জেন্ট কল'-এ চলে যেতে হয়েছিল,—তা দরজা তো খোলা, বাইরে এভাবে ফুটপাতে ঘুরছেন কেন? চলে আসুন,—বলে ঘরে প্রবেশ করেই হেসে বলে ওঠেন, ওঃ! ঐ কারণে?

শ্রীমতী করও গলার স্বর শুনে জেগে ওঠেন। ধড়মড় করে তখনই উঠে বসেন। মনে হয়, লজ্জাও পান।

চা, জলখাবার আসে। তাঁর নিজের হাতে তৈরি। এনে দেনও তিনি নিজে। কিন্তু, একী! গরম গরম ফুলকো লুচি, আলুভাজা! তিনি বলেন, এসব আপনাদের দেশে গিয়ে শেখা। দেখুন, কেমন শিখেছি।

তারপর, নিয়ে আসেন তাঁদের দেশের তিন রকম রান্না,—কাঁচা বাঁশের মধ্যে তৈরি ভাত, অদ্ভুত স্বাদের কী এক সবজি, আর একটা চাটনি মতো কি একটা টক। খেতে ভালই লাগল।

অনেকক্ষণ গল্প করে তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে যখন রাস্তায় বার হই, ততক্ষণে ফুটপাতে নৈশ বাজার বসার আয়োজন শুরু হয়েছে।

আজ বর্মায় শেষ রাত্রি।

২৬শে অক্টোবর।

আজ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়বে।

অটলবাবুর বাড়িতে এমনই আন্তরিক আদর-যত্নের মধ্যে ক'দিন কেটেছে যে এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি, আমি নিজের বাড়ির বাইরে রয়েছি, বা এই পরিবারের সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়। তাই, সকলের কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হতে মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

সকালে সাড়ে আটটায় নীরজ ও আমি Sparks Street Jetty থেকে লঞ্চে করে B.I.S.N.-এর Ellenga জাহাজে উঠি। সেখানে যেতেই খবর দেয়, মাদ্রাজ-উড়িষ্যার উপকূলে বরুয়া ও গোপালপুরে যাওয়ার জন্য আজ আরও একটা জাহাজ ছাড়বার কথা ছিল, কিন্তু সে-জাহাজের যন্ত্রপাতির কি

গোলমাল হওয়ায় আমাদের এই জাহাজ বরুয়া ও গোপালুপর ঘুরে কলকাতা যাবে,—পৌছুতে পাঁচ দিন লাগবে।

নীরজ শুনে বলে, তা মন্দ কী! আমাদের তিনদিনের সমুদ্র যাত্রার বদলে পাঁচদিন জাহাজে কাটানো, —সেই একই টিকিটে নতুন দিক দিয়ে যাওয়াও।

সেকেন্ড ক্লাসে যাত্রীর ভিড় নেই। আর একজন মাত্র রয়েছেন। ভবানীপুরেরই আমাদের এক বন্ধুর ভাই। বর্মায় তাঁদের কাঠের ব্যবসা। জাহাজের ডাক্তারও বাঙালী,—গুহঠাকুরতা। ইলেকট্রিশিয়ান ঘোষ ও gunner ব্যানার্জীর সঙ্গেও পরিচয় হয়। গল্প-গুজবে আনন্দেই সময় কাটতে থাকে।

২৮শে অক্টোবর।

আজ তৃতীয় দিন। জাহাজ বরুয়ায় পৌছুল। তীর থেকে অনেকখানি দূরে মাঝ সমুদ্রে নোঙর করেছে। তীরে একটা উঁচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ঢেউ ভেঙে কয়েকটা নৌকা আসছে,—যাত্রী নামাতে। জাহাজের নিকটে এসে নৌকা দাঁড় করাতে হিমশিম খায়। নৌকা সমুদ্রের ঢেউ-এ কেবলই দোলে, ওঠে নামে। জাহাজের সিঁড়ি নৌকা পর্যন্ত পৌছয় না, অল্প উপরে শেষ হয়। জাহাজের ডেক থেকে প্রকাণ্ড একটা দড়ি ঝুলিয়ে দেয়। নৌকার মাঝি সেইটে ধরে নৌকা কিছুটা স্থির করার চেষ্টা করে। ডেক-যাত্রী মাদ্রাজী কয়েকটি মেয়ে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে নৌকায় উঠবে বলে। কিন্তু উঠবে কি করে? ডেকের রেলিং ধরে তাকিয়ে দেখতে থাকি। সমুদ্রের অগাধ জলে না পড়ে! সিঁড়ির শেষ ধাপে এক-একজন করে মেয়ে নেমে গিয়ে দাঁড়ায়, শাড়িতে কিভাবে মালকোচা মারে, তারপর সেই দোলায়মান নৌকায় অনায়াসে ঝপ্ ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ে।

তখনই বোঝা যায়, এরা এইভাবে নামতে বেশ অভ্যস্ত।

সন্ধ্যা সাতটার পর জাহাজ ছাড়ে। রাত দশটায় গোপালপুর পৌছে আবার নোঙর ফেলে দাঁড়ায়।

২৯শে অক্টোবর।

ভোর হতেই কেবিন ছেড়ে ডেক-এ আসি। জাহাজ তখনও দাঁড়িয়ে। গোপালপুরের ঘরবাড়ি বহু দূরে দেখা যায়। আটটার সময় জাহাজ আবার চলতে থাকে। বহু দূরে তীরের রেখা ধরে এখন থেকে চলা। বেলা দুটায় তীরের সেই সমরেখার মাঝে মনে হয় যেন পুরীর মন্দিরের চূড়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। নীরজ দূরবীন এনে দেখে। বলে, হাঁ, হে, তাই বটে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এই নাও, দেখ। এইখান থেকেই জগন্নাথদেবকে প্রণাম করো।

Gunner ব্যানার্জিও এসে জানিয়ে যান,—আমরা এখন পুরীর নিকট দিয়ে চলেছি।

আমি বলি, তাহলে কোনারকের মন্দিরও দেখা যাবে।

ঘণ্টাখানেক পরে তাই যায়ও;—তবে এই দূরবীনের সাহায্যেই।

ভেবে আনন্দ পাই, পুরীর সমুদ্রতটে বসে জাহাজ যেতে দেখেছি, আজ জাহাজে বসে সেই পুরী দেখা!

৩০শে অক্টোবর।

আজ পঞ্চম দিন। সকালে উঠে দেখি, কখন গঙ্গার বুকে চলে এসেছি। শুনি, রাত্রে পাইলট এসে জাহাজ নিয়ে চলেছে। আবার সেই পরিচিত দৃশ্য। মনে হয়, যেন কত যুগ পরে দেখি।

বেলা বারোটায় উটরাম ঘাট। ক'দিন পরে শক্তভূমিতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে স্বস্তি বোধ করি। কয়দিন জল—শুধু জল দেখে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল।

রেঙ্গুন থেকে ফেরবার কয়দিন পরেই নিদারুণ দুঃসংবাদ পাই, অটলবাবু সেই রোগশয্যায় হঠাৎ ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তাঁর এই অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদ বর্মায় কাটানো সুমধুর দিনগুলির সুখস্মৃতির উপর বিষাদঘন ছায়া ফেলে।

পুনশ্চ :

১৯৮৫।

মানবজীবনেরও যেমন অবসান হয়, আমার দেখা সেই বর্মা রাজ্যেরও তেমনি বিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানীরা বর্মা জয় করে। পরে, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী জাপানীদের পরাজিত করে সেদেশ পুনর্দখলে আনে। তারপর, ব্রিটিশ সরকারও বর্মাত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্রহ্মদেশ স্বাধীন রাজ্য ঘোষিত হয়,—৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৪৮ সালে। ঐ দুই যুদ্ধের বিষময় অশুভ ফলে বর্মা বিপর্যস্ত হওয়ায় দেশে রাজনৈতিক অশান্তিও প্রকট হয়ে ওঠে। বর্মাপ্রবাসী কয়েকলক্ষ ভারতবাসী বর্মা ত্যাগ করে চরম দুর্গত অবস্থায় স্বদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

শোনা যায়, স্বাধীন বর্মা সরকারের বিদেশী সংস্পর্শ এড়ানোর নীতি প্রবল। তাই, কি জানি, এই নতুন-জেগে-ওঠা বর্মায় একালে ভ্রমণ কতদূর সম্ভব এবং বর্মার বিগতদিনের সভ্যতার সুন্দর নিদর্শনগুলিই বা এখন কি অবস্থা!

শ্রীপাদ।

শ্রীপাদ।

ভারতীয় নাম। কিন্তু, ভারতে নয়। সিংহলে—শ্রীলঙ্কায়। উত্তুঙ্গ এক গিরিশিখর। বাল্যকালে ভূগোলের পাতায় এর বিদেশী নামের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়—Adam's Peak—আদমের শিখর। তখন জানতাম, সিংহলের এই সর্বোচ্চ গিরিচূড়া। বহু বছর পরে সিংহলে বেড়াতে গিয়ে ভুল ভাঙে। এর চেয়ে উঁচু পাহাড় সেখানে আছে। সর্বোচ্চ শিখর—Pidurutalagala—পিদুরুতলগল—৮,২৯২ ফুট। Adam's Peak-এর উচ্চতা—৭,৩৬০ ফুট। আদম্‌স পিক-এর স্থানীয় নাম—শ্রীপাদ। নামের মধ্যেই স্বর্গীয় শোভা, বুকে যেন শ্বেতচন্দনে চরণপদ্ম আঁকা। শুনিও তাই। উচ্চতম শিখর না হলেও সিংহলে পুণ্যতীর্থ পর্যায়ে শ্রীপাদ সর্বপ্রধান। বৌদ্ধ, ক্রিশ্চান, হিন্দু, মুসলমান—সকল ধর্মাবলম্বী লোকেরাই এই গিরিশিখরের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন। দলে দলে এই দুর্গম তীর্থযাত্রায় যান। পাহাড়ের চূড়ায় পাথরের উপর বিচিত্র রেখা,—মনে হয় অতি-মানবের পদচিহ্ন। বৌদ্ধরা বলেন, বুদ্ধদেবের। হিন্দুরা বলেন, জগৎপালক বিষ্ণুর। ইসলাম, ক্রিশ্চান ও ইহুদী জাতীর মতে আদিম মানুষ আদমের,—স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে এইখানেই তাঁর প্রথম পদার্পণ।

১৯৫০ সালের ১১ই অক্টোবর। কলকাতা থেকে জাহাজে যাত্রা করি। ছ'দিন লাগে কলম্বো পৌঁছুতে। সিংহলের সুপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখি। সমুদ্রের কোলে বিরাট দ্বীপ। স্নিগ্ধ সবুজ গাছপালা বন। সোনার বরণ শস্যক্ষেত। চামর দোলায় নারিকেল কুঞ্জ। প্রাচীন রাজাদের কীর্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ। বিশাল সরোবর। বৌদ্ধ দাগোবা। স্থাপত্য, মূর্তিশিল্প, চারু চিত্রকলার গৌরবময় অপূর্ব নিদর্শন। রবার, কফি, চায়ের প্লানটেশন। বড় বড় পুরানো রাজধানী ও শহর—অনুরাধাপুর, পলোন্নোরুয়া, ডামবুল্লা, সিগিরিয়া, কাণ্ডি। আবার রত্নপুর, গল্, মাহ্‌তার, হাম্‌বন্‌তোতা, তিস্যমহারাম, কর্তারগ্রাম,—আরও কত কী! অপরূপ শোভাময় সিংহলদ্বীপ। ভারত মহাসাগরের বুকে দোলে যেন নীলকান্তমণি।

কিন্তু, পাহাড়ের দুর্নিবার আকর্ষণ রক্তে থাকে। এত দেখেও আশ মেটে না। সমুদ্রে ঘেরা দ্বীপ, আবার বিপুল গিরিশ্রেণীও। হিমালয়-পথের কথা বার বার স্মরণ করায়। যেন, প্রবাল পথে হঠাৎ কাকে দেখে প্রিয়-জনের কথা ভাবা।

কলম্বোতে সিংহলী বন্ধুকে জানাই,—এইবার ব্যবস্থা করে দিন শ্রীপাদ-দর্শনের। তিনি চমকে উঠে বলেন, এখন? শ্রীপাদ! এটা তো যাত্রার সময় নয়। অক্টোবরের শেষ—পাহাড়ের ওপর প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচু। লোকজন এখন কেউই যায় না, ব্যবস্থাও কিছু থাকে না। ট্রেন ছেড়ে কিছুদূর মোটরে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তারও ব্যবস্থা হয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ। শেষের কয়েক মাইল তো পাহাড়ী হাঁটাপথ—পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় ওঠা।

শুনে উৎফুল্ল হই, বলি, বাঃ! সেইজন্যেই তো আরও যাওয়া!

তিনি বলেন, আরও একটা কথা।—শ্রীপাদের চূড়া থেকে সূর্যোদয় দেখা—সিংহলের এক অপূর্ব দৃশ্য। জগদ্বিখ্যাত। যেমন, আপনাদের দার্জিলিংয়ে 'টাইগারহিলে'র 'সানরাইজ' ('Sunrise')। এখানে অবশ্য বরফ নেই, কিন্তু আলোছায়ার অদ্ভুত এক খেলা আছে। এখন মেঘ ও বাদলের সময়, আকাশ পরিষ্কার থাকে না, কষ্ট করে গেলেও কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না।

আশ্বাস দিই, আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার ওখানকার বন্ধুকে একটা চিঠি তো লিখে দিন, আমি বেরিয়ে পড়ি, তিনি ব্যবস্থা বা সাহায্য করতে পারেন ভালই, নাহলে একাই খোঁজখবর নিয়ে ঘুরে আসব। তাছাড়া, Nuwara Ellya—নুয়ারা এলিয়া—যেখানে সীতার অশোকবন—আমাদের দেখতে যেতেই হবে, ট্রেনের পথটা অনেকখানি একই।

তারপর হেসে জানাই, সময়ে অসময়ে হিমালয়ে কত ঘুরেছি, সব সময়েই দেবতার অশেষ করুণার নিদর্শন পেয়েছি। কোথাও কোন অভিলাষ অপূর্ণ থাকে নি। আমার অটুট বিশ্বাস, এখানেও সব আয়োজন ঠিক হয়ে যাবে,—না হলেও ক্ষতি নেই,—কিন্তু আবহাওয়া ভাল থাকবেই।

বন্ধু খুশি হয়ে চিঠি লেখেন।

কলম্বো থেকে ট্রেনে যাত্রা করি।

সমতল ক্ষেত্র শেষ হয়। ট্রেন ক্রমশ পাহাড়-পথে উঠতে থাকে। চারিপাশে সুন্দর পার্বত্য-দৃশ্য। সবুজ গিরিমালা ঘিরে আছে। অগণিত পাহাড়ের মধ্যে হঠাৎ দেখি বীরের মত উন্নতশির তুলে এক স্বতন্ত্র শিখর। ত্রিকোণ আকৃতি। যেন, মাথার মুকুট আকাশ ছোঁয়া। বহু লোকের ভিড়ের মধ্যেও যেন কোন বিরাট পুরুষকে চিনিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না, দেখেই চেনা যায়, ঠিক তেমনি এই গিরিচূড়াও আপন মহিমা আপনি ব্যক্ত করে। তবুও, সহযাত্রীকে প্রশ্ন করে নিশ্চিত হই। মনে পড়ে, তিব্বতে শ্রীকৈলাসও এমনি করেই জানা সত্ত্বেও প্রথম দর্শনেই চেনা যায়। মহাত্মার দর্শনে আপনা থেকেই মাথা নত হয়, দেবতাত্মার মহান শিখরেরও প্রভাব তেমনি। দূর থেকে প্রণতি জানাই। সান্নিধ্যে যাওয়ার অসীম আকাঙ্ক্ষা মনে মনে নিবেদন করি।

কলম্বো থেকে হাটন্ স্টেশন ১০৯ মাইল। ৪,১৪১ ফুট উঁচুতে। বিকালে পৌঁছুই। ট্রেন থেকে নামতেই এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। সাদর অভ্যর্থনা জানান। বন্ধুর চিঠি পেয়েছেন দেখি। স্থানীয় বৌদ্ধ সঙ্ঘের সম্পাদক, মিঃ শিরসেনা।

বারো মাইল দূরে মাসকেলিয়া গ্রাম। ৪,২০০ ফুট। মোটরে সেইখানে নিয়ে চলেন। জানান, শ্রীপাদে ওঠার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

পাহাড়ের উপর দিয়ে মোটরের পথ ঘুরে ঘুরে চলে। অনুপম প্রাকৃতিক শোভা। ছোট ছোট পরিচ্ছন্ন গ্রাম। চারিপাশে সবুজের মেলা। মাঝে যেন পাখির বাসা।

শুনি, এই সব অঞ্চলে এখন অনেক চায়ের বাগান।

মাস্কেলিয়ার এক বাড়িতে বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়। শিরসেনা জানান, রাত আড়াইটেয় যাত্রা করতে হবে, যেন তৈরি থাকি। আরও মাইল পাঁচেক মোটর যাবে। তারপর, পদব্রজে। মাত্র চার মাইল—কিন্তু দুরূহ পাহাড়ী চড়াই।

শুনে সাগ্রহে জানাই, তাতেই তো আনন্দ। যাত্রার জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত।

সন্ধ্যাবেলা। ঘরের মধ্যে গ্রামের লোকের ভিড় জমে। অসময়ে শ্রীপাদযাত্রী। তার উপর বিদেশী। সকলেরই কৌতূহল। কিন্তু বাক্য-বিনিময় হয় না। শিরসেনা ছাড়া কেউই ইংরেজী জানে না। সিংহলী ভাষা আমিও বুঝি না, দু-একটা কথা ছাড়া। হাবভাবে ইশারায় কথা চলে। শিরসেনা দোভাষীর কাজ করেন। এরই মধ্যে ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটে।

সকলের কাছে শিরসেনা আমার পরিচয় করিয়ে দেন। কলকাতা থেকে এসেছি শুনে কেউই কিছু বোঝে না দেখি। ভারতের প্রধান শহরের নাম তাদের অজানা। সিংহলের কোন এক নিভৃত অঞ্চলের গ্রামবাসী,—না, জানাই স্বাভাবিক। কিন্তু, আশ্চর্য হই যখন দেখি, বাংলাদেশ থেকে আসছি শুনে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। সবারই মুখে আনন্দের দীপ্তি ফোটে। উৎফুল্ল হয়ে পরস্পরে হাত নেড়ে কি বলাবলি করেন। খুশি হয়ে ঘাড় নাড়েন। একজন আবেগভরে এগিয়ে আসেন। দু-হাতে আমার হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে সাদরে নাড়তে থাকেন, 'শেকহ্যান্ড' করার মত। মুখে প্রীতিমাখা হাসি। নিজ ভাষায় যা বলেন, তার অর্থ সহজেই বোঝা যায়। এক হাত তুলে আঙুল দিয়ে আমার দিকে দেখান, আবার নিজের বুকের দিকে আঙুল ঘোরান। বেশ বুঝতে পারি, বার বার বলেন, তুমিও বাঙালী আমিও বাঙালী—দুজনেই বাঙালী! বাঃ! বাঃ! কী আনন্দ!

সবাই সমস্বরে তাঁর সমর্থন করেন।

আমার সারা দেহে পুলক জাগে। চোখে জল ভরে আসে। কি আন্তরিক আত্মীয়তার অভিব্যক্তি।

শিরসেনা হেসে বলেন, ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো? বিজয়সিংহের সিংহলবিজয় কাহিনী। জানেন নিশ্চয়?

বলি, আমাদের ভারতের ইতিহাস তাঁকে স্বীকার করে নেয়নি। তথ্যগত সুনিশ্চিত প্রমাণের এখনও অভাব, তাই ঐতিহাসিকরা মানতে চান না।

শিরসেনা জানান, কিন্তু সিংহলের ইতিহাস এই ঘটনাকে মেনে নেয়। শুধু মেনে নেওয়াই নয়। সিংহলী জাতির ইতিহাসের গোড়াপত্তনই হল বিজয়সিংহের কাহিনী নিয়ে। এদেশের প্রাচীন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ হল—মহাবংশ। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মূল গ্রন্থটির রচনা শুরু হয়। এক বৌদ্ধ ভিক্ষু এর রচয়িতা। আগেকার আরও প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু সেই সব

প্রাচীনতম গ্রন্থ লোপ পেয়ে যায়। অবশ্য পরে এই মহাবংশেই আরও অনেক কিছুই যোগ হয়েছে,—নানান রকম গল্প উপকথাও। তবুও, এই মহাবংশের ভিত্তিতেই সিংহলের ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা। তাতেই পাওয়া যায় সিংহলের কাহিনী। যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি যশোজ্জ্বল। সিংহলীরা সবাই সে কাহিনী জানে। সত্য ঘটনা বলে বিশ্বাসও করে।

সিংহলী কাহিনীটি শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করি।

শিরসেনা বলতে থাকেন, জানেনই তো বিজয়সিংহ ছিলেন আপনাদের বঙ্গদেশেরই এক রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র। কিন্তু রাজকুমার হলে হবে কি? কিংবা, কি জানি, সেই কারণেই হয়ত,—অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র। তাঁর যথেচ্ছ আচরণে দেশবাসী উৎপীড়িত ও উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠে। রাজার কাছে রাজকুমারের নানান অত্যাচারের নালিশ জানায়। প্রতিবিধানের আবেদন করে। রাজা আপন পুত্রের নির্বাসন দণ্ড দেন। সাত শ' অনুচরবর্গ নিয়ে বিজয় জাহাজে সমুদ্রপথে পাড়ি দেয়। সে আজ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। তাদের স্ত্রী-পুত্রদেরও অপর দুটি জাহাজে তুলে রাজ্য থেকে বার করে দেওয়া হয়। কিন্তু সমুদ্রপথে সে-দুটি জাহাজ বিজয়সিংহের জাহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের পরবর্তী ইতিহাস আর জানা যায় না। অথচ দুর্জয়সাহসী বিজয়সিংহ ঘুরতে ঘুরতে লঙ্কাদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়। সিংহলী ঐতিহাসিকদের মতে ঠিক সেই সময়েই বুদ্ধদেবের নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে।

খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে। এই সাল গণনা নিয়ে অবশ্য মতান্তর আছে। লঙ্কাদ্বীপে সে সময়ে যক্ষজাতির বসবাস। বিজয়সিংহ লঙ্কায় এসে কুবেণী নামে এক যক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কুবেণী ও তার অনুচরদের সাহায্য নিয়ে বিজয় যক্ষদের রাজাকে হত্যা করে লঙ্কার কয়েক জায়গায় রাজ্যস্থাপনের আয়োজন করলেন। মনে মনে স্থিরও করলেন, রাজসিংহাসনের মর্যাদা রাখতে হলে ভারতের কোন রাজকুমারীকে রাজমহিষী রূপে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে। ব্যবস্থাও সেইমত হয়ে যায়। পাণ্ডবরাজের কন্যার সঙ্গে বিজয়ের বিবাহ হয়। নববধূর সঙ্গে পাণ্ডবরাজ বহু সখী, অনুচরী, লোকলস্কর, দ্রব্যসম্ভার ইত্যাদি যৌতুক পাঠান। ওদিকে রাজকুমারী আসার আগে বিজয় কুবেণীকে বোঝান, এখন আমি রাজা, পাণ্ডব রাজকুমারী আমার মহিষী। তোমাকে এবার ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি। করেনও তাই।

প্রবাদ, এই শ্রীপাদ—আদম্‌স পিকের আশপাশের পাহাড়ে ও বনে কুবেণীর সন্তানরা এসে বসবাস শুরু করে।

জিজ্ঞাসা করি, যক্ষদের এখন আর এদেশে দেখা যায় না?

শিরসেনা বলেন, কারও কারও মতে, এখানকার ওয়েদ্যস্‌ (Veddahs) যাযাবর উপজাতি যাদের দেখা যায় তারাই নাকি সেই আদিম যক্ষদেরই বংশধর।—তারপর বলি শুনুন, বিজয়সিংহের সেই রাজ্যস্থাপনার পর থেকেই লঙ্কাদ্বীপের নতুন নামকরণ হয়ে গেল, তাঁরই নাম থেকে,—সিংহল। নতুন সিংহলী জাতিরও উৎপত্তি হল। সিংহলীরা মনে করেন, বিজয়সিংহ ও তাঁর অনুচরবর্গই তাদের পূর্বপুরুষ। বিজয়সিংহ বাঙালী। অতএব সিংহলীদের—এবং বিশেষ করে এই গ্রামবাসীদের বিশ্বাস,—তারাও বাঙালী। আপনাকে আজ হঠাৎ কাছে পেয়ে সেই জন্যেই এদের এমন স্ফূর্তি। আপন ভাইয়ের মত বুকে ধরে।

শিরসেনার কথাগুলি একমনে শুনি। সেই কোন পুরাকালের এক দেশান্তরিত অসীমসাহসী বাঙালী বীর যুবকের দুর্জয়-কাহিনী! বাংলাদেশ থেকে সুদূর দুর্গম দেশান্তরে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, নবীন জাতির প্রবর্তন। মনে হয়, যেন আড়াই হাজার বছর ব্যাপী কাল-সমুদ্রের ওপার থেকে মধুর কোন এক সঙ্গীত ভেসে আসে। ভাবি, আধুনিক যুগের ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ধর্ম, পররাষ্ট্র নিয়ে হিংসা-দ্বেষের বিশ্বগ্রাসী বহ্নি এদের সরল সহজ মনের মানবপ্রেম ও বিশ্বাসকে এখনও দহন করেনি।

সেদিন সুদূর বিদেশে এই অকস্মাৎ স্বজাতি-স্বীকৃতির আনন্দ জীবনে ভোলবার নয়।

এই সম্পর্কে সিংহল বাসকালে আরও দুটি আশ্চর্য যোগাযোগ চোখে পড়ে।

বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত। সিংহলীদেরও তাই। কিন্তু বাংলাদেশের বাইরে 'ভাত' কথাটির প্রচলন কোথাও দেখি না। সিংহলে এসে হঠাৎ শুনি এঁরাও বলেন,—'বাত্‌'!

বাঙালীর মাতৃসমা নদী—গঙ্গা। সিংহলেও নদীর নামকরণে গঙ্গার সংযোগ। মাণিক গঙ্গা, শীতল গঙ্গা, মহাবলী গঙ্গা, কালু গঙ্গা, জিনগঙ্গা, নীলওলা গঙ্গা, ওয়ালয়ে গঙ্গা, বেনতোতা গঙ্গা, খেলনী গঙ্গা ইত্যাদি।

ভাবি, সুদূর সিংহলে গঙ্গার পবিত্র নামের আবাহনও করে কি বিজয়সিংহ,—সিংহলের ভগীরথ?

গ্রামের লোক আসে, বসে, গল্প শোনে, উঠে যায়, অপর লোক আসে। এক যুবক এসে একপাশে বসে। শিরসেনা দেখতে পেয়ে সামনে ডেকে বসান। সোৎসাহে কি যেন অনুরোধ করেন। সে রাজী হয় না, বুঝতে পারি। শান্ত গম্ভীর মুখে ঘাড় নেড়ে 'না' 'না' জানায়।

কৌতূহল হয়। ব্যাপার কি?—প্রশ্ন করি।

শিরসেনা বলেন, রাত্রে আমরা রওনা হব, ফরেস্ট অফিসারও যাবেন, তবুও এঁকে আসবার জন্যে বলেছি, রাজী হচ্ছেন না। শ্রীপাদে এঁর মত আর কেউ যায়নি। পথঘাট নখদর্পণে। তাই বলছিলাম। কিন্তু এঁরও 'না' বলার যথেষ্ট কারণ আছে। ব্যাপারটা এখানকার সকলেরই জানা। তবুও, নিজের মুখে শুনুন, আমি তরজমা করছি। ওঁর জীবনের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

ছেলেটি, প্রথমে বলতে চায় না! পরে ধীরে ধীরে শান্ত মৃদু কণ্ঠে বলে। মুখে, চোখে, বাক্যে গভীর শ্রদ্ধা সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে।

কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। হঠাৎ ছেলেটি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। দেহের একদিকের অংশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও সারে না। অল্প বয়সে এমন ভাবে অক্ষম হয়ে চিররুগ্‌ন থাকা—তার অসহনীয় বোধ হয়। মনে মনে সঙ্কল্প করে, জীবন শেষ করে দিই, কি হবে আর এমনভাবে বেঁচে থেকে?

কিছু দূরে নির্জন রেলপথ। কোনরকমে আসে। অন্ধকারে লাইনের উপর শুয়ে পড়ে, রাত্রে ট্রেন যায়, তাতেই সব শেষ হবে, রোগ ভোগেরও শান্তি হবে।

আচ্ছন্ন অবস্থা। হঠাৎ মনে হয়, সামনে উজ্জ্বল জ্যোতি। মূর্তি ধরে স্বয়ং শ্রীপাদ দাঁড়িয়ে। মুখে করুণার হাসি। বলেন, মূঢ়! প্রাণ নিচ্ছ কার? কে দিয়েছে তোমার প্রাণ? নেবার অধিকার আছে তোমার? ওঠ। ধৈর্য ধর। মনে বিশ্বাস রাখ। ভয় নেই, চলে এস আমার কাছে। ঐ শীতল গঙ্গায় স্নান করো, উপরে এসে আমার পূজা দাও, রোগমুক্ত হবে।

চমকে ওঠে ছেলেটি। মনে এক অদ্ভুত ভাব। কোথাও কাউকে দেখে না। সাহস ও বিশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে দেহ টেনে নিয়ে চলে শ্রীপাদের পাদদেশে শীতল গঙ্গায়। স্নান সেরে পাহাড়ের সেই দুর্গম চড়াইও অতি কষ্টে কেমন করে উত্তীর্ণও হয়। ভক্তিভরে শ্রীপাদের পূজা দেয়। পরম বিস্ময়ে দেখে অচল হাত-পা নাড়ে—যেন সহজ সুস্থ দেহ।

শিরসেনা কাহিনীর ব্যাখ্যা শেষ করে বলেন, কদিন ওকে না দেখে গ্রামের লোকেরা চিন্তিত হয়। খোঁজাখুঁজি চলে। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা যায়, সুস্থ স্বাভাবিক দেহে ছেলেটি ফিরে আসে। সবাই দেখে অবাক। কারণ জিজ্ঞাসা করলে কাউকে কিছু বলে না, হাসে। এক বছর পরে ঘটনাটা জানায়। ওর আচার-ব্যবহার জীবনের ধারাও বদলে যায়। সেই ঘটনার পর থেকে প্রতি পূর্ণিমার রাতে শ্রীপাদ দর্শনে যায়, ঝড়বৃষ্টি, শীতগ্রীষ্ম কিছুই মানে না। ঘটনাটা আমরা দেখিনি ঠিকই; কিন্তু সকলেই তো দেখেছে, হঠাৎ একদিন আশ্চর্যভাবে নীরোগ হয়ে ফিলে এল।

উপস্থিত সকলেই সায় দেন।

শিরসেনা জানান, দুদিন আগে পূর্ণিমা গেছে, শ্রীপাদ-দর্শনও করে এসেছে, তাই আর যেতে চায় না। তাছাড়া শুধু শুধু বেড়াতে যাওয়ায় ওর কোনই আগ্রহ নেই, কখনও যায়ও না—শ্রীপাদের অসীম করুণার চাক্ষুষ নিদর্শন দেখছেন? এসব বিশ্বাস করেন আপনাদের দেশের লোকেরা?

আমি বলি, আপনাদের যেমন শ্রীপাদ, আমাদের তেমনি হিমালয়! সেখানেও এমন ঘটনা যে না ঘটে, তা নয়।

আমিও হিমালয়ের মহিমা কীর্তন করি।

ভাবি, মানুষের সহজ ধর্ম-বুদ্ধি, সরল বিশ্বাস দেশকাল অতিক্রম করে বিরাজ করে। তারই মধ্যে অন্তরের নিগূঢ় প্রেম-বন্ধন,—বিশ্বমৈত্রী।

মিলন বৈঠক ভাঙে অনেক রাতে। তার পর, শুলেও চোখে ঘুম নামে না। নতুন পথে আসন্ন-যাত্রার আগ্রহ মনে চাঞ্চল্য জাগায়। কেবলই টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখি, এই বুঝি সময় হয়। রাত দুটোর মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে থাকি। শিরসেনা ও ফরেস্ট অফিসার ঠিক সময়েই আসেন। দুটো পঁয়তাল্লিশে মোটরে যাত্রা করি। কিছু খাদ্য ও চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে একজন লোকও সঙ্গে চলে। পাহাড়ের উপর কিছুই পাওয়া যায় না।

অনেক আগেই চাঁদ উঠেছে। মেঘমুক্ত আকাশ। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। মনে হয়, ভোরের আলো ফোটে। তৃপ্তি ও আনন্দে মন ভরে থাকে। অনুভব করি, দেবতার অনন্ত করুণা ঝরে পড়ে।

জনহীন পথ। পার্বত্য প্রকৃতির শব্দহীন প্রশান্ত দীপ্তি।

পাঁচ মাইল গিয়ে ডালহাউসি টি স্টেট। মোটর ছেড়ে এবার পায়ে হাঁটা। সামনেই শ্রীপাদ শৈলশিখর। প্রায় তিন হাজার ফুট এখনও উঠতে হবে। চার মাইল পথ।

চাঁদের আলোয় দূর থেকে দেখায় যেন ভুবনজোড়া বিরাট মন্দির। ক্রমে ক্রমে কাছে আসে, আরও বিশাল দেখায়।

প্রথম কিছুদূর পাহাড়ের কোলে সমতল ক্ষেত্র। পথের মাঝখানে মকরতোরণ। ফেরবার সময় দেখি বিজ্ঞপ্তি লেখা, মাত্র এক বছর আগে—১৯৪৯ সালে গভর্নমেন্টের তৈরি। নিকটেই হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্ক্রিমের জন্য নদীর বাঁধ—নর্টন ব্রীজ (Norton Bridge)।

আরও কিছু দূরে পাহাড়ের নীচে মনোরম স্থান,—গাঙ্গুলাতেন্ন। পাশে পাহাড়ী নদী,—শীতল গঙ্গা। দুই তীরে গাছপালা, পাথর। শ্রীপাদের চরণ ধুয়ে ছোট নদীর কলস্বরে নেমে চলে, তারই যেন স্তবগান গেয়ে। তীর্থস্থান তীর্থযাত্রার অঙ্গ। এখানেও তাই। শীতল গঙ্গায় স্নান-আচমনাদি করে, পাহাড়ে উঠে দর্শনে যাওয়া নিয়ম।

কেবলই সিঁড়ি। পাহাড়ের গায়ে, অথবা পাথর কেটে, ধাপের পর ধাপ। প্রথম দিকে বনজঙ্গল, পরে শুধুই পাথর। এ জায়গায় খাড়া পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে কেটে সরু ধাপ। নীচের দিকে তাকালে অনভ্যাসে মাথা ঘোরা স্বাভাবিক। শুনি, আগেকার কালে এ-পথে বিপদের আশঙ্কা ছিল অতিমাত্রায়। প্রায়ই যাত্রীর প্রাণহানি ঘটত। সে-সময়ে পথ ছিল অনেক সরু, কোন রকমে পাথরের গায়ে পা রেখে ওঠা। শেষের এক জায়গায় পাহাড়ের উপর থেকে খাড়া পাথরের গায়ে প্রকাণ্ড এক লোহার শিকল ঝোলানো, এই চেন ধরে যাত্রীদের কোনমতে সেই অগম্য স্থান অতিক্রম করা। এখনও সেই লোহার শিকল তেমনি ঝোলা দেখি, কিন্তু ব্যবহারে লাগে না। পথ এখন অনেক প্রশস্ত, পাশেও ধরবার জন্য দরকার মত রেলিং দেওয়া। বিপদের আশঙ্কাও আর নেই।

শিরসেনা একবারের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার বিবরণ দেন। পরে, বইয়ের পাতাতেও এ কাহিনী পড়ি।

সে-বছর যাত্রার সময় দলে দলে যাত্রী চলে। এখানে পৌঁছে সকলকেই যথারীতি অপেক্ষা করতে হয়। সাবধানে পালাক্রমে শিকল ধরে কয়েকজন উঠতে থাকে। অকস্মাৎ প্রবলবেগে ঝড় ওঠে। যাত্রীসমেত লোহার শিকলও বাতাসে দুলতে থাকে। যত দোলে, দোলার বেগও তত বাড়ে। জনদশেক যাত্রী—সবাই একদলের, একই পরিবারের,—তখন শিকল ধরে ঝোলে, পাহাড়ের গায়ে পায়ের আশ্রয় হারায়, প্রাণপণে চেন আঁকড়ে দুলতে থাকে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতন। উন্মত্ত বাতাসের বুক চিরে কটি অসহায় মানুষের মর্মভেদী আর্তনাদ ওঠে। নিমেষ মাত্র। গুলতি থেকে ছিটকে-যাওয়া ঢেলার মত শূন্যে ঠিকরে পড়ে সেই যাত্রীদল। পাহাড়ের তলদেশে কোথায় অদৃশ্য হয় তাদের দেহ—কোন সন্ধানই আর মেলে না।

তখনকার দিনে শ্রীপাদ যাত্রা এমনি বিভীষিকাময় ছিল। তবুও, যাত্রী আসত—কীসের সাহসে বুক বেঁধে, কীসের টানে,—কে জানে!

মাইল তিনেক উঠে ইন্দিকাটুপানো। যাত্রাকালে যাত্রীদের থাকবার আশ্রয়। প্রবাদ, ভগবান বুদ্ধদেবের অঙ্গবাস—robe, এইখানে ছিঁড়ে যায়, সেলাই করে নেন। তাই এ জায়গায় ছুঁচসুতো পথে ফেলে যাওয়া তীর্থযাত্রীদেরও রীতি। মনে পড়ে, কেদার-বদরী যাত্রাপথেও 'সুইতাগা' বিতরণের প্রথা।

পাহাড়ের গায়ে গুহা। ভগবন্ লেন—Cave of Gods! ভিতরে পাথরের গায়ে খোদাই-করা অতিকায় প্রতিমূর্তি। নিকটে এক শিলালেখও।

শিরসেনা বলেন, মূর্তিটি হল নিস্যংকমল্লের। শিলালিপিও তাঁরই সময়ের অনুরাধাপুরের রাজ্য ভেঙে গেলে পলোন্নোরুয়াতে যে নতুন রাজ্য পত্তন হয়, সেই সময়ে কীর্তিমান রাজা ছিলেন—নিস্যংক। ন'বছর মাত্র তিনি রাজত্ব করলেও তাঁর বহু কীর্তির নিদর্শন ও শিলালিপি সিংহলের নানান জায়গায় ছড়িয়ে আছে—বিশেষত পলোন্নোরুয়ার ভগ্নাবশেষের মধ্যে। এই শ্রীপাদ তীর্থযাত্রা যে কত প্রাচীন এই সব দেখেই বেশ বোঝা যায়। সিংহলের অনেক রাজাই শ্রীপাদ তীর্থযাত্রীদের সুখ-সুবিধার ও তীর্থক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে শুধু যে সাহায্যদান ও ব্যবস্থাই করতেন, তাই নয়,—নিজেরাও অনেকেই এই দুর্গম তীর্থযাত্রায় আসতেন। রাজা প্রথম বিজয়বাহু (খ্রিস্টীয় এগারো শতকে), মহামহিম পরাক্রমবাহু (বারো

শতকে), নিঃশঙ্কমল্ল (Nissanka Malla) (১১৯৮-১২০০), তৃতীয় পরাক্রমবাহু (তেরো শতকে),—পরে বিমলধর্ম সূরীয় (১৮শ শতকে), তাঁর পুত্র নরেন্দ্র সিংহ,—এঁদের সকলেরই এই তীর্থযাত্রায় আসার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু সিংহলীদের কথাই বলি কেন, একজন প্রসিদ্ধ মুসলিম ধর্মাবলম্বীর কথাও বলি —Ibn Batuta—ইবন বটুটা (১৩০৪-১৩৭৮)—১৩৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের ধর্মমতানুযায়ীও এই তীর্থ করে যান,—pilgrimage to "The Footmark of our Father Adam" in Ceylon। আবার ক্রিশ্চিয়ান পোর্তুগীজ Camoensও তাঁর Lusiads-এ এ তীর্থের উল্লেখ করে গেছেন। সে-সব কালে এই দুর্গম তীর্থে আসা কী ভীষণ ভয়াবহ ছিল, এখনও পাহাড়ের গায়ের খাড়া পাথর ও বহু নীচের খাদের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হেসে বলি, ভীষণতার কথাই শুধু বললেন, বিশ্বপ্রকৃতির এই অপরূপ রূপরাজ্যের কথাও ভাবুন। স্রষ্টা যেন বলেন, আমার কাছে আসতে কোন ভেদাভেদই নেই,—ধর্মেরও নয়, দেশেরও নয়। সবারই আমি, যে যেমন ভাবেই দেখ না কেন, যেখান থেকেই আস না কেন। ভয়ঙ্করের আড়ালেই তো সুন্দরের দর্শন।

তখনই চমকে তাকিয়ে দেখি, তারই যেন এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ। গুহার মধ্যে এক তিব্বতী সন্ন্যাসিনী। অতি বৃদ্ধা। লোলচর্মা। মুখে অসংখ্য বলিরেখা। ভারী পল্লবে আধ-ঢাকা দুই চোখ। তারই মধ্যে দুটি নীল তারা জ্বলজ্বল করে। অতি শান্ত স্নিগ্ধ তাদের দীপ্তি। যেন, তুলসীমঞ্চে মরিচাপড়া প্রদীপে নিস্পন্দ সন্ধ্যাদীপশিখা। পরনে তিব্বতী বেশ। ঝোলা আলখাল্লা। শতচ্ছিন্ন, তালি দেওয়া। তবুও, দেখে যেন মনে হয় দীনহীন নন, কোন এক অমূল্য রত্নের অধিকারিণী। হাতে মণিচক্র। মুখে অবিরাম মন্ত্রোচ্চারণ। শুনি, থাকেন একাকিনী। ছ'বছর হল এসেছেন তিব্বত থেকে এখানে।

ভাবি, কোথায় তিব্বত, হিমালয়, কোথায় এই সিংহলে শ্রীপাদ! তবুও একই স্বর্ণসূত্রে গাঁথা।

আড়াই ঘণ্টা লাগে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছুতে।

অপরিসর স্বল্প সমতল স্থান। মাত্র দেড়শত ফুট স্কোয়ার। পথের শেষভাগে পাশে দু তিনটে ছোট কাঠ ও পাথরের ঘর। কটি বৌদ্ধ ভিক্ষুর আবাস। চূড়ার মাঝখানে পাথরের আচ্ছাদনের নীচে প্রসিদ্ধ চরণচিহ্ন। ভূমিতলে সাধারণ পাথর, তারই উপর বিচিত্র আঁকাবাঁকা রেখা,—বিরাট পদচিহ্নের মতই দেখায়। লম্বা সাড়ে পাঁচ ফুট, চওড়া পৌনে তিন ফুট, তিন থেকে পাঁচ ইঞ্চি রেখার গভীরতা।

বুদ্ধদেবের, অথবা বিষ্ণুর, অথবা প্রথম মানব আদমের,—এখানে এসে সে প্রশ্নের বিতর্ক ওঠে না। যে যার ধর্ম অনুযায়ী মেনে নেয়, পূজা করে। পথ নিয়েই মতভেদ, পথের শেষ নিয়ে নয়। ভাবি, স্বর্গ থেকে মর্তে যদি নামতেই হয়, এই তো তার শ্রেষ্ঠ স্থান।

পূর্বগগনে সূর্যোদয়ের প্রথম রঙিন আভাস ফোটে।

চারিদিক উন্মুক্ত। নিকটে এত উঁচু গিরীশেখর নেই। অবারিত দৃষ্টি চলে চারিপাশে। বহু নীচে পাহাড়ের সারি। গাঢ় সবুজ বনে ঢাকা। দেখায় যেন, সাগরে তরঙ্গদোলার নিস্পন্দ ছবি। পূর্ব আকাশে রঙের বিচিত্র খেলা চলে। নীচে পাহাড়গুলিতেও সবুজের উপর সে-আলোর প্রলেপ লাগে। যেন, নানা রঙের কাঁচ ঘুরিয়ে আলোকরশ্মি খেলা—বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে। কনক-কিরণ ছড়িয়ে পড়ে মাথার উপর সুনীল আকাশেও। স্বর্ণরথে সূর্যদেব দেখা দেন। চারিদিক আলোকময় হয়ে ওঠে। দিকচক্রবালে ভারত মহাসাগরের সূক্ষ্ম নীল রেখা চোখে ধরা পড়ে।

স্তব্ধ হয়ে দেখি। শিরসেনার ডাকে চমক ভাঙে। বলেন, পশ্চিম আকাশে ভাল করে দেখুন!

তাকিয়ে অবাক হই। শ্রীপাদশিখরের ঘন ছায়া পড়ে, সেদিকে আকাশের ধূসর বায়ুমণ্ডলে। যেন, জলের ভিতর প্রতিবিম্ব কাঁপতে থাকে। পূর্বদিকে সূর্য ঊর্ধ্বে ওঠেন, পশ্চিমে পাহাড়ের ছায়াও আকাশ ছেড়ে নামতে থাকে ধরার বুকে। ধীরে ধীরে। ক্রমে সে-ছায়া ক্ষণিকের আশ্রয় খোঁজে অদূরে পাহাড়ের বুকে। গগনপথে সূর্য আরও এগিয়ে চলেন। শ্রীপাদের ছায়াও পৃথিবীর অঙ্গ বেয়ে নামতে থাকেন নীচে পাহাড়ের উপত্যকায়। সূর্যও সচল, ছায়াও চঞ্চল। সূর্য ওঠেন, ছায়া নামেন। থরথর দেহে ছায়ার যেন কাঁপন জাগে। ভগবান শ্রীপাদকে ঘিরে সূর্য ও ছায়ার অভিনব খেলা চলে।

ক্রমে সূর্যের তেজ প্রখর হয়, আকাশের অনেক ওপরে ওঠেন। চারিদিক উজ্জ্বল আলোকে প্লাবিত হয়। ত্রস্ত, কোমলপ্রাণা ছায়াও পৃথিবীর কোলে কোথায় লুকান। বিশ্বপ্রকৃতির এই মায়ার খেলাও সাঙ্গ হয়।

ভক্তিভরে নতশিরে শ্রীপাদের পাদস্পর্শ করি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী'র প্রকাশন প্রসঙ্গ ও শরৎচন্দ্রের শেষ লিখন

'পথের দাবী'র প্রকাশন প্রসঙ্গ

॥ ১ ॥

সেসব দিনের কথা এখন স্বপ্নের মতন মনে হয়। আজকের ঘটনা ত নয়। পঞ্চাশ বছরেরও ওপর কেটে গেল। সে-সময়ে কি কখন ভাবতে পেরেছি, নিজের চোখেই দেখে যাব, ইংরেজরা সত্যিই এদেশ থেকে তাদের রাজত্ব গুটিয়ে ফিরে গেছে, আমাদের দেশ আমাদেরই হাতে এসেছে, ভারত স্বাধীন হয়েছে। আশাতীত হলেও তাই-ই কিন্তু একান্ত কামনা ছিল,—কী উপায়ে পরাধীনতার গ্লানি ও বিদেশী শাসনের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়,—এই ছিল তখন দিনের আশা, রাতের স্বপ্ন।

বন্দিনী ভারতমাতার দাসত্ব-শৃঙ্খল ঘোচাতে ভক্তসন্তানদের সে-যুগে সে কী সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা! কেউ বা বুকভরা দুর্জয় সাহস নিয়ে মুখ্ ফুটে মনের ভাব প্রকাশ করে, প্রবল পরাক্রম ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েও বীরদর্পে মাথা তুলে রুখে দাঁড়ায়, হাসিমুখে বিদেশী শাসকের হাতের নির্মম নির্যাতন নয়, হেলায় আত্মজীবন উৎসর্গ করে, আবার অনেকে মুখ বুজে পরাধীনতার অন্তর্জ্বালা সহ্য করে।

তখনকার সেই পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসক প্রবর্তিত আইনকানুন স্বাধীন সাহিত্য সাধনারও অন্তরায় ঘটাত। ইংরেজ সরকার কর্তৃক 'পথের দাবী' গ্রন্থের প্রচার নিষেধ ও বাজেয়াপ্ত তারই এক জ্বলন্ত নিদর্শন। বইখানির প্রকাশনার ইতিহাস লিখি।

॥ ২ ॥

আমার বড়দাদা ও মেজদাদা—রমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর উৎসাহে ও প্রযত্নে আমাদের বাড়ি থেকে ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাসে 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। পিতৃদেব তখন বর্তমান। হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে আসীন। এ প্রচেষ্টায় তাঁরও সক্রিয় সহানুভূতি থাকে। প্রথম দিকে যুগ্ম-সম্পাদক থাকেন,—ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার। পরে একা বিজয়বাবুই সম্পাদক থাকেন। আমিও আমার ক্ষুদ্রশক্তি নিয়ে এ-কাজে মেতে উঠি। সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশনেরও অপূর্ব এক আকর্ষণ ও আনন্দ থাকে। আমরা যখন ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র, তখন সেখানে ভূগোল ও বাংলার শিক্ষক ছিলেন কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী। পরে তিনি বাংলায় এম. এ. ডিগ্রী নেন এবং সাউথ সুবারবান কলেজে (পরে আশুতোষ কলেজে পরিণত) অধ্যাপক হন। তিনিও 'বঙ্গবাণী' পরিচালনার কাজে যোগ দেন ও প্রভূত সাহায্য করেন। পত্রিকা প্রকাশের বছর দুই পরে পিতৃদেবের তিরোধান হয়।

তখনকার প্রখ্যাত প্রায় সব লেখক-লেখিকার রচনা ক্রমে ক্রমে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের রচনাও বাদ থাকে না। কিন্তু নানান কারণে শরৎচন্দ্রের লেখা পেতে কিছু সময় যায়। শরৎচন্দ্র তখন থাকেন শিবপুরে। তাঁর প্রতিবেশী অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকার-এর সঙ্গে দাদাদের পরিচয় ছিল। তাঁরই মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের লেখা পাবার চেষ্টা চলে। দাদারাও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। লেখা দেবার জন্যে অনুরোধ জানান। অবশেষে, ১৩২৯ সালের আশ্বিন মাসে 'মহেশ' গল্পটি 'বঙ্গবাণী' ও অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সম্পাদিত 'পল্লীশ্রী পত্রিকায়' একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এর পর, ঐ বছরেই 'বঙ্গবাণী'র মাঘ সংখ্যায় 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটির প্রকাশ। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখাশুনা আলাপ-পরিচয়ের ফলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে এক স্নেহ-সিক্ত অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়; একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখে দেবার জন্যে তাঁকে পীড়াপীড়ি করা হয়। কিন্তু তখন অন্য যে-সব পত্রিকায় তাঁর লেখা বার হয়, তাই নিয়মিতভাবে তিনি দিতে পারেন না,—আবার এই এক নতুন

পত্রিকার জন্যে ধারাবাহিক লেখা,—কোনমতেই তাঁর আগ্রহ জাগানো যায় না।

যথারীতি বড়দাদা একদিন শিবপুরে গেছেন তাঁর কাছে আবার লেখার অনুরোধ জানাতে। শরৎচন্দ্রের সেই এক কথা—নতুন উপন্যাস লেখা আর হয়ে উঠছে কই!

ঘরের মধ্যে শরৎচন্দ্রের লেখবার টেবিল। অগোছাল কাগজ খাতাপত্র। হঠাৎ বড়দাদার দৃষ্টি পড়ে সেই সরিয়ে-রাখা অবহেলিত পুরানো কাগজগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্রের—মুক্তার মত অক্ষরে—হাতে-লেখা কয়েকটি পাতা। আকস্মিক নূতন আবিষ্কারের এই-ই হয়ত নিয়ম।

পুলকিত হয়ে বড়দাদা বলেন, এই তো! একটা লেখা পড়ে রয়েছে দেখছি!

শরৎচন্দ্র নির্বিকারভাবে জানান, ও একটা শুরু করেছিলাম,—পোলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে উপন্যাসটা লেখবার ইচ্ছা, কিন্তু এদেশে কেউ ছাপবার সাহস পাবে না,—তাই আর লিখিনি,—পড়ে আছে।

বড়দাদার আগ্রহ উদ্দীপ্ত হয়। জোর করে বলেন, এইটেই আবার আরম্ভ করুন,—যা লিখতে চান লিখুন দেখি,—'বঙ্গবাণী'তে ছাপা হবে।

শরৎচন্দ্র হাসেন। বলেন, ক্ষেপেছ? জজের বাড়ির কাগজ! তাতে ছাপতে পারবে ঐ উপন্যাস?

বড়দাদা বলেন, নিশ্চয় পারব। লেখা দিয়ে দেখুন আপনি।

॥ ৩ ॥

শুরু হয়ে যায় 'বঙ্গবাণী'তে 'পথের দাবী' ছাপানো ধারাবাহিকরূপে। পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ১৩২৯ সনের ফাল্গুন থেকে। পাঠক মহলে বিপুল সাড়া জাগে। প্রতি মাসে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে আমাদের আনাগোনা চলতে থাকে। বেশির ভাগ যান কুমুদবাবু, মাঝে মাঝে দাদাদের কেউ,—আমিও। সময়মত লেখা পাবার জন্যে তাগিদের পর তাগিদ চলে। পাণ্ডুলিপি এলে হাতে যেন স্বর্গ-পাওয়া। মোটা ফুলস্কেপ কাগজ। লাইন-টানা প্রতি পাতার উপরে এক কোণে 'এমবস' করে ছাপা একটি বোঁটা-সমেত ডাবের নীল রঙের রেখাঙ্কন, তারই গায়ে লেখা—শরৎ। এ-সবই শরৎচন্দ্রের অভিলাষ পূরণে 'বঙ্গবাণী'র পক্ষ থেকে এন্টিক কাগজ জোগাড় করে ছাপিয়ে দেওয়া। একবার একটা ভালো ওয়াটারম্যান ফাউনটেন পেন অতি সূক্ষ্ম নিব-অলা—বিলাত থেকে আনিয়ে দেওয়া হয়। লেখার সাজ-সরঞ্জামে শরৎচন্দ্রের শৌখিনতা ছিল,—উৎকৃষ্ট কাগজ, শ্রেষ্ঠ কলম, মনোমত সুখাসন, শান্ত পরিবেশ,—এ সকলের সমাবেশ না হলে লেখায় তাঁর মন বসে না। লেখা ত নয়। পাতার উপর স্পষ্টাক্ষরে মুক্তার মালা গাঁথা।

আর, সেই রত্নপ্রতীক পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে আসতেই তখনই উন্মুখ হয়ে একবার পড়ে নেওয়া। তারপর প্রেসে পাঠানো। প্রুফ এলে আবার পড়া। পত্রিকায় ছাপা হবার পর পুনরায় পাঠ ত থাকেই—তখন আর একা নয়, একবার নয়,—দল বেঁধে বসে,—বারবার। মুখস্ত হয়ে যায় অনেক লাইন, সে কী আনন্দমুখর উৎসাহদীপ্ত দিনগুলি কাটে। বন্ধু-বান্ধবেরা ত বলেই, গ্রাহকদেরও অনেকে সাগ্রহে জানতে আসেন,—'পথের দাবী', এ-মাসের 'বঙ্গবাণী'তে যাচ্ছে ত ঠিক?

এ-প্রশ্নের যথেষ্ট কারণ থাকে। নিয়মিতভাবে লেখা শরৎচন্দ্রের স্বভাব নয়। ফলে, কোন কোন মাসে লেখা পাওয়া যায় না। 'পথের দাবী' ছাপাও হয় না। পাঠকরা হতাশ হন। পত্রিকা-পরিচালকরাও বিব্রত বোধ করেন। 'পথের দাবী' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সনের ফাল্গুন মাস থেকে শুরু করে ১৩৩৩-এর বৈশাখ সংখ্যা পর্যন্ত। অর্থাৎ, তিন বছর তিন মাস ধরে চলে। কিন্তু, তার মধ্যে মাঝে মাঝে ছাপানো বাদ যায়—মোটের উপর পনেরোটি সংখ্যায়!

॥ ৪ ॥

'বঙ্গবাণী'র পৃষ্ঠায় 'পথের দাবী'র কাহিনী এগিয়ে চলে। গল্পের শুরু অপূর্বকে নিয়ে। প্রথম সংখ্যাতেই আবির্ভাব হয় ভারতীরও। দ্বিতীয় মাসে আসেন রামদাস তলওয়ারকর,—শাণিত তলোয়ারের মতনই তাঁর দৃপ্ত সাহস। চতুর্থ মাসে 'পরাধীন দেশের রাজবিদ্রোহী' 'পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট' সব্যসাচীর নাম শোনা যায়—অসীম সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের গুরুগম্ভীর গর্জনের মত। কিন্তু চোখে দেখা দিল,—দুর্বল রুগ্‌ণ, কাশির পরিশ্রমে অবসন্ন দেহে,—গিরীশ মহাপাত্র। মাথায় তার চেরা সিঁথি। চুলে নেবুর তেলের

উৎকট গন্ধ। গায়ে জাপানি সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি। বুকপকেটে বাঘ-আঁকা রুমাল। পরনে বিলাতী মিলের কালো মখমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি। পায়ে সবুজ রঙের ফুল মোজা—হাঁটুর উপরে লাল ফিতা বাঁধা। বার্নিশ-করা পাম্প-শু—তলায় লোহার নাল বাঁধানো। হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল-দেওয়া বেতের ছড়ি। তার ট্যাঁক থেকে বার হয় গাঁজার কলকে। কিন্তু, গিরীশ গাঁজা খায়,—অস্বীকার করে। কৈফিয়ত দেয়, 'আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেলাম, যদি কারও কাজে লাগে তাই তুলে রেখেচি।'

পাঠকদের কৌতূহল প্রতি মাসে বাড়তে থাকে। আরও দু-মাস পরে দেখা যায়,—অশেষ বুদ্ধিশালিনী, ভয়লেশহীনা তেজস্বিনী সুমিত্রা,—'পথের দাবী'র সভানেত্রীর। সভার সভ্য,—মনোহর, নবতারা, শশী প্রভৃতির সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় হয়। অবশেষে, মাথা তুলে দাঁড়ান ডাক্তার—সব্যসাচী। তড়িৎগতিতে কাহিনী এগিয়ে চলে। দেশের আকাশে বাতাসে স্বাধীনতার বজ্রনিনাদ ঘোষিত হয়। পরাধীন জাতির মর্মবেদনা সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে। পাঠকদের প্রবল উত্তেজনার অন্ত থাকে না। এই রচনা প্রকাশের কথা শাসকবর্গের কানে পৌঁছয়। পত্রিকার উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ে। শোনা যায়, পত্রিকার বিশেষ কয়েকটি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করার জল্পনা সরকার মহলে চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বঙ্গবাণীর উপর কোন নিষেধাজ্ঞা আসে না। তবে, উপন্যাস সম্পূর্ণ হয়ে বই আকারে প্রকাশিত হলেই গভর্নমেন্ট বাজেয়াপ্ত করবেই, সে-বিষয়ে কারও সংশয়ই থাকে না। রাজদ্রোহের অভিযোগে লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে কারারুদ্ধ করারও যথেষ্ট সম্ভাবনা।

'বঙ্গবাণী'র পাতায় উপন্যাস যখন সমাপ্তির দিকে শরৎচন্দ জানান, তাঁর এক প্রকাশক অনেক আগেই এ-বই ছাপবেন বলে তাঁকে এক হাজার টাকা অগ্রিম দিয়েছেন, তাঁদের কাছে যেন বঙ্গবাণীতে তখন পর্যন্ত যতদূর ছাপা হয়েছে তার ফাইল কপি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সেইমত ব্যবস্থাও হয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন পরে সেই প্রকাশক এ-বই ছাপানোর দায়িত্ব নিতে অসম্মতি জানান। (তাঁর অগ্রিম-দেওয়া টাকা পরে তাঁকে ফেরতও দেওয়া হয়) শরৎচন্দ্রের বই-এর অপর প্রকাশকগণও এ-বই ছাপানোর ভার নিতে সাহসী হন না।

এদিকে উপন্যাস শেষ হতে চলে। শরৎচন্দ্রকে সাগ্রহে জানাই, প্রকাশক হয়ে আমিই বই বার করব।

তিনি সবিস্ময়ে বলেন, তুমি! সে কী করে হয়?

নানান যুক্তি দেখাই।

তিনি বলেন, ছাপিয়ে যদি জেল হয় তোমার?

হেসে বলি, জেলে যাব। হলে তো একা প্রকাশকেরই হবে না, লেখকেরও হবে। দুজনে একসঙ্গে জেলে থাকব—আপনার সঙ্গে থাকা,—সে-তো মহাভাগ্যের কথা!

তিনি হেসে ওঠেন। গড়গড়া টানতে টানতে গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলেন, দেখো, গড়গড়াটা যেন সেখানে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।

হ্যারিসন রোড-এ এস কে লাহিড়ীর কটন প্রেসে 'বঙ্গবাণী' ছাপা হত। সেইখানেই এ বই ছাপানোরও ব্যবস্থা হয়। 'পথের দাবী'র শেষ অংশ 'বঙ্গবাণী'র ১৩৩৩ সনের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশ হতে চলে। উপন্যাস শেষ হলেও লেখার পাদদেশে 'সমাপ্তি' না লিখে যোগ করে দেওয়া হয়—'ক্রমশ'। কাউকে জানানো হয় না, বই শেষ হল।

পুলিশও ভাববে, উপন্যাস এখনও চলবে।

কিন্তু পরের সংখ্যা থেকে আর প্রকাশিত হবে না—তখন? সে আর আশ্চর্য কী? এমন ত মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে লেখা না পাওয়ায় ফাঁক যায়ই। একবার পর পর তিন মাস লেখা বার হয়নি।

॥ ৫ ॥

'বঙ্গবাণী'র পাতা কেটে 'পথের দাবী'র একটা সম্পূর্ণ ফাইল তৈরি করি। বই প্রকাশের জন্যে শরৎচন্দ্র আবার সমস্তখানি পড়ে দেখেন। সামান্য কোথাও ভাষাগত পরিবর্তন করেন। সেই অনুযায়ী ছাপার কাজও শুরু হয়।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩। সেই বাঁধানো ফাইলটি নিয়ে সামতাবেড়ে যাই। শরৎচন্দ্রের হাতে সেটি দিয়ে বলি, 'দিন এর ওপর কিছু নিজের হাতে লিখে।'

দুজনেই জানি, বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের নিষেধাজ্ঞা সুনিশ্চিত।

তাই ব্যথাভরা কণ্ঠে শরৎচন্দ্র বলেন, লিখব আর কি বল? আমি লিখব, আর গভর্নমেন্ট বাজেয়াপ্ত করবে,—এই ত? পরাধীন দেশে সত্যকার সাহিত্য-সাধনার ব্যথা কম?

তবুও তাঁর প্রকাণ্ড ফাউন্টেন পেনটি হাতে নিয়ে ভাবতে থাকেন।

বলেন, নাঃ। কিছুই লিখতে পারছি না।

তারপর, ধীরে ধীরে কলম চলে। দেখি প্রথম পাতায় লেখেন—মাঝখানে আমার নাম। তার পাশে তাঁর নিজের নামটি। নীচে তাঁর জন্ম-কুণ্ডলী আঁকেন। জন্ম-তারিখ, সময়ও লেখেন এবং মৃত্যু লিখে ফাঁক রাখেন।

পাতার মাথার উপর বাঁকা করে লিখে দেন :

কিছুই লিখতে পারলাম না। শরৎ—২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

পথের দাবীর দ্বিতীয় ভাগ আমি যদি সম্পূর্ণ করতে না পারি আমার দেশের কেউ যেন পারে,—এই কামনা করি : শ'

খাতার শেষ পাতায় লেখেন :

'যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।'

অস্ফুটস্বরে গানটি গাইতে গাইতে খাতাখানি আমার হাতে দেন।

॥ ৬ ॥

চোখের পলকে তিন মাস কেটে যায়। প্রেসে বই ছাপানোর কাজও শেষ। বৈঠকখানার গলিতে—প্রেসের কাছেই আমাদের সুপরিচিত দপ্তরী মোঃ ইসমাইলের ব্যবসাকেন্দ্র। তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থা থাকে প্রেস থেকে ফর্মাগুলি পেলেই যেন তাড়াতাড়ি সব বই একই সঙ্গে বেঁধে দেন। বই-এর প্রকাশ হলেই ত বাজেয়াপ্তির হুকুম জারি হবে,—অতএব রূপসজ্জার প্রয়োজন নেই। সাদা কাগজ দিয়ে মোড়া পিজবোর্ডের মলাট—মাথার উপর লাল হরফে ছাপা—'পথের দাবী' নীচের দিকে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দাম তিন টাকা। ছাপানো হয়—তিন হাজার কপি। বই-এর প্রকাশ ভাদ্র ১৩৩৩।

অপরদিকে বিপ্লবী বন্ধুরা ভার নেন, দপ্তরীর কাছ থেকে রাতারাতি বইগুলি নিয়ে কলকাতার দু-তিনটি বিভিন্ন পল্লীর বাড়িতে বইগুলি ছড়িয়ে রাখা হবে—কলকাতার বাইরেও কয়েকটি কেন্দ্রে কিছু বই পাঠানো হবে—যাতে পুলিশ সন্ধান পেলেও সব বই ধরতে না পারে। পরিচিত বই-এর দোকানেও জানিয়ে দেওয়া হয়,—অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে তাঁরাও ইচ্ছামত বই নিয়ে যেতে পারেন। সেইমত তাঁরা নিয়ে যানও। নিমিষে কয়দিনের মধ্যেই সব বই বিক্রী হয়ে যায়।

আতসবাজির মত দেশময় পথের দাবী ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন রাত্রের আকাশের বুকে জ্বলে উঠে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়।

পরম নিশ্চিন্ত ও গভীর আনন্দ বোধ করি। ছাপা বই নিঃশেষ। দু কপি বই অতি সুন্দর করে বাঁধিয়ে একটার মলাটের গায়ে সোনালি রঙে শরৎচন্দ্রের নাম লিখে তাঁকে দিই, অপরখানিতে আমার নাম লিখে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে সই করিয়ে আমার নিজের কাছে লুকিয়ে রাখি।

১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩। আগের দিন 'পথের দাবী' বই আকারে বার হয়েছে। শরৎচন্দ্র সেই রাত্রি ভবানীপুরে আমাদের বাড়িতে থাকেন। দুজনে সারা রাত জেগে কাটাই। কাছে বসে প্রাণ খুলে কত কথা বলি, তাঁর মুখে কত গল্প শুনি। কেমন ভাবে মুহূর্তের মত কেটে যায় রাত।

ভোর হতেই তাঁর হাতে এনে দিই তাঁরই নিজ হাতে লেখা 'পথের দাবী'র সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। তিনি আশ্চর্য হন। আমার মুখের পানে স্নেহবিগলিত নয়নে তাকান। বলেন, এসব তুমি এতদিন ধরে গুছিয়ে রেখেছ—এমন যত্ন করে? দাও, আমি তোমায় লিখে দিই।

তখনই লিখে দেনও ফাইলের শূন্য প্রথম পাতায় তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে :

'বিজু, আমার হাতের লেখা বই এইখানি ছাড়া আর নেই। এ যেন তোমারই কাছে থাকে। তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো।

দাদা

ভাদ্র ১৩৩৩

॥ ৭ ॥

নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক চিত্তে সরকারী হুকুমনামার অপেক্ষায় থাকি। কাজ ত ফতে। এখন গভর্নমেন্ট যে শাস্তি দিতে চায় দিক। কিন্তু আশ্চর্য! ও-তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দের প্রকাশ নেই। বিশ্বস্ত লোকমুখে শোনা যায় বই বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রস্তুত, লেখক প্রকাশক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগও আনা হবে কিনা সরকারী মহলে তারই শলাপরামর্শ চলে।

এদিকে বই-এর কপি পাবার জন্যে চারিদিক থেকে অনুরোধ-উপরোধ-ধরাধরি। কিন্তু বই আর তখন কোথায়? শুনি দু-একজন ব্যবসায়ী এই সুযোগে তাঁদের কাছে চেপে রাখা বই একশ টাকা দামে এক এক কপি বিক্রি করেছেন। এক বন্ধু নিয়ে এসে দেখান, গোপন ছাপাখানা থেকে নিরেশ কাগজে-ছাপানো ছাপার-ভুলে-ধরা পথেব দাবী বই। বিপ্লবীদের মধ্যে তাই-ই বিতরণ চলেছে।

পূজার ছুটি আসে। মধুপুরে চলে যাই। সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রচারের বিলম্ব দেখে কারও কারও মনে ধারণা হয়, বই তাহলে বাজেয়াপ্ত করল না। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রস্তাব নিয়ে এক পাবলিশার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। আগাম প্রাপ্য টাকা দিতেও প্রস্তুত। শরৎচন্দ্র খবরটা জানিয়ে আমার মতামতের জন্যে চিঠি দেন। লেখেন, '...এক্ষেত্রে টাকাটাই সব নয়। টাকার প্রতি আমার অহেতুক মোহও নাই। শুধু সংসারী লোক বলিয়াই প্রয়োজন। কিন্তু এমন কিছু যদি জানিয়া থাকো যে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবেই; তাহা হইলে আহাম্মক প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া আমি হয়ত কিছু পাইতেও পারি, কিন্তু তাহাতে আবশ্যক নাই। সে পাওয়া আমার সহিবে না।'

চিঠি পেয়েই তাঁকে জানাই, বই বাজেয়াপ্ত হবেই সন্দেহ নেই।

তিনি তখনই লেখেন, "বেশ এখন সমস্ত বন্ধ রইল। লোকেরা আমাকে খেয়ে ফেলছিল বই বই বলে। এখন থেকে জবাব দিতে পারবো।"

অবশেষে কলকাতা থেকে বড়দার চিঠিতে খবর আসে,—১২ই জানুয়ারি ১৯২৭ সালে লেখা,—"পথের দাবী প্রোসক্রাইব হয়েছে, আর কিছু হবে কিনা সংবাদ পাইনি। কাল বোধ হয় গেজেট হবে। আজ বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। বাড়িতে কোন বই নেই বলায়, তাঁরা জানান অন্তত একখানা কপি কোনমতে জোগাড় করে তাঁদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে,—নইলে প্রকাশকের বাড়ি থেকে একেবারে শূন্য হাতে ফেরা চলে কি করে!—অগত্যা ছোটবোনের বাড়ি থেকে এক কপি বই এনে তাঁদের হাতে দেওয়া হয়।"

এইভাবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে।

শরৎচন্দ্রের দেহাবসান হয়,—২রা মাঘ ১৩৪৪—১৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৮ সালে।

॥ ৮ ॥

মহাকালের রথচক্র ঘুরে চলে। জগতে রাজনৈতিক বিরাট পরিবর্তন আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়। বিপুল বিক্রম ব্রিটিশ সিংহের বিশ্বব্যাপী শক্তির হ্রাস দেখা দেয়। ভারতে স্বায়ত্তশাসনের ছিঁটেফোঁটা বর্ষণ করতে ইংরেজ সরকার বাধ্য হন। উপলব্ধি করেন ভারতের উপর তাঁদের প্রভুত্ব করার দিন অবসানপ্রায়।

বাংলায় তখন ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রীসভা। একদিন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র জানান, প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় (সেকালের নাট্য জগতে বিশেষ খ্যাতনামা) পথের দাবীর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা সরকার মহলে করতে পারেন, যদি তাঁকে পথের দাবী নাটকরূপে পরিণত করে অভিনয় করবার স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়। নাটকে রূপান্তরিত করবেন—শচীন্দ্র সেনগুপ্ত।

ব্যবস্থাও সেইমত হয়। পথের দাবীর উপর এতকাল যাবৎ বলবৎ নিষেধাজ্ঞা গভর্নমেন্ট তুলে নেন।

বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করি—বৈশাখ ১৩৪৬ সনে। ছাপা হয় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে।

বিশ্বযুদ্ধের অনিশ্চিত পরিস্থিতি তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব ঘটায়।

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। সরকারী অনেক ক্ষেত্রে তখন কন্ট্রোল—নিয়ন্ত্রণ প্রথা। পথের দাবীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্যে গভর্নমেন্টের নিকট অনুমতির আবেদন করি,—২৬শে আগস্ট তারিখে অনুমোদন পত্রও পাই। ভাবি, স্বাধীন ভারতে 'পথের দাবী'র প্রথম প্রকাশ যথাসম্ভব সুসজ্জাতেই করা যাক। শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসুকে অনুরোধ জানাই, তিনি যদি বই-এর প্রচ্ছদপট এঁকে দেন।

সানন্দে তিনি সম্মত হন। ভারতীর ছবি এঁকে পাঠিয়ে দেন। প্রচ্ছদপটে ছবির সঙ্গে কীভাবে বই-এর নাম লিখলে ভাল দেখাবে তারও নির্দেশ দেন। শিল্পী গোপাল ঘোষ সেই অক্ষরগুলি লিখে দেন। নন্দলালবাবু ভারতীর অপর একখানি স্বতন্ত্র রেখাচিত্রও পাঠান। বই-এর ভিতর তাও ছাপা হয়। এবারও বই ছাপানো,—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে। প্রকাশ কাল—আশ্বিন, ১৩৫৪।

নন্দলালবাবুর সেই রেখাঙ্কন এই প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত হল।

* * *

এইভাবেই শৃঙ্খলমুক্ত 'পথের দাবী'র কণ্ঠ আবার ধ্বনি হয়ে ওঠে সাহিত্যের মুক্ত অঙ্গনে। দুঃখ থাকে শুধু—শরৎচন্দ্র নিজের চোখে দেখে গেলেন না,—তাঁর একান্ত কাম্য স্বদেশের স্বাধীনতা। তাঁরই পথের দাবীর দেশব্যাপী অবারিত প্রচার।

শরৎচন্দ্রের শেষ-লিখন

এক সাহিত্যিক বন্ধু একবার আমার চিঠি পেয়ে লিখেছিলেন, "অনেক পুরানো দিনের কথা মনে হয়। কিন্তু পিছন দিকে তাকাতে চাই না—ওটা একপ্রকার আত্মবিলাস। তবে শিরা উপশিরায় আঁচড় পড়েই, তার উপর কোন সূচ কখন পড়লে সঙ্গীত বেরিয়ে আসবে বলা ত যায় না।"

পুরানো দিনের স্মৃতি আত্মবিলাস ত বটেই, তবে নিছক বিলাসিতাও নয়। স্মৃতির স্বর্ণসূত্রে জীবনের সুখ-দুঃখের পুষ্পহার গাঁথা হয়। অমূল্য সে সম্পদ। অপূর্ব তার সৌরভ। দুঃখের স্মৃতি আনন্দ দেয়, সুখের স্মৃতি বেদনা জাগায়। স্মৃতির বিচিত্র ধর্ম। কত বৃহৎ ঘটনা বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যায়, আবার অতি সামান্য ঘটনাও অকস্মাৎ স্মৃতির আলোয় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠে।

কিন্তু, শরৎচন্দ্রের অতি-সান্নিধ্যে-কাটানো দিনগুলির কথা কখনও ভোলবার নয়।

তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়ার সুযোগ পেলাম ১৯২৬ সালে। জানুয়ারি মাস-এ। আবার সেই জানুয়ারি মাসেই ১৯৩৮ সালে এই পার্থিব পরিচয়ের পরিসমাপ্তি হল তাঁর মহাপ্রয়াণে। কিন্তু, স্মৃতি-ভাণ্ডারে তাঁর অতি-সান্নিধ্যের অপার্থিব সৌরভ আজিও তেমনি অম্লান আছে। যেন, নিভে যাওয়া ধূপের রেখে-যাওয়া সুরভি।

দ্বাদশ বৎসর। সে যেন আমার অজ্ঞাত-বাস। প্রথম পরিচয়ের পরই আমি কাশী যাই। সেখানে তাঁর প্রথম চিঠি পেলাম : 'আত্মীয়তার সম্বন্ধ বছর মাস দিয়ে মাপতে গেলেই ভুল হয়, অথচ এই ভুল অধিকাংশ লোকেই করে। তুমি ফিরে এলে আবার দেখা হবে। বাইরের লোকের জানবার দরকার কি?'

তারপর, তাঁর সঙ্গে দেখা শুরু হল। কাজে, বিনা কাজে। নিভৃতে, নিরালায়। আবার, মুখর মজলিস-এ।

সামতাবেড়-এ রূপনারাণের তীরে বাড়ি উঠল। দুতলা। টালির ছাদ। কিন্তু, সব মাটির দেওয়াল। বড় বড় ঘর। প্রশস্ত বারান্দা। নদীর দিকে বারান্দার কোণে একখানি ঘর। লেখবার আসর। বারান্দায় বিরাট আরাম চৌকী, ইজিচেয়ার। পাশেই গড়গড়া। সামনে প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান; অদূরে কূলভাঙা নদী। বিশাল জলরাশি। তারই বুকে দোলে ছোট ছোট নৌকা। পরপারে 'মসীমাখা তরুছায়া'।

হঠাৎ গিয়ে পড়ি। দেখে আনন্দ পান। কাছে বসান। কত গল্প হয়। নদীর দিকে তাকিয়ে বলেন, এখানকার লোকে বলে আমায় 'পাগল! নইলে বাঁধের ওপর এমন করে বাড়ি করে? যেমন জলের ভাঙন, তেমনি ঝড়ের মাতন। কোন্ দিন নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'—অথচ, দ্যাখো, বাড়ি যদি এখানে করতেই হয় ত এমন জায়গা ছাড়া আর করবই বা কোথায়? যাবে ত সবই একদিন জানিই।—উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকেন, দূর দিগন্তে কোথায় দৃষ্টি ছোটে কে জানে!

সামতাবেড়ে থাকার আনন্দ ছিল। আবার দুর্ভোগও ছিল। একবার কলকাতা থেকে গিয়ে লিখলেন, 'ফিরে এসে দেখি বাড়ি ঘর দোর ঝড়ে পড়ে গেছে, সুমুখে অর্থাৎ যেখানে কুমড়োর নৌকা ডুবেছিল একটা স্টীমার ডুবে আছে। আমি যখন রাত্রি প্রায় বারোটার সময় ফিরে এলাম তখন সব শেষ। অনেক মাল ছিল, আমি না থাকায় বিশেষ ক্ষতি হয়েছে।'

আর কিছুদিন পরেই আবার লিখলেন, "এইমাত্র একজন নৌকার মাঝির চিকিৎসা করে এলাম। সর্বাঙ্গে টিন্চার আইডিন্ মাখিয়ে আর্নিকা খাবার ব্যবস্থা করে, তাপসেঁকের বন্দোবস্ত করে দিয়ে ফিরেছি। কাল রাত্রে তার নৌকা ডুবে, তার উপর দিয়ে নৌকা ভেসে গিয়েছিল। যাক্, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। এ বাড়ী রূপনারাণকে উৎসর্গ করে দিয়ে বেঁচেছি। বাণ ও বন্যায় ঐ নদী যে কি ভীষণ হতে পারে এ বারে ভাল করে দেখলাম। যে নদীর ধারের বাঁধ দিয়ে তোমরা এখানে আসতে সে নেই। বোধ হয় আজকের জোয়ারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারপরে জল আর জল। বাংলা দেশের ষড় ঋতুর অর্থ যে সত্য সত্যই কি বস্তু তা এখানে বছর খানেক না থাকলে বোধকরি জানাই যায় না। এও একটা পরম লাভ।

...দিন দশ পনেরো বান আর জোয়ার;—এখানে মাটি দেওয়া আর ওখানে গর্ত বোজানো এই নিয়েই কেটে যাচ্চে।"

তবুও, সামতাবেড়ের আকর্ষণ এড়াতে পারেন না। লোক তিনি ভালবাসেন, কিন্তু লোকালয়ের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা।

তাই জানালেন, 'আমি কলকাতায় তারপরে আর যাই নি। এদিকে ছোট্ট পরিসরের মধ্যে যেমন ভাবে হোক দিন কাটে, কিন্তু একবার শহরের মুখ দেখে এসে সামলাতে যায় ৫।৭ দিন। তার মাঝে বৃষ্টি বাদল, কাদায় পথ চলা কঠিন—সে শক্তিও নেই, উদ্যমও নেই। কিছুদিন পূর্বে অন্ধকার রাতে দুটো সিঁড়িকে একটা সিঁড়ি ভেবে নামলে যা হয় তাই হয়েছিল। অবশ্য বাইরে তার প্রকাশ নেই, কিন্তু পিঠ আর কোমরের ব্যথা আজও সম্পূর্ণ মিলোয় নি।'

বাঁধের সে-কাদার সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। এঁটেল মাটির কাদা। পা দিলেই পড়বার আশঙ্কা। কোথাও বা আধ হাঁটুর ওপর কাদায় পা বসে যায়। স্টেশনের কাছে কোন দোকানে জুতা রেখে খালিপায়ে চলি। একটু চলার পর কাদার বুটজুতা যেন পায়ে এঁটে বসে। অতি-ধীরে সন্তর্পণে এক একটি করে পা ফেলি। অথচ, পাশ দিয়ে গ্রামের লোক সেই কাদার মধ্যেই হনহন করে হেঁটে চলে যায়। আশ্চর্য হয়ে দেখি। আধ ঘণ্টার পথ, আমার যেতে দেড়ঘণ্টা লেগে যায়! কাদা পায়ে, হাসি মুখে যখন শরৎবাবুর সুমুখে গিয়ে দাঁড়াতাম মনে হত দুর্গম তীর্থপথ সাঙ্গ করে যেন মন্দির পৌছুলাম, পথ-শ্রমের গ্লানি নেই, দর্শনের তৃপ্তি আছে, আনন্দ আছে।

একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, গ্রামের লোকেরা কাদার মধ্যেও অমন সহজে চলে কেমন করে?

তিনি তখনই গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, ওঃ! তুমি বুঝি কাদার মধ্যে দেখতে পাওনি! ওদের সবারই পায়ে যে খুর আছে!

তারপর, মুচকে হেসে বলেন, তুমিও থাকো কিছুকাল এদেশে, তোমারও গজাবে।

কিন্তু, থাকা আমার হয় না। একরাত্রি ছাড়া। অথচ, গিয়েছি অনেকবার।

গ্রীষ্মকালে সেই মাঠেঘাটেরই আবার বিপরীত রূপ। রৌদ্রের অকরুণ উত্তাপ। জুতা ছাড়া চলা যায়। পাকা সড়ক জনহীন। তৃণহীণ শুষ্ক মাঠের বুকে পায়ে হাঁটার নূতন পথ জেগেছে। সোজা গিয়ে বাঁধে ওঠা যায়। দুপুরের প্রচণ্ড রোদের চারিদিক ঝলসে ওঠে। মাঠের ও বাঁধের মাটি ফেটে-হাঁ হয়ে থাকে যেন তৃষ্ণার বারির আশায়। নদীর ধারে বিরাট চর জাগে। দূরে জলের স্রোতে রোদের ঝিলিক জ্বলে।

ঘর্মাক্ত হয়ে তাঁর সুমুখে এসে দাঁড়াই। স্নেহসম্ভাষণ করে উঠে আসেন। বসতে বলেন। ঘরে গিয়ে

হাত পাখা আনেন। স্নেহ-ভরা মন। অপরের সামান্য কষ্টও মনের তারে করুণ সুর তোলে। তাঁর সাহিত্যেও সে সুরের ঝঙ্কার ওঠে। তাই জানাতেন, 'তুমি...পারো ত এসো। কিন্তু যে রোদ আসতে বলতে সঙ্কোচ হয়।'

অথচ, গেলে সত্যিই আনন্দ পেতেন। লিখতেনও, 'এতদূরে যে কোন প্রিয়জন কষ্ট স্বীকার করে যদি আসেন সত্যই খুশি হই।'

যেতামও। সারাদিন বসে কত গল্পও শুনতাম। ফেরার সময় হলে বলতেন, দাঁড়াও লাঠিটা নিয়ে আসি। চলো, আমিও বেড়িয়ে আসি স্টেশন পর্যন্ত।

আসতেনও প্রায়। একবার মাঠ পার হয়ে স্টেশনের কাছাকাছি এসে দেখি তখনও ট্রেন আসতে অনেক দেরি। বললাম, চলুন, তাহলে আপনাকে ফেরার পথে এগিয়ে দিয়ে আসি বাঁধ পর্যন্ত। এবারে এগিয়ে দেবার আমার পালা। তিনি হাসেন। বলেন, বেশ, তাই চলো।

বাঁধে পৌঁছে তিনি আবার ঘুরে দাঁড়ান। বলেন, চলো, এবার আবার আমার পালা।

আমি প্রতিবাদ করতে যাই। থামিয়ে দেন। আবার গল্প শুরু করেন। মাঠের দীর্ঘ পথ যেন স্বল্প হয়ে যায়। স্টেশনের কাছে উভয়ে বিদায় নিই। বলি, এবার কিন্তু দুজনে পিছন ফিরে কেউ কারও দিকে তাকাব না!

আজ ভাবি, গিয়েছে সে একদিন!

কিন্তু, সে-সব কাহিনী আজ থাক। তাঁর জীবনের শেষ কয়েকদিনের স্মৃতি-রেখাগুলি দিয়ে তাঁর স্মৃতি-পূজার আলপনা আঁকি।

* * *

জীবনের শেষ কয়েক বছরই তাঁর স্বাস্থ্য সুস্থ ছিল না। তবুও অসুস্থ শরীরে অনেক সময়েই সহজ ভাবে ঘোরাফেরা করতেন। রোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল না। মেনে নিতেন। যেন, আশ্রিতবৎসলের রোগের ওপরও মায়া পড়েছিল। হা-হুতাশ নেই। রোগ নিয়েও হাস্য-পরিহাস।

অর্শের কষ্টে ভুগছেন। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। লিখলেন, 'রক্তপাত হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের মত। বোধ হয় আর এ-অসুখ ভালও হবে না, স্থগিত থাকবে না।'

ম্যালেরিয়া হল। আমি তখন মুর্শিদাবাদে। লিখে জানালেন, 'কাল বিধান ডাক্তার কুইনিন্ ইন্‌জেকশন দিয়েছেন। শরীরের যে অংশে ভার দিয়ে মানুষ বেশ সুস্থ হয়ে বসে ঠিক সেই যায়গায়। উঃ—কি এর ব্যথা। নুনের পুঁটুলি এবং ভাঙা একটা হরিকেন লণ্ঠন নিয়ে সকাল থেকে বসে আছি। বেশি দিন ওখানে থেকো না নইলে ফিরে এসে তোমার জন্যেও হয়ত এমনি ব্যবস্থা করতে হবে। মুর্শিদাবাদে যাবার দুর্বুদ্ধি যে তোমার মাথায় কে দিলে তাই ভাবি।'

'ভাঙা হরিকেন লণ্ঠন'—কেন না, তখন তিনি বিজলি-ভরা বালিগঞ্জের বাড়িতে!

মৃত্যুকেও তিনি ভয় করতেন না। জীবনের শেষ মুহূর্তটির আশা-পথ-চেয়ে বহুদিনই তিনি অপেক্ষা করেছিলেন। করার হয়ত কারণও ছিল। তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি স্বল্পায়ু। পঞ্চাশ উর্দ্ধে যাবার যেন তাঁর অধিকার ছিল না। তাই লিখেছিলেন, "৫০ বছর নিঃশেষ না হলে আর নূতন কিছুই করব না।"

৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৩ সাল। তাঁর পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন। সেদিন যে পত্রখানি পেয়েছিলাম, তা এই :

'বোধকরি ৩১শে ভাদ্রই এই লিপিটুকু তোমার হাতে গিয়ে পড়বে—আর সেদিন আমার জন্মদিন, বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হবে। নিশ্চয় জানতাম এর আগে আর কিছু হবে না, কিন্তু একান্ন বছরে আর বিশ্বাস নেই। বলি, ভগবান এই যেন করেন। আমাদের বংশে পঞ্চাশ কেউ পূর্ণ করে নি; আমিই প্রথম।'

এর দুই মাসের মধ্যেই তাঁর মেজ ভাই-এর মৃত্যু হয়। তাঁরও জীবন পঞ্চাশ স্পর্শ করে নি। শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে লিখলেন, 'আমার মেজ ভাই সন্ন্যাসী বেদানন্দ বর্মা ঘুরে এ বাড়িতে আসেন। গত বুধবারে একদিনের অসুখে দেহত্যাগ করেন। আজও আবার বুধবার এল।'

নদীর তীরে গাছের ছায়ায় তাঁর সমাধি দেওয়া হয়। বৎসরান্তে স্মৃতি-উৎসবের আয়োজন চলে।

শরৎচন্দ্র জানান, 'আজ বাড়ি যাচ্ছি। কাল আমার লোকান্তরিত মেজভাই বেদানন্দের মৃত্যুর দিন।

তার সমাধির কাছে দু-পাঁচজনকে নিয়ে বসতে হয়। দেশের দশজন খায় দায়, কীর্তন করে। এই জন্যে যাওয়া।'

অগ্রজ অনুজের মৃত্যু-বার্ষিকী করেন। জীবনে অনুজ, মরণে অগ্রগামী।

তাই, পঞ্চাশ বছর বয়স উত্তীর্ণ হতেই শরৎচন্দ্র যেন অতি-বৃদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনমাস পরেই মন্তব্য করেন, 'আমি এখনও বেঁচে আছি। সুড়ো বয়সে যে ক'টা দিন যায় ততই মহালাভ।'

এমনি করে প্রতি বৎসরান্তে তিনি বার্ধক্যের দীর্ঘ ছায়া দেখেন। জনসাধারণ শ্রদ্ধায় সাগ্রহে জন্মোৎসব করে। বয়োবৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাঁর আন্তরিক শুভকামনা জানান—শরৎচন্দ্রের কল্পিত বার্ধক্যের প্রতিবাদ করেন অপূর্ব ভাষায় :

"তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনও সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয় নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক। এখনও স্তব্ধ হবার অবকাশ নেই তোমার, ফলশস্যবহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনও তোমাকে সম্মুখে আহ্বান করচে।

"সত্তর বছর উত্তীর্ণ করে কর্মসাধনার অন্তিম পর্বে আমি পৌঁচেছি। কর্তব্যের চক্রপথ প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করার পরেও এখনও যদি আমাকে চলতে হয় সেটা পুনরাবর্তন মাত্র। এই কারণেই অল্পদিন হল আমার দেশ আমার জীবনের শেষ প্রাপ্য সমারোহ করে চুকিয়ে দিয়েছে। সাধারণের কাছে আমার পরিচয় সমাপ্ত হয়ে গেছে বলেই এই শেষকৃত্য সম্ভবপর হয়েছে। আকাশ থেকে শ্রাবণের মেঘ তার দান যখন নিঃশেষ করে দেয় তখনই ধরাতলে প্রস্তুত হয় শরতের পুষ্পাঞ্জলি। তার পরেও মেঘ যদি সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করে সেটা হয় বর্ষার পুনরুক্তিমাত্র, সেটা বাহুল্য।

"সেই দাঁড়ি-টানা সময় তোমার নয়। এখনও তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে তারা তোমার; অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্বজনহস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সে দিন বহুদূরে থাক্।

"আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে; তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো, পথের চরম প্রান্তবর্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তিবাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয় এ কথা নিশ্চিত মনে রেখো।...তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"

কিন্তু কালের রথচক্রে কবির কামনা নিষ্পেষিত হয়।

* * *

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাস। বড় দিনের ছুটি। সপ্তাহ খানেকের জন্যে কলকাতার বাইরে যাব কিনা ভাবছি।

শরৎচন্দ্রের পেটের ব্যথাটা বেড়ে চলেছে। দুর্বলতাও বাড়ছে। অস্ত্র করা চলবে কিনা ডাক্তাররা আলোচনা করছেন। নানান রকম পরীক্ষা চলেছে। ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের লেবোরেটারিতে প্রায় রোজই যান। তিনি শুধু চিকিৎসক নন, তাঁর পরম ভক্ত, বিশ্বস্ত বন্ধু, একান্ত অনুরক্ত। ব্যথার যাতনা আছে, তবু ঘোরাফেরা কমতি হলেও, বন্ধ নয়। হেসে বলেন, এ সারবার নয়। তুমি কদিন ঘুরে এসো! এ ক'দিনে কাটাকুটি করার সম্ভাবনা নেই। এক সপ্তাহ তো? তাছাড়া কুমুদও তো কদিন বাইরে যাচ্ছেন। তুমি চিঠিতে সব খবর পাবে। দরকার হলেই আসতে লিখব, তখনই কিন্তু চলে এসো নিশ্চয়।

শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্র গাঙ্গুলী তখন তাঁর কাছে থাকেন। সব দেখাশুনা করেন। শরৎচন্দ্রের নিকট আত্মীয়, প্রকৃত বন্ধু। তিনি চিঠি লেখার ভার নেন।

২৫শে ডিসেম্বর তিনি লিখে জানান :

"৫টা সকাল।

...সেদিন কুমুদবাবুর লেবরেটারিতে শরতের পরীক্ষা হয়েছিল : এবং সুবোধবাবু অস্ত্র করতে রাজিও আছেন। পরের দিন সকালে সুবোধবাবুর বাড়ি যাই—সবিশেষ জানার জন্যে, কিন্তু তিনি কোন কথাই

আমাদের অর্থাৎ যারা ডাক্তার নয় তাদের বলতে চান না।

দুদিন শরৎ ভূরি ভোজন করাতে আরও দুর্বল হ'য়ে গেছেন। কাল সন্ধ্যা বেলায় হঠাৎ শরীর খুব খারাপ বোধ হয়—কুমুদবাবু নেই—অন্য কোন ডাক্তার ডাকতে চাই—তা দেবেন না। অতএব ঘন ঘন ক্যালিফস্—আর আফিং দিয়ে টালটা সাম্‌লায়।

...কাল একটি নার্সিং হোম ঠিক করেছি। পার্কস্ট্রীটে সুশীল চাটুয্যের—সুশীল ভাগ্যক্রমে আমাদের ভাগ্নীজামাই-এর ছেলে। বোধ হয় শুক্রবারে ৩১শে ওখানে যেতে হবে।

আজ ৭॥ টার সময় সকালে ডাঃ দাসগুপ্তের সঙ্গে সুবোধবাবুর কাছে যাব। এখন এই পর্যন্ত—ফিরে এসে যা যা হয় জানাব। মোট কথা আপনি চলে যাওয়াতে আমাদের ভরসা কমেছে—যদি ২।৪ দিনের মধ্যে ফিরে আসতে পারেন ত বড় ভাল হয়। আশা করি তা করতে পারবেন। ৩০শে ফিরে আসুন।

১০॥ টায়।

সুবোধবাবু আজ ৬॥ টার সময় আসবেন। তিনিই আজ থেকে রুগীর চার্জ নেবেন।....।"

দুদিন পরেই চিঠি পাই :

"২৭।১২।৩৭—বেলা দশটা।

কাল আর সময় করে উঠতে পারি নি চিঠি দেওয়ার। আজ সকাল শান্ত ভাবেই আরম্ভ হচ্ছে—তাই ও বেলার জন্য ভয় হয়। এখন মুড়ির সঙ্গে তামাক খাওয়া চলছে। মুড়ি খাদ্য হিসাবে নয় : ওটা শুধু খাবার ইচ্ছাকে তৃপ্তি দেবে বলেই ডাক্তারেরা মানা করেন না। কাল শুতে আমাদের ১২½ টা হয়েছিল।

এখন ডুশ দেওয়ার পর্ব হতে হতে বোধ হয় বেলা ১২টা হবে। তারপর অলিভ অয়েল মাখা—তারপর রেকটাল গ্লুকোজ—তারপর ১০০ সিসি গ্লুকোজ—ইণ্টার ভেনাস্। এর মধ্যে একটা স্ট্রীক্‌নিন্ অবসর মত দিতে হবে।

পেটে—মুখ দিয়ে কোন খাবারই সইচে না : এমন কি উইন্‌কার্নিসও নয়। মুখের খাবার কেবল কষ্টই সৃষ্টি করছে। কিন্তু আত্তি মেটবার জন্যে ওটা। রাতে দেরি হয় কাজ আরম্ভ করতে। অলিভ অয়েল মাখানো, তারপর রেকটাম্ দিয়ে তিন আউন্স দিয়ে দেওয়া। শেষ শুতে শুতে কাল রাতে বললেন : শোন একটা গান : শেষ পারাণির কড়ি, আমি কণ্ঠে নিলাম গান। আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব—তাই তোমায় গান শোনাচ্চি।

বাকি খবর ভাল। আমার পূর্বের আপিল আপনার ফেরার সম্বন্ধে দ্বিতীয় তাগিদের দ্বারা সজোর করতে চাই।..."

এ-চিঠি পেয়েই কলকাতায় ফিরে এলাম। সেদিন ৩০শে ডিসেম্বর।

এসেই খবর পেলাম সাদার্ণ হসপিটাল্ রোড-এ সাহেবদের এক নার্সিং হোমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিকেলে দেখতে যাওয়ার সময়। সময়মত গেলামও। প্রকাণ্ড বাড়ি। সুরম্য, সুসজ্জিত। চারিদিক পরিপাটি, নিখুঁত পরিচ্ছন্ন। সিঁড়িতেও কার্পেট বিছানো। সঙ্কোচভরে যাই। যে কয়েকজনের দর্শন পাই, সবাই সাদা মুখ। বিলাতী সাহেব মেম। নার্সরাও তাই। ভাবি, বাংলামুলুক ছাড়িয়ে একি বিলাতেই চলে এলাম!

ঘরের নম্বর দেখে সন্তর্পণে ঘরে ঢুকি। সুন্দর সাজানো ঘর, দামী আসবাবপত্র। সাদা খাটের উপর সাদা বিছানায় শরৎচন্দ্র শুয়ে আছেন। দুগ্ধফেননিভ শয্যা বোধকরি একেই বলে। হঠাৎ মুখ ফেরাতেই রোগীর চেহারা দেখে চমকে উঠি। কয়েক দিনেই এত শীর্ণ হয়ে গেছেন! মুখে পাণ্ডুর ছায়া—চোখের দৃষ্টি ম্লান।

আমাকে দেখেই বললেন, তুমি এসেছো। এবার চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা হবে।

এখানে কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা করতে যাব,—নার্স এসে হাজির। হাতে গ্লুকোজ-জল-ভরা গেলাস। শরৎবাবু বলেন, এখন খাবো না। পরে দিয়ো।

নার্স শোনে না। জোর করে। বলে, খাবার সময় হয়েছে, খেতেই হবে। মুখের ভাষায়, বলার ভঙ্গিতে কোথাও একবিন্দু মমতা নেই, কোমলতা নেই। যেন, যন্ত্র-দানব। কঠিন, কঠোর।

তার নির্মম ব্যবহারে রোগী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। নার্স-এর হাত থেকে গেলাসটা আমি চেয়ে নিই, অনুরোধ করি, আপনি দয়া করে একটু বাইরে যান। ক্রোধভরে সে বেরিয়েও যায়। নার্সেরও ক্রোধ!

বিলাতী নার্স, স্বদেশী রোগী। রোগীর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তাঁর হাত ধরি। শিরে ধীরে ধীরে হাত বুলোই। বুঝতে পারি, নিদারুণ ক্রোধে তাঁর ক্লান্ত শরীর কাঁপতে থাকে।

ধীরে ধীরে বলি, জলটুকু খেয়ে নিন।

আমার মুখের দিকে তাকান। তারপর শান্ত স্বরে বলেন, বেশ। খাবো আমি। কিন্তু, আমায় এখান থেকে নিয়ে চলো। নইলে, আমি নিজে চলে যাবো।

তাঁকে আর কথা বলতে দিই না। বলি, সব দেখলাম ত আমি নিজের চোখে। এখানে থাকা আপনার সম্ভব নয়, এসেই বুঝেছি। কালই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে।

তার পর দিন পার্ক নার্সিং হোম-এ রোগীকে আনাও হয়। রোগী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন। বাঙালী ডাক্তার নার্সের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও হয়। হাসপাতালের আবহাওয়া আছে, নিয়মকানুনও আছে। কিন্তু শিকল-বাঁধা আইন নয়। তাই, অন্য রোগীর অসুবিধা না করে যাতায়াতের বাধানিষেধ আমাদের কয়েক-জনের ছিল না।

শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলুন, কাকে চান এখানে। সেই মতই ব্যবস্থা হবে।

ক্লান্ত কণ্ঠে বলেন, কাউকে চাই না আমি। তোমরা তো রয়েছ। তুমি বসো এখানে।

১৯৩৮ সাল। নববর্ষ আসে। আমার আকস্মিক জীবনের কাঞ্চনময় অভিজ্ঞতার রত্নসম্ভার নিয়ে।

মাত্র ষোড়শ দিবস। মহাকালের মহাসমুদ্রে যেন জলবুদ্বুদ মাত্র। তবুও মনে হয় এ যেন সেই Ten Days that Shook the World.

সবাই জানি, দীপ নির্বাণোন্মুখ। মর্মে মর্মে অনুভব করি। তবুও তাঁর সামনে যখনই যাই, কাছে যখনই বসি,—মুখে ম্লান হাসির রেখা টানি। মনের পটে আশার ছবি আঁকার ব্যর্থ প্রয়াস করি।

ভাগলপুরের গঙ্গার গল্প করেন। সাঁতার কেটে বর্ষার ভরানদী পারাপারের কাহিনী।

বলি, সেরে উঠুন, এবার আপনার সঙ্গে যাবো সেখানে।

হেসে ওঠেন। বলেন, ওরে তোর আশা ত কম নয় রে! গঙ্গায় যাবো নিশ্চয়, সঙ্গে থাকবি। কিন্তু এ যে আমার শেষ যাত্রা।

কথায় ছেদ টানি। বলি, চুপ করুন। বেশি কথা বলা নিষেধ।

রাত্রে কাছে থাকতে বলেন। বলি, ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করব।

বলেন, ডাক্তাররা যাই বলুক, তুমি থাকো।

ডাক্তারের অনুমতি পাই। আমার রাত জাগা শুরু হয়।

চেয়ার টেনে খাটের পাশে বসে থাকি। রোগীর সেবার বিশেষ করণীয় কিছু নেই। ঘরের এককোণে স্তিমিত আলোক। তবুও, তন্দ্রাহীন আমার আঁখি। রোগীর দিকে নিবিষ্ট চিত্তে তাকিয়ে থাকি। রোগশয্যায় মহামানব। মৃত্যুপথযাত্রী। রোগক্লিষ্ট দেহ। তবুও সম্পূর্ণ সজ্ঞান। কত কথা মনে হয়। পুরানো দিনের মধুর স্মৃতি। কল্পনার তুলিতে আঁকা মানস-পটে কত করুণ ছবি।

সন্ধ্যার পর নার্স বদল হয়। রাত্রের নার্স আসে। পায়ে ছিল উঁচু জুতা। পাশের বারান্দা দিয়ে খুট্ খুট্ শব্দ তুলে যায়, চার্জ বুঝে নিতে। শরৎচন্দ্র চোখ বুজে শুয়ে আছেন। অস্ফুটস্বরে বলেন, খুঁড়ি নার্সটা এল।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি, খোঁড়া? খোঁড়া দেখলেন কাকে?

মৃদু হেসে বলেন, দেখতে হবে কেন? কান পেতে শুনলেই বুঝতে পারা যায়। দুই পায়ের জুতার শব্দ একরকম নয়। একটা পা নিশ্চয় একটু ছোট আছে দেখো তুমি। নার্স ঘরে ঢোকে। ভাল করে নজর করি। দেখি, ঠিকই ধরেছেন।

অতি সামান্য একটু খুঁড়িয়ে চলে। সহজ চোখে হঠাৎ ধরা পড়ে না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-শক্তি! মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও সে-শক্তির হ্রাস নেই।

দেশের গণ্য-মান্য নেতারা আসেন দেখতে। পরিচিত, অপরিচিত লোকও আসেন খবর নিতে। ডাক্তারের নিষেধ, যেন রোগীর ঘরে কেউ না যান। শরৎচন্দ্রও চান না। বলেন, সারা জীবন মানুষকে ভাল বেসেছি, কাছে ডেকেছি। কিন্তু, এখন আর নয়। চুপ করে শেষ কটা দিন শুয়ে থাকতে যেন পাই।

অবুঝ আগন্তুকও আসেন। বন্ধুত্বের দাবী করেন। জোর করে বলেন, একবার শুধু দেখে যাই। কোন

মতেই নিষেধ মানতে চান না।

অগত্যা শরৎচন্দ্রকে গিয়ে বলি, চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে থাকুন। একবার ঘরে এনেই বিদায় দেবো।

আগন্তুককে বলি, রোগী ঘুমুচ্ছেন। একটুও যেন শব্দ না হয়। দাঁড়িয়ে দেখেই চলে আসবেন।

শ্রদ্ধাভরে ঘরে প্রবেশ করেন। কপট-নিদ্রাতুর রোগীর প্রতি একাগ্রমনে তাকিয়ে থাকেন। হাত তুলে নীরবে প্রণতি জানান।

আমি কিন্তু দেখি, মুদিত-নয়ন শরৎচন্দ্রের এক চোখ অল্প খোলা। যেন, বন্ধ জানালার খড়খড়ি খুলে লুকিয়ে একটুখানি দেখা।

আগন্তুক চলে যান। শরৎচন্দ্র হাসতে থাকেন। বলেন, বেশ খেলা হল। কিন্তু, আর না। এখন কাছে এসে বোসো।

জল খেতে চান। রোগীর-জন্যে-রাখা জল দিই। খাওয়ার কষ্ট আছে। অথচ তৃষ্ণাও আছে। বলি, একটুকখানি খান।

অস্ফুটস্বরে কথার প্রতিধ্বনি তোলেন—'একটুকখানি'?

তারপর বলেন, দেখেছ? 'একটুখানি', 'একটু-উ-খানি', 'একটুক-খানি'! কত তফাৎ কথাগুলির মানে! বাঙলাভাষার কি বিচিত্র শব্দ-সম্পদ!

জীবন নদীর খেয়া-পারের যাত্রী। তবুও, সাহিত্য-পূজারীর বাণীর দেউলে ভক্তি-অর্ঘ্য।

সৌন্দর্য-পিয়াসী মনও সম্পূর্ণ সজাগ আছে। প্রতিদিন সাজি-ভরা ফুল আসে। গোলাপের গুচ্ছ আসে। রোগীর ঘর রূপে আলোকিত। গন্ধে আমোদিত হয়।

জিজ্ঞাসা করেন, কে নিয়ে এল? বড় ভালো লাগে ফুল। সার্থক জন্ম গোলাপের। শেষ সময়েও আনন্দ দিতে এসেছে।

ক্যানারী পাখিও আসে, খাঁচার ভিতর সুন্দর পাখি। মধুর কাকলী। ডাক্তার এসে নিষেধ করেন, দিনের বেলায় ঘরের ভিতর জানালায় টাঙিয়ে রাখতে চান রাখুন। কিন্তু, রাত্রে যেন বাইরে থাকে। ঘুমের ব্যাঘাত হবে।

শরৎচন্দ্র হেসে বলেন, নিদ্রা যখন আসবে তখন কেউই আর ভাঙাতে পারবে না! শুনতে দাও ওর গান। বড় মধুর শিষ দেয়।

তারপরে, পাখির দিকে তাকিয়ে বলেন, ওরে! অত সুন্দর গাস্‌নে! তোরও একদিন আমারই মত ও-মধু মাখা কণ্ঠ রোধ হবে।

রাত্রেও চোখে ঘুম নেই। তাঁরও নয় আমারও না। নার্স আসে ইনজেকসন দিতে। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নার্স। দেখেই বলেন, রাক্ষুসী নার্স। চোখ দেখেছ? সূচ ফোটাতে কেমন আমার জামার কাপড় তোলে দেখ না।

বলি, চুপ করুন। বুঝতে পারবে!

ইনজেকশন দিয়ে নার্স চলে যায়। তিনি বলতে থাকেন, এরা সব পারে। আমি জানি, একবার একটা হাসপাতালে একজন রোগী ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল। নার্স চুপ করে পাশে দাঁড়িয়েছিল, কোনও রকম বাধা দেয় নি।

বলি, চুপ করুন, কথা বলবেন না। এবার কথা বললে আমি চলে যাবো।

ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইসারা করে দেখান, কথা বন্ধ করলাম।

গভীর রাত্রি। নীরবে শান্তভাবে শুয়ে আছেন। কিন্তু চোখ খোলা। আঁখির পাতায় বিন্দুমাত্র নিদ্রা নেই। আমার দিকে দেখেন। কাছে ডাকেন। বলি, ঘুমোন। চোখ বুজোন। চোখ বন্ধ করেও মিটমিট করে তাকাতে থাকেন। বলেন, সরো এসো। একটা কথা বলি। আমার সীমান্তের একান্ত বন্ধু!

আমার মাথার উপর হাত রাখেন। বলি, আশীর্বাদ করছেন কি বোলে?

বলেন কথা নয়। আশীর্বাদ আমি চিরদিনই তোমায় করি।

এমনি করে দীর্ঘ রাত্রিরও অবসান হয়। কিন্তু প্রভাতে আলো হলেও মনে আশার আলো জ্বলে না।

অবশেষে, বড় ডাক্তারেরা অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত করেন। সব আয়োজনও হয়। ১২ই জানুয়ারি। অপারেশনের দিন। ডাক্তার কুমুদশঙ্কর বিলাতী প্রথা অনুযায়ী রোগীর কাছে লিখিত অনুমোদনের প্রস্তাব করেন। শরৎবাবুর মুখে তখনও হাসির রেখা। বলেন, দাও লিখে, আমি সই করে দিই।

কুমুদশঙ্কর কাগজখানি তাঁর হাতে দেন। শরৎচন্দ্র ইংরাজিতে সই করেন।

তারপর বলেন, দাঁড়াও, তলায় আমি একটু নিজে লিখি।—বলে লিখে দেন,—"With all my senseses courage in tact."

লেখার মধ্যে কয়েকটি হরফের দ্বিত্ব ঘটে। ভাবি, এ-অবস্থায় এটা হয়ত স্বাভাবিকই।

লেখার সময় তাঁর মুখে চোখে একটা অসাধারণ দীপ্তি দেখেছিলাম।

আশ্চর্য লাগছিল। মৃত্যু-বরণের বাণী লিখতেও এত আনন্দ!

আমার না-বোঝার ভুল ভাঙে তখনই। ফাউন্টেন পেনটি হাতে ফিরিয়ে দেন, বলেন, রেখে দিয়ো এটি তোমার কাছে।

তারপর তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আঃ! বড় আরাম পেলাম; লিখতে সত্যিই বড় ভাল লাগল।

নিমিষে বুঝি, বাণীর বরপুত্র। লেখনীর সঙ্গে তাঁর আজন্ম রক্তের সম্বন্ধ। আজ চির-বিদায়ের কালে এ যেন অতি-প্রিয়জনের সর্ব-শেষ স্পর্শানুভূতি!

ক্যালাইড্যসস্কোপের কয়েকটি কাহিনী

নিরুদ্দেশের সন্ধানে

অনন্ত বিস্ময় ও রহস্যে ভরা গিরিরাজ হিমালয়। তাঁকে ঘিরে মানুষের মনে কত বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রশ্ন। অনেকেই সন্ধান নিতে আসেন সেখানকার সাধুসন্ন্যাসীদের সম্পর্কে। পুণ্যকামী যাত্রীরা জানতে চান দুর্গম তীর্থস্থানগুলির সন্ধান। প্রকৃতিপ্রেমিক ভ্রমণ-পিপাসী মন খোঁজে হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে কত অজানা পথের সন্ধান। দুঃসাহসী অভিযাত্রী যাত্রা করে কোথায় কোন্ এক গগনস্পর্শী শিখর জয়ে। কেউ বা এসে প্রশ্ন করেন, কর্মজীবনে অবসর নিয়ে কোন্ অঞ্চলে মনের শান্তিতে বাকি জীবন কাটানো যায়? আবার, কখনও, হয়ত কোন আত্মীয়স্বজন হিমালয়ে সন্ধান পেতে আগ্রহী তাঁর কোন গৃহত্যাগী নিরুদ্দেশ প্রিয়জনের।

সেই শেষোক্ত শ্রেণীর অনুসন্ধানকারীর তিনটি কাহিনী শোনাই।

॥ ১ ॥

শৈলেনবাবু ছিলেন সেকালে আইনের কৃতী ছাত্র। কর্মজগতে প্রবেশ করে সাব্‌জজ হন। আমার পিতৃদেবেরও প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমার দাদাদের সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমার চেয়ে তিনি ছিলেন বয়সে অনেক বড়। তাই আমাকেও তিনি প্রীতি ও স্নেহের চক্ষেই দেখতেন—ছোট ভাই-এর মত।

আজ থেকে বছর তিরিশেক আগের কথা। তখন তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। কলকাতায় নিজের বাড়িতে থাকেন। আমিও সেসময় হিমালয় থেকে ফিরেছি দিন কয়েকের জন্য। একদিন তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন, আমাকে দেখতে পেয়ে বলেন, এই যে ভাই তুমি এসেছ। চল, তোমার সঙ্গে একান্তে একটু কথা আছে।

তারপর, ঘরে এসে বসেন, বলেন, ভাই, তুমি জান কিনা জানি না, একটা গভীর অনুশোচনায় আমার মনে কষ্ট পোষণ করছি বহু বছর ধরে। আমার বড় ছেলেটি যেবার ম্যাট্রিক দেবে, পরীক্ষার কদিন আগে বাড়ি থেকে হঠাৎ চলে যায়। তারপর বহু অনুসন্ধান করেও তার কোন খোঁজ পাইনি। আমার বিশ্বাস, সে সাধু হয়ে গেছে। তুমি তো ভাই হিমালয়ে ও অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রে কত ঘুরছ, তার সঙ্গে তোমার কোথাও কি যোগাযোগ হয়েছে বা তাকে দেখেছ?—এই দেখ ভাই তার ফটো।—

তিনি সজল চোখে একটি বহু পুরানো ছোট ফটো তাঁর পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করে তাই থেকে সযত্নে খুলে আমার হাতে দেন।

ঘটনাটা আমার জানা ছিল না। তাই জিজ্ঞাসা করি, কত বছর হল সে চলে গেছে?

তিনি বলেন, তা বছর পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল। ঐভাবে হঠাৎ তার চলে যাওয়ায় আমার মনোকষ্ট যা তা তো আছেই কিন্তু অনুশোচনা কেন তাও বলছি। সেদিন হয়েছিল কি জান? একটা সামান্য ঘটনার জন্যে তাকে খুব বকি—হয়ত তার অপরাধের তুলনায় শাসনটা অনেক বেশিই হয়েছিল—আমার হঠাৎ রাগের বশেই। তার কিছু পরে রোজ সকালে আমি যেমন নিত্য গঙ্গাস্নানে যাই সেদিনও বার হয়ে গেলাম। যাবার আগে দেখলাম সে তার পড়ার ঘরে বসে বই নিয়ে মুখ গুঁজে পড়ছে। গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে এসে তারপর থেকেই তাকে আর বাড়িতে দেখতে পাই না। কোথায় গেল? কোথায় গেল? কেউ বলতে পারে না। সারাদিনই আর বাড়িতে ফিরল না। কত-রকম খোঁজ খবর করেছি কত দিন ধরে। তার আর সন্ধান পাওয়া যায়নি।—বুঝতেই পারছ ভাই, আমার মনের দুঃখটা। বড় আদরের ছেলে ছিল সে আমার। সারা জীবন মনে একটা গভীর ক্ষত রয়ে গেছে—আমার অনুতাপ হয় আমার অমন অন্যায় শাসনের ফলেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তুমি কখনও এই চেহারার কাউকে কোথাও দেখেছ?—দেখ না তার ছবিটা ভাল করে।

আমি এতক্ষণ মনে মনে হিসাব করছি, তাঁর সে ছেলেটি দেখছি প্রায় আমারই সমবয়সী। ঘটনাটি ঘটেছে বছর পঁয়ত্রিশ আগে। তখন তার বয়স বছর ষোল। এ ছবি তারও কিছুকাল আগে তোলা নিশ্চয়। একটি সুশ্রী বালকের ছবি—তাও শুধু মুখটুকু নয়, দাঁড়িয়ে তোলা। এতকাল পরে এই ছবি দেখে এখন কি আর কাউকে মিলিয়ে চেনা সম্ভব!

বুদ্ধিমান বিচক্ষণ একজন হাকিম তিনি, কিন্তু অনুতপ্ত পুত্র-শোকাতুর পিতার মন সেই বিচারশক্তি হারিয়েছে।

তাঁকে এ-সব কথা বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। তাই শুধু বলি, আমি যা সামান্য ঘুরেছি, তার মধ্যে এ-চেহারার কাউকে দেখেছি বলে মনে হয় না।

তিনি বলেন, ছবিটা ভাই তোমার কাছেই এখন থাক। তুমি আবার বেরুচ্ছ তো? সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই একটু মিলিয়ে দেখো।

ছবিটা রাখা নিরর্থক জানলেও তিনি হয়ত মনে কিছুটা শান্তি পাবেন ভেবে আমার কাছেই সেটা রেখে দিই।

বছর দুই পরে। আমি তখন আবার কলকাতায়। তিনিও একদিন এসেছেন আমাদের বাড়িতে। আমাকে দেখে খুশি হন। বলেন, কী ভাই? কোন সন্ধান পেলে নাকি? আমি কিন্তু কিছুদিন আগে একটা খবর পেয়েছি খুবই অপ্রত্যাশিত ভাবে। ডাকযোগে আমার নামে আসা একটা চিঠিতে। এই দেখ—

খামে ভরা একটা চিঠি আমাকে দেন। দেখি, শৈলেনবাবুর নাম ঠিকানা টাইপ করা খাম। ডাকটিকিটে G.P.O.-র সীলমোহর। ভেতরের চিঠিও ইংরেজিতে টাইপ করা। বেনামী পত্র। পত্রপ্রেরক তাঁকে জানাচ্ছেন, হিমালয়বাসী উচ্চকোটি এক মহাত্মার নির্দেশে এই চিঠি লেখা। তিনি শৈলেনবাবুকে জানাতে বলেছেন, তাঁর নিরুদ্দেশ পুত্র সেই মহাত্মার কাছে দীক্ষা নিয়ে কঠোর সাধনারত এবং তাঁরই নিকট রয়েছে। কিন্তু তার পিতার ব্যাকুলতার কারণে তার তপোসিদ্ধির উন্নতির পথে বিঘ্ন দেখা দিচ্ছে; তিনি যেন পুত্রের হিতার্থে মনে কোন দুশ্চিন্তা পোষণ না করেন। পুত্র তাঁর সুস্থ আছে। পুত্রের কল্যাণে তিনি যেন পুত্রের সন্ধানের চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন।

শৈলেনবাবু বলেন, ভাই, আমার বিশ্বাস, কলকাতার কেউ হিমালয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে সেই মহাত্মার দর্শন পান এবং ফিরে এসে চিঠিটা আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি নিজের নাম ঠিকানা জানাননি, পাছে আমি তাঁকে ছেলে কোথায় কোন্ সাধুর কাছে রয়েছে জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করি। তাই নয় কী?

আমি বলি, নিশ্চয় তাই হবে। কিন্তু মনে মনে সন্দেহ করি, শৈলেনবাবুর কোন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু এখানে বসেই পত্রটি রচনা করে পাঠিয়েছেন।

তবে, এতে যে কিছুটা অন্তত তিনি মনে সান্ত্বনা পেয়েছেন, তা দেখি।

আমিও তাঁকে ফটোটি ফেরত দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হই।

কিন্তু, এতেও কী অনুতপ্ত পিতার মন থেকে অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষার জ্বালা সম্পূর্ণ নিভেছিল? এ-সন্দেহের কারণ বলি।

কিছুকাল পরে আবার শৈলেনবাবুর সঙ্গে দেখা। বলেন, ভাই, চলে যাবার আগে দেখা করতে এলাম।

হেসে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় চললেন?

তিনি জানান, এখানকার সংসারের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে চলেছি হিমালয়ে উত্তরকাশীতে, সেখানে বাণপ্রস্থী হয়ে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাব।

বলি, সিদ্ধান্তটি মহৎ। কিন্তু, আপনার যে-স্নেহময় নরম মন, সব ছেড়েছুড়ে ওখানে থাকতে পারবেন?

তিন দৃঢ় কণ্ঠেই জানান, দেখো, ঠিক পারব।

ভাবি, এও কী তাঁর ছেলের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে নিজের মনের অনুশোচনারই প্রতিক্রিয়া? অথবা, এখনও ছেলের সাক্ষাৎ পাওয়ার প্রত্যাশা?

এরও বছর দেড় দুই পরে হঠাৎ একদিন শৈলেনবাবু এসে হাজির।

দেখে খুশি হই। জিজ্ঞাসা করি, উত্তরকাশী থেকে কবে এলেন? আবার ফিরবেন নাকি সেখানে?

তিনি ম্লান মুখে জানান, না, ভাই। ওখানে স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না, মনও ঠিক বসছিল না, জায়গাটাও ক্রমে বড় শহর গোছের হয়ে এসেছে,—শান্তি পেলাম না।

মনে মনে হাসি। ভাবি, মনে শান্তিলাভের ক্ষমতাও অর্জন করতে হয়। সে শক্তি না পেলে শান্তি কী কোথাও পাওয়া সম্ভব! কে জানে, হয়ত হিমালয়ে হারানো ছেলের অনুসন্ধানে বিফল হয়ে তাঁর ফিরে আসা।

এর কিছুকাল পরে কলকাতাতেই শৈলেনবাবুর পরলোকগমনের সংবাদ পাই। এতকাল পরে তাঁর অনুসন্ধানের সমাপ্তিও ঘটে; হয়ত, কী জানি, নিরুদ্দেশ পুত্রের সঙ্গে একদিন মিলিতও হন।

তেজপুর শহর থেকে অপরিচিত এক ভদ্রলোকের একটা চিঠি পেলাম। টাইপ করা। ইংরেজিতে লেখা। তাড়াতাড়ি উত্তর পাবার আশায় তাঁর নাম-ঠিকানা-লেখা টিকিটমারা একটা খামও পাঠিয়েছেন। চিঠিখানির মর্মার্থ এই :

"এক ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করছি এবং আশা রাখি এ সম্পর্কে উত্তরও পাব। আপনার 'হিমালয়ের পথে পথে' বইখানি আমি পড়েছি। তাতে এক বৈরাগীজির কথা লিখেছেন এবং তিনি অসমীয়া বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সম্বন্ধেই আমার কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। বই-এ তাঁর যে ফটোটি আছে, সেটি সুস্পষ্ট না হলেও ভাল করে দেখেছি। আপনাকে জানাই, আমার চতুর্থ ভাইটি ১৯৩৮ সালের ১২ই মার্চ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে আমাদের বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে যায়। তারপর থেকে উত্তরভারতের প্রায় সকল জায়গায় বহু অনুসন্ধান করেও তার কোন সন্ধান মেলেনি। তার কাছ থেকেও কোন খবরও পাওয়া যায়নি। শুধু এইটুকু খবর আমি সংগ্রহ করতে পারি যে সেই ১২ই মার্চ তারিখে রাত্রে তেজপুর থেকে নিমাতিঘাট পর্যন্ত তখনকার যে যাত্রীবাহী স্টিমার চলত, তাইতে সে উত্তর আসামে রওনা দেয় এবং জোরহাটের নিকট নাগরিটিং ঘাটে নেমে যায়। এইটুকু ছাড়া আর কোন খবর সংগ্রহ করতে পারিনি। এখন আপনার বই-এ তার বর্ণনা ও ফটোখানি আমাদের পরিবারবর্গের সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আমরা সবাই-এ সম্পর্কে আরও খবর জানতে খুবই উৎসুক।

তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে আমাদের জানান, সেই বৈরাগীজির সঙ্গে কবে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ও কোথায়ই বা শেষ দেখা হয় এবং সে জায়গায় কোথা দিয়ে কীভাবে যেতে হয়। এ ছাড়া আরও কিছু জানা থাকলে, তা লিখে জানালে আমরা আনন্দিত হব। এভাবে আপনাকে বিরক্ত করায় ক্ষমাপ্রার্থনা করি এবং চিঠির উত্তর পাব আশা রাখি।"

চিঠিখানি পড়ে এবং বৈরাগীজি সম্বন্ধে আমারও যা জানা ছিল, তাতে সন্দেহ থাকে না যে তিনিই পত্রলেখকের সেই নিরুদ্দেশ ভাই! কিন্তু, তখনই আবার ভাবি, বৈরাগীজি তো ইচ্ছা করলেই তাঁর ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, তাঁর খবরাখবরও জানাতে সক্ষম, তবুও তিনি তা করেন না, এখন আমি তাঁর সন্ধান জানি বলে, তাঁর অজ্ঞাতে, তাঁকে আবার সংসারের জালে জড়িয়ে দেওয়া আমার উচিত নয়। তবে, এক সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের পরিচয় প্রচার করাও আমার ঠিক হয়নি,—লেখার সময় ভাবতেই পারি নি, কোথায় সেই আসামে তাঁর পরিবারবর্গের চোখে এটা পড়তে পারে। কিন্তু এখন কি করা উচিত? মনে মনে একটা প্ল্যান ঠিক করি। বৈরাগীজির ভাইকে আপাতত পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করে উত্তরে শুধু জানাই, আমি আবার হিমালয়ে চলেছি, ফিরে এসে উত্তর দেব।

মাস দুই পরে হিমালয় যাত্রা থেকে ফিরে কাশীতে গিয়ে থাকি। ভাবি, এবার সেই চিঠির একটা উত্তর দেওয়া উচিত। চিঠিটা লিখতে বসব, এমনি সময়ে বৈরাগীজির ভাই-এর আবার একটা চিঠি আসে। লেখেন, আবার আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা করবেন। আপনার পোস্ট কার্ড যথাসময়ে পেয়েছিলাম। তাতে জানিয়েছিলেন, হিমালয়ে আবার যাচ্ছেন, ফিরে এসে আমার চিঠির উত্তর দেবেন। আমাদের পরিবারের সকলেই এ-বিষয়ে বিস্তারিত খবর জানবার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছি।

আমার এই উত্তরও তখনই লিখে পাঠাই :

"আপনাকে চিঠি লিখতে বসছি এমন সময় আপনার দ্বিতীয় পত্রখানি কলকাতা ঘুরে এখানে এল। কিছুদিন হল হিমালয় থেকে ফিরেছি এবং সম্প্রতি কয়েকদিনের জন্য কাশীতে আছি। এবার হিমালয় যাত্রাকালে আপনার পত্রখানি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আশা ছিল হয়ত বৈরাগীজির সঙ্গে পথে আবার কোথাও সাক্ষাৎ হবে এবং তখন আপনার পত্র-সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করব ও ফলাফল আপনাকে জানাব। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা এবার হয়নি। বদরীনাথের পথে যোশীমঠ প্রসিদ্ধ স্থান। সেইখানে বৈরাগীজির গুরুদেবের আশ্রম ছিল। কয়েকবছর হল গুরুদেবের দেহাবসান হয়েছে। আমার বই-এ সে-কথার উল্লেখ আছে। বৈরাগীজির যোশীমঠে কিছুকাল থাকার কথা ছিল জানতাম। তাই এবার সেখানে পৌঁছে খবরও নিই। অপর এক সাধুর সঙ্গে সেই আশ্রম-গুহায় দেখা হয়। তাঁর কাছে জানলাম, বৈরাগীজি ওখানে কিছুকাল কাটিয়ে কয়েক মাস আগে অন্যত্র চলে গেছেন। কোথায়,—তা তিনি জানেন না। উত্তরাখণ্ডে—গাড়োয়ালেই—কোন নিভৃত স্থানে এখন আছেন বলে তাঁর অনুমান। বৈরাগীজির সম্বন্ধে আমার বই-এ যা লিখেছি, তার বেশি কিছু জানাবার নেই। বদরীনাথের কাছেও যোশীমঠে তিনি কয়েক বছরই কাটিয়েছেন এবং বদরীনাথে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, সে-কথাও বই-এ উল্লেখ আছে। কয়েক বছর থেকে তিনি আর বদরীনাথে থাকেন না। আমার বই-এ তাঁর নাম জানাইনি। তিনি ঐ-অঞ্চলে মোহনদাস বৈরাগী এবং এখন মোহনদাস ত্যাগীজি নামে পরিচিত। যতদূর স্মরণ হয়, সমর গুহ-র 'উত্তরাপথ' বইখানিতেও এঁর কথা উল্লেখ আছে। এর বেশি আর কিছু জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, একটা কথা লিখে এ-চিঠি শেষ করি। বৈরাগীজি নিজের আদর্শ অনুযায়ী গভীর ও নিভৃত সাধনায় মগ্ন আছেন। সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁর আকর্ষণ দেখিনি। দেহ তাঁর সুস্থ আছে, মনের প্রফুল্লতাও প্রকাশ পায়। তিনি যে-আনন্দলোকে বিচরণ করছেন তাঁর সেই সন্ন্যাস-জীবনের বিঘ্নকর কোন কার্য করা সমীচীন কিনা বিশেষ বিবেচ্য। আমার সম্ভাষণ জানবেন।"

এর পর অবশ্য সেই পত্রলেখকের আর কোন চিঠি পাইনি। ইতিমধ্যে কয়েকবার হিমালয়ে গেলেও বৈরাগীজির সঙ্গে আমারও আর দেখা হয়নি। তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগও আর নেই। তবে, তাঁর খবর আমার পাহাড়ী বন্ধুদের কাছে কখনও-সখনও হঠাৎ পেয়ে যাই। যদি ভবিষ্যতে দুজনের আবার দেখা হয়ে যায়, সেই নিরুদ্দেশ ভাইটির কথা অবশ্যই জানিয়ে চমক দেব।

॥ ৩ ॥

একদিকে সংসারে বিরাগী, গৃহত্যাগী, গুহাবাসী, উদাসী সন্ন্যাসী, অন্যদিকে নিরুদ্দেশ প্রিয়জনের সন্ধানে উন্মুখ সংসারী মানুষ—মাঝে আমার যেন গোয়েন্দাগিরির কাজ। কখনও সখনও আমার মনও কৌতূহলী হয়,—যেন ধাঁধার উত্তর খুঁজে বার করা!

সেবার কলকাতায় কদিন কাটিয়ে আবার হিমালয় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এলেন দেখা করতে। আগে কখনও সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও নাম বলতেই চিনতে পারি। লোকমুখে ও কখনও সখনও পত্র-পত্রিকাতেও তাঁর নামের উল্লেখ পেয়েছি। শ্রীগুণদা মজুমদার। নিজের পরিচয় জানিয়ে তিনি বলেন, আপনার কাছে একটা খবরের আশায় এসেছি। আমার এক ভাই ভাল গান করতে পারত। তার নাম—অম্বিকা মজুমদার—

নামটি শোনামাত্রই আমি বলি, অম্বিকা মজুমদার! তান গান আমি শুনেছি বহুকাল আগে। সে তখন ছাত্র। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্‌টিটিউটে ছাত্রদের যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হত, সেইখানে তার প্রথম গান শুনি। চমৎকার সুরেলা গলা, তেমনি সুমিষ্ট। অনেক প্রাইজ পেয়েছিল। তারপর রেডিওতে তার গান হত, দিলীপকুমার রায়ের প্রযোজিত গানের আসরেও গান গাইত। কিন্তু পরে আর কোথাও তার নাম শুনিনি, গানও নয়।

তিনি বলেন, ঠিকই বলছেন। শোনেননি তার কারণ বলি। সে তারপর একটা সুযোগ পেয়ে জার্মানী চলে যায়। সেখানে ইউরোপীয় সঙ্গীত শিখে ডক্টরেট ডিগ্রীও পায়। এরপরেই বেঁধে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সে তখনও বার্লিনে। তবুও তার চিঠি·।ত্র আমরা পেতাম;—মাঝে মাঝে ফ্রান্সের মধ্যে দিয়ে কীভাবে পাঠাত। এরই কিছুকাল পরে ব্রিটিশ বোমারু বার্লিনের উপর বোমা ফেলে। বার্লিন শহর ধ্বংস হয়। বহু নিরীহ লোক প্রাণ হারায়। সেখানে ভারতীয় মৃতব্যক্তিদের যে তালিকা দিল্লীতে গভর্নমেন্ট

প্রকাশ করে—তাতে দেখা গেল অম্বিকার নামও।

অবাক হয়ে শুনি অম্বিকার দাদার মুখে এই করুণ কাহিনী। ভাবি, অসাধারণ প্রতিভাবান এক তরুণ গায়কের এ কী মর্মন্তুদ জীবনাবসান।

তিনি বলতে থাকেন, অম্বিকার এইভাবে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা সবাই স্বভাবতই গভীর শোকাভিভূত হই। কিন্তু, সে কথা শোনাতে আমার আসা নয়। পরে এমনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে যাতে এখন আমাদের মনে স্থির বিশ্বাস, তার মৃত্যুসংবাদটি ঠিক নয়। অম্বিকা আজও বেঁচে আছে। ঘটনাটি আপনাকে বলি। কিছুকাল আগে কলকাতায় আমার এক বন্ধু যাচ্ছিলেন এক ভৃগু জ্যোতিষীর কাছে, আমাকেও সেখানে টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁদের কথাবার্তা শেষ হলে বন্ধুটি আমাকে বললেন, আপনিও কিছু জানতে চান ত প্রশ্ন করুন না। তখন হঠাৎ আমার মনে পড়ে অম্বিকার কথা। সত্যি বলতে কী, অম্বিকার মৃত্যুসংবাদটা মেনে নিলেও, মনে একটা ক্ষীণ আশা জেগে থাকেই, ঐ ভাবে মৃত্যু! হয়ত খবরটা ভুলও হতে পারে?—তাই সংবাদটা যাচিয়ে নেবার, আর সেইসঙ্গে ভৃগুর গণনার সত্যাসত্য পরীক্ষা করারও মনোভাব নিয়ে, অম্বিকার সম্বন্ধে জানতে চাইলাম। জ্যোতিষী তার জন্মতারিখ ইত্যাদি জেনে নিয়ে পুঁথি খুলে বললেন, আমি তার সমসাময়িক জাতকের এক এক করে কোষ্ঠী পড়ে যাচ্ছি, যেটাতে তার জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলতে থাকবে বলবেন। প্রকৃতই, এক সময়ে অম্বিকার জীবনের কিছু কিছু ঘটনা মিলতে শুরু হল এবং সত্যিই অবাক হয়ে যাই যখন শুনি, জাতক আকাশ থেকে অগ্নিবর্ষণে গুরুতর আহত হবে। আহত। 'হত' বা 'মৃত' নয়! তবে কী! উৎকণ্ঠিত হয়ে শুনতে থাকি। জ্যোতিষী পড়তে থাকেন, এক শ্বেতাঙ্গ সন্ন্যাসীর সেবাশুশ্রূষায় জাতক সুস্থ হয়ে উঠবে এবং পরে সন্ন্যাস নিয়ে হিমালয়ে চলে আসবে।

অম্বিকার কোষ্ঠীবিচারের এই সুখবরের পরে আমাদের চেষ্টা শুরু হল, হিমালয়ের কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যায়। এমনি সময়ে আর এক যোগাযোগ। এই কদিন আগে। হঠাৎ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে জানতে পারি, কয়েক বছর আগে তিনি গঙ্গোত্রী-গোমুখ অঞ্চলে যান। সেখানে এক সাধুর দর্শন লাভ করেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় প্রকাশ পায়, তাঁর বাঙলার শরীর এবং তিনি সঙ্গীতজ্ঞও, শুধু এ দেশীয়ই নয়, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত সম্পর্কেও তাঁর গভীর জ্ঞান। ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে সাধুকে প্রশ্নও করেছিলেন, ইউরোপীয় সঙ্গীতকলাতেও তাঁর এমন জ্ঞান লাভ হল কী করে? গিয়েছিলেন সেখানে? সাধুজি তাতে উত্তর দেন, সাধুসন্ন্যাসীর পূর্ব-পরিচয় সম্পর্কে জানতে নেই, কে কী ছিল, মজুমদার না কী? এ জেনে লাভও নেই।—বুঝতেই পারছেন, ভদ্রলোকের মুখে এই বিবরণ শুনে—বিশেষ করে ঐ 'মজুমদার' কথাটির উল্লেখে আমাদের আশা জেগেছে, ইনিই আমাদের অম্বিকা। কিন্তু, সে ভদ্রলোক ত গিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। সে সাধু কী এখনও ঐ অঞ্চলেই রয়েছেন? আপনি তো প্রায়ই ওদিকে যান—হয়ত বলতে পারবেন। তাই আপনার কাছে আসা।

আমি তাঁকে জানাই, সঙ্গীতজ্ঞ যে দুতিনটি সাধুর দর্শন আমি পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে কেউ অম্বিকা নয়। সবাই অবাঙালী। তবে এবারও ও-অঞ্চলে যাব, তখন ভাল করে খোঁজখবর নেব।

কিন্তু, তাঁকে জানবার মত কোন খবর পাই না। ফিরে এসে তাঁকে সে কথা বলি। তিনি তাতে নিরাশ হন। তবে জানতে পারি, অন্যান্য হিমালয় যাত্রী, এমনকি পর্বত-অভিযাত্রী কারও কারও সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখেছেন এবং অনুসন্ধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তারপরও দশ পনেরো বছর কেটে গেছে। অম্বিকার দাদার সঙ্গে আমার আর দেখাও হয়নি। কিন্তু, ঘটনাটি সম্পর্কে আমারও কৌতূহল যে মন থেকে মুছে যায়নি তার প্রমাণ পেলাম এই কদিন আগে।

বম্বেতে কিছুদিন কাটাচ্ছি। প্রতিবেশী এক গুজরাটী বন্ধুর সঙ্গে প্রায় রোজই দেখাসাক্ষাৎ ও গল্প হয়। মাঝে কদিন আর তাঁকে দেখি না। খোঁজ নিয়ে জানি, বম্বের বাইরে গেছেন। কদিন পরে ফিরে এলে আবার দেখা হয়। জিজ্ঞাসা করি, কোথায় কদিন ঘুরে এলেন?

তিনি জানান, গিয়েছিলাম বরোদায়। ঠিক সেখানে নয়,—বরোদা থেকে কয়েক মাইল দূরে—এক সাধুর আশ্রমে। সাধুটিকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধাভক্তি করি। মানুষটিও চমৎকার। উচ্চশিক্ষিতও। মাঝে মাঝেই ওখানে যাই। দুচারদিন কাটিয়ে আসি। মনে বেশ শান্তি পাই। আর সেখানে গেলে উচ্চাঙ্গের গানবাজনাও শোনা যায়।

সাধুজির সম্বন্ধে আমারও তখন কৌতূহল জাগে। প্রশ্ন করে জানতে পারি, বন্ধু সাধুজিকে গান গাইতে শোনেননি বটে; কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়েদের তিনি আমন্ত্রণ করে আনান এবং আশ্রমে নিয়মিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিরাট আসর ও জলসা বসে।

জিজ্ঞাসা করি, সাধুজির শরীর কোথাকার জানেন নাকি?

বন্ধু বলেন, বাঙলার। এবার একদিন তাঁকে আপনার কথা বলছিলাম। আপনার পরিচয় শুনে তিনি তখনই আপনার বাবার কথা উল্লেখ করলেন—গভীর শ্রদ্ধাভরে। সে-সময়কার আরও দুএকজন নাম করা বাঙালীর কথাও বললেন, তাঁদের কারও কারও সঙ্গে যোগাযোগও ছিল বোঝা গেল। কিন্তু এঁর সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন?

বন্ধুকে তখন অম্বিকার কথা বলি। এবং ঠিক হয়, বন্ধু আবার যখন তাঁর আশ্রমে যাবেন, আমিও সঙ্গী হব। কিন্তু তাঁর অল্প কদিন পরেই আমি বম্বে থেকে চলে আসি। তবে সুবিধা পেলে এ-কৌতূহল মেটানোর ইচ্ছা এখনও রাখি।

হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি

আইন আদালত কথাটা শুনলেই সাধারণত মনে হয় একটা গুরুগম্ভীর পরিবেশ। হাস্য পরিহাসের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। সে-রাজ্যে যাঁদের অধিষ্ঠান, তাঁদের যেন গোমড়ামুখে রসকষহীন কর্তব্য-কাজ করে যাওয়াই প্রথা। সুকুমার রায়ের ভাষায়, সেখানে যেন 'রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা'। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আদালতের থমথমে আবহাওয়ার মাঝে বিচারকেরও গুরুগম্ভীর মুখে হঠাৎ একটা সরস মন্তব্য লঘু হাস্যরসের সৃষ্টি করে।

এই ধরনের বহু ঘটনার বর্ণনা বিদেশী বই-এ পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও হয়ত কিছু লেখা হয়েছে। আমার জানা দু-একটা ঘটনা এখানে বলি।

আলিপুর আদালত। তখন ব্রিটিশ রাজত্ব। জেলা জজের কোর্ট। বিচারক খাস বিলাতী সাহেব। আই. সি. এস.। এইসব আই. সি. এস. সাহেবদেরও চাকরিতে যোগ দেবার পর প্রাদেশিক কোন ভাষা শিখে পরীক্ষা পাশ করতে হোত। ফলে, যাঁরা বাঙলা দেশে চাকরি করতেন তাঁরা সবাই অল্পবিস্তর বাঙলা জানতেন,—অবশ্য সাধারণত সে-আমলের প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের সাধুভাষা।

সেদিন সেই সাহেব জেলাজজের কোর্টে তখন যে মামলার শুনানি হচ্ছে তাতে দুই তরফে দুজন সিনিয়র উকিল। বাদীর উকিল দাঁড়িয়ে যথারীতি ইংরজিতে তাঁর বক্তব্য পেশ করছেন, অপরপক্ষের উকিল তাঁর সেই বক্তৃতার মাঝে মাঝেই বার বার বাধা সৃষ্টি করে মন্তব্য করতে থাকেন। দুই পক্ষের উকিলের মধ্যে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। জজ তাঁদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ শান্তিতে কাজ চলে। কিছু পরে আবার বিবাদী উকিলের অযথা বাধা সৃষ্টি। বাদীর উকিলও স্বভাবতই ধৈর্য হারান, রেগে যান। জজ চুপ করে দেখেন। ওদিকে দুই উকিলের মধ্যে তখন ভীষণ বচসা। কোর্টের সময় নষ্ট হয়। জজ সাহেব কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে হঠাৎ তাঁদের বাদ প্রতিবাদের মাঝে বিশুদ্ধ বাঙলায় বলে ওঠেন, বাওবা! বাওবা! বাদ্যকর বেশ ঢোল বাজাইটেছেন। চোমটকার! (দুই পক্ষের উকিলের একজনের পদবী—'ঢোল', অপরজনের 'বাদ্যকর')।

হঠাৎ সাহেব জজের মুখে বিশুদ্ধ বাঙলায় এই রসাল মন্তব্য শুনে দুই উকিলই হেসে ওঠেন, শান্ত হন। কোর্টের কাজও শান্তিতে আবার শুরু হয়।

দ্বিতীয় কাহিনীর পটভূমি হাইকোর্ট চত্বর।

কান্তিচন্দ্র মুখার্জি ছিলেন এটর্নি। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাঁর সঙ্গে অন্যসূত্রে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন সুরসিক মজলিসী ব্যক্তি। অ্যামেচার থিয়েটারে ভাল অভিনয়ও করতে পারতেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটি হলে শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্তিরদের সঙ্গে তাঁকে অভিনয় করতে দেখেছি। সেই কান্তিবাবু হাইকোর্টের 'অফিসিয়াল রিসিভার' নিযুক্ত হলেন। ইংরেজ আমলের হাইকোর্টের

এক ক্ষমতাপন্ন বড় অফিসারের পদ। তাই অফিসে তিনি মিস্টার কে সি মুখার্জি। সাহেবী বেশভূষা। দপ্তরে অফিসিয়াল কাজকর্ম পরিচালনাকালে মুখে ইংরেজি বুলি। পুরাদস্তুর বিলাতী আচার আচরণ, অফিসে কড়াকাড়ি নিয়মকানুনও।

সেদিন কোর্টে তাঁর দপ্তরে আমি একটা কাজে গিয়েছি। কাজ শেষ হলে বসে দুএকটা এমনি কথাবার্তা হচ্ছে—বাঙলাতেই; ঘরে তখন আর কেউ নেই। এমন সময় অফিসের এক তরুণ কর্মী—সুশ্রী নিরীহ দেখতে—একটা ফাইল হাতে জড়সড় হয়ে এসে দাঁড়াল। তিনি ফাইলটা হাতে নিয়ে তাকে ইংরেজিতে কী যেন নির্দেশ দিলেন।

ছেলেটি তার কথা শুনে বুঝতে না পেরে নার্ভাস হয়ে বলে উঠল—'এনকোর-এনকোর স্যার।' মিস্টার মুখার্জি কোন রকমে হাসি চেপে তখনই স্পষ্ট উচ্চারণ করে শুধু বলেন, নাউ ইউ মে গো।—ছেলেটিও তখনই চলে যেতেই তাঁর হাসি ফেটে পড়ে, কোন রকমে সামলে নিয়ে বলেন, দেখ দিকি কাণ্ড! ছেলেটা থিয়েটারে চমৎকার মেয়েদের পার্ট করতে পারে (সেকালে অ্যামেচার থিয়েটারে পুরুষরাই মেয়েদের পার্টে সাজত) আমাকে এসে ধরলে একটা চাকরির জন্যে। একটা পোস্ট সম্প্রতি খালি হতে ওকেই কাজটা দিয়েছি। থিয়েটারের ঐ মেয়ে সাজা ছাড়া আর কোথাও কাজকর্ম করেনি। আমার অর্ডারটা বুঝতে না পারায় আবার বলবার জন্যে তাই বলে উঠল, এনকোর-এনকোর!—বলে আবার মিস্টার মুখার্জির হাসির উচ্ছ্বাস!

তৃতীয় কাহিনীর পরিবেশ একেবারে হাইকোর্টের জজের এজলাসে। সেও তখন ব্রিটিশ আমল। জজও খাঁটি বিলাতী সাহেব। বর্মা হাইকোর্টে ছিলেন। সেখান থেকে এখানে আসা। বিশাল চেহারা। গোল মুখ,—বুলডগ-এর মত। লাল টক্‌টকে রঙ। কী গুরুগম্ভীর মূর্তি! গ্রীষ্মের সকালে পরিষ্কার আকাশে ওঠা যেন রক্তবর্ণ সূর্য! এজলাসে এসে যখন বসেন—অত প্রকাণ্ড কোর্টরুম, কোথাও একটু টুঁ-শব্দ নেই। তাঁর একার উপস্থিতিতেই সারা কামরা যেন গমগম করে। উকিল, ব্যারিস্টার, পেশকার, চাপরাশী সবাই সন্ত্রস্ত থাকে। গম্ভীর চালে তিনি কোর্টের কাজকর্ম করে যান—মামলা মোকদ্দমা শোনেন, আপন মত অনুযায়ী রায় দিয়ে যান, তাঁর সেই রক্তবরণ বুলডগী মুখ দেখে কারও বোঝবার সাধ্য নেই, কোন্ মামলার কী ফল হবে।

কোর্টের মানমর্যাদা নিয়মকানুন—এমন কি পরিবেশও যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকেও তাঁর কড়া নজর। একদিন তো ফজলুল হক সাহেব (তিনি তখনও অত স্বনামখ্যাত হননি) তাঁর কোর্টে এসেছিলেন কদিন দাড়ি না কামিয়ে—তাঁর মুখ-ভর্তি খোঁচা দাড়ি নিয়ে। মামলা করতে উঠে দাঁড়াতেই সেই সাহেব জজ তাঁকে গম্ভীর মুখে বলেন, মিস্টার হক, আপনার মামলা আজ মুলতুবি রাখলাম, আপনি দয়া করে দাড়ি কামিয়ে তবে কেস করতে আসবেন, তখন শোনা যাবে।—হক সাহেবকে ধীরে ধীরে চলে যেতে হয়।

সেই সাহেব জজেরই এজলাসে একদিনের ঘটনা।

এক উকিল দাঁড়িয়ে তাঁর মামলার আরগুমেন্ট করছেন। ডায়াস-এ বসে জজসাহেব চুপ করে শুনছেন। নিচে প্রথম সারির চেয়ারে অন্য উকিল ব্যারিস্টার কয়েকজন চুপচাপ বসে—পরে তাঁদের মামলারও হয়ত শুনানি হবে। পিছনের কয়টা বেঞ্চে জনকয়েক মক্কেল বা তাদের তদ্বিরকারক বসে। সেই দিক থেকে হঠাৎ একটা গরর্ গরর্ আওয়াজ শোনা গেল। প্রথমটা মৃদু, তারপর থেকে-থেকে বেশ জোরে।

সবাই ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকায়। সম্ভবত একটা মক্কেলই হবে,—বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে,—তারই নাসিকাধ্বনি! সেই নিস্তব্ধ প্রকাশু কোর্টরুমে শব্দটা একবার বিকটভাবে গরর্-গোঁ-ফুস করে উঠে প্রতিধ্বনিত হল। উকিল বক্তৃতার মাঝে থেমে গেছেন, জজসাহেবেরও কঠোর দৃষ্টি সেই দিকে। লোকটারও হয়ত নিজের নাসিকাধ্বনিতেই ঘুম ভেঙেছে।

স্বভাবতই এমন পরিস্থিতিতে সেই কড়া জজসাহেব ঘটনাটাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। পেশকারকে বলেন, লোকটাকে ডাকাও, সাক্ষীর কাঠগড়ায় ওকে দাঁড়াতে বল।

চাপরাশী তাকে ডেকে আনে। ইতিমধ্যে সে জানতে পেরেছে কী ভীষণ কাণ্ড করে ফেলেছে। তার বেশভূষা দেখে মনে হয়, গ্রামের লোক। বোধহয় এ-কোর্টে তার মামলা আছে, তাই অপেক্ষা করছিল।

হয়ত কোন দূর গ্রাম থেকে এসেছে, রাতে ঘুম হয়নি, এখন চুপ করে বসে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কোর্টের মধ্যে থমথমে আবহাওয়া। বোঝাই যাচ্ছে, কোর্টের মধ্যে কাজের সময় জজের সামনে বসে নাক ডেকে ঘুমানো!—কোর্ট অবমাননার অপরাধে নির্ঘাৎ জেল! বেচারী! এই কড়া সাহেব জজ! কোন নিস্তার নেই।

বিচার আরম্ভ হয়। সেই সাক্ষীর কাঠগোড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে সে। কী ভয়ার্ত অসহায় করুণ মুখের চেহারা। ঠকঠক করে বেচারী কাঁপে। তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে সাহেব জজ পেশকারকে বলেন, একে জিজ্ঞাসা করো, ও কি ইংরেজি বোঝে?

পেশকার প্রশ্ন করে জেনে জজকে বলেন, নো মি লর্ড।

জজ,—ওকে এবার জিজ্ঞাসা করো, ও কী এটা জানে যে কোর্টের মধ্যে সে কী গুরুতর অপরাধ করেছে। পেশকার লোকটিকে সেই প্রশ্ন বলে চুপিচুপি আরও বলেন, হাত জোড় করে দাঁড়া, ক্ষমা চা'।

লোকটিও সেই মত দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বলে, জানি, ধর্মাবতার,—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—মহাদোষ করে ফেলেছি—ক্ষমা চাইচি।

পেশকার জজসাহেবকে ইংরেজিতে তার কথাগুলি জানান।

জজসাহেব দুবার মাথা নাড়েন গম্ভীর মুখে। কোর্টরুমে থমথমে ভাব। সবাই উৎকণ্ঠিত। যা নিয়মনিষ্ঠ সাহেব জজ, ঐ রক্তরাঙা বুলডগী মুখে লেশমাত্র করুণার চিহ্ন নেই। জেল তো হচ্ছেই। বেচারী! জজ সাহেব বজ্রগম্ভীর স্বরে পেশকারকে বলেন, পেশকার! লোকটাকে জানাও, কোর্টের মধ্যে ঘুমিয়ে-পড়া তার ঘোরতর অপরাধ,—আর কখনও যেন এমন না করে। কোর্টে বসে ঘুমোবার বিশেষ একতিয়ার—একটু থেমে বলেন—একমাত্র জজেদের!—it's a Privilege only of the Judges!

কোর্টরুমেও হঠাৎ যেন ঘনঘটা মেঘে ফুটে ওঠে হঠাৎ-আলোর ঝলকানি!

পাগলীর পায়স

পাগলীর পায়স,—একখানি বই-এর নাম। নামের পাশে বিশদ বিবরণ দেওয়া—"কেদার বদরিকার দৈববাণী"। "পাগলী মা প্রণীত"। প্রকাশকের নাম,—চপলাবালা ঘোষ। ঠিকানা ১৬-২৮নং মানমন্দির ঘাট, কাশীধাম। মূল্য ২৲ টাকা।

বইখানি পড়ে মনে হয়, সম্ভবত প্রকাশিকাই লেখিকা। তাঁর "বাসা"—"পাতালেশ্বর ১৫১নং প্রতাপ ঘোষের বাড়ি কাশীধাম"।

অনেকদিন আগে এক বন্ধু বইটি আমাকে পড়তে দেন। চটি বই। অতি সাধারণ কাগজে, সাধারণ ভাবে ছাপা। কিন্তু বইটি পড়ে আশাতীত আনন্দ পাই। বন্ধুকে তাঁর বই ফেরত দিয়ে ভাবি, কাশীতে খোঁজ করে এক কপি কিনে রাখব। কিন্তু বাঙালীটোলার পুরানো বই-এর দোকানে-দোকানে খোঁজ করেও যোগাড় করতে পারি নি। তবে, ঐ "পাগলী মা"র লেখা অপর একখানি বই পাই—প্রায় একই রকম দেখতে। নামও "পাগলীর পায়স"—কিন্তু, সেটির বিশদ বিবরণ—"তারকেশ্বরের দৈববাণী"।

এই থেকে বোঝা যায়, কাশীবাসিনী সেই মহিলা সাহিত্যচর্চা করতেন ও সুলেখিকাও ছিলেন।

আমার নিজের প্রথম কেদারবদরী যাত্রা ১৯২৮ সালে। আজ ষাট বছর হয়ে গেল। আর, সেই মহিলার যাত্রা আমার যাত্রার আরও বছর ছয় আগে—১৩২৯ অর্থাৎ ১৯২২-এ।

ঝরঝরে সহজ ভাষায় লেখা সেই মহিলার নিখুঁত যাত্রাবিবরণী আমার চোখে তাই জীবন্ত ছবির মতই ফুটে ওঠে।

আমার ধারণা, "পাগলীর পায়স"-এর স্বাদ গ্রহণের হয়ত অনেকেরই সুযোগ হয় নি। অনেক দিন আগে পড়া সেই বইখানিতে বর্ণিত যাত্রা-কাহিনী আমার এখনও যেমন ও যতটুকু স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে, পাঠকদের এখানে পরিবেশন করি।

বাসি পায়সেরও চমৎকার স্বাদ থাকে!

১৩২৯ সালে কাশীবাসিনী সেই লেখিকা কেদারবদরী তীর্থযাত্রা করার "স্বপ্নাদেশ" পান। কিন্তু, যাত্রার খরচার টাকা পাবেন কোথায়? দেশে আত্মীয়স্বজনের কাছে কাপড় ও টাকার সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখেন।

অনেকেরই জবাব আসে, কিন্তু টাকা কাপড় কিছুই আসে না। জবাবে,—নানারকমের কৈফিয়ত। কেউ লেখেন, বাড়িতে অসুখবিসুখ; ডাক্তারের খরচা হচ্ছে অনেক, কারও মেয়ের বিয়েতে প্রচুর খরচ হয়েছে ইত্যাদি।

লেখিকা চিঠিগুলি উল্লেখ করে মন্তব্য লেখেন,—পাঠালে' পাঠাতিস তো দু টাকা, বা বড় জোর পাঁচ টাকা! তাই না পাঠানোর অত অজুহাত! একজন তো চিঠির জবাবই দিল না,—দেখা হলে বলবে, কই! চিঠি তো পাই নি!—মোক্তারি করে তো!

অত চেয়েও কিছুই পান না। পাবেন কী করে? ছোটবেলাতেই যে মায়ের অভিশাপ আছে! বালবিধবা মেয়ে। মায়ের কাছে থাকেন। সেকালের কঠোর নিয়ম মেনে থাকা, খাওয়াদাওয়া, একাদশীতে নিরম্বু উপবাস। স্নেহময়ী জননী তারই মধ্যে বিধবা মেয়েকে বেশি করে ও ভালভাবে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। দুধ, সর, মিষ্টি আনেন। আদর করে খাওয়াতে বসেন। বিধবা বালিকা অনাদরে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে, কোনমতেই খায় না। মা পীড়াপড়ি করেন। মেয়ে তবু শোনে না। মায়ের চোখে জল ঝরে। অবশেষে বলে ওঠেন, "না খেয়ে আমাকে এখন কষ্ট দিচ্ছিস, আমি মরে গেলে তখন কারও কাছে চাইলেও পাবি না!"

মেয়েও জবাব দিতে ছাড়ে না। মুখ ঘুরিয়ে বলে, "মা আমার অমর। সব সময়েই সঙ্গে থাকবেন, না চাইলেও সেধে খাওয়াবে মা!"

প্রথম প্রথম মা কাঁদতে কাঁদতে খাবার নিয়ে চলে যেতেন। আবার তখনই ফিরেও আসতেন। মেয়ে তখন তাঁর অভিশাপের কথা তুললে মা বলতেন, তুই তো এখন চাস নি,—"চাইলে পাবি না" বলেছি। দেখিস, তুই না চাইলেও পাবি।

মেয়ে তখন চোখে-জল, মুখে-হাসি নিয়ে খেয়েছে।

মায়ের সেই অভিশাপ ও আশীর্বাদ দুই নিয়ে সেই কন্যাই পরে কাশীবাসিনী। এখন স্বপ্নাদেশ পেয়ে কেদারবদরী যাত্রার অভিলাষিণী।

তাই কাপড় টাকার সাহায্য চেয়েও কিছুই না পেয়ে দমেন না। ভাবেন, ঠিকই তো, পাব কেন? চেয়েছি যে! কাপড় নেই। তা আমার আবার লজ্জা কীসের? বিবসনা মায়েরই যখন পূজা করি!

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। জানেন, "কাশীবাসী যাত্রীদের সঙ্গে চলবে না। সকলের টাকার খুঁটি, আমার নামের বল!"

১৬ই চৈত্র যাত্রা করেন। সঙ্গে—এক টাকা দশ আনা। ঝুলিতে—/১ গুড়, /১ ছাতু, একটা তেঁতুল, একটা ঘটি, পেতলের কড়া, পূজার শিবঝুলি, গীতা, চণ্ডী, পূজার সামগ্রী।

এই সম্বল করে তাঁর কেদারবদরী যাত্রা!

হরিদ্বার পৌঁছুলেন। সেকালে বাঙালী কেদারবদরী যাত্রী অনেকেই ভোলাগিরির আশ্রমে উঠতেন। স্বামিজীর তখনও শরীর আছে। তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করে যাত্রীরা যাত্রা শুরু করতেন। ১৯২৮ সালে আমরাও তাই করেছিলাম। মনে আছে, তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, পাহাড়ে পথ চলতে (তখন হৃষীকেশ থেকে পায়ে-হাঁটা পথ) ক্লান্তিবোধ হলে এই মন্ত্রটি স্মরণ করবে, ক্লান্তি দূর হবে।

আধবদরী যোগবদরী ধ্যানবদরী নৃসিংহবদরী কেদারবদরী।

পঞ্চবদরী স্মরেৎ নিত্যং পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

লেখিকাও অন্য যাত্রীদের সঙ্গে স্বামিজীর দর্শনে যান।

স্বামিজী কথাপ্রসঙ্গে যাত্রীদের প্রশ্ন করেন, কে কত টাকা সঙ্গে নিয়েছ?

কেউ জানায়, তিনশ', কেউ দু'শ, কেউ একশ',—এই ভাবে চল্লিশ টাকা পর্যন্ত নামে।

বেশি টাকাওয়ালাদের স্বামিজী বলেন, পথে যাত্রীদের কেউ খেতে না পেলে খেতে দেবে। বৈকুণ্ঠের পথে দয়াই হল ধর্ম।

লেখিকা চুপচাপ বসে। স্বামিজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুই কেত্তা রূপিয়া লিয়া বোল মেরে। তিনি উত্তর দেন, পরমাত্মা মজুত।

স্বামিজীর মুখে হাসি ফোটে, বলেন, টাকাওয়ালা আপ্ আপ্ খায়ে খায়ে হাগ্ হাগ্ আয়েগী। তুই হালুয়া পুরী লাড্ডু খায়ে এত্তা গোদ্ মোটা হোগী!

স্বামিজীর কথা শুনে লেখিকা মনে ভাবেন, স্বামিজী তাঁকে ঠাট্টা করলেন। মনে ব্যথা পান।

কিন্তু, যাত্রাশেষে স্বামিজীর কথামতই যে ঘটবে, তা তখন ভাবতে পারেন না।

তারপর, অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে লেখিকার যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু, কালীকমলীর ধর্মশালার সদাব্রতের চিঠি পান না, অক্ষয়তৃতীয়ায় সে চিঠি বিলি হয়। লেখেন, "নারায়ণের নাম সঙ্গে আছে, ধনরত্ন নেই, কিন্তু আনন্দের অবধি নেই।"

পথে ভিক্ষার চেষ্টা করেন। লেখেন, "চাইতে জানি না। মিষ্টি মুখ নেই, অহঙ্কার আছে, কেউ সামান্য কিছু দিতে এলে নিতে মন ওঠে না।"

তবু, খাবার জোটে। সঙ্গীরা কেউ কখনও ভাগ দেয়, না নিলে স্নেহের ভর্ৎসনা করে।

পথে চটিতে শুয়ে বারে বারে নানা স্বপ্ন দেখেন। অদ্ভুত অসম্ভব ঘটনার স্বপ্ন। অথচ, জেগে উঠলে সেই স্বপ্নই সফল হয় আশ্চর্যভাবে।

তারই অনেক ঘটনা লেখেন। দু একটা যা মনে আছে, বলি।

দেবপ্রয়াগে। স্বপ্নে দেখেছেন, মা এসেছেন, খাবার হাতে, বলছেন, কেন রাগ করিস? চেয়ে খেতে পারিস না? সময় পাই না, তাই এসে দিতে পারি না। এই নে,—খা'।—একটা দোয়ানিও নে।

ঘুম ভেঙে যায়। দেখেন, কাশীবাসিনী এক সহযাত্রী অনুরোধ করছেন খাবার জন্যে। তারপর ডেকে নিয়ে হাতে দেন একটা দোয়ানিও!

অথচ, জানেন সেই যাত্রীরও যাত্রা মাত্র ৩৫্ টাকা সঙ্গে নিয়ে!

আর এক চটিতে। আবার স্বপ্ন। মা এসেছেন একবাটি পায়েস হাতে। বলছেন, আয়, পায়েস এনেছি, খেয়ে নে!

জেগে ওঠেন। মায়ের ওপর অভিমান হয়,—স্বপ্নে এসে পায়েস খাওয়াচ্ছেন!

কিছু পরে। চটির অপরদিকে এক ধনী যাত্রীদল এসে ওঠে। রান্নাবান্না করে খাওয়াদাওয়াও হয়। তাঁদের এক মহিলা লেখিকার দিকে তাকিয়ে বলেন, কই গো! তুমি তো উনুনও জ্বালালে না, রান্না করলে না, খাবে কী? চলে এস এদিকে, নিয়ে যাও—এটা।

ডেকে খেতে দেন—খাবার ও একবাটি পায়সও!

লেখিকার চোখে জল নামে! মায়ের এ কী করুণা!

দিনের পর দিন পাহাড়ের সেই দুর্গম পথে চলতে চলতে পাথরে চোট লেগে লেখিকার পায়ে ভীষণ ব্যথা। চলতে পারেন না। ওদিকে আবার নিজের ঝোলার ভারও আছে। মনে মনে বাবা কেদারনাথকে গালি দিচ্ছেন। হঠাৎ গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী আসেন, তাঁর বোঝা নিজে বয়ে নিয়ে তাঁকে চটিতে পৌঁছে দিয়ে চলে যান।

চকিতে তাঁর পায়ের ব্যথার যন্ত্রণা বাড়ে। প্রবল জ্বর দেখা দেয়। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকেন। কাশীবাসিনী যাত্রীরা দুদিন অপেক্ষা করে তাঁকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে যাত্রাপথে এগিয়ে যান।

ওদিকে লেখিকা জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখেন, কে যেন এসেছেন তাঁকে নিয়ে যেতে কাণ্ডি করে!

ঘটেও অবশেষে তাই।

গোরখনাথের এক শিষ্য সাধু চটিতে পৌঁছান। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে তাঁর সেবা করেন। বলেন, ফুঁক্ দিয়া তুমরা দরদ, চলো তুম্ কাণ্ডিমে,—হাম্ লেনে আয়া।

প্রকৃতই তাঁর ব্যথা কমে যায়। পরদিন কাণ্ডিতেও উঠতে হয় না। পায়ে হেঁটেই চলেন। সাধু বলেন, আমার সব জানা আছে, তোমার কাছে খানা নেই, আমি খানা দেব—না খেলে মার দেব—গোসা করব। —তিনি তাঁকে এইভাবে একদিন সঙ্গে থেকে খাইয়েদাইয়ে চলে গেলেন।

লেখিকা মন্তব্য করেন, "প্রহ্লাদের পিতৃবৈরী না হলে জগৎপতির দর্শন হোত না, আমার সঙ্গীরা না ছাড়লে এ প্রত্যক্ষ অনুভূতি হত না। সঙ্গীদের আশীর্বাদ করলাম।"

এইভাবে ঘটনার পর ঘটনা। তাঁর কেদারবদরী দর্শনলাভও। বদরীনাথে থাকা ও খাওয়াদাওয়ার সুব্যবস্থাও হয়ে যায়। সেখানে কয়েকদিন তীর্থবাসও করেন। যাত্রীদের কাছে যথেষ্ট অর্থভিক্ষাও পান।

—এইবার কাশীতে ফেরবার কথা। কিন্তু, ঠিক করেন, হাতে যখন টাকা এসে গেল, ঘুরে যাই মথুরা বৃন্দাবনেও।

সেইমত চলে যান। বৃন্দাবনেও খাওয়াদাওয়ার অভাব হয় না। পরম আনন্দে দিন কাটে। কেদারবদরীর দুর্গম যাত্রার পর শ্রান্ত দেহ শুধু বিশ্রমই পায় না, পশ্চিমের জলহাওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্যও ফেরে।

অবশেষে কয়েকমাস পরে একদিন কাশীতে ফিরে আসেন। হাতে তখনও এক টাকা দশ আনা—যে-টাকা সম্বল করে তাঁর যাত্রা শুরু।

ওদিকে কিন্তু তাঁকে দেখে কাশীর সবাই অবাক! তার ওপর তাঁর শরীরও অমন মোটাসোটা! একী!

লেখিকা তখন শোনেন কাশীবাসিনী সহযাত্রীরা ফিরে এসে রটনা করেছেন, পথে ঘোরতর অসুস্থ হয়ে সেই তীর্থপথেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

শুধু তাই নয়। আরও জানতে পারেন, সেই সব সহযাত্রীরা ফিরে এসে অনেকেই পেটের রোগে ভুগছেন এবং এখন অস্থিসার হয়েছেন!

লেখিকারও তখন মনে পড়ে, হরিদ্বারে যাত্রারম্ভে ভোলাগিরি মহারাজের সেই সহাস্য মন্তব্য,—টাকাওয়ালা আপ্ আপ্ খায়ে খায়ে হাগ্ হাগ্ আয়েগী। তুই হালুয়া পুরী লাড্ডু খায়ে এত্তা গোদ্ মোটা হোগী!

কিন্তু, এ তো হল লেখিকার নিজের কাহিনী। সেই সঙ্গে তিনি যাত্রাপথেরও নানান বর্ণনাও দিয়েছেন। অন্যান্য যাত্রীদের সম্বন্ধেও লিখেছেন। তার মধ্যে এক চটিতে যে বিশেষ একটি ঘটনার বিবরণ দেন, তা প্রকৃতই ভাল উপন্যাস রচনার বিষয়বস্তু হবার যোগ্য।

সেই ঘটনারও আমার যা মনে আছে, এখন শোনাই।

গরুড় চটির ধর্মশালা।

হৃষীকেশের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা এসে আশ্রয় নিয়েছেন। পাশেই অপর এক গেরুয়াবাস সাধুর দল। সেখানে তাঁদের গুরুদেব—বয়স্ক সন্ন্যাসী—শুয়ে বিশ্রামরত। যুবক শিষ্যরা তাঁর পদসেবা করেন। দেখা যায়, সেই প্রবীণ স্বামিজী বার বার সন্ন্যাসিনীদলের দিকে কাকে যেন তাকিয়ে দেখেন। তারপর তাঁদের মধ্যে একজনকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেন, কে? সুশীলা না? আশ্চর্য! তোমার এমন মনের বল ও সাহস হয়েছে! এইভাবে ঘরের বার হতে পেরেছ? তুমি যে খুবই ভীরু ছিলে!—তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে জানান, তোমাকে দেখে ভারী খুশি হচ্ছি।

হৃষীকেশবাসিনী সেই সন্ন্যাসিনীও স্তম্ভিত হয়ে তাঁর সঙ্গিনীদের বলে ওঠেন, ওগো! এ যে দেখছি, আমার স্বামী এসেছেন!

সন্ন্যাসিনীরা হেসে ওঠেন। ঠাট্টা করেন, গেরুয়া দেখে দলে ভিড়তে ইচ্ছে হল বুঝি? কখনও তো বল নি, তোমার স্বামী আছে! অনেক দিন হল সন্ন্যাস নিয়েছ, মাথা মুণ্ডন করেছ, হাতের লোহা ফেলেছ!

প্রবীণ স্বামীজী আগ্রহ করে বলেন, চল আমার সঙ্গে। এখন আর কোন চিন্তার কারণ নেই।

সুশীলা উঠে আসেন। তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করেন।

সাধুজী তখন শিষ্যদের কাছে স্বীকার করেন, উনি তোমাদের গুরুমা। আমার পূর্বাশ্রমের শাদির আওরাত।

তারপর তাঁদের দুইজনের পূর্বাশ্রমের কাহিনীও শোনা যায়।

সুশীলার বিবাহ হয় ১৩।১৪ বছর বয়সে। স্বামীর নাম—শশীভূষণ, তখন তাঁর বয়স ২১।২২।

সুশীলা সুরূপা নয়,—কালো, বেঁটে। লোকে তাঁকে কুৎসিত বলে। অথচ, শশীভূষণ সুদর্শন, গৌরবর্ণ, অতি সুশ্রী।—সুশীলা বলেন, তাঁরা ভগবানের দাস সন্তান, বিষয়ীগুণ বর্ণিতে চাই না।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বুদ্ধিমান। তবু, সুশীলার মনে সব সময় সংশয়,—স্বামীর অমন রূপ, গুণ—আমাকে নিয়ে তিনি হয়ত সুখী নন। অথচ, কোন দিনই কখনও স্বামীর কোন কথায় বা আচরণে তিনি যে অসুখী এমন কিছু প্রকাশ পায় না। তবুও, সুশীলার সদা সঙ্কোচ বোধ। মনভরা সংশয়। তাঁর কোন আচরণে স্বামী অসন্তুষ্ট না হন,—তাই সতর্ক। সর্বদাই চেষ্টা,—কীসে তিনি সুখ পান, তাঁর দেহ সুখে থাকে।—এই হয়ে ওঠে সুশীলার জপধ্যান;—সংসারের অন্য কোন কাজে মন থাকে না।

জব্বলপুরে শশীভূষণ অফিসের বড়বাবু হলেন। একটি মেয়ে হল, কিন্তু মারা গেল। অনেকদিন পরে আবার একটি ছেলে হল। অথচ, সুশীলার সেই ছেলেকে যত না আদরযত্ন দেখাশুনা, তার চেয়ে বেশি সেবাযত্ন স্বামীকে।

স্বামীর অফিসের বেশভূষা গুছিয়ে শুধু ঠিক করে রাখাই নয়, তাঁকে পরিয়ে দেওয়া, ফিরে এলে নিজে খুলে দেওয়া, বাতাস করা, খাবার তৈরি করে খাওয়ানো,—সারাক্ষণই স্বামীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি। স্বামী আপত্তি জানান, বলেন, অত করো কেন? বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—এ আমার ভাল লাগে না,—এত করো না। শুনে সুশীলা কেঁদে আকুল হয়, বলে, এ তো আমার কর্তব্য করি—

এ-সব সত্ত্বেও স্বামী কখনও কোন কঠোর বাক্য বলেন না।

স্বামীর অফিস থেকে ফিরতে দেরি হলে সুশীলা চাকর পাঠিয়ে খোঁজ নেয়। স্বামী ফিলে এলে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করে। উত্তর না পেলে কাঁদতে থাকে। স্বামী তখন হয়ত বলেন, আমি আর কোথাও যাব না নাকি? একদিন না বলে চলে যাই যদি—তখন?—সুশীলা কথা শুনে কেঁদে অস্থির।

স্বামী নিয়মিত যোগ অভ্যাস করেন। সুশীলা পিছন থেকে বাতাস করেন। রাত্রে তেল জল দিয়ে স্বামীর পায়ে মালিশ করে দেন, স্বামী ঘুমালে তবে ঘুমান।

স্বামীর দিকেই সব সময়ে দৃষ্টি, ছেলের প্রতি তত নয়।

স্বামী কখনও হয়ত বলেন, তোমার এখন ছেলে হয়েছে, তার দেখাশোনা করো, তোমার আর দুঃখ কী!

সুশীলা বলে ওঠে, ছেলে আমি চাই না।

সুশীলার সেই বাক্যই যেন তার ভাগ্যবিধাতা শোনেন!

ছেলের তখন আড়াই বছর বয়স। প্রবল জ্বর দেখা দিল। ডাক্তার এসে দেখেন। ওদিকে কিন্তু সুশীলার স্বামীসেবার ত্রুটি নেই। অবশ্য ছেলের কাছেও থাকতে হয়। কিন্তু মনে মনে সর্বদাই ভাবনা, স্বামীর বুঝি কোথাও অসুবিধা হল। তাড়াতাড়িতে করা রান্না হয়ত ভাল হয় নি, চাকরে হয়ত সব দেখাশুনা ঠিকমত করছে না।

রাত্রে স্বামীর ঘুম হয় না। হঠাৎ দেখেন, কে পাশে বসে পাখা হাতে হাওয়া করে। কে? সুশীলা! স্বামী আশ্চর্য হয়ে বলেন, তুমি এখানে! যাও, ছেলের কাছে যাও, তার কাছে থাক।

সুশীলার মন ওঠে না যেতে। তবু যেতে হয়।

ছেলের অসুখ বেড়ে চলে। স্বামী অফিস থেকে ছুটি নেন। ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করেন। তিন-চারজন ডাক্তার এসে দেখেও যান। গরমের দিন। স্বামী ঘরের একপাশে চুপ করে এসে বসেন। গা বেয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরে। সুশীলা ছেলের পাশ থেকে উঠে গিয়ে এক গেলাস সরবৎ করে আনেন। স্বামীর গায়ের ঘাম মুছে দেন। বাতাস করতে বসেন। স্বামী বলেন, তুমি পাগল হয়েছ নাকি সুশীলা? ছেলের কিরকম বাড়াবাড়ি চলছে, বুঝছ না? সরবৎ আমি খাব না, নিয়ে যাও তুমি। আমি এখন আবার চললাম —সায়েব ডাক্তার আনতে। তুমি যাও—ছেলের কাছে গিয়ে বসো। এখনই আসছি!

স্বামী খালি গায়ে, খালি পায়ে বেরিয়ে যান।

সুশীলা আকুলকণ্ঠে ডাকে, ওগো, সরবৎটুকু খেয়ে যাও—একটু সুস্থ হয়ে বার হও।

স্বামী আর ফিরে তাকান না। সুশীলা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে,—সেই রোদে স্বামী চলেছে—চলেছে——চলেছে, শুধু গায়ে, খালি পায়ে।

ওদিকে স্বামী অফিসে গিয়ে তাঁর দু-চারজন বন্ধুকে বলেন, এখনই তোমরা যাও। ছেলের হয়ে এল। সুশীলাকে সান্ত্বনা কোরো। সে পাগল। আমি চললাম। সুশীলাকে তার বাপ-মার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

চিরবিদায় পত্র লিখে স্বামী চলে গেলেন।

বিকালে এসব ঘটনা। সন্ধ্যার সময় ছেলেরও শেষ নিঃশ্বাস। সুশীলার কেবলই কান্না—বাবু সায়েব ডাক্তার আনতে গেছে,—কই! কই! এখনও এল না...কিছুই খেয়ে যায় নি!

সুশীলাকে পাগল অবস্থায় তাঁর বাবা নিয়ে যান। বছর তিনেক সে উন্মাদ ছিল। তারপর কাশীবাস করে। পিতা মাসোহারা পাঠাতেন। আরও তিন বছর পরে সুশীলা হরিদ্বার চলে যায়। সেখানে কিছুদিন পরে শাঁখা লোহা ফেলে শঙ্করাচার্য মঠে সন্ন্যাস নেয়। নাম হয়, নারায়ণগিরি। এখন হৃষীকেশে মাটি ও

পাথরের কুটির তুলে তপস্যা করে। কালীকমলী ছত্রের ভিক্ষায় দিন চলে।

এখন তেরো বছর পরে এই তীর্থপথে তাঁদের আবার দেখা!

স্বামিজীর শিষ্যরা এসে সন্ন্যাসিনী সুশীলাকে প্রণাম করে। বলে, চলুন মায়ীজি, গুজরাটে আমাদের মঠে, আমরা আপনার দাস।

স্বামিজীও বলেন, আমার সঙ্গে চল। আর চিন্তা নেই। তোমার জন্যে ভিন্ন আশ্রম করে দেব। কোন অসুবিধে হবে না তোমার।

সুশীলা স্বামিজীর পদসেবা করে। চোখে তার জল। স্থির কণ্ঠে জানায়, যে ফাঁকি দিয়ে যায়, তাকে আর চাই না। যাঁকে ডাকলেই আনন্দ পাই, তাঁকেই এখন পেয়েছি,—আর কপটের সেবায় বাসনা নেই—চোখ দিয়ে তার জল ঝরে পড়ে।

সুশীলা বলে, আমার চোখের এ জল মায়ার কান্নার নয়। জগৎপতিকে সর্বদা প্রার্থনা জানিয়েছি, একবার শুধু তাঁকে দেখাও।—আমাকে না বলে চলে গেল! জিজ্ঞাসা করব, কেন? কেন আমাকে বলে গেল না? এখনই আসছি বলে চলে গেল,—আমি অপেক্ষায় রইলাম,—কেন না বলে ওভাবে চলে গেল?—শুধু একবার যেন তাঁকে দেখাও।—আজ আমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করলেন আমার আরাধ্য দেবতা,—তাই আমার এই আনন্দের অশ্রু!

স্বামিজী ও শিষ্যরা আবার অনুরোধ করেন, গুজরাটে তাঁদের আশ্রমে গিয়ে বাস করতে।

সুশীলা বলে, আমি এখন বিশ্ব-স্বামীর কৃপা পেয়েছি। সাধারণ শরীর-সেবার আগ্রহে উন্মাদ হয়ে ছিলাম,—আজ মনের কল্পতরু দর্শন করলাম। তেরো বছর যে-বাসনা প্রাণে ধারণ করেছি—তাঁরই দর্শন পেয়েছি। আপনি আপনার পথে যান, আমিও আমার পথ পেয়েছি।

তারপর?

সেই স্বামিজী কেদারবদরী দর্শন করে ফিরছেন, সন্ন্যাসিনী সুশীলা নারায়ণগিরি দর্শনে চলেছেন। দুইজন নিজ নিজ পথে যাত্রা করেন।